উজ্জ্বলভারত

একাদশ বর্ষ

মাঘ ১৩৬৪—পৌষ ১৩৬৫ , ১৮৮০ (১৯৫৮)

বর্ষসূচী

সম্পাদক
শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত
শ্রীরেণু মিত্র

উজ্জ্বলভারত
নরনারায়ণ আশ্রম
পোঃ দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগণা

উজ্জ্বলভারত, ১১শ বর্ষ, মাঘ ১৩৬৪—পৌষ ১৩৬৫ (১৯৫৮)

বর্ষসূচী

বর্ষসূচী

উজ্জ্বলভারত

মাঘ, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ　　১১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

আমাদের কথা

আমাদের দশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে—এই মাঘ মাস হইতে উজ্জ্বলভারত মাসিক পত্রিকার একাদশ বর্ষ আরম্ভ হইল। আমরা এই নূতন দিনে আমাদের জীবনদেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে আমাদের জীবনে অনুধ্যান করি, তাঁহার জীবন ও জীবনদর্শনকে আমাদের জীবনে রূপ দিবার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস করিবার নূতন সংকল্প গ্রহণ করি। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শনই শ্রীনিত্য-গোপাল বর্তমান যুগের আবেষ্টনে ও ভাষায় বহন করিয়া আনিয়াছেন, নিজ জীবনে প্রকাশ করিয়াছেন—তাই শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের সমস্ত সত্ত্বা দিয়া গ্রহণ করিবার সংকল্পও আমরা গ্রহণ করি। সেই পুরুষোত্তম-তত্ত্বের প্রকৃতি-পুরুষ সমন্বিত তনু, রাধাকৃষ্ণ একই স্বরূপতত্ত্বের ঘন বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরকে আমাদের প্রাণের প্রণতি নিবেদন করি।

ইহাদের প্রতি আমাদের প্রণতি পৌঁছাইয়া তাহার পর প্রণাম জানাই জীবন্ত জীবনদর্শনের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, আর রাজনৈতিক জটিলতার মধ্যে পর্যন্ত এই জীবনদর্শনকে রূপ দিতে প্রয়াসী হইয়া মানুষকে বাস্তব জীবনের শোষণের বিরুদ্ধে যিনি ভারতবাসীকে দাঁড়াইতে শিখাইয়া গিয়াছেন, সেই মহাত্মা গান্ধীজীকে।

উজ্জ্বলভারত তথা আমাদের চলার পথে যাঁহাদের জীবন ও জীবনতত্ত্ব আমাদের পথপ্রদর্শক, তাঁহাদের সকলকে আমাদের ভক্তিপ্রণতি জানাইয়া উজ্জ্বলভারতের সহিত যে কোনরূপে জড়িত যাহারা ছিলেন, আছেন ও থাকিবেন তাঁহাদের সকলকে আমাদের প্রাণের প্রীতি ও আনন্দ-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করি। শ্রীভগবানের আশীর্বাদ মানুষের মধ্য দিয়াই মানুষ পায়। তাই তাঁহাদের সহযোগিতার মধ্যে এবং অসহযোগিতার মধ্যেও—আমরা শ্রীভগবানের আশীর্বাদই যেন সর্বদা অনুভব করিতে পারি—তাঁহার কল্যাণ ও রুদ্র দুই রূপকেই যেন আমরা জীবনের অগ্রগতির সহায়ক বলিয়া বুঝিতে পারি। তাই যতখানি সহযোগিতা আমরা দশ বৎসর সকলের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহাই যেমন আমাদিগকে আগাইয়া দিয়াছে, তেমনই যে সহ-যোগিতা পাই নাই, তাঁহা কেন পাইলাম না, তাহা পাইতে হইলে আমাদিগকে

জীবনগত কোন্ স্তর অর্জন করিতে হইবে, আমাদের চিত্তবৃত্তিকে কতখানি সম্প্রসারিত ও গভীর করিতে হইবে—আজিকার দিনে এই সকল আত্মানুশীলন যেন আমরা করিতে পারি—তাহা হইলে ভগবানের রুদ্র রূপ আমাদের জীবনে সার্থক হইবে, চলার পথের অগ্রগতির খোঁজও আমাদের মিলিবে।

নূতন বৎসরের এই নূতন দিনে আমাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে আমরা একবার স্মরণ করিতে চাই। এক কথায় আমরা প্রাণকে—উপনিষদুক্ত জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রাণকে আস্বাদন করিতে চাই; অন্তরে চাই, বাহিরে চাই, এককভাবে চাই, সমগ্রের মধ্যে চাই—প্রাণকে চাই। অধ্যাত্মজীবনে প্রাণবল্লভ পুরুষোত্তমকে চাই, বাস্তব জীবনে—রাজনৈতিক সামাজিক ও দৈনন্দিন জীবনে—পুরুষোত্তমকে চাই; পুরুষোত্তমকে রূপে চাই, তত্ত্বে চাই। রবীন্দ্রনাথের যে প্রাণ জাগিয়া উঠিয়া বলে

'আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল-পারা

* * * *

এত কথা আছে, এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥'

—আমরা সেই প্রাণকে চাই। যে-প্রাণ পাষাণকারা ভাঙ্গিয়া করুণা ধারায় সমস্ত জগতে নিজেকে ঢালিয়া দেয়, সেই করুণাময়ী প্রাণকে আমরা চাই। যে প্রাণে অনেক কথা আছে, অনেক গান আছে, অনেক আনন্দ আছে—জীবনকে যাহা জাগ্রত উদ্বোধিত সঞ্জীবিত করে—আমরা সেই প্রাণ চাই। 'একটা সর্বপ্রকারে স্তব্ধীভূত জাতিকে এই প্রাণ আজ লাভ করিতে হইবে।

আজ এই নূতন দিনের যাত্রাপথের প্রারম্ভে দাঁড়াইয়া আমরা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, পুরুষোত্তম শ্রীগৌর, পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আর মহাত্মা গান্ধীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। আর যে কেহ যে কোন দিন প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে যতটুকু আমাদের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই প্রীতি ও সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা

বিশ্বসঙ্ঘ রচনার গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশ্যই 'কলি'-চক্র ও চক্রী-'পুরুষের' সমন্বয় করিয়া দিব্য একটি 'অশোকচক্র' গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের জাতীয় পতাকার অন্তর্নিহিত অশোকচক্রের নিগূঢ় অর্থ ই হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যা ও লাঙ্গলের সমন্বয়ে 'রাখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। পুরুষপ্রধান ভারতীয় ঋষি-সভ্যতার দৃষ্টি ছিল অন্তরের ব্রহ্মবিদ্যার দিকে; পাশ্চাত্যের কালপ্রধান সভ্যতা চঞ্চল বাহিরে মজদুররাজ প্রতিষ্ঠার জন্য। কোন একটিই একান্ত সত্য নয়। শ্রীকৃষ্ণ-সভ্যতাই এই দুইটি দৃষ্টিকে যথাস্থানে ও যথামানে সুবিন্যস্ত করিয়া অন্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ। ব্রজধামেই এই সভ্যতার ভিত্তি পত্তন হইয়াছিল। সেখানে আমরা ব্রজের গোঠে মাঠে স্বরাজসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা লাঙ্গলধারী বলরামের যুগল মিলনে রাখালরাজ-মূর্ত্তি আস্বাদন করিয়াছি। ব্রজেই ব্রহ্মবিদ্যা ও তাহার কার্য্যাত্মক রূপ লাঙ্গলের সমন্বয়। এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। গীতাশাস্ত্রে জনক তাই এই সভ্যতার আদর্শ। জনক ছিলেন একাধারে ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও চাষী-রাজা জনক। ভারতের মাটিতেই চাষী-রাজর্ষি-ব্রহ্মজ্ঞানী জনকের আদর্শে কমিউনিজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত হইবার প্রয়োজনকে সার্থক আস্বাদন করিবে।

শ্রীকৃষ্ণ গো-গোপ-সংঘাবৃত। কৃষিক্ষেত্র-বিচরণকারী বলিয়াই তিনি 'কৃষ্ণ'। 'কৃষ্'-ধাতু হইতে 'কৃষ্টি' 'কৃষি' ও 'কৃষ্ণ' শব্দ নিষ্পন্ন। এই কৃষ্ণচন্দ্রেরই জ্যেষ্ঠ সহোদর হলধর বলরাম। ভারতের স্বরাজ মূর্ত্ত হইবে হলধরেরই দেশে। তাই নরনারায়ণ আশ্রমের পতাকা **'লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা'**।

উজ্জ্বলভারতের প্রচ্ছদপটে এই পতাকাই অঙ্কিত রহিয়াছে।

বন্দরের কাল হল শেষ

যে নূতন সমুদ্রতীরের কল্পনা রবীন্দ্রনাথের বলাকা কাব্যের সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, সে নূতন সমুদ্রতীরের ধ্যান আজও আমাদের মধ্যে রয়েছে; সে ধ্যানকে, সে কল্পনাকে রূপ দিতে আজও আমরা পারি নি। ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে আজও মৃত্যুর গর্জন শোনা যায়, ক্রন্দনের কলরোল, লক্ষ বক্ষ হইতে রক্তের কল্লোল এখনও ছুটিয়া আসে, মূর্চ্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন আজিও চতুর্দিকে। বর্ত্তমান আবেষ্টন দেখিয়া এক এক সময় আজও মনে হয় এত পাপ, এত অমঙ্গল, এত হিংসা হলাহল আর বুঝি কোনদিন ছিল না!

জানি অমৃত লোকের জন্য মানুষের প্রয়াসের যেমন অন্ত থাকিবে না, তেমনি মরণের কল্লোলও চিরদিন চলিবে। অমৃতও অনন্ত, মরণও অনন্ত। তথাপি নূতন সমুদ্রতীরের সন্ধান, অজানা সে দেশের সন্ধান মানুষকে চিরদিনই করিতে হইবে। মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে বহু অসম্মান তোমার আমার পাপে জমিয়া উঠিয়াছিল, লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ যে সমাজকে ভিত্তিমূলে পচাইয়া দিয়াছিল, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে, এ বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মত শেষ করিতেই হইবে, নূতন সমাজ—সমাজতান্ত্রিক সমাজ—গড়িয়া তুলিতেই হইবে। সে সমাজে প্রত্যেকের যথাস্থানে সে স্থিত থাকিয়া, নিজের মূল্যে ও মানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া অপরের সহিত আলিঙ্গিত। উজ্জ্বলভারত এই নূতন সমাজ রচনার প্রয়াসী, সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ-রূপ নূতন সমুদ্রতীরের ধ্যানে বিভোর। তাই আজ তাহার নূতন বৎসরের প্রথম পথক্ষেপের দিনে কবি-কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া যাত্রার গান গাহিয়া যাই—

দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জ্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল

বহ্নিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্চ্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন,—
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্র-তীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,—
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা'
আর চলিবেনা।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,—
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি,—
"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্র তীবপানে
দিতে হবে পাড়ি।"
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারিদিক হতে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ি!

"নূতন উষাব স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর ?"
এ-কথা শুধায় সবে
ভীত আর্ত্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো,—জানে না ত কেউ
রাত্রি আছে কি না আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ,—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী,—

"নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"
বাহিরিয়া এল কারা? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।
ঝড়ের গর্জ্জন মাঝে
বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল;
"যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল,
উঠেছে আদেশ '
"বন্দরের কাল হল শেষ।"
মৃত্যু ভেদ করি
তুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌছিবে ঘাট, কবে হবে পার,
সময় ত নাই শুধাবার।
এই শুধু জানিয়াছে সার
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল;—
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ,—
সেথাকার লাগি
উঠিয়াছে জাগি
ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল,
যত হিংসা হলাহল,
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
ঊর্দ্ধ আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।
তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দ্দিন
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন
হে নির্ভীক, দুঃখ-অভিহত!
ওরে ভাই, কার নিন্দা করো তুমি? মাথা করো নত!
এ আমার এ তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহুযুগ হতে জমি' বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়,—
ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ,
জাতি-অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
বিধাতার বক্ষ আজি বিদরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।
ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ!
রাখো নিন্দাবাণী, রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান,
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে! * * *

পশু´-রাম কি জরথুস্ত্র ?

॥ শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ॥

অদ্যাপি চ হিতার্থায় লোকানাং ভৃগু-নন্দনঃ।
তিষ্ঠতে দেববত্ ধীমান্ মহেন্দ্রে পর্বতোত্তমে ॥

হরিবংশ—হরিবংশপর্ব—৪১-১১৮

ভগবান পশু´-রাম শ্রেষ্ঠ অবতার—অবতারগণের মধ্যে তিনিই চিরজীবী। অবতার কাহাকে বলে, তাহার একটা সংজ্ঞা ভাগবত পুরাণ দিয়াছেন।

অনুগ্রহায় ভূতানাং মানুষং দেহম্ আশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াঃ যাঃ শ্রুত্বা তত্-পরো ভবেত্ ॥ ১০-৩৩-৩৮

—যাহার আদর্শ দেখিয়া মানুষ ঈশ্বর-পরায়ণ হয়, তিনিই অবতার।

এই দৃষ্টিভঙ্গি হইতে ভগবান পশু´-রামের চরিত্র-লীলা আলোচনা করিয়া আমরা বুঝিতে চাই যে, ভগবল্লাভের জন্য কী শিক্ষা তিনি আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন।

দুঃখের বিষয় রামায়ণে যেমন রামচন্দ্রের, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণে যেমন শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রপঞ্চ সবিস্তর বর্ণিত আছে, কোনও গ্রন্থেই আমরা ভগবান পশু´রামের সেরূপ সবিস্তর লীলাকীর্তন শুনিতে পাইনা। ভার্গব-শ্রেষ্ঠ পশু´রামের জীবন-চরিত মহাভারত ও পুরাণাদিতে ইতস্ততঃ কিঞ্চিত্ কিঞ্চিত্ উল্লিখিত আছে মাত্র। এই সব বিবরণে যে দুইটী কর্ম ভগবান পশু´-রামের প্রধান কীর্তি বলিয়া খ্যাপিত হইয়াছে, তাহা হইল (১) পিতৃ-আদেশে মাতৃ-হত্যা (২) পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় করা।

ভাগবত পুরাণে (নবম স্কন্ধ, ১৫-১৬ অধ্যায়) যে বিবরণ আমরা পাই, তাহা এইরূপ। (১) পশু´রামের মাতা রেণুকা জল আনিতে নদীতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হওয়াতে পিতা জমদগ্নি এত ক্রুদ্ধ হন যে, রেণুকাকে বধ করিতে পুত্রদিগকে আদেশ দেন। পশু´রামের অপর ভ্রাতারা ইহাতে অসম্মত হন। পশু´রাম মাতাকে কিম্বা ভ্রাতাদিগকেও হত্যা করেন। [পরে অবশ্য জমদগ্নি তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন।] (২) হৈহয়-বংশীয় রাজা কৃতবীর্য্যের পুত্র অর্জ্জুন (কার্ত-বীর্য্যার্জ্জুন) জমদগ্নির

আশ্রম হইতে একটী গাভী জোর করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই অপরাধে পশুরাম অর্জ্জুনকে হত্যা করেন। ইহার প্রতিশোধস্বরূপ অর্জ্জুনের পুত্রগণ পশুরামের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া অগ্নি-মন্দিরে উপাসনারত জমদগ্নিকে হত্যা করে।* প্রতিহিংসাপরায়ণ পশুরাম বালবৃদ্ধ নির্বিশেষে সকল ক্ষত্রিয় জাতিকে সমূলে বিনাশ করেন।

একজনের অপরাধে অপরকে দণ্ড দেওয়া, বাল-বৃদ্ধ নির্বিশেষে একটা জাতিকে নির্মূল করা নিতান্ত গর্হিত কাজ। আর মাতৃ-হত্যার মতন জঘন্য কর্ম আর কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। একজন সাধারণ লোকেও যদি এমন কাজ করে, তবে সমাজ তাহা সহ্য করেনা, তাহার উপযুক্ত দণ্ড বিধান করে। একজন ধর্মপ্রবর্তকের পক্ষে এরূপ দুষ্কর্ম কল্পনারও অতীত। অথচ এই দুষ্ক্রিয়াগুলিই পশুরামের অবতারত্বের পরিচায়ক বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছে। অতএব বলিতে হয় যে, হয় এই কর্মদুইটীর রূপক অর্থ আছে, নয় পশুরাম অবতার পুরুষ নহেন।

পশুরামের কীর্তি বলিয়া বর্ণিত এই কর্ম দুইটীর গূঢ় অর্থ খুঁজিতে গিয়া আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, ভৃগুপতি পশুরামের চরিত্র সর্বদাই রঘুপতি রামচন্দ্রের চরিত্রের প্রতীপ (contrast) রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা দুজনে যেন একটী বর্মের (shield) দুইটী বিপরীত দিক্। রামচন্দ্র কোমল, পশুরাম কঠোর; রামচন্দ্র ধৈর্য্যশীল, পশুরাম অসহিষ্ণু; রামচন্দ্র সুস্থির, পশুরাম চঞ্চল। ক্ষমা এবং তেজস্বিতা দুইটীই মানবোচিত গুণ—স্থৈর্য্য এবং ক্ষিপ্রতা ক্ষেত্রানুযায়ী মানুষের পক্ষে দুইটীরই প্রয়োজন আছে। মানবচরিত্রের এই দুইটী বিপরীত দিকের চরম আদর্শই যেন পশুরাম ও রামচন্দ্রে প্রতিফলিত। উভয়েই লোকোত্তর মহিমায় মণ্ডিত হইলেও, তাঁহাদের আদর্শের পার্থক্যও লক্ষণীয়। পশু-রাম 'পরশু-মৃগবরা-অভীতিহস্ত' সদাশিবের উপাসক, আর রামচন্দ্র হরধনু ভগ্ন করিয়া পশু-রামের গৌরব ম্লান করিয়া দিলেন।

তাঁহারা উভয়েই শ্রেষ্ঠ অবতারপুরুষ। তাঁহাদের কাহারওই ব্যক্তিগত চরিত্রে কোনও কলঙ্ক থাকিতে পারে একথা আমরা বিশ্বাস করিনা। তথাপি দেশ-কাল-পাত্রানুযায়ী পরমার্থলাভের জন্য বিভিন্ন পন্থা তাঁহারা নিজেরাও অনুসরণ করিয়াছেন, অনুচরদিগকেও অনুসরণ করিতে বলিয়া গিয়াছেন।

প্রথমেই ধরা যাউক মাতৃহত্যার উপাখ্যান। পশুরাম ও রামচন্দ্র উভয়েই

ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পশুরাম সত্য ও ত্রেতার সন্ধিকালে, আর রামচন্দ্র ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিকালে। *

গ্রন্থদ্বারা নির্দেশ করিলে সত্যযুগকে ঋগ্বেদের, ত্রেতাকে অথর্ব বেদ ও উপনিষদের এবং দ্বাপরকে মহাভারতের যুগ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।

ঋগ্বেদের যুগে ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি পুরুষদেবতার পূজার প্রথাই বেশী প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের একহাজাব সতেরটি সূক্তের মধ্যে বোধ হয়, নয়শত নব্বইটী সূক্তই পুরুষদেবতার স্তব গান। পরন্তু ভগবান রামচন্দ্র জগজ্জননীর অকালবোধনদ্বারা মাতৃপূজার প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। অথর্ব—(আঙ্গিরস) বেদে আমরা দেখিতে পাই অথর্বা বেন-রাম নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া, ইন্দ্রের পূজা অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রজননীর পূজা করিতেছেন।

ইন্দ্রং যা দেবী সুভগা জজান।
সা নঃ ঐতু বর্চসা সংবিদানা॥ আঙ্গিরস বেদ—৬-৩৮-১

যিনি ইন্দ্রকে জন্ম দিয়াছেন সেই সুভগা দেবী দীপ্তিতে শোভমানা হইয়া আমাদের নিকটে আসুন।

ভগবান্ পশু-রাম মাতৃপূজারূপ এই "নব-বিধানের" সৌষ্ঠব উপলব্ধি করেন নাই। তিনি প্রাচীন পন্থার অনুবর্তী থাকিয়া পিতৃ-পূজায়ই রত রহিলেন। মহেশ্বরই রহিল তাঁহার আরাধ্য দেবতা। † তিনি মাতৃ-পূজাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ইহারই নাম পশু-রামের মাতৃহত্যা।

যখন দেখি জগতের অন্যত্র সর্বত্র পিতৃ-রূপে আরাধনাই (Father-hood of God) অধিক প্রচলিত, কেবল ভারতবর্ষই মাতৃরূপেও আরাধনা করে, তখন ভগবান পশু-রামের পূজা-পদ্ধতির নিন্দাই বা কেমনে করিব ?

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, পরমপাতা পরমেশ্বর স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন, নপুংসকও নহেন। তিনি সর্বাবস্থার অতীত।

মাতৃ-রূপে পূজা কিম্বা পিতৃ-রূপে পূজা একটা প্রণালী ভেদ মাত্র। তন্ত্র তারস্বরে রটনা করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম, মহেশ্বর এবং উমায় কোনও পার্থক্য নাই, ইহাদের প্রভেদ কেবল কথার মার-পেচ মাত্র।

---

* মহাভারত—শান্তিপর্ব—৩৩৯ অধ্যায়

† ততঃ রামং সুশিক্ষায়ৈ জগাম হরম্ অন্তিকে। শিবপুরাণ-ধর্মসংহিতা—৩০-১৩২

শক্তির্ মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়মৃতুল্যার্থবাচকঃ।
স্ত্রী-পুম্-নপুংসক-ভেদঃ শব্দতঃ ন পরার্থতঃ ॥ গন্ধর্বতন্ত্র—৩৪-৩৪

মাতৃ-হত্যা ছাড়িয়া এবার ক্ষত্রিয়হত্যার আলোচনা করা যাউক।

ব্রাহ্মণের আদর্শ ক্ষমা এবং ক্ষত্রিয়ের আদর্শ প্রতিহিংসা। একগণ্ডে চপেটাঘাত করিলে ব্রাহ্মণ অপরগণ্ড পাতিয়া দিবে, আর ক্ষত্রিয় আহন্তার দুই গালে দুই থাপর দিবে। ক্ষেত্রানুযায়ী ক্ষাত্র আদর্শের প্রয়োজন শাস্ত্র অকুণ্ঠিত-ভাবে সমর্থন করিয়াছে। মহাভারত তো স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিয়াছে যে, সমাজরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিলে একজন ক্ষত্রিয় দশজন ব্রাহ্মণের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

নোদ্বিগ্নশ্ চরতে ধর্মং নোদ্বিগ্নশ্ চরতে ক্রিয়াম।
দশ-শ্রোত্রিসমঃ রাজা ইত্যেব মনুর্ অব্রবীত্ ॥ আদিপর্ব—৪১-৩১

গীতাও সমাজরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি হইতেই অর্জ্জুনকে ক্ষাত্র-ধর্ম-পালনে প্রোৎ-সাহিত করিয়াছে।

ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষমার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু জাতীয় জীবনে ক্ষমা কাপুরুষতার নামান্তর। তাহা আত্ম-বিলোপের পথ মাত্র। তাই ভগবান্ পশু'-রাম নিজে ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিলেন। জাতিকে ক্ষাত্র-ধর্মে দীক্ষিত করাই ছিল তাঁহার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ভগবান্ পশু'-রাম ছিলেন ক্ষাত্রবৃত্তির প্রবল অনুরাগী। এইজন্য তাঁহার সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, তিনি পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিতে চেষ্টান্বিত ছিলেন, তবে মনে একটা খটকা লাগে; মনে হয় যে "পশু'-রাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন" এই ঐতিহ্যের মধ্যে একটা তত্ত্ব লুক্কায়িত আছে যাহার মর্ম উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে আমরা ভগবান্ পশু'-রামের অবদানের রহস্য বুঝিতে পারিব।

বর্ণাশ্রম বিভাগ ভারতের নিজস্ব ব্যবস্থা। চাতুর্বর্ণ্যের প্রয়োজন অস্বীকার না করিয়া, বলা যাইতে পারে যে, বর্ণ-বিভেদের অপ-প্রয়োগ বশতঃ জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হওবার আশঙ্কা আছে। বর্ণবিভেদের ফলে একই জাতি চারিটী উপজাতিতে—চারিটী কেন বৃত্তিভেদে ছত্রিশটী উপজাতিতে—বিভক্ত হয়। উপজাতিগুলি পরস্পর কলহ করিতে থাকে; বিজাতীয় শত্রু তাহাদিগকে অক্লেশে পদানত করে। এই জন্য ব্রাহ্ম-সমাজ শিখ-সমাজ প্রভৃতি সংস্কার-প্রবণ সম্প্রদায়গুলি বর্ণ-বিভাগের প্রবল বিরোধী। ডাক্তার অম্বেদকর তো

বর্ণভেদের তাড়নায় প্রপীড়িত হইয়া গোষ্ঠিসহ বৌদ্ধপন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভগবান পশু-রামও বর্ণবিভাগের প্রবল বিরোধী ছিলেন। তাঁহাকে এই সংস্কারক সম্প্রদায়গুলির অগ্রণী নেতা বলিয়া গণনা করিলে ভুল করা হয় না। চারিটী বর্ণ না থাকিয়া সমাজে কেবল একটী মাত্র বর্ণ থাকুক, ইহাই ছিল ভগবান পশু-রামের অভিপ্রায়।

কিন্তু কেবল একথা বলিলেই সব বলা হইলনা। কারণ যে একটী মাত্র বর্ণ অবস্থিত থাকিবে, তাহা বৌদ্ধশ্রমণদিগের মতন কেবল শাস্ত্রচর্চা করিবে, কিম্বা বর্তমান জৈন মারোয়ারীদিগের মতন কেবল বণিগ্-বৃত্তি করিবে, ইহা ভগবান পশুরামের অভিপ্রেত ছিলনা। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, এই বর্ণ হইবে মুসলমান ও শিখের ন্যায় ক্ষাত্র-বৃত্তি প্রধান।

আশ্রম সম্বন্ধেও অনুরূপ নির্দেশ। প্রাচীনকালে চারিটী আশ্রম প্রবর্ত্তিত ছিল। কালক্রমে এই ব্যবস্থা শিথিল হইতে থাকে। তন্ত্র তো স্পষ্টভাষায় রটনা করিযাছে, কলিকালে ব্রহ্মচর্য্য এবং বানপ্রস্থ আশ্রম নাই—কলিকালে আশ্রম মাত্র দুইটী, গার্হস্থ্য এবং সন্ন্যাস।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমো নাস্তি বানপ্রস্থোঽপি ন প্রিয়ে।
গার্হস্থ্যো ভিক্ষুকশ্চৈব আশ্রমৌ দ্বৌ কলিযুগে ॥ মহানির্বাণতন্ত্র—৮-৮

মহাভারত বলিতেছে, "গার্হস্থ্য আশ্রমই মূল আশ্রম। অন্যান্য আশ্রম-গুলি পরগাছার মতন পরোপজীবী।"

যথা মাতরম্ আশ্রিত্য সর্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গার্হস্থ্যম্ আশ্রিত্য বর্তন্তে ইতরাশ্রমাঃ ॥ শান্তিপর্ব—২৭৫-৬

তাই ভগবান পশু-রাম বলিলেন সমাজে একটী মাত্র আশ্রম থাকিবে, তাহা গৃহস্থাশ্রম এবং একটীমাত্র বর্ণ থাকিবে, তাহা ক্ষত্রিয়বর্ণ। এইরূপ ঐকান্তিক ক্ষত্রিয়বর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজেই ক্ষত্রিয়-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন।

বর্তমান সময়ে এমন লোক বহু আছেন, যাহারা বর্ণ-ভেদ লোপ করিতে (অর্থাৎ একটী মাত্র বর্ণ প্রতিষ্ঠিত করিতে) ইচ্ছুক। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে শিখাসূত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট চিহ্ন, কিম্বা যজন-যাজন প্রভৃতি বিশিষ্ট অধিকার ত্যাগ করিতে আহ্বান করেন। ইহাতে সফলতার সম্ভাবনা কম দেখিয়া, যাহারা সুচতুর, তাঁহারা পশ্চাত্ দিক হইতে আক্রমণ করেন। তাহারা সকল অন্ত্যজ জাতিকেই ব্রাহ্মণত্ব দাবী করিতে উস্কাইয়া দেন। তাই আমরা, অধুনা এত "নাপিত-

ব্রাহ্মণ" 'সূতার ব্রাহ্মণ' 'জুগি-ব্রাহ্মণ' 'ভূমিহার-ব্রাহ্মণ'-এর ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। তাহাদের গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে, সকল মানুষই যদি ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণ বলিয়া আর **পৃথক্** একটা বর্ণ রহিলনা। ব্রাহ্মণ থাকা আর না থাকা সমান কথা হইল। এই দৃষ্টিকোণ হইতে বলা চলে "জগত্ নিঃব্রাহ্মণ হইল"। ভগবান পশুরামও এইরূপভাবেই পৃথিবী "নিঃক্ষত্রিয়" করিতে চাহিয়াছিলেন—ক্ষত্রিয়-বর্ণের **পৃথক্** অস্তিত্বের প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেন নাই।

যদি নিঃক্ষত্রিয় করার এইরূপ একটা অর্থ আমরা অনুমোদন করি—class-less class (শ্রেণী-হীন সমাজ) প্রতিষ্ঠারূপ একটা নূতন আদর্শের সন্ধান তথায় পাই, তবেই তাহার অবতারত্বের মহিমা আমরা উপলব্ধি করিব। নতুবা কতকগুলি নির্দোষ মানবের নির্বিচার হত্যাদ্বারা পশুরামের গৌরব বৃদ্ধি পায়না; উহা তাঁহার কলঙ্কের হেতুমাত্র হয়।

পশুরামের বেলায় একটা নূতন আদর্শ অনুমানের আর একটা হেতু এই যে, আমরা দেখিতে পাই যে অপর কোনও কোনও ব্রাহ্মণও—যেমন দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্য—ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে তেমন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইতে হয় নাই, এত অধিক লোক তাঁহাদের শত্রু হইয়া উঠে নাই। তাহার কারণ এই যে যদিও তাঁহারা ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা চাতুর্বর্ণ্যের বিরোধী ছিলেন না—মাত্র আপদ্-ধর্ম হিসাবে ক্ষত্রিয়-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর পশু-রামের ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনের হেতু ছিল পৃথক্—তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করা, সকল ব্যক্তিকেই ক্ষত্রিয়ে পরিণত করা। এখানে একটা আদর্শগত বিরোধ ছিল।

ক্ষাত্র ধর্মকেই তিনি প্রধান ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন, ইহা কেবল ভগবান্ পশুরামের আচরণ হইতেই অনুমান করিতে হইবে, এমন নহে। তিনি স্পষ্টভাষায় রটনা করিয়াছিলেন যে সমাজে ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজনই সর্বাপেক্ষা অধিক (রাজানং **প্রথমং** বিন্দেত্)

> অত্র গাথা পুরা গীতা ভার্গবেন মহাত্মনা।
> আখ্যানে রাজচরিতে নৃপতিং প্রতি ভারত ॥
> রাজানং প্রথমং বিন্দেত্ ততো ভার্য্যাং ততো ধনম্।
> রাজন্য অসতি লোকে অস্মিন্ কুতো ভার্য্যা কুতো ধনম্ ॥

মহাভারত—শান্তিপর্ব—৫৭—(৪০ + ৪১)

মহাত্মা ভার্গব রাম রাজার আচরণ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই গাথাটী বলিয়াছেন। [দুর্বলের অধিকার রক্ষার জন্য] যদি ক্ষত্রিয় না থাকে, তবে কাহারই বা ধন, কাহারই বা ভার্য্যা। [যে কেহ আসিয়া তাহা কাড়িয়া নিয়া বলিতে পারে "ইহা আমার"]। অতএব প্রথমই প্রয়োজন ক্ষত্রিয়ের।

ভগবান পর্শুরাম কর্তৃক কথিত এই 'গাথা'টীর সহিত, আমরা ইরাণীয় বেদ আবেস্তাতে উল্লিখিত মঘবান্ জরথুস্ত্রের একটী 'গাথা'র তুলনা করিতে পারি।

কে অর্য্যম্না কে খএতুস্ দাতা ইস্ অংহত্।
যে বেরেজনায় বংউহীম্ দাত্ প্রশস্তিম্॥ যস্ন—৪৯-৭

ব্রাহ্মণ আর বৈশ্য (অর্যাম্না ও খএতু) দিয়া কী ফল? যিনি ক্ষত্রিয়কে (বেরেজনকে) দাক্ষিণ্য দেন তিনিই যথার্থ সমাজরক্ষক।

চাতুর্বর্ণ্য বিধান ভাল কি মন্দ তাহা পৃথক্ কথা। কেহ বলিবেন ভাল, কেহ বলিবেন মন্দ। এবিষয়ে মতদ্বৈধ কখনও ঘুচিবে কিনা সন্দেহের কথা। আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে মাতৃ-পূজার ন্যায় এই বিষয়েও ভগবান পর্শুরাম রামচন্দ্রের প্রতীপ। বর্ণাশ্রমধর্মের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুক মুনিকে প্রাণদণ্ড দিয়াছিলেন; আর পর্শুরাম ব্রাহ্মণত্বের দাবী অক্লেশে পরিত্যাগ করিলেন।

পর্শুরাম ছিলেন একজন বিদ্রোহী—জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্রোহী, জ্যেষ্ঠ বিপ্লবী। সাম্য-বাদ প্রতিষ্ঠার জন্য অনারত যুদ্ধই তাঁহার পেশা।

আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উত পীড়িতের ক্রন্দন রোল,
আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ,
ভীম রণভূমে রণিবেনা।
বিদ্রোহী রণক্লান্ত,
আমি সেই দিন হব শান্ত॥

পরন্তু যাহারা বর্ণ-ভেদ-লোপের চেষ্টাকে অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারাও পর্শুরামের ব্যক্তিত্ব (personality) স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। স্বীয় আদর্শের উপর এমন দৃঢ় নিষ্ঠা, আর এমন দিগ্বিজয়ী পরাক্রম অবতার-পুরুষেই সম্ভবে।

ভারতীয় ঋষি পর্শু-রামকে নিয়া একটু সংকটেই পড়িয়াছেন। যিনি

ভারতীয় আদর্শের এতটা পরিপন্থী, তাঁহাকে ষোলআনা পূজা করিতেও মন চায় না, আবার তাঁহার অতুলনীয় ব্যক্তিত্বও অস্বীকার করা চলে না। পুরাণ-কার মধ্যপন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি পর্শু-রামকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, কিন্তু রামচন্দ্র কিম্বা শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তাঁহার আরাধনার বিধান দিলেন না; তাঁহার জন্মতিথিকে পর্বদিন বলিয়া গণনা করিলেন না বরং বলিয়া গেলেন যে পর্শু-রাম আরাধনার অযোগ্য—কারণ দেখাইলেন তাঁহার পরাক্রমের আতিশয্য—

নোপাস্যং হি ভবেত্ তস্য শক্ত্যাবেশান্ মহাত্মনঃ।

পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড—৯৩-৪১৫

কারণটা অদ্ভুত বটে।

পরন্তু যখন দেখি যে ভারতেতর সমস্ত জগত্ পর্শু-রামের উপাসনা-পদ্ধতিই আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে, যখন দেখি পর্শু-রামের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াই মুসলমানজাতি দেশে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তখন কেমনে বলি যে পর্শু-রাম ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কেমনে বলি যে পর্শু-রামের উদানের উপযোগিতা নষ্ট হইয়াছে, পর্শু-রামের প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়াছে। বরং চ পর্শু-রামের আদর্শকে বর্জন না করিয়া, উহাকেও যথাযোগ্য সমাদরে বরণ করিয়া লইলে, আমরা লাভবান হইব, আমাদের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। মহর্ষি দয়ানন্দের ধারণা এইরূপ ছিল; অন্ততঃ গুরুগোবিন্দ সিংহের তো ছিলই। তিনি পর্শু-রামকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার প্রশস্তি গান করিয়া গিয়াছেন।

যো জমদগ্নি দ্বিজ অবতারী।
ভযো রেণুকাতে কবচী কুঠারী॥

গোবিন্দ সিংহ—চৌবিশ অবতার

তথাপি স্বীকার করিতেই হইবে যে ভগবান পর্শু-রামের আদর্শ ভারতীয় সাধনা-ধারার প্রতিকূল। কিন্তু ভারতীয় সাধনার প্রতিকক্ষ বলিয়াই, তাহা অবৈদিক কিম্বা 'অনার্য্য-জুষ্ট' নহে। কথাটা বুঝিতে হইলে পর্শু-রামের কুল-শীল বিচার করিতে হয়।

ক্রমশঃ

খুশি

॥ শ্রীভারতী ॥

মানুষের খুশি—
সে এক আশ্চর্য বস্তু।
সে যেন হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানি
যেন পূর্ণিমার চাঁদ আজ আছে কাল নেই।
যেন মেয়েলি কাঁকনের মৃদু নিক্কন, এই বাজে এই বাজেনা।
যেন মানুষের আয়ু, এই থাকে এই থাকে না।
তাই হয়ত মানুষের শবরী মন অহর্নিশি থাকে
তারই প্রতীক্ষায়।
কিন্তু খুশি বলি কাকে ?
খাওয়া পরার অতি প্রাচুর্যে, ভোগে ব্যসনে
ক্ষণ পরিতৃপ্ত জীবনের মধ্যেই কি তার
অকলঙ্ক আবির্ভাব ?
কিম্বা অনেক অর্থ আর অনেক যশের
উত্তুঙ্গ শিখরেই তার বিদ্যুৎদীপ্তির
অত্যুজ্জ্বল প্রকাশ ?
না, তার সংজ্ঞা আরো একটু বেশি ;
আরো একটু বেশি, কারণ সেটা মানুষের খুশি।
ভাস্করকে গড়তে দেখেছো মূর্ত্তি !
দেখেছো ছবি আঁকতে চিত্রকরকে
লেখককে লিখতে ?
গৃহস্থালীকে নিপুণ হাতে সাজিয়ে তুলতে মেয়েদের
অথবা কপালে টিপ পরিয়ে, মোছা মুখ আরো মুছিয়ে
মুগ্ধ চোখে শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকতে !
আরো দেখেছো পুরুষের বলিষ্ঠ বাহু দিয়া গড়ে তোলা
ক্ষেত ভরা ফসল

কামারের পেশীবহুল-হাতুড়ী ধরা হাত !
বিজ্ঞানীর পরমতম নিষ্ঠা ?
দেখেছি আমরা সকলেই—
দেখেছি সেই একাগ্র দৃষ্টি ; গভীর তপস্যা
আর কুঞ্চিত ললাট।

তারপর—
তারপর হঠাৎ প্রসন্ন খুশিতে শুকতারার উজ্জল দুটি চোখ।
দেখেছি সৃষ্টির সাফল্যে, রচনার সৌন্দর্যে, কর্মের গরিমায়
প্রতিটি মুখে ফুটে ওঠা এক অপরূপ
আনন্দোজ্জল ছটা—
দেবত্বের অসামান্য আলো।
মানুষ পশুকে ছাড়িয়ে উঠেছে সেখানেই—
যেখানে সে এই পরম খুশিটিকে পেরেছে করায়ত্ত করতে।

'If religion is treated as an inward integration which each one has the freedom to achieve for himself, without interference from others, and a call to establish an equitable social order, there is not much in such a religion for the. communists to complain about. In its essence, religion is reintegration of human personality and redemption of human society. ...This integration of human personality is an essential factor of all types of humanism.

—On Earth one family, Radhakrishnan

আমি যদি হ'তাম...

॥ শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় ॥

শিরোমণিমশাই টিকিটা নেড়ে, মাথাটা ঝেঁকে উঠে দাঁড়ালেন। বেশ-একটু উত্তেজিত ভাবেই বল্লেন—আমি যদি হতাম এই স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী, তা'হলে কি করতাম জানো ?

—কি করতেন ? উত্তেজনাটুকু উপভোগ করার ভঙ্গিতে একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলাম আমি।

শিরোমণির প্রধান মন্ত্রী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। না-জানেন রাষ্ট্রভাষা হিন্দী, না-জানেন আন্তর্জাতিক ইংরাজি। কবরস্থ সংস্কৃতের দাবীদার একজন বাঙালী পণ্ডিতের প্রধান-মন্ত্রী হওয়ার দুরাকাঙ্ক্ষা এ যুগে হাস্যকর। তবু প্রেতাত্মার মতবাদ জান্‌বার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠ্‌লো।

শিরোমনি বল্‌তে লাগ্‌লেন—আমি যদি হতাম—এই স্বাধীন ভারতের প্রধান-মন্ত্রী—তাহলে অগ্রাধিকার দিতাম মাত্র দুটি সমস্যাকে।

—কোন্ দু'টি সমস্যাকে ?

—একটি শিক্ষা, অপরটি স্বাস্থ্য......

—আপনি কি মনে করেন—শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে আমাদের জাতীয় সরকার উদাসীন ?

—নিশ্চয়ই ! আমার ভাঙা-টেবিলে একটা কিল দিয়ে, দোদুল্যমান উপবীতটা কাঁধে ফেলে—শিরোমণি মশাই আবার বসলেন। তাঁর উত্তেজনার পারদ তখন পাঁচে উঠেছে। দন্তহীন মুখটা বিকৃত করে বল্‌তে লাগ্‌লেন—বর্তমান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির কোথায় গলদ, তা কি তোমাদের জাতীয় সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছেন ?

—গলদটা কোথায় বলুন তো শুনি ?

—আমাদের শাস্ত্রমতে—বিদ্যা-বিক্রেতা, ঔষধ-বিক্রেতা, ও অন্ন-বিক্রেতা পতিত। যে বিদ্যার্থীর মারফৎ শিক্ষক বেতন গ্রহণ করেন—সে কি মনে করে না—'শিক্ষকটি আমার ভৃত্য ?' ভৃত্য কি পারে তার অন্নদাতা প্রভুকে লেখাপড়া শেখাতে ? তার চরিত্র গঠন করতে ?

—ছাত্র-বেতন না পেলে শিক্ষকের চল্‌বে কি করে—সে কথাটা বলুন…?

—দেশের প্রত্যেকটি শিক্ষক হবেন রাজকীয় বৃত্তিভোগী! প্রত্যেকটি ছাত্র লেখাপড়া শিখ্‌বে নতশিরে ও করজোড়ে। 'বিনয়' নামে মানব-চরিত্রে একটা সদ্‌গুণ আছে—তার খবর কি আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে বর্ত্তমান? বিনীত ব্যবহার অনুশীলন-সাপেক্ষ। শিক্ষকের গুরুত্ব স্বীকার না-করে মানুষ-তৈরির কারখানায় যদি বানর-তৈরি হয়, সে জন্যে দায়ী কে? তবলন্‌তি ছেলেদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করার কি মানে হয়?

প্রত্যেক শিক্ষককে বৃত্তিদান কি রাষ্ট্রীয় তহবিলের পক্ষে সম্ভব?

—কেন নয়? প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করভারে কি দেশের লোক পিষ্ট হচ্ছে না? পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় বহু বড় বড় কল-কারখানা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চল্‌ছে। শুধু মানুষ-তৈরির কারখানাটাই থাক্‌ছে উপেক্ষিত। যে-কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মূলে চাই নিঃস্বার্থ ও চরিত্রবান কর্ম্মী। তারা কোথায়? শিক্ষিত অমানুষদের গোপন কলা-কৌশলেই কি যে-কোন উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে না? অচির ভবিষ্যতেই রাষ্ট্রের কর্ণধারকে বুক-চাপ্‌ড়াতে হবে—'দে রামা! মানুষ দে।' অমানুষ দিয়ে কোন কারখানাই চালাতে পারবেন না তিনি……

অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা ভারতীয় শিশুরাষ্ট্রের পক্ষে কি ভাবে সম্ভব তা ঠিক বুঝ্‌তে পারছিনে।

বুঝিয়ে দিচ্ছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের চাপড়াস্‌ নিয়ে প্রতি বৎসর যে হাজার হাজার ছেলে বেকারীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে, অভিভাবকরা কি তাদের শিক্ষার ব্যয়-বহন করছেন না? সেই অভিভাবকদের অর্থেই শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা-দান মোটেই অসম্ভব নয়। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রেখে, বর্ত্তমানের প্রয়োজনীয়তাকেও স্বীকার করে—আমি যদি হ'তাম প্রধানমন্ত্রী! তুলে দিতাম সব ইস্কুল-কলেজ—চাইনা তোমাদের চেয়ার-টেবিল-সাজানো—দশটা-পাঁচটার বিদ্যার্থী-জীবন! সহুরে বিদ্যা-বিলাস!

—কী সর্ব্বনাশ! তারপর?

—প্রত্যেকটি পল্লীতে বাস করবার জন্যে বাধ্য করতাম—কয়েকটি শিক্ষককে। তাদের কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ সাহিত্যিক, কেউ গাণিতিক। সকলেই বৃত্তিভোগী! গাঁয়ের ছেলেরা গুরুগৃহে ঘুরে ঘুরে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা গ্রহণ করতো। পরীক্ষান্তে বিশ্ব-বিদ্যালয় পুরস্কৃত করতেন

—শিক্ষকদের। ছাত্রদের নয়। আর সেই সঙ্গে প্রত্যেক গাঁয়ে থাক্‌তেন একজন বৃত্তিভোগী সুচিকিৎসক। তোমাদের সহুরে-রাস্তার মোড়ে মোড়ে যে সব ডাক্তার বসে আছেন—তারা কি দেশে রোগবৃদ্ধির জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন না? সেবাধর্ম্মের সঙ্গে অর্থাকাঙ্ক্ষা—কসাই-বৃত্তির চেয়েও ঘৃণ্য। স্বাস্থ্যনীতির মূলে বৃত্তিভোগী ডাক্তার অপরিহার্য্য।

—আপনি একজন ভয়ানক সাম্যবাদী দেখ্‌ছি… ..

—ভগবৎ-বিশ্বাসের ভিত্তিতে—সাম্যবাদই ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার লক্ষ্য। সেই শান্তম্-শিবম্-অদ্বৈতম্‌কে অস্বীকার করে যে 'সোনার পাথর-বাটি' তৈরীর চেষ্টা জগতে চল্‌ছে—তাকে ধ্বংস করবার জন্যেই রুদ্র জেগেছেন, হাইড্রোজেন-বোমা-রূপে! স্বার্থের দ্বন্দ্বে উন্মত্ত বিশ্ববাসীকে ভারতের দ্বারস্থ হতে হবে—সাম্যবাদের তত্ত্বানুসন্ধানের জন্যে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—আত্মবিস্মৃত ভারত আজ পরানুকরণে মেতে উঠেছে—নিজের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেল্‌ছে!

—আপনার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনাটি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে বাংলাতেই লিখে দিন। তার ইংরাজি-তরজমা করে পাঠিয়ে দিতে চাই—আমাদের জাতীয় উন্নয়ন-পরিকল্পনার সভ্যদের কাছে…

—লাভ নেই……

—কেন?

—তারা বুঝ্‌বে না। বুঝ্‌লেও না-বোঝার ভান করবে। আমি চাই—এক ঢিলে দুই পাখী মারতে। সহুরে সভ্যতাকে ভেঙে—অনাড়ম্বর পল্লীকে পুনরুজ্জীবিত করতে। তারা তা' চায়না। সহর-কেন্দ্রিক সভ্যতাই তাদের কাম্য। পল্লী-উন্নয়ন হবে রেডিও-মারফৎ। অ্যাম্প্লিফায়ারের চিৎকারেই দেশ জাগবে। দেশের সমৃদ্ধি বাড়বে। তবে আমি যদি হ'তাম—

শিরোমণি মশাই আর একবার তাঁর টিকিটা নেড়ে, মাথাটা ঝেঁকে চলে গেলেন। যাবার সময় প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দাখিল করে যেতেও ভুল্‌লেন না। অস্ফুটস্বরে বল্‌লেন—নাঃ, দরকার নেই প্রধানমন্ত্রী হ'য়ে। আর কটা দিনই বা বাঁচবো? মা-ব্রহ্মময়ী তুমিই ভরসা!

আমি বুঝ্‌লাম—এই তিতিক্ষাই ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য!

বুদ্ধিযোগ

॥ সম্পাদক ॥

বুদ্ধিপ্রধান একটী যুযুৎসু বিশ্বের বুক চিরিয়া একটী প্রাণ-প্রচুর সমগ্র বিশ্ব জনম নিতেছে, আমরা ইহার আগমনী-গান গাহিব। পচা-গলা, 'মন্দ, সুমতি, মন্দভাগ্য ও উপদ্রুত' একটী বিশ্বকে পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা সামনের জীবন্ত গৌরবোজ্জ্বল প্রাণঘন ঐ বিশ্বকে বরণ করিতেছি, অভিনন্দন জানাইতেছি। বুদ্ধি (abstract intellect, calculating intelligence) তাহার সব দোষ-গুণ লইয়া বিদায় লইতেছে, বুদ্ধি নিজের মধ্যে বিশ্বের মধ্যে ও বিশ্বনাথের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হইতেছে। 'Divide and rule'-এর বুদ্ধি 'Live and let live'-এ গড়িয়া উঠিতেছে। আমরা আজ নূতন যুগের ভোবে দাঁড়াইয়া; অতীতের সব করা বা না-করা, অতীতের 'কি রবে কি রবে না, কি হবে কি হবে না' লইয়া বিষয়ীর ভাবনা আর ভাবিব না। যত পুরাতন আজ নূতন হইবে—আজ তাহারই সূচনা দিকে দিকে। যুযুৎসু মনোবৃত্তি আজ জিজ্ঞাসু, শুশ্রূষু ও প্রেম-পিপাসু মনোবৃত্তিতে রূপান্তর লাভ করিতেছে। সঙ্ঘর্ষেরই দিব্য রূপ সমন্বয়। এত দিন কেহ অপরের বুকের বেদনা জানিতে চায় নাই, বিপক্ষেরও যে কথা আছে, তাহা কেহ শুনিতে চায় নাই, অপরের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধে কাহারও কোন জিজ্ঞাসা ছিল না, কাহারো প্রীতি পাইবার জন্য কাহারো পিপাসা ছিল না। সকলেই বলিয়াছে 'ন অন্যৎ অস্তি'—একমাত্র আমার কথাই সত্য, আমার মতবাদই সত্য, আমার সম্প্রদায়ই সত্য, আমার দ্বৈতবাদই সত্য, আমার সংসার বা আমার সন্ন্যাস সত্য—আমার কর্ম সত্য বা জ্ঞান সত্য বা ভক্তিই সত্য। ইহাই বহুযুগ পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান পর্যন্ত চলিয়া-আসা যুযুৎসু বিশ্বের মনস্তাত্ত্বিক চিত্র। বুদ্ধিমান মানুষ কেনই বা অপরের কথা শুনিবে বা বুঝিবে বা তাহার দিকে চাহিয়া নিজের জীবনে পরিবর্ত্তন আনিবে? বুদ্ধি তাই সঙ্ঘর্ষে সঙ্ঘর্ষে শ্রান্ত ক্লান্ত, মরণের পারে। মনস্তত্ত্বের গতিবিৎ যাহারা, তাঁহারা দেখিতেছেন যে ইহা দীর্ঘদিন চলে না, চলিতে পারে না, ভবিষ্যতে আর চলিবে না। আজ চলিবে উপনিষদের মধ্যম প্রাণ, যাহার মধ্যে সকলের মরণ গড়িয়া উঠে অমৃতে, আত্মকৃতি-পরিণামে।

'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।
সকল দ্বন্দ্ব-বিরোধ মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো ॥'—রবীন্দ্রনাথ

অন্ধকার শুধু অন্ধকারই নয়, অন্ধকার আলোরই উৎস, দ্বন্দ্ব শুধু দ্বন্দ্বই নয়, দ্বন্দ্ব সকল ভালোর জন্মদাতা। দ্বন্দ্বেরই (ঝগড়ার) অপরার্দ্ধ উভয়পদার্থ-প্রধান দ্বন্দ্ব-সমাস। দ্বন্দ্ব অর্থ বিরোধ, দ্বন্দ্ব অর্থ মিথুন। দ্বৈত-অদ্বৈতের দ্বন্দ্ব, (বিরোধ), আলো-আঁধারের দ্বন্দ্ব, আদর্শ-বাস্তবের দ্বন্দ্ব, বুদ্ধ-শঙ্করের দ্বন্দ্ব, এক ও বহুর দ্বন্দ্ব, হাঁ ও না-এর দ্বন্দ্ব এই ভাবে সব আজ দ্বৈতাদ্বৈত-মৈথুনে, আলো-আঁধার মৈথুনে, আদর্শ বাস্তবের মৈথুনে সার্থক হইতে চলিয়াছে। এ্যারিস্টটেলের 'Law of the Excluded middle' (নির্মধ্যম নীতি) আজ অচল। আজ কোনও ক্ষেত্রের দ্বিধাবিভক্ত কোনও পক্ষে (block) যোগ দিবার অধিকার বর্ত্তমান বিশ্ববাসীর নাই; মধ্য-পন্থাই আজ একমাত্র পন্থা। ঋষিরা এই পথেরই প্রাধান্য দিয়া 'অগ্নে নয় সুপথা' মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন। এই পথই সুপথ, পুরুষোত্তম-পথ। এই পথই ব্রজের পথ, প্রাণ-পথ। সজ্ঘর্ষে সজ্ঘর্ষে বিশ্ব আজ ছিদ্রময়, তাই বিশ্বের সব কল্যাণ আজ নিঃশেষিতপ্রায়। প্রাণ ছাড়া কে এই ছিদ্রবহুল বিশ্বকে নিচ্ছিদ্র করিবে? 'সতী'-বিশ্বের কলঙ্ক ভঞ্জন করিবে? এই সাধনার বার্ত্তাই ছিদ্রকুম্ভে শ্রীরাধার জল-আনানচ্ছলে সতীত্ব প্রস্থাপনদ্বারা কলঙ্ক-ভঞ্জন উপাখ্যানের ভিতর দিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

বিশ্বে আজ প্রাণের জয়জয়কার। প্রাণ আচার্য্য শঙ্করের ভাষায় সর্ব্বম্ভরি। যিনি দ্বৈতাদ্বৈত, স্বপক্ষ-পরপক্ষ, ধনিক-শ্রমিক, উচ্চ নীচ সকলকে সমানভাবে ভরণ করেন, তিনিই প্রাণ। প্রাণের কাছে কিছুই 'অনন্ন' নাই, 'ন তস্য কিঞ্চিৎ অনন্নং অস্তি'। সকল সম্প্রদায়ের সকল অন্ন অর্থাৎ মত-পথ-সাধনা-সিদ্ধি সব আজ সকলের অন্ন। আজ প্রাণের অন্ন আকাশে, মাটিতে, দ্বৈতে অদ্বৈতে, একে, বহুতে, কর্ম্মে জ্ঞানে ভক্তিতে, আস্তিক্যে নাস্তিক্যে আহরণ করিতে হইবে। প্রাণ জোগায় চক্ষুর অন্ন, কর্ণের অন্ন, নাসিকার অন্ন, জিহ্বার অন্ন, ত্বকের অন্ন, মস্তিষ্ক বা হৃদয়ের অন্ন, সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অন্ন। বাঁচিতে হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সকল অন্নই প্রাণের অন্ন হওয়া চাই। উপনিষদ্ এই প্রাণোপাসনার কথা মরণোন্মুখ বিশ্বকে শুনাইয়াছেন। উপনিষদ মতে

এই প্রাণদর্শন যদি কেহ শুষ্ক স্থাণুর কাছেও শুনায়, সেখানে অঙ্কুর জন্মায়, পত্রপুষ্প বিকশিত হয়।

এতদিনকার শোষক 'প্রজ্ঞা' (abstract intellect) যখন এই প্রাণ-চুম্বিত হয়, তখনই তাহা গীতার 'বুদ্ধিযোগে' গড়িয়া উঠে। প্রাণস্পন্দনহীন 'প্রজ্ঞা'র উপর তীব্র কটাক্ষ করিয়া পুরুষোত্তম বলিয়াছিলেন, 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' —অর্জুন, তুমি 'intellectualism' বলিতেছ, ইহাতে প্রাণের স্পর্শও নাই। যে বুদ্ধি মতবাদে, দৃষ্টিকোণে, একে-বহুতে, সগুণে-নির্গুণে অর্থাৎ পরস্পর-বিপরীতের মধ্যে 'যোগ' বিধান করে, তাহাই 'বুদ্ধিযোগ'। কিন্তু বুদ্ধি এতদিন বিয়োগ-সাধনায়ই সিদ্ধহস্ত ছিল। বুদ্ধি-বিয়োগের ফলে আজ সব মতবাদ সব পথ, সব সিদ্ধি শূন্যবাদে পর্যবসিত। এই বিশ্বে সব এখনও বুদ্ধি-বিয়োগী। এই বুদ্ধি-বিয়োগকে বুদ্ধিযোগে রূপায়িত করিতে হইবে। বুদ্ধিযোগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রাণ-প্রজ্ঞাঘন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের প্রজ্ঞা-প্রাণস্পর্শ আজ ঘন হইয়া ব্রজভূমি সৃষ্টি করিতে চাহিতেছে। আজ বিশ্বকে ব্রজধামে গড়িয়া তুলিবার ভার শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক বিশ্ববাসীর উপর ন্যস্ত হইয়াছে। 'ব্রজেত-কিম্'— অর্জ্জুনকৃত এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে শ্লোকটী বলিয়াছিলেন, আজ তাহাকেই কার্য্যাত্মকরূপে পরিণত করিয়া তুলিবার সাধনা নিতে হইবে।

'রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ গীতা

—রাগদ্বেষবিমুক্ত, আত্মবশ্য, বিধেয়াত্মা পুরুষ ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা বিষয়ে বিচরণ করিয়া প্রসাদ অধিগত হন।

প্রজ্ঞাবাদী এতদিন বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে 'সংহরন' করিয়া কূর্ম্মের মত নিজের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে চাহিয়াছিল, অথচ বিষয় তাহাকে ছাড়ে নাই। 'বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ রসবর্জ্জং'; বিষয়ের এই 'রস' পরিপাক করিবার 'যোগ'ই 'রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ' শ্লোকে নিহিত হইয়াছে। বিষয় স্বরূপতঃ বিষ ছিল না; উহা বিষাক্ত হইতেছে রাগদ্বেষযুক্ত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শেই। পুরুষের রাগদ্বেষ যখন বিষয়কে ভোগ করিতে লালসাবান হয়, তখন বিষয়ের প্রসাদগুণই বিষে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটী বস্তু ছিল ব্রহ্মগুণদ্বারা নিগূঢ়—'স্বগুণৈ নিগূঢ়ঃ' (শ্বেতাশ্বেতর)। ইন্দ্রিয়সমূহ যখন রাগদ্বেষমুক্ত, নিজের মধ্যে নিজের দ্বারা বশ্য, ইন্দ্রিয়সমূহ যখন বিনীত ও বচনে স্থিত, তখনই বিষয়ের প্রসাদগুণ উদ্ভাসিত হয়, তখন 'সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম'

—এই উপনিষদ-মন্ত্রের অর্থ আস্বাদিত হয়। ব্রজধামে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ সবই 'প্রসাদ'। বিশ্বের সব কিছু জগন্নাথের প্রসাদ; 'প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্য উপজায়তে'। এই প্রসাদ আজ আত্মার সর্ব্বভূতস্থ হইতে না পারার দুঃখের, সর্ব্বভূতের আত্মস্থ হইতে না পারার দুঃখের হানি ঘটাইবে। বিশ্বের যাবতীয় হেয়-উপাদেয়কে, সব গুণ-দোষকে, সব মতবাদকে, সব দৃষ্টিকোণকে সব সম্প্রদায়কে প্রসাদে গড়িয়া তুলিবার জন্যই আজ দিকে দিকে সারা জাগিয়াছে। বিশ্বের বুকে সকলেই অন্যোন্যবদ্ধবাহু হইয়া প্রতি দুইটীর মধ্যে পুরুষোত্তমকে রাখিয়া এবং মণ্ডলীবদ্ধ প্রতিটী বস্তু পুরুষোত্তম-দ্বারা 'গৃহীতকণ্ঠ' হইয়া রাসমণ্ডল রচনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বিশ্ববাসী আজ শ্রীনিত্যগোপালের 'I am a cosmopolitan' বাণী সার্থক করিবে। বুদ্ধিযোগ অর্থবান হইবে। তখন ধরার ধূলি হইবে ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রহ্মমানুষ। বন্দেমাতরম্।

— — —

'We are sparks of the divine and it is for us to be co-creators with God, to battle with circumstances, to overcome evil and iniquity and raise the quality of human living.'

—On Earth One Family from Occasional Speeches and writings II—S. Radhakrishnan

ব্রহ্মসূত্রম্

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যাহারা স্ত্রীবিদ্বেষের উপর একদিন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা একটু প্রণিধান পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন কেন বৈষ্ণব-সাধনার পাশাপাশি সহজিয়া, কর্ত্তা-ভজা, আউল বাউল, পঞ্চরসিক সম্প্রদায়গুলি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রকৃতির সহজ বিধানে মনস্তত্ত্বের খোঁচায়ই উহারা গড়িয়া উঠিয়াছিল। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য্য রতিবিদ্যা শিক্ষার জন্য অমরক রাজার দেহানুপ্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত রতিক্রিয়ায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্রহ্ম-ভোগ ও রতিবিদ্যা উভয়েরই যে পূর্ণ আত্মারাম জীবনেও প্রয়োজন আছে, ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনিদের জীবনে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। সংসার-রতি বাদ দিয়া আত্মরতি প্রাকৃত রতিরই পুষ্টি করে। যে ধর্ম্ম মোক্ষ ও শিল্পশাস্ত্র দুয়েরই সমন্বয়ে উন্নতি বিধান না করিবে, দুইকেই ধারণ না করিবে, তাহাকে আমরা 'ধর্ম্ম' নাম দিতে আদৌ রাজী নই। ধর্ম্মলাভে দেশ ধন-ধান্য-শিল্প-বিজ্ঞানে যেমন ভরপুর হইবে, তেমনি মোক্ষজ্ঞানও অটুট থাকিয়া উহাদের নিত্যত্ব ও পারমার্থিকত্ব বিধান করিবে। যাহারা সমন্বয়-সাধক, তাহাদের সহিত দেবশক্তিরও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। শাস্ত্রে দেখিতে পাইয়াছি দেববৃন্দ কেমন করিয়া সংসার-বিরোধী যোগীদের তপস্যা ভঙ্গ করিয়া ছিলেন। তপস্যার সহিত সংসার সমন্বয়ই দেবতাদের তপস্যাভঙ্গের মূলতথ্য। যাহারা ব্রহ্মকে সমন্বয়ের ভিতর দিয়া চান, তাঁহাদের জীবন সংসার, দেবশক্তি ও ব্রহ্মের সমন্বয়ে রসলীলার আস্বাদনে বিভোর থাকে বলিয়া কোথা হইতেও কোন বিরোধের সাক্ষাৎকার লাভ করে না। অন্যথা সর্ব স্তরে কেবল বিরোধ। 'য অন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ সর্ব্বং তং পরাদাৎ।' কেবল যোগীদের দেবতাদের হাতে লাঞ্ছনার অন্ত নাই, যেমন কেবল ভোগীদেরও যমদূতের হস্তে নিপীড়নের কত কথা আমরা পুরাণে শুনিয়াছি। প্রলোভনের মূল হইতেছে গোড়ামি।

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবান্

অতিবিলঙ্ঘ্য তেঽন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।

গতিবিদস্তবোদ্গীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥ ভাঃ ১০।৩১।১৬

—যিনি চঞ্চল পতিপুত্রভ্রাতৃবান্ধবের চঞ্চলতার মধ্যে মহাচঞ্চলতাময়ী গতির খোঁজ খবর পাইয়াছেন, গতিবিৎ পুরুষোত্তম এই অচ্যুতগতির নিকটে (অন্তি) যাহারা উপনীত, তাঁহারা কি আর কিতব ব্রহ্মের কৈতবে আত্মসমর্পণ না করিয়া নিশা যাপন করিতে পারেন? এই গতিগীত গাহিয়া গাহিয়াই ব্রজ-গোপী জীবের বৃত্তির উচ্চ ব্রহ্মবৃত্তিতা বিধান করিতেছেন। 'যা নিশা সর্ব্ব-ভূতানাং তস্যাম্ জাগর্ত্তি সংযমী'—কিতবের আহ্বানে ভক্ত যখন কিতবতাময় হইয়া সকল কৈতবের যাথার্থ্য বিধান করেন, তখনই নিশাযোগে ব্রহ্মমিলন সার্থক। কিতবের লীলা-আবিষ্কারেই রাত্রির অন্ধকারে ব্রহ্মদর্শনের গুহ্যতম রহস্য। অন্ধকারের রাজ্যের রহস্যে জীবের সৌভাগ্য আবিষ্কার করাই গতিমান ভগবানের আগমন প্রয়োজন। এক এক অবতার এক এক নূতন রাজ্য আলো করিয়া জগতের সামনে টানিয়া উপস্থিত করেন। নিশি নিশানাথ চন্দ্রের আলোকে তাই ব্রহ্মরসলীলা প্রচার। রাত্রির অধিকার (hidden truths) আলোড়ন করাই জীবের দর্শনশাস্ত্র, অবতার তাহার চক্ষু।

উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩।৩।৩০ ॥

তল্লক্ষণার্থোপলব্ধেঃ [নির্গুণ ও সগুণ এবং দেব ও পিতৃলক্ষণারূপে যাহার অর্থকে উপলব্ধি শাস্ত্র করাইতেছে] উপপন্নঃ [তিনিই বাস্তবিক উপপন্ন] লোকবৎ [সংসারেও এইরূপই দেখা যায়। হীরক পাইলে মানুষ যেমন সকল 'লক্ষণ' দ্বারা তাহাকে হীরক বলিয়া চিনিয়া সাদরে গ্রহণ করে, ব্রহ্মকেও তদ্রূপ আরাধনাকারী পুরুষ স্বাভাবিকভাবেই পাইয়া সকল লক্ষণায় তাঁহাকে আস্বাদন করিয়া কণ্ঠহার স্বরূপে পরিধান করেন।]

ব্রহ্মই লক্ষ্য; সগুণ-নির্গুণ, দেব-পিতৃভাব প্রধানভাবে তাঁহার লক্ষণা। নির্গুণবৃত্তি ও সগুণবৃত্তি দুই-ই নিত্যরসাবধৃত পুরুষোত্তম-বস্তুর লক্ষণা বই আর কি? ব্রহ্ম 'গতির্ভর্ত্তাপ্রভুঃ সাক্ষীনিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানম্ বীজমব্যয়ম্।'—ব্রহ্মগতি (flowing) অনাদি অনন্ত। গতিরই ভর্তৃত্ব সম্ভব। অগতির গতিত্ব বিধান করাই গতি-ব্রহ্মের তপস্যা। 'স তপোঽতপ্যত'। জগতের জগদ্ভাবই ব্রহ্মভাব; এই গতির মধ্যেও যে পরমা গতি তাহাতেই ব্রহ্মের আবাস স্থল।

অনিয়মঃ সর্ব্বাসামবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩।৩।৩১ ॥

অনিয়মঃ [পুরুষোত্তমারাধনায় কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই] সর্ব্বাসাম্ [সর্ব্ব বিদ্যার] অবিরোধঃ [অবিরোধ] শব্দানুমানাভ্যাম্ [শব্দ ও অনুমান দ্বারা প্রমাণিত হয়।]

'গতিবিৎ' পুরুষোত্তমের আরাধনায় আরাধ্য-আরাধনা-আরাধক সম্বন্ধে কোনও 'চূড়ান্ত' নিয়ম স্থাপন করিবার সম্ভাবনা নাই। আরাধ্যের যত রূপ এ যাবৎ আরাধকের দল স্থির করিয়াছেন, পুরুষোত্তম সব কিছুই; তিনি আস্তিকের অস্তি, নাস্তিকের নাস্তি, জড়বাদীর জড়, চৈতন্যবাদীর চৈতন্য, ভক্তের ভগবান, কর্ম্মীর কর্ম্ম-ব্রহ্ম, অদ্বৈতবাদীর অদ্বৈত, দ্বৈতবাদীর দ্বৈত ইত্যাদি। আরাধনার যত রূপ বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত, সব রূপের সমন্বয় রহিয়াছে পুরুষোত্তমারাধকের জীবনে। এই অবিরোধ সম্ভব হইতেছে 'হৃদয়' ইহাদের সকলের একমাত্র গতি বলিয়া; 'সর্ব্বাসাম্ এব বিদ্যানাম্ হৃদয়মেকায়নম্'। হৃদয় প্রতি আরাধ্যের, প্রতি আরাধনার ও প্রতি আরাধকের স্ব স্ব অধিকার বজায় রাখিয়াই সকলের মাঝে অবিরোধ। শ্রুতি ও স্মৃতি প্রত্যক্ষ ও অনুমানদ্বারা পুরুষোত্তমের এই অবিরোধ রূপই প্রতিষ্ঠিত করে। পুরুষো-ত্তমারাধনায় কেহ বা স্থিতির পথে, কেহ বা গতির পথে চলিয়াছেন। ঋষভদেবের পুত্র নব যোগেন্দ্র জোর দিয়াছেন সন্ন্যাসের উপর। ইহাদের সম্বন্ধে ভাগবত লিখিতেছেন—

'নবাভবন্ মহাভাগা মুনয়োহ্যর্থশংসিনঃ।
শ্রমণা বাতরশনা আত্মবিদ্যাবিশারদাঃ ॥'—ভাগবত ১১।২।২০

পক্ষান্তরে রাজর্ষি জনক শুধু গৃহীই নন্, রাজাও বটেন। পুরুষোত্তমারাধনায় সর্ব্ব বর্ণ, সর্ব্বাশ্রমই সমানভাবে অধিকারী। সকলের সকল অধিকারের সত্য বাস্তব জীবন্ত 'নিয়ম' যিনি বজায় রাখিয়া বর্ত্তমান, তিনি নিশ্চয়ই 'অনিয়ম'। যাহা dynamic, তাহাই অনিয়ম। যাহা mechanical, তাহাই নিয়মের বাঁধনে মৃত, অবসন্ন ও আত্মহীন। কোন নিয়ম না থাকিলে সৃষ্টি হইত একটী devil's dance। কিন্তু সৃষ্টি তো তাহা নয়, তাই নিয়ম ও অনিয়মের সীমারেখা কোথায়, তাহারই নিরাকরণের জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা।

যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩।৩।৩২

যাবদধিকারম্ অবস্থিতিঃ আধিকারিকাণাম্ [আধিকারিকদের অধিকার

যতক্ষণ ও যতদূর, ততক্ষণ ও ততদূর অবস্থিতি আছে বলিয়াই] (নিয়ম-অনিয়মেরও অবিরোধ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।)

একান্ত গতি স্বীকার করিলে আবার একটা উচ্ছৃঙ্খলা আপতিত হয় ; তাই এই সূত্র তাহারই নিয়মন করিতেছে। গতি যদি নিজেই থাকিতে পারিত, তবে তাহার অস্তিত্বও থাকিত না, ধরাও পড়িত না। গতি অবস্থিতির বুকেই রমণ করিয়া ঘন হইতে ঘনতম হইতেছেন। কৃষ্ণ-গতির শৃঙ্খলা শ্রীরাধা। কৃষ্ণ-গতিপথের বাধা শ্রীরাধা।

'কংসারিরপি সংসারবাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ॥ গীতগোবিন্দ

কৃষ্ণ-গতি রাধা-শৃঙ্খলার সাহায্যেই আজ জীবেরও গতি, মুক্ত পুরুষের গতি, আধিকারিক (bureaucratic) দেবগণেরও গতি। 'বদ্ধ জীবের গতি পথে বাধা প্রত্যক্ষ-দৃষ্টি ; কিন্তু মুক্ত পুরুষগণ অবাধ মুক্তি আস্বাদন করেন, কাজেই তাঁহাদের দেহ ধারণ হয় না। যদি বা দেহ ধারণ করেন তাহা পরমেশ্বরের ইচ্ছায়' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত একান্ত মুক্তিবাদীরা করেন। সূত্রকার এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া বলিতেছেন যে, একটানা মুক্তি কাহারও নাই। মুক্তি যেমন অনন্ত, স্তরে স্তরে বাধাও তেমন অনন্ত ; কাজেই বাধা-মুক্তি সমন্বয়েই সত্য বাস্তব মুক্তি। 'তত্ত্বতঃ মুক্তের দেহ অসম্ভব, তবে ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সম্ভব হয়'—ইহা কি যুক্তি ? ঈশ্বরের এ খাম খেয়ালির যুক্তি কোথায় ? মুক্তি ও দেহের যোগ দেখাইবার জন্য ঈশ্বরেচ্ছাকে যখন মানিতেই হইতেছে, তখন আর 'যুক্তির' দোহাই দিয়া 'আলো-আঁধারের যৌগপদ্য হয় না ইত্যাদি' হেতুর অবতারণা করার মূল্য রহিয়াছে কোথায় ? প্রত্যক্ষ ও অনুমান দেহ-আত্মার যৌগপদ্যই প্রমাণ করে—ইহা আমরা পূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি। 'ঈশ্বরেচ্ছা'-রূপ অনির্ব্বাচনীয়তা দেহ ও আত্মার বাহিরে 'Deus ex machina' নয়। উহা রহিয়াছে দেহ-আত্মার অন্তরে বাহিরে তত্ত্বরূপে। অপান্তরতমা নামক বেদাচার্য্য পুরাণর্ষি কলিদ্বাপরের সন্ধিতে কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নামে সম্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ শাপের ফলে পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মাদেশে মিত্রাবরুণা হইতে সম্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমার স্কন্দরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দক্ষ-নারদাদিরও বহুবার দেহোৎপত্তির কথা উল্লিখিত আছে। ইহারা সকলেই সমধিগত-সকলবেদার্থ বলিয়া স্মৃত হন। এই দেহ-ধারণের একটী দার্শনিক যুক্তিপূর্ণ

সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে হইলে স্থিতি-গতির সমন্বয়ই অবধারিত হয়। মুক্তের যদি তত্ত্বতঃ দেহ থাকিতেই পারে না, তবে ঈশ্বরের ঈপ্সিতই বা তাহা থাকিবে কি করিয়া? এইরূপ একটি ঈশ্বরেচ্ছার কাছে মাথা নোয়ানোর অর্থ বিজ্ঞানের মর্য্যাদা বিলোপ এবং ঈশ্বরের হাতে মানুষের অনন্ত কাল ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া থাকা—যাহা মানুষের আত্মা কিছুতেই সহ্য করিবে না। অনন্ত গতি কেমন করিয়া আবর্ত্ত (eddy) সৃষ্টি করিয়া 'স্থিত' হয়, অধিকার রূপ ধারণ করে, পুরুষোত্তমদর্শন তাহাই দেখাইয়া অপূর্ব্ব দর্শন। গতি যেখানে যতটুকু আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়া 'যেন' এক একটী স্থিতি লাভ করে, সেখানেই তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠাও যাবৎ ও তাবৎ-ভাব-লক্ষণা। গতির ভিতরে এইরকম ঘূর্ণাবর্ত্ত তৈয়ার হয় বলিয়াই উহার সহিত নিজের ও সৃষ্টির সম্বন্ধ সম্ভাবনা। গতি নিজ আবর্ত্ত (eddy) দ্বারাই নিজের গতিত্ব 'অনুভব করে, 'অধিকারে' অবস্থিত হয়। বাধাই এই আবর্ত্ত রচনা করিয়া গতির স্থিতিত্ব বিধান করে। ভগবান্, দেবতা, মানব প্রভৃতির যাহার যাহা কিছু অধিকার, সবই এই আবর্ত্তের ফল, কিম্বা আবর্ত্ত মাত্র। আবর্ত্তনের পর আবর্ত্তন সৃষ্টির বুকে এইরূপে চলিয়াছে। এই হিসাবে বিশ্বের সবই আধিকারিক। যুগে যুগে ভগবান এই স্থিতিমূর্ত্তি প্রকট করিয়া যুগের প্রয়োজন-সিদ্ধি পর্য্যন্ত জগতের বুকে বিহার করেন—ইহাই তাঁহার যাবদধিকার-অবস্থিতি। প্রয়োজনাভাবে eddy আবার ভাঙ্গিয়া 'যেন' মিশিয়া যায়। এই যেন-মিশিয়া-যাওয়াই যাবদাধিকার অবস্থিতির অবসান বা অন্তর্ধান। এক এক যুগকে এক এক অধিকার প্রদান করিয়া সেই সেই যুগের আধিকারিক মূর্ত্তিতে ব্রহ্ম ও দেবতা আধিকারিক। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্রাদি দেবতার অধিকারত্বের উল্লেখ শাস্ত্রে সর্ব্বত্র রহিয়াছে। ভগবানের নূতন অধিকার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদের অধিকারও তদনুরূপ নূতন হয়। অবতরণের পূর্ব্বে ভগবান দেবগণকে বলিতেছেন—

> পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
> ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
> স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
> স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ভুবি ॥ ভাঃ ১০।১।২২

নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান পৃথিবীর বিপদ বিদিত আছেন। তোমরা আপন আপন অংশে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করে। ঈশ্বরের ঈশ্বর সেই হরি

অবিলম্বেই আপনার কালশক্তিদ্বারা পৃথিবীর ভার নাশ করত ভূতলে বিহার করিবেন।

জীবও যুগে যুগে নব নব অধিকার লাভ করে। এক ব্রহ্ম-অধিকারই অনন্ত দেশ কাল পাত্রে অনন্ত অধিকার প্রকট করিয়া গতি ও 'অবস্থিতি'র সমন্বয় বিধান করিতেছে। যাহার যতদিন যতখানি যে-অধিকার, তাহাকে সেই অধিকারে রাখাই রস-লীলার বিশেষত্ব; নচেৎ রসাভাস-দোষ-দুষ্টতা আসিবে, সৃষ্টিলীলা ব্যর্থতায় পরিণত হইবে। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার অধিকারেই শ্রীগৌরাঙ্গ; বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মূর্ত্তি নিশ্চয়ই অন্যান্য অধিকার হইতে কিছু বিভিন্ন। আমরা কি শ্রীগৌরাঙ্গকে গৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে ও গৌরাঙ্গাধিকারে বর্ত্তমান যুগে চিনিতে পারিব? গৌরাঙ্গদেবকে আমাদের অধিকারস্থ দেশকাল-পাত্রের পোষক হইতে হইলে আমাদের অধিকারকেও তাঁহার অঙ্গে মাখিয়া শ্রীনিত্যগোপালরূপে আবির্ভূত হইতে হইবে। এক এক যুগকে যেন ব্রহ্মের অনন্ত পথে বিচরণের বিশ্রাম স্থল বলিয়াই বোধহয়; যুগে যুগে অবতার তাই ক্লান্তি দূর করিয়া গতি লাভে সক্ষম হইতেছেন; 'ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের নিয়ত বিশ্রাম'। গৌরচন্দ্রকে নবদ্বীপ অধিকারে, কৃষ্ণচন্দ্রকে বৃন্দাবনাধিকারে নন্দ-যশোদার কোলে ও রাধার বিলাস কুঞ্জে এবং যিশুকে মেরীর কোলেই এখন দেখা যায়, অথচ তাঁহারা কেহই ঐ ঐ অধিকারে বর্ত্তমান যুগে আমাদের নহেন। আমরা ঐ ঐ যুগে যাইতে পারি বলিয়াই এখনও তাঁহাদিগকে সেখানে দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। প্রতি লীলা স্ব স্ব অধিকারে নিত্য।

স্বে স্বে অধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নিশ্চয়ঃ॥ ভাঃ—১১।২১।২

বর্ত্তমান যুগাধিকরণকে সার্থক করিতেছেন এমন নিত্যরসাবধূত পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল-বস্তুই। তিনিই এই যুগের বরণীয়, তাঁহার ভিতর দিয়াই আমরা সর্ব্ব বেদান্ত প্রত্যয় সমন্বিত বর্ত্তমান যুগোপযোগী 'অধিকার' আস্বাদনে সক্ষম হইব।

অক্ষরধিয়াং ত্ববরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপ-
সদবত্তদুক্তম্॥ ৩।৩।৩৩॥

(স্ব স্ব অধিকার-নির্ণয়) অক্ষরধিয়াম্ তু [অক্ষরধী পুরুষসঙ্ঘের জীবনেই]

অবরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্ [সামান্য ও তদ্ভাবদ্বারা নির্গুণ পুরুষোত্তমের অবরোধই (উপপন্ন হয়, কেননা অক্ষরধী পুরুষগণ পুরুষোত্তমেই নিজেদের অবরোধ আনয়ন করিয়াছেন)] ঔপসদবৎ [উপসদবৎ অর্থাৎ দ্বাদশ উপসৎ-বৎ, শিষ্যসঙ্ঘবৎ] তৎ উক্তম্ [তাহা উক্ত হইয়াছে।]

অক্ষর পুরুষোত্তমে যাহাদের ধী, তাঁহারাই অক্ষরধী। দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধা ধীর বিচারে একান্ত ক্ষরের আপেক্ষিক ঐ একান্ত অক্ষরও ক্ষরপাদবাচ্য। মুখ্য (নির্গুণ) পুরুষোত্তম ক্ষর ও অক্ষরের অতীত এবং ক্ষর অক্ষর সমন্বিত সত্য বাস্তব জীবন্ত (living) অক্ষর। এই নির্গুণ অক্ষর পুরুষোত্তমে যাহার ধী অর্পিত, তিনিই অক্ষরধী। অক্ষর ব্রহ্মের টানে, একটী ন-এর টানে জীবসমূহ যখন কি-জানি-কেন না-জানিয়া শুনিয়া কোথায় কাহার পানে পাগলের মত উধাও হইয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়, তখন সেই পুরুষসমূহ সামান্য ও বিশেষ বিশেষ পুরুষোত্তম-ভাবনা (সামান্যতদ্ভাব) নিয়া হাত ধরাধরি করিয়া অন্যোন্যবদ্ধ হইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইলেই, মণ্ডলীবদ্ধভাবে দাঁড়াইলেই সেই Lost sheep of the Israelities-এর 'অবরোধ' হয়। তখন পুরুষোত্তম সঙ্ঘজীবনে অবরুদ্ধ হন, ধরা দেন। পুরুষোত্তমই অক্ষর-বিষয়িণী ধীসমূহের বা গোপীগণের জীবনে 'অবরুদ্ধ'। প্রত্যেকেই যে একই (সমান) পুরুষোত্তম-সেবায় ঘর ছাড়িয়াছেন, ইহাই তাহাদের 'সামান্য' ভাব। অথচ তাঁহারা যেখানে বিশেষ বিশেষ পুরুষোত্তম-ভাবেই 'ভাবিত', সেখানেই তাঁহাদের বিশেষ ভাব। 'সামান্য' ও 'বিশেষ'ভাব দ্বারাই অক্ষরধী পুরুষদের জীবনে পুরুষোত্তমের অবরোধ সম্ভব হয়। তাই ভগবান সূত্রকার বলিতেছেন, 'অবরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যাম্।' 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীমুখ্যা', 'সখীজনবৎসলা' রাধা এই 'শ্যাম শুকপাখী সুন্দর নিরখি ধরেছিল নয়ন-ফাঁদে'। পরকীয় 'ভাব' ব্যতীত এই নির্গুণ শ্যাম পাখী হৃদয়াকাশে আনন্দে বিহার করেন না। 'সামান্য বিশেষে একতা রতি'—চণ্ডীদাস। অবরোধের মন্ত্রে রহিয়াছে সামান্য ও তদ্ভাবসাধন বিশেষ। ব্রহ্মও সামান্য-রস এবং বিশেষ 'জীব'ভাব ব্যতীত জীবকে অবরোধ করিতে পারেন না, এবং জীবও রস-সামান্য ভাব ও বিশেষ অধিকারে আধিকারিক ভাব উপলব্ধি না করিয়া কিছুতেই নিত্যবস্তুর আশা করিতে পারেন না। লীলায় উভয়েরই উভয়ের স্তরে অপকর্ষ অবরোধ (transferance) রহিয়াছে। সামান্য ও বিশেষভাবই রসলীলার দর্শন। পুরুষোত্তমের সামান্য ভাব থাকিলেও বিশেষ ভাব ব্যতীত ভক্তহৃদয়ে তাঁহার

প্রাকট্য নাই। 'সমান' পুরুষোত্তম সব দেশকাল পাত্রেই সমান; কিন্তু তাঁহার বিশেষত্বই বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রের আস্বাদ্য। ভক্তও প্রতি বিশেষ দেশকাল-পাত্রের প্রতিরূপ ধারণ করিতে পারে বলিয়াই তাঁহার নৈর্গুণ্য ও সমন্বয়-সম্ভাবনা রহিয়াছে; ইহার নিদর্শন দিতেছে উপষদ-সমূহ। সূত্রকার তাই বলিতেছেন 'উপসদবৎ তদুক্তম্'। উপসদ (কর্ম্মাঙ্গভূত মন্ত্র) সমূহদ্বারা যেমন অহীনের কিম্বা গুরুভক্ত শিষ্যদের দ্বারা অবরুদ্ধ গুরুদেবের যেমন অগৌণত্ব, নির্গুণত্ব বা মুখ্যত্ব উপপন্ন হইতেছে, ঠিক তেমনি অক্ষরধী পুরুষদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইবার যোগ্যতা আছে বলিয়াই পুরুষোত্তমের সম্বন্ধে 'তৎ' অর্থাৎ নির্গুণত্ব, মুখ্যত্ব উক্ত হইয়াছে—'তদুক্তম্'। পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন 'উপসদ' শব্দের অর্থ দিয়াছেন—'শিষ্যসমূহ'। 'অহীনো বা প্রকরণাৎ 'গৌণঃ' (পূর্ব মীমাংসা ৩।৩।১৫)—এই সূত্রে পূর্ব্ব পক্ষ প্রকরণ অহীনের গৌণত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কেননা বেদ বলিতেছেন, 'দ্বাদশ সাহ্নস্যোপসদঃ স্যুস্তিস্রঃ অহীনস্য যজ্ঞস্য' (তৈত্তিরীয় সংহিতা—৬।২।৫।১)। সাহ্ন অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম যাগের উপসদ (কর্ম্মাঙ্গভূত মন্ত্র) বারটী, অহীনের উপসদ তিনটী। 'সাহ্ন' অর্থ জ্যোতিষ্টোম; কেননা উহা একদিনে নিষ্পাদিত হয়। এই প্রকরণ হইতে অহীনকে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গই বলা যাইতে পারে। কিন্তু সূত্রকার ইহার উত্তরে উপরোক্ত বৈদিক মন্ত্রের পরের 'বিলোমঃ ক্রিয়েত তিস্র এব সাহ্নস্যোপসদো দ্বাদশাহীনস্য যজ্ঞস্য সবীর্যত্বায়'—তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।২।৫।১ অংশের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সূত্র দিতেছেন—'অসংযোগাত্তু মুখ্যস্য তস্মাদপকৃষ্যেত'—পূর্বমীমাংসা ৩।৩।১৬॥। মুখ্য অর্থের অসংযোগ (বাধ) হয় বলিয়া তাহা হইতে অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম প্রকরণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া (অপকৃষ্য) দ্বাদশ উপসদকে অহীনের সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে। সূত্রকার বলিতেছেন যে, উপরোক্ত সম্পূর্ণ বৈদিক বাক্যের দ্বারা এমন বুঝা যায় না যে, জ্যোতিষ্টোমই মুখ্য এবং অহীন গৌণ। দ্বাদশ 'উপসদ' মুখ্যের সঙ্গেই যুক্ত ইহাই বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্য। অহীন যজ্ঞ মুখ্য বলিয়াই অপকর্ষ, অবরোধ (transferance) দ্বারা তাহার বারটী উপসদ সিদ্ধ হইয়াছে। বারটী উপসদের যেমন অগৌণ, মুখ্য অহীনের সঙ্গে অভিসম্বন্ধ (অবরোধ) উপপন্ন হইতেছে, ঠিক তেমনি অক্ষরধী পুরুষদের দ্বারাও অগৌণ, নির্গুণ, মুখ্য পুরুষোত্তমের সঙ্গে অভিসম্বন্ধ বা অবরোধ উপলব্ধ হইতেছে। অক্ষরধী পুরুষগণ দ্বাদশ উপসদ স্থানীয়।

ক্রমশঃ

'পল্লীসমাজ'—শরৎচন্দ্র

।। শ্রীরেণু মিত্র ।।

"রমার দুই চোখ বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; কিন্তু সেই অত্যন্ত মৃদু আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল, এবং পরক্ষণেই রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজকর্মের উৎসাহ যেন এক নিমেষে এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট ছায়াময় হইয়া গেছে।

পরদিন সকাল বেলায় রমেশ এ বাড়ীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বিশ্বেশ্বরী যাত্রা করিয়া পাল্কিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে মুখ লইয়া অশ্রু-ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল, কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ করে চললে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী ডান হাত বাড়াইয়া রমেশের মাথায় রাখিয়া বলিলেন, অপরাধের কথা বলতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা? তাতে কাজ নেই। তারপরে বলিলেন, এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে! সে হলে ত কোন মতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে জ্বলেই গেল বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে পুড়ে মরি আমি সেই ভয়ে পালাচ্ছি রমেশ।

রমেশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটী কথায় সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটার জননীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল এমন আর কোন দিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, রমা কেন যাচ্ছে জ্যাঠাইমা?

বিশ্বেশ্বরী একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তারপরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন, সংসারে তার যে স্থান নেই বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নিচেই নিয়ে যাচ্ছি; সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কি না জানি নে, কিন্তু যদি বাঁচে সারা জীবন ধরে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিলেন এবং কেনই বা বিনা

দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নেই, বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; বিশ্বেশ্বরী একটু পরেই কহিলেন, কিন্তু তোর ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস্ নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ করে যেতে চাই নে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনও অবিশ্বাস করিস নে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী তোর আর কেউ নেই।

রমেশ বলিতে গেল, কিন্তু জ্যাঠাইমা—

জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই রমেশ। তুই যা শুনেছিস সব মিথ্যে; যা জেনেছিস সব ভুল, কিন্তু এ অভিযোগের এখানেই যেন সমাপ্তি হয়! তোর কাজ যেন সমস্ত অন্যায়, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে চিরদিন এমনি প্রবল হয়ে বয়ে যেতে পারে এই তোর ওপর শেষ অনুরোধ। এই জন্যই সে মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করে গেছে। প্রাণ দিতে বসেছে রে রমেশ, তবু কথা কয় নি।

গত রাত্রে রমার নিজের মুখের দুই একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্জ্জয় রোদনের বেগ যেন ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নিচু করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে বলিয়া ফেলিল, তাকে বলো জ্যাঠাইমা তাই হবে, বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোন মতে তাঁহার পায়ের ধুলো লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।'

—বিশ্বেশ্বরী চলে গেলেন, রমা চলে গেল। কুঁয়াপুর গ্রামের শ্বাস-রোধকারী আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে রইল হতভাগ্য রমেশ। অথচ গ্রামের উন্নতি করতে আরম্ভ করে চতুর্দিকের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে রমেশ যখন একদিন গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল তখন বিশ্বেশ্বরীই তাকে নিষেধ করে বলেছিলেন, '…বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিস রমেশ, বল দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে?…এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্বল—তা যদি জানিস রমেশ, এদের ওপর রাগ করতে তোর আপনি লজ্জা হবে।

ভগবান যদি দয়া করে তোকে পাঠিয়েছেন, তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক বাবা।'

উদ্ধৃতি আর বাড়াব না—আবেষ্টনের কুৎসিত রূপ ও তার চাপ যখন রমেশকে ক্লান্ত করে ফেলছিল, তখন জ্যাঠাইমার কথাতেই রমেশ একদিন গ্রামে টিকে যেতে পেরেছিল। সেই রমেশকে একা ফেলে রেখেই জ্যেঠাইমা আর রমা একদিন চলে গেলেন। রমা যদিও প্রত্যক্ষভাবে রমেশকে বাধা দেওয়া ছাড়া, দুঃখ দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে নি বলা যেতে পারে, তবু এ কথাও তো সত্যি যে, রমেশের অস্তিত্বের মূলে পরোক্ষে অন্তরালে রস জুগিয়েছে সে-ই। তবু তাকে শরৎচন্দ্র সেদিন সরিয়ে না নিয়ে পারেন নি। আজকে হলে রমাকে দিয়ে শরৎচন্দ্র কি করতে পারতেন তা আমরা পরে ভেবে দেখব, কিন্তু সেদিন এই অভিশাপগ্রস্ত সমাজকে রক্ষা করার কাজে রমা কেউ হতে পারল না!

সেদিনের সমাজের কি অবস্থা ছিল, আজকের আমরা তা প্রায় ভুলতে বসেছি। তাই পল্লীসমাজ নিয়ে ভেবে দেখবার আগে সেই সমাজকে একবার মনে করে দেখা লাগে। আজকের আমরা সামাজিক তথা হিন্দু-সমাজের মানুষ যতখানি, তার চেয়ে বেশী রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার ফল। বলতে চাই আজ আমরা ভারতীয় রাষ্ট্রে বাস করি, হিন্দুসমাজে নয়। অথচ যে রাষ্ট্রে বাস করে আজ আমরা নর নারী, ব্রাহ্মণ চাঁড়াল, মুচি মেথর সব মানুষ বলে অভিহিত হতে চাইছি, সেই মানুষ আমাদেরকে হিন্দু সমাজে বসেই হতে হবে—হিন্দুত্বকে এতখানি বড় করে জানবার বুঝবার ও প্রয়োগ করবার আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। পল্লী-সমাজে হিন্দুর যে চিত্র ফুটে উঠেছে, সে কি শুধু পল্লীর পক্ষেই সত্য? সহরের সমাজ কি আলাদা কিছু? এক হিসেবে আলাদা নয়, একই হিন্দু-সমাজে মনু-শাসিত অনুশাসনদ্বারা তারাও পীড়িত, লাঞ্ছিত। তবু বুঝি সহরে নিশ্বাস ফেলবার উপায় আছে, গ্রামে তা নেই। সেই জন্যই বুঝি শরৎচন্দ্র-চিত্রিত হিন্দুর সমাজ-চিত্রের নাম পল্লীসমাজ।

এই সমাজ আজ গেল কোথায়? সমাজপতিরা কি সবাই মিলে বসে কিংবা একক ক্ষমতার বলে শরৎচন্দ্র-চিত্রিত সমাজের গ্লানিগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্ট হয়ে উঠবার পথগুলি বন্ধ করে দিয়েছেন? কতকগুলি অবস্থা আছে যা মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাবসিদ্ধ, আবেষ্টন বদলে দিলে যা খানিকটা পরিশুদ্ধ হলেও

চিরদিন আছে, চিরদিন থাকবে। কিন্তু মানুষের যে অসম্মান সামাজিক ব্যবস্থাদ্বারা আসে—তার দায় এড়াবার ব্যবস্থা কি মানুষ করেছে? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্ম্মদাস, বেণী ঘোষাল প্রভৃতিদের যে ব্যক্তিগত চরিত্রের গ্লানি—নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোন কর্ম্ম যারা অনায়াসেই করতে পারে—মানুষের এই স্বার্থপরতা আবেষ্টন বদলালেও কিছু না কিছু থেকেই যাবে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ ও চারিত্রিক সঙ্কীর্ণতা যখন সম্প্রদায় বিশেষের সামাজিক সুবিধাবাদের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন সে শোষণ অপরের ওপর যে কি রকম মর্মান্তিক হয়ে ওঠে, হৃদয় বলে বস্তু যাদের নিঃশেষে নষ্ট হয়ে যায় নি, তাদেরই কাছে তা ধরা পড়বে! সে শোষণের পথ কি সমাজপতিরা বন্ধ করে দিয়েছেন? ক্ষেন্তি বামনির মেয়ের চারিত্রিক দুর্বলতার অজুহাতে পরাণ হালদার গোবিন্দ গাঙ্গুলী একদিন যে অত্যাচার করবার সুযোগ পেয়ে এসেছে একথা জেনেও যে, ঠগ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে, সে সামাজিক সুযোগ কি সামাজিকভাবে বন্ধ করা হয়েছে? রমেশ যেখানে মধু পালের দোকানে বাকি দশ টাকা বয়ে গিয়ে দিয়ে আসে, সেখানে বাঁড়ুয্যেমশায় কেবল বাঁড়ুয্যেমশায় হওয়ার আভিজাত্যে সৈরুবি জেলেনী, মধু পাল দোকানী, প্রভৃতির উপর যে অত্যাচার চালাবার সুযোগ পান, সে সুযোগ থেকে কি সামাজিকভাবে তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে? পল্লীসমাজ কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করলে এমন কত কাহিনীই আমরা পাব, যা ব্যক্তিগত অত্যাচার নয়—সামাজিক অত্যাচার। সেই সমাজ কোথায় গেল? কে বদলাল? কোন্ শাস্ত্র-ব্যবস্থা দিয়ে তার বদল হল? আজ হিন্দু সমাজের সমাজপতি কারা?

—আমরা পল্লীসমাজের কাহিনী অনুসরণ করে করে এ সব কথার খোঁজ করে যাব।

বাবার শ্রাদ্ধ করতে রমেশ গ্রামে এসেছিল—এসে দেখল গ্রামটা ঠিক মনুষ্যবাসের উপযুক্ত নয়। দলাদলি অর্থাৎ কোন ঘটনাকে উপলক্ষ করে সৃষ্ট বিবাদকে বেণী ঘোষাল আর যদু মুখুজ্জের কন্যাকে যখন চিরদিন ধরে বাপের ঝগড়াকে ছেলে পর্যন্ত টানতে হয়, যে কোন ভাবেই হোক বিরোধটাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হয়, তখন সে দলাদলিটা গ্রাম্য বটে কিন্তু মনোবৃত্তিটা গ্রাম্য নয় শুধু। গ্রামে এ মনোবৃত্তিকে খেলিয়ে অপরের সর্বনাশ করবার সুযোগ সামাজিক ভাবে বেশী মেলে সত্য, কিন্তু সহরের মানুষের এ

তা তো নয়। তাই আজ নূতন জগতে নূতন সমাজে নূতন মনোবৃত্তি নিয়ে বাস করতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামনে অনেক কিছু করণীয় এসে স্তূপীকৃত হয়েছে। ব্যক্তিগত চিত্তশুদ্ধির জন্য একটা বিশ্লেষণাত্মক সামগ্রিক চিন্তাধারা ও চলার পথ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত করার প্রয়োজনও ততখানিই যতখানি সামাজিক শোষণ দূর করার প্রয়োজন। দলাদলি করা, দল পাকিয়ে অপরকে জব্দ করা, অপদস্ত করা, নীচু করা—এ সমস্ত মনোবৃত্তিগুলি ব্যক্তিগত হয়েও সামাজিক সঙ্ঘবদ্ধ শোষণের যন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। পল্লীসমাজ জুড়ে ব্যক্তিগত চারিত্রিক অসৌন্দর্য সামাজিক ভেদ-ব্যবস্থা বা কুব্যবস্থার সঙ্গে মিশে একটা সীমাহীন শোষণের গহ্বর সৃষ্টি করে তুলেছে।

তবু বিধাতার সৃষ্টি যে নিঃশেষ হয়ে যায় নি, পঙ্কের মধ্যেও পদ্ম জন্মে' সৃষ্টির অপূর্বতাকে যে আজও জিইয়ে রেখেছে, পরম আশ্চর্য জীবনে তারই চিহ্ন পদে পদে। তাই কুঁয়াপুর গ্রামের ঐ বিষপঙ্কের মধ্যেও রমেশের মত প্রাণ এসে পৌঁছেছে—সৃষ্টিটা এমন না হলে কবে যে শেষ হয়ে যেত! বেণী ঘোষাল, যদু মুখুজ্জের কন্যা, মাসি, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, পরাণ হালদার এরা জানে বিবাদ জিইয়ে রাখতেই হবে যে কোন উপায়েই হোক না কেন, কিন্তু সমাজের একদিকে যখন ঐ অবস্থা, তখন তো অন্য রকম করে ভাবে এমন লোকও আছে। রমেশ নূতন জগতের মানুষ—নূতন জীবনের চেতনা তার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। বিবাদ করে হোক, ঠকিয়ে হোক, যেন তেন প্রকারেণ নিজের প্রাপ্য অংশ বুঝে নিতেই হবে—এ মনোবৃত্তিই সকলে জানে, বোঝে। কিন্তু রমেশ বলে, '...কিন্তু দু'খানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া করা যায় না!'

ঘটনাটা বড় সুন্দর—মনে হয় চতুর্দিকের তাপক্লিষ্ট মনোবৃত্তির গরম হাওয়ার মধ্যে এ যেন বসন্তের হাওয়ার স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দিয়ে গেল। কুঁয়াপুরের জমিদারী ভাগ হলেও এখনও কতক সম্পত্তি তিনজনের এক হয়ে আছে। বেণী ঘোষাল আর রমা সেগুলি এতদিন যেমন দুজনে ভাগ করে নিচ্ছিল, রমেশ গ্রামে ফেরবার পরও তেমনই দুজনেই ভাগ করে নিতে চাইছে। রমেশের প্রতি মমত্ববশতঃই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক একদিন এক পুকুরের মাছের যখন দুটো ভাগ হচ্ছিল, ভৈরব আচায্যি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে রমেশের সরকার গোপালকে এত বড় নিদারুণ সংবাদটা দিলে 'গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না, কহিল, আমাদের বাবু মাছ মাংস খান না।

ভৈরব কহিল, নাই খেলেন; কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত।

গোপাল বলিল, আমরা পাঁচজন ত চাই, বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন; কিন্তু রমেশবাবু একটু আলাদা ধরণের, বলিয়া ভৈরবের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া, সহাস্যে একটুখানি শ্লেষ করিয়া কহিল, এ ত তুচ্ছ দুটো শিঙি-মাগুর মাছ, আচায্যিমশায়। সেদিন হাটের উত্তর দিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দু ঘরে ভাগ করে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়তে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলুম, কি করব বাবু! আমার রমেশবাবু আর মুখটা একবার তোলবারও ফুরসৎ পেলেন না। তারপর পীড়াপীড়ি করতে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বললেন, কাঠ? তা আর কি তেঁতুল গাছ নেই? শোন কথা! বললুম, থাকবে না কেন? কিন্তু ন্যায্য অংশ ছেড়ে দেবই বা কেন, আর কে কোথায় এমন দেয়? রমেশবাবু বইখানা আবার মেলে ধ'রে মিনিট পাঁচেক চুপ করে থেকে বললেন, সে ঠিক; কিন্তু দু'খানা তুচ্ছ কাঠের জন্য ত আর ঝগড়া করা যায় না।'—খুব সুন্দর কথা নয় কি? খুব ভাল লাগল না কি? খুব ভাল লাগল। বেণী ঘোষাল আর তার পাল্লায় পড়ে রমা মুখুজ্জে—পাল্লায় পড়েই বা বলি কেন, সে-ও বোধহয় কম বেশী ঐ মনোবৃত্তিরই মানুষ কিংবা এখন পর্যন্ত তাই কিংবা আর কিছু সেটা পরে দেখব—ওরা জানে কাঠ যেমন পাওয়াই চাই, তেমনি ঝগড়াটাও বাঁচিয়ে রাখা চাই-ই—বিশেষ করে ঝগড়াটাকে চোখের উপর তুলে ধরবার জন্যেই যেন তাদের সমস্ত কর্ম-প্রচেষ্টা।—এতেই তো সমস্ত আবহাওয়া বিষিয়ে ওঠে। অথচ কেবল অপর পক্ষ নয়, রমেশের নিজের লোকও মনে করে রমেশ সরিকদের ভয় করে বলেই নিজের পাওনাটা নেয় না। গোপাল সরকার বলছে, 'যদু মুখুয্যের কন্যা—স্ত্রীলোক। সে পর্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি। গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে ডেকে নাকি সেদিন তামাসা করে বলেছিল, রমেশবাবুকে ব'লো একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে। এর চেয়ে লজ্জা আর আছে?'—অথচ রমেশ যে বিবাদ করতে চায় না বলেই মাছ বা কাঠ নিয়ে মাথা ঘামায় না, সে কথা সাধারণ মানুষকে বোঝানো সেদিন কেন আজও কঠিন। নিজের প্রাপ্য অংশ খুইয়েও রমেশের এই ঝগড়া না-করার মনোবৃত্তির ফলে সমস্ত গ্রামের আবহাওয়া যে খানিকটা পরিশুদ্ধ হয়েছিল, সে কথা আমরা ক্রমে দেখতে পাব।

সেদিন ভৈরবের মুখে খবর জানতে পেয়ে ক্রুদ্ধ রমেশ গর্জে উঠে তার গোরখপুর জেলার ভৃত্য ভজুয়াকে হুকুম দিয়ে ছিল—'সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে, এবং যদি কেহ বাধা দেয় তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি আনা না সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার এক পাটি দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে।' কিন্তু রমেশের বিধাতা রমেশকে এই ক্রোধের পরিণতি থেকে রক্ষা করেছিলেন। রমেশ যে কাজে নেমেছে তাতে যেমন ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু করায় কোন ফল হবে না, তেমনি রমেশের ব্যক্তিগত পরিচয়েও সেটা গৌরবের নয়। তাই রমেশের ভুল বিধাতা সেরে নেন। কিন্তু এই ভুলের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ মানুষকে কেমন করে সামাজিক পীড়নের যূপকাষ্ঠে ফেলে দিয়ে থাকে, তারই চিত্র ফুটে উঠে' রমেশকে বিহ্বল করে দিল। ভৈরব বাক্য ব্যবহার দ্বারা দু চারটে মাছের আশা করেছিল, কিন্তু বাক্যের বদলে ভজুয়াকে সুদীর্ঘ বংশদণ্ড হাতে রমেশের পূর্বোল্লিখিত আদেশ তালিম করতে যেতে দেখে সে বেণী ঘোষালের হাতে তার নিজের পরিণতি দেখতে পেয়ে শিউরে উঠল। সে বলছে, 'ওরে ভোজো, যাস নে! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ, এক দণ্ডও বাঁচব না।' আরও—'এ কথা ঢাকা থাকবে না! বেণীবাবুর কোপে পড়ে তাহলে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘর-দোর পর্য্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষা করতে পারবে না।'

রমেশ স্তব্ধ বিস্ময়ে বসে রইল। ভজুয়াকে সে নিষেধ করে দিল যেতে আর 'তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঙ্কার আকারেই এই ভৈরব আচার্য্যের অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্যামীই দেখিলেন। কারো ওপর রাগ করে কেউ অপর কারো এমন নিদারুণ সর্বনাশ করতে পারে, রমেশ যে ধাতু দিয়ে গড়া বা যে শিক্ষাদীক্ষায় বেড়ে ওঠা, তাতে তার পক্ষে এ কথা বুঝতে পারা ও স্বীকার করে নেওয়া অসাধ্য হয়ে পড়ে। যে চিন্তাধারার ফলে অর্থনীতি ক্ষেত্রে জমিদারী প্রথার সৃষ্টি হয়, সেই চিন্তাধারাই একজনকে আর এক জনের এতবড় সর্বনাশে প্রণোদিত করে। এ সবই ধনতান্ত্রিক চিন্তাধারার ফল। হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থাটাতে, যেখানে সকলেই মানুষ হয়েও একজনের সঙ্গে আর একজনের আশমানজমীন তফাৎ, একজনের খুশী খেয়ালের উপর যেখানে আর একজন বেঁচে বর্ত্তে থাকে, সেখানেও এই একই চিন্তাধারা। বিশ্ব আজ

সে অবস্থাকে সব দিক দিয়েই—ব্যক্তিগত ভাবে বা সমষ্টিগত ভাবে পার হয়ে আসতে চাইছে—খানিকটা এসেওছে। পরিবার বা সমাজের যে কাঠামোর ফলে বেণী ঘোষাল বা গোবিন্দ গাঙ্গুলী বা পরাণ হালদারের অত্যাচার আর একজনকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে পারে, পারিবারিক বা সামাজিক সে কাঠামো আবার কোনদিন মানুষের জীবনে ফিরে আসবে কি না জানি না, কিন্তু আজ আর তার অস্তিত্ব রক্ষা করা চলবে না—এ কথা বিঘোষিত হয়ে গেছে বলা যেতে পারে। ব্যক্তিগত চরিত্রে মানুষকে মানুষের অত্যাচার প্রবৃত্তি থেকে যাবে বটে, তবু সামাজিক ভাবে সুবিধা না পেয়ে তার দাপট যেমন কমে যাবে, তেমনি এ আশা করাও অসম্ভব কিছু হবে না যে, বিশ্বজোড়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের যে ঢেউ উঠেছে, তাতে ব্যক্তিগত চরিত্রও কম বেশী পরিশুদ্ধ হবে।

ক্রমশঃ

'কাল-সহায় মুক্তিই রস। কালস্পর্শহীন মুক্তি ঐন্দ্রজালিকের মুক্তি। ...বাস্তব জীবনের সঙ্গে উহার সংশ্রব সামান্য।...যে মুক্তি অন্নক্ষেত্রে, প্রাণক্ষেত্রে, মনক্ষেত্রে, বিজ্ঞানক্ষেত্রে মুক্ত আত্মা, মুক্ত দেহ, মুক্ত বুদ্ধি, মুক্ত ইন্দ্রিয় ফুটাইয়া তুলিয়া মুক্ত রূপরসগন্ধস্পর্শ স্বচ্ছন্দে লুট করিয়া মুক্ত হইবার কিংবা মুক্তের মত সকলের সব 'স্ব'-মান বজায় রাখিবার কৌশল শিখাইতে সক্ষম, গীতার কাল-দেবতার তাহাই কাম্য।'

—অবধূতভাষ্য—ভাষ্যপ্রদীপ, পৃঃ ৭৫-৭৬

শিবনাথ শাস্ত্রী

॥ শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ॥

জন্ম ও শিক্ষালাভ : মহামান্য পূতচরিত্র শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতৃভবন চব্বিশপরগণার মজিলপুর সহরে। তবে তিনি জন্মগ্রহণ করেন মাতুলালয়ে, ঐ জেলার চাংড়িপোতা গ্রামে। স্বনামধন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের শিক্ষা ও নিষ্ঠা প্রেরণা লাভ করিয়াছিল পিতৃকুল এবং মাতৃকুল হইতে। উভয়-কুলই ছিল তৎকালে শিক্ষা-নিষ্ঠার আদর্শে পরিপূর্ণ, ভক্তি ও ধর্ম্মভাবের প্রভায় প্রোজ্জ্বল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ দুইটি শ্রদ্ধা বিচারবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও ধর্ম্ম-ভীরুতার আদর্শে উপপ্লুত; স্বাধীন চিন্তাধারা এবং স্বদেশ ও সমাজ সেবা নিষ্ঠাব্রতী শিবনাথের জীবনের লক্ষ্য ছিল। সর্ব্বোপরি নির্ভীকতা ও হৃদয়বল তাঁহার চরিত্র আজীবন অম্লান রাখিয়াছিল বলিতে হইবে।

১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে শিবনাথ সংস্কৃত কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া সংস্কৃতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। তিন বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এফ-এ পাশ করিবার পর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। পরে চরিত্র-দৃঢ়তা ও বিদ্যাবত্তার গুণে তিনি ব্রাহ্ম সমাজে এক খ্যাতনামা আচার্য্যের পদে অভিষিক্ত হন। তাঁহার সুকোমল ব্যবহার, অমায়িক প্রকৃতি এবং জ্ঞান-বুদ্ধির জ্যোতিঃ বহু সজ্জন মণ্ডলীকে আকর্ষণ করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সাহিত্যিক, দৃঢ়-চিত্ত পুরুষদের মধ্যে তিনি ভাস্বরদীপ্তিতে বিদ্যমান ছিলেন।

সাহিত্য-চর্চ্চা : ছাত্রজীবন হইতে শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তাঁহার সাহিত্য সেবার সূত্রপাত 'সোমপ্রকাশ' পত্রে। এই সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পাদক যশস্বী পণ্ডিত কুলবরেণ্য দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ছিলেন শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতুল। তাঁহার আনুকূল্যে সাহিত্য-সাধনা অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে, সোমপ্রকাশ তৎকালে স্বাধীন-চিন্তা ও সাহিত্য-সমালোচনা, সমাজ-সংস্কার ও দেশ-সেবা প্রভৃতি বিষয়দ্বারা প্রতিষ্ঠা-

লাভ করিয়াছিল। দেশের ধর্ম্ম, সমাজ ও নৈতিক জীবনের সংস্কার-সাধন প্রভৃতি শাস্ত্রী মহাশয়ের সুললিত প্রবন্ধগুলির বিষয়বস্তু ছিল। সেকালে 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত রচনাবলী সাধারণের সুখপাঠ্য ছিল, ছাত্রমহলে সমাদৃত হইত ও বিবুধজনের হৃদয়ে উল্লাস জাগাইত।

শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা ছিল সরস, সুমধুর ও রুচিকর। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী হইলেও তাঁহার ভাষা সংস্কৃত-বহুল ছিল না, ছিল ভাবমধুর, রস-প্রবণ। সরল, পরিচ্ছন্ন ভাষা চিন্তাধারাকে অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিল, এইজন্য উঁহার রচনাগুলি পার্ব্বত্য নদীর নির্ম্মল স্রোতের ন্যায় গতিশীল। তাঁহার রচনা সকলকে যে আকৃষ্ট করিত, তাহার প্রধান কারণ—লিখনভঙ্গী ছিল ভাবপ্রবণ, সরল ও সবল। প্রবন্ধ-রচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত হইলেও তাঁহার অমূল্য অবদান "আত্মচরিত" ও "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থদ্বয়। প্রাঞ্জল ভাষা, স্বাধীন চিন্তা ও সমস্যা বিশ্লেষণের প্রভায় দ্যুতিমান "প্রবন্ধাবলি", "প্রবন্ধমালা", "ধর্ম্মজীবন", "গৃহধর্ম্ম" প্রভৃতি। তাঁহার ভাব-প্রবণ হৃদয় কাব্য-ঝঙ্কারে যখন উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল তখন প্রকাশিত হইল "পুষ্পমালা", "পুষ্পাঞ্জলি", "হিমাদ্রিকুসুম", "ছায়াময়ী", "পরিণয়" ও "নির্ব্বাসিতের বিলাপ"।

উপন্যাস রচনায়ও তাঁহার পারদর্শিতা অক্ষুণ্ণ দেখা যায়। মেজবউ, নয়ন-তারা, বিধবার ছেলে, যুগান্তর প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁহার মনস্বিতার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্র-বিশ্লেষণ স্বাভাবিক, সঙ্গত ও সুমধুর; চরিত্রগুলি আড়ষ্ট বা কৃত্রিম নহে বলিয়া উপন্যাসগুলি মনোজ্ঞ ও লোকপ্রিয় হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতির ইতিহাস, সমাজ-চিত্র ও খ্যাতনামা মনীষীবৃন্দের জীবন-আলেখ্য যাহাতে চিত্রিত হইয়াছে, সেই দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ 'আত্মচরিত' ও 'রামতনু লাহিড়ীর জীবন চরিত ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' তাঁহাকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

শিক্ষা-জীবন সমাপনান্তে শাস্ত্রী মহাশয় কিছুকাল চব্বিশপরগণা জেলার অন্তর্গত হরিনাভি বিদ্যালয়ে এবং কলিকাতার দক্ষিণে ভবানীপুর সাউথ সাবার্বন স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এ সময়ে সহকর্ম্মী ও বিদ্যার্থীগণ তাঁহার চরিত্র-মাধুর্য্য ও বিদ্যাবত্তায় যুগপৎ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি 'সমদর্শী' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনের ভার যখন প্রাপ্ত হন, তখন অধ্যবসায় ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়া সকলকে বিমুগ্ধ করেন। শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে

সাহিত্যসাধক চরিতমালার সঙ্কলয়িতা বন্ধুবর স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন—শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ধর্ম্মপ্রচারক, সমাজ সংস্কারক, লোক-সেবক এবং স্বাধীনতার উপাসক।

প্রজ্ঞার পরিচয়ঃ—রামমোহন রায় সম্বন্ধে এই প্রথিতযশাঃ বঙ্গমাতার কৃতীসন্তান যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা হইতে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রোজ্জ্বল প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বরচিত 'প্রবন্ধাবলি'র প্রথম খণ্ডে তিনি লিখিয়াছেন "মানবের আত্মাকে রামমোহন অতি পবিত্রচক্ষে দেখিতেন। মনে করিতেন, এই মানবাত্মা সেই বিশ্বাত্মারই অঙ্গীভূত। সকল প্রকার সামাজিক দাসত্ব এবং রাজনৈতিক অত্যাচার ও দাসত্বকে তিনি এই জন্য অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। এই জন্য পৃথিবীর যে কোন বিভাগে লোকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিত, তাহারই সহিত তাঁহার হৃদয়ের যোগ হইত, এবং স্বাধীনতা লাভ-প্রয়াসে কোনো জাতি অকৃতকার্য্য হইতেছে জানিলে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। ইটালিয়ানগণ অনেক চেষ্টার পর যখন অষ্ট্রিয়াবাসীগণের নিকট পরাস্ত হইল, তখন সেই সংবাদে রামমোহন রায় কলিকাতাতে শয্যাস্থ হইলেন, নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিলেন না। অপরদিকে স্পেনে যখন নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি আনন্দে কলিকাতার টাউন হলে ভোজ দিলেন। তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ডিগ্‌বী সাহেব লিখিয়াছেন যে, তাঁহার নিকট কর্ম্ম করিবার সময় ডিগ্‌বী অনেকবার দেখিয়াছেন যে, রামমোহন রায় ফরাসী বিপ্লবের বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্রতা সহকারে বিলাতী ডাকের অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন, যদি দেখিতেন যে স্বাধীনতাপক্ষের পরাজয় হইতেছে তাহা হইলে দরদর ধারে তাঁহার দুই কপোলে অশ্রুধারা বহিত।

এই মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান আর একদিকে অসাধারণ আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের আকার ধারণ করিয়াছিল। * * * * (রামমোহন) জল পান করিয়া একটু সুস্থ হইয়া (বন্ধু উইলিয়ম এডামকে) বলিলেন, "আমার জীবনের সর্ব্ব প্রধান আঘাত ও সর্ব্ব প্রধান দুঃখ আজ পাইয়াছি। বিশপ মিডলটন আজ আমাকে এই বলিয়া প্রলোভন দেখাইয়াছেন যে, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে আমার পদ আরও বড়ো হইবে। ছি! ছি! আমাকে এত ছোটলোক মনে করে!"

এডাম বলিয়াছেন, ইহার পরে রামমোহন রায় আর বিশপ মিডল্‌টনের

মুখ দর্শন করেন নাই। বৈষয়িক সুখের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, ইহা তাঁহার চক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ, অসহনীয় অপমান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

কেবল ইহাও নহে, মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান হৃদয়ে অন্তর্নিহিত ছিল বলিয়া তাঁহার স্বাবলম্বন-শক্তি অপরিসীম ছিল। নিজের গূঢ় আত্মশক্তিতে এতদূর বিশ্বাস ছিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে কেহ দমাইতে পারিত না। কোনো বিঘ্ন বা বাধা তাঁহাকে স্বকার্য্য সাধনে বিমুখ বা নিরুদ্যম করিতে পারিত না। যাহা একবার করণীয় বলিয়া অনুভব করিতেন, বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিতেন এবং পূর্ণমাত্রায় তাহা না করিয়া নিরস্ত হইতেন না। * * * * "

মহাত্মা রামমোহন রায় সম্বন্ধে লিখিতে গিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, "মানবাত্মার মহত্ত্ব যে জানে না, স্বাবলম্বন-শক্তি তাহার আসে না। জগতে মানুষ আপনার ঘর আপনি রচনা করে। তুমি বড়ো হইয়া দাঁড়াইবে কি ছোটো হইয়া থাকিবে, তাহা তোমারই হাতে। বিঘ্ন বাধা, পাপ প্রলোভন, জীবনের সমস্যা সকলেরই পথে উপস্থিত হয়। তাহার উপরে উঠা বা নীচে পড়িয়া যাওয়া, ইহার উপর বড়ো বা ছোট হওয়া নির্ভর করে। রামমোহন রায় উপরে উঠিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি বড়ো, আর তুমি আমি নীচে পড়িয়া যাই, এই জন্য আমরা ছোটো। তিনি যে উপরে উঠিয়া ছিলেন তাহারও ভিতরকার কথা নিজের শক্তি-সামর্থ্যে ও মানবাত্মার মহত্ত্বে অপরাজিত বিশ্বাস।"

উপরি উদ্ধৃত নিবন্ধাংশ হইতে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মাইবে যে, শাস্ত্রী মহাশয়ের রচনা বিশ্লেষণ-ধর্ম্মী ও মনোমুগ্ধকর।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তাঁহার দেহাবসান ঘটে।

মাতা-পিতার পরিচয়ঃ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পরমারাধ্য পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য্য এক সময়ে নিজ পল্লীতে হার্ডিঞ্জ মডেল বাংলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিত মহাশয়ের কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও দয়াধর্ম্মের জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। কেবল গ্রামবাসী নহে, ব্রিটিশ সরকার পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও একনিষ্ঠার জন্য তৎপ্রতি সম্ভ্রম দেখাইতেন। তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া ইংরাজ সরকার বিদ্যালয়গৃহ মেরামতের জন্য টাকা পাঠাইতেন। সতর্ক তত্ত্বাবধানে মেরামতের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথাসময়ে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেরত পাঠাইতেন।

কলিকাতার বাংলা পাঠশালায় তিনি কিছুকাল পণ্ডিত মহাশয়ের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একসময়ে গ্রীষ্মাবকাশে স্বগৃহে আসিয়াছেন, সে সময়ে দেশে নিদারুণ দুর্ভিক্ষ।' তৎকালে ইংরাজ সরকার দুস্থ লোকদের সাহায্য-কল্পে একটি রিলিফ কমিটি গঠন করিলেন, উহার সভ্যগণের হরানন্দ পণ্ডিতের উপর অগাধ বিশ্বাস, অনন্ত আস্থা। তদারকের ভার অর্পিত হইল তাঁহার স্কন্ধে, তিনি কখনও অবিচার করিতে পারেন না, তিনি যেন ন্যায়নিষ্ঠাব অবতার।

তাঁহার নিকট ঋণীকে বিপন্ন দেখিলে এই সদাশয় পণ্ডিত মহাশয় কেবল যে তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিতেন তাহা নহে, প্রয়োজনবোধে কৃষক পরিবারকে ঋণ-বদ্ধ অবস্থায়-ই স্বগৃহ হইতে অন্ন দিয়া সাহায্য করিতেন। শ্রীরবীন্দ্র কুমার বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিকেলবেলা হরানন্দ নিজের চালের গোলা থেকে কিছু চাল কোঁচড়ে বেঁধে তিন-চার মাইল পথ পায়ে হেঁটে সেই চাষাকে দিয়ে এলেন। ঋণের টাকা আদায় দূর হ'ল, উপরন্তু হরানন্দ ঐ দরিদ্র চাষার পরিবারে নিয়মিত অন্ন যোগাতে লাগলেন। মজিলপুর নিবাসী এই পণ্ডিত হরানন্দ ভট্টাচার্য্য ছিলেন তেজস্বী, নির্লোভ এবং ত্যাগী ব্রাহ্মণ।" (বিশ্ববাণী, বৈশাখ ১৩৬৭ দ্রষ্টব্য)

সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার রচিত 'নলোপাখ্যান' জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, বাল্মীকির মূল রামায়ণের বাঙ্গলা অনুবাদ বেশ সুখপাঠ্য বলিয়া পরিচিত। পঁচাশি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৩১৮ সালের ২৭শে শ্রাবণ সজ্ঞানে স্বর্গধামে তিনি গমন করেন।

সহৃদয়া জননী গোলকমণি শিবনাথের প্রাণে ধর্ম্ম ও সাহিত্যরসের প্রেরণা দিতেন। তাঁহার আদেশে পুত্র ছুটির দিন মাতাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করিয়া শুনাইতেন। সংসারধর্ম্ম পালনে মাতা ছিলেন বিলক্ষণ হিসাবী, সঞ্চয়ী। ৮১ বৎসর বয়সে তিনি ১৩১৫ সালে দেহত্যাগ করেন।

বাগ্মী-প্রবর বৈষ্ণব রসভিজ্ঞ, দেশ-নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় শিবনাথ সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—"এক সময়ে শব্দ যোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কোনও কোনও দিক দিয়া বিচার করিলে, এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবি-রূপেই বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি

হয়। এমন কি, পরে ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্ম্মচিন্তায় ও কর্ম্মজীবনে তিনি যাহা কিছু প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও কবি প্রতিভার সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙ্গলার আধুনিক সাহিত্যে ও সমাজ জীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন সন্দেহ নাই। আর ব্রাহ্ম সমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা-লাভ করিযাছেন, তাহাও প্রকৃতপক্ষে বাগ্মিতাশক্তি ও সাহিত্য সম্পদের উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে।"

নির্ভরতা ঃ পূজ্যপাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের "আত্মচিন্তা"য় প্রকাশিত ঃ

"যেসকল সত্যের এক একটি সাধনার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিলে মানুষের পরিত্রাণ হয়, এমন কত সত্য এ জীবনে শুনিলাম, পড়িলাম, প্রচার করিলাম! আজ সকালে ডেভিডের সাম ও পার্কারের প্রার্থনা পড়িবার সময় এই চিন্তা মনে উদয় হইতেছে। ইহাতে যে বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা রহিয়াছে, তাহা জীবনে ফলিত হইলে আর ভাবনা কি থাকে! আমি ধর্ম্ম-জীবন গঠনের উপযোগী সত্যের কণিকা অন্বেষণ করিয়া ইহার তাহার কাছে বেড়াইব কেন? সেরূপ বিশ্বাস, একাগ্রতা, অকৃত্রিম নির্ভয়ের সহিত সত্যস্বরূপের হাতে আপনাকে দিয়া যদি বলিতে পারি—কাদার তালের ন্যায় আমার হৃদয় তোমার হাতে দিলাম, ইহাকে তোমার মনের মত করিয়া গড়, তাহা হইলে কেমন সুন্দর হয়। কিন্তু সে কত বড় বিশ্বাস ও প্রেমের কথা! সে প্রেম আমার কোথায়? আমার এক একবার এমনি মনে হয় যে, দূর কর্ প্রকৃত বিশ্বাস না পাইলে আর তাঁর কথা বলিব না। বৃদ্ধ দায়ুদ নৃপতির ন্যায় যতদিন না বলিতে পারিব, "প্রভু পরমেশ্বরে আমার নির্ভর, তিনি আমার বর্ম্ম ও দুর্গ, আমি ভয় করিব না,"—ততদিন তাঁহার কথা কাহাকেও বলিব না। সেই সত্যের সত্যে চির বিশ্বাসী ও স্থির বিশ্বাসী হইতে নিতান্ত বাসনা! আমাকে খাওয়াইবার, পরাইবার ভার, আমাকে গড়িবার ভার, আমাকে তাঁহার পথে রাখিবার ভার, আমাকে তাঁহার কাজে নিয়োগের ভার, সকল ভার তাঁহার উপর। এই ভাবটি যতই হৃদয়ে ধারণ করিব ততই জীবন্ত-ধর্ম্ম প্রাণে পাইব।"

প্রার্থনা—"হে সত্যস্বরূপ, হে প্রাণাভিরাম! সত্যই ত তোমার উপর আমার সকল ভার। আমি কেন তাহা দেখিব না? আমি কেন এমন সুখে বঞ্চিত থাকিব? আমাকে ত্বরায় সেই সত্যে বিশ্বাস দাও।"

আর একটি প্রার্থনায় প্রকাশ—"আমাদিগের হস্তে যে আলোক দিয়াছ, তাহা ত তোমার আলোক, আমাদিগকে যে উৎসাহ-বাণী শুনাইতেছ, তাহা ত তোমারই বাণী, তবে আমরা এমন দুর্ব্বল, এমন ক্ষীণ, এমন মলিনভাবে তাহা ধারণ করিতেছি কেন? তোমার সত্যরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমুচিত প্রয়াস পাইতেছিনা কেন? তোমার উপরে বিশ্বাস ও সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার উপরে নির্ভর নাই বলিয়া আমি তোমার চরণে প্রণত হইয়া এই জানাইতেছি, ব্রাহ্ম সমাজকে নবশক্তি দাও। ইহার কার্য্যসকল বর্ষার নদীর ন্যায় ডাকিয়া চলুক। প্রেমের ঘোর আবর্ত্ত উপস্থিত হউক। সেই আবর্ত্ত মধ্যে আমাকে ফেল, আমার জীবন সার্থক হউক।"

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুলাই বিলাতে ডিভাইজেস (Divizes) সহরে থাকা কালীন একটি প্রার্থনায় ব্যক্ত করিয়াছেন—'পতিতপাবন দীনবন্ধু! আমার প্রণতি গ্রহণ কর। তুমি আমার ধর্ম্মজীবনের গুরু। তুমিই আমার উপজীব্য। আমাকে তোমার উপরে একান্তমনে নির্ভর করিতে সমর্থ কর। নিত্য নিত্য নূতন জীবন দিয়া আমাকে তোমার নাম প্রচারের উপযুক্ত কর।'

প্রেমের প্রয়োজন ঃ—কল্য হইতে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিতেছে। বন্ধুবর প্রকাশচন্দ্র রায় একবার আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার সিম্‌প্লিসিটি ও লাভিংনেস (lovinguess) এই দুইটি গুণে তুমি সকলের প্রিয়। আমার সিমপ্লিসিটি কখনও কখনও অতিরিক্ত মাত্রায় যায়, সে জন্য আমি সময়ে সময়ে লজ্জিত হইয়াছি। এই সিমপ্লিসিটি বোধহয় চিন্তাবিহীনতার ফল। যে সিমপ্লিসিটি চিন্তাবিহীনতা ও অসারতা হইতে উৎপন্ন, তাহাকে আমি প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করি না। আমার লাভিংনেস সম্বন্ধে আমার বিশেষ সন্দেহ। আমার প্রেমের শক্তি কম না হইলে, ব্রাহ্মসমাজের কাজ আরও কত হইত। আমার ভাব যেন এই প্রকার, সমষ্টিগত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেম আছে, ব্যক্তিগত ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তেমন প্রেম নাই। এইজন্যই বোধহয়, আমার দ্বারা প্রচুর কার্য্য আশানুরূপ হইতেছে না। আমি প্রেমের সূত্রে ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছি না। সেণ্টপলের জীবনে ইহার বিপরীত ভাব কি সুন্দর। জননী যাহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই শিশুকে যেমন ভালবাসেন, পল তেমনি করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত খ্রীষ্ট-মণ্ডলীগুলিকে ভাল বাসিতেন। এইজন্যই এত কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

আমার এই প্রেমবিহীনতার জন্য ক্ষতি হইতেছে। কার্য্যবহুলতা,

নির্জনবাস ও সাহিত্যালোচনার অভাব নিবন্ধন বোধহয় এইরূপ হইতেছে। জগতে প্রেমের বড় দরকার। বিশেষতঃ সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে লোকের জীবন সংগ্রাম যত কঠিন হইতেছে, ততই হৃদয়ের সরস ভাবসকল শুকাইয়া যাইবার সম্ভাবনা।

আমি ফিরিয়া গিয়া যেরূপে কাজ করিব সে বিষয়ে কতই ভাবিতেছি, কতই যুক্তি করিতেছি। নূতন সঙ্গীত বাঁধিব, নূতন প্রণালীতে উপাসনা ও উপদেশ প্রবর্ত্তিত করিব; নূতন প্রণালীতে প্রচার করিব, ইত্যাদি মনে মনে কত ঘড়ি পাড়িতেছি। কিন্তু প্রেম সকলের মূলে। গড়ের উপরে ব্রাহ্ম-সমাজকে ভালবাসিলে চলিবে না, প্রত্যেক ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকা যিনি আমার সংস্রবে আসিবেন, তাঁহার প্রাণ আমার প্রেম পাইয়া যদি পুলকিত না হয়, তিনি আকৃষ্ট হইবেন না।

কিন্তু কথাই এই, প্রেম কি চেষ্টা-চরিত্র করিয়া পাওয়া যায়? প্রেম কি শিক্ষা-লভ্য? ইহা কি প্রার্থনা দ্বারা পাওয়া যায়? শিক্ষা দ্বারা প্রেমকে প্রস্ফুটিত করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই, শিক্ষার দোষে হৃদয়ের প্রেমের অঙ্কুর সকল বিনষ্ট হইয়া হৃদয় কঠিন হইতে পারে। আমার পক্ষে এখন কর্ত্তব্য কি? হৃদয়কে ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকার সহবাসে দিতে হইবে, যে সকল কার্য্যে প্রেমের প্রকাশ ও চালনা হয় তাহা করিতে হইবে। মনকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদের কল্যাণ চিন্তাতে নিযুক্ত করিতে হইবে।"

এই সম্পর্কে তাঁহার প্রার্থনাও প্রেমের বার্ত্তায় পরিপূর্ণ। "হে প্রেমময়! প্রেমের চক্ষে তোমার জগত সুন্দর! প্রেমের চক্ষে দেখিলে ইহার সকলই মিষ্ট; প্রেমের অভাবে ইহা শূন্য ও প্রাণবিহীন। তুমি আমাকে যে কাজে নিযুক্ত করিয়াছ, তাহাতে প্রেমের বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহাদের প্রতি তোমার প্রেম, সেইজন্যই তাঁহাদের সেবায় আমাকে নিযুক্ত করিয়াছ। তোমার প্রেমাগ্নির দুই এক কণিকা আমাকে দেও। আমি প্রেমে সকলকে আবদ্ধ করি।" (২২।৮।৮৮)

তিনি বিশ্বাস করিতেন, বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থতার আগুন মনের মধ্যে ভাল করিয়া জ্বলিলে সকল আদর্শমূলক কার্য্য সুকর ও সুবিধাজনক হইয়া উঠে। প্রার্থনাশীল ও আত্মদৃষ্টিপরায়ণ হইলে প্রকৃতির ও চিন্তার গভীরতা জন্মে। ধর্ম্মবিশ্বাসী আচার্য্য শিবনাথের ক্ষুদ্র অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রার্থনাবাণীর তুলনা নাই, —"প্রভু হে, আমি তোমারই হস্তে আপনাকে দিতেছি, তোমার সেবার

উপযুক্ত কর আমাকে” [১-৮-৮৮] কিংবা “দীন দয়াময়! আমি কবে আত্ম-গৌরব-স্পৃহাকে তোমার গৌরব স্পৃহার নিকট বলিদান দিব? কবে বলিব তোমার জয় হউক, আমার ক্ষয় হউক।” [২৭-৭-৮৮]। তাঁহার আজীবন সাধনার সমুজ্জ্বল আদর্শ সমপরিমাণে পরিস্ফুট আর একটি আবেগময় প্রার্থনায়,—তিনি বলিয়াছিলেন “হে দীন দয়াল, আমার দ্বারা যদি তোমার কাজ করাতেই চাও, তবে কেন আমাকে সম্পূর্ণরূপে তোমার অনুগত করিয়া লওনা? আমি আর কতদিন তোমাকে মুখে বন্ধু বলিব! একথা জীবনে যাহাতে সত্য হয়, এরূপ কর।”

দেখা যায়, ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তায় তিনি লিখিয়াছেন, ২৭।৭।৮৮ তারিখে—“গতকল্য আমরা একদল ভারতবর্ষীয় লোক মিলিয়া উইনসর ক্যাসল দেখিতে গিয়াছিলাম। পথে যাইতে যাইতে দেবেন্দ্র নাথ মল্লিকের (বাগনানের প্রিয়নাথ মল্লিকের ভাই প্রফেসর ডি, এন, মল্লিক) সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজ বিষয়ে অনেক কথা হইল। ছেলেটি বড ভাল। এবারে ৫০ পাউণ্ডের এক স্কলারশিপ পাইয়াছে। নব-বিধানের প্রতি আমাদের আপত্তি কি তাহা তাহাকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলাম। দেখিলাম সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রিন্সিপ্‌লের (Principle) সঙ্গে তাহার হৃদয়ের মিল। কথায় কথায় তাহাকে বলিলাম, আমাদের দ্বারা পরমেশ্বরের কাজ ভাল হইতেছে না, কারণ আমরা আপনাদিগকে ভুলিতে পারি না। এই কথাটা তারপরে অনেক বার মনে আসিয়াছে; আজ প্রাতেও বার বার মনে হইতেছে। অনেকবার দেখিয়াছি, যখনই প্রকৃত বিনয় হৃদয়ে আসিয়াছে, আত্মগৌরবের স্পৃহা হৃদয় হইতে গিয়াছে, বেতের মত ঈশ্বরের কৃপা-স্রোতের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছি, তখনই তাঁহার কার্য্য আশ্চর্য্যরূপে সুসিদ্ধ হইয়াছে।”

আর একটি প্রার্থনা দৃষ্টান্ত দ্বারা সমুজ্জ্বল, ইহাতেও আছে নির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা, ঈশ্বর-ভক্তির পরিচয়। ঈশ্বরই যেন তাঁর একমাত্র আশ্রয়, অবলম্বন। এই অটুট বিশ্বাস তাঁহার সমগ্র জীবন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রার্থনা—“প্রভো! আমাকে তোমার কাছ ছাড়া হইতে দিও না। তুমি সকল শুভ সঙ্কল্পের চিরপোষক, ইহা নিরন্তর আমার হৃদয়ে উদ্দীপ্ত রাখ; আমি এই বিশ্বাসে আত্ম সমর্পণ করি। শিশু যেমন দুইখানি হাত তুলিয়া উচ্চ স্থান হইতে ঝুপ করিয়া মায়ের কোলে পড়িয়া যায়, আমিও সেইরূপ তোমার ক্রোড়ে পড়ি। আমার সমুদয় ভার তোমার উপরে ফেলি[illegible]

হে অধম-তারণ, আমার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি তোমার হাতের যন্ত্র হইয়া তোমার সত্য-রাজ্যকে বর্ধিত করি, এই আকাঙ্ক্ষা। আমার সহায় হও।" (৭-৮-৮৮)

আত্ম নিবেদন :- বিগত ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুলাই তারিখে পণ্ডিতপ্রবর শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বিলাতে বাস করিবার কালে এইভাবে ধর্ম্মপ্রবণতায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন : "হে পরম প্রভু, হে জীবন-শরণ, আবার প্রাতঃকালে তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমার আশা-ভরসা তোমারই উপরে, আমার সহায়-সম্বল তুমি। আমার প্রতি তোমার এই অপার করুণা যে, আমাকে তুমি তোমার সেবক হইবার জন্য, তোমার কার্য্যে জীবন দিবার জন্য আনিয়াছ। আমি দুর্ব্বল, আমি তোমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই ; এই জন্য তোমার কাজ সমুচিতরূপে করিতে পারি নাই। তুমি আমাকে তোমার সেবার আরও উপযুক্ত করিবে বলিয়াই আনিয়াছ। আমি আশা করিতেছি যে তোমার প্রসাদে আমি আমার পুরাতন শত্রুদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব। আমার অন্তরের শত্রু সকল তোমার বশীভূত হইয়া তোমার নাম প্রকৃতরূপে মহিমান্বিত করিবে। আমার প্রতি যে এত করুণা বর্ষণ করিতেছ আমি তাহার উপযুক্ত কি করিলাম! হে প্রভো! আমি যে একান্তমনে তোমারই আশ্রিত ও অনুগত হইয়া থাকিতে চাই। আমি যে বাস্তবিক আর কিছু চাই না। আমি যে তোমার নাম প্রচারিত হইতে দেখিতে চাই, আমি যে একেবারে তোমার জীবনপ্রদ শক্তির হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতে চাই। কেন আমার এই বাসনা পূর্ণ হইবে না? কেন আমি তোমারই হইব না? আমাকে অর্দ্ধ-বিশ্বাস, অর্দ্ধ-অবিশ্বাস ক্ষণেক আশা, ক্ষণেক নিরাশা এমন অবস্থাতে রাখিও না। আমাকে তোমার চরণে চির জাগ্রত, চির আশাযুক্ত, চির উৎসাহী করিয়া রাখ। আমাকে প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবনে অধিকারী কর। আমি আর কি বলিব!"

শাস্ত্রী-মহাশয়ের বৃহত্তর প্রাণের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তি প্রসূত প্রার্থনাগুলির মধ্য হইতে। উদার দৃষ্টিভঙ্গী, প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের বিশালতা এবং তীক্ষ্ণ চিন্তা শক্তি তাঁহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের আসনে যে বসাইল, তাহার পুণ্যস্মৃতি চিরদিন ঝঙ্কৃত থাকিবে অকপট ও পবিত্র প্রার্থনা সমুচ্চয় মধ্যে :

(১) "হে জীবনদাতা, হে পিতা, তোমারই প্রসাদে তোমাকে জানিবার

ও তোমাকে প্রীত করিবার অধিকার পাইয়াছি। তোমার সকল করুণার শ্রেষ্ঠ করুণা এই যে, আমাদিগকে তোমার নিকটস্থ হইবার অধিকার দিয়াছ, আমাদিগকে পুত্র বলিয়া ডাকিয়াছ। আমরা পাপের কবলে পড়িয়া চিরদিন কষ্ট পাই,—ইহা কখনই তোমার অভিপ্রায় নহে। পাপকে দমন করিয়া তোমার সম্মুখস্থ হই এবং তোমারই পুণ্যালোকে বাস করি ইহাই তোমার অভিপ্রায়। আমাকে তোমার নিকট সর্ব্বদা রাখ, তুমি যে ভাবে আমাকে পুত্র বলিয়াছ, আমি যেন সেইভাবে তোমাকে পিতা বলি।" (১৬।৭।১৮৮৮) অপর একদিন তাঁহার উপাসনার এই প্রকার রূপ ছিল :

(২) "হে দীনশরণ! তুমি আমার পরিবারের পিতা-মাতা। আমার পরিবার পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সাধন করিতে পারি নাই। আমার সাধ্য কুলায় নাই, প্রতিজ্ঞারও শিথিলতা ছিল। আমার পুত্র ক্রমেই যৌবনের কণ্টকময় পথে পদার্পণ করিতেছে। এই ভয়াবহ সময়ে তুমি তাহার চিত্তকে ধর্ম্মের দিকে, সাধুতার দিকে তোমার দিকে আকৃষ্ট কর। তাহার জন্মদিবসে তোমার চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি।" (২৭শে জুন, বুধবার, লণ্ডন)

(৩) "হে প্রভো! তুমি আমাকে যে শক্তি, যে সুবিধা দিয়াছিলে, তাহার সমুদয় কি তোমার কাজে লাগাইতে পারিয়াছি? আমার মানসিক সমুদায় শক্তির তো বিকাশ হয় নাই। সকল শক্তি তো নিয়োগ করা হয় নাই। ক্রমে শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয় সকলেরও বল ক্ষয় হইতেছে। সন্ধ্যা না আসিতে আসিতে আমাকে একবার নববলে বলী কর, নব অগ্নি হৃদয়ে আনিয়া জ্বালিয়া দেও। সময় থাকিতে থাকিতে একবার সকল শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তোমার সেবা করি।" (১৪।৭।৮৮)

শাস্ত্রী মহাশয় ছিলেন মহাপ্রাজ্ঞ, সুধী, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচারক। সে কারণ তাঁহার রচনা ও চিন্তাধারা ঈশ্বর-নির্ভরতা ভগবদ্ভক্তিতে নিবিড় ভাবে পরিব্যাপ্ত।

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রমে সরস্বতীপূজা ঃ—বিগত ১০ই মাঘ, ১৩৬৪ (২৪শে জানুয়ারী, ১৯৫৮) নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিবারের মত শান্ত ও গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে সরস্বতী পূজা করে। কিন্তু এবারের পূজার আরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। নরনারায়ণ আশ্রমে প্রতিবারই আশ্রমদেবতা শ্রীনিত্য-গোপাল দেবের পূজার সহিত শ্রীশ্রীসরস্বতীর পূজা হইয়া সরস্বতীর পূজার অর্থ ও তাৎপর্য শ্রীমৎ স্বামীজী কর্তৃক আলোচিত হয়। পূজা লইয়া যে হৈচৈ গোলমাল ও তামসিকতা, তাহা সে চিরদিন তত্ত্ব দ্বারা ও তাহার ব্যবহার-দ্বারা প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। এবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে, এবারে নরনারায়ণ আশ্রম-সঙ্ঘ পরিচালিত নরনারায়ণ গ্রন্থাগার, মহিলা শিল্পশিক্ষাকেন্দ্র ও বয়স্ক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠক ও ছাত্রীদের লইয়া এই অনুষ্ঠান একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মহিলা শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে সমাজের সকল স্তরের মেয়েরা থাকিলেও বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রের মেয়েরা বলা যাইতে পারে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর। এই সকল মেয়েদের লইয়া একটী পূজার অনুষ্ঠান কেবল অভিনব নয়, সমস্ত অনুষ্ঠানটী প্রথম হইতে শেষপর্যন্ত যেরূপ হৃদ্যতার মধ্য দিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা এইসকল সুযোগ ও শিক্ষাবঞ্চিত মেয়েদের পক্ষে বিশেষ শিক্ষামূলক হইয়াছিল।

পূজার স্থানটুকু সুন্দর অথচ জাঁকজমকহীনভাবে সাজান হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও ইউরোপের মানচিত্র ঝুলান হইয়াছিল—গ্লোব একটী সামনে রাখা হইয়াছিল। সরস্বতী মূর্তির দুইপাশে মেয়েদের বই শ্লেট দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের মেয়েরা দুইজন সুন্দর ভাবে আলপনা দিয়াছিল। সকল মেয়ে আলপনা দিতে জানে না—তাহারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে। আশ্রমেরই একটী ছেলে বিধিমার্গানুযায়ী সরস্বতীপূজা ও আরতি করিলে বেলা ঠিক এগারটায় একটী ভারতীবন্দনা সঙ্গীত গাওয়া হয়। ইহার পর শ্রীমৎ স্বামীজী সরস্বতী পূজার অর্থ ও তাৎপর্য মেয়েদের সহজভাবে বুঝান। স্বামীজী দুঃখ করিয়া বলেন যে, বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে এত সরস্বতী পূজা হয়

কিন্তু সরস্বতী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তো কেহ ছাত্র-ছাত্রীদের শিখাইয়া দেন না। বয়স্ক শিক্ষার মেয়েরা এই বুৎপত্তি না বুঝিলেও অপর যাহারা উপস্থিত ছিলেন—নরনারায়ণ গ্রন্থাগারের কয়েকজন পাঠক ও আশ্রমের সর্বাপেক্ষা কাছের প্রতিবেশী শ্রীযুত কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক এবং আশ্রমের ছেলেমেয়েরা উপস্থিত ছিলেন—তাঁহাদের নিকট বলেন। সরস শব্দের উত্তর বতুপ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ সরস্বতী। সরঃ আছে যাহাতে, যে শক্তিতে। সরঃ অর্থ সরোবর, সরোবরের জল (রস)। সরস্বতী রসের দেবী—জীবনের রসক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াও কি করিয়া ছন্দ-পতন না হইতে পারে, সরস্বতী আমাদিগকে তাহাই শিখাইবেন। এই সরস্বতী পূজার দিন হইতেই বসন্ত আরম্ভ হইল—শীতের প্রকোপ হইতে দেহমন মুক্ত হইয়া আজ হইতে জীবনে বসন্তের আমেজ সুরু হইবে। মেয়েদের উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীমৎ স্বামীজী বলেন, সরস্বতীকে আমি দেবী রূপে দেখিতে চাই না, আমি চাই মাটীর পৃথিবীর ঘরে ঘরে নারীর মধ্যে সরস্বতীর প্রকাশ দেখিতে। তোমরা আজ লেখাপড়া এবং শেলাই শেখার যে সুযোগ পাইয়াছ, তাহা তোমাদিগকে সরস্বতী হইবার সুযোগ দিয়াছে—তোমরা নিজের শক্তিতে এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া আগাইয়া চল। তোমরা সমাজের নিকট হইতে এ সকল সুযোগ এতদিন পাও নাই—কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্র আজ সে সুযোগ তোমাদিগকে দিয়াছে। তোমরা লেখাপড়া শেখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হও—ইহাই আমার ইচ্ছা। কেমন করিয়া চলিলে, কেমন করিয়া কথা বলিলে, কেমন করিয়া খাইলে, কেমন করিয়া সাজগোজ করিলে তাহা সরস্বতীর মত হয়—তোমরা সর্বদা তাহা মনে রাখিয়া চলিবে। তোমাদের জীবন শুভ্র হউক, তোমরা সরল হও, অকপট হও। হৈচৈ গোলমালের মধ্য দিয়া সরস্বতী পূজা হয় না, শান্ত আবহাওয়ার মধ্যে মায়ের কাছে নিজের কথা বল, মায়ের মত হইবার সংকল্প গ্রহণ কর।

ইহার পর আশ্রম-সেক্রেটারী মেয়েদের কিছু বলেন—তাহা এইরূপ—

আজ আমরা সরস্বতী পূজা করিতেছি। কোন কাজ করিলে তাহার অর্থ বুঝিতে হয়। এই যে আমরা পূজা করিতেছি, ইহার অর্থ কি? সরস্বতীকে পূজা করিয়া আমরা কি পূজা করি? সরস্বতী পূজা করিতে হইলে আমাদিগকে কিরূপ হইতে হইবে? পূজা করিয়া আমরা কি হইব?—এ সকল তোমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

সরস্বতী হইতেছেন বিদ্যা—ভগবান বিষ্ণুর শক্তি দুইটী—লক্ষ্মী ও বিদ্যা। যে ভগবান সকলের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুর শক্তি এই বিদ্যা লাভ করিতে হইবে। লিখিতে পড়িতে শিখিলেই কিন্তু বিদ্যা লাভ হয় না। বিদ্যা লাভ হইবে তখনই যখন সকলের সঙ্গে মিলিতে পারিব, সকলকে ভালবাসিতে পারিব, সকলের সঙ্গে ভেদ দূর হইবে। তখনই বিদ্যা লাভ হইবে যখন আমরা বিনয় শিখিব, মানুষকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে শিখিব। এই বিদ্যা লাভ হইলেই আমরা বিষ্ণুর অপর স্ত্রী লক্ষ্মীকেও লাভ করিতে পারিব। সত্যিকারের বিদ্যা লাভ হইলেই সহজেই লক্ষ্মীকে পাওয়া যায়। এ লক্ষ্মী ধনীর লক্ষ্মী নহেন। অপরকে বঞ্চিত করিয়া ধনী যে লক্ষ্মীকে একদিন লাভ করিয়া আসিতেছিল, বর্ত্তমান জগতে তেমন লক্ষ্মী আর লক্ষ্মী নহেন—কেননা ধনীর সে লক্ষ্মী ধনীর সর্বনাশ আনিয়াছে। আজ সেই লক্ষ্মী লাভ করিতে হইবে যে লক্ষ্মী বিদ্যার সঙ্গে একত্র থাকিতে পারেন।

যাহারা আজ এই আশ্রমে বিদ্যা লাভ করিতে আসিতেছ, তাহারা সেই সত্যিকারের বিদ্যা লাভ করিও, যাহা তোমাদিগকে বিনয়ী করিবে, যে বিদ্যা লাভ করিয়া তোমরা অপরকে আপন করিতে শিখিবে, প্রত্যেক মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিবে। এই জন্যই আজ সরস্বতী পূজা। তোমাদিগকে সরস্বতী হইতে হইবে। আমরা যদি নিজেদের সব দিক দিয়া সুন্দর না করি, নিজেদের বড় না করি—তাহা হইলে সরস্বতী পূজা করিবার অধিকার আমাদের থাকিবে না। যাহার পূজা করিব, তাঁহার মত হওয়ার চেষ্টা করাকেই পূজা বলে। সরস্বতীকে পূজা করিলে আমাদের কি হইতে হইবে, তাহা বলিলাম—তোমরা সর্বদা সে কথা মনে রাখিও।

লেখাপড়া শিখিলে তোমরা হয়তো কোনদিন পয়সা রোজগার করিতে পারিবে—এ বুদ্ধি লইয়া লেখাপড়া শিখিও না। মানুষের মত মানুষ হইতে হইলে আজিকার দিনে সত্যিকারের লেখাপড়া শিখিতে হইবে। তোমরা মানুষ হইবে, এই বুদ্ধি লইয়া লেখাপড়া শিখিও—তাহা হইলেই সরস্বতী পূজা করা সার্থক হইবে। মানুষকে ভগবান অনেক বড় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—আমরা যে কত বড়, দেশ বিদেশের মানুষের কথা জানিলে সে কথা আমরা বুঝিতে পারিব। আজ আমরা কোথায় আছি, কেন এ অবস্থায় আছি, আমরা কি হইতে পারি, আমাদের দুঃখদুর্দ্দশা কি রকম করিয়া ঘুচিতে পারে, এ সকল জানিতে বুঝিতে ও করিতে হইলে আমরা যতটুকু আছি,

তাহা হইতে আমাদিগকে বড় হইতে হইবে। সেই বড় হওয়ার জন্য লেখা পড়া শেখা আমাদের বিশেষ দরকার। বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন লোকে কেমন করিয়া নিজেদের দুঃখ কষ্ট দূর করিয়াছে, এই সকল জানিতে পারিলে আমরা শক্তি লাভ করিব, আমাদের সমস্যা লইয়া শুদ্ধভাবে ভাবিতে পারিব। এই সমস্ত নানা কারণে লেখাপড়া করা দরকার। আজ এই সরস্বতী পূজার দিনে তোমরা বিদ্যা লাভ করিবার সংকল্প লও। বড় হওয়া অর্থ কিন্তু টাকাপয়সা জামাকাপড় গহনায় বড় হওয়া নয়। বড় হওয়া অর্থ সত্যকার বিদ্যা লাভ করিয়া বড় হওয়া —বিনয়ী হওয়া, শ্রদ্ধাবান হওয়া, মানুষকে ভালবাসিতে পারা—বড় হইতে হইবে এই সব ক্ষেত্রে। তোমরা এতদিন বিদ্যালাভ করিবার সুযোগ পাও নাই, দেশের স্বাধীনতা না হইলে পাইতেও না কোনদিন—আজ এই স্বাধীন ভারতবর্ষে তোমরা যে সুযোগ পাইয়াছ, তাহার সদ্ব্যবহার কর—তোমরা সত্যিকারের বিদ্যা লাভ কর। তাহা হইলেই সরস্বতী পূজা করার অর্থ হইবে। পূজা কেবল কতকগুলি আচার নয়—ঘণ্টা নাড়িয়া ফুলবেলপাতা দিলেই পূজা হয় না—যাহার পূজা করিবে তাহার মত হইবার চেষ্টা করাই পূজা করার অর্থ। তোমরা তেমনই হইবার চেষ্টা কর—আজিকার দিনে সেই সংকল্প তোমরা গ্রহণ কর।

সরস্বতীমূর্ত্তির সঙ্গে নরনারায়ণ আশ্রমের দেবতা শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের প্রতিমূর্ত্তি তোমরা দেখিতে পাইতেছ। এই শ্রীনিত্যগোপালই বিষ্ণু—তাঁহাকে সেইভাবেই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ পাইয়াছেন। তাঁহারই শক্তি সরস্বতী। তোমরা শ্রীনিত্যগোপালকে প্রণাম করিও।

ইহার পর মেয়েরা ও অপর সকলে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অঞ্জলি প্রদান করে। পরে সরস্বতীর নিকট খিচুরী শাকতরকারী পায়েস ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়। মেয়েরা সকলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্রীমৎ স্বামীজী নিমন্ত্রিত বলিয়া মেয়েদের পাতা ফেলিতে নিষেধ করেন। ইস্কুলের প্রায় সকল মেয়েই উপস্থিত হইয়াছিল। মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ খই-বাতাসা কুল আনিয়া সরস্বতীর ভোগের জন্য দিয়াছিল। আর প্রায় প্রত্যেকেই অঞ্জলি দিয়া অন্ততঃ দুই এক পয়সা করিয়া দক্ষিণা দিয়াছে। মেয়েদের নিকট হইতে এই অনুষ্ঠানের জন্য কোন চাঁদা লওয়া হয় নাই। আপন জনের মত তাহাদের সঙ্গে এক হইয়া নরনারায়ণ আশ্রম সরস্বতী পূজা করিয়াছে।

'One forward step is something gained'

—"Sabitri"

॥ শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ॥

যতটুকু হেঁটে যাই ততটুকু পাই এ জীবন।
যাই খুঁজে খুঁজে দিশা হৃদয়ের আলোক সংকেতে,
অনন্ত চলার পথে কোনদিন যদিই না থাকে
শেষ,
তবু চলে যাওয়া শুধু,—
যেতে পারা প্রাণের উত্তাপে
পথচলা চলার আনন্দে,—
—বাঁচা পূর্ণ এ' জীবন।
সঙ্কীর্ণ সীমার বন্ধ রুদ্ধ করে প্রাণ।
বরং অশঙ্কগতি দ্বিধাহীন আপন উচ্ছ্বাসে
প্রস্তর-কঠিন পথ ভেঙ্গে ভেঙ্গে চলা,—
নির্ঝরের প্রমত্ত আবেগে
পূর্ণতার পথে
নিত্য গতির অমৃতে।
তাই দেখি উজ্জ্বল মাধুর্য্য সূর্য্যে
নিরুদ্বেগ উত্তাপ-প্রাচুর্য্য;
পৃথিবীর বহু পরিবর্তনের অনন্ত সৃষ্টিতে
অসঙ্কোচ আনন্দের দানে।
এ' জীবন চলার অমৃতে।

শ্রীরেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩/১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

ফাল্গুন, ১৮৭৯ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

ধন কাহার? শ্রম কাহার?

॥ সম্পাদক ॥

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্॥ ঈশোপনিষৎ

—'এই সমগ্র জগৎ হইতে জীবের মন-বুদ্ধি দ্বারা টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া বাহির করা (carved out) আপোষহীন বিচ্ছিন্ন অনন্ত জগৎকে প্রাণেশ পুরুষোত্তম দ্বারা বাসিত করিয়া লইবে, পুরুষোত্তমের বাসস্থানরূপে সমগ্ররূপে গড়িয়া তুলিবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রাখিয়া নিজের ভোক্তৃত্বের কবল হইতে জগতের প্রতিটি বস্তুকে মুক্তিদান করিয়া (ত্যক্তেন) ভোগ করিও (ভুঞ্জীথাঃ)। লোভ করিও না। ধন কাহার? শ্রমসম্পদ কাহার?'

ধন ধনিকের নয়, শ্রম-ধনও শ্রমিকের নয়। ধন পুরুষোত্তম-সম্পদ ও বিশ্ব-সম্পদ; শ্রমও পুরুষোত্তম-সম্পদ, বিশ্ব-সম্পদ। কিন্তু রাগদ্বেষ-দ্বন্দ্বমূঢ়, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা এতদিনকার ধনিক (capitalist) 'আমি ভোক্তা' সাজিয়া ধন-ভোগের জন্য ছুটিয়াছে। ইহাই ছিল 'thesis'। ইহার 'antithesis'-এ বর্ত্তমান যুগের শ্রমিকবৃন্দও 'আমি কর্ত্তা' সাজিয়া শ্রমকে ভোগ করিবার জন্য দুনিয়ার মজদুরদের আহ্বান করিয়াছে, ধনিকদের চূর্ণ করিবার জন্য জেহাদ ঘোষণা করিয়াছে। ধন ও শ্রম, ধনিক ও শ্রমিক আজ রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত।

এই সঙ্ঘর্ষের ফলে দুই-ই রক্তমোক্ষণ করিতে করিতে মরিবে, বিশ্বকেও মারিবে। ধনকে 'মম' (আমার) মনে করিয়া ভোগ করিতে গিয়া যে ভুল ধনিক করিয়াছে, শ্রমিকও 'শ্রম'কে তাহাদের ব্যক্তিগত মনে করিয়া সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত থাকিয়া সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। দুই-ই সমানভাবে

'কামাত্মা'। 'জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশন' কাম দুইকেই পাইয়া বসিয়াছে। প্রত্যেকেই বলে 'আমিই সমাজ'। অথচ ধনিক ছিল সমাজের এক অংশ এবং শ্রমিক ছিল সমাজের অপর অংশ। ধনিক চায় নিজেই সমগ্র সমাজ বনিয়া গিয়া অপর অংশকে নিজের মধ্যে মুছিয়া ফেলিতে, শ্রমিককে কুক্ষিগত করিতে। শ্রমিকও বিশ্বনাথের বিশ্বে ধনের সঙ্গে সমান মর্যাদা দাবী করে, ধনিককে কুক্ষিগত করিয়া নিজেকেই সমগ্র সমাজ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। ধনের বুকে যেমন পুরুষোত্তমের স্ব-গুণ আছে, শ্রমের অন্তরেও তেমনি পুরুষোত্তমের স্ব-গুণ রহিয়াছে। দুইয়েরই আত্ম-কথা আছে। এতদিন ধন ছিল মুখর, আর শ্রম ছিল মূক। কিন্তু আজ মূক শ্রমের মুখেও কথা ফুটিয়াছে। পুরুষোত্তম 'মূকং করোতি বাচালম্'। শ্রম ও শ্রমিকের ম্লান মূক মুখে পুরুষোত্তম আজ ভাষা দিয়াছেন। কিন্তু কামাত্মা ধনিকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়া শ্রমিকও আজ কামাত্মা। কামুকের স্পর্শে ধন ও শ্রম দুই-ই বিষাক্ত।

ত্যাগ না করিয়া ভোগ করিতে গেলে এমনি হয়। চক্ষু যখন রূপকে, কর্ণ যখন শব্দকে, নাসিকা যখন গন্ধকে, জিহ্বা যখন রসকে, ত্বক যখন স্পর্শকে 'আমার' করিয়া ভোগ করিতে চায়, তখন রূপাদি নিজের অন্তরের পুরুষোত্তম-গুণ মানুষের কাছ হইতে গোপন করে; সব তখন বিষাক্ত হইয়া যায়। রামের সীতাকে যখন রাবণ ভোগের জন্য চুরি করিল, ভোগ করিবার জন্য বলের আশ্রয় গ্রহণ করিল, তখন রামের লক্ষ্মী রাবণের কাছে অলক্ষ্মী হইলেন। যাহার ফলে 'এক লক্ষ পুত্তুর আর সওয়া লক্ষ নাতি, একজন না রহিল বংশে দিতে বাতি'। এমনই হয়। ভোগের পথই মরণের পথ, বংশ-লোপের পথ; ত্যাগই অমৃত, ত্যাগেই বংশ-রক্ষা। বিশ্ববাসীর সঙ্গে সম-ভোগ না করিয়া, ধনের অন্তর্নিহিত বিশ্বনাথের 'seal' মুছিয়া ফেলিয়া এবং উহার উপরে ধনিকের শিল-মোহর অঙ্কিত করিয়া ভোগ করিতে গিয়াই না রাশিয়ার Czar নিজের মরণ ডাকিয়া আনিয়াছে? যে পাপে Czar মরিয়াছে, শ্রমকে 'ভোগ করিতে যাইবার' সেই একই পাপে শ্রমিকও মরণের দিকে ছুটিয়াছে। কাম যেমন ধনিককে মরণের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে, শ্রমিককেও তেমনি মরণের পথে সে ঠেলিয়া দিতেছে। বিশ্বনাথের দৃষ্টিতে বা বিশ্বের দৃষ্টিতে দুই-ই সমান অপরাধে অপরাধী।

ধন ও শ্রম কিছুই private বা public নয়। Private-Public-ভেদই মনঃকল্পিত, এবং কাম 'মন' হইতেই জাত। তাই কামের নাম

'মনোজ'। 'মনের' লক্ষণ ন্যায়দর্শন দিতেছে—'যুগপজ্‌-জ্ঞানানুৎপত্তিঃ মনসঃ লিঙ্গম্‌'। মন কখনও knowledge of simultaneity (যৌগপদ্যের জ্ঞান) উপলব্ধি করাইতে পারে না। মন Either—or'-এর ভাষায় কথা কয়। মনের ক্ষেত্রে ধন বা শ্রম হয় private হইবে, নয় public হইবে। ধনিক জোর দিয়াছে 'private property'-র উপর, যাহাকে কম্যুনিষ্টগণ বলেন 'bourgeois property'। কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেস্টো (manifesto) বলে, 'Communism can sum up their theory in the pithy phrase: the abolition of private property.' 'In a word, you accuse us of wanting to abolish *your* property. Well, we do !'—Manifesto.

মানুষের দ্বন্দ্বমোহবিদ্ধ মনই ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ধনের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের মাঝে সঙ্ঘর্ষ বাধাইয়া দিয়াছে। ব্যষ্টি-সমষ্টির ঝগড়ার নিষ্পত্তি করিতে হইলে চাই ব্যষ্টি-সমষ্টির L. C. M., সমগ্রের স্তরে ব্যষ্টি-সমষ্টিকে উন্নীত করা। সমগ্রের মাঝে ব্যষ্টি-সমষ্টি দুই-ই দুইয়ের পরিপূরক (complementary), অথচ দুইয়ের স্বতন্ত্র সত্ত্বাও সেখানে বর্ত্তমান। ব্যষ্টিকে ভাঙ্গিয়া সমষ্টি হয় না, কিম্বা ব্যষ্টিগুলির যোগফলেও সমষ্টি বাহির হয় না। অনন্ত ব্যষ্টির যোগফলও ব্যষ্টিই—তাহা যতই বড় হউক না কেন। সমাজের ব্যষ্টিগুলি যখন সমগ্রের স্তরে সমষ্টির ভাবে transformed (রূপান্তরিত) হয়, তখন ব্যষ্টি ব্যষ্টি থাকিয়াও সমগ্র হয়। মায়ে ঝিয়ে আলাদা মঙ্গলবার হয় না। একই জীবন্ত বিশ্বে ধনিকের মঙ্গল ও শ্রমিকের মঙ্গল একই। বিশ্বনাথের অভিধানে 'দুঃখ মানে সুখ রে'। এই অভিধানে বিশ্বের মঙ্গলে প্রত্যেকের মঙ্গল, প্রত্যেকের মঙ্গলে বিশ্বের মঙ্গল। প্রতি মানুষের মধ্যে যখন সমগ্র-মানুষটী জাগিয়া উঠিবে, তখন প্রতিটী মানুষ দেখিবে যে, সে যুগপৎ Self-life ও Cosmic life। 'Spiritual life is at the same time a self life and a cosmic life.'—Eucken. সে যুগপৎ কর্ম্মী মানুষ, জ্ঞানী মানুষ, ভক্ত মানুষ　প্রতিটী মানুষের মধ্যেই তো কর্ম্মী মানুষ, জ্ঞানী মানুষ ও ভক্ত মানুষ, শ্রমিক মানুষ ও ধনিক মানুষ ঘুমাইয়া আছে। ধন ও শ্রম তো একই মানুষের দুইটী সমান শক্তি (force). কোনও মানুষের মধ্যেই একান্ত শ্রমিক বা একান্ত ধনিক বলিয়া কিছু নাই। আজ সারা বিশ্বে সকল উপাধি, সকল আবরণ, সকল ব্যষ্টি ও সমষ্টির খোলস

পরিত্যাগ করিয়া সত্য-মানুষ বাহির হইতে চাহিতেছে। মানুষের ‘ধনিক’-হওয়া ও ‘শ্রমিক’-হওয়া দুই-ই উপাধি। ধনিকের উপরেও ‘মানুষ’, শ্রমিকের উপরেও মানুষ।

শুনহে মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
ইহার অধিক নাই।’—চণ্ডীদাস

ধনিক-শ্রমিক, কর্ম্মী-জ্ঞানী-ভক্ত, bourgeois-proletariet, স্ত্রী-পুরুষ, কুলীন-অকুলীন, শোষক-শোষিত সকলের কাছেই ডাক আসিয়াছে ‘মানুষ হও’। মানুষ ধনিকেরও উপরে, শ্রমিকেরও উপরে, বুর্জ্জোয়ারও উপরে, প্রোলেটা-রিয়েটেরও উপরে, কর্ম্মীরও উপরে, জ্ঞানীরও উপরে, ভক্তেরও উপরে। অখণ্ড মানুষই অনন্ত পরিচ্ছিন্ন মানুষের L. C. M.। ধনিক-শ্রমিকের সঙ্ঘর্ষ ‘মানুষ’ বেশীদিন বরদাস্ত করিবে না। ধনিকের ‘আমি’ ও ‘আমার’ শেষ হইয়াছে, শ্রমিকের ‘আমি’ ও ‘আমার’-ও বেশীদিন আর চলিবে না। ‘On earth one family’ প্রতিষ্ঠিত হইবার দিকে প্রেরণা আসিয়াছে, তাই বিশ্বে এক মানব-পরিবারই গড়িয়া উঠিতে চাহিতেছে। ধনিক-শ্রমিক একই সমগ্রের ‘two halves’। ধনিক যখন ধনের লোভে ‘pushed to extreme’ হইয়াছিল, তখন প্রকৃতির স্বাভাবিক antithesis-এ আবার শ্রমিকও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে ‘pushed to extreme’ হইয়া মরণের বীজ বুনিতেছে। এই নানা-দর্শনের ফলে, অসহ্য-দর্শনের ফলে দুইয়েরই বিশ্বে ধন-ক্লৈব্য ও শ্রম-ক্লৈব্য নামিয়া আসিবে কিম্বা নামিয়া আসিয়াছে প্রায়। এই মরণ-ঘন ক্লৈব্যের বুক চিরিয়া ধন-শ্রমের মেদে গড়া নূতন মেদিনীতে নূতন করিয়া ধনিক-শ্রমিকের synthesis প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাই হইবে পারস্পরিক পোষণময় পুরুষোত্তম-রাজ্য।

ধন বা শ্রমকে আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য ব্যবহার করা চলিবে না। ‘your’ বা ‘mine’-এর ভাষা ভুলাইতেই তো কম্যুনিষ্টরা চাহিতেছেন। আমরাও তাই চাই। আমরা your-কে সর্ব্বার্থে তুলিয়া দিতে চাই। ‘your’ বা class-গত collective ‘your’ বা ‘mine’ বিশ্বে চলিবে না। ভোগ-দৃষ্টি থাকিলেই ‘আমি-আমার’, ‘তুমি-তোমার’ এই ভাষা বুদ্ধিমান মানুষ প্রয়োগ করে। বিশ্ববাসী প্রতিটী আত্মা আজ হইবে কর্ম্মের সেবক, শ্রমের সেবক, ধনের সেবক, জ্ঞানের সেবক, ভক্তির সেবক। ‘আমি’ যেমন

স্বতন্ত্র, 'ধনও' তেমনি স্বতন্ত্র, 'শ্রমও' তেমনি স্বতন্ত্র। কাহাকেও কেহ একান্ত-ভাবে স্বার্থসিদ্ধির উপায় (instrument) রূপে ব্যবহার করিতে পারিবেনা। কর্ম্ম বা শ্রমের 'মালিক' হইলেই 'আমি' বুর্জ্জোয়া হইব। এই দৃষ্টিতে কম্যুনিষ্টরাও বুর্জ্জোয়া। শ্রম-সেবক, কর্ম্ম-সেবক ও ধন-সেবকই শুধু শোষণ (exploit) করে না। মানুষ কর্ম্ম-করা বা কর্ম্ম না-করার একান্ত মালিক নয়। কর্ম্মও যেমন মানুষের অধীন, মানুষও তেমনি কর্ম্মের অধীন। কর্ত্তৃ-নিরপেক্ষ কর্ম্মের মূল্য, শ্রমিক-নিরপেক্ষ শ্রমের মূল্য পুরুষোত্তম স্বীকার করিয়াছেন।

শত্রুর্মিত্রমুদাসিনঃ কর্ম্মৈব গুরুরীশ্বরঃ।
তস্মাৎ সম্পূজয়েৎ কর্ম্ম স্বভাবস্থঃ স্বকর্ম্মকৃৎ॥ ভাঃ ১০।২৪।১৭-১৮

বর্ত্তমান যুগ 'ভক্তি'র (decentralisation) যুগ। এই ভক্তির যুগে ধন, শ্রম, কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, সব কিছুর বিকেন্দ্রীকরণের প্রেরণা আসিয়াছে। ধন-সেবা, শ্রম-সেবা করিতে গেলেও সঙ্ঘ গড়িতে হয়। শ্রম যদি centralised হয়, তাহাও শোষণ করিবে। একান্ত শ্রমিক-সঙ্ঘ রচিত হইলেও তাহা বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তিই সৃষ্টি করিবে। ধনিক যে-হেতুতে বুর্জ্জোয়া-পদবাচ্য হইয়াছে, শ্রম যদি centralised হইয়া ধনিকের উপর চাপের সৃষ্টি করে, তবে তাহাও শ্রমিককে বুর্জ্জোয়া করিয়া তুলিবে। কেন্দ্রীভূত force-ই ভারতবর্ষে 'শক্তি' পদ-বাচ্য, আর বিকেন্দ্রীভূত শক্তিই 'ভক্তি' পদ-বাচ্য। আমার—বা আমাদের, তোমার বা তোমাদের বলিয়া ধন বা শ্রমকে নিজ প্রয়োজনপূরণের কাজে লাগাইতে গেলেই তাহা বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিবে। 'আমার ধন' বা 'আমার শ্রম' এই ভাষা প্রয়োগ না করিয়া শিখাইয়া দেও 'ধনের আমি' বা 'শ্রমের আমি' এই ভাষা প্রয়োগ করিতে। ধনের সেবা করিয়াই ধনিককে ধন উপার্জ্জন করিতে হইবে, শ্রমের সেবা করিয়াই শ্রমিককে বিশ্বসেবায় শ্রমকে লাগাইতে হইবে, জ্ঞানের সেবা করিয়াই জ্ঞানী হইতে হইবে, ভূমির সেবা করিয়াই ভূপতি হইতে হইবে।

'রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আশে'—চণ্ডীদাস

ব্রিটিশ যদি ভারতের 'ভজনা' করিত, সেবা করিত, এমন করিয়া ভারত তাহার হাতছাড়া হইত না। জমিদার যদি জমির সেবা করিত, জমিদারী তাহার রাষ্ট্রায়ত্ত হইত না। লক্ষ্মীর সেবা করিয়াই বিষ্ণু লক্ষ্মী-পতি। ধনের সার্থক সেবা করিয়াই, ধনের পুরুষোত্তম-দেওয়া মর্য্যাদা প্রদান করিয়াই তবে মানুষ

ধনপতি হইবে। ধনের উপর বা শ্রমের উপর বলাৎকার করিয়া কেহই ভবিষ্যৎ বিশ্বে ধনিক বা শ্রমিক হইতে পারিবে না। ধন একটী শক্তি, শ্রমও একটী শক্তি। শক্তির মর্য্যাদা ক্ষুন্ন করিয়া তাহাকে নিজের প্রয়োজনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিলেই তাহা বিষাক্ত হয়, তখনই সেই বিষাক্ত শক্তি মানুষের উপর প্রতিহিংসা লয়। তখন ধন-বিকার ধনিকের ধ্বংস আনে, শ্রমিকেরও শ্রম-বিকার আসিয়া শ্রমিককে রসাতলে ডুবাইয়া দেয়। এই বিশ্ব-শক্তিই মানুষকে চ্যালেঞ্জ করিয়া চণ্ডীতে শুনাইয়া গিয়াছেন, 'যো মাং জয়তি সংগ্রামে···স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি'—যে আমাকে সংগ্রামে জয় করিবে সে-ই আমার পতি হইবে। ভোগের পথে ধন-শক্তি বা শ্রম-শক্তি—তাহা ব্যক্তিগতই হউক আর সমষ্টিগতই হউক—কাহাকেও জয় করিবার সম্ভাবনা নাই। শক্তির পতি হইবার লালসাটুকু আছে; অথচ জয়ের কৌশল জানা নাই—শুম্ভ-নিশুম্ভের মত শক্তির হাতে নির্লজ্জ মরণ মরিতে হইবে। যাহারা নিজেদের শক্তি সেবায় নিয়োগ করে, তাহাদের শক্তিই অফুরন্ত কৃপায় অমৃতের অধিকারী হয়। বিকেন্দ্রীভূত ধনশক্তি বা শ্রমশক্তি অমৃতরূপা। চাই শুধু ধনের বিকেন্দ্রীকরণ, শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণ। এই বিকেন্দ্রীকরণের মন্ত্র জপ করিয়াই ধনিক-শ্রমিকের ধন ও শ্রম পরস্পরের মধ্যে সহজভাবে ছড়াইয়া পড়িবে। এই বৈপ্লবিক দর্শন বিশ্বের বুকে বাতাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হইতেছে।

ধনের যিনি শক্তি, তিনিই শ্রমেরও শক্তি। দুই-ই এক মহাশক্তির দ্বিধা প্রকাশ মাত্র। ধন যোগায় জীবনে স্থিতির ভাব, শ্রম জোগায় গতির রস। ধন শ্রম যখন idependent ও interdependent হইয়া মানুষের ভক্তিময় জীবনের ভিতর দিয়া বিশ্বসেবায় প্রযুক্ত হইবে, তখনই আমরা সমগ্র মানুষ হইব। ধনে ধান্যে বিশ্ব ভরিয়া উঠিবে, শ্রমের মাধুর্য্যে আমরা পরাগতি লাভ করিব। তখনই হইবে ধন-তন্ত্র ও শ্রম-তন্ত্র দুইয়েরই প্রতিষ্ঠা। পুরুষোত্তম-তন্ত্রের মধ্যে এতদিনের ধনিকের স্বপ্ন ও শ্রমিকের শ্রমিক-রাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তব রূপে উদ্ভাসিত হইবে। আজ বিশ্ববাসীর কাণে কাণে উপনিষদের এই মন্ত্র শুনাও,—

'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্।'

'মা গৃধঃ মা গৃধঃ'—লোভ করিও না, লোভ করিও না। লোভ করাই বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি। ধনে লোভই হউক, শ্রমে লোভই হউক, কর্ম্মে জ্ঞানে

ভক্তিতে লোভই হউক, স্ত্রী-পুত্র-কন্যায় লোভ হউক, সংসার বা সন্ন্যাসে লোভই হউক—সবই বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি। ভোগ-মনোবৃত্তিই বুর্জ্জোয়া মনোবৃত্তি। ধনই ভোগ কর, কিম্বা শ্রমই ভোগ কর—সবই বুর্জ্জোয়া-মনোবৃত্তি। 'ভুজ্' ধাতুর স্থানে বসাও 'ভজ্'-ধাতু। 'ভজ্ সেবায়াম্'। ধনের সেবা কর, শ্রমের সেবা কর, রাজ্যের সেবা কর, বিশ্বের সেবা কর—বিশ্বপতি ইহাই চান। বিশ্ব শান্ত হউক, স্বস্থ হউক, ধনিক-শ্রমিক-সমন্বয়ে পুরুষোত্তম-রাজ প্রতিষ্ঠিত হউক। বন্দেমাতরম্।

'নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
　　কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই ত একে একে
যা কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবে
এমনি করেই হবে
　　এ ঐশ্বর্য্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।
　　এমনি করেই দিনে দিনে
　　আমার চোখে লও যে কিনে
　　　　তোমার সূর্য্যোদয়।
　　এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি-যে লও চিনে
　　আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।'

—রবীন্দ্রনাথ

জ্যামিতির অতীত ও বর্তমান *

॥ শ্রীনীরেন্দু কুমার হাজরা ॥

তখন সমাজে সৃষ্টি হয়েছে পরিবার—বিভিন্ন গোষ্ঠী। মানুষ যাযাবর বৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শিখেছে—আবিষ্কার করেছে কৃষির কাজ। স্থায়ীভাবে এই বসবাস আরম্ভ হয়েছিল নদী-পরিবেষ্টিত দেশগুলিতে, বিশেষ করে মিশর, ব্যাবিলন, চীন ও ভারতবর্ষে। কৃষির কাজ আবিষ্কারের জন্যে মানুষ পেয়েছিল স্বাধীন চিন্তার প্রচুর সময়। তার সঙ্গে সমাজে দেখা দিয়েছিল ব্যক্তিগত মালিকানা। মানুষ নিজের সুখ-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত। মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবার ফলে স্বাধীন চিন্তার সুযোগটুকু ছেড়ে দিয়েছে সমাজের বিশেষ একজনের উপর। পরে সেই ব্যক্তিই হয়েছে সমাজের একচ্ছত্র অধিপতি—পুরোহিত বা ধর্মযাজক। স্বাধীন চিন্তার ফলে পুরোহিত লাভ করেছে পাণ্ডিত্য। ভগবানের দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আদায় করেছে প্রচুর সেলামী যা পরে ট্যাক্সে পরিণত হয়েছে। মানুষ নিজের বলে যা কিছু জেনেছে, তার পরিমাণ না জানলেই নয়। এই পরিমাণ নির্ধারণই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল জ্যামিতি বা রেখাগণিত আবিষ্কারে।

মিশর বা ব্যাবিলনে পুরোহিত বা ধর্মযাজকদের হাতে ছিল এই শিক্ষা-চর্চা। সমস্ত বিজ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল নানাপ্রকার প্রাণহীন আলোচনার মধ্যে। সাধারণের মধ্যে জ্ঞানস্পৃহা বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখা হতো; কারণ তা ছিল পুরোহিতদের আধিপত্যের অন্তরায়। বিজ্ঞানের অগ্রগতি চলেছিল অতি মন্থর গতিতে। সেই সময়ে গ্রীকদের তেমন কোন সামাজিক বাধা ছিল না; প্রচলিত নিয়ম বা সামাজিক সংস্কারকে ছেড়ে তাঁরা যুক্তিকেই স্থান দিয়েছিল সকলের উপরে। সুতরাং তাঁদের হাতে যে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল তাতে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।

প্রাচীন গ্রীক বিজ্ঞানের ইতিহাসে যাঁদের কথা জানা যায় তাঁরা ছিলেন আইওনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বিখ্যাত

---

* "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" নামক পত্রিকার অগাষ্ট, ১৯৫৭ সংখ্যা হইতে পুনর্মুদ্রিত।

পণ্ডিত থেল্‌স্‌। তিনি ছিলেন একজন পূর্তবিদ্‌—হেলিস্‌ নদীর বাঁধ তাঁরই কীর্তি। গণিতশাস্ত্রে, বিশেষ করে রেখাগণিত বা জ্যামিতি সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেন। মিশরের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে তিনি সেই দেশের ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন। নতুন করে তিনি অনেক কিছু প্রমাণ করেন যা পরে ইউক্লীডের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। তাই আজও তিনি গণিতশাস্ত্রে, বিশেষ করে রেখাগণিতের প্রথম স্রষ্টা হিসাবে সম্মানিত হন।

থেল্‌সের পরে গ্রীক দেশে যে শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে উঠে সেটি হচ্ছে পিথাগোরিয়ান সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছিল পিথাগোরাসকে কেন্দ্র করে। তিনি থেল্‌সের জ্যামিতিক সূত্র অনুসরণ করে গবেষণা আরম্ভ করেন এবং মিশর ও ব্যাবিলন পরিভ্রমণ করে ক্রোটন অঞ্চলে এক শিক্ষায়তন খোলেন। এই প্রতিষ্ঠান ছিল এক গুপ্ত সমিতি—বিশেষ এবং যাবতীয় গবেষণাই ঐ প্রতিষ্ঠানের নামে প্রকাশিত হতো। সেজন্যে আজ বলা যায় না, পিথাগোরাস ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কার কৃতিত্ব কতটুকু? তবে একথা ঠিক, পিথাগোরাসের চরম সাফল্য হচ্ছে তাঁর জ্যামিতি। তাঁর জ্যামিতির প্রতিপাদ্য আজ আর কারও অজানা নেই।

আইওনিয়ান ও পিথাগোরীয়ান সম্প্রদায় ছাড়া গ্রীসে আরও কয়েকটী শিক্ষিত সম্প্রদায় দেখা যায়; যেমন—ইলিয়াটিক সম্প্রদায়, এথিনিয়ান সম্প্রদায়, আলেকজেনড্রিয়ান সম্প্রদায়। ইলিয়াটিক সম্প্রদায়ের বিশেষ কৃতিত্ব বীজগণিতে। তারপর এথিনিয়ান সম্প্রদায়ের সময়ে জ্যামিতিকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার চেষ্টা হয়। আর সে চেষ্টা বেশ কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে প্লেটো ছিলেন অনন্য-সাধারণ। তিনি দার্শনিক সক্রেটিসের ছাত্র। তিনি জ্যামিতিক প্রমাণ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। তাছাড়া জ্যামিতিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসাধারণ। এই সময়েই গ্রীসের অঙ্কশাস্ত্রের অনুশীলন প্রাধান্য লাভ করে। এর পরে আলেকজেনড্রিয়ান সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। এই সম্প্রদায়ের সময় গ্রীক জাতি অন্যান্য জাতি অপেক্ষা গণিতে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল আলেকজেনড্রিয়াতে। এখানেই তাঁদের চরম কীর্তি স্থাপন করে গেছেন—ইউক্লীড, আর্কিমিডিস্‌, আর এপোলোনিয়াস্‌।

আজও যে-জ্যামিতির সঙ্গে আমাদের পরিচয়—সেটা ইউক্লীডের জ্যামিতি। তাঁর জ্যামিতির প্রতিপত্তি সমানভাবে চলে আসছে। অনেকের ধারণা

ইউক্লীডের জ্যামিতির সবটাই তাঁর নিজের গবেষণার সৃষ্টি নয়। একথা ঠিক যে, তাঁর পূর্বেকার সব কিছু গবেষণা তিনি একত্র করেছিলেন এবং নিজেও যথেষ্ট নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। যে প্রণালীতে জ্যামিতির প্রমাণগুলি আমরা পাই, সে প্রণালী ইউক্লীডের নিজস্ব। জ্যামিতির সংজ্ঞা এবং স্বতঃসিদ্ধগুলির জন্যে তিনি চিরস্মরণীয়। এ ছাড়া তিনি জ্যামিতির সাহায্যে আলোক-রশ্মির ধারা সম্বন্ধেও গবেষণা করেন।

আর্কিমিডিস্ ছিলেন ব্যবহারিক শাস্ত্রের পক্ষপাতী। তিনি জ্যামিতির সূক্ষ্ম প্রমাণগুলি নূতন ভাবে সমাধান করেন; তবে তাঁর জ্যামিতির গবেষণার বিষয় ছিল—বৃত্তের পরিধির সঙ্গে তার ব্যাসের সম্বন্ধ কি? তার সূক্ষ্ম হিসাব তিনি এক নতুন ভাবে দিয়ে গেছেন। কি ভাবে প্যারাবোলার যে কোন অংশের কালি কষা যেতে পারে, তার সমাধানও তিনি করে গেছেন। ক্যাল-কুলাস বাদ দিয়ে যে হিসেব সম্ভব তার অনেকাংশ সেই যুগেই তিনি শেষ করে গেছেন।

এপোলোনিয়াস্‌কে আলেকজেনড্রিয়ান সম্প্রদায়ের শেষ মনীষী বলা যেতে পারে। তাঁর কীর্তি হলো কোণিক্‌স্। তিনি এর সব প্রতিপাদ্যগুলি আবিষ্কার করেন। প্রায় চারশ প্রমাণ তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্যারাবোলা, ইলিপস্ এবং হাই-প্যারবোলা—এসব নাম তাঁরই দেওয়া।

গ্রীসের সামাজিক জীবনে পরিবর্তন এলো, ধীরে ধীরে তার উন্নত শির অবনত হলো নানা প্রকার রাজনৈতিক কার্য কারণে। গ্রীস অবরুদ্ধ হলো মুসলমানদের দ্বারা, পূর্ব্বের স্বাধীন চিন্তায় পড়লো বাধা। শুধু তাই নয়, সকলের সমবেত চেষ্টায় আলেকজেনড্রিয়াতে যে পাঠাগার গড়ে উঠেছিল, তা তখনকার মুসলমান সম্রাট খলিফ ওমরের আদেশে ধ্বংস হয়ে গেল। ফলে বহু পুরাতনের নতুন করে পুনরাবৃত্তি চললো প্রায় এক সহস্র বছর ধরে।

এই দীর্ঘ সময়ে শুধু ইউক্লীড, আর্কিমিডিসেরই পর্য্যালোচনা হয়েছে। তারপর যে নতুনত্ব দেখা দিয়েছে তা ডেকার্টের বিশ্লেষণী জ্যামিতিতে। ইউক্লীডকে যাচাই করতে গিয়ে এই নতুনত্বের সৃষ্টি হয়েছিল। ইউক্লীডের মতে দুটি সমান্তরাল রেখা কখনো কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলতে পারে না। ডেকার্টে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, এই মত পৃথিবীর ক্ষেত্রেই সম্ভব, পৃথিবীর বাইরে কোনদিন সম্ভব নয়। পৃথিবীর বাইরে সুদূরে কোন এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে তারা মিলিত হবে। ডেকার্টের যুগ পার হয়ে জ্যামিতির গতি

শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে—আপেক্ষিকতাবাদের যুগে। এই যুগেই মানুষের দৃষ্টি প্রখর থেকে প্রখরতর হলো—সন্ধান পেলো চরম সত্যের।

আপেক্ষিকতাবাদ প্রমাণ করে দিল যে, চতুর্মাত্রিক বিশ্বকে ত্রিমাত্রিক রূপে অনুভব করবার মূলে রয়েছে মানুষের অক্ষমতা বা যুক্তিহীন বুদ্ধি। দেশ ও কালকে পৃথক ভাবে দেখাই মানুষের রীতি। এই রীতির দাস হয়ে থাকলে চলবেনা—সত্যকে স্থান দিতে হবে সকলের উপরে। দেশ-কালের যুক্ত পরিণতি বা চতুর্মাত্রিক কাঠামোর মধ্যে বিশ্ব-ইতিহাসের নতুন সংস্করণকে বোঝবার প্রয়াস পেতে হবে। আইনস্টাইনের এই তত্ত্বকে সর্ব্ব প্রথম রূপ দিয়েছিলেন রুশ বিজ্ঞানী মিনকোভস্কি।

এবার আসা যাক সত্য যাচাইয়ের ব্যাপারে। সরল রেখার কল্পনা কতটুকু বাস্তব? আপাতদৃষ্টিতে সরলরেখাকে বাস্তব বলেই মনে হতে পারে। দ্বিমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভূ-পৃষ্ঠকে সমতল বা সরল রৈখিক মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু আজ সকলেই জানে যে, ভূ-পৃষ্ঠ সমতল নয়—গোলাকার। গোলাকার পৃথিবীর উপর বসে সরলরেখার কল্পনা করা বাতুলতা ছাড়া আর কি হতে পারে? গোটা পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর দিয়ে একটা সরল রেখা টানা কোন কালেই সম্ভব নয়। আর যে রেখা টানা হবে তা হবে গোলাকার। শুধু সে বক্রই নয়—তার প্রান্তরদ্বয় মিলবে এসে এক বিন্দুতে। অথচ ইউক্লীড দ্বিধাহীন চিত্তে জানিয়েছিলেন যে, সরলরেখার প্রান্তদ্বয়ের সাক্ষাৎ ঘটবেনা কোন কালে। সরলরেখার সংজ্ঞা কি? দুটি বিন্দুর মধ্যে ক্ষুদ্রতম দূরত্বকে পরিচিত করা হয় সরল রেখা হিসাবে। কিন্তু গোলাকার ভূ-পৃষ্ঠের উপর দুটি বিন্দুর সংযোজক রেখাগুলির মধ্যে সর্ব্বাধিক ক্ষুদ্র যে রেখাটী পাওয়া যাবে, সেটীও হবে বাঁকা। সেজন্যে আজকের জ্যামিতিতে সরলরেখা বলে কিছুই নেই। যা আছে তার নাম দেওয়া হয়েছে জিওডেসিক। আজ সরল রেখার স্থান কোথাও নেই। এমন কি মহাশূন্যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানেও নয়। জিওডেসিক পূরণ করেছে সরল রেখার স্থান। আইনস্টাইন এটা প্রমাণ করেছিলেন অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্যে।

ইউক্লীডিয় জ্যামিতিতে ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়—ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ। গোলাকার ভূপৃষ্ঠের উপর সরল রেখা নিয়ে ত্রিভুজ আঁকা কোন দিনই সম্ভব হবে না এবং ত্রিভুজের কোণগুলির সমষ্টি কখনও দুই সমকোণের সমান হবেনা। একটু চিন্তা

করলেই দেখা যায়—প্রত্যেক দ্রাঘিমা রেখা বৃহত্তম বৃত্ত, অর্থাৎ বিষুব রেখাকে স্পর্শ করে সমকোণে। অতএব দুটা দ্রাঘিমা রেখা নিয়ে যে ত্রিভুজ গড়ে উঠবে—তার কোণগুলির সমষ্টি কখনই দুই সমকোণের সমান হবেনা। বরং বেশীই হবে।

নব্য-জ্যামিতি অর্থাৎ আইনস্টাইন রীমানীয় জ্যামিতি এখানেই শেষ নয়। এসব প্রথম কল্পনা করেন জার্মাণ জ্যামিতি-বিশারদ রীমান। এই নব্য-জ্যামিতি সৃষ্টি হয়েছে রীমান ও আইনস্টাইনের বাস্তব ধর্ম্মী কল্পনায়। সেজন্যে আজ নব্য-জ্যামিতিকে আইনস্টাইন-রীমানীয় জ্যামিতি বলে অভিহিত করা হয়। এখন প্রশ্ন উঠে তবে মিনকোভস্কির জ্যামিতি বাস্তব-ধর্ম্মী হলোনা কেন? তিনি তো আইনস্টাইনের চতুর্মাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই তাঁর জ্যামিতিকে দেখেছিলেন। তিনি আইনস্টাইনের দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেছিলেন বটে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়েছিলেন—ইউক্লিডের কল্পিত সরল রেখাকে স্থান দিয়ে।

ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে কোন কিছুর আয়তন পরিমাপের যে কল্পনা বা যুক্তি—সেখানে ছিল মানুষের অক্ষমতা। চতুর্মাত্রিক, অর্থাৎ দেশ-কালকে নিয়ে গঠিত যে জ্যামিতি, তার কথা তখন ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে। আজকের দিনে বাস্তবের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে নব্য-জ্যামিতি, অর্থাৎ চতুর্মাত্রিক জ্যামিতিকে স্থান দিতে হবে সকলের উপরে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, নব্য-জ্যামিতি সৃষ্টির আগে বিজ্ঞান কি কিছুই আমাদের দেয়নি? বিজ্ঞান অনেক কিছুই দিয়েছে ঠিক কথা, শুধু দেয়নি গূঢ় সত্যের সন্ধান—যা দিয়েছে বর্তমান জ্যামিতি। এটা আরও ভাল ভাবে বোঝা যাবে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর উক্তি থেকে—'নির্ণেয়বাদ মানুষকে নিষ্প্রাণ যন্ত্ররূপে কারণবাদের নিগড়ে আবদ্ধ করে ভাগ্যের শরণার্থী হতে বাধ্য করেছিল। নয়া কোয়াণ্টামবাদ সেই অসাধ্য আদর্শের স্থানে একটি প্রণিধান-যোগ্য সত্যের সন্ধান দিয়েছে এবং অনেকখানি বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছে। নয়া কোয়াণ্টাম থিওরী প্রকৃতির লীলা অনুধাবনের পথ বিশেষভাবে এগিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানের গতি চলমান। সময়োপযোগী যেটুকু সত্যের সন্ধান পেয়েছে—তার উপর ভিত্তি করে সে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে।'

বরিশাল-ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

॥ শ্রীদুর্গামোহন সেন ॥

[অসহযোগ আন্দোলনের সময় শ্রীদুর্গামোহন সেন সম্পাদিত বরিশাল-হিতৈষী পত্রিকাতে যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার যেটুকু নকল আমাদের কাছে ছিল, তাহা এইখানে প্রকাশ করা গেল।—উঃ ভাঃ সম্পাদক]

পল্লী-বৃন্দাবন　　　　১৪ই আষাঢ়, ১৩২৯

শ্রীযুত শরৎ কুমার ঘোষ

সহজ সরল স্নেহস্পর্শে স্নিগ্ধ হইবার লোভে কিছুদিন পল্লী বৃন্দাবনে সফর করিলাম, আশায় হৃদয় ভরপুর হইল, মাভৈঃ বাণী শ্রবণে প্রাণ সজীব হইয়া উঠিল। সহরে স্বার্থপরতার পুতিগন্ধে অবসন্ন ও নিরাশ হৃদয় পল্লীর হাওয়ায় কেমন একটা সজীবতা লাভ করিয়া ধন্য হইলাম, বুঝিলাম সত্যই স্বরাজ নীলমণি কেন বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। সহরের চারিদিক হইতে তথাকথিত শিক্ষিতদের মুখ হইতে কেবল রব উঠিতেছে "আন্দোলন থামিয়াছে।" সত্যই কি এই নিত্যবস্তু নিভিতে পারে? যখন পল্লীতে দেখিলাম সহস্র সহস্র কার্পাস গাছ স্বরাজ লাভে মোহন মধুর গর্ব্বে উন্নত শির, তখন সব সন্দেহ দূর হইল। দীর্ঘতর নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ-দগ্ধ কার্পাসগুলি আজ ঘন বর্ষার বারিধারা পুষ্ট হইয়া নধর দেহ ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া বলিতেছে কৈ? সাত মাসের রুদ্র রৌদ্রে আমরা মরি নাই—আজও বাঁচিয়া আছি—আর আমরা জীবিত থাকিতেই কি থামিল আন্দোলন? এরা যে বৃন্দাবনের তরুগুল্মলতা; স্বরাজের স্পর্শে অজয়, অমর, অব্যয়, অক্ষয়। কে বলে স্বরাজ আসে নাই? নহিলে কাহার মৃত্যু-সঞ্জীবন হস্তস্পর্শে ভারতের ঘরে ঘরে এমন শোভা ফুটিয়া উঠিল? এদের শ্রী ত স্বরাজ-শ্রী! স্বরাজ যে কেবল মানুষে সৃষ্টি করে তা নয়, তরুগুল্মলতাও। তোমরা স্বরাজ না বুঝিয়া থাক এই সকল তরুগুল্মলতার আশ্রয় লও। উদ্ধব তাই বার বার গুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার কোলে পুষ্ট তরু গুল্ম, পরাধীন মানুষের চেয়ে অনেক বড়। কার্পাসের পশ্চাতে দেখিতেছি স্বাধীন

প্রাণের স্বাধীন স্পন্দন। তাই ত বলি এই সব তরু গুল্ম স্বরাজের আদি সৃষ্টি, ইহাদের চরণতলে এবার মানুষকে স্বাধীনতার সাধনা করিতে হইবে। আন্দোলন যতই ঘন হইতে ঘনতর ততই উহার রুদ্র মূর্ত্তি দক্ষিণা মূর্ত্তিতে পরিণত হইতেছে। কালী (destruction) কমলা (construction) সাজিতেছেন। অল্পবুদ্ধি মানব ভাবিল আন্দোলন বুঝি নিভিয়া গেল। আন্দোলন যে জড় নয়, উহা যে চিরানন্দ স্পন্দন, একথা কেমন করিয়া ইহাদের বুঝাইয়া দিব? প্রাণের আন্দোলন কেবল প্রাণ দিয়াই ধরা ছোঁয়া যায়। একটা নূতন প্লাবন যে সমগ্র জগৎকে গ্রাস করিতে উদ্যত, এ তত্ত্ব অন্য কোনো উপায়ে কি উপলব্ধি করার উপায় আছে? প্রাণহীন জগতের প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই স্বরাজ, ধরার ব্যথা দূরীকরণই স্বরাজ। চেতন ত দূরেব কথা যাহাদের জড় বলিয়া এতদিন তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছি আজ তাহাদিগকেও স্বরাজ পাইতে হইবে। মাটী ও মানুষ দুইয়েরই স্বরাজে সমান অধিকার। চাহিয়া দেখ দেখি কার্পাসের পশ্চাতে চরকা ঘূর্ণনে কেমন মধুর গান সহকারে সূত্র নির্ম্মিত হইতেছে, নিশ্চয় জানিয়া রাখ এই ভারতের ব্রহ্মসূত্র। ভারতের ঋষি অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়াছেন, আমাদেরও সূত্রকে ব্রহ্ম দৃষ্টিতে আপ্যায়িত করিতে হইবে। আর ঐ চরকার পিছনে কাহার স্নেহ মথিত হইয়া সূত্রের ভিতর দিয়া আমাদের প্রাণ সঞ্চার করিতে সদা উন্মুখ? মা আমার অন্নপূর্ণাও বটেন, বসনপূর্ণাও বটেন। আজ আমার মায়ের স্নেহ অন্ন বস্ত্র দ্বিধা মূর্ত্তিতে বিভক্ত সন্তানকে আলিঙ্গিত করিবে। ছান্দোগ্য বলিয়াছেন "প্রাণঃ প্রাণং দদাতি", প্রাণই প্রাণ প্রদান করে। হোটেলের অন্নের পশ্চাতে রহিয়াছে স্বার্থ,—তাই প্রাণ প্রদানের শক্তি নাই, হোটেলের অন্ন অর্দ্ধ অভুক্ত রাখিবেই রাখিবে। আদর ব্যতীত কে অন্নে তুষ্টি পুষ্টি এবং তৃপ্তি বিধান করিবে? হোটেলের কাপড়ও তেমনি আদর পরিশূন্য। তাহারা জাতিকে অর্দ্ধ উলঙ্গ রাখিবেই রাখিবে। হোটেলের অন্নের মত হোটেলের বস্ত্রেও প্রাণ-নাশিকা ও সংযম-সংহারিণী শক্তির প্রাচুর্য্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাণময়ী মা তাই ত আজ প্রাণতুল্য অন্ন বস্ত্র দ্বারা খাওয়ান ও পরাবার ভার নিলেন। জড় মানব দেখ, অন্নের মূল্য অন্নে নয় প্রাণে, এইখানেই পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি বাক্যের স্বার্থকতা। কেন জান? বিদুরের ক্ষুদ দুর্যোধনের সোনার থালায় পরমান্নের চেয়েও অধিক মিষ্টি। ঐ প্রাণের ওজনে অন্নের ওজন বলিয়াই প্রাণেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ প্রাণময় বস্তুতেই সর্ব্বদা মুগ্ধ।

মহাত্মা এইখানেই দাঁড়াইয়া religiously চরকায় সুতা কাটিতে বলিয়াছিলেন। পল্লীতেই মা আমার যশোদা; কলঙ্ক কালিমা মুখে মাখিয়া এতদিন জগতের কাছে নির্লজ্জতারই পরিচয় দিয়াছে। এতদিন পরে মা আমাদের যশ দান করিতেই স্নেহময় মূর্ত্তিতে দাঁড়িয়ে। যখনই পল্লীতে উপস্থিত হইয়াছি, উপলব্ধি করিয়াছি কেমন করিয়া মায়ের অজস্র স্নেহধারা চতুর্দ্দিক গঙ্গাধারার মত প্লাবিত ও সঞ্জীবিত করিতেছে; মাতৃস্নেহে স্নাত হইয়া নূতন রস, নূতন আশা পাইতাম। প্রতিগৃহ হুলুধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিত। আজ যেন কত যুগ পরে স্বরাজ নীলমণি বাসুদেব দেবকীর বন্ধন মোচন তরে মায়ের কোলের কাছে উপনীত: ভাবিতাম কাহাকে বুকে করিয়া পল্লীতে ভ্রমণ করিতেছি আর কাহাকে আদর করিতেই বা মায়েরা আজ উন্মাদিনী, ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে সদা উন্মুখ? যাহারা আন্দোলনের মরণ সর্ব্বদা কামনা করেন, তাহারা কি মায়ের বুকের এই উন্মাদনা আস্বাদন করিয়াছেন? সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য আজ কাহার শরণ লাভের আশায় এরা ছুটি ছুটি করিতেছে। মা মা বলিয়া ডাক দিতে যে এরা এমন অস্থির হয়, তার কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? এ ডাক যে মানুষের নয়, এ যে তাঁহারই ডাক যাঁহার ডাকে ব্রজধামে সব গোপীনী গৃহধর্ম্ম দেহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া উধাও হইয়া বাহির হইয়াছিল। এ ডাক বিশেষ কোন মানুষের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই, ইনি যে—"সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ—সর্ব্বভূতাত্মা"। তাই ত' মা আমার এ আন্দোলনের নেতা, একমাত্র মায়েরই কর্ম্মে অধিকার, ফলে অধিকার নাই, মায়ের রান্নায় অধিকার কিন্তু পরমান্নে অধিকার নাই। মায়ের মত সরল শিক্ষক non-violent আর কে আছে? Non-violent-এর মুখ্য কথা পর রক্ষা, non-co-operation-এর প্রাণ আত্মরক্ষা, মায়ের মতন কে নিজের মরণ দিয়া অপরের মরণ শুষিয়া লয়? এই আন্দোলনের বিশেষ উদ্দেশ্য এই যে,—নিজে মরিতে হইবে কিন্তু অপরকে মারিতে হইবে না; অপরের মান সম্মান সম্পূর্ণরূপে অব্যাহত রাখিয়াই তাহাকে আমার পথে আনিব। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে রাণী করিয়াই নিজের কাছে স্থান দিয়াছিলেন, দাসীভাবে নয়; স্বরাজও প্রত্যেককে স্বরাট্ করিয়াই নিজের কাছে আকর্ষণ করিবেন, দাসীভাবে নয়। Bardoli resolution is the proclamation of Swaraj:—যাহারা ঐ সিদ্ধান্তকে বিরুদ্ধ চক্ষে দেখিতেছেন তাঁহারা স্বরাজ বোঝেন নাই। চৌরিচৌরা ঘটনায় জাতি

ঘোষণা করিয়াছে police-ও স্বরাজের প্রজা, মানুষের মান মানুষকে দিতেই হইবে; যে যতই বিরুদ্ধবাদী হউক। বারদৌলি সিদ্ধান্তের প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে নীলমণি আমার সমগ্র জগৎকে অভয় দান করিলেন। জগৎ সত্য সত্যই সেইদিন কৃতার্থ ও অমর হইল। স্বরাজত্ব করিতে গিয়া কে কবে এমনভাবে প্রেমে জয় করিতে চিন্তা করিয়াছে? ধন্য ভারতবর্ষ, ধন্য স্বরাজ, ধন্য মহাত্মা গান্ধী। বলিতেছিলাম মায়ের কথা—, মায়ের মতন মরণ বাবাও ভাল বাসেন না। তাই এই আন্দোলনে—"বন্দেমাতরম্" মন্ত্রের সম্পূর্ণ সার্থকতা। গৈলায় মা দেখিয়াছি, নিজের হাতের সূতা ও অলঙ্কার পায়ের কাছে রাখিয়া—"বাবা! কি করিব"—বলিয়া অমন ব্যাকুল ক্রন্দন ত' জীবনে আস্বাদন করি নাই। এতদিন পরে ভারতবর্ষে মায়ের সন্তানরক্ষার কথা মনে জাগিয়াছে, নইলে সন্তান রামপ্রসাদের মত "মা, মা ব'লে আর ডাকবো না,—মা ব'লে ডাকিস্ না রে মন মাকে কোথা পাবি ভাই। থাকলে এসে দিত দেখা সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই," গান গাইতে গাইতে মায়ের সঙ্গে নন-কো-অপারেশন্ করে? মায়ের স্তন আজ টন্ টন্ করিয়া উঠিয়াছে, তাই সন্তানের মুখে স্তন্যধারা ঢালিয়া দিতে পাগলিনী। ভয় কি এ আন্দোলনের? এর যে মা আছে, মরিয়া আজ এ অন্দোলন বাঁচিয়া উঠিয়াছে; তবুও বল আন্দোলন নিভিয়াছে? এই আন্দোলনে কত পুত্রহারা পুত্র, স্বামীহারা স্বামী পাইয়াছে। যখন দেখিলাম বাটাজোড় উন্মার্গগামী পুত্রকে ফিরিয়া কোলে পাইয়া পিতামাতার বুক জুড়াইয়া গিয়াছে, তখন কি বলিব না যে আন্দোলন একটী মাত্র ঘটনা দ্বারাই সত্য সার্থক? যখন দল বাঁধিয়াছে তখন সব রস মিশ্রিত হইবার দেরী নাই। যেখানে আদর্শ ছিল জমিদার নিজের বাড়ীতে সকল সুখভোগের ভিতর থাকিয়া কেবল হুকুমে প্রজা চালাইতেন, সেখানে যখন দেখিতে পাই হাতে ভিক্ষার থালা লইয়া দ্বারে দ্বারে কাঙালের মত সেই জমিদার স্বরাজের চাঁদা সংগ্রহ করিতেছেন, তখনও কি বলিব না আন্দোলন সার্থক? কে আজ জমিদারকে ফকির করিল?

স্বরাজ ত' চির ফকির, তাই ফকিরী ব্যতীত রাজা হওয়া চলিবে না। ব্রহ্ম নিত্য ফকির বলিয়াই জগন্নাথ, প্রাণবল্লভ। রাজ-রাজেশ্বরের নিত্য ফকিরের আদর্শে আমরা স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিব। তবেই রাজা হইবেন ব্রজের প্রতিনিধি। যখন দেখি দেশবন্ধু অতবড় সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পথে দাঁড়াইলেন, সেই দিন এ আন্দোলন বৃদ্ধকে নবীন করিয়াছে। মনে পড়ে

মেধী কুলের বৃদ্ধ নবীন বা নবীন বৃদ্ধ ষাট বৎসর বয়স্ক শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা, বৃদ্ধের নাকি নৌকায় চড়িলে পা টন্ টন্ করে! হাঁটিতেই বৃদ্ধের আনন্দ। কে এমন করিল? উত্তর দিতে পার কি? যুবক অনেক স্থানেই নিদ্রিত, কিন্তু বৃদ্ধেরা জাগ্রত রহিয়াছে। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোঁচড়ে কার্পাস বীজ লইয়া বাড়ী বাড়ী রোপণ করিয়া আসেন, আবার ৪।৫ দিন পরে গিয়া দেখেন অঙ্কুর উঠিয়াছে কি না? বৃদ্ধের পরিধানে খদ্দর, মাথায় একটী গান্ধী টুপি। নয়ন জুড়ান পোষাক দেখিয়া সত্য সত্য স্বরাজের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। পৃথিবী শুদ্ধ লোকও যদি বিরুদ্ধাচরণ করে, সাধ্য নাই যে এ আন্দোলনকে এক তিল পিছনে টানিয়া লয়। এই আন্দোলন রক্তদানের ভিতর অচল—চঞ্চলা কালী মরণ-ঘন শিব স্কন্ধে অচল অটল পূজা লাভার্থে ব্যগ্র। ভারতবর্ষ, আজ এই শুভমুহূর্ত্তে অচলা মায়ের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানে সার্থক, ভরপূর হও। ভয় নাই—ভয় নাই, অভয়ার ডাক আসিয়াছে, আর ডাকই বা বলি কেন, অভয়া যে নিজেই আসিয়াছেন। একবার মাকে মা বলিয়া চেন, সর্ব্বনাশী পূজা করিয়া আজ সর্ব্বময়ী কমলাকে পাইবে।

বরিশাল হিতৈষী
২১শে আষাঢ়, ১৩২৯

ভোলা সংবাদ।

ভোলায় রৈ রৈ ব্যাপার।

শরৎকুমারের অনশন ব্রত—আজ ৭ দিন।

বিগত ১১ই আষাঢ় রবিবার প্রাতে দশ ঘটিকার সময় দেশ-পূজ্য শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ মহাশয় এখানে পৌঁছিয়াছেন, সহরের বহু গণ্য মান্য ভদ্রলোক দোকানদার বারবণিতা প্রভৃতি জাতীয় পতাকা উড়াইয়া মহোল্লাসে, স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বন্দরের ঘাটে সম্বর্দ্ধনার জন্য উপস্থিত হয়। ঐ তারিখ অপরাহ্নে পাঁচ ঘটিকায় উকিল লাইব্রেরীতে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শরৎবাবু মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা করিয়া সকলের প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। ১২ই আষাঢ় জাতীয় বিদ্যালয় গৃহেও জাতীয় ইস্‌লামিয়া মাদ্রাসার ছাত্রগণ ও শিক্ষকদিগের এক সভা হয়। তাহাতে শরৎবাবু জাতীয় শিক্ষা, তাহার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় ২॥০ ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। ঐ তারিখ অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় উকিল লাইব্রেরীতে সহরের সমবেত স্ত্রীলোকদের বর্ত্তমান আন্দোলন, আন্দোলনে মাতৃজাতির কর্ত্তব্য

সম্বন্ধে শরৎবাবু উপদেশ দেন। বহু নারী দেশের সাহায্যের জন্য নগদ টাকা ও অলঙ্কার দান করিয়া সকলের ধন্যবাদভাজন হন।

১৩ই আষাঢ় অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় উকিল লাইব্রেরীতে এক সভায় শরৎবাবু সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

১৪ই প্রাতে মহকুমা শাসক এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারী করেন যে, দুই মাসের মধ্যে সহরের কোন স্থানেই শরৎবাবু কোনপ্রকার বক্তৃতা করিতে পারিবেন না, কারণ তাঁহার তেজস্বী বক্তৃতায় নাকি শান্তি ভঙ্গ হয়। ঐ তারিখ হইতে শরৎবাবু প্রায়োপবেশন গ্রহণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতা গিরীন্দ্র কিশোর চক্রবর্ত্তী, ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও কতিপয় কংগ্রেস কর্ম্মী ও ভদ্রমহিলা অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। সহরে ও মফঃস্বলের অনেক স্থানে খুব আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ঐ তারিখ অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় সহরে অধিকাংশ ভদ্রমহিলা স্বদেশী-সঙ্গীত গাহিয়া কংগ্রেস নির্দ্দেশিত চরকা ও খদ্দর প্রচলন ও অন্যান্য বিদেশী বর্জ্জন প্রথা প্রচলন চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

১৫ই তাং অপরাহ্ন ৬ ঘটিকায় স্ত্রীলোকেরা সহরের রাস্তায় স্বদেশী-সঙ্গীত গাহিয়া চরকা খদ্দর প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছেন। ভোলার সংবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটিতে পৌঁছাইলে তথা হইতে মাতা সরোজিনী দেবী, সুবক্তা ভূপতিকান্ত বক্সী, সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত এবং ৬ জন কর্ম্মী ভোলায় উপস্থিত হন।

সহরের ভদ্রমহিলা, ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, বারবণিতাগণ ও বহু গণ্য-মান্য এবং সাধারণ ব্যক্তিগণ জাতীয় পতাকা হস্তে স্বদেশী-সঙ্গীত গাহিয়া বন্দরের ঘাটে তাঁহাদের বরণ করিয়া লয়। পরে শোভাযাত্রা করিয়া সহরের মধ্য দিয়া তাঁহাদের স্থানীয় জমিদার রজনীবাবুর বহির্বাটী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়। ভূপতিবাবু ও সরোজিনী দেবী তাঁহাদের ভোলা আসিবার প্রয়োজনীয়তা ও দেশবাসীর বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অল্প কথায় বুঝাইয়া দেন। ঐ তারিখ অপরাহ্নে উকীল লাইব্রেরীতে সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী আহাম্মদ খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সুরেশবাবু, ভূপতিবাবু, মাতা সরোজিনী দেবী বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ন ৪॥০ ঘটিকায় রজনীবাবুর বহিবাটী প্রাঙ্গণে প্রায় ৩ হাজার লোক লইয়া এক সভা হয়। শরৎবাবু সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সুরেশবাবু, মাতা সরোজিনী দেবী ও নূরমহম্মদ সাহেবের চরকা ও খদ্দর গ্রহণের প্রস্তাবে উপস্থিত অনেকেই হাত তুলিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। ক্রমশঃ

বাংলার মাটি

গান

।। শ্রীমনোজিৎ বসু ।।

বাংলা-মায়ের আমরা ছেলে,
বাংলা-মাটি সরস যে—
সেই মাটিরে শ্রদ্ধাভবে
আমরা করি পরশ যে।
স্নেহের ধারা অন্তরে তার,
নেই তুলনা শ্যামল শোভার,
বিচিত্র তার রূপ নেহারি
আমরা সারা বরষ যে ॥
অন্নদা এই বাংলা-মায়ের
ভাঁড়ার সদাই পূর্ণ রে ;—
হেথায় সকল শান্তি মেলে
বাংলা-মাটি পুণ্য রে।
আমরা মায়ের অন্ত না পাই,
সন্ধ্যা-সকাল বন্দনা গাই।
তার কোলেতেই আনন্দ-সুখ
তাই তো মোদের হরষ যে ॥

কৌপীন

॥ শ্রীরামশম্ভু গঙ্গোপাধ্যায় ॥

দর্শনশাস্ত্রে এম্. এ. পাশ করিয়াও যখন আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান অস্পষ্ট থাকিয়া গেল, তখন সুকুমার বেদান্ত-সার, বিচার-সাগর ও অধ্যাত্ম রামায়ণে মনোনিবেশ করিল। সেই সময় গ্রামের বাঁধানো ষষ্ঠীতলায় এক জটাশ্মশ্রুধারী গৈরিকবাস সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটায় সুকুমার তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল।

জ্যেষ্ঠ অরুণকুমার প্রাতরাশ সারিয়া বাহির হইয়া যাইবে এমন সময় পত্নী সুনীতা বলিল,—একটা কথা আছে, শুনে যাও।

—পিছু ডাক্‌লে কেন? গুরুতর কাজে যাচ্ছিলাম। চট্‌পট্ বলে নাও।

—লক্ষণ সুবিধের নয়, বাপু! সুকুমার ঐ বাউণ্ডুলে সন্ন্যেসীটার সঙ্গ ধরেছে। আমাকে কাল জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল, ডোর-কৌপীনে কতখানি কাপড় লাগে। আমার ত ঐ কথা শুনে হাত পা পেটের ভিতর ঢুক্‌বার যোগাড়! তুমি ওর বিয়ের দিন কখন স্থির করছ, বল! আর দেরী করা ভাল নয় বল্‌ছি।

—সুকুমারের এম্. এ. পাশটার অপেক্ষায় ছিলাম। আমার কাজ শেষ হয়েছে; এইবার তোমার কাজ তুমি বুঝে কর। আমি চল্‌লুম।

অধ্যাত্ম-রামায়ণ হাতে লইয়া সুকুমার সন্ন্যাসী-সঙ্গের আশায় বাহিরে যাইতেছিল। সুরমার আলোক-চিত্রখানি সম্মুখে ধরিয়া সুনীতা জিজ্ঞাসা করিল;—ঠাকুর পো! চিন্‌তে পারো একে?

না চিন্‌বার কথা নয়। গ্রামের মেয়ে সুরমা, অধ্যাপক সান্ন্যালের কন্যা। নিখুঁৎ সুন্দরী। এই স্বর্ণকান্তি কোমলাঙ্গীর গণ্ডে গোলাপী আভা, অধরৌষ্ঠে সিন্দুররাগ দুই বৎসর পূর্ব্বেও সে অপলকনেত্রে দেখিয়াছে। দুই বৎসর কাল পিতার নিকট সহরে কাটাইয়া বি. এ. পাশ করিয়া সুরমা কল্য গ্রামে আসিয়াছে ও তাহাদেরই বাটীতে উঠিয়াছে।

বৌদির প্রশ্নের জবাবে সুকুমার উত্তর দিল;—এ ত পটের ছবি!

সুনীতার ইঙ্গিতে মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে সশরীরী সুরমা আসিয়া সুকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। সুনীতা বলিল,—এটা কি ঠাকুর পো ?

চোখ নামাইয়া অন্তরের একটা প্রবল আলোড়ন কোনমতে সাম্‌লাইয়া লইয়া গম্ভীর অনাসক্ত কণ্ঠে সুকুমার উত্তর দিল ;—এটাও একটা পটের ছবি, বৌদি !

—আর আমি ? আমি, ঠাকুরপো ?

—তুমিও পটের ছবি। বৌদি ! এই জগৎ-প্রপঞ্চ সবই মিথ্যা, সমস্তই পটের ছবি। এক অখণ্ড, সন্মাত্র শুদ্ধ চৈতন্যই সত্য। তুমি, আমি, এ, সে সবই একাকার ; ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তুই নাই।

—বল কি, ঠাকুরপো ! তুমি, আমি, সুরমা—সবই এক ?

—হাঁ, বৌদি। সবই এক ; সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। এসব কথা তুমি বুঝ্‌তে পারবে না, বৌদি !

—তা বটে, তা বটে, ঠাকুরপো। আমি ত আর দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. নই। আই. এ'র দৌড় বেশী নয় তা মানি, কিন্তু বুঝিয়ে বল্‌লে সুরমাও কি বুঝ্‌তে পার্‌বে না ?

—ও সব বোঝা খুব কঠিন। আর—বোঝাবার সময়ও আমার নাই।

সুরমার মুখে পাষাণের আবেগবিহীন স্থিরতা, সুনীতা স্তব্ধ। উত্তাপ-ভরা কণ্ঠে সুনীতা বলিল ;—ও সব ব্রহ্ম ট্রহ্ম সত্যিই বুঝি না, ঠাকুরপো। সোজা কথায় বল, বিয়ে থা' ক'রে আমার কষ্ট ঘোচাবে, না, সন্ন্যাসীর সঙ্গে বসে পেট ভ'রে বাতাস খাবে ?

চোখ দুইটী প্রায় কপালে তুলিয়া সুকুমার বলিল,—বিয়ে ? কার বিয়ে ? কার সঙ্গে ? এক চৈতন্য সর্ব্বভূতে বিরাজ কর্‌ছেন। এক—এক—একাকার। সবই পটের ছবি। ও কথা ছেড়ে দাও, বৌদি ! সেই যে কৌপীনের কথা বলেছিলাম, সেলাই করেছ ?

সুনীতা ঝাঁঝের সহিত উত্তর দিল,—গরজ আমার ! তোমার কৌপীন সেলাই কর্‌বো ? আমি ত পটের ছবি ! পটের ছবিতে কি সেলাই কর্‌তে পারে ?

সুকুমারের মুখ বিষাদের কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। শান্তকণ্ঠে সুরমা বলিল—ও বেলায় পাবেন, আমি তৈয়ের ক'রে দোব।

—তাই দিও, তাই দিও। তুমি, আমি, বৌদি—একই আত্মা। যে কেউ দিলেই হ'ল, একই কথা।

একরকম লাফাইতে লাফাইতে সুকুমার চলিয়া গেল। সুনীতার বড়ই আশ্চর্য্য ঠেকিল। পিতামাতা জীবদ্দশায় সম্বন্ধ পাকা করিয়া স্বহস্তে ভাবী পুত্রবধূরূপে সুরমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন, সে কথা সুকুমার বিশেষ-ভাবে জানে। অথচ তাহার আজিকার এই ব্যবহার, এই ঔদাসীন্য! সন্ন্যাসীর নিকট আত্মতত্ত্বলাভের উদগ্র বাসনায় মনোনাশের উপায় স্বরূপ গোপনীয় কোন তত্ত্বসেবনের ফলে তাহার অকলঙ্ক-চরিত্র দেবরের কোনরূপ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে নাই ত? সুনীতা চিন্তার সমুদ্রে তলাইয়া গেল।

সুরমা ডাকিল;—দিদি!

চমকিয়া উঠিয়া সুনীতা বলিল;—কি বোন্?

—বিয়ের জন্য মন্ত্রের কি একান্তই প্রয়োজন, দিদি? মন্ত্রপড়ার আগে অন্তরের ধনকে অন্তরে ধরে রাখ্‌তে চাওয়া কি অপরাধ হবে?

অমানিশার ঘনান্ধকার বালারুণের উজ্জ্বল ছটায় যেমন আরক্তিম হইয়া উঠে, সুরমার কথায় সুনীতার বেদনাচ্ছন্ন মনের দিক্ চক্রবালেও তেমনি আশার আলোক-সম্পাত হইল। আশ্বস্ত কণ্ঠে সে উত্তর দিল;—তোর ধন তুই বুঝে নে, ভাই। তাতে কোন দোষ নেই, কোন লজ্জা নেই। আমি পেছনে রইলাম। ঠাকুরপোকে ফেরানো আমার সাধ্য নয়। ও অনেকদূর এগিয়েছে, সন্ন্যাসী হবার মতলব এঁটেছে। এ শিবের তপস্যাভঙ্গের উমা তুই। পঞ্চশরের সাহায্য নিবি, না নিজেই ছাই মাখ্‌বি তা নিয়ে মাথাব্যথা আমার নেই।

বেলা একটার সময় প্রচণ্ড ক্ষুধা ও রুক্ষ চেহারা লইয়া সুকুমার গৃহে ফিরিল। সুনীতা একখানি মাদুরে শয়ন করিয়া তাহার শিশুসন্তানটীকে স্তন্য পান করাইতেছিল এবং সুরমা অদূরে একখানি সতরঞ্চিতে বসিয়া একজোড়া কৌপীনে শেষবারের মত সূঁচ চালাইতেছিল। সুকুমারের বৌদি' সম্বোধনে সুনীতা বলিল;—কি চাই, বলে যেয়ো, জুগিয়ে দোব। সাড়া পাবে না এখন থেকে। পটের ছবিতে কি সাড়া দেয়?

নীরবে সুনীতা সুকুমারকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য পরিবেশন করিল। নীরবে তাহার পানের ডিবাটী আগছিয়া দিল।

বৌদি বাক্যালাপ বন্ধ করায় সুকুমারের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা প্রচণ্ড বেদনা অনুভূত হইল। সমুদ্রের ঢেউ ঝড়ের সময় তীরস্থিত পর্ব্বতগাত্রে

আছাড় খাইয়া যেমন আর্ত্তনাদে গুমরিয়া উঠে, তেমনি একটা অনন্তভূত বিষাদ-তরঙ্গ তাহার মনকে সজোরে আঘাত দিয়া অন্তঃস্থলে আর্ত্তনাদের ধ্বনি তুলিল। কিন্তু কেন? কেন? মনোনাশ না হইলে যে আত্মদর্শন ঘটিবার নয়! মনোনাশের গভীর প্রচেষ্টায় সুকুমারের ভয়ঙ্করভাবে মাথা ধরিয়া উঠিল এবং সে দুই হাতে মাথার দুই রগ্ টিপিয়া যন্ত্রণায় অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে তাহার নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

কৌপীন-জোড়া হাতে লইয়া সুরমা ধীরে ধীরে সুকুমারের ঘরে প্রবেশ করিল। অপরূপ দীপ্তিসম্পন্ন এই তরুণীমূর্ত্তির দিকে সুকুমার অপলকনেত্রে চাহিয়া রহিল। এ কি উদীয়মান সূর্য্যের মত প্রভাবিশিষ্ট প্রভাত-গায়ত্রী? এ কি তপস্বিনী গৌরী? এ কি কশ্যপ-তপোবনের সুরভিত হবিঃপূত হোম-শিখা? সুকুমারের যন্ত্রণাকাতর ছায়াপাণ্ডুর দৃষ্টিপথে এ কী আরক্তিম তড়িৎ-শিখা যা নিঃশেষে প্রাণরসটুকুকে আকর্ষণ কর্‌তে চায়?

না, না, কিছু নয়, এ মোহ মাত্র; অবিদ্যার ফল—সংস্কারাধীন প্রারব্ধ-বেগ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ। অগ্নির কাছে শুষ্ক বৃক্ষশাখা ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত মূল্যবান গৃহ-সামগ্রী কাষ্ঠমাত্রই; দাহ্য হিসাবে মূল্যের কোন তারতম্য নাই। তেমনি নামরূপ মিথ্যা মাত্র; সমস্তই ব্রহ্ম।

স্মিতহাস্যে সুরমা জিজ্ঞাসা করিল;—ছট্‌ফট্ কর্‌ছেন কেন? মাথা ধরেছে বুঝি?

সুকুমার কোন উত্তর না দিয়া চোখ্ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। সুরমা সুকুমারের পাশে বসিয়া তাহার মাথা টিপিতে আরম্ভ করিল।

সুকুমারের কণ্ঠ হইতে আরাম-সূচক শব্দ বাহির হইল—আঃ! কিন্তু একটীবার মাত্র; তারপর সম্পূর্ণ নীরব। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হেতু সুখ-দুঃখবোধ মনের ধর্ম্ম। কিন্তু মনোনাশ না হইলে যে ব্রাহ্মীস্থিতি অসম্ভব! তথাপি—?

সুরমার সুমিষ্ট কণ্ঠ যে কর্ণে মধু বর্ষণ করে! নিমীলিত চক্ষুর অভ্যন্তরেও যে ঐ অপরূপার রূপচ্ছবি নৃত্য করে!

না, না। এত পটের ছবি।

মনোনাশের প্রবল চেষ্টায় সুকুমার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরে সুকুমারের মাথা টেপা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুরমা বলিল;—আমি আজ সন্ধ্যার ট্রেনে বাবার কাছে চলে যাচ্ছি। আপনার কৌপীন থাক্‌ল।

সুকুমার তাহার প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ জনিত নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অপরাধ বুদ্ধিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে কোন উত্তর না দিয়া চোখ বুজিয়া নীরব রহিল।

সুরমা পুনরায় বলিল;—চুপ করে রইলেন যে! আপনার কৌপীন থাক্‌ল। পছন্দ হল কি হল না, কিছুই যে বল্‌ছেন না। বেশ্‌—চল্‌লুম।

প্রায় একরকম লাফাইয়া উঠিয়া বিছানায় বসিয়া সুকুমার বলিল;—চলে যাবে, আজই চলে যাবে, সুরমা? দুই একদিন থেকে গেলে কি কোন ক্ষতি হ'ত?

—কি জন্য থাক্‌বো বলুন? আপনি ত কৌপীন নিলেন। আসি তবে; নমস্কার!

সুকুমার উঠিয়া আসিয়া অনুরোধ করিল;—আজ যেয়ো না। বৌদির রাগ না ভাঙ্গলে যেয়ো না। আমার খুব মুস্‌কিল হবে, আবার মাথা ধর্‌বে।

ছেলে-কোলে সুনীতা কপাট ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল;—আজ আর ওকে ধ'রে রেখো না, ঠাকুরপো! পটের ছবি হ'লে কী হয়, একটু সাজিয়ে গুছিয়ে একটা শুভদিন দেখে ওর মা-বাপের কাছ থেকে ওকে আন্‌তে হবে। সাম্‌নের মাসে খোকার পৈতের সময় ওকে আমার খুবই দরকার। কিন্তু তোমার কৌপীন?

মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে সুকুমার উত্তর দিল;—খোকার উপনয়নে কৌপীন লাগ্‌বে না, বৌদি? কিন্তু—মাপ্‌টা ত!

—ভেবো না ঠাকুরপো, ওটা খোকার মাপেই তৈরী হয়েছে।

ব্রহ্মসূত্রম্

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইয়দামননাৎ ॥৩।৩।৩৪ ॥

ইয়ৎ [এই পর্য্যন্ত] আমননাৎ [গুণসমূহকে যুক্তরূপে আমনানর ফলেই পুরুষোত্তম অবরুদ্ধ হন।]

পুরুষোত্তম গুণসমূহের তখনই হয় প্রতিষ্ঠা, যখন তাহা অক্ষরধী মুক্তসঙ্ঘের জীবনে ধরা পড়েন। সঙ্ঘ-জীবনেই গুণসমূহের প্রতিষ্ঠা এবং সেইখানেই পুরুষোত্তমের ইয়ত্তার আমনন যাহারা অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছেই 'অধর' অবরুদ্ধ। আমনন শব্দের অর্থ 'অভিমুখ্যেন চিন্তনম্'। এই অনুচিন্তনই সর্ব্ব সাধনার পরিণতি; ইহাই সাধনার ইয়ত্তা। ব্যক্তিগত আরাধনা যে পর্য্যন্ত না সমগ্র জীবনে, পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে, জাতীয় জীবনে, বিশ্ব জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ততদিন তাহা পুরুষোত্তমারাধনাই নয়। প্রশ্নোপনিষদ বলিতেছেন, 'স এতস্মাৎ জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে'। জীবঘনই হইতেছে জীবসঙ্ঘ। জীবসঙ্ঘই পূর্ব্ব সূত্রের উপসদন। ঘন শব্দের মধ্যে যে হন্ ধাতু রহিয়াছে, সঙ্ঘ শব্দের মধ্যেও সেই একই হন্ ধাতু। গোপালতাপনী শ্রুতিও শ্রীকৃষ্ণকে 'গোপগোপীগবাবীতম্' বলিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বিল্বমঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকে 'গো-গোপ-সঙ্ঘাবৃত' বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন। ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে লিখিতেছে, 'প্রপন্নজনতা-নন্দ সন্দোহং প্রথিতুম্'—তিনি প্রপন্ন জনসমূহের আনন্দ প্রদান করিবার জন্য এই প্রপঞ্চের বুকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলমণ্ডন। মণ্ডলী জীবনেই শ্রীকৃষ্ণ ধরা দেন; নচেৎ তিনি নিত্য অধর। সঙ্ঘ-নায়কত্বই তাঁহার সর্ব্বশেষ গুণ, এখানেই সর্ব্বগুণ-সমন্বয়। সঙ্ঘগঠনের কৌশল বর্ণনা করিবার জন্য পূজনীয় সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন :

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ স্বাত্মনঃ ৩।৩।৩৫

(পুরুষোত্তম) অন্তরা স্বাত্মনঃ [প্রতি নিজ নিজ আত্মার অন্তরা (নিকটে

ও ব্যতিরেকে)] ভূতগ্রামবৎ [ভূতগ্রামের মধ্যে যেরূপ নিকটত্ব ও ব্যতিরেকত্ব রহিয়াছে, সেইরূপ]

রাসোৎসব প্রসঙ্গে ভাগবত লিখিতেছেন :

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তঃ গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ ॥
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্‌·· ··· ॥ ভাঃ ১০।৩৩।৩

প্রতি গোপী গোপীমণ্ডলমণ্ডিত পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে আত্মার নিকট মনে করিতেছেন ; শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মাঝে প্রবিষ্ট হইয়া কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া আছেন। প্রতি দুইটী আত্মার স্বনিকট শ্রীকৃষ্ণ ; তাই দুইয়ের মাঝে রহিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণ। সূত্রোক্ত• 'অন্তরা' শব্দের অর্থ নিকট ও ব্যতিরেক দুই-ই। দুইটী গোপী পরস্পরের স্বনিকট পুরোষত্তমদ্বারা ব্যবহিত হইবার কৌশল শিখিয়াছিলেন বলিয়াই ভূত সমষ্টির জীবনেও এই কৌশল নিহিত রহিয়াছে। ক্ষিতি-অপতেজ প্রভৃতি ভূতগ্রাম স্বনিকটে সর্ব্বান্তর পুরুষোত্তমকে পাইয়াই স্ব স্ব বৈচিত্র্য আস্বাদন করিয়াও এক ভূতসঙ্ঘ সৃষ্টি করিয়াছে। পুরুষোত্তম তাই তো 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'। যিনি অন্তরাত্মা, তিনিই প্রতি ভূতের ভরণও করেন এবং অন্যান্য ভূতের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার প্রেরণাও প্রতি ভূতকে প্রদান করেন। সর্ব্ব ভূতের সর্ব্বভূতত্ব বজায় রাখিয়া যিনি সর্ব্বভূতের স্বনিকটে ও ব্যতিরেকে, তিনিই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। ভূতসমূহকে উচ্চ নীচ ভাবে সাজাইয়া একটি সিঁড়ি রচনা করিয়া সেই সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপে আত্মাকে স্থাপন করিলে তিনি সর্ব্বান্তর হন না, সর্ব্ব নিকট হন না। এই সিঁড়ি-বিভাগ স্বীকার করিলে যে ভূত থাকে সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্ন ধাপে, তাহা হইতে ব্রহ্ম অনেক দূর, আর যাহারা থাকে সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপে ব্রহ্ম তাহা হইতে অনেক নিকট। অথচ ব্রহ্ম সকলেরই স্বনিকট। সিঁড়ি-বিভাগ ব্যবস্থায় বর্ত্তমান বর্ণ বিভাগ, আশ্রম বিভাগ, মতবাদ বিভাগ, সাধন বিভাগ সবই উচ্চ অবচ ভাব সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ-লিপ্ত, দ্বন্দ্বমূঢ়।

সিঁড়ি-বিভাগের একটী সার্থকতা আছে—প্রত্যেকের পৃথক পৃথক রূপ, ক্রমান্বয় রূপ, ব্যাপকতর রূপ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য। যাহাকে সিঁড়ি-

বিভাগের নীচে বলিতেছ, তাহাকে উপরে তুলিয়া উপরের স্তরে ব্যাপকতর করাই হইতেছে উচ্চস্তরের প্রয়োজন। উচ্চ অর্থ এই নয় যে নীচের ধাপ হইতে উচ্চের ধাপ অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন। দৃষ্টিকোণ বদলাইলে উচ্চও নীচ হয়, নীচও উচ্চ হয়। ভাবের দৃষ্টিতে যাহা সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্ন—যেমন জড়, রসের দৃষ্টিতে তাহাই হয় সর্ব্বোচ্চ। রসের দৃষ্টিতে যে জড় সর্ব্বোচ্চ, ভাবের দৃষ্টিতে তাহাই সর্ব্বনিম্ন। নারদ-সনৎকুমার সংবাদে দেখিয়াছি যে, 'নাম' হইতেছে সিঁড়ির সর্ব্ব নিম্ন ধাপ; নাম হইতে 'বাক' ভূয়সী, বাক হইতে 'মন' ভূয়ান্। এইভাবে স্তরে স্তরে ভূয়ত্ব দেখাইয়া 'প্রাণ' পর্য্যন্ত পৌছাইয়াছেন। এই প্রাণ নিজকে স্তরে স্তরে মন্থন করিয়া 'ভূমা' সুখকে প্রকাশ করেন। তখন প্রাণ-বল্লভ সুখঘন পুরুষোত্তম-আত্মা ফুটিয়া বাহির হন। যে 'নাম' ছিল সর্ব্ব নিম্ন ধাপ, প্রাণ-সাধনায়, ভক্তি-সাধনায় সেই নামই হইতেছে সর্ব্বোচ্চ সাধনা। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' 'কৃতে যদ্ধ্যায়েতঃ বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যাং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ।' নাম সম্বন্ধে বৈষ্ণব-দর্শন লিখিতেছেন, 'নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধঃ নিত্যমুক্তঃ অভিন্নাত্মান্নামনামিনোঃ॥' প্রাণ-সাধনায় সর্ব্বনিম্নস্তর ঐ নাম ও প্রাণবল্লভ নামী পুরুষোত্তম-আত্মস্তর অভিন্ন। সিঁড়ি-বিভাগের প্রতি ধাপেরই স্বনিকট এই পুরুষোত্তম-বস্তু; তাই ধাপগুলি প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিকট হইয়াও দূরে, কত দূরে—'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে চ'—ইহাই সঙ্ঘগঠনের মূল সূত্র। 'অন্তরা' শব্দের মধ্যে এই দূরত্ব ও অন্তিকত্ব দুই-ই যুগপৎ বর্ত্তমান। রাসমণ্ডলী রচনার রহস্যও এইখানেই নিহিত। সিঁড়ির প্রতি ধাপ পুরুষোত্তম জীবনে যুগপৎ থাকিয়াও ক্রম-অন্বয়ে যুক্ত। ব্রজধামে তরুলতাগুল্ম হইতে পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানুষ দেবতা পর্যন্ত—এক কথায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সবারই পুরুষোত্তম স্বনিকট। তাই উদ্ধব তরুলতাগুল্ম জন্ম প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন,

'আসামহো চরণরেণুজুষাম্ স্যাম
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্॥
যা দুস্ত্যজং স্বজনম্ আর্য্যপথং চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥ ভাঃ ১০।৪৮।৬১

'Animal is a unfinished man'—ইহা ব্রজের ভাষা নয়। ব্রজে সবই কৃষ্ণ-কেন্দ্র, আবার সকলেই কেন্দ্র-কৃষ্ণেরও কেন্দ্র; ব্রজে কেন্দ্র-পরিধির একান্ত

বিভাগ বিলুপ্ত। সেখানে বিনিময়-ধর্ম্মদ্বারা কেন্দ্র পরিধি হয়, পরিধি কেন্দ্র হয়। যিনি সর্ব্বান্তর, তিনি সর্ব্বের কেন্দ্র, সর্ব্বও আবার তাঁহার কেন্দ্র।

অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩।৩।৩৬ ॥

অন্যথা [(সর্ব্বান্তর আত্মা ও সর্ব্বভূতের সমকেন্দ্রত্ব) উপলব্ধ না হইলে] ভেদানুপপত্তিঃ ইতি চেৎ [ভেদের অনুপপত্তি হয়—এই যে উক্তি] ন [ইহা অদ্বৈতবাদসম্মত হইলেও পুরুষোত্তম অদ্বৈতদর্শনে ঠিক নয়।] (কেন না) উপদেশান্তরবৎ [(সম কেন্দ্রত্ব হইলেই 'ভেদ' উপপন্ন হয় এবং পুরুষোত্তম-দর্শনে এই ভেদ অভেদের সঙ্গে সমন্বিত) যেমন একই উপদেশ ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশের মত গৃহীত হয়।]

জীবনে আত্ম-কেন্দ্র যখন সর্ব্বভূতের মাঝে স্ব-কেন্দ্র (Centre everywhere) প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়, তখনই হয় কেন্দ্র ও পরিধির বৈশিষ্ট্য রক্ষার ভিতর দিয়া পরস্পরের বৈচিত্র্য ও ভেদের উপপত্তি। 'অন্যথা' আত্মা বা সর্ব্বভূত যে-ই একান্ত কেন্দ্র হউক না কেন, 'ভেদ' 'মৃত্যোঃ মৃত্যুঃ'-র অর্থাৎ ক্লৈব্যের সৃষ্টি করিবে। 'ভেদ' তখন জীবনে আর রস যোগাইয়া জীবনকে বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত পাইতেছি বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে। যখন দেব মনুষ্য ও অসুর এই তিন প্রজাপতি-নন্দন পিতা প্রজাপতির গৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন, প্রজাপতি 'দ' এই অক্ষরটী মাত্র উহাদিগকে উপদেশ দিলেন। ইহার অর্থ দেবতারা বুঝিল 'দাম্যত'; মানুষ বুঝিল 'দত্ত', অসুর বুঝিল 'দয়ধ্বম্'। কেন্দ্র হইতে স্ফুরিত হইল উপদেশ 'দ', এই 'দ' পরিধিস্থিত দেবতায় উদ্ভাসিত হইল দাম্যত অর্থে, মানুষে দত্ত-অর্থে, অসুরে দয়ধ্বম অর্থে, যেন তিনের জন্যই ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। একই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডল-কেন্দ্রে দাঁড়াইয়া পরিধি স্থানীয় প্রতি ব্রজগোপী হৃদয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদন যোগাইতেছেন। কাজেই পরস্পরের ভেদ তখনই উপপন্ন হয় যখন দুই-ই দুইয়ের কেন্দ্র বনিয়া যাইবার মত 'যোগ' অবলম্বন না করেন।

ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩।৩।৩৭

ব্যতিহারঃ বিশিংষন্তি হি [বেদশাস্ত্র ব্যতিহারই বিশেষিত করেন]

ইতরবৎ [যেমন ইতরগুণগুলির ব্যতিহার হইয়াছে] (সর্ব্ব শাস্ত্রই জীব-ঈশ্বর পরস্পরকে পরস্পরের বিশেষণরূপে বলিয়াছেন।)

ব্যতিহার হইতেছে 'জীবেশ্বরয়োঃ মিথঃ বিশেষ্যবিশেষণী ভাবঃ।' মুক্ত সঙ্ঘ ও ভগবান দুই-ই দুইয়ের বিশেষ্য বিশেষণ বলিয়া উহাদের সম্বন্ধই ব্যতিহার সম্বন্ধ। 'তৎ এষোঽহম্ সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্,' 'ত্বং বা অহমস্মি ভগবতি দেবতে অহং বা ত্বমসি'। 'তুমি আমি, আমি তুমি'—ইহাই ব্রজের ব্যতিহার।

তাহার গলার ফুলের মালা মোর গলায় দিল
মোরে তার মত করি সে মোর মত হইল ॥—চণ্ডীদাস

পরস্পরের পরস্পর বনিয়া যাওয়ার মধ্যে যে উপাধি-বিধুর সহজ স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহাই শাস্ত্রের সর্ব্বত্র প্রচারিত ও আস্বাদিত হইয়াছে। পুরুষোত্তম তাঁহার মণ্ডলেশ্বরত্ব, সর্ব্বান্তরত্ব এবং সর্ব্বগতত্বাদি ইতর গুণসমূহকেও মুক্তসঙ্ঘের সঙ্গে ব্যতিহার করিয়াছেন। পুরুষোত্তম সর্ব্বগত, তাঁহার এই গুণও তিনি মুক্তসঙ্ঘের সঙ্গে বিনিময় করিয়াছেন, ব্যতিহার করিয়াছেন। তিনি সাজিয়াছেন ব্রজে 'গূঢ়'। 'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে'—মুণ্ডকোপনিষৎ।—দুইটী সোনার পাখী; সমান তাঁহাদের যোগ, সমান তাঁহাদের আখ্যা, সমান তাঁহাদের প্রাণ, সমান তাঁহাদের একই দেহকে আলিঙ্গন করা'। 'মম সাধর্ম্ম্যমাগতঃ'—গীতা। এত সমানতার ভিতর দিয়া দুই-ই দুইয়ের অনুসন্ধানে রত। অথচ কেহই অপরকে আজ পর্য্যন্ত পাইয়া ফুরাইয়া ফেলিতে পারিল না, ভবিষ্যতেও পারিবে না। প্রাণের স্তরে দুই দুই থাকিয়াই এক। মনোবুদ্ধি এক প্রান্তের একেকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া, অপর প্রান্তের একের মধ্যে সেই এককে না মুছিয়া ফেলিয়া 'এক' করিতে পারে না। এক-অনেকের ব্যতিহার-সম্বন্ধোদ্ভূত দিব্য সঙ্ঘশক্তিই প্রাণশক্তি।

সৈব সত্যাদয়ঃ ॥ ৩।৩।৩৮

সা এব [সেই সঙ্ঘশক্তি বা প্রাণ-দেবতাই] সত্যাদয়ঃ [সত্যাদি রূপে মথিত হইয়া অহঙ্কার-আত্মরূপকে ফুটাইয়া তোলে।]

'সা বা এষা দেবতা দূর্ণাম'—বৃ—১।৩।৯। পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণ-দেবতা 'দূর্' নামে প্রসিদ্ধ; কেননা মৃত্যু ইহা হইতে 'দূরে' থাকে। এই প্রাণ-দেবতার

সম্বন্ধেই ছান্দোগ্য বলিতেছেন, 'প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি'—৭।১৫।৪। নাম-বাক্-মন-সঙ্কল্প-চিত্ত-ধ্যান-বিজ্ঞান-বল-অন্ন-আপ-তেজ-আকাশ-স্মর-আশা — সবই প্রাণের পরশে প্রাণ বনিয়া গিয়াছে। সেই প্রাণ পুরুষোত্তম-প্রজ্ঞা চুম্বিত ও মথিত হইয়া পরিণত হইতেছে সত্য-বিজ্ঞান-মনন-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-কৃতি-সুখরূপে। 'এষ তু বা অতি বদন্তি যঃ সত্যেন অতিবদতি'।—ছাঃ ৭।১৬।১। সূত্রোক্ত 'সত্যাদি' বলিতে সত্য-বিজ্ঞান-শ্রদ্ধা-নিষ্ঠা-কৃতি সুখকেই বুঝিতে হইবে। এই সত্যাদিই আবার প্রাণের ভিতর দিয়া প্রকট হইয়া গড়িয়া তুলিয়াছে ভূমা 'সুখ'কে। সেই ভূমা সুখেরই মহিমা এই সব কিছু। এই মহিমাই শ্রুতির পরাশক্তি। 'পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবল ক্রিয়া চেতি'। এই মহিমা ভূমা পুরুষের 'অন্য' নহে, তাই এই ভূমা স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিতও বটেন, নাও বটেন—'স্বে মহিম্নি যদি বা ন মহিম্নি ইতি'। স্ব মহিমা ঐ পরাশক্তির সঙ্গে ভূমা পুরুষের পরকীয় সম্বন্ধ। এই ভূমা পুরুষেরই 'অহঙ্কারাদেশ' রহিয়াছে। তিনিই 'অহম্' এবং এই অহম্-ই আত্মা। এই অহম্ আত্ম-বস্তুকে প্রকট করিতে হইলে চাই প্রাণের -সত্যাদি রূপের মধ্য দিয়া মথিত হইয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্র এই বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। শ্রুতি প্রাণের সঙ্গেই সাক্ষাৎভাবে আত্মার সংযোগের উল্লেখ করিয়াছেন—'আত্মতঃ প্রাণঃ আত্মতঃ আশা' ইত্যাদি। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, সত্যাদি সবই প্রাণের স্বরূপগত ধর্ম্ম, প্রাণই। এই প্রাণই সঙ্ঘ-শক্তি। সঙ্ঘ-শক্তি সত্যাদি দ্বারা যুক্ত হইলেই পুরুষ আত্ম-রতি, আত্ম-ক্রীড়, আত্ম-মিথুন, আত্মানন্দ, স্বরাট্ হন। পরাশক্তির প্রকাশ ঐ প্রাণ ও প্রজ্ঞা সমন্বয়ে যে দিব্য সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে, সেই সঙ্ঘেই আত্মরতি পুরুষোত্তম রাস-লীলায় রত হন। পরাশক্তির সঙ্গে যুক্ত না হইয়া একান্ত আত্মাতে যাহার রতি, ক্রীড়া, মৈথুন, আনন্দ, স্বারাজ্য, তাহার কাছে ঐ সব ভাবুকতা মাত্র। বিশ্বসঙ্ঘের বুকেই সত্য বাস্তব পুরুষোত্তমের সত্য বাস্তব রাস-রসাস্বাদন-রসিক স্বরাট্ হওয়ার সম্ভাবনা ও স্বার্থকতা।

প্রাণবল্লভ সঙ্ঘশক্তিমান আত্মা-পুরুষোত্তমকে কোথায় খুঁজিতে হইবে, কোন্ গুণযুক্তরূপে তাঁহাকে জানিতে হইবে, তাহারই আলোচনার জন্য ভগবান সূত্রকার পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন:

কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৩।৩।৩৯

(পুরুষোত্তম আত্মবস্তু সত্যকামাদি গুণযুক্ত হইয়া) ইতরত্র [অনাত্মার বুকে বিরাজমান] তত্র চ [এবং সেখানে তিনি] আয়তনাদিভ্যঃ [আয়তনাদি হইতে নিজ কাম ছড়াইয়া দিতেছেন, জমাইয়া তুলিতেছেন, মদনমোহন রূপে ঘন হইতেছেন।]

পুরুষোত্তম আত্মবস্তুকে খুঁজিতে হইবে আত্মপুরে, 'অথ যদিদম অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যঃ তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।'—ছা ৮।১।১। 'যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ উভে অস্মিন্ দ্যাবা পৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে।'—ছা ৮।১।৩। 'যচ্চ অস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।'—ছা ৮।১।৩।—'পুরুষোত্তম আছেন হৃদয়ে, সেই হৃদয়ে ঐ দ্যুলোক ও এই পৃথিবী সমাহিত; যা এখানে আছে এবং যাহা নাই, তাহা সেখানে সমাহিত। হৃদয়ই আত্মা ও অনাত্মার, সব অস্তি ও সব নাস্তির সমন্বয় বিধান করিতেছে। প্রাণবল্লভের বিহার-ক্ষেত্র হৃদয়, তিনি আত্মা হইতে 'ইতরত্র' অর্থাৎ অনাত্মার ক্ষেত্রে বিহার-ক্ষেত্র প্রসারিত করিতেছেন। খুঁজিতে হইবে তাঁহাকে এই হৃদয়েই। এই হৃদয়েই আছেন তিনি মদন মোহন-রূপে, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্পাদিরূপে। যেমন তিনি আত্মার ক্ষেত্রে 'অপহতপাপ্মা বিজরঃ বিমৃত্যুঃ বিশোকঃ বিজিঘৎসঃ অপিপাসঃ', তেমনি তিনি ইতর-ক্ষেত্রে বিষয়ের ক্ষেত্রে 'সত্যকামঃ সত্য-সঙ্কল্পঃ'। যদি আত্মবস্তু এই অনাত্ম ক্ষেত্রে বিহারোপযোগী কাম প্রকাশ না করিতেন, তবে তিনি একান্ত আত্মার ক্ষেত্রে মদন-মোহিতই থাকিতেন। পুরুষোত্তম-আত্মা অনাত্মা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই মদনমোহন। 'কামার্ত্তাঃ হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু'—মেঘদূত। কাম চেতন-অচেতনের ভেদ সহ্য করে না। পুরুষোত্তম-কামেও দ্বন্দ্বপাপবিদ্ধা বুদ্ধির আত্মা-অনাত্মা ভেদ মুছিয়া গিয়াছে। অপহত-পাপ্মা আত্মা যদি অনাত্মার ক্ষেত্রকে স্বীকার না করেন, তাহার মদনমোহন রূপের প্রকাশ অসম্ভব হইত। স্বরূপ-বিশ্বরূপ সমন্বিত যিনি, তিনিই মদনমোহন। স্বরূপ-বিশ্বরূপের সমন্বয় হইলেই কাম হয় 'সত্য', তখন যাহার যাহা কামনা সব হয় অবিতথ। 'অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাং স্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামাচারো ভবতি'—ছা ৮।১।৬। তখন পিতৃলোক, মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক, স্বসৃলোক, সখিলোক, গন্ধমাল্য-লোক, গীতবাদিত্র-লোক, স্ত্রী-লোক 'সঙ্কল্পাদবাস্য…

সমুত্তিষ্ঠন্তি তেন সম্পন্নো মহীয়তে'।—ছাঃ ৮।১।১০। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে ইহার পূর্ণ চিত্র আমরা দেখিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ পিতৃ-সঙ্ঘ, ভ্রাতৃ-সঙ্ঘ, সখা-সঙ্ঘ, গোপী-সঙ্ঘের ভিতর দাঁড়াইয়াই সকল কামকে আস্বাদন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন কামের divine রূপ—'বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন'।—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

প্রাণ প্রকাশিত হইতে চাহিলে চাই তাহার আয়তন। 'আয়তনাদিভ্যঃ'—পদের 'আদি' বলিতে বুঝাইতেছে—পৃথিবী, কাম, রূপ, আকাশ, তমঃ রূপসমূহ, আপ ও রেতঃ এই আটটি 'আয়তন'। এই ভাবে অগ্নি প্রভৃতি আট লোক, শারীরাদী আট পুরুষ ও অমৃত প্রভৃতি আট প্রকার দেবতারও উল্লেখ বৃহদারণ্যকে রহিয়াছে। 'কতম একো দেব ইতি স ব্রহ্ম ত্যদিত্যাচক্ষতে' —বৃহদারণ্যক ৩।৯।৯। 'সেই একটী দেবতা কে? তাহা প্রাণ; এই প্রাণই ব্রহ্ম-স্বরূপ। পণ্ডিতগণ অপ্রত্যক্ষ বস্তু-বোধক 'তৎ' শব্দে তাঁহার নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন'। এই প্রাণেরই আট প্রকার বিভাগ বৃহদারণ্যক ক্রমশঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। পৃথিব্যাদ এই আট আয়তন, অগ্নি প্রভৃতি আট লোক, অমৃত প্রভৃতি আট দেবতার ও শারীরাদি আট পুরুষ বিভিন্ন রূপে পৃথকভাবে বিভক্ত করিয়া এবং প্রাচ্যাদিদিগ্‌ভাবে আপনাতেই উপসংহৃত (একীভূত) করিয়া এবং সে সমুদয়কেও অতিক্রম করিয়া যিনি ঔপনিষদ পুরুষ, তিনিই মদনমোহন, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প; 'ইতর' অনাত্মার হৃদয়-রমণ গোপীজন-বল্লভ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। 'এতান্যষ্টাবায়তনান্যষ্টৌ লোকা অষ্টৌ দেবা অষ্টৌ পুরুষাঃ স যস্তান্ পুরুষান্ নিরুহ্য প্রত্যুহ্যাত্যক্রামৎ তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি'—বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৬॥ কামায়তন পুরুষের স্ত্রী হইতেছে দেবতা। ভোগের দৃষ্টিতে স্ত্রীদেবতাকে দেখিলে পুরুষের হয় সেই দেবতার কাছে মহা অপরাধ। কামুক অহরহ এই পাপ করিতেছে। মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণ স্ত্রীদেবতা শ্রীরাধাকে ভজনা করিয়াই অপহতপাপ্‌মা, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস ও অপিপাস। তাঁহার জীবনে কেহ কাম-পিপাসা দেখে নাই।

প্রাণদেবতা সঙ্ঘশক্তি অব্যাহত থাকে শরণাগতিতে, আত্ম-সমর্পণে। এই আত্মসমর্পণের ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ সাধিত হয়, কি না,—এই সংশয়ের নিরাকরণের জন্যই পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা।

ক্রমশঃ

'পল্লীসমাজ'—শরৎচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

মাছ ভাগের ব্যাপারটার আর একটু ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে দলাদলি করে নিজের বিত্ত ও সম্মান রক্ষার মনোবৃত্তির জন্য রমা যে কতখানি ছোট হয়ে গেছে, তাই দেখে দুঃখ হয়। তখন মনে হয় সংসারে দলাদলির বুদ্ধিটা যেমন একেবারে চলে না, তেমনিই একেবারে চলে না মুখস্থ করা চলার পথ। বেণী যেরকমের মানুষ, রমেশও যে সেই রকমই, বেণীর মত রমেশও যে সমস্ত কাজই ব্যক্তিগত স্বার্থবোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই করবে—এই মুখস্থ করা ধারণা নিয়ে ব্যবহার চালাতে গিয়েই তো রমা বিপদে পড়েছিল, ভজুয়ার কাছেও অপমানিত হয়েছিল। সংসারে কত সাবধান হয়েই যে ব্যবহার চালাতে হয় !

ভজুয়া এসেছিল রমারই কাছ থেকে জানতে যে এ মাছে তার বাবুর ভাগ আছে কি না। এবং এ কথা সে যথাসাধ্য সম্ভ্রম প্রকাশ করেই জিজ্ঞেস করেছিল। কিন্তু কটু কণ্ঠে রমা জবাব দিয়েছিল, 'তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল গে যা, যা পারে তাই করুক গে।' কথা শুনেই ভজুয়া 'বহুৎ আচ্ছা মা-জী' বলে চলে যাচ্ছিল, তবু যাবার আগে সবটুকু কথা সে জানিয়ে গেল,—'মাজী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুরধার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন। বাবুজী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু···বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয়ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত; কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন, বাবুজীর রাগ পড়িয়া গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, ভজুয়া, যা, মাজীকে জিজ্ঞাসা করে আয়—ও-পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিশুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, বাবুজী বলে দিলেন—আর যে যাই বলুক ভজুয়া, আমি নিশ্চয় জানি মাজীর জবান থেকে কখনও ঝুটা বাত বার হবে না—

সে কখনও পরের জিনিষ ছোঁবে না, বলিয়া সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।'

—এটুকু বোঝা গেল যে সাধারণতঃ দশজন মানুষ যেরকম ছিল, কুঁয়াপুরেরও আর দশজন যেরকম ছিল, রমেশ সে জাতীয় জীব ছিল না। তাই রমার ব্যবহারটাও আর দশের প্রতির ব্যবহারের মত হওয়ায় শোভন বা সঙ্গত হয় নি। এ সংসারে কোন কিছুই যে মুখস্থ করে হয় না, সংসারে চলার প্রতি পদে সেটা মনে রাখতেই হবে। প্রচলিত পরিবেশের মধ্যে যে রমেশ খাপ খায় না—এ কথাটা শ্রাদ্ধের দিন থেকেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমরা সামাজিক মনোবৃত্তিটা কি রকম ছিল সেটা বুঝতে চেষ্টা করবার সাথে সাথে দেখব সমাজ সংস্কারক হিসাবে এই মনোবৃত্তির মধ্যখানে দাঁড়িয়ে প্রথম পথিক হিসাবে চলার পথে রমেশের ত্রুটি হয়েছিল কি কি।

বিশ্বেশ্বরীকে বাদ দিয়ে রেখে সোজা বলা যেতে পারে যে, রমেশকে অভ্যর্থনা করে, আদর করে নেবার গ্রামে কেউ ছিল না। দীর্ঘকাল পরে বাইরে থেকে গ্রামে গিয়ে পড়ে সেখানে কেমন করে নিজের স্থান করে নিতে হয়, সে কথা রমেশের জানা ছিল না। পল্লীর লোকগুলি তথা সমাজের লোকগুলিই যে কোন্ জাতীয় জীব সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও রমেশের ছিল না। শ্রাদ্ধবাসরে যারা উপস্থিত হয়েছিল তাদের আমরা একটু দেখেছি। দেখেছি বাপের শ্রাদ্ধ করতে আরম্ভ করে রমেশ এত খাইয়েও কারো মন পেল না। দেখেছি ক্ষেন্তি বামনির মেয়ের ব্যাপার নিয়ে যে বিবাদটা পাকিয়ে উঠতে পেরেছিল, সেটার পিছনের চিত্তবৃত্তিটা। দেখেছি এবং দেখব যে ধর্ম্মদাস গোবিন্দ গাঙ্গুলী বা বেণী ঘোষাল প্রতি পদে এই কথাই প্রমাণ করে যে, মানুষের স্বভাবগত সৌন্দর্য তাদের একটুকুও অবশিষ্ট নেই —লোভ, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা, পরের সর্বনাশ করেও নিজের বিত্ত সঞ্চয় করা, মানুষকে মানুষ হিসাবে এতটুকু শ্রদ্ধা ও সম্মান না করা—এই মনোবৃত্তি সমস্ত জাতটার মধ্যে—কি উচ্চবংশে কি নিম্নবংশে—একেবারে ছেয়ে আছে। কাহিনী আরম্ভের প্রথম কয়টা পৃষ্ঠায় গোবিন্দ ও ধর্ম্মদাসের যে চিত্র ফুটে উঠেছে, তা স্মরণ করে শিউরে উঠতে হয়। মিষ্টি খাওয়ার লোভ যেমন এদের দুরন্ত, তেমনি রমেশের ভাঁড়ার ঘরের চাবি কে নেবে—ধর্ম্মদাস-গৃহিণী না গোবিন্দ গাঙ্গুলীর স্ত্রী—তাই নিয়েই না কি কুৎসিৎ মনোবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে ফেলে! এই পরিবেশে রমেশ তার হৃদয়খানি নিয়ে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু পথ কোথায়? গোবিন্দ গাঙ্গুলী আর ধর্ম্মদাস চাটুজ্জে যে সামান্য কারণে ছাতা তুলে লাঠি উঁচিয়ে কুৎসিৎ গালাগালি করতে আরম্ভ করে দিয়েছিল তা দেখে রমেশের অবস্থা লিখছেন লেখক,…'এই সমস্ত লোকের দৃষ্টির সম্মুখে রমেশ লজ্জায়, বিস্ময়ে, হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ সন্তান। এত সামান্য কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে? আবার নিজেদের কাজটাকে সমর্থন করে গোবিন্দ গাঙ্গুলী বলছে, '…সে বছর…রমার গাছ পিতিষ্ঠের দিনে সিদে নিয়ে রাঘব ভটচাযিতে হারাণ চাটুয্যেতে মাথা ফাটাফাটি হয়ে গেল।' একে তো সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতা—তার ওপর আবার তার সমর্থন! সমাজ যে বেঁচে নেই—সে কথা কে মনে করিয়ে দেবে? এর মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে হবে রমেশকে। এ কি সহজ কথা? শ্রাদ্ধে বস্ত্র বিতরণ করা হবে তথাকথিত ছোট জাতদের মধ্যে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর এটা সইল না—বলছে, 'ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের এক জোড়া, আর ছেলেদের একখানা করে দিলেই নাম হ'ত।' ধর্ম্মদাস সায় দিয়ে বলছে, 'গোবিন্দ মন্দ কথা বলে নি বাবাজী। ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেছে কেন?…'

রমেশের সম্বন্ধে লেখক লিখছেন, 'এই বস্ত্র বিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্মাহত হইয়া পড়িল। ইহার সুযুক্তি কুযুক্তি সম্বন্ধে নহে, এখন এইটাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহারা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদের সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এতবড় একটা লজ্জার কাণ্ড করিয়া বসিল, সেজন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই।'—শুনেছিলাম ভারতবাসীকে শাসক ইংরেজ একসময়ে কুকুর বিড়াল সদৃশ মনে করত বলে ভারতবাসীর সামনে বাহ্য প্রস্রাব করতে তাদের কোন সঙ্কোচ ছিল না। উচ্চবর্ণের বলে গর্বিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ও তেমনি জানত যে, ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মানর সৌভাগ্য একবার যখন লাভ হয়ে গেছে, তখন আর কোন যোগ্যতার বা জীবনের কোন সৌন্দর্য-বোধেরই আর অপরিহার্য প্রয়োজন নেই। তাই চারিত্রিক কোন অসৌন্দর্যের জন্যই লজ্জা পাওয়ার কোনো প্রয়োজন-বোধও তাদের লোপ পেয়ে গেছে। মনোবৃত্তি সপ্রমাণ করতে আমরা উদ্ধৃতি বাড়াব না—তবে

পাঠককে মনে করিয়ে দেই মধু পালের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বাড়ুয্যে-মশাই সৈরুবী জেলেনীর আক্কেল নিয়ে যে অভিযোগ করেছিলেন, মধু পালের সম্মতির অপেক্ষা না রেখে 'তেলের ভাঁড়ের ভিতর উড়খি ডুবাইয়া এক ছটাক তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্দ্ধেকটা দুই নাক ও কানের গর্ত্তে ঢালিয়া বাকিটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন'...ইত্যাদি। নুনের পয়সাটা বিকেলে দেবেন বলে নুন তো নিলেন, আগের পাওনা পাঁচ আনার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে 'বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিলেন—হাঁ রে মধু, দুবেলা চোখা-চোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্যন্ত নেই?......হলেই বা অনেক দিনের? এমন করে সবাই মিলে পিছনে লাগলে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না, বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিষ পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।' '

—এমনি আত্মমর্যাদাবোধ লোপ পেয়ে যাবার একমাত্র কারণ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলেই সবকিছু নিরপেক্ষ এমন বড় যে কোন কিছুতেই আর তার অপমান নেই—এই ধারণা;—এই ধারণা যে, ব্রাহ্মণ তথা ব্রাহ্মণত্ব মানুষ তথা মানুষত্বের থেকেও বড়!

কেন এমন হল?

পরে এর উত্তর কোথায় ভেবে দেখব।

রমেশ গ্রামে এসে যা কিছু করতে যায় তাই-ই অপরের প্রশংসা না কুড়িয়ে ঈর্ষা বিদ্বেষ আর নিন্দার ঢেউ তোলে। পিতৃশ্রাদ্ধ নিয়ে কোনো দলে না গিয়ে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করে সে প্রথম থেকেই বিপদ ডেকে এনেছে। তার বাপের সঙ্গে যে বিবাদ অন্য দলের ছিল, তা তো তাকে ঘাড়ে করতেই হবে, তার উপর তার কোন কাজই কারো পছন্দ হচ্ছে না। রমেশ যা করছে তা ভাল এবং তাই-ই করা উচিত সন্দেহ নেই। দলাদলিতে না থেকে সবাইকে আপন মনে করে নিমন্ত্রণ করাই উচিত, রমেশও তাই করেছিল। মাছ নিয়েও রমেশ ঝগড়া করতে যায়নি—রমার মহানুভবতার উপর নির্ভর করে ভজুয়াকে সংবাদ জানতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোনটাই কেউ ভালভাবে নেয় নি, কোনটাই ভাল ফল দেয় নি। আর একটা ঘটনা এখানে স্মরণ করি। 'গ্রামের যে পথটা বরাবর ষ্টেশনে গিয়া পৌছাইয়াছিল, তাহার একটা যায়গা আটদশ বৎসর পূর্ব্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে।

প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতে সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্য সময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সন্তর্পণে ইহারা পার হয়, কিন্তু বর্ষাকালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটো বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙা তালের ডোঙা উপুর করিয়া দিয়া কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহারা আছাড় খাইয়া হাত-পা ভাঙিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়; কিন্তু এত দুঃখ সত্ত্বেও গ্রাম-বাসীরা আজ পর্যন্ত তাহাব সংস্কারের চেষ্টামাত্র করে নাই। মেরামত করিতে টাকা কুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই টাকাটা রমেশ নিজে না দিয়া চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আট দশদিন পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আট-দশটা পয়সা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসিবার সময় পথের ধারে স্যাকরাদের দোকানের ভিতর এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কানে যাওয়ায় সে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, একটা পয়সা কেউ তোরা দিস নে। দেখছিস্ নে ওর নিজের গরজটাই বেশি! জুতো পায়ে মসমসিয়ে চলা চাই কি না! না দিলে ও আপনি সারিয়ে দেবে তা দেখিস। তা ছাড়া এতকাল যে ও ছিল না, আমাদের ইষ্টিশান যাওয়া কি আট্‌কে ছিল!

কে আর একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুজ্জেমশায় বলছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক করে নেওয়া হবে। খোসামোদ করে দুটো বাবু বাবু করতে পারলেই ব্যস।'—সমাজ সেবার কাজে সদ্য আগত নূতন পথিক রমেশকে যে এ সকল মন্তব্য কঠিন করেই বাজবে তাতে আর সন্দেহ কি। নিজের চিত্ত-দাহকে কোন এক স্থানে প্রস্থাপন করতে না পারলে মানুষ কি বাঁচে—বিশ্বেশ্বরী রমেশের সেই স্থান। তাঁকে বলছে রমেশ, '…আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে যে, না বুঝে অনেকগুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্য খরচ করে ফেলেছি। এ গাঁয়ের কারো কিছু করতেই নেই। রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল, এদের দান করলে এরা বোকা মনে করে; ভাল করলে গরজ ঠাওরায়; ক্ষমা করাও মহাপাপ; ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল।'

কেউ কেউ বলবে সমাজ সেবার এই-ই ত পুরস্কার—এই পুরস্কার নিয়েই কাজ করে যেতে হবে।—কথাটা খানিকটা সত্য বটে, খানিকটা সত্য নয়ও বটে। এ কথাটা গোড়ায় জেনে নিতে হবেই যে আমার কাজ সকলে

সমর্থন করবে না—যে কোন কাজ তা যত ভাল কাজই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে কিছু বলার সম্ভাবনা কোনদিন একেবারে লুপ্ত হবে না। আবার রমেশের কাজ নিয়ে স্যাকরাদের দোকানে বসে যারা বিরূপ সমালোচনা করছিল, তারা একেবারেই নিম্নস্তরের সমালোচনা করছিল, সে কথাও সত্য। কিন্তু একদল এরকম করার পরও যদি এমন একদল না থাকে যারা আমার কাজকে কোন না কোন রকম ভাবে সমর্থন করে, সহযোগিতা জানায়—তাহলেও মানুষ কাজ করতে পারে না—এ কথাও খুব সত্যি। একক মানুষের বুকের পাটা এত বড় হতেই পারে না যে, একজন লোকেরও তার প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও সে-অশ্রদ্ধার আবেষ্টন ঠেলে সে বেরোতে পারে। পৃথিবীতে যে কেউ নূতন জীবনের কথা নিয়ে এসেছেন তাঁরা সহস্র বাঁধা পেয়েছেন সহস্র মানুষের কাছ থেকে, আবার তারই মধ্যে দুইচারজন তাঁদের কথা ধরে রেখেছেন, মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন। একলা রমেশ পারবে কেন? বিরুদ্ধ আবেষ্টনের মধ্যে নূতন কথা নিয়ে চলবার পথে ভুল করে ফেললে সে বিরুদ্ধতা এমন নোংরা ও বীভৎস হয়ে ওঠে যে, সে বীভৎসতা ও নোংরামি ধারণ করবার ক্ষমতা একক মানুষের থাকে না। রমেশ এই ভুলটী করে বসেছিল। তাই তার শুভেচ্ছা যেমন কেউ বুঝল না, তেমনি তার কোনো কাজেই অপরের সহযোগিতা পেল না। রমেশের ভুল হয়েছিল কোথায়?

এ পর্যন্ত ঘটনা আমরা যা দেখেছি, তার থেকেও জটিল ঘটনা ঘটেছে।

আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলি নিয়ে ভাববার সময় কি রকম করে ভাবব? কেউ কেউ মনে করেন যে, যে-শাস্ত্র ব্যবস্থাদ্বারা আমাদের সমাজ-কাঠামো তৈরী হয়েছে, তা গোড়াতে ঠিকই আছে, কেবল কালের ব্যবধানে যা জঞ্জাল জমেছে, আজ তাই দূর করে নিতে হবে। কিন্তু তা নয়। মানুষ যে শাস্ত্র দিয়ে সেদিন সমাজ ব্যবস্থা তৈরী করেছিল, সেই শাস্ত্র-ব্যবস্থা-ই আজ অচল। দ্বারিক চক্রবর্তীর কি অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয়েছিল, তা আমরা জানতে পারি নি, কিন্তু মৃতদেহের প্রায়শ্চিত্ত না হলে যে-সমাজে তা পড়েই থাকবে, কেননা অশাস্ত্রীয় কাজ হতেই পারে না, সে-সমাজের সে-শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাশুদ্ধই ত্যাগ করতে হবে সন্দেহ নেই। প্রায়শ্চিত্ত করতে কেউ সাহায্য করল না এইটাই বড় কথা নয়—প্রায়শ্চিত্ত করার এই আনুষ্ঠানিক আচারগত ব্যবস্থাটাই অশোভন। যাইহোক, এ পর্যন্ত ছিল শাস্ত্রীয়

শোষণ যা সামাজিক রূপ ধরেছে, এর পরে যোগ হল মানুষের শোষণ। ব্যথিত রমেশ জিজ্ঞেস করেছিল সরকার মশাইকে, এমন গরীব এ গাঁয়ে আর কয় ঘর আছে। উত্তরে শোনা গেল—মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান এদেরও ছিল; শুধু একটা চালতা গাছ নিয়ে মামলা করে এই অবস্থায় এসেছে, যদিও 'এতদূর গড়াত না বাবু, শুধু আমাদের বড় বাবু আর গোবিন্দ গাঙ্গুলী দুজনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা করে তুললেন।...তারপর আমাদের বড় বাবুর কাছে দুঘরের (দ্বারিক চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা) গলা পর্যন্ত বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে আসলে সমস্তই কিনে নিয়েছেন।'

এই ছিল পল্লীসমাজে হিন্দুর সমাজ—তার সামাজিক ও অর্থনীতিক সমাজ ব্যবস্থা। এমন সমাজ-কাঠামো তা সামাজিক বা অর্থনীতিক,যাই হোক না কেন—কিছুতেই আর আজ চলতে পারবে না যেখানে একজনের সব কিছু আর এক জনের কাছে বাঁধা পড়ে যায়।

পল্লীসমাজ কাহিনীর মধ্যে রমা-রমেশের যে-ব্যক্তিগত সম্বন্ধের পরিচয়টুকু আছে, সামাজিক ঘটনাগুলি ভেবে দেখবার পর সেটা আমরা ভেবে দেখব।

দু-তিনশ টাকার ক্ষতি হবে বলে রমা আর বেণী ঘোষাল যেদিন গ্রামের প্রধান ভরসা একশ বিঘার ধানের জমির জল বের করিয়ে দিতে দিল না, সেদিনের সে ঘটনা বড় মর্মান্তিক। যাদের অনেক আছে, তারা সমস্ত গ্রামের জন্যও তিনজনে মিলে দু-তিনশ টাকার ক্ষতি করবে না—চাষারী খেতে না পেয়ে সেই তাদেরই কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে ছুটে আসবে—অর্থাৎ আবার সেই কথা—এক ক্ষুদ্র সংখ্যক ধনীর কাছে বৃহত্তর জন-সাধারণ হাতে পায়ে বাঁধা পড়ে আছে। এ জমিদারী যে থাকতে পারে না, থাকা উচিত নয়—থাকে নি—আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সে কথা আমরা বুঝি। রমেশ কেবল বেণী ঘোষালকেই বাঁধটা কাটিয়ে দিতে অনুরোধ জানায় নি, রমাকেও সে তার প্রাণের আবেদন জানিয়েছিল। কিন্তু জমিদারী রক্ষার মনোবৃত্তি রমার মধ্যে এমন শক্ত হয়ে শেকড় গেড়ে বসেছিল যে, রমেশের আবেদন দূরস্থান, কোনো মানবতা-বোধও তাকে এ সামান্য ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করতে পারল না।

আত্মকেন্দ্রিক হয়েই তো মানুষের এই বিপদ—আর ভারতবর্ষের লোক একদিক দিয়ে খুব আত্মকেন্দ্রিক। যারা জানে মানুষের মুক্তি তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, মুক্ত হতে সর্ব্বভূতে আত্ম-আস্বাদনের কোনো

প্রয়োজন নেই, সংসারে তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া আটকানো শক্ত। গো-গোপসঙ্ঘাবৃত, রাস-মণ্ডলমণ্ডন শ্রীকৃষ্ণকে পর্য্যন্ত যে-ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত মুক্তির ঠাকুর করে তুলেছিল, সংকীর্ত্তনে সকলকে নিয়ে নামকীর্ত্তন করে সকলের মধ্যে নেমে এলেন যিনি, 'আর কি পাতকী আছে নদীয়ায়' বলে কেঁদে গেলেন যে-গৌরসুন্দর, ধরার ধূলায় অবলুণ্ঠিত সেই-গৌরসুন্দরকেও যে-ভারতবর্ষ ব্যক্তিগত প্রেমের ঠাকুব করে বৈকুণ্ঠ লাভের সহায়ক করে তোলে, তাদের আত্মকেন্দ্রিক হওয়া ছাড়া আর উপায় কি? বিচিত্র এই ভারতবর্ষ বহু চিন্তাধারার পীঠস্থল। জওহরলালের লেখায় আছে একমাত্র ভারতবর্ষের লোকেরাই রোজ স্নান করে; অথচ ত্রিসন্ধ্যা স্নান যেমন একজন করছে, তেমনি সে-ই হয়তো তার বাড়ীর আবর্জনা নিয়ে আর এক জনকার বাড়ীর দুয়ারে ফেলে দিয়ে আসছে—এ দুটো পাশাপাশি চলছে। এই দেশেই আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত ভুবনের তৃপ্তিসাধন যেমন মানুষের আদর্শ বলে ধরা হয়েছে, সকলের মধ্যেই ব্রহ্মদর্শন যেমন তার কাম্য, তেমনি আবার সমস্ত মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত হয়ে যেমন তার অধ্যাত্ম জীবন সম্ভব, তেমনি তার সামাজিক জীবনও নির্বিঘ্নে চলে বলে সে মনে করে। Civic sence বা সামাজিকতা-বোধ তার যে কত কম, নিজ ব্যক্তিকে নিয়ে সে যে কেমন তৃপ্ত হয়ে থাকতে পারে—রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে আজও তার সহস্র দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে। জলের কলে দড়ি বা তার বেঁধে সর্বদা খুলিয়ে রেখে সে সর্ব সাধারণের জল নির্বিবাদে একটুকুও কুণ্ঠা বোধ না করে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ফেলে যাচ্ছে—এমনি কত! বললেও তার তাতে কোনো চৈতন্য হবে না আজও। আর একজনের অসুবিধা করেও নিজের কাজটুকু সেরে নেবার এমন একটী নীচ চিত্তবৃত্তি সর্বদা চোখে পড়ে. যা বোধ হয় পৃথিবীর অপর জাতের মধ্যে নেই। তাই রমার কাছে পাষাণ বেণীর মতই অপরের বাঁচবার না-বাঁচবার কোনো আবেদন নেই। স্তম্ভিত রমেশ না বলে পারল না যে, 'তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হয়ে উঠেছি সে তুমি টের পেয়েচ বলেই আমার কাছে ক্ষতি পূরণের দাবী করলে। কিন্তু বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি; পুরুষ মানুষ হয়ে তাঁর মুখে যা বেঁধেচে, স্ত্রীলোক হয়ে তোমার মুখে তা বাঁধে নি। আমি এর চেয়েও বেশী ক্ষতিপূরণ করতে পারি, কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলে দিচ্ছি রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা

সব চেয়ে বেশী। আজ তুমি তাই করে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেছ।'

রমেশ বলে গিয়েছিল বাঁধ সে কেটে দেবেই। রমা আর বেণী মুসলমান লাঠিয়াল রেখে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রমেশ নিজে যে এত বড় লাঠিয়াল তা তাদের জানা ছিল না। বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি। হেরে গিয়ে তারা আরও জঘন্য স্তরে নাম্‌তে চেয়েছিল, আকবরকে বলেছিল থানায় গিয়ে লেখাতে রমেশ চড়াও হয়ে ইত্যাদি, কিন্তু মূর্খ ছোটলোক আকবর জবাব দিয়ে চলে গিয়েছিল এই বলে যে, 'দিদিঠাকরুণ, তুমি হুকুম করলে আসামী হয়ে জ্যাল্ খাটতে পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুয়ে?'

রমা রমেশের যে ব্যক্তিগত সম্পর্কটী সমস্ত কাহিনীর মধ্যে অন্তঃস্যূত হয়ে আছে, সেটা বৃহত্তর সমাজ জীবনে কোন গঠনাত্মক জীবন-চেতনা সৃষ্টি করে তুলতে না পেরে একরকম ব্যর্থ হয়েছে বলা চলে। এ কথায় আমরা পরে আসব।

নিজের এত বড় ত্যাগ ও পরহিতৈষণা সত্ত্বেও নিজ গ্রামে যখন কারো হৃদয়ের মধ্যে নিজের আসন বিস্তার করতে না পারায় 'তাহার সমস্ত কাজকর্ম্ম, শোয়া-বসা, এমন কি চিন্তা-অধ্যয়ন পর্য্যন্ত' যখন রমেশের কাছে বিস্বাদ হয়ে উঠল, তখন এমন সর্ব্বব্যাপী অনাত্মীয়তার মাঝখানে তার গরীব মুসলমান প্রজাদের হৃদয়-স্পর্শ তাকে সেদিন আবার সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল। যে মহাশক্তি মানুষেব ব্যক্তিগত ধরা ছোঁয়ার বাইরে, মানুষের মধ্যে তাঁর অবতরণের পথরেখা হচ্ছে হৃদয়। হৃদয়ের মধ্যে ছাড়া কোন কিছুতেই কারো স্থিতিলাভ ঘটে না। স্থিতি ভূমিতেও নেই, গৃহেতেও নেই, অর্থেতেও নেই। সংসারী লোক সাধারণতঃ দুই একজনের হৃদয়ে স্থিতিলাভের প্রয়াস পায়, তাই তারা সংসারী। আর যারা ত্রিকালে অবাধিত স্থিতি লাভ করেন, বিশাল হৃদয়-সম্পন্ন সেই মহাপুরুষেরা বহু মানুষের হৃদয়ে স্থিতিলাভ করেন—তাই তাঁরা বড়। মানুষের অন্তর্নিহিত আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ের মধ্যে এই স্থিতি লাভ করবার—কিন্তু বহুর হৃদয়ে স্থিত হওয়ার কৌশল মানুষ জানে না, তাই মানুষের হৃদয় না পেয়ে তার শান্তিও নেই, সোয়াস্তিও নেই। অবতীর্ণ ভগবান পর্য্যন্ত বললেন 'ভক্তই আমার পিতা মাতা, ভক্তই আমার আশ্রয়দাতা, আমি ভক্ত হৃদয়ে জন্মে থাকি, ভক্ত আমার নাম রেখেছে'। হৃদয়ের মধ্যে যার ছাপ পড়েছে, সেই ছাপই কালক্রমে পাথরে উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে—পাথরে ছাপ আগে ওঠে না!

রমার ক্ষুদ্রতা রমেশের হৃদয়কে যখন শূন্য করে দিল, সেই শূন্য হৃদয় সেদিন বেঁচে উঠল দরিদ্র মুসলমানদের স্পর্শ পেয়ে। অপরের সঙ্গে কলহ না করে কোনো একটা কাজ করতে পেয়েছে বলে রমেশ সুস্থ বোধ করল। 'কলহ-বিবাদে রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল। ইহাদের সম্পর্কে আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল কুঁয়াপুরের হিন্দু প্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি কথায় বিবাদ করে না; করিলেও তাহারা প্রতি হাত এক নম্বর রুজু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচারফলই সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যে ভাবেই হোক্ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে রমেশ ভদ্র অভদ্র কোন হিন্দু গ্রামবাসিকেই দেখে নাই।'

—হিন্দুর প্রতি মুসলমানের আচরণ ও ব্যবহার যাই-ই হোক না কেন, মুসলমানদের যে উপরের গুণগুলি রয়েছে এবং জাতি হিসাবে বাঁচতে হলে এ গুণ যে প্রত্যেকেরই আয়ত্ত করতে হবে, ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই কথাটা আমাদের কাছে আসছে।

রমেশ পীরপুরে মুসলমানদের মধ্যে স্কুল করতে গিয়ে যে হৃদয়-স্পর্শ পেয়েছিল, তাতে তার হৃদয়ের শূন্য ভরে ছিল, জ্বালা জুড়িয়েছিল। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরের কাহিনীতে নিখিলেশ যেদিন বিমলার হৃদয়কে হারিয়ে ফেলেছিল বলে বিরাট শূন্যতার মধ্যে পড়েছিল, সেদিন সামান্য পঞ্চুর আনা নারকেলের মধ্যে পঞ্চুর হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে নিখিলেশ জুড়িয়েছিল। হৃদয়ের মধ্যে যখন বিরাট শূন্যতা হাঁ করে আসে, তখন অন্য হৃদয়ের কত সামান্য স্পর্শও মানুষের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। 'এ সংসার অতি ভীষণ স্থান' এ বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ নেই যদি এ সংসারে চলবার ঠিক পথটা না পাওয়া যায়। হৃদয় মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে ও তাকে কর্মে জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করবার পক্ষে কত বড় চোদনা, সে কথা যে সংসারের প্রতি পদে মনে রাখতে পারল, এবং সেই হৃদয়কে মর্যাদা দিয়ে চলতে পারল, সে-ই এই ভীষণ স্থান সংসারে উতরে যেতে পারবে। রমেশ এ যাত্রা উতরে এল।

ক্রমশঃ

বিষ্ণুপ্রিয়া

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

সাড়ে চারি শত বৎসর পূর্বে আমাদের এই বাংলা দেশের নবদ্বীপ নগরী যখন পণ্ডিত সমাজ কর্ত্তৃক অলঙ্কৃত, ন্যায় শাস্ত্রের শুষ্ক তর্কের কচ কচিতে মুখরিত, সেই সময় নবদ্বীপের বুকে এক প্রাণের প্লাবন নামিয়া আসিয়াছিল, যে প্রাণ-প্লাবনে নবদ্বীপের এবং সেই সময়ের যে সমস্ত বড় বড় শুষ্ক শাস্ত্রাভিমানী পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ভাসিয়া গিয়াছিল। সেই মূর্ত্তিমান প্রাণ আমাদের পুরুষ প্রকৃতি সমন্বিত মহাভাব-রসরাজ মুরতি প্রাণের নিমাই। তিনি তাঁহার ভালবাসা দিয়া বাংলা তথা ভারতের হৃদয়ের এক নিভৃত প্রদেশে স্থান করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু এই প্রাণের সঙ্গে আর একটি প্রাণ যে জড়িত ছিল তাঁহার কথা তো কেহ তেমন করিয়া বলে না! নিমাইয়ের তীব্র বৈরাগ্যের চাপে বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই পবিত্র প্রেম-সলিল ফল্গু নদীতে পরিণত হইয়াছে। তিনি নিমাইয়েব প্রেম প্লাবনে স্রোতের ফুলের মতন ভাসিয়া আসিয়াছিলেন, আবার স্রোতের ফুলের মতই এ সংসার হইতে চলিয়া গিয়াছেন শুধু রাখিয়া গিয়াছেন বাংলার বুকে এক বেদনার সুর।

আজ সেই বাঙ্গালীর ঘরের সরলা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন-কথাই একটু আস্বাদন করিব। সে দিনের মেয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া। নির্ম্মল হৃদয় তাঁহার, সে তো কিছুই জানিত না, সে তো কিছুই বুঝিত না, সে শুধু চাহিয়া থাকিত তাহার উপাস্য দেবতা নিমাইয়ের মুখের পানে। তাঁহার প্রাণের কথা তো ছিল,

'হরি সে তোমার সাধনার ধন,
তুমিই আমার হরি,
জীবন-সিন্ধু তরিতে সাধন—
তোমার পাদুকা তরী।'

বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের ভিতর দিয়া এক নূতন বেদ গড়িয়া উঠিয়াছিল। নিমাই ছিলেন ভালবাসার সাগর, সেই সাগরের যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী তাঁহার হৃদয়ে ছিল ভালবাসার কি উদ্বেল গতি! কিন্তু সেই গতিবেগ যিনি একখানি মুখের পানে তাকাইয়া, হৃদয়ের সমস্ত গতিকে স্থির অটল রাখিয়া স্বামীর বিশ্ব-

সেবার কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন, সেই বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের কত আদরের, কত ভালবাসার। বিষ্ণুপ্রিয়া যেন সর্ব্বংসহা পৃথিবী। সারা ভারত সেদিন যাঁহার জন্যে পাগল সেই নিমাই তো বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ ধন, কিন্তু সে ধনে সেদিন তিনিই ছিলেন বঞ্চিত। শরৎচন্দ্র লিখিয়াছেন, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও সরাইয়া দেয়'। বিষ্ণুপ্রিয়া তো সারা জীবন নিমাইকে দূরেই রাখিয়াছিলেন। শ্রীরাধা যেমন শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়াই রাখিয়াছিলেন, তিনি দ্বারকায় যাইয়া কোন দিন হানা দেন নাই, বিষ্ণুপ্রিয়াও পতিগৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া তাঁহার জীবনের দিনগুলি নিমাইয়ের ধ্যানে কাটাইয়াছেন। প্রতি বৎসর নবদ্বীপবাসিগণ নিমাইকে দেখিতে নীলাচলে যাইতেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া তো কোনদিনই নীলাচলে নিমাইকে দেখিবার জন্য যাইতে চাহেন নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়া বালিকা বয়সেই সারা নবদ্বীপে নিমাইয়ের রূপগুণের কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। নিমাইকে স্বামী রূপে পাইবার জন্য ত্রিসন্ধ্যা গঙ্গাস্নান এবং ঠাকুর মন্দিরে বসিয়া ভগবানের নিকট নিমাইকে পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতেন। একদিন গঙ্গার ঘাটে সেই ভক্তিমতী পরমাসুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া নিমাই-জননী শচী দেবী মুগ্ধ হইলেন। নিমাইয়ের উপযুক্ত কন্যা মনে করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, তোমার পিতার নাম কি? বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিভরে শচীদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—মা, আমার পিতার নাম সনাতন মিশ্র। শচীর আনন্দের আর সীমা নাই, ঘটক পাঠাইয়া নিমাইয়ের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সনাতন মিশ্রের প্রাণ-স্বরূপা কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া, তাঁহার যোগ্য স্বামী নিমাই ভিন্ন আর কেহ নাই, সনাতন মিশ্রের মনে মনে এইরূপ ইচ্ছাই ছিল। আজ ঘটকের মুখে সেই নিমাইকে জামাতা রূপে পাইবেন জানিয়া তাঁহাদের সকলেরই আনন্দের সীমা রহিল না। শুভদিনে শুভক্ষণে গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার মিলন হইয়া গেল। দুই বৎসর গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার দিনগুলি পরমানন্দের ভিতর দিয়া কাটিয়াছিল, এই দুই বৎসরই বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনে ধ্যানের জিনিষ হইয়া থাকিল। সরলা বালিকা বিষ্ণুপ্রিয়া জানে না এ সুখ-স্বপ্ন তাঁহার ভাঙ্গিবার দিন আসিয়া গিয়াছে, যে সুখের নীড় নিমাই-বিষ্ণুপ্রিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন, সে নীড় ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য বিশ্বপ্রেমের প্রবল ঝড় তাঁহাদের অভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে।

একদিন নিমাই মায়ের নিকট অনুমতি লইয়া গয়াধামে পিতৃকার্য্য করিতে গেলেন। সেখানে নিমাই ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ নিমাই নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। শচী-বিষ্ণুপ্রিয়া এবং নবদ্বীপবাসিগণের আনন্দের আর সীমা নাই, তাঁহাদের প্রাণ যে নিমাই; কিন্তু একি, এতো সেই হাস্যচপল নিমাই আর নাই, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরা, গম্ভীর মূরতি সকল দেহখানি ছাপাইয়া উঠিতেছে এক বিরহ বেদনা। বিষ্ণুপ্রিয়া আকুল নয়নে চাহিয়া থাকেন নিমাইয়ের প্রতি। এ কিসের বেদনা তাঁহার স্বামীর, তিনি তো কোনদিন ভাবিতে পারেন নাই, নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়া হইতে এমন উদাসীন হইতে পারেন। কৃষ্ণ-প্রেমে নিমাই ক্ষণে ক্ষণে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনে হয় ভূমিতে তাঁহার হৃদয় বিছাইয়া দেন, এ কি হইল বিষ্ণুপ্রিয়ার কপালে!' নিমাই কেমন করিয়া সুস্থ হইবেন বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাই ভাবেন এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। নিমাই ক্রমে সুস্থ হইলেন, মায়ের বেদনায় ব্যথিত হইয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে কিছুদিন কাটাইলেন। সুখের দিন বিষ্ণুপ্রিয়ার বুঝি ফুরাইয়া আসিল, গৌর প্রেমে গরবিণী বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন শুনিতে পাইলেন, নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। চতুর্দ্দশ বৎসরের বিষ্ণুপ্রিয়া এই নিদারুণ সংবাদে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন। নিমাই ছাড়া বিষ্ণুপ্রিয়া কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবেন, আকুল নয়নজলে বিষ্ণুপ্রিয়া রাত্রিতে স্বামীর চরণতলে এই আকুতি নিবেদন করিলেন। প্রেমের ঠাকুর, চতুর চূড়ামণি নিমাই, বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখের জলে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, আদরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুলিয়া লইয়া কত মধুর সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইলেন। সরলা বিষ্ণুপ্রিয়া পতির ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া পতির কোলে ঘুমাইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমাও, নিমাইয়ের মাঝে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া চিরজীবনের মত সমাহিত হও, পতির কোলে এই ঘুমই তোমার জীবনে সাধনা ও সিদ্ধি আনিয়া দিবে।

নবদ্বীপবাসীর ও শচী-বিষ্ণুপ্রিয়ার সে রাত্রি কাল-রাত্রি, নয়নের মণি নিমাইকে হারাইবার রাত্রি। আর এক দিকে দেখিতে গেলে, দেখা যায় বিশ্ববাসীর সে দিন সুদিন, তাহারা এই নিদারুণ ঘটনার ভিতর দিয়া এক নূতন তত্ত্বের আস্বাদন করিল। বহু-প্রসবিনী, প্রগতিশীলা প্রকৃতি, একের ধ্যানে তাহার গতিবেগ সংহত করিয়া একের মাঝে, পুরুষের মাঝে নিজে

নিশ্চিহ্ন হইয়া ডুবিয়া গেলেন। আর পুরুষ বহুর আহ্বানে ব্যাকুল হইয়া, নিজের একত্বের, পুরুষত্বের অভিমান ভুলিয়া প্রকৃতির বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়া, নিমাইকে বিশ্বের বুকে বিলাইয়া দিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন, নিমাইও বিষ্ণুপ্রিয়ার মাঝে নিজেকে মুছিয়া ফেলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনাকে বুকে লইয়া সুপ্ত বিশ্বের বুকে কৃষ্ণ-বিরহের আগুন জ্বালাইয়া দিলেন। দুইজন দুইজনের মাঝে মরিয়া বিশ্বের বুকে এক নূতন তত্ত্বের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। মরণের মাঝেই জীবন ফুটিয়া বাহির হয়, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার মরণের ভিতর দিয়াই শুষ্ক বিশ্বের বুকে ব্রজরস ধক্ ধক্ করিয়া জ্বালিয়া উঠিল। উপনিষদের 'ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' বাণীর বাস্তব রূপ বিশ্ব দেখিল।

বিষ্ণুপ্রিয়া ঘুমে বিভোর, নিমাইয়ের প্রাণ যে বাহির বিশ্বের ডাকে আকুল; কি করিবেন তিনি! একবার প্রাণ পুত্তলী বিষ্ণুপ্রিয়ার নিশ্চিন্ত মুখের পানে তাকাইতেছেন, আবার ঘর ছাড়িয়া যাইবার জন্য পা বাড়াইতেছেন, আর বলিতেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি ঘুমাও, নিশ্চিন্তে ঘুমাও, যদিও আমি দূরে চলিয়া যাইতেছি তবু আমি তোমারই। নিমাই নিশীথ রাত্রিতে নবদ্বীপ অন্ধকার করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি শেষে বিষ্ণুপ্রিয়া জাগিয়া নিমাইকে ঘরে না দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তাড়াতাড়ি শচীমাকে সংবাদ দিলেন, মা উঠিয়া নিমাই নিমাই বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কোথায় নিমাই? সে তো তাঁহার স্নেহের শিকল কাটিয়া পলাইয়াছে, ব্যাকুল হইয়া শচীমা খুঁজিতে লাগিলেন। সারা নবদ্বীপ নিমাই নিমাই বলিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিতে লাগিলেন, প্রতিধ্বনি বলিল নিমাই তোমাদের নাই, সে পালাইয়াছে। যুগে যুগে সেই চপল এমনই করিয়াই তো তাহার নিজ জনকে কাঁদাইয়াছেন, এবারেও কাঁদাইবেন।

মনে পড়ে আর একজনের কথা, আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এমনই করিয়াই একদিন নিশীথ রাত্রে গৌতম বুদ্ধ তাঁহার যুবতী স্ত্রী যশোধরা ও শিশুপুত্র রাহুলকে ফেলিয়া সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন বাহিরের দিক দিয়া বিচার করিলে আরও দুঃখের, বিষ্ণুপ্রিয়া মাত্র দুই বৎসর স্বামীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছিলেন। যশোধরা তাহার তুলনায় অনেকদিন গৌতমের সঙ্গে রহিয়াছিলেন এবং একটি সন্তানও তাঁহার অবলম্বন ছিল। শেষ জীবনে যশোধরা ভিক্ষুণী হইয়া শ্রাবস্তী নগরে থাকিয়া

স্বামীর দর্শন লাভ করিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর ভিটা ছাড়িয়া কোথায়ও এক পাও তো বাড়ান নাই, একদিন মাত্র তিনি স্বামীর সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। যে দিন গৌর সন্ন্যাসীর নিয়ম পালন করিবার জন্য নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন, সেইদিন বিষ্ণুপ্রিয়া চাহিয়া লইয়াছিলেন স্বামীর পাদুকা দুখানি, যাহা তাঁহার দীর্ঘজীবনের অবলম্বন ছিল। বিষ্ণুপ্রিয়ার বেদনার জীবন তো দীর্ঘ ছিল, মহাপ্রভু তাঁহার লীলা শেষ করিয়া চলিয়া গেলেও বিষ্ণুপ্রিয়া নবদ্বীপ থাকিয়া কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। প্রতিদিন তিনি হরিনাম ১৬ বার জপ করিয়া ১টি চাউল ধান হইতে বাহির করিতেন; এইভাবে সারা দিন রাত্রে যে চাউল হইত তাহা দ্বারা তিনি জীবন ধারণ করিতেন। এমনই করিয়াই তিল তিল করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গের প্রেম-যজ্ঞে নিজের জীবন আহুতি দিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে মায়ের নিকট বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, 'কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন, সন্ন্যাস লইনু যবে ছন্ন হইল মন'। বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদাইয়া এ কঠোর পথ লইবার কি প্রয়োজন ছিল, যিনি প্রকৃতিকে নিজের জীবনে হজম করিয়া গৌর হইয়াছেন, তাঁহার বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করার কোনই অর্থ হয় না। বড় প্রেম যে কেমন করিয়া বিশ্ব সেবার জন্য নিজ জনকে ছাড়িয়া রাখিতে পারে, শুধু সেই আদর্শই বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবন অবলম্বনে দেখাইয়া গিয়াছেন।

ভোগ বাসনায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে, বিষ্ণুপ্রিয়ার পবিত্র জীবন গাঁথা গাহিবার প্রয়োজন আছে। ধরিয়া রাখিবার শাস্ত্র আজ আর নাই, নূতন যুগে ছাড়িয়া রাখিবার শাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। যে ভালবাসায় বন্ধন আনে, উহা কাম; আর যে ভালবাসা ছাড়িয়া রাখিতে পারে, তাহাই প্রেম। এই প্রেম-ধনে ধনী বাংলার দুলাল-দুলালী, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউন।

মুক্তি

॥ শ্রীকল্যাণী প্রামাণিক ॥

জ্যৈষ্ঠের প্রভাত,
টাকা আনা পাইএর জটিল হিসাব নিয়ে
ভ্রূকুঞ্চিত আমার ললাট,
জানালার বাইরে দিনের পেয়ালা গেছে কাত হয়ে,
রোদের সোণালি শরবৎ পড়ছে গড়িয়ে,
চুমুকে চুমুকে পান করে মনের তৃষ্ণা মেটাবো—
এমন সময় নেই।

আঃ! হিসাবটা কিছুতেই মিলছে না।

হঠাৎ অন্যমনস্ক দৃষ্টি
জানালা পেরিয়ে পাশের ডোবাটার দিকে পড়ল।
জ্যৈষ্ঠের তাপিত ওষ্ঠ
শুষে নিয়েছে তার অনেকখানি জল।
ঢালু পড়ি বেরিয়ে পড়েছে,
তার গায়ে মাছরাঙাদের গর্ত।
অল্প জলে শালুকের পাতাগুলি নিশ্চিন্তে ভাসছে,
তপ্ত মৃদু বাতাসে আস্তে আস্তে কাঁপছে
সেই নিস্তরঙ্গ জল,
আর তার বুকে বুড়ো কাঁঠাল গাছটির ছায়া,
আলোর কুচি মাখামাখি।
পাড়ের কাছে কাদার মধ্যে
ভারী আরামে স্নান করছে দুটি শালিক পাখি,
তাদের পালক এলোমেলো,
তারা ঠোঁটে করে জল খাচ্ছে, ডানা ঝাড়ছে।

তাদের রোদ-ঝিকিমিকি ভিজে ডানার কাঁপন
ভুলিয়ে দিল আমাকে বদ্ধ আমি,
ভুলিয়ে দিল, জীবিকার প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে
ক্রীতদাস সভ্যতা আমার গলায় পরিয়েছে শৃঙ্খল,
লেহন করে নিচ্ছে আমার জীবন।
বনের পাখি
আমায় দিল মুক্তি হিসেবের খাতা থেকে,
প্রকাশিত করল আমার চিন্ময় সত্তা,
মনে পড়িয়ে দিল আমার অমৃতত্বের অধিকার।

এই বোলতার ঝিনঝিনানি দিয়ে গাঁথা
জ্যৈষ্ঠের সকাল বেলাটিতে
পাখি দুটির কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলেম॥

সাময়িকী

যুগদর্শন ও দলীয় রাজনীতিঃ সম্প্রতি বস্তী সম্পর্কিত সরকারী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বলিতে গিয়া একজন বিরোধী দলের নেতা বলিয়াছেন: 'কংগ্রেস সরকার বস্তী অপসারণের ছলে রাজনৈতিক মতলব সিদ্ধ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু আমরাও (সরকারবিরোধী পক্ষ) সেই উদ্দেশ্য কিছুতে হাসিল করিতে দিব না।' বক্তা তাঁহার উক্তি সরল ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন: 'গত নির্ব্বাচনে কলিকাতার যে জনমত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে, তাহার মোটা অংশটাই বস্তীর বাসিন্দা। সেই জন্যই কলিকাতা নগরীর বর্ত্তমান রাজনৈতিক চেহারা বদলাইবার জন্য সরকার তাড়াহুড়া করিয়া বস্তীর উন্নয়নে লাগিয়া গিয়াছেন।'

কংগ্রেস-বিরোধী দলের নেতা কংগ্রেস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, হয়ত বা তাহা আংশিক সত্য, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। আংশিক সত্য এই হিসাবে

বলি যে, বর্ত্তমান যুগের সমস্ত সঙ্ঘ পরিচালনাই চলিতেছে Polemic প্রণালীতে। 'Polemic is a method of combat'—দ্বন্দ্বের প্রণালী। যেদিন হইতে পার্টি গভর্ণমেণ্ট আমদানী হইয়াছে, সেই দিন হইতে এই 'বিরোধ' পাকা পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ঐ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তাহা প্রমাণিত হয় কংগ্রেস কর্ত্তৃক গত নির্ব্বাচনের একেবারে মুখে বাঙলা বিহার মাদ্রাজের ও বৃহত্তর বোম্বাইয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা দ্বারা। কংগ্রেসের উক্ত দুই সিদ্ধান্তকে একদল কংগ্রেসীই নিতান্ত অদূরদর্শিতার পরিচায়ক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছে। কেননা নির্ব্বাচনের ফল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যাইবে, গিয়াছেও। কংগ্রেসের উক্ত সিদ্ধান্ত নির্ব্বাচনের প্রয়োজনে নিতান্ত ভ্রান্ত নিশ্চয়ই। কংগ্রেসের বিরুদ্ধদের অভিযোগের মধ্যে সত্য থাকিবার যথেষ্ট সম্ভাবনাও আছে। কেননা বর্ত্তমানের সব রাষ্ট্র-পরিচালনা, সব কমিটি-পরিচালনা পার্টি-লাইনেই চলে। ইহাই হইল Polemic method বা method of combat (দ্বন্দ্ব-প্রণালী)। এই প্রণালী সত্য অনুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া উহা বিশ্বের কোনই সত্য দিক্‌দর্শন করিতে পারে নাই, সমস্যার সমাধান আনয়ন করিতে পারে নাই। বিশ্বে একান্ত এই দ্বন্দ্ব-প্রণালী অচল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে। আজ চলিবে প্রতি ঘটনার critical study বা method of research—গবেষণা প্রণালী। 'Polemic is a method of combat; criticism is a method of research. Polemic only sees the feebleness of the adversary and the strength of the thesis that is defended; criticism sees the weakness and strength of both sides. Polemic is engaged beforehand, and pursues a determined aim; criticism is disinterested, and lets itself be led to the result by analysis and examination. Criticism is methodical doubt; it is therefore the philosophic method *par excellence.* In a science in which one has not at his disposal the methods of rigorous verification possessed by the other sciences namely, experiment and calculation, in a science in which one has only reasoning at his dis-

posal, if one is content with a one-sided reasoning that only presents things under one aspect, one will doubtless be able to think what one pleases, and each one, thinking for his part, will have the same right; but there will then be as many philosophies as individuals, and no common, no objective philosophy. Philosophic reasoning, it seems to us, to compensate for what it lacks on the side of rigorous verification, ought therefore to control itself, to be two-sided, to examine at once the *pro* and the *contra*, —in fine, to be what the English call *cross-examination*'.— Preface to the second edition of 'Final Causes' by Paul Janet. উপরোক্ত উক্তির কিছু পরেই গ্রন্থকার লিখিতেছেন, 'Our aim then was much less the criticism of the adversaries of this principle, than the criticism of this principle itself: for the more we have it at heart, the more ought we to assure ourselves of its solidity. To found a doctrine only on the negation of the opposite doctrine is a frail foundation, for, because others are wrong, it does not follow that we are right; and because our objections are strong, it does not follow that the objections of the opponents are weak. This account taken of the objection is sometimes regarded as a complaisant concession, inspired by the exaggerated desire of peace. An absolute error! It is, on the contrary, a method of verification, which replaces, very imperfectly no doubt, but in a certain measure, the verification of experiment and calculation. The objection in metaphysics is the part of the forgotten and unknown facts. To suppress the objection, or to express it softly, is to suppress one side of the facts, it is to present the part of the things that suits us, and to dissemble that

which does not suit us, it is to take more care of our opinion than of the truth itself. If, by this cross-examination, the truth appears much more difficult to discover, it is not our fault, but that of the nature of things; but an incomplete truth, expressed in a modest way, is worth more than a pretentious error or an emphatic prejudice'.—Preface to the second edition, p. XV.

বিশ্বের রাজনীতিক্ষেত্রই যে শুধু দলীয় তাণ্ডবে কলুষিত ও ভদ্রতা-বিবর্জ্জিত, ঘৃণাকারজনক, সমগ্র মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল হইয়াছে, তাহাই নয়, বিশ্বের সব দর্শন-শাস্ত্র দলীয় দর্শনে পরিণত হইয়া ক্লেদাক্ত, সুস্থ জীবন্ত মানুষের গ্রহণের অযোগ্য। বিশ্বের সমাজ দলের টানাটানিতে অচল, মনের চিন্তাধারার পঙ্গুত্বের ফলে আজ সত্য-অনুসন্ধানের পথ বিশ্বে প্রসারিত হইতে চাহিতেছে। সর্ব্বদল আজ পরস্পর দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এক সমগ্র মানুষের সমাজ গড়িয়া তুলিবে। ধর্ম হউক, রাজনীতি হউক, সমাজ হউক—কোন ব্যাপার লইয়াই সতীনের ঝগড়া আজ আর চলিবে না। সতীন কখনও বস্তুতন্ত্র হয় না—নিজের স্বার্থের সঙ্গে সে এমন একাত্ম হইয়া গিয়াছে যে, বস্তুকে তার নিজস্ব মূল্যে সে দেখিতে পারে না। শ্রীনিত্যগোপাল এই 'method of research' অবলম্বন করিয়া লিখিতেছেন: 'আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়, আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ি আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। বাহ্যিক জপতপ পূজা অর্চ্চনাও নাই, কুলগুরুর কাছে কাণে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চ্চনা জপই আস্তিকের কার্য্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে তো আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে; স্বচ্ছ সরোবরে, প্রবাহিণী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; সেইজন্য আমার

এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল। শাক্ত শৈব গাণপত বৈষ্ণব খৃষ্টান মুসলমান সকল জাতি সকল সম্প্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন।'

অন্যত্র তিনি লিখিলেন: 'সিদ্ধান্তদর্শনে দ্বৈততত্ত্ব সমর্থনও আছে, অদ্বৈততত্ত্ব সমর্থনও আছে এবং দ্বৈতাদ্বৈত উভয় তত্ত্ব সমর্থনও আছে। ঐ সিদ্ধান্তদর্শনে দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধে সমন্বয়ও আছে।

সিদ্ধান্তদর্শনে দ্বৈততত্ত্ব খণ্ডনও আছে, অদ্বৈততত্ত্ব খণ্ডনও আছে, দ্বৈতাদ্বৈততত্ত্ব খণ্ডনও আছে।'—বিবিধতত্ত্ব পৃঃ ৫৮৪। শ্রীনিত্যগোপাল বর্ত্তমান যুগের মানুষের সামনে উপরোক্ত 'critical study'-র পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। প্রথমে তিনি ইহা দর্শন-ক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন; এখন ইহা ধীরে ধীরে সর্ব্বক্ষেত্রে সঞ্চারিত হইতেছে। তিনি যেমন অদ্বৈতবাদের পক্ষের (pro) ও বিরুদ্ধের (contra) যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনি দ্বৈত ও অদ্বৈত তত্ত্বের ও দ্বৈতাদ্বৈতের পক্ষের ও বিপক্ষের যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। কোনও মতবাদ বা দলই তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় নন। বর্ত্তমান যুগে একজনই পুরুষ শ্রীনিত্যগোপাল, যিনি বলিতে পারেন:—'সমোঽহম্ সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ'—গীতা।

দ্বৈততত্ত্ব, অদ্বৈততত্ত্ব কিছুই তাঁহার একান্তভাবে প্রিয় বা দ্বেষ্য নয়। তিনি কাহাকেও নিয়া 'দল' গড়িবেন না। তাঁহার 'এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল'। তাই তিনি লিখিতে পারিলেন, 'যিনি ভগবান সম্বন্ধীয় সকল মত স্বীকার না করেন, তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা বোঝেন নাই। তাঁহাকে প্রকৃত ধার্ম্মিকও বলা যায় না'।

'সকল দল লইয়া এক অখণ্ড দল'—শ্রীনিত্যগোপাল প্রদত্ত এই বাণী শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রেই তো আজ আর নাই, ইহা পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। শ্রীনিত্যগোপালই বর্ত্তমান যুগের আদি পথিকৃৎ। এই পথ শুধু toleration-এর নয়। ইহা সকল তত্ত্বকে লইয়া, ইহা সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে লইয়া, সকল রাজনৈতিক দলকে লইয়া একটী সামগ্রিক সত্তা গড়িয়া তুলিবার উপযোগী সমন্বয়। তিনি লিখিতেছেন: 'ধর্ম্ম তো বহু নয়। আমি তো জানি একই ধর্ম্ম আছে। সাম্প্রদায়িক মত সেই একই ব্রহ্মের নানা শাখা প্রশাখা।' বিশ্বরাজনীতি ক্ষেত্রে পঞ্চশীলদ্বারা কি ইহারই সূচনা হয় নাই? যাহা আদর্শরূপে আসিয়াছে, ধীরে ধীরে তাহা কার্য্যাত্মক রূপে গড়িয়া উঠিবে। 'এক পরমেশ্বর আকারে, রূপে ও নামে

অসংখ্য। কিন্তু তাঁহার সকল আকার, সকল রূপ আর তিনি অভেদ। ফলের শাঁস, খোসা ও আঁঠি আকারে রূপে ও নামে এক নয়, অথচ তিনে অভেদ।' 'আমি অভেদবাদীও বটে, প্রভেদবাদীও বটে।' যুগদর্শনকে ডিঙ্গাইয়া কোন দলীয় ধর্ম্ম, দলীয় শাস্ত্রব্যবস্থা, দলীয় তর্কবিদ্যা (Induction or deduction), দলীয় পদার্থবিদ্যা, দলীয় জীবন, সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম, দলীয় রাজনীতি-সমাজনীতি কিছুই চলিবে না। যত বিরুদ্ধই হউক না কেন, সমগ্রের মধ্যে তাহারও একটি স্থান আছে। বাদ (thesis), বিবাদ (antithesis) দুই-ই সম্বাদের (synthesis) মধ্যে 'সম'। প্রত্যেকের প্রভেদ রাখিয়া প্রত্যেকের সঙ্গে অভিন্ন হইবার যুগই বর্ত্তমান যুগ। 'তোমার মহা বিশ্বে প্রভু হারায় না তো কিছু।'

'To found a doctrine only on the negation of the opposite doctrine is a frail foundation; for, because others are wrong, it does not follow that we are right; and because our objections are strong, it does not follow that the objections of the opponents are weak'—এই নীতি যদি বিধান সভার দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী সদস্যগণ মানিয়া লইতেন, দেশ সম্বন্ধে সত্য দৃষ্টি তাঁহাদের লাভ হইত। কিন্তু আজ কি দেখিতেছি? কংগ্রেসকে, যেহেতু তাহার হাতে রহিয়াছে শাসন ক্ষমতা, তাহাকে যখন তখন যে সে ভাবে নিন্দিত, বিকৃত বা ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য কি চেষ্টাই না চলিতেছে! যাহারা নিজেদের বিপক্ষের কথা বলিতে পারে না, তাহাদের পক্ষে অপরের দোষ কীর্ত্তনের অধিকার নাই। নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে সম্যক্ চেতন না রাখিয়া যাহারা অপরের দোষ সম্বন্ধেই শুধু সচেতন, তাহারা মিথ্যাচারী, তাহারা কিছুতেই বিশ্বে সাম্যবাদ আনিতে পারিবে না। বিশ্বনাথের ব্যবস্থায় ইহাদের মরণ অনিবার্য্য। সর্ব্বক্ষেত্রে 'সম' পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন, বিশ্বের বুকে সর্ব্বক্ষেত্রে সাম্যবাদ জমিয়া উঠুক। বন্দে মাতরম্।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

চৈত্র, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

শ্রীনিত্যগোপাল

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

আবির্ভাব : ১৩ই চৈত্র, ১২৬১
রবিবার, বাসন্তী-অষ্টমী

তিরোভাব : ৭ই মাঘ, ১৩১৭
শনিবার, কৃষ্ণা-পঞ্চমী

'শ্রীনিত্যগোপাল পরম রূপবান। চম্পক এবং গলিত সুবর্ণের ন্যায় তাঁহার সুন্দর কান্তি। তাঁহার মুখপদ্ম হইতে আনন্দ স্ফুরিত হইতেছে। তাঁহার মুখমণ্ডলে কোটি কোটি প্রভাকর-বিনিন্দিত তেজঃ-পুঞ্জ প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য। তাঁহার নিরুপম মহাভাবের তুলনা নাই। তিনি জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানানন্দ। সমস্ত দিব্যভাবই তাঁহা হইতে বিকশিত হইয়া থাকে। তাঁহার নলিন নয়নদ্বয়ে কত কমনীয় জ্যোতি বিলসিত রহিয়াছে। তিনিই মহানির্ব্বাণের কারণ। তাঁহার কৃপায় কত পতিত জীবও পরম ভক্ত হইয়াছে। তাঁহার দিব্য বিভূতিনিচয়ের মধ্যে পরাভক্তিও একটি বিভূতি। তিনি যে পরম প্রেমিক, সর্ব্বজীবে তাঁহার প্রেম আছে। তিনি পরম দয়াল। তাঁহার অহৈতুকী দয়া। তিনি নিত্যানন্দ ব্রহ্ম সনাতন। সমস্ত বিধিনিষেধ তাঁহার কিঙ্করস্বরূপ। তিনি সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। আমি তাঁহাকে পাইবার জন্য তাঁহার চিন্ময়ী মূর্ত্তি ধ্যান করি।'—শ্রীনিত্যগোপালের শ্রীহস্ত-লিখিত আত্মধ্যান।

নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল নিত্যগোপাল—অনন্য হয়ে এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে দেহে মনে চিত্তে এক প্রশান্তি নেমে আসে!

কেন ?

কেননা মানুষের যেটা শেষ প্রশ্ন, যেটা তার অস্তিত্বের কারণ, সেই জীবন-চোদনার শেষ উত্তর—অশেষের এই দেশে শেষ বলে কিছু না থাকলেও বিশেষ কালে বিশেষ আবেষ্টনে ব্যবহার-জীবনে শেষ বলে একটা কিছু ধরে নেওয়া যেতে পারে যদি সেই শেষও অশেষ-ধর্মী হয়, সেই অর্থেই শেষ বলা—পাই শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও তাঁর প্রস্থাপিত জীবন-দর্শনের মধ্যে। মানুষ সব চেয়ে বিপন্ন কোন্‌খানে ? যেখানে তার জীবন-প্রবর্ত্তনার কারণ হৃদয়ের সঙ্গে তার বোঝাপড়ায় গোলমাল হয়ে যায়। হৃদয়েশ্বর শ্রীনিত্যগোপালে এই বোঝাপড়ার তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যাবে আধুনিকতম ভাষায়। সেইজন্যই শ্রীনিত্যগোপাল-নামে দেহে মনে চিত্তে শান্তি ঝরে' পড়ে।

আরও কেন ? কেন শ্রীনিত্যগোপাল-নামে প্রশান্তি নেমে আসে ?

কেননা তিনি আমাদের ভালবাসেন আর সেই ভালবাসার মধ্য দিয়ে আমাদের জীবত্বকে ভগবত্বে গড়ে তোলবার পথ-রেখা তিনি রেখে গেছেন।

তিনি এত বড় অথচ তিনি আমাদের ভালবাসেন—এ কী করে সম্ভব হল ? সম্ভব হল কেননা তাঁর প্রেম স্বপ্রকাশ—স্বভাবতঃই তা ঝরে পড়ছে—তাই আমার মত পাত্রেও তা এসে পৌঁছেছে। তাই তাঁকে আমার প্রণাম পৌঁছাতে পারি, কেননা তিনি তা আপনি এসে গ্রহণ করেন। আজ শুভ বাসন্তী অষ্টমীর তাঁর এই ১০৪-তম জন্মতিথির পুণ্য ক্ষণটিতে তাঁকে নিবেদন করি আমার সকল সত্তার অঞ্জলি। তিনি নেবেন বলেই তাঁকে এ দেওয়া চলে। আমার জীবনে, বিশ্ব-জীবনে তিনি জয়যুক্ত হোন।

একশ তিন বৎসর আগে তিনি এসেছিলেন, চলে গেছেন সে-ও আজ কত কাল—সাতচল্লিশ বৎসর হয়ে গেল। কী তিনি নিয়ে এসে ছিলেন ? কী তিনি রেখে গেছেন ?—নিয়ে এসেছিলেন দুর্বোধ্য এক অদ্ভুত সহজ জীবন—যা মূক থেকেও কথা কইছে মানুষের অবচেতন সত্তায়। শ্রীনিত্যগোপাল অদ্ভুত দুর্বোধ্য, কেননা শ্রীনিত্যগোপাল অদ্ভুত সহজ। সত্যের যতক্ষণ এক দিককে দেখা যায়, ততক্ষণ তাকে আয়ত্ত করার প্রচেষ্টা তবু সহজ-সাধ্য ; কিন্তু সত্যের যখন দুই দিকই সমান দাবী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে' বসে—মানুষ আর সেখানে থই পায় না। মার্কস্‌বাদ জগতে আসবার আগে সত্যের ছিল এক রকম রূপ, মার্কস্‌বাদ এসে তার আর একটা দিককে খুলে ধরেছে। তারপরের আজকের দিনের সহজ কথা হচ্ছে কোনো বাদেরই তার প্রতিবাদ

একান্ত সত্য হয় না—সত্য আছে তুইটেতেই—মিলবে তারা উচ্চতর আর একটা বোধিতে, যা হৃদ্‌গত বা যা চিত্তের প্রশান্তির মধ্যে ধরা পড়ে। এই কথাটা জানাতেই শ্রীনিত্যগোপাল প্রায় সত্তর আশী বছর আগে লিখলেন তাঁর সিদ্ধান্তদর্শন নামক অদ্ভুত দার্শনিক গ্রন্থে, 'এই সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থ অদ্বৈতবাদের বিরোধী নহে। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা। এই সিদ্ধান্তদর্শনের অনেক স্থলেই অদ্বৈততত্ত্বের প্রতিকূল বিচারসকলও দৃষ্ট হইবে। সে সকলের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকৃত অদ্বৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সমস্ত অদ্বৈতবাদ-প্রতিপাদক গ্রন্থালোচনা করিলে, দ্বৈতাদ্বৈতের সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রুতিমতে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলিতে হয়। সেইজন্য সমস্ত সিদ্ধান্তদর্শনে অদ্বৈততাই আদৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শ্রুতিতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে বলিয়া খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই ব্রহ্ম বলিতে হয়। অবধূত-গীতানুসারে ভগবান দত্তাত্রেয়-নির্দ্দেশিত 'সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিখ্যাতং ব্রবীতি বহুধা শ্রুতিঃ' বলিয়া সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ে বিরোধ নাই, সেইজন্য খণ্ডনাখণ্ডন উভয়ই 'এক-তত্ত্ব' —সেইজন্য উভয়ই 'অভেদতত্ত্ব'—সেইজন্য উভয়ই 'অদ্বৈত'।'

ষাট বৎসর আগে প্রথম প্রকাশিত, আর তার কতদিন আগে যে লেখা তা আমাদের জানা নেই, এই সিদ্ধান্তদর্শন গ্রন্থের এই উপসংহারটুকুতে যে একটা ব্যাপক ও গভীর জীবন-চেতনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তা আমাদেরকে বিস্মিত করে, এর আধুনিকতা আমাদেরকে চমৎকৃত করে। মনে হয় এ জিনিষ বুঝবার মত হৃদয়মনের অবস্থা আজও আমরা লাভ করি নি—সহাবস্থান নিয়ে রাজনীতির মত জটিল স্বার্থ নিয়ে হানাহানি করার সম্ভাবনাপূর্ণ ক্ষেত্রে এতদিন ধরে এত কথা শোনবার পরেও। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের সমন্বয়, প্রতিবাদ ও অপ্রতিবাদের সমন্বয়, খণ্ডন ও অখণ্ডনের সমন্বয়—চিন্তাধারার এই যে তুর্লভ বৈজ্ঞানিকতা—এই কথা মনে করেই শ্রীনিত্যগোপাল-নামে দেহে মনে চিত্তে প্রশান্তি নেমে আসে।

এমন করে ভাবতে পারলে, আমার বিরুদ্ধকে আমারই অপরার্ধ বলে মনে করে' তু'য়ে মিলে এক সমগ্রকে দেখতে পারলে চিত্তের যে সমাহিতি লাভ হয়, অন্তরে-বাইরে যে বিশ্ববোধ জাগ্রত হয়ে ওঠে, তার খবর দিয়েছেন বলেই শ্রীনিত্যগোপাল-নাম এমন করে শান্তি এনে দেয়।

সত্যের সমগ্র রূপকে দেখতে চাইলে আমার পক্ষের ও বিপক্ষের সমস্ত দৃষ্টিকোণকেই ভেবে দেখবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে ফরাসী দার্শনিক পল জেনেট লিখলেন, '...if one is content with a one-sided reasoning that only presents things under one aspect, one will doubtless be able to think what one pleases, and each one, thinking for his part, will have the same right ; but there will then be as many philosophies as individuals, and no common, no objective philosophy. Philosophic reasoning...to compensate for what it lacks on the side of rigorous verification, ought therefore to control itself, to be two sided, to examine atonce the *pro* and *contra*,.... To found a doctrine only on the negation of the opposite doctrine is a frail foundation ; for because others are wrong, it does not follow that we are right, and because our objections are strong, it does not follow that the objections of the opponents are weak. ..To suppress the objection, or to express it softly, is to suppress one side of the facts ; it is to present the part of the thing that suits us, and to dessemble that which does not suit us ; it is to take more care of our opinion than of the truth itself.'

আজকের দিনে চিন্তাধারার এই বৈজ্ঞানিকতা, এই গভীরতা ও ব্যাপকতাই তো নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। সত্যের সর্বরূপের প্রকাশই এই প্রয়োজনকে ত্বরান্বিত করেছে। আর সত্যের এই সর্বরূপের আত্মপ্রকাশের জন্যই জীবনের সহজ রূপই আজ কাম্য—শ্রীনিত্যগোপাল সেই সহজ রূপের একটী পরম কমনীয় মূর্তি। তাঁর বাইরের রূপখানিই যে শুধু এমন অপরিসীম কমনীয় আর সহজ ছিল, তাই নয়; তাঁর অসনভূষণ ছিল সহজ, চালচলন ব্যবহার ছিল সহজ—তাঁর সব কিছুই ছিল অদ্ভুত সহজ আর অদ্ভুত কমনীয়। সেইজন্যই তা ছিল সর্বসাধারণের। বর্তমান যুগ সহজের যুগ—আজ কোন কিছু দিয়েই—ঐশ্বর্য হোক অনৈশ্বর্য হোক, বৈরাগ্য হোক অবৈরাগ্য হোক,

ধর্ম হোক অধর্ম হোক, বিদ্যা হোক, বুদ্ধি হোক, শ্রম হোক কিংবা যা কিছু হোক, কোন কিছুরই আতিশয্য দিয়ে মানুষকে বিমোহিত করা আজকের মানুষের কাছে সহনীয় নয়। যে কোন আতিশয্যকেই আজ মানুষ দানবীয় বলে মনে করে। দানবীয় এ আতিশয্য যে আজও মানুষকে মুগ্ধ করে না, তা নয় বটে—কিন্তু এটা খুব সত্য কথা যে, সাধারণ বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান মানুষের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা আজ সহজ মানুষ হওয়ার জন্য, সহজ মানুষকে পাওয়ার জন্য এবং মনে হয় সত্যের এই সর্বরূপের প্রকাশ আরও কিছুকাল ধরে চলবে বলে' আগামী দিনের মানুষ আরও বেশী করে এই সহজকে পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে। শ্রীনিত্যগোপাল সেই সহজকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মেটাবেন। সহজ বলেই তিনি সর্বসাধারণের। তাঁর খাওয়া পরা যেমন ছিল সব সাধারণের মত, তেমনি তাঁর স্নেহও ছিল সর্বসাধারণের জন্য। যারা পতিত, যারা দীনহীন দরিদ্র, যারা একেবারে সাধারণ—প্রাণবল্লভ শ্রীনিত্যগোপালের স্নেহ সেই সবসাধারণদের জন্য। তাঁর কোন কিছুই তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন না যা অপরকে যাকে বলে বিমোহিত করে—সেদিকে তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁর মধ্যে এমন কতকগুলি কিছু ছিল যা সাধারণ নয়, যা দুর্লভ, যা ঐশ্বর্য, যা বিভূতি। কিন্তু তাঁর সেই অসাধারণত্বকে তিনি প্রাণপণে গোপন করবার প্রয়াস করতেন; সাধারণ হয়ে সহজ হয়ে, মানুষের আপন জন হয়েই মানুষের কাছে প্রকাশ পেতে চাইতেন। যদিও অনেক সময়ই তা সম্ভব হতো না, কেননা দিনের মধ্যে অর্দ্ধেক সময়ই বোধহয় তাঁর সমাধিস্থ অবস্থায়ই কাটত। কিন্তু যখনই তিনি ফিরে আসতেন এই জগতের বুকে, তখনই এমন আপন জনের মত মানুষের কাছে উপস্থিত হতেন যেন তিনি একজন পরম আত্মীয় মাত্র। তাঁর বিভূতি দিয়ে, ঐশ্বর্য দিয়ে মস্ত মস্ত বই হতে পারবে, তবু এ কথাই তাপিত ক্লিষ্ট বর্তমান যুগের মানুষের কাছে সব চেয়ে বড় কথা যে, সাধারণ মানুষের কাছে তিনি সহজ হয়ে সাধারণ হয়ে প্রকাশিত হতে চেয়েছেন!

দীর্ঘকালের ব্যক্তিগত পারিবারিক সামাজিক দেশজ প্রভৃতি নানাবিধ সংস্কার দিয়ে মানুষ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, তবু যদি ধীরভাবে মানুষের স্বরূপ সম্বন্ধে ভাবা যায়, তাহালে দেখতে পাই সহজ মানুষ-ত্ব বলে একটা বস্তু আছে যেখানে দেশ কাল বা কোনো সংস্কারেই মানুষ আবদ্ধ নয়—সেইটে তার আত্মা—সেইটে তার স্বরূপের পরিচয়। এই স্বরূপের পরিচয়টীকে, এই

আত্মাকে লাভ করবার জন্য মানুষের মধ্যে একটা গভীর আকুতি আছে—যদিও কতটুকুই বা সে পারে, কী-ই বা তার ক্ষমতা। তবু একে মানুষের চাই-ই। এইখানে যে সে সকল মানুষের সঙ্গে এক। নিজেকে সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে মানুষ সংস্কারাবদ্ধ হয়ে। নিজেকে সর্বভূতের সঙ্গে এক করে দেখাতেই মানুষের আত্মস্বরূপ তৃপ্ত হয়। মানুষের আত্মস্বরূপ এই সহজ মানুষটীর খোঁজ দিতেই শ্রীনিত্যগোপাল লেখেন নিজের জীবনের ভাষায়, 'আমি বৈষ্ণব নহি কারণ তাহাতে তিলক কেটে ভেক নিতে হয়; আমি বৈষ্ণবের দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। দাড়ি আছে বটে কিন্তু কাজি মৌলভির নিকট কলমা পড়ে মুসলমান হই নাই, মুসলমানের দলের মুসলমান কেবল মুখে বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। ব্যাপটাইজড না হইলে খৃষ্টান দলের বলিলে তাহারা আমাকে নিবে না। বাহ্যিক জপ তপ পূজা অর্চ্চনাও নাই; কুলগুরুর কাছে কাণে ফোঁকা মন্ত্রও লইতে চাহি না—ইহাতে সাধারণ হিন্দুরা আমাকে নাস্তিক বলিবেন। বাহ্যিক পূজা অর্চ্চনা জপই আস্তিকের কার্য্য তাঁহারা বলেন। এখন কোন দলে ত আমাকে লইবে না, আমিও দল চাই না। দল গেড়ে ডোবাতেই, পঙ্কিল পঙ্ক পরিপূর্ণ পূতিগন্ধযুক্ত পল্বলেই হইয়া থাকে, স্বচ্ছ সরোবরে প্রবাহিণী স্রোতস্বিনী নদীতে হয় না। তবে আমি কি? আমি সকল দলের ভিখারী। ভিখারীর জন্য সকল দ্বারই উন্মুক্ত। আমাকে প্রেম ভক্তি ভিক্ষা সকল দলের সাধুরাই দিয়া থাকেন। আমি সকল দলেই ভিক্ষা পাই; সেইজন্য আমার এক সকল দল লয়ে অখণ্ড দল। শাক্ত শৈব গাণপত বৈষ্ণব খৃষ্টান মুসলমান সকল জাতি, সকল সম্প্রদায়ই আমাকে ভিক্ষা দিয়া থাকেন।'

কী একটা অপূর্ব মুক্তির কল্পনা নয়? বিচিত্র এই জগতের বিভিন্নতায় বিচিত্র আস্বাদন, অথচ অন্তরে সে আস্বাদন এক আত্মস্বরূপের ধ্যানে লীন—এক মানুষত্বে তার শেষ বিশ্রাম।

জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্ররূপিণী…
অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তরবাসিনী।

বহুকে আস্বাদন করেও একৃকে পাওয়ার এই তত্ত্ব যেমন জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, তেমনি অধ্যাত্ম জগতেও।

সমস্ত ধর্মমত যতক্ষণ আমারই ধর্মমত নয়, ততক্ষণ তা আমার কাছে ধর্ম নয়, ততক্ষণ তা আমার পক্ষে সত্যও নয়—তাকে সত্য বলা কপটতা। কেননা যা আচরণ উপলব্ধি ও প্রচার করতে পারি না, তাকে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি দেওয়া সত্য ভাষণ নয়। সাম্প্রদায়িক মতবাদ বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ধর্ম একই। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে শ্রীনিত্যগোপাল কত কথাই লিখে গেছেন। তিনি লিখছেন, 'ধর্ম্ম তো বহু নয়। আমি তো জানি একই ধর্ম আছে। সাম্প্রদায়িক মত সেই একই ধর্ম্মের নানা শাখা-প্রশাখা।' 'যিনি ভগবান সম্বন্ধীয় সকল মত স্বীকার না করেন, তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা বোঝেন নাই। তাঁহাকে প্রকৃত ধাম্মিকও বলা যায় না।' 'পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সকল মতে যখন তোমার সমান শ্রদ্ধা হইবে, তখনি তুমি প্রকৃত আস্তিক হইবে। এখন তুমি আস্তিকও নও, নাস্তিকও নও।' 'এক পরমেশ্বর আকারে রূপে ও নামে অসংখ্য। কিন্তু তাঁহার সকল আকার সকল রূপ আর তিনি অভেদ। ফলের শাঁস, খোসা ও আঁঠি আকারে রূপে ও নামে এক নয়, অথচ তিনে অভেদ।' সংসারের বহু বিচিত্র আস্বাদনে যেমন, তেমনি ধর্ম জগতেরও বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে একখানি আস্বাদনে মানুষের সহজ ধর্ম পরিতৃপ্ত হলে মানুষ উপাধি-বিনির্মুক্ত হয়। নয়তো জগতের বহু মতবাদের, বহু মনোবৃত্তির আস্বাদনেও শুধু তৃপ্তি নেই, শুধু এক নিয়েও মানুষের চলে না। শ্রীনিত্যগোপাল এক থেকেও, অন্তরে স্থিতি লাভ করেও সর্বভূতের ক্ষেত্রে বিচরণ করবার জীবন ও তত্ত্ব রেখে গিয়ে আধুনিকতম চিন্তাধারায় ও জীবন-যাপনে পথিকৃৎ। সত্যের সর্বার্থও এইখানে সার্থক।

ঐকদেশিক পথে চিন্তা করতে ও জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত মানুষের কাছে শ্রীনিত্যগোপাল ঐ সর্বাত্মক পথ-রেখাটী এঁকে দিয়ে গেছেন। সেইজন্য তাঁকে আমরা সহজে বুঝে উঠতে পারি না। সর্ব ভাবের চিন্তাধারাই তার মধ্যে পাওয়া যাবে বলে তাঁর বই পড়ে হঠাৎ বোঝা যেতে চায় না যে, তিনি কি বলতে চান। তাঁর জীবন-যাপনেও তাই—কখনও তিনি অতিরিক্ত সনাতনী—ডাক পিয়নের হাত থেকে নেওয়া পোষ্ট-কার্ডখানাতেও গঙ্গাজল ছিটিয়ে নেন, আবার কখনও তিনি তাঁর নিজের সম্বন্ধে নিজের কথা সপ্রমাণ করে দেন—'সমস্ত বাধানিষেধ তাঁর কিঙ্কর স্বরূপ,' 'অবধূত কোনো নিয়ম নিষেধের অনুবর্ত্তী বা বিদ্বেষ্টা নহেন।' তখনকার অবস্থা হচ্ছে দীর্ঘ দিনের ব্যবহারে পরিহিত বস্ত্র কলুর তেল-ছোপানো কাপড়ের

মত্ত হয়ে গেলেও তা ছাড়া হয়ে ওঠে না, সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই—একে তো দিনের পর দিন এক মহাভাবের আবেশে সমাহিত হয়ে সমাধিস্থ হয়ে কেটে যায়, তা ছাড়া জাগ্রত অবস্থায় থাকলেও এতখানি কৃচ্ছ্রতা তাঁর যেন স্বভাবসিদ্ধ। আবার তাঁর লেখার পেনসিলটী এত ছোট হয়ে গেছে যে, তা আর ধরে লেখা যায় না, তখন তার সঙ্গে কাগজ জড়িয়ে তাই দিয়ে লেখার কাজ সারছেন। বিশ্বকে তিনি পারমার্থিক সত্তায় স্বীকার করেন, অথচ সমস্ত জীবনখানা তাঁর নিরঙ্কুশ বৈরাগ্য, কৃচ্ছ্রতা আর ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি। এমনি করেই তিনি অদ্ভুত সাধারণ, অদ্ভুত সহজ, আবার সেই সঙ্গেই সব কিছুকেই ছাড়িয়ে যান! জীবনের দৈনন্দিনতায় তাঁর অদ্ভুত নিপুণতা প্রকাশ পেতো যা মনে হতো দীর্ঘ দিনের অভ্যাসের ফল। অথচ অভ্যাস বোধহয় এক দিনেরও ছিল না বলা চলে, কেননা দৈনন্দিনতার জীবন তিনি যাপনও করেন নি, এদিকে মন দেবার তাঁর সময়ও ছিল না। তিনি জগৎকে, জাগ্রত অবস্থাকে সর্বার্থে সত্য স্বীকার করেই তাকে অত্যতিষ্ঠৎ করে অবস্থান করতেন। বিপরীতের সমন্বিত-মূর্ত্তি তিনি তাই সাধারণ হয়েই অসাধারণ; তিনি তাই সবশুদ্ধ একজন সহজ সুন্দর আপন জন, যিনি একান্ত আপন হয়েও বহু দূরের!

আ'ট বৎসর বয়স পর্যন্ত এক অপূর্ব-দর্শন বালকের সহাস্য আনন্দোজ্জ্বল মধুর দিনগুলি কেটেছে মা দিদিমা আর দিদির কোলে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত পানিহাটী গ্রামের মাতুলালয়ে। এর মধ্যে মধ্যেও বহু ঘটনা ঘটেছে যা তাঁর আর একটী পরিচয়কে বহন করে আনে, যা তাঁর পরবর্তী জীবনের সুরটুকু ধরিয়ে দেয়। তথাপি প্রধানতঃ তা ছিল শিশুর আনন্দময় জীবন। আট বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগের পর থেকে যে ভাবগম্ভীর কিশোরটী বেরিয়ে এলেন আনন্দোচ্ছল শিশুটীর মধ্য থেকে—সেই ভাবগম্ভীর মানুষটীই সারা জীবনে প্রাধান্য লাভ করেছেন। মাতৃবিয়োগের পরে কিছুদিন পর্যন্ত কলকাতায় পড়াশুনো ও অল্প কিছুদিন চাকুরী করার প্রয়াস করার পর তিনি বেরিয়ে পড়লেন সারা ভারতবর্ষ পর্যটনে গুরু ব্রহ্মানন্দ অবধূত মহারাজের কাছ থেকে কালীঘাট ত্রি-কোণেশ্বর মন্দিরে একবারেই সন্ন্যাস দীক্ষা নেওয়ার পর।

ভারতবর্ষ পর্যটন করবার সময় ও তার পরেও একদিকে যেমন তিনি ত্যাগ বৈরাগ্য কৃচ্ছ্রতার চূড়ান্ত করেছেন, তেমনি বই-ও যে কত পড়েছেন, তার লেখা জোখা নেই। আর সেগুলি শুধু তিনি পড়েন নি, সেই সবই

তাঁর কণ্ঠস্থ হয়ে গিয়েছিল বলা চলে। কেননা দীর্ঘকাল পরেও সে সমস্ত বই থেকে পৃষ্ঠা সংখ্যা সমেত তিনি যে উদ্ধৃতি দিতে পারতেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। পর্যটনের পরে প্রথমে তিনি বেশীর ভাগ কাশীতে ও কলকাতায় এবং তার পরে নবদ্বীপে ও হুগলীতে বাস করেছেন। সেই সময়ে যে জন্য তাঁর এই ধরার ধূলিতে আসা, এক সামগ্রিক জীবন-তত্ত্ব বর্ত্তমান মানুষের কাছে পৌঁছানো, সেই সামগ্রিক সমন্বয় দর্শন—জড় অজড়, চৈতন্য অচৈতন্য, নিত্য অনিত্য, আত্মা অনাত্মা, জ্ঞান অজ্ঞান প্রভৃতির সমন্বয় তত্ত্ব—কালীর আঁচড়ে শ্রীনিত্যগোপাল লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর এত লেখার মধ্যে সব রকম মতবাদই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু সমস্ত মতবাদের মধ্য দিয়েই এবং তাঁর জীবন-যাপনার মধ্য দিয়েও যে মূল সুরটী ধ্বনিত হয়েছে, সেটা তাঁর পরস্পর বিপরীতের সমন্বয় তত্ত্ব।

বিশ্বের পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করে এক জায়গায় লিখছেন, 'জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র সত্য চন্দ্র নয়। দূর হইতে মরুভূমির স্বচ্ছ বালুকারাশি দেখে মৃগের জল বোধ হয়। বালুকাময় প্রদেশ সত্য, সেটা যাহা তাহা সত্য, কিন্তু জলভ্রমটা মিথ্যা। জগৎ সত্য ; কিন্তু মায়াবশতঃ জগৎকে আমাদের যাহা বোধ হয়, তাহা মিথ্যা।' জগৎকে সত্য বলতে পারেন তিনি যিনি জগতের বাইরে আছেন, আমরা যারা জগৎকে নিয়ে জড়িয়ে আছি, জগৎকে তারা মিথ্যেই বলি। শ্রীনিত্যগোপালের জগৎকে সত্য বলার বীর্য ছিল, এবং বর্ত্তমানের মানুষকে সে বীর্য লাভ করবার পথের কথাও তিনি বলে গেছেন। জগৎকে সত্য বলেছেন তিনি যে স্তরে দাঁড়িয়ে সেটা জগতের অন্তর্গতই শুধু নয়, আবার যে স্তরে দাঁড়িয়ে দিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বোধ হয় চৌদ্দ ঘণ্টাই তাঁর সমাধিতে কেটে যাচ্ছে, সেটাও একান্ত সমাধির স্তর নয়। এইটে প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান যুগের মানুষের এইটে সাধ্য। কোনটাতেই তিনি আটকে পড়ে যান নি,—সমাধিতেও না, জাগ্রত জগতেও না। মুহুর্মুহুঃ যার সমাধি হচ্ছে—একেবারে নির্বিকল্প সমাধি যে সময় পিঠে জলন্ত টিকে ছেঁকা দিলেও দেহে কোন স্পন্দন জেগে উঠত না কিংবা আড়াই বৎসর বয়সের সময় এমনি নির্বিকল্প সমাধিতে যিনি তিনদিন কাটিয়ে দিয়েছেন, তিনিই আবার তাঁর নিত্যধর্ম পত্রিকায় (৬ষ্ঠ বর্ষ, আশ্বিন কার্ত্তিক ১৩২৬ সংখ্যা—পৃঃ ১৫৯) লিখছেন, 'নির্ব্বিকল্প সমাধিও একটা রোগ।' অন্যত্র আছে, 'মহাসিদ্ধাবস্থায় সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য সম বোধ হয়।

ঐ প্রকার সিদ্ধ যেন অরণি। অরণির অগ্নি জলে স্থলে সমানই থাকে। ঐ প্রকার সিদ্ধও গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসে সমানই থাকেন।' কিংবা 'সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ ও গার্হস্থ্য হেয়-বোধও বন্ধন'। কিংবা 'সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও থাকে না, কিন্তু সে অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মায়িক, নির্ব্বাণ প্রাপ্তিও মায়িক। যা কিছু হয়, যা কিছু ঘটে, তাহাই মায়িক। নির্ব্বাণও একটা ঘটনা, সুতরাং তাহাও অমায়িক বলা যায় না।' কিংবা 'নির্ব্বাণ মহা-নির্ব্বাণ হওয়াও মায়া। নির্ব্বিকল্প সমাধি হওন ও নির্ব্বিকল্প সমাধিও মায়া।......সমাধি অবস্থাও মায়ার কার্য্য'।

—পরম আশ্চর্য নয় কি? বিজ্ঞানের cross examination-এর মত সমাধিকেও মায়া ও রোগ বলার মত বীর্য তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার মোহ-গ্রস্ত ভারতবর্ষে খুবই দুর্লভ নয় কি? নিজের বিরুদ্ধের কথাগুলি যিনি বলতে পারেন, তাঁর মত বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিই তো দর্শনের ক্ষেত্রে আর জীবনের পথ-চলায় আজ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমাধিকে রোগ বলছেন অথচ সমাধি তাঁর হচ্ছেই; জগৎকে সত্য বলছেন অথচ জগতের কিছুতে তিনি আটকে নেই। এই-ই কি পরম মুক্তির অবস্থা নয়? এই-ই কি পরস্পর বিপরীতের সমন্বয়ের স্পষ্ট দৃষ্টান্ত নয়? যিনি বলেছেন, এই বিশ্বই আমার মহামঠ......, তিনিই আবার বলছেন, 'এ সংসার অতি ভীষণ স্থান'। খুব একটা গভীর ব্যাপকতা রয়েছে না সমস্তটা মিলিয়ে?

এ সংসার সত্যিই ভীষণ স্থান যদি আমার পরিচ্ছিন্ন অহংকারের মধ্য দিয়ে সংসারকে পেতে চাই। কিন্তু যদি অবতীর্ণ ভগবানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি, তাহালে এই ধরার ধূলিই ব্রহ্ম ধূলি, এই ধরার মানুষই ব্রহ্ম-মানুষ। কিংবা যদি ভগবৎ-ভাবে ভাবিত এক দল মুক্ত সাধকের সঙ্ঘ-দৃষ্টি থেকে দেখতে পারি, যাদের দেহ এক-দেহ, যাদের মন এক-মন, যাদের প্রাণ এক-প্রাণ, তাহালে সেই সঙ্ঘ-জীবনে অমৃতময় ভগবান অবতীর্ণ হয়ে মূর্ত্ত হয়ে ওঠেন। সেইখানেই সার্থক, 'এই বিশ্বই আমার মহা মঠ। কালী-ক্ষেত্র আমার আদি মঠ। কাশী আমার মহানির্ব্বাণ মঠ। কৈবল্যই আমার সমাধি মঠ। পুরুষোত্তম আমার পরমহংস মঠ। আমার আত্মজ্ঞানই অবধূত মঠ। শ্রীবৃন্দাবনই আমার যোগ মঠ। আমার ধ্যানই ধ্যান মঠ। আত্ম-ত্যাগই আমার সন্ন্যাস মঠ। শান্তিই আমার বিশ্রাম মঠ।' এইখানেই

দার্শনিক বৈজ্ঞানিক জিন্‌সের মতে নূতন পদার্থবিদ্যার জগৎ সত্য হয়ে ওঠে, কেবল পশুদের সাময়িক আশ্রয়স্থল না হয়ে সে জগৎ তখন মুক্ত মানুষদের স্থায়ী আবাসভূমি রূপে গড়ে ওঠে। 'The old physics showed us a universe which looked more like a prison than a dwelling place. The new physics shows us a universe which looks as though it might conceivably form a suitable dwelling place for free man, and not a mere shelter for brutes—a home in which it may at least be possible for us to mould events to our desires and live lives of endeavour and achievement.'

এইজন্যই শ্রীনিত্যগোপালের মতে 'পূর্ণজ্ঞানের অন্তর্গত আত্মজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞানের এক শাখা আত্মজ্ঞান। সর্ব্ব জড় ও অজড় সম্বন্ধে জ্ঞানই পূর্ণজ্ঞান।'—এতখানি আধুনিকতম ভাষায় কথা বলেন বলেই শ্রীনিত্য-গোপালের নাম এমন প্রশান্তি এনে দেয় আমাদের সমস্ত তাপিত সত্তায়। তিনি কোন একটাতেই আটকে নেই, তিনি উভয়ত্র থেকেও দুইয়ের বাইরে আছেন—যেটা তাঁর চতুর্থ-মাত্রিক সমন্বয়ের স্বর, যেটাই তাঁর পূর্ণজ্ঞানের সুর; সেইখানে দাঁড়িয়ে আগামী যুগের দেবতা তিনি। তাঁকে আজকের আমরা বুঝতে পারি নি, আয়ত্ত করতে পারি নি; তবু তাঁকে ভূয়োভূয়ঃ নমস্কার করি—তাঁর সামনে নমস্কার করি, তাঁকে পেছনে নমস্কার করি, তাঁর ডাইনে নমস্কার করি, তাঁর বাঁয়ে নমস্কার করি। তাঁকে বার বার বহুবার নমস্কার করি।

মানুষ এত বড় হল কিসে? জীবন এত ব্যাপক ও গভীর হল কোন্ পথে? রাবণের দশ মাথা রাবণের যে পরিচয়টা দিচ্ছে সেটা দানবোচিত পরিচয়—বুদ্ধির আতিশয্যকে ধরে রাখবার পাত্রের সংখ্যাধিক্য। আজকের বিজ্ঞানী যখন আণবিক শক্তি দিয়ে ধ্বংসের বীজ বপন করে যাচ্ছে, তখন সে-ও দানবীয় শক্তিরই অপ-প্রকাশ মাত্র। এগুলি অর্গানিজিম-এর ধর্ম-বর্জিত। অর্গানিজিম-এ, অংশও যেখানে পূর্ণ, সেইখানে জীবন এমন ব্যাপক ও গভীর, এমন মহা সম্ভাবনাময়—কেননা অর্গানিজিম পোষণ-ধর্মী। যে বিজ্ঞান পোষণ-ধর্মী নয় তা যতই আণবিক শক্তিরই চূড়ান্ত প্রকাশ হোক না কেন, নিজের আতিশয্য হেতু নিজের ধর্ম থেকেই সে চ্যুত হয়েছে।

ছোট্ট দু'হাত দু'পা নিয়ে শ্রীরাম যে অদ্ভুত শক্তি বলে দশমাথা বিশ হাত রাবণের চেয়ে বড় হয়ে পড়েন, সেটা প্রাণ—যে-প্রাণ অণুর পরিপূর্ণ সার্থকতা দিয়েই ভূমাধর্মী, যে প্রাণ অর্গানিজ্‌ম। মানুষও সেই প্রাণের অধিকারী হয়েই ভূমা। তাঁরই খোঁজ দিয়ে শ্রীনিত্যগোপাল লিখলেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অধিক অগ্নি হইতে পারে। পরিচিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারে।'

বহুভাবে সীমাবদ্ধ মানুষ যে পথে অশেষধর্মী হয়, ভূমা হয়, সে ঐ প্রাণের পথ—যেখানেই অল্পও অধিক হয়, ছোট মানুষেরও ব্রহ্মমূল্য স্থাপিত হয়। প্রতি অণুই যদি মহান না হয়, প্রতি অল্পই যদি অধিক না হতে পারে, তাহালে হৃদয়ের কোন মূল্য থাকে না, মানুষেরও ভূমাত্ব লাভ কবার কোন সম্ভাবনা থাকে না, সমাজের তথাকথিত পতিত মানুষেবও মানুষ হিসাবে উঠে দাঁড়াবার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। প্রতি সর্ব এই অর্গানিজ্‌মের ক্ষেত্রেই ব্রহ্ম। এইখানেই শ্রীনিত্যগোপালের 'আমি বিশ্বনাগরিক'-মন্ত্র বাস্তব পথ-রেখা নির্দেশ করে। মানুষকে বিশ্বনাগরিক হতে হবে এইজন্যে যে, মানুষকে ফুরিয়ে গেলে চলবে না। সীমায়িত স্বল্প মানুষের স্বল্পতা স্বীকার করেই শ্রীনিত্যগোপাল তার অফুরান হওয়ার সংবাদ রেখে গেলেন। সেইখানেই তাঁর বাণী, 'ভবিষ্যতে সব জাতি একজাতি হইবে সার্থক'।

অবতার জন্ম-কর্ম্মকে তত্ত্বতঃ না বুঝলে মানুষের জীবনে তার কোন আবেদন বা অবদান থাকে না—শ্রীনিত্যগোপাল-জীবনকে তত্ত্বতঃ বুঝবার আবেষ্টন এতদিন ছিল না বলেই সমাজ-জীবনে তাঁর গুঞ্জরণ ধ্বনিত হয়ে ওঠে নি। মনঃসমীক্ষণ, বায়োলজি ও নূতন পদার্থবিদ্যা-সমেত বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালীর অগ্রগতি মানুষকে ক্রমেই সচেতন করে তুলছে—সার্বজনীন করে তুলছে, যে জন্য শ্রীনিত্যগোপাল আজ একটু একটু করে প্রকাশ পেতে চাইছেন। মানুষের মধ্যে সর্ব হওয়ার, সহজ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে জাগিয়ে তুলবে। 'আমি বিশ্বনাগরিক' মন্ত্রের উদ্গাতা শ্রীনিত্যগোপাল জেগে উঠুন, পরস্পর বিপরীত চিত্তবৃত্তিরও ঘটনাপুঞ্জের দ্বন্দ্বমোহে বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত মানুষ তাঁর জীবন-তত্ত্বে অবগাহন করে স্নিগ্ধ হোক, শুদ্ধ হোক, সুস্থ হোক, সুন্দর হোক। সর্ব-পথের পথিক আজকের যে-মানুষ একবিশ্বের অধিবাসী হতে চলেছে, তার পক্ষে সে মন্ত্র জপ করে স্নিগ্ধ হবার সত্যিই প্রয়োজন

আছে। শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীনিত্যগোপাল! আবার বলি শ্রীনিত্যগোপাল, শ্রীনিত্যগোপাল—শ্রীনিত্যগোপাল!

শ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

'শেষে অর্থাৎ মহাসিদ্ধাবস্থায় সকল জাতি একজাতি বোধ হয়, সকল সম্প্রদায় এক সম্প্রদায় বোধ হয়, সকল ধর্ম এক ধর্ম বোধ হয়, সকল জীবাত্মা এক জীবাত্মা বোধ হয়, সকল শাস্ত্র এক শাস্ত্র বোধ হয়, সকল সাম্প্রদায়িক ঈশ্বরই একেশ্বর বলিয়া বোধ হয়।'

—নিত্যধর্ম্মপত্রিকা ষষ্ঠ বর্ষ, পৃঃ ১৮৮

* * * *

'ভগবান সম্বন্ধে যত পুস্তক আছে, ভগবান সম্বন্ধে যত পুস্তক লুপ্ত হইয়াছে, ভগবান সম্বন্ধে যত পুস্তক প্রকাশিত হইবে সে সমস্তই আমার ভাগবতের অন্তর্গত। আমার ভাগবত কোন সঙ্কীর্ণ গ্রন্থ নহে।'

বিবিধতত্ত্ব, পৃঃ ৩১০

* * * *

'একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে এক সঙ্গে বসায়ে আহার করাইতে পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিম্বা তাঁহাদের সকলকে বসাযে একসঙ্গে উপাসনা করালে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞান যাঁহার হইয়াছে তিনিই একের স্ফুরণ সর্ব্বত্রে দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য এক বুঝিয়াছেন তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন। তিনি সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক ঐক্য দেখিতেছেন।'

—সর্ব্বধর্ম্মনির্ণয়সার—৬৪।৩

* * * *

'ভক্তিযোগ সাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভ না করিলে শ্রীভগবানের আশ্রিত হওয়া যায় না, ইহাই অনেকের ধারণা। ঐ প্রকারে শ্রীভগবানের আশ্রিত না হইলে তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া যায় না, ইহাই অনেকের ধারণা। কিন্তু স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপা করিয়া কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনার আশ্রিত করিলে কিংবা স্বয়ং শ্রীভগবান কৃপা করিয়া কোন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনার শরণাপন্ন করিলে, ভক্তিযোগ সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভের অপেক্ষা করিতে হয় না। শ্রীভগবানের কৃপায় ভক্তিযোগ সাধনা না করিয়াও সে ব্যক্তি তদ্বিষয়িণী সিদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের আশ্রিত হইতে পারিলে—শ্রীভগবানের কৃপায় শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে ভক্তিযোগ বিষয়িণী কোন প্রকার সিদ্ধিরই অভাব হয় না'।

—ভক্তিযোগদর্শন, ৯৯

* * * *

'শ্রীভগবানের আশ্রিত শরণাপন্ন ভক্তিযোগী মহাপুরুষ পরাগতি লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত নহেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার যে কোন গতি প্রাপ্তি হয়, তাঁহার তাহাতেই আনন্দ। শ্রীভগবান তাঁহার জন্য যাহা করেন, তাঁহার তাহাতেই আনন্দ'।

—ভক্তিযোগদর্শন, ৯৮

* * * *

'সর্ব্বত্যাগ যাঁহার হইয়াছে তাঁহার আত্মত্যাগও হইয়াছে। আত্মত্যাগের উপর আর কোন শ্রেণীর বৈরাগ্য নাই।' *

---

* আগামী ১৪ই চৈত্র শুক্রবার ১১৩ রাসবিহারী এভিনিউস্থিত মহানির্ব্বাণ মঠে শ্রীশ্রীনিত্য-গোপাল দেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে।

পশু্রাম কি জরথুস্ত্র ?

(২)

।। শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ।।

গৌবং অগ্নি-শিখাকারং তেজসা ভাস্করোপমম্ ।
ভার্গবং রামং আসীনং মন্দরস্থং যথা রবিম্ ॥

—হরিবংশ-বিষ্ণুপর্ব্ব—৩৯-২১

বহুদিনের পূর্বকার কথা। সেই সুদূর জীবন প্রভাতে আর্যগণ কাশ্যপ সমুদ্রের (Caspian sea) উভয়তীরে—পূর্ব ও পশ্চিম তটে সুখে বসবাস করিতেন। কশ্যপ মুনিকে বলা হয় প্রজাপতি—দেব, দৈত্য, ও মানুষের আদি পিতা। কশ্যপ মুনির স্মৃতির সহিত বিজড়িত বলিয়াই সাগরটির এরূপ নামাকরণ হইয়াছে।

কাশ্যপ-সমুদ্রের পশ্চিমতটবাসী আর্য্যগণ আরও একটু দক্ষিণ-পশ্চিমে সরিয়া গিয়া গ্রীক ও ইটালীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। আর পূর্বতটবাসী আর্য্যগণ দক্ষিণপূর্বে সরিয়া আসিয়া পারসিক ও ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিলেন। এই চার জনপদে উপনিবিষ্ট আর্য্যগণকেই মানবজাতির নেতৃ-স্থানীয় মনে করা যাইতে পারে।

তখনও ভারতীয় এবং ইরানীয়গণ, হিন্দু ও পার্শীগণ দুইটা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয় নাই। তাহারা একসঙ্গে মিলিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়া, অমৃত আহরণ করিয়া, একসঙ্গে বসিয়া ভোজন করিত। গার্হপত্য অগ্নিতে হোম করিয়া, একই দেবতা হরিমেধসের অর্চনা করিয়া একসঙ্গে বসিয়া সোমরস পান করিত। দেবতার কোনও নির্দিষ্ট রূপ নাই, এই জন্য কেহ কেহ ঈশ্বরকে বলিতেন "অসুর" অর্থাৎ নিরাকার—অসু অথবা প্রাণবায়ুর মতন অমূর্ত। আবার সকল মূর্তির ভিতরই দেবতা বিরাজমান, এইজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে বলিতেন "দেব" অর্থাৎ সাকার—দ্যোতমান্, প্রকাশশীল অথবা মূর্তিমান।

এই সাকার ও নিরাকার বাদের পার্থক্য প্রথম একটা রুচি ভেদ ছিল—অর্থাৎ যাহার ইচ্ছা সাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন, যাহার ইচ্ছা নিরাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু ক্রমে অসহিষ্ণুতা আসিয়া দেখা দিল। সাকার

বাদীরা একটী জোটবদ্ধ হইল, নিরাকারবাদীরা মিলিয়া ভিন্ন সংঘ গঠন করিল। জোট-বদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, বিষ্ণুমায়া সংঘ-গত "মমতা"-বুদ্ধি জাগরিত করিয়া ভেদের সৃষ্টি করিল। তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেবল উপাসনামন্দিরেই সীমাবদ্ধ রহিল না—সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বণ্টনের ব্যাপারেও তাহা সংক্রামিত হইল। সাকার-বাদীরা মনে করিলেন, জগতের সুখ-সুবিধা কেবল সাকারবাদীরাই ভোগ করুক, নিরাকারবাদীরা মনে করিলেন সব সুখ-সুবিধা কেবল তাহাদেরই প্রাপ্য। আজও হিন্দু হিন্দুকেই চাকুরি দেয়, মুসলমান মুসলমানকেই চাকুরি দেয়—অন্ততঃ এই ধারণা হইতেই পাকিস্থানের সৃষ্টি হইয়াছে। দেব-বাদী ও অসুর-বাদী উভয় পক্ষই মনে করিলেন যে, ধন্বন্তরির ভাণ্ডস্থিত অমৃত কেবল তাহাদেরই ভোগ্য। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমে তুমুল কলহে পরিণত হইল। ইহারই নাম দেবাসুর যুদ্ধ। ইহার ফলে হিন্দু ও পার্শীগণ দুইটী পৃথক্ জাতিতে পরিণত হইল। অসুর-বাদীগণ রহিলেন পশ্চিমে, দেব-বাদীগণ আরও পূর্বে সরিয়া আসিয়া ভারত-বর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন।

পূর্বে কিন্তু এরূপ ছিল না। ঋগ্বেদের প্রাচীনতর মণ্ডলগুলিতে, পরমেশ্বর সম্বন্ধে "অসুর' (নিরাকার) এই বিশেষণ যদৃচ্ছাক্রমে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতি যে কোনও নামেই পরমেশ্বরকে ডাকা হউক না কেন, তাহাকে "অসুর" বলিয়া বিশেষিত করা হইয়াছে। পঞ্চম মণ্ডলের একটী ঋকে তো পরমেশ্বর রুদ্রকে একসঙ্গেই "দেব" ও "অসুর" এই উভয় বিশেষণে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বর সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন।

যক্ষ্বা মহে সৌমনসায় রুদ্রম্।
নমোভির্ দেবম্ অসুরং দুবস্য ॥ ৫-৪২-১১

মহৎ সৌমনসের (শান্তির) জন্য রুদ্রকে যজন কর; তিনি দেব ও অসুর দুই বটেন, নমস্কারদ্বারা তাঁহার অভ্যর্থনা কর।

কিন্তু গোড়ার দিকের এই উদারতা শেষ পর্যন্ত টিকে নাই। অসহিষ্ণুতা আসিয়া দেখা দিল, উভয় পক্ষের শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, পরে এমন হইল যে সংস্কৃত সাহিত্যে অসুর শব্দের অর্থ হইল দানব (devil) আর জেন্দ সাহিত্যে দেব শব্দের অর্থ হইল রাক্ষস (devil)। যে অসুর শব্দ বেদের প্রাচীন অংশে ইন্দ্র বরুণ রুদ্র নামধেয় পরমেশ্বরের সম্মানসূচক বিশেষণরূপে

প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা শুনিলে এখন আমরা আতঙ্কিত হই। আর পার্শীগণ নব-জাত (যজ্ঞোপবীত) সংস্কারের সময় মন্ত্র পড়েন "নাশয়ামি দেবান্"—যস্ন-১২—দেবদিগকে (অর্থাত্ দানবদিগকে) তাড়াইয়া দিতেছি।

অসুর-পূজকদিগের নেতৃত্ব করিতেন; দেবর্ষি ভৃগু, আর দেবপূজকদিগের নেতা ছিলেন দেবর্ষি বৃহস্পতি। ভৃগুর গায়ের রং এত শুভ্র ছিল যে, তাঁহার খ্যাতি হইয়াছিল শুক্র যথা শুক্ল (শ্বেত)। আমরা জানি যে পার্শীগণ হিন্দু হইতে অধিক গৌর বর্ণ, আর তাহাদিগের ধর্মগুরু জরথুস্ত্রের কৌলিক উপাধি "স্পিতম" অথবা শ্বিতম, অর্থাত্ শ্বেততম। [অধ শব্দের পরে "তম" প্রত্যয় যোগ করিলে যেমন 'অধ-তম' না হইয়া 'অধম' হয়, সেইরূপ শ্বেত শব্দের পরে 'তম' প্রত্যয় যোগ করিয়া শ্বেতম বা শ্বিতম হইয়াছে।]

অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য মূর্তি পূজার এত প্রবল বিরোধী ছিলেন যে, তিনি বিষ্ণুমূর্তি লাথি দিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন—

তং বীক্ষ্য মুনি শার্দুলঃ ভৃগুঃ কোপসমন্বিতঃ।
সব্যং পাদং বিচিক্ষেপ বিষ্ণোর্ বক্ষসি শোভনে॥

পদ্মপুরাণ—উত্তরখণ্ড—২৫৫-৪৮

বিষ্ণুকে দেখিয়া ভৃগু কোপান্বিত হইয়া, তাহার সুন্দর বক্ষে পদাঘাত করিলেন।

সাকার না হইলে বক্ষ থাকে না, এবং বক্ষে পদাঘাত করা চলে না। বিষ্ণু নিরাকার হইলে ভৃগু পদাঘাত করিতে পারিতেন না, এবং পদাঘাত করিতে উদ্যতও হইতেন না।

দেবর্ষি ভৃগু যে কাজটা করিলেন, তাহা সুলতান মামুদের যোগ্য কাজ, একজন দেবর্ষির পক্ষে তাহা সাজে না। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে আগ্রহের আতিশয্য মহাপুরুষকেও বিচলিত করে। শুনিতে পাওয়া যায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁহার মাতৃস্বসার পূজার টাট হইতে শিবলিঙ্গ তুলিয়া নিয়া আঙ্গিনায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এইজন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা কমে না, কারণ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির তাড়নায় তিনি এমন কাজ করেন নাই। মূর্তিপূজাকে জাতীয় উন্নতির অন্তরায় মনে করিতেন বলিয়াই মূর্তিপূজার উপর তাঁহার এত বিতৃষ্ণা। লোক-সংগ্রহই তাঁহার কাজের মূল প্রেরণা। দেবর্ষি ভৃগুও এইরূপ জাতীয়-সংহতির বিষয় বিবেচনা করিয়াই মূর্তিপূজাতে বিদ্বিষ্ট ছিলেন।

এহেন উত্‌কট দেব-দ্বেষী যে মহর্ষি ভৃগু, পশুরাম জন্মিয়াছিলেন সেই বংশে। সুতরাং তাঁহার সাধন-প্রণালীর সহিত ভারতীয় সাধনা-ধারার যে বৈলক্ষণ্য থাকিবে তাহা অপ্রত্যাশিত নহে। কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতি হইতে বিলক্ষণ বলিয়াই যে তাহা অবৈদিক এমন কথা বলা চলে না। দেবর্ষি বৃহস্পতির ন্যায় দেবর্ষি ভৃগুও বৈদিক সংস্কৃতির একজন শ্রেষ্ঠ বিনায়ক, হিন্দুর ন্যায় পার্শীও বেদমাতার প্রিয় সন্তান, দক্ষিণ ও বাম চক্ষুর ন্যায় উভয়ে মিলিয়াই পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি। হিন্দুর ভাই পার্শী, পার্শীর ভাই হিন্দু। একথা ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত দুদশা—নতুবা এশিয়ার ইতিহাস অন্য-ভাবে লিখিত হইত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে অসুরবাদীরা রহিয়া গেলেন পারস্যে, আর দেব-বাদীরা আসিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। ভৃগু ছিলেন অসুর পূজকদিগের পুরোধা। অতএব ইরাণদেশ (অথবা ইলাবৃতবর্ষই) তাঁহার বাসস্থান ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। ভৃগুর বংশধর ইরাণদেশেরই অধিবাসী ছিলেন, একথাও অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাতে চমকিত হইবার কিছুই নাই। ত্রেতা কেন, দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত ইরাণীয় এবং ভারতীয় জনগণ একই সমাজভুক্ত ছিলেন; তাঁহারা পরস্পর বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন। ভরতের মাতামহ কেকয়, এবং নকুল-সহদেবের মাতুল শল্য ছিলেন ইরাণদেশের সম্রাট্। গান্ধারী যে কান্দাহারের তাহা সকলেই জানেন। ধৃতরাষ্ট্রের অপর দুই ভ্রাতা পাণ্ডু (মাদ্রী সম্পর্কে) এবং বিদুরও ইরাণদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন। মাদ্রী সহ-মরণে উদ্যত হইলে কুন্তী বলিয়াছিলেন

ধন্যা ত্বম্ অসি বাহ্লিকী মত্-তঃ ভাগ্যতরা তথা।

আদিপর্ব—১২৫-২১

হে বাহ্লিক (Bactua) দেশের কন্যা, তুমি আমা অপেক্ষা ভাগ্যবতী।

আর বিদুর সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, পারস্য-দেশীয় মহামতি দেবকের কন্যাকে বিদুর বিবাহ করিয়াছিলেন:

অথ পারসবীংকন্যাং দেবকস্য মহীপতেঃ।
বিবাহং কারয়ামাস বিদুরস্য মহাত্মনঃ॥

আদিপর্ব—১১৪—১২

ভৃগুর বংশধর বলিয়া পশুরামকে পারস্য দেশের অধিবাসী বলিয়া অনুমান

করা যাইতে পারে। "পর্শুরাম" এই নামটী ভিতরও উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন পাওয়া যায় বলিয়া আমরা মনে করি।

যে কোন ও অভিধান খুলিলেই দেখা যাইবে, পর্শু এবং পরশু শব্দের অর্থ হইল কুঠার। পর্শুরাম অতীব কঠোর (বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদ্ অপি) প্রকৃতির লোক ছিলেন, এই জন্য তাঁহার হস্তে কুঠার দিয়া, তাঁহার নামের সঙ্গত একটা অর্থ আমরা করিয়া লইয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায় বলা যাইতে পারে,

প্রভু কহে এহো হয়, আগু কহ আর।

লৌকিক সংস্কৃতে পর্শু শব্দটার অর্থ কুঠার বটে, বৈদিক সংস্কৃতে ইহার অন্য অর্থ আছে। ঋগ্বেদে আমরা দেখিতে পাই বৈদিক ঋষি বলিতেছেন

শতম্ অহম্ তিরিন্দিরে সহস্রম্ পর্শৌ আদদে।—　　ঋগ্বেদ—৮-৬-৪৬

আমি তিরিন্দির দেশে শত গবী এবং পর্শু দেশে সহস্র গবী দক্ষিণা পাইয়াছি।

তথায় আমরা দেখিতে পাইলাম পর্শু শব্দে একটা দেশ বুঝায়।

পাণিনিতে একটি সূত্র পাই—পর্শ্বাদি-যৌধেয়াদিভ্যঃ অণ্-অঞৌ— ৫-৩-১১৭

পর্শু শব্দের উত্তর স্বার্থে অণ্ (এবং যৌধেয় শব্দের উত্তর অঞ্) প্রত্যয় হইয়া থাকে।

স্বার্থে অণ্ বলিয়া 'পর্শু' শব্দের অর্থও যাহা, 'পার্শব' শব্দের অর্থও তাহাই। পর্শু বলিতে একটি আয়ুধজীবী জাতি বুঝায়। অতএব ঐ জাতিকে 'পর্শু'ও বলা চলে, পার্শবও বলা চলে, পাণিনির সূত্রের এই অর্থ।

তথায় জানিলাম পর্শুদ্বারা শব্দের একটি জাতি বুঝায়।

ঋগ্বেদও জাতি বুঝাইতে পর্শু শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

মং মাং তপন্ত্যা অভিতঃ সপত্নীর্ ইব পর্শবঃ।—　　ঋগ্বেদ—১-১০৫-৮

—পর্শুরা আমাকে চারিদিক হইতে সপত্নীর ন্যায় জ্বালা দেয়।

বিহিস্তান শিলালিপিতে দেখিতে পাই প্রাচীন ইরানীয়গণ নিজদিগকে "পার্স" বলিয়া উল্লেখ করিতেছে।*

অর্থাত্ তখন "পার্শী" বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা বুঝাইতে প্রাচীনকালে ভারতে "পর্শু" এবং "পার্শব" অপিচ ইরাণে "পার্স" শব্দ ব্যবহৃত হইত।

* Hodi bala—Parsis of Ancient India (Preface)

তাহা হইলে পর্শু-রাম কথার অর্থ হয় যে, রাম পর্শুদেশে এবং পর্শুজাতিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। অর্থাত্ গীতায় যাহাকে শুধু রাম (রামঃ শস্ত্রভৃতাম্ অহম্—১০-৩১) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, রামচন্দ্র অথবা রঘু-রাম হইতে পৃথক্ করিবার জন্য তাহাকে ভূয়শঃ বলা হইত পর্শু-রাম।

'রাম' নামটা পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। রাম এই নামটী ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়। অন্ততঃ ভৃগু-রাম যে রঘু-রামের পূর্ববর্তী, ইহা সর্ববাদিসম্মত। অতএব রঘুরামের অনুকরণে পর্শু-রামের নামাকরণ হয় নাই। বরং পর্শু-রামের বীরত্ব স্মরণ করিয়াই পুত্র তাদৃশ' বীর্য্যবান হউক এই আশায়ই, হয়ত রঘুকুলতিলকের নামও রাম রাখা হইয়াছিল, এখন বলা যাইতে পারে। ভার্গব রাম পারস্য ভূমি পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়াই পরে তাহাকে বলা হইত পর্শু-রাম।

এ অনুমান যদি সত্য হয়, জমদগ্নি রাম পারস্য দেশের অধিবাসী বলিয়াই যদি পরে পর্শু-রাম বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন, তবে পর্শু-রামের অবতারত্বের হেতু খুঁজিয়া আমাদিগকে হয়রান হইতে হইবে না।

কারণ আমরা জ্ঞান যে সত্য-ত্রেতার সন্ধিক্ষণে, (অর্থাত্ যখন পর্য্যন্ত অসুর শব্দ ঋগ্বেদে সম্মানসূচক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত) প্রাচীন ইরাণদেশে এমন একজন লোকোত্তর মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন যিনি ইরাণীয় জাতিকে পরমার্থলাভের নূতন পন্থা দেখাইয়া একটী নূতন শাস্ত্রগ্রন্থ (জেন্দ আবেস্তা-গাথা) তাহাদের হাতে তুলিয়া দিয়া, তাহাদিগকে একটী ধর্ম-প্রাণ জাতিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্মমত অবলম্বন করিয়া পারসিক জাতি তদানীন্তন জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত হয়, অর্দ্ধ-এশিয়ার উপর রাজত্ব স্থাপন করে, ম্যারাথন-থার্মপলিতে আক্রমণ করিয়া গ্রীসের অবস্থা শোচনীয় করিয়া তোলে। এই মহাপুরুষের পবিত্র নাম "মঘবান স্পিতম জরথুস্ত্র"। মঘবান জরথুস্ত্র একজন কাল্পনিক পুরুষ নহেন। তাঁহার উদাত্ত-উদান পবিত্র গাথা-মন্ত্র ভারত ও পারস্যের সকল অগ্নিমন্দিরে সশ্রদ্ধায় উচ্চারিত হইয়া মোহমুগ্ধ মানবকে শাশ্বত শান্তিলাভের অব্যর্থ সন্ধান আজিও জানাইয়া দিতেছে। আর্য্যজাতির এই আদি-তম অবতার পিতৃ-পূজায় অনুরক্ত ছিলেন, সাকার-পূজার নিন্দা করিয়াছেন, আর বর্ণভেদপ্রথা মানিতেন না। গাথার মন্ত্রগুলি আলোচনা করিলেই মঘবান জরথুস্ত্রের মতবাদ জানিতে পারা যাইবে। বর্তমান পার্শীদিগের আচার অনুষ্ঠান হইতে, এবং পার্শী পণ্ডিতদিগের লিখিত

গ্রন্থ (যথা Dhalla—History of Zaroastrianism) হইতেও তাহা জানা যাইতে পারে।

মঘবান জরথুস্ত্রের ঐতিহ্যই পুরাণের রূপক-ভাষায় পশু-রামের কীর্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যদি ভগবান পশুরামে আমরা মঘবান জরথুস্ত্রের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই, তবেই আমাদেব পুরাণপাঠ সার্থক হইবে। নতুবা রূপক কথার ধাঁধায় পড়িয়া, কুঠারহস্তে একটী জল্লাদ সাজাইয়া মাতৃঘাতক পশুরামের যে চিত্র আমরা উপস্থাপিত করিব, তাহাদ্বারা ভগবান পশু-রামকে আমরা হেয় করিব, এবং এই শ্রেষ্ঠ অবতারের অনুপ্রেরণার ফল হইতে নিজ-দিগকে বঞ্চিত করিব।

আমরা উপেক্ষা করিয়াছি বলিয়াই ভগবান পশু-রামের উদানের মহিমা লুপ্ত হয় নাই, তাঁহার নেতৃত্বের প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় নাই। আমরা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়াছি বলিয়াই জগত্ অন্ধকার হয় নাই। "ঈশ্বরের পিতৃত্ব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব" (Fatherhood of God and Brother-hood of man। ইহাই ছিল ভগবান পশুরামের বিজয় নির্ঘোষ। "মূর্তি-ভেদের মোহে পড়িয়া, দেবতায় দেবতায় পার্থক্য কল্পনা করিয়া ঈশ্বরের অদ্বয়ত্ব বিনষ্ট করিও না; বর্ণভেদের মোহে পড়িয়া, মানুষে মানুষে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া মানবজাতির ঐক্য বিনষ্ট করিও না" ইহাই জমদগ্নির উদাত্ত আহ্বান। এই মহাবাণীতে যে শাশ্বত সত্য নিহিত আছে, তাহা অবিনশ্বর। ভগবান পশু-রামকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু তিনি যে চিরজীব। যে মহা পীযুষ তিনি পরিবেশন করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবজ্ঞাভরে ফেলিয়া দিয়াছি, কিন্তু জগতের অন্য যে জাতি তাহা পান করিয়াছে, সেই জাতিই বল সঞ্চয় করিয়াছে।

ক্রমশঃ

পুরাতনী

।। শ্রীশান্তশীল দাশ ।।

লিখতে বসেছি কিছু : কী যে লিখি কিছুই তো
মনে যে আসে না।
আকাশের পানে চাই— কই কোথা তুলো-সাদা
মেঘ তো ভাসে না।
সে-মেঘের ভেলা চড়ে যাব যে উধাও হয়ে,
নেইকো উপায়।
মাটিতো পুরানো বড়, এর ধূলি প্রতিদিন
লাগে সারা গায়।
সে ধূলির কথা নিয়ে লেখা যায় কিছু নাকি ?
অতি পুরাতন ;
জীবনের সুরু থেকে জীবনের শেষ অবধি
আছে সারাক্ষণ।
তবু মন বলে ওঠে : এই ভালো, এই ভালো,
চাইনেকো আর—
চির চেনা এ মাটির চির পুরাতন কথা
লিখি বারবার।

"এক কাপ চা"

॥ অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দর্শন সেন শর্মা ॥

—কি যে বলেন, চলেনা মানে? দাঁড়ান না একটু, ঘড়িতে তিনটে বাজতে দিন, দেখবেন পালে পালে লোক এসে ভীড় করেছে এই 'ঝণ্টুর এক কাপ চা'এর জন্য। হ্যাঁ মশায়, সিরুফ্ এক কাপ চা-এর জন্য। দেখবেন তখন একটা মাছি ঢুকবার জায়গা পাবে না। সমস্ত স্পেস্ ফিল্ড্ আপ। সব কেবল মাত্র ঐ এক কাপ চা, ব্যস্। বুঝলেন না চা যে আমাদের ন্যাশনেল বিভারেজ – জাতীয় পানীয়।

একটু দম নিলেন দোকানী।—তবে বুঝলেন কিনা এ রকমটা আগে ছিল না। এর জন্য ষোল আনা বাহাদুরিই মশায় 'ইণ্ডিয়ান টি এক্সপ্যানশন বোর্ডে'র। হ্যাঁঃ কোশিশ করেছে বটে, একেবারে সাধনা। বুঝলেন না এ গণ্ডমূর্খের দেশে আগে কেউ এ সব ছুঁতই না, দেশের জিনিষ দেশে কদর পায়না। ঐ যে কথায় বলে, 'গেঁয়ো যোগীর ভিখ্ মেলেনা গাঁয়ে,' সেই দশা আর কি! ভদ্র লোক একটু থামলেন, এ্যাঁ শেষটায় চা খাওয়াটা পর্য্যন্ত শিখতে হলো সাহেবদের কাছ থেকে! আর চা খাওয়া কি, চা যে আমাদের দেশে হয় তা'ত আমরা জানতুম না। তবে আর বলছি কি? মানুষ থাকে ত সাহেব, খাবার থাকে ত চা। এই ধরুন না চীন আর আমাদের দেশের ব্যবধানটা কতটুকু, কিন্তু কৈ আমরা কি জানতাম যে ওদের দেশে চা হয় বা আর কিছু? বুঝলেন কিনা ওদের দেশ থেকে চাএর খবর প্রথম আনলে পর্ত্তুগীজেরা। তা তখন তারা তত গ্রাহ্য করেনি। আসল কদর বুঝল ওলন্দাজরা। চীনেদের থেকে চা খেতে শিখে ব্যাটারা চা নিয়ে গেল সোজা একেবারে য়ুরোপে, সে ধরুন ১৬১০ খৃষ্টাব্দের কথা। ইংরেজরা চা খাওয়া শিখল আরও দেরীতে। মশায় ওদের দেশে চা ঢুকলইত ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে। তা মশায় রাজার জাত ত বটে, পহেলা নজরেই চা-এর কদর বুঝল। চা হ'ল ওদের খানদানী ড্রিঙ্ক্। এ বিষয়ে অবশ্য তারিফ্ করতে হয় মার্কিন মুল্লুকের; 'চা' হয়ে উঠল ওদের রাজনৈতিক মতবাদের এক অংশ। আর সেই চা-ই

আমাদের দেশ প্রথম দেখল ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে। তাও কি মশায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীন থেকে বিলেতে চা নিয়ে যাবার কালে আমাদের দেশের উপর দিয়ে যেত বলে যা একটু মুখদর্শন ঘটত। তাতেও কী আমাদের দেশে চা-এর কোন আদর আপ্যায়ন হয়েছে! ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চীন থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ত এক চেটিয়া চা পাঠাল বিলেতে, তারপর বুঝলেন কিনা, টাকার ব্যাপারে লোকের ভীড় হ'তেই কোম্পানী চট করে চীন থেকে গাছ এনে চা লাগাতে চাইল আমাদের দেশে। কিন্তু চাইলেই কি আর হয়? হরসাল তদারক-তস্‌লীম করে কোম্পানী আমাদের দেশে চা তৈরী করতে পারল ১৮৪০ সালে। তখন কোম্পানীর সে কি ব্যস্ততা, বুঝতেই ত পারেন পয়সার ব্যাপার! বেহদ্দ চা পাতার গন্ধটুকু বজায় রাখবার জন্য কোম্পানীর জাহাজ উত্তমাশা ছেড়ে মশায় সুয়েজে ঢোকে। তবেই বুঝুন ব্যাপারটা। আরে জাভা যে জাভা সেখানেও ত মশায় ১৮২৬ সালে চা শুরু হয়ে গিয়েছে। আর আমাদের হলো ১৮৪০ সনে! হুঁঃ! তাতেই বা কি আক্কেল হয় মশায়, কিছু বললেই চোখ ঘুরিয়ে বলবে, সিংহলে যে হ'ল ১৮৭০ সালে; মধ্য দক্ষিণ এশিয়ার ভেতরে ত আমরা প্রথম! আরে এটা বোঝে না যে লঙ্কায় চা হ'ল ভিন্ দেশী আর আমাদের চা যে আসামের আদিবাসী—তার খোঁজ-খবর হাল-হাক্কিতটা আগে নিলে দোষ কী ছিল?

কথায় বার্ত্তায় একটু ছেদ পড়ল, দোকানী একটা চক্কর দিয়ে এলেন, দু'তিনটে টেবিলে ভীড় জমেছে। দোকানী দু'হাতে দু'কাপ চা নিয়ে এলেন, খান দাদা! ফোৎ ক'রে নিজেই এক চুমুক দিলেন, এ্যাঃ, চা! এ চা খেয়ে আর লাল নেই। চা খেয়ে সুখ ছিল মশায় তখন। এখনত মশায় বয়স পড়ে গেছে, তাই এই চায়ের কারবার করি—এত শুধু কেবলমাত্র ডাষ্ট্—গুঁড়া মশায়—গুঁড়া, বাঙ্গালরা ঠিকই বলে 'ফাঁকি'। হক্‌কথা দাদা বিলকুল ফাঁকি। চা দেখেছি তখন, যখন ছোট্ট ঘোড়ার পিঠে চড়ে বাগানে বাগানে ঘুরতাম। এই ধরুন অরেঞ্জপিকো, পিকো, পিকোসুচঙ্ কঙো, এই সব। অরেঞ্জপিকো বুঝলেন, ঐ যে আপনারা কি বলেন দুটি পাতা একটি কুঁড়ি। একদম কচিপাতা, সবেমাত্র যেই চোখ খুলল কি না খুলল অমনি খাসিয়া মেয়ে টক্ করে তুলে ফেললে পিঠের ঝুরিতে। সেখান থেকে গেল 'ফারমেণ্টিং কলে,' তাকে শেঁকা হলো গরম হাওয়ায়। তারপর গরম থাকতে থাকতেই তাকে ভরা হ'ল সিসের বাক্সয়, তারপর সিধে চালান হয়ে গেল বিলেতে। সে চা

এদেশের কেউ খাওয়া ত দূরের কথা দেখতেই পেলে না। চুক্ চুক চুকচুক্। সে চা হ'ল চা। তারপরের পাতা হলো পিকো, তার নীচের পাতা হলো পিকোসুচঙ্ আর তার চাইতেও বুড়ো যেসব পাতা সেগুলো হলো কঙো। আর এসবের ঝড়তি পড়তি যেগুলো রইল সেগুলোই শুঁকিয়ে কড়কড়া করে কলে পিষে গুঁড়ো করা হ'ল। তারপর গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, জানেন ঐ গুঁড়োগুলো পাইকাররা এনে তাতে চামড়ার গুঁড়ো মিশেল দিয়ে বাজারে ছাড়ে। বুঝলেন ত দাদা, তিরিশ বছর কাটিয়েছি এই লাইনে, এর অলিগলি নাড়ীনক্ষত্র সব মশায় নখদর্পণে। এই যে এগুলো হ'ল কালা চায়ের জাতিভেদ। জানেন ত চা-এরও আবার বর্ণ বৈষম্য আছে, কালো, লাল আর সবুজ। আমাদের দেশে যে চা হয় ওগুলো বেবাক কালা—আরে কালা আদমীর দেশের চা ত! আর এই দেখুন জাপানে যে চা হয়—সেগুলো সবুজ। তা জাপানী চা-এর মধ্যে জাতে বামুন হচ্ছে গাইয়োকুরো। তারপরেই হলো তেন্‌চা। আর তারপর হলো সেন্‌চা, বেন্‌চা। তবে চা হয় মশায় চীন দেশে। ক্ষেতে খামারে ত হয়ই, এমন কি গৃহস্থ ঘরস্থ লোকের উঠানেও মশায় হয়। জানেন ত দুনিয়ায় যত চা হয় তার শতকরা ৪০'-৯২ ভাগ চা হয়—চীনদেশে। চীনে চা-এর নাম শুনবেন, ইয়ং-হাইসন, হাইসন-নং-১, হাইসন্ নং ২, গান পাউডার—চমকে যাবেন না, বারুদ নয়—চা-এরই নাম গান পাউডার।

একটা গণ্ডগোল লেগে গেল। একটি টেবিলের চারটে ছেলে বয়টাকে খুব দাবরাচ্ছে, চাএ চিনি না দিয়ে নুন দিয়েছিস্ নুন দিয়ে কেউ চা খায়? দোকানী উঠে গিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে এলেন, হ্যাঁ, খুব চা খেতে শিখেছেন আজকালকার ছোঁড়ারা। নুন দিলে চা নাকি অখাদ্য হয়ে পড়ে। বলি চা খাবার এরা জানে কি? চা খাবার কায়দার প্রবর্ত্তনই ত করল ঐ চীনেরা। জানেন, ওরা আগে চা পাতার তরকারি খেত; চীনে কবিরাজরা চা পাতা থেকে দাবাই তৈরি করত, বাতের মশায় কী অব্যর্থ ওষুধ বানিয়েছিল চীনেরা। তা মশায়, কথায়ই ত বলে, 'হেকমৎ-এ চীন আর হুজ্জতে বঙ্গাল।' তফাৎটা ত নিজের চোখেই দেখলেন।

জানেন তাও পন্থীরা চাকে বলত অমৃত; আর ঐ যে বৌদ্ধদের দেখছেন, ওদের সাধনার সোমরসই ত ছিল চা।

সভ্যতার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে চা খাবার রীতিও বদলে গেছে।

জাপানী এক ভদ্রলোক ওকাকুরা কাকুজো বলেছেন, চা খাবার রীতিগুলো তিনটে স্তরের ভিতর দিয়ে এসেছে—প্রথম যুগে চা খেত সেদ্ধ করে ; দ্বিতীয় যুগে চা ছুঁইয়ে জল খেত আর তৃতীয় যুগে চা ভিজিয়ে খাওয়া হয়।

আগের দিনে চা খাবার একটা ঠাট ছিল, গমক ছিল। সে কি আর এখনকার মত এই ফুচকে চা। তখন চা পাতা ভাপে সেদ্ধ করে খলে পেষা হত, তারপর সেগুলোকে চাল, আদা, পেঁয়াজ, গরম মশল্লা, কমলার খোসা, মুন ও দুধের সাথে সেদ্ধ করা হত। সে ত আর চা নয়, চা-এর পোলাও। শুনছি কাশ্মীরে নাকি এখনও চায়ের পোলাও খাবার রেওয়াজ আছে। তারপর তিব্বতে কি হয়? ভাতের মাড়ের সাথে ভাপে সেদ্ধ চা পাতা মিশিয়ে কেক বানিয়ে খায়।

চীনেরাও চা-এর পোলাও খেত। চা খাবার উপর ভক্তি ছিল চিনেদের। এই ধরুননা চীনে যখন তুংএরা রাজত্ব করছে, অর্থাৎ আপনার সে হবে ৬১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ৯১০ খৃষ্টাব্দ, তখন এক চীনে কবি লুবাহ্‌ ত চা খাবার এক ধর্ম্মগ্রন্থই লিখে ফেললেন। চা-এর পোলাওএর বদলে চা-এর সরবৎ খাবার ব্যবস্থা করলেন ত এই লুবাহ্‌। চা তৈরি করার সোক বহর। প্রথমে জল চড়াও, জলে যখন ফুটকি ফুটকি বুদ্বুদ উঠছে, তখন তাতে মুন মেশাও। তারপর যখন বড় বড় বুদ্বুদ উঠছে তখন উনুনের পারে রেখে শেকা চা পাতা ছাড়। তারপর যখন জলে খুব বুদ্বুদ উঠছে তখন কেটলিতে ঠাণ্ডা জল মেশাও, কেটলি নামাও। জল ঠাণ্ডা হলে কাপে কাপে ঢেলে খাও। সেই কাপের উপরে চা পাতা ভাসা চাই। তাহলে বুঝুন একবার চা খাবার বিলাসটা। আর এরা বলে চা-এ মুন দিলে চা অখাদ্য হয়ে উঠে। আরে চা-এ মুন দেওয়াও বন্ধ করলে স্থংএরা। চীনে যখন স্থংবংশ রাজত্ব করছে তখন তারা এক নূতন ফ্যাসান বার করলে; চা পাতা জলে ছুঁইয়েই চা খাও। সে কি ব্যাপার মশায়! চা পাতাকে খুব গুঁড়ো করে বাঁশের ঝাঁটায় মাখাত, তারপর ঐ চা মাখা বাঁশের ঝাঁটাটাকে গরমজলে খুব তাড়াতাড়ি ঘুরিয়ে আনত। তারপর ঐজল খেত। চা খাওয়ার সুখটা এরা একেবারেই মাটি করে দিলে মশায়।

ভাগ্যি ভাল এদের পর মিংএরা এসেছিল। এরা এসে স্থংই ফ্যাশানের উপর একটু কারিগরি করল, তাও তুংই প্যাটার্ণের কাছ দিয়ে গেলনা। এদের নিয়মই হচ্ছে আসলে আজকালকার ফ্যাশানের সুরু। জল গরম করে তাতে চা পাতা ভিজিয়ে চা খেত মিংএরা।

তারপরের খবর ত আপনারা জানেনই, সাহেবদের কেউ কেউ এর সাথে একটু চিনি মিশাতে সুরু করল, আবার কোন কোন মুল্লুকে এতে নুন মিশাল। তবে কিনা রসিক জাত এই ইণ্ডিয়ানরা। সেরেফ পোয়া কাপ কি আধকাপ দুধ নিল, খপ্ করে দুচামচ চিনি নিল তবে চা খেল।

আর খেতেও সুরু করেছে। ভাত খায় এক ছটাক ত চা খায় ডজন কাপ। হাড লিকলিকে ছোঁড়া এসে ঢুকল দোকানে, কি চাই বাবুর, না এক কাপ চা—সেরেফ এক কাপ চা মশায়। তা থাক্, চাএ ক্ষতি আর কীই বা বলেন? চাএ আছে ত কিছু ক্যাফিন, আর থিওফিলিন, কিছু ট্যানিন, আর আজকাল ত কেউ কেউ চা-এ ভিটামিন সি দেখছে। তা দেখুন এক ট্যানিনটা যা একটু ইয়ে, তা ছাড়া সবইত—কি বলেন, এঁ্যা?

'সংসারে দৈন্যের শেষ নাই। সে দিক হইতে দেখিতে গেলে মানব-জীবনটা অত্যন্ত শীর্ণ শূন্য শ্রীহীনরূপে চক্ষে পড়ে। মানবাত্মা জিনিসটা যতই উচ্চ হউক না কেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি তণ্ডুল সংগ্রহ করিতেই হইবে, এক খণ্ড বস্ত্র না হইলে সে মাটিতে মিশিয়া যায়। এ দিকে আপনাকে অবিনাশী অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করে, ওদিকে যেদিন নস্যের ডিবাটা হারাইয়া যায়, সেদিন আকাশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।······ এই কারণে সে এই শুষ্ক ধূলিময় লোকাকীর্ণ হাট-বাজারের ইতরতা ঢাকিবার জন্য সর্বদা প্রয়াস পায়। আহারে-বিহারে আদানে-প্রদানে আত্মা আপনার সৌন্দর্যবিভা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। সে আপনার আবশ্যকের সহিত আপনার মহত্বের সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইতে চায়।'

—পঞ্চভূত, রবীন্দ্রনাথ

টফ্‌টে দম্পতির আতিথ্য

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

(১)

"And nightly sings the staring owl—tu-who tu-whit tu-who" (Shakespeare)—একটা পত্রপল্লবঘন চেষ্ট্‌নাট গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একজন টাকমাথা ভদ্রলোক, উর্ধ্বমুখ, প্রায় নাসাগ্রনিবদ্ধ দৃষ্টিতে গাছের পাতার আড়ালে কি যেন খুঁজছেন। ইনিই প্যাস্টর ক্নুড্ টফ্‌টে (Pastor Knud Tofte)। স্কিবি গ্রামের পুরোহিত (Parish Priest)। এক হপ্তা মেয়াদের অতিথি হয়ে টফ্‌টে সাহেবের বাড়িতে আমার এই প্রথম আগমন। উচ্চ বৃক্ষচূড়ে স্থাপিত কাঠের ভাসপক্ষীর দিকে অর্জুনের অনন্য-লক্ষ্যের মতোই টফ্‌টে সাহেবের একাগ্র দৃষ্টি। তবে এ-ক্ষেত্রে ভাসপক্ষী নয়, এবং টফ্‌টে সাহেবও ধনুবিদ্যার পরীক্ষা দিচ্ছেন না। তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে একটি শ্বেত পেচকের দিকে। পেঁচাটা চেস্ট্‌নাট গাছের একটা মগডালে বসে ডাকছে tu-who, tu-whit, tu-who। আমার সঙ্গী ভদ্রলোক পাদ্রীমশায়কে ডেকে আমাদের উপস্থিতি ঘোষণা করলেন। টফ্‌টে সাহেব মুহূর্তের জন্য মুখ নামিয়ে ঠোঁটে তর্জনী স্থাপন করে ইঙ্গিতে আমাদের নীরব থাকতে বললেন, কিন্তু তাঁর মুখখানা হাস্য-রেখায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সহাস্যমুখে আমাকে সম্বর্ধনা জানালেন; বললেন: "আপনার অপেক্ষাতেই আছি। আমার বাড়িতে একজন ভারতীয়কে অতিথিরূপে পেয়ে বড় সুখী হলাম। স্কিবি গ্রামে আপনিই বোধহয় প্রথম ভারতীয়।" "আসুন, আসুন" বলতে বলতে নিয়ে গেলেন তাঁর ড্রয়িং রুমে, হাঁক ডাক শুরু করে দিলেন গৃহিণীর নাম ধরে: "জুলি জুলি।" টফ্‌টে সাহেব সরল, সদানন্দময় আমুদে মানুষ। বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ। সারা মাথায় একটি নিটোল টাক। অনাবৃত টাকে আসল বয়সটি ঢাকা পড়ে থাকে, কিন্তু টাকের উপর টুপি চাপালেই বুঝা যায় ভদ্রলোক প্রৌঢ় নহেন, এখনও যুবক। শ্রীমতি জুলি (Julie) এলেন স্মিত-মুখে, স্বাগত জানালেন। আর তার পেছনে এল টফ্‌টে দম্পতির পালিতা

কন্যা কুমারী বীরগিটা (Miss Birgita)—তেরো বছরের সুশ্রী সুশীলা মেয়েটি। আমি ড্যানিস ভাষা জানি না, কিন্তু টফ্‌টে দম্পতি ইংরাজী বেশ জানেন। বীরগিটাও ভাঙা ভাঙা ইংরাজী বলতে পারে। রোজ সকালে এসে ডাকত, "Good morning Mr. Roy, we shall eat now." আলাপ জমতে দেরি হল না। পাঁচ মিনিটেই যেন ওঁদের আপনার একজন হয়ে উঠলাম। তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। আপরাহ্নিক চা-পানের পর টফ্‌টে সাহেবের বাগান দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। গ্রাম্য-গীর্জার (Parish Church) বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্যেই পাদ্রী সাহেবের কোয়ার্টার্স আর চারপাশে বাগান ও তৃণাস্তীর্ণ সবুজ লন (lawn)। টফ্‌টে সাহেব উদ্যানানুরাগী, নিজ হাতে বাগানের কাজ করেন, নানা রকমারি ফুল ও ফলের গাছ সযত্নে রোপন ও সংরক্ষণ-সংবর্ধন করে আসছেন। এ-দেশের স্বল্পস্থায়ী গ্রীষ্ম-শরৎ অর্থাৎ মে থেকে সেপ্টেম্বর এই মাস পাঁচেক সময়ের মধ্যেই চাষবাসের কাজ শেষ করে ফেলতে হয়। এর আগে ও পরে শীতের প্রকোপে কৃষি-কার্য সম্ভব নয়। প্রায় গোটা শীতটাই মাঠঘাট গাছপালা সব বরফে ঢাকা থাকে। আমি যে-সময়টা স্কিবিতে ছিলাম সে-সময়টা ছিল শরতের শেষ লগ্ন। পাইন গাছের পাতাগুলি সারাদিন ঝির ঝির করে পড়ছে। ঘরের বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা। হিমেল হাওয়ায় ঝরা পাতার এলোমেলো নাচ। বাগান ঘুরে আবার সেই চেস্টনাটের তলায় এলাম। পেঁচক-প্রবর তখনও গাছের ডালে সমাসীন। টফ্‌টে সাহেবের পশুপক্ষী-প্রিয়তার বহু নিদর্শন ক্রমশঃ পেলাম। নিজের পোষা হাঁস, মুরগী, কুকুর, বিড়াল ছাড়াও বুনো জীবজন্তু সম্বন্ধে অফুরন্ত আগ্রহ। নিজস্ব লাইব্রেরীতে পশুপক্ষী সম্বন্ধীয় বহু ছবি ও বই-পুস্তক সংগ্রহ করেছেন। তাঁরই দৌলতে দু' চারখানা বই আমার পড়বার সুযোগ ঘটেছিল। পশুপাখী বিষয়ক এই শ্রেণীর বই পূর্বে বড়ো একটা আমার পড়া ছিল না। দেখলাম এমন বই ইংরাজীতে আছে যাতে পশু পাখীর আকৃতি-প্রকৃতি চলাফেরা, মেজাজ, যৌনলিপ্সা ইত্যাদির অতি নিখুঁত ও নিপুণ বর্ণনা পাওয়া যায়, অথচ এই সকল বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবেশন হয়েছে অতি উপভোগ্য সাহিত্যধর্মী ভাষায়।

মুক্ত, আরণ্য জীবজন্তুর জীবন বিষয়ে নানা খুঁটিনাটি সংবাদ সংগ্রহ করেছেন জ্ঞান পিপাসুর দল অসীম ধৈর্য, পরিশ্রম আর সহানুভূতি সহকারে।

বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক J. B, S. Haldane মাছের ভাষার রহস্য উদ্‌ঘাটন-মানসে ওয়াটার প্রুফ্ রবারের পোষাক পরে হিমশীতল জলে চব্বিশ ঘণ্টা নিমজ্জিত ছিলেন। মৌ-মাছির ভাষা জানবার জন্য পুষ্পিত গাছের ছদ্মবেশে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অদ্ভুত! টফ্‌টে সাহেব সেই চেস্ট্‌নাট বৃক্ষবিহারী পেঁচাটার অনেক খবরই সংগ্রহ করেছেন। পেঁচাটা বছরের কোন্ সময়ে স্কিবি গ্রামে আসে, কখনো সঙ্গিনী সহ আবার কখনো নিঃসঙ্গ, কোন্ কোন্ তল্লাটে কোন্ কোন্ গাছে এর যাতায়াত, রাত্রের কোন্ কোন্ প্রহরে এর ডাক শোনা যায় ইত্যাদি বহু খবর টফ্‌টে সাহেবের ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ আছে।

টফ্‌টে দম্পতির পোষা বিড়াল দু'টো—একটার নাম মিমি—এটা মার্জারী—গায়ের রং পাঁশুটে, অপরটি মার্জার, নাম কাপ্তেন ব্লাড (Captain Blood); গায়ের রং মিসমিসে কালো; চোখ দুটো জলন্ত অঙ্গারের মতো রক্তবর্ণ। নিঃসন্তান টফ্‌টে দম্পতির নিরুদ্ধ অপত্যস্নেহ যেন নিঃশেষে উচ্ছলিত হচ্ছে এই বিড়াল দুটোকে উপলক্ষ্য করে। ডিনার টেবিলের পাশেই মিমি আর কাপ্তেন ব্লাডের জন্য নির্দিষ্ট থাকে বিশেষ আসন। দৈনিক দুধ মাছের বরাদ্দ আছে। এদের শোবার জায়গা নির্দিষ্ট আছে রান্নাঘরে ইলেক্‌ট্রিক চুল্লীর পাশে। শ্রীমতি জুলীর দু'টো পুরান পশমী ওভারকোট পাতা আছে এদের সুখ-শয়নের জন্য। টফ্‌টে সাহেব কাপ্তেন ব্লাডকে আদর করে ঘাড়ে তুলে আমার সঙ্গে বাগানে ঘুরছেন। একদিন মিমির ঠাণ্ডা লেগে বেজায় সর্দি হ'ল। বেচারা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে, সেই মার্জারী সুলভ চাঞ্চল্য আর নেই। রান্নাঘরের কোণে চুপটি করে শুয়ে শুয়ে কাতর আওয়াজ করছে—আহার বন্ধ হয়ে গেছে আর অনবরত হাঁচি দিচ্ছে। বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আবহাওয়া বেশ দুর্যোগপূর্ণ। টফ্‌টে সাহেব ছাতা-বর্ষাতি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন পশু-চিকিৎসকের খোঁজে। পশু-চিকিৎসক ডাক্তার থ্যামড্রুপকে নিয়ে এলেন। রাত তখন আটটা। যথারীতি পরীক্ষাদির পর ডাক্তার থ্যামড্রুপ মিমিকে পেনিসিলিন ইন্‌জেক্‌শন দিলেন, আর সেঁক দিতে বলে গেলেন। তারপর সারারাত শ্রীমতি টফ্‌টে মিমিকে কোলে নিয়ে ইলেক্‌ট্রিক-হিটার জ্বালিয়ে ফ্লানেল গরম ক'রে ক'রে সেঁক দিতে লাগলেন। প্যাস্টর টফ্‌টেও সারারাত ঘুমোন নি। দু'জনেরই কী অধীর উৎকণ্ঠা! নিজ সন্তানের অসুখ বিসুখ হ'লে বাপ-মায়ের মানসিক উদ্বেগ

যেমনটি হয়, একটা পোষা বিড়ালের অসুখে টফ্‌টে দম্পতিরও অনুরূপ দশা। দেখে অবাক হয়ে গেলাম! আমরা অহিংস, আমাদের শাস্ত্রের অনুশাসন: জীব সেবা পরমধর্ম্ম। জীবজন্তুর প্রতি আমাদের আচরণ কি সত্যই শাস্ত্রসম্মত? এরা গো-খাদক বটে, কিন্তু গরুকে এরা যে-পরিমাণ আদর যত্ন ক'রে তার সিকি ভাগও আমরা করি কি?

টফ্‌টে দম্পতির গৃহে অতিথি হিসেবে অন্তরঙ্গ ভাবে এঁদের সঙ্গে মিশে দেখলাম যে এঁরাই সত্যিকারের জীব-দরদী। পশু-পাখির প্রতি এঁদের কী অসীম দরদ; এ-সব দেশে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো পশু-পাখির প্রাচুর্য্য ততো নয়। ডেনমার্ক ও অপর স্ক্যান্ডিনাভীয় দেশগুলি উত্তর হিমমণ্ডলের কাছাকাছি। শীতের প্রকোপের সঙ্গে পশু-পাখিরা মানুষের মতো লড়াই করতে অপারগ, কাজেই জীবনযুদ্ধে তারা পরাভূত। শীতের দিনে যখন সমস্ত মাঠ-ঘাট তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন মুক্ত বন্য পশু-পাখি প্রায় দেখাই যায় না। পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে উষ্ণতর অঞ্চলের খোঁজে উড়ে চলে বনপ্রান্তর-দেশ-মহাদেশ-সাগর পেরিয়ে। আবার বসন্ত সমাগমে পাখিরা ফিরে আসে। এ-সময় ডেনমার্ক-সুইডেন অঞ্চলে দেখা যায় বিস্তর স্টর্ক, ফ্ল্যামিঙ্গো, সোয়ান, রুক আর বুনো হাঁস। সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বরফ-পড়া রাতেও ঘুরে বেড়ায় ক্ষুধার্ত নেকড়ের দল। রাজোদ্যানে—যার নাম Royal Deer Park—আছে কয়েকশ' নানা জাতের হরিণ। বুনো পশু-পাখির সম্বন্ধে এ-দেশের মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। নানা নামের ক্লাব-সমিতি-সংস্থা পশুপাখি বিষয়ে নানা গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি করছে। ইস্কুলের ছেলে মেয়েদের দলে দলে নিয়ে যাওয়া হয় বনাঞ্চলে, খোলা প্রান্তরে পশুপাখির চলাফেরা, আকৃতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য। স্কিবি গ্রাম হতে মাইল তিনেক দূরে আছে এক বিস্তীর্ণ জলাভূমি—নাম মরাল-সরোবর (Swan lake)। একদিন ভোরে প্রাতরাশের পর টফ্‌টে সাহেব, টফ্‌টে গৃহিণী আর মিস্ বীরগিটের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম মরাল-সরোবরের উদ্দেশ্যে। বেশ দ্রুতপদেই হাঁটতে হ'ল। টফ্‌টে সাহেব প্রায় দৌড়ে চলেন। মিস্ বীরগিট আর আমি তাঁর পেছনে পেছনে। শ্রীমতি টফ্‌টে পিছিয়ে পড়তে লাগলেন, তাই মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে টফ্‌টে সাহেবকে অপেক্ষা করতে বলি।

মরাল-সরোবরে পৌঁছে গেলাম মিনিট চল্লিশের মধ্যে। একটা উঁচু বাঁধ বেয়ে বেশ খানিকা উপরে উঠতেই চোখে পড়লো সেই বিস্তীর্ণ জলাভূমি

—এককালে সমুদ্রেরই অংশ ছিল। এখন সমুদ্র অনেক দূরে সরে গেছে, আর এই অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গাটা একটা স্বাভাবিক সরোবরে পরিণত হয়েছে। রাজশাহীর বিখ্যাত চলন বিলে বালিহাঁসের ঝাঁক বিস্তর দেখেছি। সোয়ান-লেক বলতে প্রথমটা ঐরকম একটা ধারণাই হয়েছিল। কিন্তু যা দেখলাম পূর্ব-ধারণার সঙ্গে তা অনেকখানি পৃথক। শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে হয়তো আরও বেশী, বুনো হাঁস। তাদের কলকণ্ঠে আকাশ-বাতাস উচ্চকিত। আকাশে উড়ছে ঝাঁক বেঁধে আবার সরোবরের জলে নাবছে আর অবলীলাক্রমে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। জলের ধারে ধারে শরবন। শরবনের আশ্রয়ে বুনো হাঁসেরা বাসা বাধে। হংসীরা ডিম পাড়ে আর সেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয়। ক্রমে সেই বাচ্চা বড় হয়। সাদা আর বাদামী ও মিশ্রিত রংয়ের অসংখ্য হাঁস। মাঝে মাঝে উচ্চগ্রীব শাদা মরালও দেখা যায়—গর্বভরে সমুন্নত ভঙ্গীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। আর আছে অগণিত দাত্যূহ বা water-fowl. শীতের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু হাঁসের দল এ-দেশ ছেড়ে পালায়—বলাকাবদ্ধ হয়ে আকাশপথে নিরুদ্দেশ যাত্রা শুরু করে। আর আছে স্টর্ক বা সারস জাতীয় পাখি। পেলিক্যানও বেশ দেখা যায়। এরা সবাই ডেনদের অতি প্রিয় পাখি। স্কিবির আপেল-বাগানে রোজ বিকালবেলায় একটা নাইটিঙ্গেল গান গাইত। কোন ঝোঁপের আড়ালে বসে আপন খুশিতে শীষ দিত। কিন্তু কখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি। আর আছে অতি ক্ষুদ্রকায় লিনিট (Linnet) এবং ছাতারে (Swallow) পাখি। লিনিট পাখি প্রায় মৌমাছির মতো। সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রায় মাটি ছুঁয়ে এরা দলে দলে উড়ে উড়ে ঘুরপাক খায়। কবি ইয়েটসের (W.B. Yeats) ভাষায়:

'The evening came on the linnet's wings.' টফ্‌টে সাহেবের অদম্য পক্ষী-উৎসাহ, তাঁর পাল্লায় পড়ে আমাকেও আঁদারে-বাদারে পাখির পিছনে কম ঘুরতে হয় নি!

ক্রমশঃ

———

ভক্তি-ভিক্ষা।

॥ শ্রীসুধাময় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রভু, তোমার পায়ে একটিকণা ভক্তি দিয়ো,
জীবন তোমার চরণতলে বিকিয়ে নিয়ো।

আর যা কিছু চাই গো আমি,
জানইত তা হৃদয় স্বামী,
ভুল করে' চাই,—ভুলটুকু মোর
শুধ্‌রে নিয়ো।
তোমার পায়ে একটিকণা ভক্তি দিয়ো।

অজ্ঞানতার অন্ধকারার কক্ষ হ'তে
ফিরিয়ে নিয়ো তোমার উদার আলোর পথে।

দুঃখে, দাহে, বিপদ-বাধায়—
যখন আমার চিত্ত ধাঁধায়,
মন যেন রয় তোমার পায়ে
—শক্তি দিয়ো।
তোমার পায়ে একটিকণা ভক্তি দিয়ো।

ব্রহ্মসূত্রম্

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(১৯)

আদরাদলোপঃ ৷ ৩৷৩৷৪০

আদরাৎ [প্রাণদেবতার আদরে] (ইন্দ্রিয়াদির) অলোপঃ [অলোপই সিদ্ধ হইতেছে।]

প্রাণ-দেবতার আদরে এই সৃষ্টির প্রতি স্পন্দনটী আদৃত আপ্যায়িত বলিয়া কাহারও লুপ্ত হইবার, মুছিয়া যাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। বৃহদারণ্যক স্পষ্ট শুনাইয়া দিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গণ যখন ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত সামান্য সত্তা ও নিজ বিশেষ সত্তার মাঝে পৃথক-বুদ্ধি রাখিয়া উদ্গীথ গান করিয়াছিল, 'যো বাচ ভোগস্তং দেবেভ্য আগায়ৎ যৎ কল্যাণং বদতি তদাত্মনে'—বৃঃ-১৷৩৷২, তখনই 'তমভিদ্রুত্য পাপ্মনাঽবিধ্যন্'—বৃঃ-১৷৩৷২। কিন্তু 'প্রাণ' যখন উদ্গীথ গান করিলেন, তখনই অসুরগণ আর তাহাকে পাপবিদ্ধ করিতে পারিল না। কেন না প্রাণের দৃষ্টিতে সাধারণ-অসাধারণ, সামান্য-বিশেষ, সমষ্টি-ব্যষ্টি সম স্বার্থ। প্রাণের সুরে 'নিজ' অর্থ সর্ব্ব। প্রাণের জয়ে তাই সর্ব্বেন্দ্রিয়েরই জয়। 'যথাঽশ্মানমৃত্বা লোষ্টো বিধ্বংসেত এবং হৈব বিধ্বংসমানা বিষঞ্চো বিনেশুস্ততো দেবা অভবন্'—বৃঃ ১৷৩৷৭। পাপকে আত্মসাৎ করার ফলে যখন প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন ইন্দ্রিয়গণ দেবতা হইলেন, সামান্য-বিশেষের সমন্বয় করিয়া প্রাণের সুরে স্থিত হইলেন। প্রাণের বাহিরে যে-ইন্দ্রিয় পরাজিত, প্রাণের ভিতরে তাহারাই দেবভাবাপন্ন, সমষ্টিভূত, আদৃত। প্রাণের আদরে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আদর আজ বাড়িয়া গিয়াছে। প্রাণের মাঝে ডুবিয়া তাহারা হারায় তো নাই-ই, পরন্তু সেখানেই তাহারা নিজ বিশেষ সত্তার আদর বুঝিল। প্রাণের সত্তায় তাহাদের বিশেষ সত্তা সার্থক হইল, প্রাণের ভোজনে তাহাদের বিশেষ বিশেষ সত্তার ভোজন মিলিল। প্রাণ প্রতি ইন্দ্রিয়কে মরণের হাত হইতে রক্ষা করিয়া অমৃতত্ব প্রদান করিলেন—'সা বা এষা দেবতৈতাসাং দেবতানাং পাপ্মানং মৃত্যুমপহত্যাথৈনা মৃত্যুমত্যবহৎ' ॥—

বৃঃ ১।৩।১১। প্রাণের আদরেই ইন্দ্রিয়বর্গের অমৃতত্ব-গতি লাভ হইল, লুপ্ত হইবার ভীতি হইতে তাহারা মুক্ত হইল।

ইন্দ্রিয়াদির সাধনার পথে কোনও বৈকল্য উপস্থিত হইলে প্রাণ-সাধনা তাহা পূর্ণ করিয়া লয়। অঙ্গ-বৈকল্যে, অঙ্গ-লোপে প্রাণ-সাধনার বিলোপ হয় না। 'যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি।' সুরেশ্বরী প্রাণ-দেবতার প্রসাদে সকলের সব অনিচ্ছাকৃত ছন্দহানি প্রাণের রসে পূর্ণ হইয়া যায়। অঙ্গহানি জীবের অনিবার্য্য, প্রাণ-সাধনাই শুধু এই অঙ্গহীনকে পূর্ণাঙ্গ করিতে পারে। অঙ্গ-লোপে অঙ্গী প্রাণের লোপ তো দূরের কথা, অঙ্গী অঙ্গ-লোপকে অলোপে পরিণতই করেন। 'যদ্যপ্যেনচ্ছুষ্কায় স্থাণবে ব্রূয়াজ্জায়েরন্নেবাস্মিন্ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানীতি' —ছাঃ ৫.২।৩। শুষ্ক তরু মুঞ্জরিবে, মরা ভ্রমর গুঞ্জরিবে।' প্রাণের এমনই গৌরব, এমনই আদর শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রাণ-প্রভাবে 'অন্ধঃ অনন্ধঃ ভবতি'—অন্ধ চক্ষু পায়, বোবা কথা কয়—'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥' প্রাণ দেবতাই এই কৃপা-শক্তি।)

উপস্থিতেঽতস্তদ্বচনাৎ ॥ ৩।৩।৪১

উপস্থিতে [ভজনীয়ের ভজনার অনুকূল আবেষ্টন উপস্থিত হইলেই] অতঃ [তবে] (ভজনের স্ফুরণ হয়) তদ্বচনাৎ [শ্রুতিবচন হইতে তাহা উপলব্ধ হয়।]

(ভজনীয়ের ভজনার অনুকূল আবেষ্টনের উপস্থিতিতেই ভজনার প্রকাশ হয়; ভজনা আনুমানিক নয়। ভজনা জীবনের স্বাভাবিকী বৃত্তি, অহৈতুকী, অব্যবহিতা। বৎস উপস্থিত হইলে গাভীর দুগ্ধ-ক্ষরণ হওয়া একটি সহজ ঘটনা। ইহাই 'বর্ত্তমান ভজন'। যাহা 'বাস্তব', তাহা চিরদিন বর্ত্তমানকে ভিত্তি করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। বর্ত্তমানকে ভিত্তি না করিয়া বুদ্ধি অতীতের উপর দাঁড়াইতে চায়। কিন্তু 'বর্ত্তমান' আবেষ্টন বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে ওলটপালট করিয়া দেয়। মানুষ চলে সহজ প্রেরণায়, বুদ্ধিদ্বারা নয়। তাই পুরুষোত্তম সহজের ভিত্তি হইতেই সাধনার আরম্ভের উপদেশ দিয়াছেন। তিনি তাই নন্দ-নন্দন, যশোদা-নন্দন, গোষ্ঠ-বিহারী, গোপীজন-বল্লভ, মথুরাধীশ, পার্থ-সারথি ইত্যাদি। বাস্তব ঘটনাকে, বর্ত্তমানকে ডিঙ্গাইয়া যে সাধনা, তাহা

আনুমানিক; সেই আনুমানিক সাধনা সহজ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে অভিযান করিতে পারে। কিন্তু সহজের টান সামলাইয়া উঠা তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই 'শ্রুতি বচনে' সর্ব্বত্র বর্ত্তমান-ভজনই উপদিষ্ট হইয়াছে। সহজের টান ও ভাবুকতা যে-সাধনায় এক, সেই এক-সাধনাই হইতেছে 'ভজন'। শ্রীনিত্য-গোপাল লিখিতেছেন, 'সামবেদ, যজুর্ব্বেদ এবং অথর্ব্ববেদের মতে বর্ত্তমান ভজন। তাহা ঐ তিন বেদের তিন মহাবাক্য হইতেই বোঝা যায়। সামবেদ অনুসারে 'তত্ত্বমসি' বলিলেও বর্ত্তমান ভজন বোঝা যায়, যজুর্ব্বেদ অনুসারে 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' বলিলেও বর্ত্তমান ভজন বোঝা যায়, অথর্ব্ব বেদ অনুসারে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিলেও বর্ত্তমান ভজন বোঝা যায়।' মহাবাক্যোক্ত 'তত্ত্বমসি'র 'অসি' পদ, 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'-র 'অস্মি'-পদই বর্ত্তমান ভজনের ইঙ্গিত দিতেছে। 'তুমি তিনি ছিলে'—এইরূপ অতীত কালের প্রয়োগ না করিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, 'তুমি তিনি আছ'। 'আমি ব্রহ্ম ছিলাম কিম্বা আমি ব্রহ্ম হইব'—এইরূপ না বলিয়া বলা হইতেছে, 'আমি ব্রহ্ম আছি'। শ্রীনিত্যগোপাল 'সাধকসুহৃদ্' গ্রন্থে লিখিতেছেন, 'আনুমানিক ভজনা করিবার সময় যাহার ভজনা করা হয়, তাঁহাকে সে সময় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে ভজনার দ্বারা সেই ভজনীয়কে প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহাই বর্ত্তমান ভজন বা বর্ত্তমানে ভজনা। ব্রজের নন্দ-যশোদারও বর্ত্তমান ভজনা ছিল। তাঁহারা বাৎসল্যভাবদ্বারা আনুমানিক কৃষ্ণের ভজনা করিতেন না। তাঁহাদের বর্ত্তমান কৃষ্ণ-ভজনা ছিল।......সমস্ত জীবেরই বর্ত্তমান ভজনা। মাতার বর্ত্তমান ভজনা। পিতার বর্ত্তমান ভজনা। তাঁহারা প্রত্যক্ষ সন্তান সন্ততির বা সন্তান সন্ততিগণেরই ভজনা করেন।......জগতে জীবগণের যত লোকের সহিত যত প্রকার সম্বন্ধ আছে, তাহাদের মধ্যে সকলেরই বর্ত্তমান ভজনা। আমাদের অন্ন প্রভৃতি আহার্য্যের সঙ্গেও বর্ত্তমান সম্বন্ধ। আমরা তাহাদেরও বর্ত্তমানে ভজি।...... আমরা সুখ শান্তি প্রভৃতিও বর্ত্তমানে সম্ভোগ করি। সেইজন্যই বলি বর্ত্তমান ভজনা ভিন্ন ভজনীয়ের ভজনা করিবার আমাদের অন্য আর প্রশস্ত অবলম্বন নাই।' বর্ত্তমান ভজনা জড়বাদের দাবী ও ভাববাদের দাবীর সমন্বয় বিধান করিয়াছে। জড়বাদীর প্রচার্য্য 'বর্ত্তমান', ভাববাদী জোর দেয় 'অতীতে'র উপর। 'বর্ত্তমান ভজনে' রহিয়াছে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ সমন্বয়। শ্বেতাশ্বেতরও ইহাই বলিতেছেন, 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাঃ হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ'। গুরু 'বর্ত্তমান', দেব 'অতীত',

গুরু ও দেব সমন্বয়ে ভজনই বর্ত্তমান ভজনা। বাস্তবের দাবীকে অস্বীকার করিয়া, সহজ প্রবৃত্তিকে ক্ষেপাইয়া তুলিয়া যতই তুমি বাস্তবের ওপারে আদর্শকে পাইবার জন্য প্রাণপণ কর না কেন, তোমাকে রক্তাক্ত হইয়া বাস্তবের দেশে আবার ফিরিতেই হইবে। বাস্তবের দাবী ও আদর্শের দাবী সমন্বিত করিয়া 'বর্ত্তমান ভজনা'ই এ দেশের গুরুবাদ প্রবর্ত্তন করিয়াছে। যাহার যেখানে সহজ স্থিতি, সেখানেই খুঁজিতে হইবে তাহার ইষ্টকে, সেখান হইতেই যাত্রা আরম্ভ করিতে হইবে। 'অঞ্জসা যেন বর্ত্তেত তদেবাস্য হি দৈবতম্'— 'যাহাদ্বারা তোমার বৃত্তি অনায়াসলভ্য, তাহাই তোমার দেবতা'। যেখানে 'অঞ্জসা' সেখানে 'কর্ত্তুম্ সুসুগম্', সেখান হইতেই বর্ত্তমান ভজনার স্ফূর্ত্তি সম্ভব।)

তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৩।৩।৪২

তন্নির্দ্ধারণানিয়মঃ [ভজনীয়ের ভজনার অনুকূল আবেষ্টন সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা করিবার কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিতে পারে না] তদ্দৃষ্টেঃ [কেননা অনিয়মই দৃষ্ট হইতেছে] পৃথক্ হি ফলম্ [নির্দ্ধারণের নিয়ম হইতে অনিয়মের নিশ্চয়ই পৃথক্ ফল] অপ্রতিবন্ধঃ [সেই ফল হইতেছে সর্ব্বত্র অপ্রতিবন্ধ।]

(বর্ত্তমান ভজনায় ভজনীয়ের কোন্ রূপ হইবে, কোন্ আবেষ্টন হইতে রওয়ানা হইতে হইবে, ইহার কোনও নিশ্চিত ধারণা করিবার কোনও নিয়ম নাই। ভজনীয় অস্তি, নাস্তি, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবান, জড় বা চিৎ ইত্যাদি সবই হইতে পারেন; কিন্তু কাহার পক্ষে কে ভজনীয় এবং কোন্ আবেষ্টনে সেই সাধনার সিদ্ধি হইবে, তাহা নির্ভর করিবে ভক্তের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য ও আবেষ্টন-গত বৈশিষ্ট্যের উপর। একই আবেষ্টনে একই স্বভাবযুক্ত পুরুষ ভজনীয়ের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আস্বাদন করে; কখনও বা এক আবেষ্টনেই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবযুক্ত পুরুষ এক রূপই আস্বাদন করে। ইহা সম্ভব হইতে পারে তখনই, যখন ভজনীয় ও আবেষ্টন নমনধর্ম্মশীল হয়। ইহাদের অন্তরে বাহিরে অনিশ্চয়তার (uncertainty) তত্ত্ব ওতপ্রোত থাকে। ঈশোপনিষদের 'অসম্ভূতি'ই সূত্রোক্ত 'নির্দ্ধারণ', অনিয়ম বা হাইসেনবার্গের অনিশ্চয়তা। একই পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনে ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভজনা করে। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা একই দ্রৌপদীর ভিন্ন ভিন্ন রূপের ভজনা করিতেন। এক আবেষ্টনে যখন সকলে এক রূপের ভজনায় সংগৃহীত

হয়, তখন সেই একরূপই সামান্যরূপ, নির্ব্বিশেষ রূপ, কেবল রূপ। পুরুষ ও আবেষ্টন-গত বৈচিত্র্য ভাঙ্গিয়া কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম প্রবর্ত্তনা পুরুষোত্তম-সৃষ্টির উপর জুলুম। সৃষ্টির প্রতি স্তরে এইরূপ নিশ্চিত ধারণার অনিয়মই দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া কোনও নিয়মই নিশ্চিত রূপে মানা চলে না। ইহাই সূত্রকার বলিতেছেন 'তদ্দৃষ্টেঃ'। নিয়ম মানা ও নিয়ম না-মানার ফল পৃথক্। 'তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরম্ ভবতি'—ছাঃ ১।১।১০। যাহারা 'নির্দ্ধারণানিয়ম' জানে ও যাহারা জানে না, তাহারা উভয়েই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের, জড় ও চেতনের ভজনা করে, কিন্তু ফল তাহাদের পৃথক্। কেননা একান্ত প্রত্যক্ষ, একান্ত অনুমান, একান্ত জানা ও একান্ত না-জানা 'নানা' অর্থাৎ কেহও কাহাকে সহ্য করিতে পারে না। বিদ্যা, শ্রদ্ধা ও উপনিষদ দ্বারা যাহা করা হয়, তাহাই বীর্য্যবত্তম হয়। না জানিয়া করিলে হয় বীর্য্যবৎ, জানিয়া করিলে হয় বীর্য্যবত্তর। ঈশোপনিষৎ ইহাই বলিয়াছেন, 'অন্যদাহুর্বিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া'—বিদ্যার ফল অন্য, অবিদ্যার ফল অন্য। 'বিদ্যাং চ অবিদ্যাঞ্চৈব যস্তদ্বেদ উভয়ং সহ'—তাহার ফল আরও অন্য। এই ফল কি, সূত্রকার তাহাই বলিতেছেন, অনিয়ম জানার ফল হইতেছে, 'অপ্রতিবন্ধ,' কোনও প্রতিবন্ধ না-থাকা। জড়কে বাদ দিয়া একান্ত চৈতন্যকে মানায়ও যেমন প্রতিবন্ধ আসিবেই, চৈতন্যকে বাদ দিয়া একান্ত জড় মানাতেও প্রতিবন্ধ আসিবে। জড়-চৈতন্যের সমন্বয়েই 'অপ্রতিবন্ধ'রূপ ফল লাভ। এই সমন্বয় সাধিত হয় প্রাণ-সাধনায় আত্মসমপর্ণের ফলে। বুদ্ধির ক্ষেত্রে নির্দ্ধারণের একটা নিয়ম স্থাপন করিতেই হইবে। শাণ্ডিল্য বলিতেছেন, 'অবন্ধঃ অর্পণস্য মুখম্'—অর্পণের মুখ বন্ধনহীন। অর্পণের মুখে কোনও প্রতিবন্ধক থাকে না বলিয়াই সেখানে সর্ব্বফল-সমন্বয় রহিয়াছে। ভজনা অবশ্য আরম্ভ হয় 'উপস্থিত'-কে লইয়া, বর্ত্তমানকে লইয়াই। কিন্তু ভজনীয়ের সব রূপই তো বর্ত্তমান-ভজনকারীর বর্ত্তমান-ভজনের ভিতর দিয়া আস্বাদিত হওয়া চাই, নচেৎ সেখানে আবার নির্দ্ধারণের নিয়ম আসিবে, প্রতিবন্ধের সৃষ্টি হইবে। ভজনীয়ের ও ভজনের সমগ্র রূপের আস্বাদন না হওয়ার ফলে ঐকদেশিক ঐ ঐ রূপের উপাধিত্বই আপতিত হইবে। সমগ্র ফল লাভ করিতে হইলে চাই সমগ্র রূপের বর্ত্তমান ভজনা, ব্যষ্টি ভজনাকারীর সমগ্রের কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া যাহা লাভ করিবার দ্বিতীয় আর কোনও পথ নাই।

বর্ত্তমানের বুকে বর্ত্তমান অতীত ভবিষ্যৎ আছে; তাই সহজ মানুষ বর্ত্তমানকে ধরিয়াই সকল কালের সকল ঐ ঐ অংশ-নির্দ্ধারণগুলির সমন্বয়ে অনন্ত বর্ত্তমানে ভজনীয়ের সমগ্র রূপের আস্বাদন করিয়া চলিয়াছে। এই সমগ্র আস্বাদনই প্রেমাস্বাদন।)

ভজনীয় ও ভজনীয় তত্ত্বগত ঐক্য থাকিলেও বিশেষ বিশেষ ভজনার ধারা যে অনুরূপ ফল সৃষ্টি করে, পরবর্ত্তী সূত্রে তাহারই আলোচনা হইতেছে।

প্রদানবদেব তদুক্তম্ ॥ ৩।৩।৪৩

প্রদানবৎ এব [(প্রাণাগ্নি হোত্রে আহুতি) প্রদানের অনুরূপই] তদুক্তম্ [(প্রদানের) ফল উক্ত হইয়াছে।]

সর্ব্ব ভজনার মূল তত্ত্ব হইতেছে আত্মাহুতি বা আত্মসমর্পণ, সেখানে সকলেই এক। কিন্তু যে পথ ধরিয়া পুরুষ নিজকে ভজনীয়ের কাছে জীবনের আহুতি প্রদান করে, সেই প্রদান-পথের অনুরূপ রূপে ভজনীয় প্রকট হন। পথও ভজনীয়কে সৃষ্টি করে। ট্রেনে চড়িয়া বার ঘণ্টায় কাশী গমন ও দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ পায়ে হাটিয়া কাশী গমনের ফল কি এক? পায়ে হাটিয়া যাওয়ার মধ্যে যে ধ্যান, আকুলতা থাকে, তাহা ট্রেন-যাত্রীর নাই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ পায়ে হাটিয়া পথ-শ্রমের মধ্যে যে আত্মসমর্পণ নব নব রূপে উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহা কাশীকে, কাশীর বিশ্বেশ্বরকে এক নূতন রূপ দান করিবে। অলস, সমস্ত-রাত্রি-ব্যাপী নিদ্রাতুর পুরুষের কাশী-দর্শন অলস দর্শন; পায়ে হাঁটিয়া দীর্ঘ-পথযাত্রী, দীর্ঘ পথ-শ্রমে ক্লান্ত তপস্বী পুরুষের কাশীদর্শন, বিশ্বনাথ দর্শন জীবন্ত দর্শন। সব নদী একই সাগরে মিলিত হয়, শ্যামবাজার হইতে যে-কোন পথে কালীঘাট গেলে একই কালী-দর্শন হয়—এই রূপ উক্তির ভিতর অনেক ফাঁকি রহিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন পথের পথিকের কালীদর্শনও ভিন্ন ভিন্ন। পথিক, পথ ও গন্তব্য সব একেরই বিভিন্ন আস্বাদন মাত্র। পথিক পথদ্বারা পাথেয়দ্বারা গন্তব্যকে সৃষ্টি করে। ভজনীয় যেমন ভজনা ও ভক্তকে সৃষ্টি করে, তেমন ভজন পন্থা, ভজনার সামগ্রী ও তাহার আত্মপ্রদান-বিশেষও ভজনীয়কে সৃষ্টি করে। আত্মসমর্পণাংশে মাতা ও স্ত্রীর ভজনা এক হইলেও মাতা ও স্ত্রী ভিন্ন ভিন্ন ভজনার দ্রব্য প্রদান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুত্র ও স্বামীর ভজনা করে; সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রদান দ্বারা কি তাহাদের ভজনীয় ও

ভজনের ফল পৃথক হইতেছে না? প্রদানের বস্তু ও ঢং ভজনীয়কে নিশ্চয়ই সৃষ্টি করে। ভজনীয়কে তাই 'প্রদানবৎ' উক্ত হইয়াছে। পৌঁছানো আর চলা যে আত্মসমর্পণ সাধনায় এক।

'পথের বাঁশী পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে চঞ্চলা।

আনন্দে তাই এক হ'ল তার পৌঁছানো আর চলা॥'—রবীন্দ্রনাথ

আত্মপ্রদান-পথের প্রতি পাদক্ষেপেই রহিয়াছে পৌঁছানোর আস্বাদন। যেমন তাহার 'চলা', যেমন তাহার জীবন-প্রদানের ঢং, তেমনি তাহার ভজনীয়ের রূপ। অভিসারের বিশেষ বিশেষ ধারাই শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজগোপীদেব কাছে নব নব রূপে উপস্থাপিত করিয়াছিল। সুতরাং উপপন্ন হইতেছে যে, তত্ত্বতঃ অভেদ থাকিলেও আধ্যানের পৃথকত্ব বশতঃ আধ্যায়েরও পৃথকত্ব অনিবার্য্য।

এখানে সংশয় হইতে পারে যে, ভজনার বিশেষ বিশেষ ধারা যখন একই আত্মসমর্পণ-ক্রিয়ার মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করিয়াছে, তখন উহারা কি একান্ত ক্রিয়ার শেষভূত অঙ্গ মাত্র অথবা উহারা বিদ্যা-অবিদ্যা সমন্বিত আত্মসমর্পণাত্মিকা মহাবিদ্যা-ভজনারই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধারা? ইহারই মীমাংসার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা:

লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৩.৩।৪৪

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ [লিঙ্গভূয়স্ত্ব থাকাবশতঃ] তৎ হি [(ভজনার ধারা সমূহের) স্বাতন্ত্র্যই] বলীয়ঃ [বলীয়ান] তৎ অপি [পূর্ব্ব মীমাংসায় তাহাই (স্বীকৃত হইয়াছে)]

আত্মসমর্পণময়ী ভজনার ধারাসমূহ যে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, বলীয়ান্ মহাবিদ্যার ধারা, তাহা প্রকাশিত হইতেছে তাহার বহু লিঙ্গদ্বারা।

'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ 'সামর্থ্য'; লিঙ্গের অর্থ চিহ্নও বটে। 'ঘরের' ঠাকুরকেই যখন 'পথে' অভিসারের ভিতর দিয়া পাইতে হয়, তখন পথের চতুর্দ্দিকে ছড়ানো থাকে তাঁহার 'লিঙ্গ', পদচিহ্ন। ঐ পদচিহ্নের সঙ্গত অর্থ (সামর্থ্য) ধরিয়া চলাতেই বংশী-শ্রুতিসম্পন্না অভিসারিণীগণের জন্মিয়াছিল কৃষ্ণপ্রাপ্তির 'সামর্থ্য'। পথের প্রতি পদক্ষেপ 'বিদ্যাবধূজীবনম্ পূর্ণামৃতাস্বাদনম্'। পথের বাঁশী পায়ে পায়ে গতিপথের প্রতি স্পন্দনকে স্থিতির সঙ্গে সমন্বিত করিয়া দিয়াছে; তাই প্রতি গতি-স্পন্দনই স্থিতিঘন ব্রহ্মের বিদ্যাস্পন্দন ও আনন্দস্পন্দন। 'ঘর বলে

পেয়েছি, পথ বলে পাই নি।'—রবীন্দ্রনাথ। পথের পাওয়াতেই জীবনের স্থিতি বা বিদ্যা, না-পাওয়াই জীবনের গতি ও রস বা আনন্দ। পাওয়া ও না-পাওয়ার 'লিঙ্গে' প্রতি পদবিক্ষেপ স্বতন্ত্র, মহাবিদ্যাময়। 'যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ'—কেনোপনিষদ্। পরস্পরাকাঙ্ক্ষা-লক্ষণ প্রকরণ যদিও ভজনার ধারাসমূহের সমর্পণ ক্রিয়ার মধ্যে অনুপ্রবেশ দ্বারা উহাদের ক্রিয়াশেষত্বই স্থাপন করিতে চায়, তবুও প্রকরণ হইতে লিঙ্গ বলবান্ বলিয়া লিঙ্গের সম সাক্ষাৎভাবে অর্থ-প্রকাশন-মর্য্যাদাই রক্ষিত হইবে, ভজনধারাসমূহের স্বাতন্ত্র্যই-স্বীকৃত হইবে। উর্দ্ধমুখ ভজন জড়-চৈতন্য, আস্তিক্য-নাস্তিক্য, দ্বৈত-অদ্বৈতাদি যে কোনও বাদ অবলম্বনে যে-কোনও ধারায়ই স্ফুরিত হউক না কেন, উহা সমভাবে সাক্ষাৎভাবে পর অর্থকে প্রতি পদে প্রকাশ করিতেছে। ইহাই এই ভজনের লিঙ্গ বা সামর্থ্য। ভজনে জড়বাদ ও চৈতন্যবাদ সমভাবেই, সাক্ষাৎভাবেই নিরপেক্ষভাবে পুরুষোত্তমার্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ। এখানে কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না, অথচ দুই-ই সমগ্র পুরুষোত্তমে দুইয়ের পরিপূরক। পরস্পরের আকাঙ্ক্ষা করাই হইতেছে প্রকরণের লক্ষণ; প্রকরণের মধ্যে দুইয়েরই অর্থ প্রকাশে বিপ্রকর্ষত্ব রহিয়াছে, দৈন্য রহিয়াছে। প্রকরণে কেহই স্বয়ংভাবে স্বতন্ত্রভাবে অপরের অপেক্ষা না করিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে পারে না। 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত'— দর্শপূর্ণমাসদ্বারা স্বর্গকাম ব্যক্তি যজন করিবে। 'দর্শপূর্ণ মাসদ্বারা স্বর্গাপূর্ব্ব করিবে'—এইরূপ বলা হইলে আকাঙ্ক্ষা হয় কেমন করিয়া ইহাদের দ্বারা স্বর্গাপূর্ব্ব সাধন করিতে হইবে। 'অগ্নি সন্নিধিতে সমিধা যজাতি তনূনপাতং যজতি'—ইত্যাদি ফলরহিত প্রযাজ্যাদি শ্রুত হয়। এই সব প্রযাজ্যাদের স্ববাক্যের মধ্যে ফলের অশ্রবণহেতু ইহাদের প্রয়োজন কি তাহা জানিবার জন্য প্রয়োজনাকাঙ্ক্ষা হয়। কেমন করিয়া দর্শপূর্ণমাসদ্বারা স্বর্গাপূর্ব্ব কর্ত্তব্য, এই প্রশ্নের ভিতরে ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রযাজ্যাদের প্রয়োজনের আকাঙ্ক্ষা; আবার প্রযাজ্যাদির প্রয়োজন কি, তাহার ভিতর দিয়া পাইতেছি দর্শপূর্ণমাস কি করিয়া স্বর্গাপূর্ব্ব সৃষ্টি করিবে ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা —এই পরস্পরাকাঙ্ক্ষালক্ষণ প্রকরণদ্বারা সর্ব্ব প্রযাজাদিসমূহের দর্শপূর্ণ-মাসের অঙ্গত্বই নিশ্চিত হইতেছে। পরস্পরাকাঙ্ক্ষালক্ষণ প্রকরণ হইতে লিঙ্গ বলবান।

ক্রমশঃ

বরিশাল-ইতিহাস

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

॥ শ্রীদুর্গামোহন সেন ॥

প্রচারে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার ঘোষ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার ১৩২৯

বাটাজোড়ে শরৎবাবু প্রাতে দুই শত বা আড়াই শত জন মহিলার সভায় একটি বক্তৃতা করিয়া তাহাদেব চরকা খদ্দরের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন, অতঃপর জাতীয় বিদ্যালয়, কংগ্রেস অফিস পরিদর্শন করেন।

বুধবার ১৭ই জুন লক্ষ্মণকাঠি কারিগর পাড়ায় এক বৈঠক বসে, অমৃতবাবু স্বদেশী সুতা ব্যবহারের জন্য কারিগরদের অনুরোধ করেন। বাসরাইল কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুত হেমচন্দ্র বসু তাহাদের সুতা সরবরাহ করিবার ভার নেন। সন্ধ্যায় শোলকে শ্রীসবল কুমার দত্তের সভাপতিত্বে বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শরৎবাবুর প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় জনগণ স্বদেশী ব্যবহারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। বৃহস্পতিবার ১৮ই জুন—চরকা, তাঁত, কংগ্রেস সম্বন্ধে কর্ম্মীগণের সঙ্গে শরৎবাবু আলোচনা করেন। শুক্রবার প্রাতে শাকোকাঠি কংগ্রেস কমিটি পরিদর্শন করেন। সন্ধ্যায় বাটাজোড়ে শরৎবাবু সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন, বহুদূর হইতেও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। শনিবার—শরৎবাবু, সরলবাবু ও প্রভু চরণ গুহঠাকুরতা গৈলায় উপস্থিত হন। প্রাতে তাঁহারা কংগ্রেস কমিটি পরিদর্শন ও কার্য্য তালিকা নির্ণয়, হিসাব পরীক্ষা ও সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরযু বালার সঙ্গে আলাপ করেন।

সন্ধ্যায় —কালুপাড়া ময়দানে শরৎবাবু সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন—কিন্তু বৃষ্টি হওয়ায় সভার কার্য্য বন্ধ থাকে। রবিবার প্রাতে শরৎবাবু মহিলা সভায় বক্তৃতা করেন। সোমবার প্রাতে শরৎবাবু, সরলবাবু ও প্রভুবাবু স্থানীয় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গের সহিত গৈলা বাজারে ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের বাড়ীতে অর্থ সংগ্রহ করেন। দাশের বাড়ীতে মহিলা বৈঠকেও শরৎবাবু আলোচনা করেন; ফলে অনেকেই অলঙ্কারাদি দান করেন। ৭৫।৵১০ ও অলঙ্কার গৈলা কংগ্রেস কার্য্যের জন্য জিলা কংগ্রেস-কমিটিতে স্থায়ী আমানত থাকিবে এরূপ বন্দোবস্ত

হয়। সন্ধ্যায় সরলবাবু কংগ্রেস কর্ম্মীগণের সহিত কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ বিষয়ে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর সম্পাদিকা ও মহিলাকর্ম্মী লইয়া আর একটি সভায় শরৎবাবু মনসা বাড়ীর সাধারণ সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় আরও টাকা অলঙ্কারাদি সংগৃহীত হয়। মোট ৯৩৲ টাকা এবং কতক অলঙ্কারও পাওয়া যায়। মঙ্গলবার সকালে মনসা বাড়ী মহিলা সভায় শরৎবাবুর বক্তৃতা হয়। তারপর সরলবাবু ও প্রভুবাবু গৈলা ত্যাগ করিয়া পালরদি রওয়ানা হন। সন্ধ্যায়—নদীতীরে প্রকাণ্ড সভা হয়; শ্রোতা ৪০০ শত হইয়াছিল। শরৎবাবু দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বুধবার সকালে সরলবাবু স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ও পালরদীর প্রধান ব্যবসায়ী প্রসন্নকুমার সাহা মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহনলাল সাহা পালরদি বন্দরে ও অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী-গণের গৃহে গৃহে চাঁদা আদায় করেন। শরৎবাবু বিশ্রাম গ্রহণ করেন, সন্ধ্যায় সরলবাবু ও প্রভুবাবু বাটাজোড় রওয়ানা হন। শরৎবাবু মেদাকুল গমন করেন।

৭ই আষাঢ় বুধবার, ১৩২৯

গৈলায় শরৎকুমার

গত ৩রা জুন দেশপূজ্য শ্রীশরৎকুমার ঘোষ গৈলা আসেন। সকালে বেলা প্রায় ৭টার সময় গ্রামের অনেক ভদ্রলোক ও সেচ্ছাসেবকগণ মিছিল করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। প্রায় ৯টার সময় শরৎবাবু ও দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত কংগ্রেস আফিস পরিদর্শন করেন। তৎপর কংগ্রেস সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা করিতে যান। সেখানে নানা বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি ডুহি সেনের বাড়ী শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার সেন গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের গৃহে যান এবং সেই স্থানেই অবস্থান করেন। বেলা ৩টার সময় স্থানীয় কালুপাড়া মাঠে জনসাধারণের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত মধুসূদন স্মৃতিরত্ন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় বহু সংখ্যক লোক উপস্থিত ছিল। শরৎবাবু স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বর্ষার জন্য সভা ভঙ্গ হয়। ৪ঠা জুন সকালবেলা স্থানীয় নিমদাসের বাড়ী একটি মহিলা সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রায় ৫০০ শত মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভায় মাহিলাড়া নিবাসী বাইসাড়ী জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত অনন্ত কুমার সেন গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা উষাবালা সেনগুপ্তা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় শরৎকুমার মাতৃশক্তি, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, মাতৃগণের কর্ত্তব্য,

চরকার উপকারিতা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রায় ১২টার সময় সভা ভঙ্গ হয়। এই সভায় সকলেই চরকার সূতা কাটিতে ও খদ্দর পরিতে প্রতিশ্রুত হন।

বেলা ৪টার সময় উক্ত স্থানেই একটি বিরাট জনসাধারণের সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত গোপাল গুপ্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সভায় শরৎকুমার মুসলমানের বর্ত্তমান অবস্থা, জাতীয় শিক্ষা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে বক্তৃতা করেন। রাত্রি ১০টায় সভা ভঙ্গ হয়। ৫ই জুন প্রাতে শরৎকুমার ও সরলকুমার গ্রামের কতিপয় ভদ্রলোক সমভিব্যহারে অর্থ সংগ্রহে বহির্গত হন, কেবল মাত্র তিনটি বাড়ী ও বাজারে অর্থ সংগ্রহ করিয়াই অলঙ্কার ও নগদে দেড়শত টাকা সংগৃহীত হয়। শরৎ কুমার যে যে গৃহে গমন করিয়াছিলেন, সেইখানেই মহিলাগন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিল। অনেকেই নিজ নিজ অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া তাহার পবিত্র হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, এই সময়ে অল্প বয়স্কা একটি কুলবধু পাগলিনী প্রায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার স্বহস্তে প্রস্তুত এক বাণ্ডিল সূতা ও অঙ্গ হইতে উন্মোচিত ১ জোড়া চুড়ী শরৎ কুমারের পাদোপরি স্থাপন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া উঠিলেন। "বাবা তুমি দেশের মঙ্গলের জন্য আমার এই ক্ষুদ্র দান গ্রহণ কর"। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বিলাপে শরৎকুমার আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তিনিও উচ্চৈঃস্বরে "মা মা" বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, তিনি সেই উন্মত্তপ্রায় বালিকা বধুটীকে অতি কষ্টে সুস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

৫ই জুন বৈকালে ৺বিজয় গুপ্তের মনসা বাড়ী এক বিরাট জনসাধারণের সভার অধিবেশন হয়। শ্রীযুত জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শরৎকুমার অহিংস অসহযোগ, চরকা ও খদ্দর সম্বন্ধে এই সভায় বক্তৃতা করিয়া স্বদেশব্রতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ছিলেন।

৬ই জুন প্রাতে ৺বিজয় গুপ্তের মনসা-বাড়ীতে একটি বিরাট মহিলা সভার অধিবেশন হয়। কবিরাজ অশ্বিনী সেনের স্ত্রী শ্রীযুক্তা বিধুমুখী সেন গুপ্তা সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শরৎকুমার মাতৃ জাতিকে প্রকাশ্য ভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া ভারতের সহস্র সহস্র কারাক্লিষ্ট সন্তানকে মুক্ত করিয়া ভারতে স্বরাজ আনয়ন করিতে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করেন। মহিলাবৃন্দ অশ্রু-সলিলে সিক্ত হইয়া

প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যে, তাঁহারা দেশের কাজে আত্ম নিয়োগ করিবেন ও প্রাণপণে চরকায় সূতা কাটিয়া খদ্দর বস্ত্রের সংস্থান করিবেন এবং খদ্দর ভিন্ন অন্য বস্ত্র অপবিত্র জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। সভায় উপস্থিত মহিলাবৃন্দ নিজ নিজ অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দেশ হিতার্থে প্রদান করিয়াছিলেন। প্রায় ৫ ঘণ্টা অধিবেশনের পর সভা ভঙ্গ হয়। অন্যান্য স্থানে অত্যাবশ্যক কার্য্য উপস্থিত হওয়ায় শরৎকুমার সেই দিনই অপরাহ্নে গৈলা পরিত্যাগ করেন। গৈলার অধিকাংশ স্থানেই তিনি অর্থ সংগ্রহে বহির্গত হইতে পারেন নাই। তথাপি অল্প সময়ের সংগ্রহেই অলঙ্কার ও নগদে ৫০০ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। যে যে স্থানে তিনি অর্থ সংগ্রহে যাইতে পারেন নাই সেখানের জনগণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন এবং পুনবায় তাঁহাকে পাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। তিনি গৈলায় পুনঃ আগমন করিলে বহু নবনারী দেশ হিতার্থে তাঁহার হাতে অর্থ প্রদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। (স্বাক্ষব) শ্রীমতী চারুবালা দাস গুপ্তা—গৈলা কংগ্রেস কার্য্যালয়, প্রচার বিভাগ।

৪র্থ গান্ধী পুণ্যাহ ৩রা শ্রাবণ বুধবার
শরৎকুমারের অদ্ভুত দান। ১৩২৯
১০০০৲ টাকাব অলঙ্কার দান!
ধন্য উষাঙ্গিণী।
পবিত্র বলি।

গতকল্য মঙ্গলবার ৪র্থ গান্ধী পুণ্যাহের দিনে বরিশাল যে দান সংগ্রহ করিয়াছেন, অধুনাতন ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়—এমন আপনভোলা সর্ব্বস্ব দান স্মরণীয় কালে কেহ দেয় নাই। ঐ দিন প্রাতে শ্রীশরৎ কুমার ঘোষ কয়েকজন মহিলা ও ভদ্রলোককে তাঁহার বাসায় আহ্বান করেন। তাঁহার গুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের চিত্র-সমক্ষে পরিবারস্থ ও অপর সকলকে বসিতে আসন প্রদান করেন। তৎপর তদীয় জ্যেষ্ঠাগ্রজ বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয় একটি ও শরৎবাবু স্বয়ং একটি প্রার্থনা করেন। এবং গান করিতে লাগিলেন—সে প্রাণস্পর্শী প্রার্থনা ও গানে সকলের নেত্র অশ্রু ভরাক্রান্ত হয়—সে প্রার্থনার সার কথা

'বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি
এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি
অন্তর মম গোপনে যাক্ ভরে
প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে তোমার দানে।'

অতঃপর ভক্তিযুক্ত প্রণাম সহকারে জিলা কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি শ্রীযুত তারিণী কুমার গুপ্ত মহাশয়ের হস্তে তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা উষাঙ্গিণী দেবীর সমস্ত অলঙ্কার ও তাঁহার ভ্রাতৃবধুর এক জোড়া অনন্ত প্রদান করেন। তাহার মূল্য আনুমানিক ১০০০৲ টাকা। অতঃপর প্রসাদ বিতরণের পর সভা ভঙ্গ হয়।

অপরাহ্নে চিন্তাহরণ চট্টোপাধ্যায় ও নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে গ্রেপ্তার হন। সায়াহ্নে কংগ্রেস প্রাঙ্গণে এক সভা হয়। তারিণী বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সর্ব্ব প্রথমে দুর্গামোহন বাবু বলেন যে, দেশীয় কোন কোন পত্রিকা বলেন আন্দোলন মরিয়া গিয়াছে, গান্ধী পুণ্যাহে কেহ আর দান করে না। তাহাদের ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য জানাইতেছি। বুদ্ধিমান সাংসারিক আমরা তর্কশাস্ত্রের সাহায্যে ভগবানের অস্তিত্বও অস্বীকার করিতে পারি, কিন্তু সমস্ত তর্কের অতীত যে প্রাণশক্তি আছে তাহাকে বাহিরের লোকে পাগল বলে—তেমন পাগলেরাই চিরকাল পৃথিবীতে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন,—বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, অরবিন্দ, গান্ধী প্রভৃতি সেই শ্রেণীর আর তাঁহাদের অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগণই জগতের সার বস্তু। আজ বরিশালের পাগল শরৎকুমার ও তাঁহার পাগলিনী পত্নী উষাঙ্গিণী তাঁহাদের সঞ্চিত সকল অলঙ্কার স্বরাজের পদে অর্ঘ্যদান করিলেন—বুদ্ধ দেবের ভক্ত শিষ্যকে জীর্ণ চির দানের ন্যায় এই দান অতুলনীয়। কোটিপতি লক্ষ দান করিতে পারেন, কিন্তু সে দানের সহিত এ দান তুলনা হয়না। অদ্যকার এই দান প্রধান। দ্বিতীয় দান চিন্তাহরণের আত্মদান। সহস্র সহস্র স্বদেশ সেবকের সমক্ষে অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি, চিন্তাহরণের ন্যায় পবিত্র পূত অর্ঘ্য দুর্লভ, আজ তাহাও আমরা দান পাইয়াছি। তৎপর ভূপতি কান্ত বক্সী মহাশয় তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় শরৎকুমারের সরলতা, আন্তরিকতা ও সাত্ত্বিকতার বর্ণনা করেন। তৎপর সভাপতি বলিলেন এই অলঙ্কার সমূহের দাম ১০০০৲ টাকা, কিন্তু এক হিসাবে ইহা অমূল্য—তাঁহার টাকা থাকিলে দ্বাদশ সহস্র মূল্যেও উহা গ্রহণ করিতেন—কারণ যে

অঙ্গ হইতে এই অলঙ্কার আজ অর্ঘ্য স্বরূপ অর্পিত হইল, যে অঙ্গে এ অলঙ্কার শোভা করিতেছিল, তাহাতে সাবিত্রীর তেজ আছে, অন্যথা এমন দান করা সম্ভব হয় না। আজ যাহারা উহা ক্রয় করিয়া পরিধান করিবেন তাহাদের দেহে ঐ তেজ সংক্রমিত হইবে। অতঃপর গান্ধী পূণ্যাহের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়; এবং গভীর বন্দেমাতরম্ ও আল্লাহো আকবর ধ্বনির মধ্যে সভা ভঙ্গ হয়।

বরিশালের দধিচী

আজ 'গান্ধীপুণ্যাহ', বহুদিনের পরে আজ এই পবিত্র দিনে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ-রত্নের স্মৃতি পূজার দিনে বরিশাল আবার সেই পৌরাণিক মহাঋষির আত্মত্যাগ-কাহিনী জীবন্ত বাস্তব সত্যে পরিণত দেখিল। ঋষি দধিচী দেব-মঙ্গলে নিজের বক্ষ পঞ্জর উৎপাটিত করিয়া দিয়াছিলেন, বরিশালের ঋষি শরৎকুমার আজ দেশমঙ্গলব্রতে সহধর্ম্মিনীকে নিরাভরণা করিয়া তাঁহাদের উভয়ের শেষ সম্বল ৪০ ভরি পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার স্বরাজ ভাণ্ডারে দান করিলেন। মনে হয় শরৎ কুমারের এই আত্মত্যাগ যেন অনেক আত্মত্যাগের চেয়ে বড়, উদার এবং মহৎ; দেশাত্মবোধযুক্ত মুক্ত বন্ধন মহা-ঋষির আত্মত্যাগের আলোক,—বোধ হয় সংসারী শরৎকুমার এই ত্যাগের প্রভায় মলিন ও নিস্প্রভ হয়ে যায়।

শরৎকুমারের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সংসারী, পুত্র কলত্রাদি সম্বলিত একটি নাতিক্ষুদ্র পরিবারের একমাত্র আশ্রয় স্থল। সংসার জীবনে কখনও সচ্ছলতার সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় নাই। বর্ত্তমান আন্দোলনের প্রারম্ভে যখন সমগ্র বাংলাদেশ সুষুপ্তির ক্রোড়ে অচেতন, শরৎকুমারের অন্তরাত্মা তখন এই ধর্ম্মের আন্দোলনে সাড়া দিয়ে উঠল। শরৎকুমার কোনও দিনই রাজনীতি ক্ষেত্রের লোক ছিলেন না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ শরৎবাবু ধর্ম্মের ডাকে নীরবে থাকিতে পারেন না। তাঁহার চির ত্যাগ-উন্মুখ প্রাণ প্রথম দিনেই তাঁহার আজীবনের সঞ্চিত ৭০০৲ শত টাকার জীবন বীমা স্বরাজ ভাণ্ডারে দান করিয়া আত্ম তৃপ্ত হইল।

শরৎকুমারের এই ত্যাগ বরিশালের সুপ্তপ্রাণে নব ভাবের জাগরণ আনিয়া দিল। দলে দলে লোক দেশমাতৃকার আহবানে আত্মত্যাগের মহাব্রতে দীক্ষিত হইতে লাগিল এবং নিরাশ্রয় নিঃসম্বল শরৎকুমার তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ

করিয়া চির-দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইলেন, তদবধি শরৎকুমারের কল্যকার সম্বল ছিল না। কিন্তু দারিদ্র্য দুঃখে অচল অটল শরৎকুমার স্থির ধীর ও অবিচলিত চিত্তে সমস্ত বাধা বিঘ্ন পদদলিত করিয়া কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং সমস্ত বাংলার উদাসীনতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সর্ব্বপ্রথমে কারাবরণ করিয়া লইয়া নিজেকে ও দেশকে ধন্য করিলেন। কারাবরণের সময় তিনি কপর্দক বিহীন নিরাশ্রয় পরিবারকে একমাত্র ভগবানের চরণে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন। এবং তাঁহার সমস্ত ভাবনা সমস্ত চিন্তা তাঁহারি চরণে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

শরৎকুমারকে এই দুঃখ কষ্টের মধ্যে একদিনও বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে সহস্র অনুরোধ ও চেষ্টা সত্ত্বেও স্বরাজ ভাণ্ডার হইতে এক কপর্দক গ্রহণে সম্মত করান যায় নাই, তাঁর আত্মসম্মান-দৃপ্ত ও তেজ-গর্ব্বিত প্রাণ ততটুকু হীনতার জ্বালা কোন দিনই সহ্য করিতে সম্মত হয় নাই।

শরৎকুমার অযোগ্য নহেন, নিজেকে নিয়া শুধু বিব্রত থাকিতে চাহিলে তিনি দশ জনের একজন হইতে পারিতেন, কিন্তু ভগবান তাহা দিলেন না। বাঁশীরস্বরে তাঁহাকে পাগল করিয়া গৃহের বাহির করিলেন। শরৎকুমারের যোগ্যতমা পত্নীও সর্ব্বাবস্থায় স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। তিনি ধনীর কন্যা, চির সুখে লালিতা-পালিতা; তথাপি অম্লান চিত্তে মধুর হাসি মুখে শরৎকুমারের সর্ব্ব দুঃখের অংশভাগিনী হইয়া জীবন কাটাইয়া আসিতেছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে পিতৃকুলের সাহায্য লইয়া অভাব ও দৈন্য মোচন করিতে পারিতেন, এবং তাহারাও সাগ্রহে শরৎকুমারের মতন জ্ঞানী গুণী সুকুলীন প্রিয়দর্শন জামাতাকে সাহায্য করিতে কোন দ্বিধা করিতেন না—কিন্তু শরৎকুমারের আত্মসম্মান-প্রবুদ্ধা সহধর্ম্মিনী কোন দিনই স্বামীর অবমানের কারণ হইয়া ভিক্ষার দান গ্রহণে স্বামীর উন্নত মস্তক অবনত করিবার নিমিত্ত-ভাগিনী হন নাই। ধন্য পতিব্রতাময়ী! এমন সহধর্ম্মিনী না হইলে আজ বোধ হয় শরৎকুমার এ শরৎকুমার হইতে পারিতেন না। শরৎকুমার বহুদিন হইতে জ্বালা-দগ্ধ হইতে ছিলেন, "নিজের এক কপর্দক সম্বল থাকা পর্য্যন্ত অপরকে ত্যাগ করিতে বলার অধিকার মানবের নাই।" সতীর হৃদয়ে স্বামীর সেই মরমের বাণী পৌঁছিয়াছে; তাই, সতী আজ হাসিমুখে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাভরণা করিয়া একমাত্র এয়োতির চিহ্ন শঙ্খ সম্বল হইয়া সর্ব্বস্ব দেশ-মাতৃকার কাজে উৎসর্গ করিলেন। ধন্য সতী শিরোমণি

আমাদের মা! ধন্য আত্মত্যাগ! বন্ধু-বান্ধবদের শত চেষ্টা ও নিষেধ সত্ত্বেও শরৎকুমার এ কার্য্য হইতে বিরত হন নাই। অনেকে হয়তো শরৎ কুমারের আত্মত্যাগকে পাগলের কার্য্য মনে করিবেন। এই যদি পাগলের আদর্শ হয়, তাহলে ভগবান করুন ভারতের প্রতি পরিবারের বুকে পাগলের এই আদর্শ চির বিরাজমান থাকে। শরৎকুমারের এই দান ব্রাহ্মণের দানের মত তত বড়, তত মহৎ, এ যে শরৎকুমারের সর্ব্বস্ব দান। রাজার দান যত বড় হউক, সে তাহার সম্পদের সহস্রাংশের একাংশ দান। এ যে শরৎকুমারের প্রাণের দান, শ্রদ্ধার দান; এ দানক্ষেত্রের পূতরেণু স্পর্শে যে দেহ সুবর্ণ হয়, যজ্ঞেশ্বর হরির পরাভব হয়। তাই আজ যে-ভূমি এই যজ্ঞস্থল বক্ষে ধারণ করিয়াছে সেই পুণ্যভূমি বরিশাল ধন্য। যাহারা এই মহাযজ্ঞ দেখিয়াছেন তাঁহারাও ধন্য। যে বাংলার সন্তান এমন আজ শিখিয়াছে সে বাংলা ধন্য। এর পরও কি দুর্ভাগা দেশবাসীকে কিছু বলিতে হইবে? বরিশালবাসী দেখ, শেখ, আর তোমার কিছু শিখিবার বাকি থাকিবে না। দেখিয়া শিখিয়া ধন্য হও। জীবন সার্থক কর।

—শ্রীভূপতিকান্ত বক্সী

ক্রমশঃ

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীদোলপূর্ণিমা: বিগত ২১শে ফাল্গুন ১৩৬৪ (৫ই মার্চ, ১৯৫৮) পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা ও বাঙ্গালীর আশা-ভরসা, বাংলার বিপ্লবের আদিগুরু শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মতিথিকে স্মরণ করিবার উদ্দেশ্যে নরনারায়ণ আশ্রমে বিকাল ৪৷৷-টায় এক আলোচনা সভা হয়। অনেকেই উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমৎ স্বামীজী তাঁহার চোখের জলে আর উদাত্ত ভাষণে দুই ঘণ্টা কাল শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব ও শ্রীগৌর-তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করেন। অতঃপর সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বাঘজোলা ১১ নং ক্যাম্পের উদ্বাস্তুগণ তাঁহাদের নব প্রতিষ্ঠিত হরিসভার উদ্বোধন করার জন্য শ্রীমৎ স্বামীজীকে আহ্বান জানাইয়া রাখায় আশ্রমের সভার শেষে ক্যাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট শ্রীযুত শচীন্দ্র চক্রবর্তী শ্রীমৎ স্বামীজীকে লইয়া যান। উদ্বাস্তুদের মধ্যেও

তিনি দোললীলার তাৎপর্য ও মহাপ্রভুর জীবনতত্ত্ব বর্ণনা করেন। সেখানে সভার শেষে নাম কীর্ত্তন করিবার জন্য কাহাকেও পাওয়া না যাওয়ায় তিনিই প্রাণ ভরিয়া কিছুক্ষণ নাম কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সকলের মধ্যে বাতাসা বিলাইয়া দেন। দুই স্থানেই স্বামীজী যাহা বলিয়াছেন, সংক্ষেপে তাহা এইরূপ।

দোললীলা যাহা, তাহাই গৌর-তত্ত্ব। প্রকৃতি ও পুরুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয়ই এই দুই ঘটনায় রহিয়াছে। দোললীলায় রাধাশ্যামকে, প্রকৃতি পুরুষকে একত্র দেখিয়াছি, গৌর-জীবনে সেই মিলন-কৌশলই ব্যাখ্যাত।

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি—
লোভাত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ চৈঃ চঃ-পৃঃ-৪৮

শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ—অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে প্রকৃতির স্থান কি, মূল্য কি, পারস্পরিক সম্পর্ক কি তাহাই স্থির করিতে শ্রীকৃষ্ণ যে-লীলা প্রস্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, দীর্ঘকালের ব্যবধানে শ্রীগৌর তাহার ব্যাখ্যা রাখিয়া গিয়াছেন। যে মায়াবাদ বলে প্রকৃতি মিথ্যা, মায়া, তাহার কোন পারমার্থিক মূল্য নাই—ব্রজলীলা সেই মায়াবাদের প্রতিবাদ। একাধারে রাধাশ্যাম ব্যাপারটা খুব জটিল। জটিল তত্ত্ব প্রথমে বিদ্বজ্জনের নিকটই ধরা পড়ে—পরে তাহা জনসাধারণে ছড়াইয়া পড়ে। মার্ক্সবাদ কিংবা আইনষ্টিনের আপেক্ষিকতাবাদ সবই প্রথমে বিদ্বজ্জনের নিকটই ধরা পড়িয়াছিল।

মায়াবাদের ব্রহ্ম নির্ম্মল, তাহাকে মলিন করিয়াছে মায়া-প্রকৃতি; অথচ গৌরজীবনে শ্রীকৃষ্ণ-মুখাৎ যে প্রকৃতি-তত্ত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে তাহা বলিতেছে—

কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণ তত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত॥
না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল॥
রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট॥

—এখানে প্রকৃতি তো মায়া নয়, ইনি যোগমায়া। প্রকৃতিকে এই অর্থে বুঝিবার আহ্বান জানাইয়া গিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, আর সেই অর্থেরই মূর্ত্ত বিগ্রহ

শ্রীগৌর। প্রকৃতি পুরুষের, আদর্শ বাস্তবের মিলনভূমি শ্রীগৌর জনসমাজের মধ্যে তাঁহার কৃষ্ণকে পৌঁছাইয়া দিয়া মানুষের জীবনকে ভূমানন্দ দান করিতেছেন।

রাধার ঋণ শোধ করিতে কৃষ্ণ গৌর হইলেন—এই কথাটী যেমন ব্যাপক, তেমনি গভীর। রাধা মানে প্রকৃতি, প্রকৃতি মানে প্রজা, নারী এবং সেই সব কিছু যাহা কিছুর এতদিন কোন নিজস্ব মর্য্যাদা ছিল না, অন্যের মাপে যাহার মাপ ছিল, মান ছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণের এই ঘটনাই বলিয়া দিতেছে যে, প্রজার ঋণ আজ রাজাকে শোধ করিতে হইবে, নারীর ঋণ আজ পুরুষকে শোধ করিতে হইবে, যাহারা দলিত নিপীড়িত শোষিত, অথচ সমাজের যাহারা ভিত্তি, তাহাদের ঋণ আজ উচ্চবর্ণকে শোধ করিতে হইবে, শোষককে শোধ করিতে হইবে; শ্রমিকের ঋণ আজ ধনিককে শোধ করিতে হইবে। তাই ত রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মহাপ্রভুর দেখা হয় না, রাজা প্রতাপরুদ্র যখন ঝাড়ুদার প্রতাপরুদ্র—তখনই পথের মধ্যে দেখা মিলে। হৃদয়-পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই অবতীর্ণ ভগবানকে ধারণ করা যায়। 'রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আশে'—শ্রীকৃষ্ণ এই যে নব-জীবনের সূত্র রাখিয়া গিয়াছেন, আজ আমাদের সকলকেই সেই সূত্র মানিয়া চলিতে হইবে। যাহা কিছু আমার ভোগ্য রূপে আসিল—রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ—সেই সব ভোগ্য বস্তুকে ভজনা করিয়া তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃতি বন্ধন আনিয়া দেয়—ইহাই সাধারণতঃ সত্য কথা—কিন্তু প্রকৃতি বন্ধন না আনিয়াও যে পারে—সেই কঠিনতম তত্ত্বটী শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌর দিলেন। প্রকৃতি যে পথে বন্ধন হয় না, তাহা ভক্তির পথ। যে চাপ দেয়, শোষণ করে, নিজের ইচ্ছামত আর একজনকে পরিচালিত করে তাহা শক্তি। ভক্তিও শক্তি, কিন্তু সে-শক্তি চাপ দেয় না, শোষণ করে না, নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা অপরের উপর চাপাইয়া দেয় না—অপরকে স্বাতন্ত্র্য দেয়—পারস্পরিকতার স্বতন্ত্র সম্বন্ধে পরস্পর পুষ্ট হয়—আগাইয়া চলে। আনন্দ অব্যাহত থাকে। মুক্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মুক্ত বিষয়ের সংযোগ—এই-ই গৌরতত্ত্ব—এই-ই দোললীলা। বর্ত্তমান মানুষের জীবনের এইটিই সাধ্য—মুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা মুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ হয় কি করিয়া? রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপ শ্রীগৌর এই যে কৃষ্ণতত্ত্ব সাড়ে চারিশত বৎসর আগে আনিয়াছিলেন, তাহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীনিত্যগোপাল লিখিলেন, 'নিত্যানিত্য সমন্বয় বা 'আত্মানাত্ম সমন্বয়। জ্ঞানাজ্ঞান সমন্বয়। সাকার

নিরাকার সমন্বয়। আকার-নিরাকার সমন্বয়। সাকার-আকার-নিরাকার সমন্বয়। জড়াজড় সমন্বয়। চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বয়। দ্বৈতাদ্বৈত সমন্বয়। সর্ব্ব সমন্বয়।'

শ্রীগৌর বাঙ্গলার বুকে এত বড একটি জীবন-তত্ত্বই যে শুধু রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে—বাঙ্গলার আগাগোড়া বদলাইয়া দিয়া তিনি এক নবীন বাঙ্গলা সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—বাঙ্গলার সাহিত্য, গান, নাটক, বাংলার চোখের জল, খোল করতাল কীর্ত্তন, মহোৎসব, বাঙ্গলার ধূলায় গড়াগড়ি, বাঙ্গলার কোলাকুলি—এই সবই তাঁহার অনন্য দান। আজ যে বাঙ্গালী ধাতু-দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ গৌরতত্ত্বের সবখানি কথা মানুষের কাছে পৌঁছান হয় নাই। আজ সেই কাজটী করিতে হইবে।

বৃহত্তর বাংলা ঃ ভগবান বুদ্ধ একদিন বৃহত্তর ভারত রচনা করিবার নিমিত্ত হইয়াছিলেন, এই সেদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু বৃহত্তর বাংলা রচনা করিয়া বাংলার গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকাশীধামে বাঙ্গালীর স্থান ও প্রসার কাহারও অবিদিত নাই। ইহার পর রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি মনীষীগণ বৃহত্তর বাংলা রচনার যে ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছিলেন, যে ব্যাপকতর চিন্তাধারা, সাহিত্য প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সেদিন পর্য্যন্ত দেশগত বৃহত্তর বাংলা রচনা না করিয়া তুলিলেও তাহার মালমসল্লা হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল কবে বাংলার কোন্ সুসন্তানের হাতে তাহা রূপ ধরিয়া উঠিবে, বাংলার প্রেমধর্মের কৃষ্টিদ্বারা বৃহত্তর বাংলা রচিত হইয়া উঠিবে। বৃহত্তর বাংলা রচনা করিবার বিধাতার আহ্বান বাংলার নিকট অনেকবার আসিয়াছে, কিন্তু আজও কোনো সুসন্তান এই প্রেমের ব্রত লইয়া পরিব্রাজক হইয়া বাহির হইয়া পড়িবার প্রেরণা পাইল না।

ঘটনাচক্রে পাকিস্থান হওয়ায় পূর্ব্ব বাংলার উদ্বাস্তুগণ আজ যে-জীবন-সন্ধিক্ষণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, সেখানে দাঁড়াইয়া এই বৃহত্তর বাংলা রচনার গুরু দায়িত্ব ও আহ্বান কেমন করিয়া তাঁহাদেরই উপর পড়িয়াছে দেখা যায়। কিন্তু সে আহ্বানে তাঁহারা সাড়া দিতে তো পারিতেছেন না। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার উদ্দেশ্যে গত কয়দিন কলিকাতাতে যে আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে শ্লোগান দেওয়া হইতেছে, 'জীবন দিব, তবু বাংলা ছাড়িব না'।—এ শ্লোগান যে মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়, তাহা কোন রকমভাবে কোন সৌন্দর্য্যই প্রকাশ করে না—ইহা বাংলার

প্রতি প্রেমের পরিচায়ক নয়, ইহা জীবনকে সবলে গ্রহণ করিবার চিত্তবৃত্তিও নহে। ইহা একেবারেই ঋণাত্মক মনোবৃত্তি।

উদ্বাস্তুগণ তাঁহাদের চিরদিনের বাসস্থানের জন্য সুযোগ সুবিধাপূর্ণ স্থান চাহিতে পারেন, যাহাতে নূতন স্থানে যাইয়া তাঁহারা জীবন-যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন—এমন অবস্থা যাহাতে সেখানে থাকে, এ দাবীও তাঁহারা করিতে পারেন—যদিও এ কথা সত্য যে পূর্ব্ববঙ্গের তাঁহাদের আদি বাসভূমিতেও বোধহয় আজ তাঁহারা যত সুযোগ সুবিধা চাহিতেছেন, তত সুযোগ সুবিধা ছিল না। তবু এ কথা যুক্তিসহ যে, নূতন স্থানে একটু বেশী সুযোগ সুবিধা না হইলে দাঁড়ান মুস্কিল। তাই তাঁহাদের পুনর্ব্বাসনের স্থান যেন সাধারণ সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত না হয়, ইহা অবশ্যই দেখিতে হইবে। কিন্তু 'জীবন দিব, তবু বাংলা ছাড়িব না'—এ কোন্ মনোবৃত্তির পরিচয়? বাঙ্গালী কি কখনও বাঙ্গালা ছাড়ে নাই? তাহা হইলে কাশীর বাংগাল পাড়া গঠিত হইয়া উঠিল কি করিয়া? বৃন্দাবনের অগণিত মন্দিরগুলি বাঙ্গালীর অর্থেই তো পরিপুষ্ট—কোনো বাঙ্গালীই সেখানে পয়সা না দিয়া মন্দিরে ঢুকিতে পারে না। বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি বাঙ্গালীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত। মন্দির-প্রবেশে বাঙ্গালীকে যে আবশ্যিকভাবে ভেট দিতে হয়, অন্যদের দিতে হয় না, তাহার অর্থ এই যে বাঙ্গালীর অর্থে উহা প্রতিষ্ঠিত, বাঙ্গালীর অর্থেই উহা জীবিত থাকিবে—অন্যরা ইচ্ছা হয় দিবেন, না হয় না দিবেন। ইহা বাঙ্গালীরই গৌরব —যদি ইহাতে তাহার অহংকার বৃদ্ধি না হয়। অর্থাৎ বাঙ্গালীর অর্থেই বাঙ্গালীর গৌরের আবিষ্কৃত বাঙ্গালার উপনিবেশ শ্রীবৃন্দাবন চলে। বাঙ্গলার বাহিরে যাইতে বাঙ্গালীর এত ভয় তো কোনদিন ছিল না। বাঙ্গালী তো চিরদিনই বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়া নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কোন্ প্রদেশে বাঙ্গালী না আছে? বাঙ্গালীর নিজের যে দোষের জন্য, প্রীতির পরিবর্ত্তে প্রভুত্ব করার যে মনোবৃত্তির জন্য সে স্থান-বিশেষে লাঞ্ছিত হইয়াছে, সে মনোবৃত্তি বদলাইয়া লইয়া বিপ্লবী বাঙ্গালী বাঙ্গলার বাহিরে যাইয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না? বাঙ্গালী এত ভীরু হইয়া গিয়াছে? এত ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে? বাঙ্গালীর সেই বিপ্লব কোথায় যে জন্য মহাত্মা গোখেলকে একদিন বলিতে হইয়াছিল 'What Bengal thinks to-day, India thinks to-morrow'? বিপ্লব থাকিলে এত ভয় পায়? বৃন্দাবনে যে একদিন উপনিবেশ রচনা করিতে পারিয়াছে, আজ দণ্ডকারণ্যে সে নূতন

বাংলা সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে না? দেশের দিক দিয়া তাহার যে ক্ষতি পূর্ব্ব বাঙ্গলাকে হারাইয়া হইয়াছে, নূতন নূতন উপনিবেশ রচনাদ্বারা তাহার দেহের সে ক্ষতি সে ভরাট করিয়া লইতে পারে না? সহস্র সহস্র পরিবার যদি বিশেষ বিশেষ স্থানে যাইয়া নিজেদের শক্তি সামর্থ্য নিয়োজিত করে, নিশ্চয়ই সে স্থান গড়িয়া উঠিবে। পূর্ব্ববঙ্গের লোকের বিশেষ করিয়াই এ যোগ্যতা ছিল, আজও আছে, বিশ্বাস করি। নাই বলিয়া যাহা দেখা যাইতেছে, সে শুধু ভ্রান্ত নেতৃত্বের ফল এবং আমাদের নিজেদের কিছুই করিবার নাই—সবই সরকারের দায়িত্ব—এই মনোভাবের ফল। সরকারের দায়িত্ব যতটা আছে, অবশ্যই সরকারকে তাহা পালন করিতে হইবে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের করিবার কিছু আছে কি না তাহা আবার ভাবিয়া দেখা দরকার। উদ্বাস্তুগণ যে সকল সুযোগ সুবিধা অপরিহার্য, তাহা সঙ্গতভাবেই দাবী করুন, কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে, বাঙ্গলার মুখে কলঙ্ক দিয়া 'জীবন দিব, তবু বাঙ্গলা ছাড়িব না'—এ ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির পরিচয় যেন না দেন।

বাঙ্গালী যদি বাঙ্গালা না-ই ছাড়িবে, তাহা হইলে নিজেকে বাড়াইবার জন্য এটা ওটা অনুষ্ঠান সে করে কেন? প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন সারা ভারত ব্যাপী অনুষ্ঠান করিয়া বাঙ্গালী যে নিজেকে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিতে চাহিতেছে, সে মনোবৃত্তির সঙ্গে 'বাঙ্গলা ছাড়িব না' মনোবৃত্তির কি মিল আছে? বাঙ্গালার দেশগত সীমার মধ্যেই যদি বাঙ্গালীকে থাকিতে হয়, তবে নিজেকে প্রসারিত করিবার জন্য প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন করারও অর্থ হয় না, দিল্লীতে কালী-বাড়ী প্রতিষ্ঠিত করারও অর্থ হয় না। যে-বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলন একদিন সারা ভারতবর্ষকে অনুপ্রেরণা জোগাইয়াছিল, সে-বাঙ্গালীর সে-আত্ম-জ্যোতি আজ কোথায় গেল? বাঙ্গালী আজ বীর্য্যহীন, কলহপরায়ণ, পরদোষদর্শী। অথচ এ অবস্থা তাহাকে পার হইতেই হইবে, নিজের অন্তরের জ্যোতিদ্বারা সমস্ত কুহককে নিরস্ত করিয়া আত্মপ্রসারের পথে বাঙ্গালীকে আগাইয়া যাইতেই হইবে। দেশ বিভক্ত হওয়ায় তথাকথিত নিম্নবর্ণের সমক্ষে দুঃখদৈন্যের মধ্য দিয়াই মানুষ হিসাবে পরিচয় লাভ করিবার যে সুযোগ ঘটিয়াছে, পূর্ব্ব বাঙ্গলার কোণে পরিয়া থাকিলে সামাজিক বিভেদ-প্রথার যে অত্যাচারের অবসান ঘটান ছিল নিতান্ত অনিশ্চিত, তেমনই আর এক সুযোগ, আর এক আহ্বান আসিয়াছে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে নিজেকে দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবার, আত্ম প্রসারণ করিবার। এ আহ্বানে বাঙ্গালী

সাড়া দিক; দণ্ডকারণ্যে, আন্দামানে, ভারতের প্রতি রাজ্যে এমনকি আরও কোথাও দলে দলে ছড়াইয়া পড়িয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতি, বাঙ্গলার সাহিত্য, বাঙ্গলার সমন্বয়-ধর্ম্মকে সর্ব্বত্র পৌছাইয়া দিক—ইহাই বাংলার ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আজিকার বাঙ্গলার জনসাধারণ ও নেতৃবৃন্দের নিকট দাবী করিতেছে। দণ্ডকারণ্যে সঙ্গত সুযোগ সুবিধা আছে কি না তাহা বাঙ্গালী দেখিয়া লউক, কিন্তু 'পশ্চিমবঙ্গ ছাড়িব না' এ লজ্জাকর আত্মশ্লাঘাকর আত্মলোপকারী উক্তি যেন বাঙ্গালী হইয়া সে না করে। বাংলার পূর্ব ইতিহাস বাদ দিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হইতেও যদি আরম্ভ করি তাহা হইলেও বলিতে হয় গৌরের বাঙ্গলার, রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ - রবীন্দ্রনাথ - শরৎচন্দ্র - জগদীশচন্দ্র-শ্রীনিত্যগোপালের বাঙ্গলার এ কথা বলা শোভা পায় না যে আমার ক্ষুদ্র দেশগত সীমার বাহিরে আমি যাইব না। জ্ঞান বিজ্ঞান চিন্তাধারা ছড়াইয়া পড়িবার জন্যই—কিছুতেই তাহাকে একটী খণ্ড স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না। শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এত চিন্তা-নায়কেরা যে জ্ঞান-বিজ্ঞান সহ জীবনযাত্রার যে নূতন কথা লইয়া বাঙ্গলার ঘরে জন্মিয়াছেন, সে চিন্তাধারা সে নূতন কথা লইয়া তো বাঙ্গালীকে ঘরের বাহির করিবার ব্যবস্থাই তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর আত্ম-প্রসারণের প্রেরণা তো তাঁহারাই রাখিয়া গিয়াছেন। নিজের ঘরের এই সম্পদ লইয়া, এই সভ্যতা লইয়া বাঙ্গালী দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়ুক—ইহাই বাঙ্গালীর স্বরূপগত সাধনা। আমরা ভরসা রাখি সে সাধনায় সে জয়ী হইবে।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩/১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

Statement in Form IV of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

1.	Place of Publication	...	Naranarayan Ashram P. O. Deshbandhunagar, 24 Parganas.
2.	Periodicity of its publication	...	Monthly.
3.	Printers Name	...	Renu Mitra.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram P. O. Deshbandhunagar, 24 Parganas, W. B.
4.	Publishers Name	...	Renu Mitra
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram P. O. Deshbandhunagar, 24 Parganas.
5.	Editor's Name	...	Swami Purushottamananda Abadhut.
	Nationality	...	Indian.
	Address	...	Naranarayan Ashram P. O. Deshbandhunagar, 24 Parganas.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one percent of the total capital.		(1) Swami Purushottamananda Abadhut. Naranarayan Ashram, P. O. Deshbandhunagar, 24 Parganas, W. B. (2) Renu Mitra Naranarayan Ashram, P. O. Deshbandhunagar, 24 Parganas, W. B.

I, Renu Mitra, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 24-2-58.

(Sd.) Renu Mitra,
Signature of Publisher.

উজ্জ্বলভারত

বৈশাখ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ   ১১শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

পুরুষোত্তমানন্দ

পুরুষোত্তমানন্দ আর তাঁহার পুরুষোত্তমানন্দ নাম-ধেয় দেহেতে নাই! যে উদ্দেশ্য, যে কাজ, ধরার ধূলিকে ব্রহ্মধূলি ও ধরার মানুষকে ব্রহ্ম-মানুষ রূপে আস্বাদন করিবার ও করাইবার যে ব্রত লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন, কর্মযোগী পুরুষোত্তমানন্দ, বীর সৈনিক পুরুষোত্তমানন্দ সেই কর্মে রত থাকা কালীন আত্মাহুতি দান করিয়াছেন। গত ১লা এপ্রিল, ১৯৫৮, ১৮ই চৈত্র ১৩৬৪ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবন-দেবতার সহিত যুক্ত হইয়াছেন।

বিগত ১৪ই চৈত্র, ১৩৬৪ (২৮শে মার্চ, ১৯৫৮) পুরুষোত্তমানন্দের জীবন-দেবতা জড়াজড় সমন্বয়-বাদের মূর্ত্ত বিগ্রহ শ্রীনিত্যগোপাল দেবের শুভ ১০৪-তম জন্মতিথিতে শ্রীনিত্যগোপালদেবের জীবন-কথা তথা বর্তমান যুগের মানুষের অগণিত সমস্যা ও তাহার সমাধানের বিষয় আলোচনার জন্য পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার গ্রামের নরনারায়ণ আশ্রম হইতে শুক্রবার সকালে মহানির্ব্বাণ মঠে আসেন। দুপুরে কেওড়াতলা শ্মশানের সন্নিকটে ৮এ, রাসবিহারী এভিনিউতে তাঁহার পুত্রদের বাড়ীতে স্নানাহার ও বিশ্রাম করিয়া বিকেল ৪টাতে মঠে উপস্থিত হন। শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীনিত্যগোপালদেবের জীবন ও দর্শন আলোচনা করেন। রাতে আবার ছেলেদের ওখানে যান। শনিবার এবং রবিবারও একবার সকালে মহানির্বাণ মঠে আসেন আবার বিকাল ৪টায় মহানির্বাণ মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। শনিবারের সভায় তিনি শুধু উদ্বোধক ছিলেন, তাই সেদিন তাঁহার বক্তৃতা খুব বড় হয় নাই। রবিবারে তিনি সভাপতি ছিলেন। সভা আরম্ভে অল্প কিছু বলিয়া সকল বক্তার পরে সময়ের দিক দিয়া অনেকক্ষণ না হইলেও এমন উদাত্ত কণ্ঠে এমন আকুল প্রাণে তিনি কিছু বলিলেন যে তাহা কেমন যেন মনে হইল অভূতপূর্ব। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার গুরু-ভ্রাতাদের নামোল্লেখ করিয়া সকলে মিলিয়া

শ্রীনিত্যগোপাল-তত্ত্ব ও জীবন প্রচারের জন্য আহ্বান জানান। এমন কি কথা প্রসঙ্গে ইহাও বলেন যে ঐ-ই হয়তো তাঁহার শেষ বক্তৃতা, কেননা তাঁহার শরীর ভাল নাই, আর যে সামনের বৎসর আসিয়া তিনি শ্রীনিত্য-গোপাল-কথা বলিতে পারিবেন, এমন ভরসা তাঁহার দেহের নাই।

যাহাহউক, প্রতিদিনের মত সভার শেষেও একদল শ্রোতা যখন মহানির্বাণ মঠের অফিস ঘরেব বারান্দায় তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া তাঁহার কথা শুনিতে-ছিলেন, তখন তাহাদের নিকট শ্রীনিত্যগোপাল-কথা কহিতে কহিতেই মুখের কথা মুখে থাকিয়া যায়, তিনি ঢলিয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যান। চোখেমুখে জল দেওয়ার পর তাঁহার জ্ঞান আসে বটে, কিন্তু তিনি আর উঠিয়া বসিতে পারেন না, শুইয়াই পড়েন। পুরুষোত্তমানন্দ আরও তিনবার অজ্ঞান হইয়াছেন কিন্তু প্রথম বার ছাড়া অপর দুইবার জ্ঞান হইলেই সুস্থ হইতেন, আর কোন অসুবিধাও তেমন কিছু বোধ করিতেন না। প্রতিবারই এবং অন্য সময়েও ডাক্তার দেখান হইয়াছে, তাঁহার রক্তের চাপ সর্বদাই স্বাভাবিকই ছিল, হৃৎযন্ত্রেও কোন বৈকল্য কিছু পাওয়া যায় নাই। বছর দেড়েক আগে তিনি যখন তাঁহার গ্রামের আশ্রমে প্রথমবার অজ্ঞান হইয়াছিলেন, তখন স্টেথিসকোপে তাঁহার হৃৎযন্ত্রের কোন ত্রুটি ধরা না পড়ায় ডাক্তারগণ কলিকাতা যাইয়া কার্ডিওগ্রাফ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সাধারণভাবে তাঁহার পছন্দসই ছিল না বলিয়া এবং উহা অতিশয় ব্যয়সাধ্য বলিয়া উহার গহন অরণ্যে প্রবেশ করাইতে তাঁহাকে সম্মত করান যায় নাই। যাহাহউক, প্রথমবার অজ্ঞান হওয়ার পর বমির ভাব অনেকক্ষণ চলিয়াছিল, তাহার পর ঘুমাইয়া পড়েন এবং সকাল বেলা সুস্থই হইয়া যান। পরের দুইবার তো কোন কষ্টই হয় নাই। বিগত ১৪ই মার্চই দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের পর বিছানায় শায়িত অবস্থাতেই অজ্ঞান হইয়া গিয়াছিলেন। তিন চার মিনিট পরে বেশ সুস্থই হইয়া যান। তাঁহার রক্তের চাপ ও হৃৎযন্ত্রের কোন বৈকল্য ধরা না পড়ায় তিনি বক্তৃতা দেওয়া বন্ধ করেন নাই।

কিন্তু গত রবিবার ৩১শে মার্চ জ্ঞান হওয়ার পর আর উঠিতে পারিলেন না। একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে দিয়া তখনই ওষুধ দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল উহা মিনিটে মাত্র ৬।৭ বার স্পন্দিত হইতেছে। ইহাতে তখনই এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার আনাইয়া ইনজেকসন করা হইল, ওষুধ খাওয়ান হইল—পরপর কয়েকটী ইনজেকসনই

দেওয়া হইল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে যখন তাঁহার নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ১৩।১৪, বার সেই অবস্থাতেই তিনি একে একে তাঁহার গুরু-ভ্রাতাদের নাম উল্লেখ করিয়া কাছে ডাকিলেন, তাঁহাদের কাঁধের উপর নিজের একটী হাত রাখিলেন।—তাঁহার গুরু-ভ্রাতা শ্রীযুত নীলরতন বাবুকে বলিলেন—ডাক্তার কি হইবে, নিত্যগোপাল বলুন! তাঁহাদের কাছে পাইয়া তিনি বিশেষ আনন্দ পাইলেন, ইহা বুঝিতে পারা গেল। তিনি নিজেও কয়েকবার 'নিত্যগোপাল' নাম বলিতেছিলেন। এইভাবে রাত ১টা পর্যন্ত নাড়ির গতি কখনও ১৩।১৪, কখনও বা ২০।২২-এর বেশী বাড়িল না। শ্রীমৎ স্বামীজী গত প্রায় চার বৎসর হইল এনলারজমেন্ট অব প্রস্টেট গ্ল্যাণ্ডের জন্য দাঁড়াইয়া ছাড়া প্রস্রাব করিতে পারিতেন না। ঐদিন রাত নয়টা সাড়ে নয়টায় তিনি প্রস্রাব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—এবং বলিলেন আমাকে দাঁড় করাইয়া দাও। কিন্তু নাড়ীর ঐ অবস্থায় ডাক্তারবা তাঁহাকে দাঁড় করাইতে সাহস পাইলেন না। রাত সাড়ে এগারটা পর্যন্ত ঐ এক ভাবেই চলিল। তাঁহার বন্ধু স্থানীয় ও বিশেষ স্নেহভাজন যে সকল ডাক্তার পূর্বে তাঁহার চিকিৎসা করিতেন তাঁহারা প্রায় সাড়ে বারোটায় আসেন। ইহার পূর্বে যে দুইজন ডাক্তার আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল কম্‌প্লিট হার্ট ব্লক কেস, হাসপাতালে পাঠানই উচিত। তখন রাত প্রায় একটা—এ্যাম্বুলেন্সে ফোন করা হইল—ডিপোতে এ্যাম্বুলেন্স ছিল না। বার তিনেক ফোন করার পর এ্যাম্বুলেন্স আসিল রাত পৌণে তিনটায়। শ্রীমৎ স্বামীজীর অজ্ঞান হওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁহার তিন পুত্র, একমাত্র কন্যা, পুত্র-বধুরা সকলে উপস্থিত হইয়া ছিলেন এবং সমস্ত ব্যবস্থা তাঁহারাই করিতেছিলেন। শ্রীমৎ স্বামীজীর স্ত্রী—আমাদের মা—প্রথম হইতেই মহানির্বাণ মঠে উপস্থিত ছিলেন। রাত তিনটায় সুখলাল কারনানি হাসপাতালে পৌঁছিয়া কার্ডিওলজি বিভাগে তাঁহাকে রাখা হইল। তখনই চিকিৎসা আরম্ভ হইল। মেডিক্যাল সায়ান্সে যতটা সম্ভব সবই করা হইল। হাসপাতালের ডাক্তার ও নার্সগণ সর্বদা উপস্থিত থাকিয়া আপন জনের মত সেবা করিয়াছেন—দেখা গেল। হাস-পাতালের বেডে যাওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ রাত প্রায় ৪টা পর্যন্ত তাঁহার কিছু জ্ঞান ছিল। পরদিন সকাল হইতে আর জ্ঞান আছে বলিয়া বোঝা গেল না। মনে হয় ডাক্তাররা চেষ্টা করিয়া একটি দিন রাখিলেন—মঙ্গলবার ভোর ৬টা ৩৫ মিনিটে

তিনি চলিয়া গেলেন, নিত্যলীলার সহিত যুক্ত হইলেন! তাঁহার অভাবিত ও আকস্মিক তিরোধান তাঁহার নিজজনকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে।

হাসপাতাল হইতে তাঁহার দেহ তখন তাঁহার গুরুপীঠ মহানির্বাণ মঠে লইয়া যাওয়া হইল। তাঁহার ছেলেরা, ঐ অল্প সময়ে যে কয়জন আত্মীয় ও বন্ধুজন সংবাদ পাইয়াছিলেন তাঁহারা এবং মহানির্বাণ মঠ হইতে আগত প্রায় কুড়িজন গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্য সকলে মিলিয়া শ্রীনিত্যগোপাল নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দেহ কাঁধে বহন করিয়া মঠে লইয়া আসেন। সেখানে মন্দিরের বারান্দায় তাঁহাকে রাখা হয়। শ্রীমৎ স্বামীজীর তৃতীয় পুত্র তখন এবং পরেও অনেকগুলি ফটো তোলেন। ইতিমধ্যে লরী প্রস্তুত হইলে লরীতে দেহ তুলিয়া মঠের সন্ন্যাসীগণ, তাঁহার ছেলেরা ও অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুগণ যতটা লরীতে সম্ভব উঠিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার পুত্রদের ৮এ, রাসবিহারী এভিনিউর বাড়ীতে একটু লইয়া যান, সেখান হইতে তাঁহার গ্রামের নরনারায়ণ আশ্রমে লইয়া আসেন। আমাদের মা, তাঁহার কন্যা, পুত্র-বধুগণ, নাতি-নাতনী সকলে ট্যাক্সীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে সমস্ত গ্রামে সংবাদ রটিয়া গিয়াছিল—গ্রামের সকলে—উদ্বাস্তরাও—আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহানির্বাণ মঠের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যগোপাল-নাম কীর্ত্তন সমানেই চলিতেছিল। সমস্ত আশ্রম সকল রকম নরনারীতে একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল—কলিকাতা হইতেও যে-কেহ সংবাদ পাইয়াছেন—আত্মীয় বন্ধুগণ—আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আকস্মিক তিরোভাবের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না—তাই ব্যথায় সকলেই আপ্লুত হইয়া গিয়াছিলেন। ফুলে-ঢাকা মুদ্রিত-চক্ষু হাসি-মুখ তাঁহার দেহের যে কী অবর্ণনীয় অপরূপ রূপ তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা যে-কেউ সেদিন সে অনির্বচনীয় দেহ দেখিয়াছেন, তিনিই উপলব্ধি করিয়াছেন। সমাধি-স্থান প্রস্তুত হইলে রাত সাড়ে আটটা মত সময়ে তাঁহার দেহ কফিনে রাখা হয় এবং সমাধিস্থানে নামান হয়। এই চৌদ্দ পনের ঘণ্টায় এই চৈত্র মাসের রোদে গরমে ঐ দেহ এতটুকু বিকৃত হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই চৌদ্দ পনের ঘণ্টাতেও ঐ দেহ শক্ত হয় নাই, ঠাণ্ডা হয় নাই। যে-কেহ সে-দেহ স্পর্শ করিয়াছেন, তিনিই অনুভব করিয়াছেন যে, দেহে স্বাভাবিক তাপ রহিয়াছে ও দেহ নরম রহিয়াছে!

এইভাবে মহাপ্রাণ পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার দেহ রক্ষা করিয়া তাঁহার জীবন মরণের দেবতা শ্রীনিত্যগোপালে লীন হইলেন।

সন্ন্যাসীর দেহান্তরে কোন অনুষ্ঠানের—শ্রাদ্ধাদি—প্রয়োজন হয় না। পূর্বে অপরকে ও কথাপ্রসঙ্গে ২৮শে মার্চ শুক্রবার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকেও তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের একটী অনুষ্ঠান পাঁচদিন পরে করা যাইতে পারে। সেই কথা অনুযায়ী দেহরক্ষার ষষ্ঠদিনে ৬ই এপ্রিল ১৯৫৮ রবিবারে নরনারায়ণ আশ্রমে তাঁহার স্ত্রী, সন্তানগণ, আশ্রমবাসীগণ, সমস্ত গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে এবং কলিকাতা হইতে বন্ধু বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ভক্ত ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিগণ একত্রিত হইয়া ভোর পাঁচটা হইতে রাত বারোটা পর্যন্ত নানাবিধ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাঁহাব প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে। ভোব পাঁচটায় গ্রামের বিভিন্ন সঙ্ঘ (১) নেতাজী কিশোর সঙ্ঘ, (২) অশ্বিনী কুমাব ব্রতী সঙ্ঘ, (৩) পল্লীসঙ্ঘ, (৪) বাস্তুহাবা ক্যাম্প সম্প্রদায় সম্মিলিত হইয়া স্থানীয় অধিবাসী শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়-কৃত একটী প্রভাতী সঙ্গীত

—জয়তু পুরুষোত্তমানন্দ জয়তু শ্রীনিত্যগোপালজী

তোমার কৃপায় যুগ-জীবনের ধর্মতত্ত্ব জানিযাছি—

কবি-গায়ক উদ্বাস্তু শ্রীসুবেন সবকাবেব নেতৃত্বে গাহিয়া গাহিয়া সমস্ত গ্রাম পর্যটন করেন। শোভাযাত্রাব পুরোভাগে শ্রীনিত্যগোপালের ও শ্রীমৎ স্বামীজীর প্রতিকৃতি যথাক্রমে শ্রীলক্ষ্মীকান্ত বাগুই ও শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাস লইয়া এবং শ্রীমৎ স্বামীজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসত্যব্রত ঘোষ নরনারায়ণ আশ্রমের লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা লইয়া অগ্রসর হন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাসকে ছেলেদের মধ্যে যাইয়া গান গাহিতে হইলে শ্রীফণিভূষণ মালাকার শ্রীমৎ স্বামীজীর প্রতিকৃতি বহন করেন। প্রভাতী-সঙ্গীত বেশ সুন্দর হইয়াছিল। বেলা সাড়ে আটটা হইতে স্থানীয় একদল কীর্ত্তন গান করেন প্রায় ১২টা পর্যন্ত। এদিকে সকাল ৭॥০টা নাগাদ শ্রীশ্রীনিত্যগোপালদেবকে বাল্য ভোগ দেওয়া হয় পরে শ্রীমৎ স্বামীজীর ইচ্ছানুযায়ী শ্রীনিত্যগোপালের প্রসাদ শ্রীমৎ স্বামীজীর সমাধিস্থলে লইয়া গিয়া তাঁহাকে নিবেদন করা হয়। অতঃপর শ'তিনেক লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। দ্বিপ্রহরেও শ্রীনিত্যগোপালের পূজার পর ভোগ দিয়া সমাধিস্থলে শ্রীমৎ স্বামীজীকে নিবেদন করা হয়। অতঃপর উদ্বাস্তুসহ প্রায় দুই হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গ্রামের সকল লোকেই উপস্থিত হইয়া ছিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী চিত্তরঞ্জন কলোনী হইতেও অনেকে

আসিয়াছিলেন। বিকাল ঠিক পাঁচটায় ডাঃ প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়ের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হয়। স্থানীয় ও আশেপাশের বহু নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন, কলিকাতা হইতেও শ্রীমৎ স্বামীজীর বহু বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন আসিয়াছিলেন।

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় সভাপতিকে আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইয়া শ্রীমৎ স্বামীজীর সমন্বয়ধর্মী জীবনের কথা কিছু বলেন। অতঃপর সভাপতি আসন গ্রহণ করিলে ছোট্ট ছেলে শ্রীমান ডমরুপাণি চট্টোপাধ্যায় তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিলে তিনি আবার সে মালা ডমরুর গলায় পরাইয়া দেন। শ্রীমতী মায়া সেন ও শ্রীমতী ভারতী গুপ্তের উদ্বোধন সঙ্গীত গাহিবার কথা ছিল। কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌঁছিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হওয়ায় শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য মহাশয় উদ্বোধন সঙ্গীত গান করেন। অতঃপর শ্রীযুত সত্যব্রত ঘোষ যিনি চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সভাপতি মহাশয়, বিপ্লবীনেতা শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনেক কিছু শুনিবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানান। অতঃপর স্থানীয় অধিবাসী শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন-দর্শন ও তাঁহার বিশাল প্রাণের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া বলেন যে, স্বামীজীর মত মহাপুরুষকে পাইয়া বাগুইআটী গ্রাম ধন্য হইয়া গিয়াছে। অতঃপর শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত এম এল সি, ডাঃ কামিনীকুমার ঘোষ এম এল এ, স্থানীয় অধ্যাপক শ্রীমাধব দাস সাংখ্যতীর্থ, মহানির্বাণ মঠের শ্রীতারিণীচরণ নন্দী ও শ্রীমৎ ধীরানন্দ ব্রহ্মচারী, সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সহ-অধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৪ পরগণার সোশ্যাল এডুকেশন অফিসর শ্রীঅনাদিনাথ সিংহ, শ্রীমণীলাল মিত্র, বাগজোলা ১১নং ক্যাম্প-সুপারিন্টেনডেণ্ট শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ শ্রীমৎ স্বামীজীর রাজনৈতিক জীবন, তাঁহার বিপ্লবী সমন্বয়-ধর্ম, তাঁহার ত্যাগ প্রভৃতি এবং সর্বোপরি তাঁহার বিশাল বিরাট প্রাণের ও তাঁহার ভাল-বাসার কথা উল্লেখ করেন। সভাপতি অনেক কথার মধ্যে বলেন শ্রীনিত্যগোপাল-সাধনার মূর্ত প্রতীক স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ। তাঁহার আরব্ধ কাজ বন্ধ হইতে পারে না, বরং তাহা আরও দ্রুতগতিতে সুসম্পন্ন হইবে। সভাপতির কলিকাতায় পার্টি মিটিং থাকায় সভা শেষ হইবার পূর্বেই তাঁহাকে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল, তিনি তাঁহার অনুপস্থিতিকালে শ্রীজলধরবাবুকে সভার কার্য চালাইতে অনুরোধ করেন। সকলের বলা হইলে আশ্রম সেক্রেটারী রেণু মিত্র শুধু সকলের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। শ্রীফণিভূষণ মালাকার সভাপতিদ্বয়কে ও

সেইদিনের সমস্ত অনুষ্ঠানের জন্য গ্রামের সকলকে এবং বহিরাগত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভার শেষে জলধরবাবু শ্রীমৎ স্বামীজীর জীবন-ব্রতের কথা কিছু বলেন।

সভান্তে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত সুর-রত্নাকর শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় 'মাথুর' পালা কীর্ত্তন করিয়া সকলকে বেদনা-আনন্দ দান করেন।

এইভাবে কয়টী দিনের মধ্যে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ নিজেকে বাহিরের দিক হইতে সরাইয়া লইয়া বহু বহু জনের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। আমরা, তাঁহার প্রিয়জন যাঁহারা দূরে রহিয়াছেন, আকস্মিকভাবে সকল ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ায় যাঁহারা উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদের জন্য, আমাদের পুনরায় স্মরণের জন্য এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা শুনিতে জানিতে আগ্রহশীল হইবেন, তাঁহাদের জন্য সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা মোটামুটি লিপিবদ্ধ করিলাম।

পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার পুরুষোত্তমানন্দ নামধেয় দেহেতে আর নাই! এই না-থাকা এত আকস্মিক যে ইহা বুঝিয়া লইতে যেন সময় লাগিবে। তদুপরি তাঁহার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এত কাজের ভিড় আসিয়া জমিল যে, স্পন্দনহীন অন্তঃকরণ সমস্ত ভাবনা চিন্তা আবেগকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া কেবলই কাজ সারিয়া যাইতেছে। ক্লান্ত অসুস্থ দেহ ভাবনার ক্ষমতাও যেন হারাইয়াছে। ভোঁতা মন চোখ বুজিয়া থাকিলেও আজ যাহা দেখিতেছে তাহা এই যে, যতদিন তিনি ছিলেন, ততদিন তিনি যেন বড় একলা ছিলেন, আজ যখন তিনি গেলেন তখন তিনি বহুর মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের গত ৬ই এপ্রিলের দিনটীতে যে মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা মুগ্ধ করিয়াছে। এই গ্রামের প্রতিটী সঙ্ঘ, ক্লাব, সমিতি, ব্যক্তি সকলে স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে ভাবে নিজের ঘরের কাজ করিবার মত করিয়া সারাদিন খাটিয়া সমস্ত কাজ সারিয়াছে, তাহা অভাবনীয়। এই যে একটা মিলন-ক্ষেত্র রচিত হইয়া উঠিল তাঁহার যাওয়াকে কেন্দ্র করিয়া, এই মিলনের আভাস তাঁহার কাছে পৌঁছিয়াছে, তিনি তৃপ্তি পাইয়াছেন—এই-ই মস্ত বড় কথা। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, ব্যক্তির সঙ্গে পরিবারের, সমাজের, দেশের, রাষ্ট্রের, সমষ্টির সঙ্গে সমষ্টির মিলনকে যে তিনি কত বড় করিয়া দেখিতেন, তাহা বলিব কোন্ ভাষায়? বিরুদ্ধকে তিনি একান্ত বিরুদ্ধ বলিয়া, একেবারে কোনোখানে কোনরকম ভাবেই মিলিতে পারে না' বলিয়া মনে করিতেন না, বিশ্বাস করিতেন না।

তাই তো বিরুদ্ধ মতাবলম্বী—শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, রামানুজ, চার্বাক—সকলকে মিলাইয়া এক মহারাসের সংবাদ দিয়া তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। কাজেই সেদিন যে পারস্পরিক প্রীতির এক আন্তরিকতাপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে আনন্দ দিয়াছে—এই কথা মনে করিয়া, উপলব্ধি করিয়া এই গভীর ব্যথার মধ্যেও শান্তি পাইয়াছি।

পুরুষোত্তমানন্দ একজন মানুষ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন একটী বিরাট তত্ত্ব। তত্ত্বে আর মানুষত্বে মিলাইয়া তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমন সুরে যাইয়া পৌঁছাইয়াছিল যাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া মানুষের অনুসন্ধানের বিষয়, উপলব্ধির বিষয়। সর্ব সমন্বয়ের, বিরুদ্ধ তত্ত্বের সমন্বয়ের কথা লইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার তত্ত্বালোচনার যেমন শেষ ছিলনা, মানুষ হিসাবেও তিনি ছিলেন অফুরান। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যেমন কৃষ্ণ-জীবন ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যগোপালের জীবনদর্শনের আলোকে বর্ত্তমান যুগের মানুষের সীমাহীন সমস্যার কথা আর তাহাদের সমাধানের কথা বলিয়া যাইতে পারিতেন, তেমনই মানুষ-পুরুষোত্তমানন্দ কখনই ফুরাইয়া গেলেন না। মানুষকে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন—গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। নির্বিশেষ মানুষকে এমন গভীরভাবে ভালবাসিয়াছিলেন বলিয়া ব্যক্তি-মানুষ যখন তাঁহার চলার পথের সামনে আসিয়া পড়িত—তখন সে ব্যক্তি ভাল না মন্দ, কুলীন না অকুলীন, মূর্খ না পণ্ডিত, নর না নারী—কোন বিবেচনাই তিনি রাখিতেন না। এমন কি যাহাকে তিনি দেখামাত্র আপন জন বলিয়া বুকে তুলিয়া লইলেন সে তাঁহাকে ভালবাসিল কি না সে কথা ভাবিয়া দেখিবার প্রকৃতিও তাঁহার ছিল না। সে যদি তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, তাহার আসার অপেক্ষায় পথের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতেন; বলিতেন আশীর্বাদ করি তাহার কল্যাণ হউক, কিন্তু আমার দুয়ার খোলা রহিল—কোনদিন প্রয়োজন বোধ করে তো আসিবে। বলিতেন আমার হৃদয়ে হাজার হাজার কুঠরী। সেফ ডিপজিট ভল্টের বাক্সের মত প্রত্যেকের জন্য একটী করিয়া বাক্স রিজার্ভ করা। যে তালা বন্ধ করিয়া চাবি লইয়া চলিয়া গেল, আমি সে বাক্স ঠিকমতই রক্ষা করিয়া চলিয়াছি—সে আসিলেই দেখিবে আমার হৃদয়ে তাহার স্থান যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। তিনি এমন করিয়া ভালবাসিতেন বলিয়াই তিনি ফুরাইয়া যান নাই। কিন্তু শুধু তাহাই নয়, প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়াও তিনি

নিজের প্রজ্ঞা-স্থিতি কখনও হারাইয়া ফেলিতেন না, তাহাতেই অমন অফুরান হইয়া উঠিতেন। বুদ্ধির পার পাওয়া যায়, হৃদয়েরও তলা বলিয়া জিনিষটাই নাই বলিয়া ভাসাইয়া লইয়া তাহা একস্থানে লইয়া ঠেলিয়া ফেলে। কিন্তু যিনি প্রজ্ঞাতে স্থিত হইয়া প্রাণের অতল গভীরে ডুব দিলেন, তাঁহাকে কিছুতেই ফুরাইয়া ফেলা গেল না। .পুরুষোত্তমানন্দের দীর্ঘ জীবনের পথরেখা অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে তাঁহার প্রথম জীবন হইতে এই শেষ জীবন পর্যন্ত যত লোক তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে, অল্প সময়ের জন্যই হউক, বেশী সময়ের জন্যই হউক, বন্ধুভাবেই হউক, সাধারণভাবেই হউক—কেহ তাঁহাকে ভুলিয়া যাইতে পারে নাই। তাঁহার সংস্পর্শ তাহাদের প্রাণের কোথাও এমনভাবে গাঁথিয়া যাইত যে পঁচিশ বৎসর পরেও না আসিয়া পারিত না। তাঁহার জীবন-চেতনা অফুরান ছিল বলিয়াই তাঁহার তত্ত্ব অফুরান ছিল।

সে কম্বু-কণ্ঠ, সে সিংহ গর্জন আজ স্তব্ধ হইয়াছে। কৃষ্ণ-কথা, গৌর-কথা, নিত্যগোপাল-কথা 'এমন করিয়া এমন রকমে' আর কেহ বলিবে না। শত শত বৎসর হইল ভারতবর্ষ কৃষ্ণ-কথা শুনিয়া আসিতেছে, গৌর-তত্ত্ব শুনিয়া চোখের জল ফেলিতেছে, নিত্যগোপাল-কৃষ্ণ-গৌর চিরন্তন কালের বলিয়া নিরবধিকাল মানুষ তাঁহাদের কথা শুনিবে, কিন্তু পুরুষোত্তমানন্দ কৃষ্ণ-কথা গৌর-কথা নিত্যগোপাল-কথা যে 'রকমটী' করিয়া বলিতেন এমন করিয়া আর কেহ আজ বলিবে না—সে কণ্ঠ স্তব্ধ হইয়াছে! যিনি তাঁহাকে এই কথা, এত কথা দিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে টানিয়া লইয়াছেন। বলিবার আমাদের কিছুই নাই —তবু আকুল পরাণ আর্তনাদ করিয়া ওঠে—সে কম্বুকণ্ঠ আর শুনিব না— 'তেমন' করিয়া সেই 'রকম' করিয়া কৃষ্ণ-কথা আর কেহ কহিবে না, জীবনকে 'এই রকম' করিয়া কেহ আলোচনা করিবেনা। বিরাট বিশ্ব, বিচিত্র বিবিধ ইহার চলার গতি—কত কথা,—সবই কৃষ্ণ-কথা, সবই ভাল কথা—তবু যাহার 'ঐ রকম' করিয়া ছাড়া আর কিছু ভাল লাগিত না, লাগে না, আর কিছু বুঝিত না, বোঝে না, সে কোথায় যাইবে, কাহার কাছে এ কথা শুনিবে? বিশ্বে কেউ আছে কি 'এমন করিয়া' যিনি বলিতে পারেন? পুরুষোত্তমানন্দ যাহা বলিতেন, যাহা লিখিতেন, তাহাই যে সর্বাপেক্ষা ভাল. তাহা না-ই বলিলাম, কিন্তু 'তেমন' কথাই যদি শুনিতে চাই, কোথায় যাইব?—বিধাতা জানেন! জন সমাজের মধ্য হইতে এই তত্ত্ব বাণীমূর্তি লাভ করিবে—সেই আশায় থাকিব।

মানুষকে তিনি ভালবাঁসিয়াছিলেন। মানুষকে তিনি নির্বিচারে নির্বিবাদে

গ্রহণও করিতেন—কিন্তু গ্রহণ করিবার পর আর বিচারহীন বা বিবাদহীন থাকিতেন না। অর্থাৎ মানুষ যেমন আছে তেমনই থাকিবে—সে চিন্তায় কার্যে ভাবে বিপ্লবী হইবে না, ব্যক্তি-মানুষ বিশ্ব-মানুষ হইয়া উঠিবে না—ইহা তিনি বরদাস্ত করিতেন না, করিতে পারিতেন না—তাঁহার প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিত। সীমায়িত প্রতি মানুষটীর মধ্যে যে একটী বিশ্ব-মানুষ ঘুমাইয়া আছে, সেই বিশ্ব-মানুষটীকে জাগ্রত করিবার জন্য প্রাণ ভরিয়া যেমন তিনি ভালবাসিতেন তেমনি প্রাণপণ করিয়া তাহাকে প্রতিপদে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিতেন। সাধারণ মানুষের প্রকৃতি এই যে, সে যাহা আছে তাহাই থাকিতে চায়, নিজের প্রকৃতি বদল করিয়া নূতন মানুষ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে, নিজের ক্ষুদ্রতা, সীমাবদ্ধতা দূর করিতে চেষ্টা করিতে সে নারাজ। মানুষের এই নিষ্ক্রিয়তা, এই বিপ্লব-বিমুখিতা পুরুষোত্তমানন্দকে গভীরভাবে আঘাত করিত। তাঁহার মানস-নেত্রে ব্যক্তি ও সমষ্টির এমন একটী উজ্জ্বল চিত্র ভাসিয়া উঠিয়াছিল, যাহা তাঁহার কাছে নিতান্ত বাস্তব হইলেও মানুষের কাছে বাস্তব না থাকায় সেখানে পৌছাইবার জন্য কোনো তাগাদা তাহারা বোধ করিত না। অথচ পুরুষোত্তমানন্দ প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না—মানুষের মধ্যের বিশ্ব-মানুষটীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া তিনি সারা জীবন কাঁদিয়া গেলেন। তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি এই ছিল যে, ঐ বিশ্ব-মানুষটীকে—ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে যেটী সামঞ্জসীভূত—বাহির করিতে পারিলে মানুষ ও সমাজ যে দিব্য ভাগবত-জীবন লাভ করিত, ভবিষ্যৎ বিশ্বের তাহাই লক্ষ্য স্থল—মানুষকে সেখানে পৌছাইতে হইবেই। তাই তাঁহার প্রচেষ্টার যেমন অন্ত ছিল না, তাঁহার কান্নারও অন্ত ছিল না। একদিন সন্ধ্যাকালীন ভাষণে কাঁদিয়া তাঁহার দেবতাকে বলিয়াছিলেন, ঠাকুর, রইল তোমার বিশ্ব, রইল তোমার বিশ্বের দুঃখকষ্টে-ভরা মানুষগুলি—তাহাদের দুঃখকষ্ট আমাকে পাগল করিয়া তুলিত—সারাজীবন তাহাদের সে কষ্ট দূর করিবার জন্য প্রাণপণ করিলাম—কিছুই করিতে পারিলাম না, মানুষের দুঃখকষ্ট রহিয়াই গেল! তুমি রহিলে, তোমার বিশ্ব রহিল—আমার সময় হইয়া আসিয়াছে—ক্লান্ত এই দেহটী আজ মায়ের কোলে ঘুমাইবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে—ইত্যাদি।

মানুষের দুঃখটা যতবড় বাস্তব সত্যই হউক না কেন, সেটা যে নূতন রকম করিয়া ভাবিলে অনেকখানি বদলান যায় এবং ভাবনার উপরেই যে

দুঃখের অপহ্নব নির্ভর করে যদি সেই ভাবনাকে কাজে রূপ দেওয়া যায়—এই কথাটা তিনি মানুষের কাছে উপস্থিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি নিজে সারা জীবনে কখনও ভাল খান নাই, ভাল পরেন নাই, সারা জীবন সাধারণতম জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন—যাহা জুটিয়াছে তাহারও অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া না দিয়া নিজে গ্রহণ করেন নাই—মানুষকেও সেই পথে চলিতে আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন। এই পথেই দুঃখ থাকিলেও দুঃখের অতীত হওয়া যায়।

তাঁহার কথা কত বলিব? একদিনে তাহা শেষ হইবার নয়। তাঁহার তত্ত্বের পূর্ণ দৃষ্টান্তই ছিল তাঁহার নিজের জীবন। মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর করিতে প্রয়াস পাইয়া তিনি মানুষের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন, এইজন্যই রাজনীতির আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন—তথাপি সমস্ত কিছুর মধ্যে থাকিয়াও সব কিছুর অতীত থাকিবার এমন একটি প্রজ্ঞাস্থিতির অদ্বৈতসিদ্ধি তাঁহার প্রকৃতিতে সহজ ছিল যাহা বিস্মিত করে এবং যে জন্যই তিনি এত সহজে বহুর মধ্যে বিচরণ করিতে পারিতেন। তাই কাজ না থাকিলে তিনি দিনের পর দিন একেবারে একলা পড়িয়া থাকিতে পারিতেন—সে কৈবল্য তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ—নিজের মধ্যে তাহার এমন একটি আত্মতৃপ্তি ছিল, যাহারই জন্য বহুর মধ্যে বিচরণ করিয়াও তিনি বিচলিত বা পথচ্যুত কখনও হন নাই। জীবনে কোন্ অবস্থা লাভ করিলে গীতার এই শ্লোক সার্থক হয়

• রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ —সেইটুকুই

পুরুষোত্তমানন্দ সারাজীবন দৃঢ়ভাবে বলিতে চাহিয়াছেন, প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

—মানুষ বিষয়ে বিচরণ করিবে কিন্তু আসক্তি বা বিদ্বেষ দিয়া বস্তুকে সে বিষাক্ত করিবে না, বিষয়ের বা বস্তুর স্বভাবসুন্দর সৌন্দর্যকে বিকৃত করিবে না।—কেমন করিয়া তাহা সম্ভব? আত্মবশ্য যে, বিধেয়াত্মা যে সে-ই বিষয়ের এই প্রসাদ-রূপ আস্বাদন করে।—শ্রীমৎ স্বামীজী বিষয়ের এই প্রসাদরূপকে আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন—তাই তিনি অমন মধুর, অমন মিষ্টি, অথচ অমন রুদ্র।

এই পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার পুরুষোত্তমানন্দ-নামধেয় দেহেতে আর নাই! এত অভাবিতরূপে এত আকস্মিকভাবে তিনি চলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার

সে না-থাকাটাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সময় লাগিতেছে।—জীবনে তাঁহার যে সাধনা ছিল, তাঁহার মহাপ্রয়াণ তাহারই একটি সুন্দর পরিণতি—যে কৃষ্ণ-কথা তাঁহার প্রাণস্বরূপ ছিল, তাহাই কহিতে কহিতে তিনি জ্ঞান হারাইয়াছিলেন। আমরা যাহারা রহিলাম তাহারা তাঁহার সেই কথাকেই মানুষের হৃদয়-দুয়ারে পৌছাইয়া দিতে পারি, আজ তাঁহার কাছে এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার কৃষ্ণ-কথা কওয়া ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না, কথা ছিল না—আমাদেরও যেন ঐ কৃষ্ণ-কথা কওয়া ছাড়া আর কোন কাজ না থাকে, কথা না থাকে। তিনি নাই এ কথা যেমন সত্য নয়, তথাপি তিনি নাই সে কথা সত্যও। এই দুই সত্যকে সত্য ধরিয়া তাঁহার কাজে, তাঁহার সঙ্গে একাত্মতার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার কাজে, তাঁহার কথায় জীবনের পথে আগাইয়া যাইব—আজ এই সংকল্পই গ্রহণ করি।—আগাইয়া যাওয়াই ছিল পুরুষোত্তমানন্দের জীবনের গূঢ় তত্ত্ব। বসিয়া থাকিতে তিনি জানিতেন না, শুইয়া তাঁহার জীবন কাটে নাই—দুঃখ দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা কোন কিছুই তাঁহাকে আগাইয়া যাওয়া হইতে হটাইতে পারে নাই—আমরাও যেন দুঃখ দারিদ্র্য লাঞ্ছনা যাহা আসিবে তাহা দ্বারা পথচ্যুত না হই। চলিব, শুধু চলিব—মহাজনগণ ইহাই বলিয়া গিয়াছেন,—পুরুষোত্তমানন্দও ইহাই বলিয়া গিয়াছেন—দুঃখ আসে, চোখের জল ফেলিতে হয়, দারিদ্র্য নিষ্পেষিত করে—সবই গ্রহণ করিয়াও তবু চলিব। তিনি যাহা চাহিতেন, যেরূপ চাহিতেন, যাহাতে সুখী হইতেন—আমরা তাহাই করিব, তাহাই হইব। তিনি জয়যুক্ত হউন, তাঁহার জীবন-ব্রত জয়যুক্ত হউক, তাঁহার জীবনদেবতা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন, তাঁহার বিশ্বের মানুষ জয়যুক্ত হউক।

পুরুষোত্তমানন্দ-প্রয়াণে কয়েকটী পত্র

[শ্রীমৎ স্বামীজীর আকস্মিক তিরোভাবের সংবাদ পাইয়া যে সকল পত্র আমাদের নিকট আসিয়াছিল, আমরা তাহা হইতে কতকগুলি এইখানে মুদ্রিত করিয়া রাখিলাম। ইহা শ্রীমৎ স্বামীজীর প্রতি সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি হইয়া আমাদের চিরদিনের পাথেয় হইয়া রহিল।]

Bidhanpalli
P.o. Garia
24. Pargana
3. 4. 58

কল্যাণীয়াসু

স্নেহের রেণু,

তোমারই অনুগ্রহে আমি স্বামীজিকে শেষ দেখা দেখিয়াছি। যুগান্তর ও আনন্দবাজারে বোধহয় তাহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেখিয়াছ—গত ৭৫ বৎসরের জন্মোৎসবে তুমি জীবনী পাঠ করিয়াছিলে তাহা উজ্জ্বল ভারতে প্রকাশ করিতে পার—ঈষৎ বিস্তৃত করিয়া লইও। আজ আমি কেবল ভাবিতেছি তোমার কথা। কি অকুল বিপদ সাগরে তুমি কাণ্ডারী বিহীন অবস্থায় আপতিত হইলে! এমনি একদিন অবস্থা আসিয়াছিল নরেন্দ্র নাথ দত্তের পরমহংস দেবের তিরোধানের সঙ্গে। কিন্তু তাঁহার ছিল কয়েকজন অন্তরঙ্গ সঙ্গী—তোমার তাহা নাই। তবে তাহাদের ছিলনা মাথা গুঁজিবার স্থান—তোমার আছে নরনারায়ণ আশ্রম। আজ সেই আশ্রমের "মা" হইয়া তোমাকে জীবনব্রত সাধন করিতে হইবে। গান গাহিবে—"এই করেছ ভাল নিঠুর এই করেছ ভাল।" ভয় কি—সাধু যাহার ইচ্ছা ভগবান তাহার সহায়। তবে আমার ভয় হয় তোমার রুগ্ন দেহ লইয়া। আজ তোমাকে বাঁচিতে হইবে স্বামীজির অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত কাজগুলি বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য। জানি তোমার জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কিছুই নাই—তুমি নিত্যগোপাল ও পুরুষোত্তমের পাদমূলে তাহা পূর্ণাহুতি দিয়াছ—কিন্তু তেন ত্যক্তেন কার্য্য তোমাকে পরিপূর্ণ করিতে হইবে। হয়তো স্বামীজির সাঙ্গোপাঙ্গগণ কেহ কেহ হতাশ হইয়া সরিয়া পড়িবে—তাহাতেও ভয় পাইও

না—একলা চলরে বলিয়া অগ্রসর হও—কোনও বাধা থাকিবেনা। তোমার দৃঢ়ব্রতের সমক্ষে সব দূর হইয়া যাইবে—জিতা রহো!

শ্রীদুর্গামোহন সেন।

শ্রীশ্রীবিশ্বরূপ সেবাশ্রম
দক্ষিণেশ্বর
২৩শে চৈত্র, ১৩৬৪।

স্নেহনিলয়া, মা রেণু

কাল তোমার কার্ড পাইয়াছি—সংবাদপত্রে আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা জানিয়াই আমার মন তোমার কাছে ছুটিয়া যাইতেছিল কিন্তু অচল দেহ তো আমাকে আজও চলিতে দিল না। আমি যে শুধু অচলই তাহা নহে রোগ যন্ত্রনায় সর্ব্বদাই ছট্‌ফট্‌ করিয়া কাটাই। এ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র কিন্তু মরি কি করিয়া? যিনি আমার মধ্যে থাকিয়া রোগ যন্ত্রণার অশেষ দুঃখরস আস্বাদন করিতেছেন, তিনি ইচ্ছা করিয়া বিদায় না নিলে আমাকে এ ক্লেশ সহ্য করিতেই হইবে। আজ আমি সশরীরে তোমার কাছে উপস্থিত হইতে না পারিলেও আমার আত্মা স্বামীজির পাদদেশে বসিয়া আছে দেখিতে পাইবে।

স্বামীজির অন্তিমকালের কথাগুলি তোমার মুখে বিস্তারিত শুনিবার বাসনা থাকিলেও তাহাতে নিরাশ হইলাম। স্বামীজি গুরুমহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে গুরুধামে থাকিয়া মহাপ্রস্থান করিয়াছেন জানিয়া আনন্দ ও গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। তিনি দিব্যগতি লাভ করিয়াছেন ইহা আমাদেরও সৌভাগ্যের কথা, কিন্তু যাহা হারাইলাম তাহা আর এ জীবনে পাইব না ভাবিয়া আকুল হইতেছি। স্বামীজির বিদায়কালীন বিস্তারিত সংবাদ জানিবার জন্য স্বামী সুবলানন্দজি মহারাজকেই পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তিনি আশ্রমে উপস্থিত না থাকায় শ্রীমান সুনীলকেই তোমার কাছে পাঠাইলাম। শ্রীমতী জলদাও স্বামীজির চরণে দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিবার জন্য তোমার কাছে যাইতেছে।

স্বামীজি বাংলার বুকে উজ্জ্বলভারতের যে নিশান তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, সেই নিশানখানা আমারই হাতে তুলিয়া লওয়া কর্ত্তব্য ছিল তাহা আমি বুঝিতেছি, কিন্তু মা, আমি যে একেবারেই গতিহীন অচল, নিঃস্ব। অদূর

ভবিষ্যতে ভারত উজ্জ্বল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; স্বামীজির আশা এবং প্রচেষ্টা নিষ্ফল হইবেনা ইহা নিশ্চয় জানিও। উজ্জ্বলভারতের বিজয় পতাকা নরনারায়ণ আশ্রমের শীর্ষদেশে তুলিয়া ধরিবার গুরু কর্ত্তব্য ভার তোমারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে, তুমি ঐ পতাকাটিকে দৃঢ় হস্তে গ্রহণ করিবে। তুমি ভয় পাইও না, স্বামীজি তোমার ভিতর থাকিয়া তাঁহার পতাকা বহিবার শক্তি তোমাকে যোগাইবেন।

শুভাশীর্ব্বাদক

শ্রীঅতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী

ওঁহরি

নারায়ণেষু:— 3, Annada Neogi Lane,
Calcutta 3.

মা রেণু!

যুগান্তর পত্রিকায় স্বামিজী মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ পাঠ করে মর্মাহত হলুম—পরিণত বয়সেই তাঁহার এই মহাপ্রয়াণ, তবু এত শীঘ্রই তিনি চলে যাবেন কখনো মনে হয় নাই; কাজেই অপ্রত্যাশিত এ মর্মান্তিক সত্য কেবলই মনকে অশান্ত করে তুলছে। যে আদর্শনিষ্ঠার তিনি মূর্ত্তবিগ্রহ ছিলেন, তার তুলনা বিরল। বাংলার এই চরম দুর্দ্দিনে, আদর্শহীন জাতীয় জীবনে তাঁহার এই স্থূল অভাব—স্থূলধর্মী আমাদের পক্ষে যে অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হল, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না—অনুভব করা যায় মাত্র। তোমাদের যে ক্ষতি হল, যে ব্যথা তোমরা পেয়েছ—তার জন্য সান্ত্বনার কোন ভাষা নেই, তবে তাঁহার মহৎ আদর্শই তোমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখবে, তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে প্রেরণা যোগাবে এই ভরসা। গুরু দেহ নয়, গুরু তত্ত্ব—ভগবতত্ত্ব, তাই দেহের বিনাশে গুরুর বিনাশ নাই, শিষ্যের হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর চির অধিষ্ঠান—সাধনার সিদ্ধিতে সে অনুভূতি হৃদয়ে জাগে—তখন বিচ্ছেদের দহনজ্বালা, মিলনের, নিরবচ্ছিন্ন মিলনের অমৃতবারি নিষেকে নির্বাপিত হয়। অদূর ভবিষ্যতে গুরুর অমৃতময় জীবনের অমৃতধারায় তোমরা কৃতকৃতার্থ হও, ইহাই আজ সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কামনা করি।

আজ মনে পড়ে অসহযোগ আন্দোলনের কথা, তাঁহার সেই অনলবর্ষী বক্তৃতা আমাদের উচ্ছল যৌবনে ত্যাগ ও আদর্শের কি প্রেরণাই না জাগাত। তখন হয়ত তোমরা জন্মাও নাই। তারপর দীর্ঘ দিন অতীত হয়েছে, তবুও

তাঁহার বক্তৃতার ঝঙ্কার আজও যেন কর্ণকুহর হতে একেবারে মুছে যায়নি। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রম, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা, সবকিছুর দায়িত্বই বোধহয় তোমার উপর পতিত হল; তাঁহার সঙ্গলাভে যে আদর্শের প্রেরণা পেয়েছ, তাহাই তোমাকে এ গুরুভার বহনে শক্তি দিবে, তাঁহার অশরীরী আত্মার আশীর্বাদ তোমাকে সাধনার সিদ্ধিতে পৌঁছাইয়া দিবে একথা খুবই বিশ্বাস করি। আশ্রম সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, আমি কিছুটা অসুস্থ তা না হলে এখনই একবার যেতুম। পুরুলিয়ায় নিবারণ বাবুর আশ্রমে তাঁহার সঙ্গে একসঙ্গে থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আশা করি শ্রীভগবৎ কৃপায় আশ্রমস্থ সকলসহ কুশলে আছ। তোমাদের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে ভগবান শান্তি দিন এই প্রার্থনা করি। ইতি

ব্রঃ শিশির কুমার

শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু শরণং

60, Simla St.
Calcutta—6.
২২. ১২. ৬৪

মা,

শ্রদ্ধেয় স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর মহাপ্রয়াণে একজন অতি আপনলোকের বিয়োগব্যথা অনুভব করছি, তাই শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সাধনসঙ্ঘের তরফ থেকে তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছি এবং আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করছি যেন তিনি উর্দ্ধলোক থেকে আমাদের কার্য্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত করেন— রবিবার বাগুইআটীতে আমাদের কেউ কেউ উপস্থিত থাকবেন—নিবেদনমিতি

ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ

ওঁ

33, McLeod Street,
Park St., Calcutta-16

কল্যাণীয়াসু—

আমি বাংলা খবরের কাগজ রাখি না; তুমি যে-সংবাদ দিয়েছ সেটা আমার জানা ছিল না। যাইহোক্, তাঁর যে কাজ ছিল, সেটা নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে পারলেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো স্মৃতিরক্ষা করা হবে। আমি সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যেন তোমরা সেই দীপশিখা উজ্জ্বল করে রাখতে পারো এবং অপরকে তাই থেকে প্রদীপ্ত করতে পারো। আর কিছু

বলার নেই। সর্বশুভদাতা তোমাদের কল্যাণ করুন—আর তোমাদের সেই বুদ্ধিই প্রদান করুন—যে-বুদ্ধি সর্বজীবের মঙ্গলের হেতু। ইতি ইং ৭।৪।৫৮

শুভার্থী

শ্রীতপনমোহন শর্মা

গ্রাম—নারিকেল বেড়িয়া
পোঃ—বোদরা
জিলা—২৪ পরগণা
বুধবার, ১৯শে চৈত্র ১৩৬৪

কল্যাণীয়া রেণু মিত্র,

আজ এখানে (কলিকাতা হইতে ২০।২৫ মাইল দূরে) আপনার (ঠিকানা পরিবর্ত্তিত) চিঠি পড়িতেছি এমন সময় যুগান্তরে স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের কথা জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আশ্চর্য্য যোগাযোগ—যাদৃশী ভাবনা, তাদৃশী সিদ্ধিলাভ হইল তাঁর। পরম ভাগবত শ্রীপুরুষোত্তমানন্দ প্রাণারাম শ্রীগুরু শ্রীনিত্যগোপাল-স্মরণে তাঁরই সমাধি পাশে ইহলৌকিক জ্ঞানবলক্রিয়া শেষে তাঁরই চরণাশ্রয়ে নিত্যধামে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রায়ই আমার মনে হইত স্বামীজীতে তাঁর গুরু-মূর্ত্তি প্রতিফলিত, আকারিত হইতেছে। তাঁর ধারা রক্ষায় আপনাকে শক্তি ও প্রেরণাদান এবং আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করুন তিনি।

আমাদের বরিশালের প্রিয় কুমার শ্রীশরৎ কুমার,—বন্ধু, গুরু,—জয় হউক তোমার, সার্থক হউক তোমার বাণী, সাধনা।

সময়োপযোগী সামান্য কিছু অর্থ পাঠাইলাম।

নকুলেশ্বর (চট্টোপাধ্যায়)

C M P College,
Allahabad,
4-4-1958.

মাতঃ

নিদারুণ সংবাদ আজ আমি জানিয়া মর্ম্মাহত হইলাম, স্বামীজী—দেহ রক্ষা করিয়াছেন! He died in harness। যেমনটি তাঁর আদর্শ মানুষটি গান্ধীজী ৮ বৎসর পূর্বে এ'মরধাম ত্যাগ করিয়াছেন! গান্ধীজীকে আমরা

মারিয়াছি—মনে হয় আমরাই-যেন স্বামীজীকে এই সময়ে হত্যা করিলাম! তাঁর ভিতরে যে দর্শন এবং আদর্শ টগ্‌বগ্‌ করিতেছিল, তা তিনি আমাদিগকে বিলাইবার জন্য অত্যধিক শারীরিক মানসিক ক্লেশ সহ্য করিয়া ও অনেক সময় গভীর strain সহ্য করিয়া, চলিতে থাকিতেন। গত বৎসর যেদিন রবিবাসরীয় তাঁর ব্যাখ্যার ক্লাশে উপস্থিত ছিলাম, লক্ষ্য করিলাম সহ্যের অতিরিক্ত strain নিয়া বক্তৃতা দিতেছিলেন—সময়ের দিকে ভ্রূক্ষেপ থাকিত না। লক্ষ্য করিয়া থাকিবে আমার পকেট ঘড়িটা খুলিয়া তাঁর সামনে ধরিলাম, তিনি সে কথা উল্লেখ করিলেন এবং তারও কিছুক্ষণ পরে ব্যাখ্যা সাঙ্গ করেন। মনে হয় শেষ দিনে তিনি সাধ্যের অতিরিক্ত সময় নিয়া আবেগ ভরে বলিতে বলিতে—বা কাঁদিতে কাঁদিতে অমূল্যধন বিলাইতেছিলেন! অজ্ঞান হইলেন অথবা সমাধিস্থ হইলেন—আর দেহে ফিরিলেন না। গুরুর কথা বলিতে বলিতে সাধনোচিত ধামে চলিয়া গেলেন! মৃত্যু যন্ত্রণা বোধ হয় হইল না। তাঁর পক্ষে অসময় নয়, তবে আমরা তাঁকে আরো ১০ বৎসর পাইলে ভালো হইত! আমার তো ব্যক্তিগত loss। 'ভাইটি' সম্বোধন করিবার আমার আর কেহ রহিল না। বৌ-ঠাকুরাণীকে বলিবে এ শোক আমারো সমধিক। তোমাদের সকলকে এই শোক-বেগ ধারণ করিবার ক্ষমতা তিনিই দিবেন, যিনি তাঁর আরব্ধ কার্য এতকাল করাইয়া আসিতেছেন। বলিবার ভাষা নাই। আমার তো কলিকাতা যাইবার আকর্ষণ কমিয়া গেল। সেই যে এক বৎসর পূর্বে শেষ দেখা হইল, তা তখন জানিতাম না। তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ।

মা, তুমি শোক করিয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। তোমাকে এবং তোমাদিগকেই তাঁর আরব্ধ কর্ম চালাইয়া যাইতে হইবে। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন কেন আর ঘোরাঘুরি করিবে, এখানে এসে বসে যাও; যদি তাঁর কথা রক্ষা করিতে পারিতাম, তবে নিজেই ধন্য হইতাম। কিন্তু আমার সে সৌভাগ্য হইল না।

গত পত্রে লিখিয়াছিলাম 'ধনিক শ্রমিক সমস্যা'র ঠিক ভাষান্তর হিন্দীতে না করিলেও উহার ভিত্তিতে হিন্দী নিবন্ধ লিখিতেছিলাম—লেখা শেষ করাই হয় নাই এখনো। যদি কখনো হয় তাঁহাকে দেখানো হইবে না। তবু তোমাকে দেখাইলেও আমার ক্ষোভ কিছু মিটিতে পারে। তিনি তো অনেক-কিছু বলিলেন ও রাখিয়া গেলেন। তাই প্রচার করা আমাদের কার্য।

তুমি তাঁর উপযুক্ত উত্তর সাধক, কিন্তু তোমারও শরীর তো এই। শ্রীশ্রীনিত্য গোপাল নিত্যই তোমায় প্রেরণা ও শক্তি প্রদান করিতেছেন আমি বিশ্বাস করি। আশ্রম যে ভাবে চলিতেছে তাঁর ইচ্ছা হইলে স্বামীজীর অবর্ত্তমানেও তেমনি চলিবে। অথবা যদি এভাবে না চালাইতে চান, তাই হউক। আমার বিশ্বাস যত দিন যাবে স্বামীজীর অমূল্য গ্রন্থরাজি এবং শ্রীশ্রীনিত্য গোপালের বাণী ক্রমশঃ লোকে হৃদয়ঙ্গম করিবে। আমি মনে প্রাণে তোমাদের কাজে সংশ্লিষ্ট আছি কিন্তু আমার দ্বারা কিছুই হইতেছে না। নিজ আরব্ধ কার্য্য অগ্রসর হয় না। শ্রীভগবানের যন্ত্র তো হইতে পারি নাই—কেবল তাঁর দিকে চাহিয়া রহিয়াছি মাত্র, বা তাহাও হইতেছে না।······

তোমরা সকলে আমার গভীর সমবেদনা হৃদয়ঙ্গম করিবে নিশ্চয়। ৺সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে হারাইবার পর এই আমার আরেক মহাগুরু নিপাত হইল। স্বামীজীর পুত্রকন্যাও আমার সহানুভূতি জানিবে! দেশের এ ক্ষতি অপূরণীয়।

শুভচিন্তক সতীশ গুহ

৬৪।১ মায়ারপুর রোড
পোঃ আলিপুর
কলিকাতা। ৮।৪।৫৮ মঙ্গলবার

কল্যাণবরাস্থ,

স্বামীজির মৃত্যু সংবাদে যারপরনাই মর্ম্মাহত হইয়াছি। তিনি একাধারে আমার গুরু ও বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নিকট আমি অত্যন্ত উপকৃত। তাঁহার মহাপ্রয়াণে আমি যে কি হারাইলাম তাহা ভাষায় প্রকাশের যোগ্য নহে। আমি কলিকাতার বাহিরে ছিলাম। গতকল্য ফিরিয়া আসিয়া তোমার পত্র আমার হস্তগত হইল। গত রবিবারের সভায় সেজন্য উপস্থিত থাকিতে না পারায় মনে আরও অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিলাম এবং আমার স্বামীজির প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি জনিত অপরাধের গ্লানি অনুভব করিতেছি। তাঁহার প্রিয়জনের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। আমার স্ত্রী এখনও কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন নাই। আশ্রমের কোনও সময়োচিত কার্য্যে

আশ্রমে যাইয়া তাঁহার প্রিয়জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা রহিল। মধ্যে মধ্যে আশ্রমের সংবাদ জানাইলে বিশেষ বাধিত হইব। ইতি

মর্ম্মাহত

শ্রীমন্মথ নাথ দাস।

পোঃ নবগ্রাম, হুগলী

৪-৪-৫৮

স্নেহের রেণু,

কাল কাগজ খুলিয়াই হঠাৎ স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের সংবাদে মর্মাহত হইলাম। নিত্যগোপালময় জীবন, নিত্যগোপালের ক্রোড়েই শান্তিলাভ করিয়াছেন—ধন্য তিনি! তাঁহার নিকট প্রচুর স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ আজীবন পাইয়াছি, কিন্তু আজ দুঃখ রহিয়া গেল যে তাঁহার কাজে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করিতে পারি নাই।

তোমাদের সংবাদাদি জানাইলে একটু শান্তিলাভ করিব। আর কি লিখিব। আর কিছু লিখিতে পারিতেছি না। তোমাদের স্নেহ হইতে বঞ্চিত না হই। ইতি

হতভাগ্য

জিতেন কুশারী

কোগ্রাম

২৫।১২।৬৪

মা,

তোমার চিঠি পেলাম। শ্রীমৎ স্বামীজী নিত্যলোকে গমন করিয়াছেন। তিনি ছিলেন দেশের অন্যতম অভিভাবক, নিত্য আশীর্ব্বাদক ও কল্যাণকৃৎ। তাঁহার অভাব সমস্ত জাতি ও সমগ্র দেশ অনুভব করিবে। তাঁহার নীরব তপস্যা দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তুমি ভক্তিমতী পুণ্যবতী, তোমার সাধন পথ জীবনপথ সব সময়েই শান্ত স্নিগ্ধ শুচি ও মনোরম থাকিবে। শ্রীভগবান তোমার শরণ ও সুহৃৎ। ভাবনার কিছুই নাই। ইতি

স্নেহধন্য

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

৫০।১, হিন্দুস্থান পার্ক
বালিগঞ্জ, কলিকাতা-২৯
শনিবার, ৭ ঘটিকা

কল্যাণীয়াসু,

এই মাত্র (শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা) তোমার পোষ্ট কার্ড খানিতে স্বামীজীর অকস্মাৎ তিরোধানের খবর পেয়ে দারুণ আঘাত অনুভব করলাম; তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হ'ল না—এর চেয়ে বেশি অনুতাপের বিষয় আমার নাই। তিনি যে গত রবিবার মহানির্ব্বাণ মঠে এসেছিলেন এ কথা আগে জানলে সেখানে নিশ্চয়ই উপস্থিত হ'তাম। তোমার পোষ্ট কার্ডখানি ৩ দিনে পেলাম। আমি ফোঁড়ায় অসুস্থ আছি। একাকী অতদূরে যেতে অক্ষম। চিঠিখানি আগে পেলে অফিসে খবর দিয়ে কোন ছাত্রকে ডেকে আনিয়ে কিছু একটা বন্দোবস্তের চেষ্টা করতে পারতাম। কাল রবিবার ছুটি; কাকেও পাওয়া কঠিন; এমতাবস্থায় তাঁর স্মৃতি ও শোক সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে তাঁর উদ্দেশে আমার হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারবনা বলে বেদনা বোধ করছি, তবে তোমাদের সকলের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগদানে আমাদের সকলের সমবেত শ্রদ্ধাঞ্জলি ঊর্দ্ধলোকে তাঁর পবিত্র ও মুক্ত আত্মার উদ্দেশে অর্পিত হোক—ইহাই মাত্র কামনা।

ভাবছি, "উজ্জ্বল ভারত"কে এখন চালাবে কে? কে ইহার আদর্শ প্রচার করবে নির্ভীকভাবে? ঊর্দ্ধলোক হতে তাঁর স্বর্গগত আত্মা আমাদের পথ দেখিয়ে দিন।

ওঁ শান্তি!

ইতি শুভার্থী
শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন

9, Allenby Road,
Calcutta-20
2. 4. 58

নমস্কার নিবেদন,

সংবাদপত্রে দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ অকস্মাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন। ইহাতে নরনারায়ণ আশ্রম, উজ্জ্বল ভারত এবং দেশের জনসাধারণের যে বিষম ক্ষতি হইল তাহা

বর্ণনাতীত। আশা করি আপনারা এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করিবার শক্তি পাইবেন। পরলোকগত আত্মা শান্তিলাভ করুন ইহাই কামনা করি। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসতেন্দ্রনাথ মোদক

Phone 46-1075

2 4-58

5 Janak Rd,

Calcutta-29

পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণু,

আমাদের শিক্ষক ও গুরুদেব শ্রীশ্রীস্বামীজির তিরোধানে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। গত রবিবার তাঁহার ওজস্বিনী ও উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ মঠে শুনিয়া আমার একটু ভয় হইতেছিল যে উহা হয়ত তাঁহার শেষ বাণী ও নির্দেশ সকলের প্রতি। গতকাল মঠে যাইয়া ঐ ভীষণ সংবাদ পাইলাম। স্বামীজির জীবন দেশের নিকট আদর্শস্থানীয়। তিনি আমার মাতুল ৺অশ্বিনীকুমারের ছাত্র ও ভক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেক স্মৃতি সভায় স্বামীজির বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইত। আমাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং বরিশালকে গভীরভাবে ভালবাসিতেন। তাঁহার ত্যাগ ও সেবা-ধর্ম ছিল উজ্জ্বল—তিনি নিজে আচরিয়া পরকে আচরণ করিতেন বলিতেন। স্বামীজি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় ছিলেন। তাঁহাকে একটি personality মনে করিনা, তিনি একটি institution by himself.

তোমার ও শ্রীমতী প্রতিভাদির মনের ভাব কতকটা অনুমান করিতে পারি। তোমাদের উপর তাঁর নরনারায়ণ আশ্রম রক্ষার গুরুভার পড়িল—তিনি আনন্দধাম হইতে আশীর্বাদ করিবেন ও বল দিবেন।

আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ নিও।

আশীঃ

শ্রীজিতেশ চন্দ্র গুহ

(অধ্যক্ষ, দেশবন্ধু কলেজ)

২-৪-১৯৫৮

অকাল নিবাস

বারাকপুর রোড,

পোঃ—বারাসত

কল্যানীয়াসু

সংবাদপত্রে স্বামিজীর তিরোভাবের সংবাদ শুনিয়া মর্মাহত হইলাম। তাঁহার মত বিদ্বান্ বাগ্মী ত্যাগী বিপ্লবী সন্ন্যাসী আর একজন নাই। সর্ব-বিষয়েই তিনি অগ্রগণ্য। সর্বোপরি তাঁহার প্রেম—সকলের জন্যই তাঁর উদার হৃদয়ে আদরের স্থান ছিল। এইরূপ একজন প্রেমিক কর্মবীরের সংস্পর্শে আসিয়া ধন্য হইয়াছি—তাঁহার অভাব মর্মান্তিক পীড়া দিতেছে।

এই প্রতিষ্ঠান সকল থাকিবে কিনা তজ্জন্য উদ্বেগ বোধ করিতেছি। সম্প্রতি তোমরা শোকে অভিভূত। অনেক চিঠি পত্র লিখিতে হইবে। কয়েকদিন পরে অবসর মত জানাইও, প্রতিষ্ঠান চালাইবার কী ব্যবস্থা হইল। তুমি একাকী অত্যধিক পরিশ্রম করিলে শয্যাশায়ী হইবে। ইতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

২০।২ বি, ফরডাইস লেন

কলিকাতা—১৪

৩রা এপ্রিল, ৫৮

কল্যানীয়াসু,

*   *   *

আমি আশৈশব মামার স্নেহাশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আসিয়াছি এবং শেষ পর্যন্তও তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করিয়া নিজেকে অনুগৃহীত মনে করিয়াছি। আজ তাঁহার অভাব তীব্র ভাবে অনুভব করিব, তবে ক্ষেদ করিবার কিছু নাই। তিনি যথা সময়ে পরলোকে গমন করিয়াছেন।

মামার অবর্ত্তমানে তোমার উপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হইল। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তুমি যেন সে ভার বহন করিতে পার।

তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। ইতি

আশীর্ব্বাদক

শ্রীমনোরঞ্জন বসু

রায়গঞ্জ পোঃ
(পশ্চিম দিনাজপুর)
৫।৪.৫৮

পরম স্নেহাস্পদাসু,

আজ সকালে দৈনিক বসুমতীতে দেখলাম গত ১লা এপ্রিল স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতজী যখন মহানির্ব্বাণ মঠে কিছু ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তখন হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন ও পরে দেহত্যাগ করেন। সংবাদে খুবই মর্ম্মাহত হয়ে পড়েছি। একজন পরম বৈষ্ণব, প্রেমিক, সাধক ও আদর্শবাদী দেশভক্তের মহাপ্রয়াণে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তাঁর চিন্তায় চিন্তিত একটি গোষ্ঠী সৃষ্টির চেষ্টা তিনি করছিলেন—আপনিই এখন সেই গোষ্ঠীর ও সংঘের প্রাণ স্বরূপা। আপনার স্বাস্থ্য খুব ভাল না। আপনার উপর যে গুরুভার অর্পিত হলো—ভগবান তা বহন করার শক্তি দিন এই প্রার্থনাই তাঁর চরণে জানাই।

আপনার অবস্থা অনুভব করতে পারছি। আপনাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা ও শক্তি আমার নাই। স্বামীজীই তাঁর জীবনাদর্শের মধ্যেই আপনাকে সে শিক্ষা দিয়েছেন—যার বলেই আপনি এই সংকটকালে ধৈর্য অবলম্বন করতে পারবেন। ভগবানের বিধান অলংঘনীয়—তা আমাদের মেনে নিতে হবেই, গত্যন্তর নেই।

আপনি, বৌদি ও শ্রীমান সত্যব্রতরা কি শেষ সময়ে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন? আমার শরীর খুব ভাল নয়। কলিকাতা যেতে পারি। গেলে যাবো দেখতে আপনাদের। আশাকরি শরীর ভাল। ইতি—শুভার্থী

নিশীথনাথ কুণ্ডু

পোঃ বঙ্গীগাছী
৩।৪।৫৮

কল্যাণীয়াসু,

রেণু, ৩১ তারিখে তোমার চিঠি দেখিয়া স্বামীজী সম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলাম। পরে কাল খবরের কাগজে তাঁহার তিরোধানের খবর পাইয়া

মর্মাহত হইলাম। তিনি ঐ রবিবার সকালেই আমাকে বলিয়াছিলেন, 'আর হয়ত দেখা হইবে না'—কথাটা যে এইভাবে সত্য হইবে ভাবি নাই।

স্বামীজীর জীবনে—মৃত্যুসময়ে নিত্যগোপালের কথা স্মরণ করিতে করিতে অজ্ঞান হইলেন—ইহা পরম লাভ। যাঁহার ধ্যানে, যাঁহার দর্শন অনুসরণ করিয়া স্বামীজী সারাজীবন কাটাইলেন, শেষমুহূর্তে তাঁহাকেই স্মরণ করিতে করিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন—ইহা এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সাধারণ লোকের জীবনে এইরূপ ঘটেনা।

স্বামীজী গিয়াছেন, কিন্তু অনন্ত কর্মভার রাখিয়া গেলেন তোমার উপর। তোমার স্বাস্থ্যও ভাল নয়, ভগবানের কছে প্রার্থনা করি, তুমি সেই ভার বহন করিবার মত শক্তি অর্জন কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

মাখনবাবু (সুবোধ সেনগুপ্ত)

৪১।৩৫বি, চারু এভেনিউ,কলিকাতা-৩৩

৯।৪।৫৮

সুচরিতাসু,

রেণু, তোমার পত্র পাইলাম। স্বামীজীর সংবাদ জানিয়াছি। দীর্ঘদিনের প্রেরণার স্মৃতিজড়িত তাঁহার সঙ্গে। তোমার মধ্যে তাঁহার বাণী ও সাধনা রূপ লাভ করুক।

রবিবার অবশ্য যাইতাম, কিন্তু পূর্ব হইতে ঐদিনে আটকা আছি। শ্রদ্ধা নিবেদনে আমি তোমাদের সঙ্গেই আছি। প্রীতি গ্রহণ কর। ইতি

শুভার্থী

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

শ্রদ্ধেয়াসু,

শ্রীমৎ স্বামীজীর তিরোভাবের পরে এই দিনগুলিতে কাছাকাছি থাকতে চাইলেও শরীর আমার সায় দিচ্ছে না। তোমার অন্তর্দেবতা তোমাকে শক্তি দেবেন। একান্তভাবে স্বার্থের দিকে চেয়েই বলতে হয়, যখন স্বামীজীর কাছ থেকে বেঁচে-থাকার প্রেরণা নিয়ে আসছিলাম, তখনই বাগুইআটির পথে অন্ধকার নেমে এলো। অথচ স্বামীজী বিশ্বের প্রতিস্থানে আরও জীবন্ত

ভাবে নিজেকে ব্যাপ্ত করে দিলেন। ক্ষুধার অন্ন চাই। ইহা সত্য। প্রাণের ক্ষুধা মানুষকে আরও কাতর করে দেয়। সে ক্ষুধায় সবাই অন্ন যোগাতে পারে না।

কিছুদিন পূর্বেও জানা ছিল না যে স্বামীজী আমার জীবনকেও ধন্য করেছেন, প্রেম ও স্নেহ দিয়ে। তাঁর অদর্শন আজ আমায় পীড়া দিচ্ছে। আশা ও সাহসের মহৎ আশ্রয় ও অবলম্বন লুপ্ত হয়ে গেল। বাগুইআটি গ্রাম আজ মহাপুরুষের সমাধি বক্ষে নিয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছে। ২ বৎসর পূর্বে যেন এরই আয়োজন হয়েছিল। ভগবান নিজেই তাঁর প্রিয়জনের প্রত্যেকটি প্রয়োজন মিটিয়ে দেন। নিজের অভাব-দুঃখের কথাই এতক্ষণ বলেছি। তোমার মর্মভেদী হাহাকার কি শুধু দিগন্তে মিলিয়ে যাবার জন্য? ইতি ৩।৪

* * * *

শ্রীমৎ স্বামীজীর তিরোধানের পর সাতটি দিন কেটে গেছে। তিনি ছিলেন, তিনি নাই এবং তিনি আছেন। এই তিনটি facts নিয়ে আমাদের তৃপ্ত থেকে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। দেশবন্ধুনগর গ্রামটি দেখতে দেখতে একদিন একটি তীর্থস্থান হয়ে উঠবে। আর তা যে হবে-ই, তার খবরও কাল পেলাম। সর্বশ্রেণীর নরনারীর শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। সেইটুকু আমাকে মুগ্ধ করেছে, আশান্বিতও করেছে। স্বামীজীর সাধনা জয়যুক্ত হয়েছে।

স্বামীজী যাবার কয়েকটি মাস পূর্বে আমাকে কিন্তু ধন্য করেছেন, কৃতার্থ করেছেন। তাঁর আশ্রমের কি হবে, একা রেণু মিত্র কি ক'রে চালাবেন, এ-সব নিয়ে চিন্তার কিছু নাই। ঠাকুরের আশ্রম, ঠাকুরই চালাবেন। এই তো জানি।

হেমাঙ্গপদ বরাট

৭।৪

আপিস - বুধধার, ৯ ৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

যে রবিবার স্বামীজী মহানির্বাণ মঠে বক্তৃতা দেবার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন, সে সংবাদ কাগজে দেখিছি, তারপর তাঁর মহাপ্রায়ণের সংবাদও কাগজে দেখি তখন আমি দেশে।

আমি গত পরশু সোমবারে এখানে এসিছি। আপনার ৩।৪ তারিখের পোষ্টকার্ড সোমবারেই বোধহয় সেখানে পৌছেচে ও কাল মঙ্গলবারে আমার ছেলে এখানে নিয়ে এসেছে। তাতে দেখলাম যে আপনারা স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে গত রবিবারে এক সভার আয়োজন করেছিলেন। সময় মত চিঠি পেলে অন্তত এই সভায় উপস্থিত থাকতে চেষ্টা করতাম। যাইহোক সভায় উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর তিরোধানের সংবাদ পাওয়া থেকে রাতদিনই তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

তাঁর অভাবে আপনাদের আশ্রমের, ও বিশেষ করে আপনার, কি অপূরণীয় ক্ষতি হল বুঝতে পাচ্ছি। সেই সঙ্গে মহানির্বাণ মঠেরও কম ক্ষতি হয় নি, কারণ ঠাকুর জ্ঞানানন্দ দেবের এত বড় সার্থক শিষ্য ও তাঁর মত ও পথের ধারক আর কেউ আছেন কি না জানি না।

আপনার জন্যেও আজ আমার খুব দুঃখ হয়। সমস্ত ত্যাগ করে শুধু মাত্র যাঁর চরণ আশ্রয় করে এতদিন ছিলেন তিনি আজ নেই। এ "নেই" যে আপনার কাছে কত বড় "নেই", তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পাচ্ছি।

আপনার শরীর এখন কেমন ?

ভগবান আপনাকে শক্তি দিন এই প্রার্থনা করি।

নিবেদন ইতি—

বিনীত শ্রীরাজেন্দ্র নাথ মিত্র

15 College Square,
Calcutta—12
5-4-58.

কল্যানীয়াসু,

স্বামীজীর নিত্যলোক প্রাপ্তির সংবাদ সংবাদপত্রে দেখিয়া আমরা সবিশেষ মর্মাহত হইয়াছি। সাধুমহাপুরুষের মৃত্যুতে শোক নাই জানি, তথাপি আমাদের মন মানিতে চাহে না। বাঙালী তাঁহাকে চিরকাল মনে রাখিবে এবং সমগ্রদেশবাসী, বিশেষ যাহারা তাঁহাকে জানিতেন, আপনাদের শোকের অংশ গ্রহণ করিবে জানিবেন। ইতি—

মণি বাগচী

৬ বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন,
কলিকাতা—১২
২।৪।৫৮

সবিনয় নিবেদন,

দেশকর্ম্মী, সমাজসেবী, বরিশালের জননায়ক পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের তিরোধান সংবাদ পাঠে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি ছিলেন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, দেশমাতৃকার সাধক, তাঁহার মহাপ্রয়াণে বঙ্গমাতা নিশ্চয়ই দীনবেশ-ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার ত্যাগের আদর্শ ও জ্ঞানের দীপ্তি দেশবাসী চিরকাল স্মরণ করিবে। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। মহাপ্রাণ নিত্য গোপালের গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি দিব্যধামে চলিয়া গেলেন। তাঁহার অমর আত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চিরশান্তি লাভ করুক—ইহাই প্রর্থনা। ইতি—

শোকসন্তপ্ত
শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ

কলিকাতা
২।৪।৫৮ ইং

সুচরিতাসু,

আজ আনন্দ বাজার পত্রিকায় আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ সংবাদ পড়িয়া মর্ম্মাহত হইলাম। আপনি সময় মত পোষ্টকার্ডটি না লিখিলে হয়তো তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইত না। স্বামীজীর অভাবে আশ্রমের ও 'উজ্জ্বল ভারত' পত্রিকার সমস্ত গুরু দায়িত্ব আপনার স্কন্ধেই পতিত হইল। এখন আপনার নিজের স্বাস্থ্যের সবিশেষ যত্ন নেওয়া অপরিহার্য্য।

স্বামীজী পরিণত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন এবং কিছুমাত্র রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন নাই। ভগবান পুরুষোত্তম আপনাকে স্বামীজীর আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার শক্তি দিন এই প্রার্থনা জানাইতেছি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপুরঞ্জীকাক্ষ প্রসাদ দেবশর্ম্মা

Ramtanu Bhawan
Hyderpur,
P. O. Malda,
4-4-58.

মাননীয়াসু

রেণুদি, 'যুগান্তরে' পরম শ্রদ্ধাভাজন গুরুদেব স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর পরলোকগমন বার্ত্তা পাঠ করিয়া শোকগ্রস্ত হইলাম। তাঁহার অনুপম চরিত্র, বাগ্মিতার ও বিদ্যাবত্তার কাছে সকলেই নতশির ছিলেন। আর আমি তাঁর সুমধুর আন্তরিক ও সরল ব্যবহারের কাছে চিরজীবন কেনা রহিয়া গেলাম। তাঁর অসমাপ্ত কাজ আপনি সমাপ্ত করুন।

আপনাদের
শ্রীরাধাচরণ দাস

পলতা
শনিবার

সুচারিতাসু

রেণু ভাই, খবরের কাগজে স্বামীজীর তিরোধানের সংবাদ পড়িয়া অবাক হইয়া গিয়াছি। এত আকস্মিকভাবে এত তাড়াতাড়ি গেলেন যে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না। আমি তাঁকে এই সেদিন দেখিয়া আসিয়াছি, সেই দেখাই প্রথম ও শেষ তাহা কে জানিত? মনে হইয়াছিল যেন কোনো পরমাত্মীয়ের কাছে গিয়াছি. অসুস্থ শরীরেও আমাদের খানিকটা পথ আগাইয়া দিলেন। শেষ কথা বলিলেন 'পুনরাগমনায়'। প্রণাম করিলাম সেই শেষ প্রণাম। খবর পড়িয়া মনটা এত খারাপ লাগিত না হয়ত যদি না তাঁর সঙ্গে দেখা হইত এবং অমন আন্তরিক ও সস্নেহ ব্যবহারটি পাইতাম।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে কতখানি ক্ষতি হইল সেটা অনুভব করিবার খুব শক্তি আমার নাই, তবুও বাংলাদেশ আজ যে অবস্থার মধ্যে আছে তাতে তাঁর মত অভিভাবকের অভাব ঘটা দুর্ভাগ্য, একথা স্বীকার সকলকেই করিতে হইবে। তোমার যে তিনি কতখানি ছিলেন তাহা অনুমান করিতে পারি, একাধারে পিতা ও গুরুকে হারাইয়া যে মানসিক অবস্থায় আছ—তাহাতে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা। তবু জানি ক্ষীণদেহের মধ্যে যে অজেয় শক্তি ভগবান তোমাকে দিয়াছেন, তাহা সমস্ত রকম অবস্থাতেই তোমাকে দুর্বল হইতে দিবে না। অনেক কাজ

নিয়া জড়াইয়া আছ, শরীরও এত খারাপ, আমাদের ভাবনা তবু হয়ই। এখন কেমন আছ, সব খবর দিও সুবিধামত। প্রতিভাদিও নিশ্চয় খুব আঘাত পাইয়াছেন। যিনি তাঁর বিরাট ছায়া দিয়া তোমাদের সকলকে আড়াল করিয়া ছিলেন, তাঁর অভাবকে সুসহনীয় করিয়া তুলিতে সময়ের দরকার হইবেই।

প্রতিভাদিকে প্রণাম দিও। তুমি অনেক প্রীতি ও ভালবাসা নিও।

ইতি—

পুণ্যপ্রভাদি

P. O. Dinhata
(Cooch-Behar)
7-4-58.

শ্রীরেণু মিত্র, এম, এ

সম্পাদক—নরনারায়ণ আশ্রম

দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা

স্নেহের বোন রেণু মিত্র,

আনন্দবাজার পত্রিকায় আমাদের পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের গত ১লা এপ্রিল অকস্মাৎ তিরোধান সংবাদে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়ি। এই দুঃসংবাদে আমার অন্তরে বাহিরে একটা দুর্বলতার ভাব লক্ষ্য করিতেছি এবং আমার দৈনন্দিন কাজ-কর্ম্মে কেমন যেন নিষ্ক্রিয়তার ভাব আসিয়া পড়িয়াছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে সৌভাগ্যক্রমে ২টি মাত্র দিন কয়েক ঘণ্টার জন্য তাঁর সান্নিধ্য লাভ আমার ঘটে। ঐ সামান্য কয়েক ঘণ্টাই আমার জীবনের মহামূল্য সময় হইয়া থাকিবে। তাঁর "শ্রীশ্রীগীতার" প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার মাধ্যমে জ্ঞানগর্ভ উপদেশগুলির কথা ভুলিতে পারিব না এবং বিদায়ের পূর্ব্বে তাঁর গাঢ় আলিঙ্গনের স্মৃতি আমাকে মুগ্ধ ও ধন্য করিয়া রাখিয়াছে।

আজ নরনারায়ণ আশ্রমের যাবতীয় ভার আশ্রমবাসী ও আশ্রমের বাহিরের গুণমুগ্ধ সমস্ত ভাইবোনদের উপরেই আসিয়া পড়িল, যার কর্ণধার হইয়া এই ছোট বোনটি দাঁড়াইয়া আছে অবধূত মহারাজের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সকল রকম দুর্ব্বলতার অন্ধকার দূরে চলিয়া যাইবে এবং কর্ত্তব্যের রাস্তা সরল সহজ ও আলোকিত হইবে।

আশ্রমের ও আশ্রমের বাহিরের শোকসন্তপ্ত ভাই-বোন, মা, ভগ্নীদের

সকলকেই আমার সমবেদনা জানাই এবং পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের পবিত্র স্মৃতির প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

ভাগ্যহীন—
শ্রীসতীশ চন্দ্র পাল

Jabalpur,
9-4-58

শ্রদ্ধাস্পদাসু,

গতকল্য আপনার কাছ থেকে একখানা কার্ড পেয়ে আমাদের পরমারাধ্য স্বামীজীর তিরোধানের সংবাদে যে কতদূর মর্ম্মাহত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না। আমার সাথে মাত্র অল্প দুদিনের দেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সাথে দুদিনের দেখাতেই তিনি যে আমায় কতখানি কাছে টেনে নিয়েছিলেন আজ তাঁর অভাবে সেই স্মৃতি বিশেষভাবে অনুভব করছি। এ মাসের শেষ সপ্তাহে ১ মাসের ছুটি নিয়ে কোলকাতা যাওয়ার সংকল্প করেছিলাম এবং তার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল আপনাদের নূতন আশ্রমে গিয়ে কিছুদিন থেকে স্বামীজীর এবং আপনাদের সান্নিধ্য লাভ করা। কিন্তু এমনি আকস্মিকভাবে তাঁর তিরোধানের সংবাদ এসে পৌঁছাবে তা কখনও ভাবি নি। তাঁকে হারিয়ে আপনারা যে কতখানি অসহায় হলেন, তা শুধু আপনারাই উপলব্ধি করছেন। আমার নিবিড় সহানুভূতি ও সমবেদনা জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি।

ইতি—
ক্ষিতীন রায়

P. O. & Dist. Murshidabad,
4 4-58.

My dear Renudi,

That Luminous star has fallen. The sun has set and light goes out. It no longer burns.

The sad demise of Sreemat Swami Purushottamananda was catered to us through the local dailies three days back. We have been passing in morning. It is

more than the family bereavement. He was more than a preceptor, more than a teacher, more than a father in all the traditional sense of the terms. The shock is immeasurable. It is something unbelieveable that Swamiji is no longer with us.

We owe an infinite and incalculable debt to him. How can we repay it? The onus of responsibility has fallen on you, but no less on us also. * * *

Yours sincerely,
Chunilal Mitra.

প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
কলিকাতা

প্রীতিভাজনেষু,

আজ আপনার কার্ড পাইলাম। স্বামীজির এরূপ আকস্মিক তিরোধানে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আর দেখা হইল না। আপনিও বড় নির্ভর হারাইলেন। ভগবান আপনার প্রাণে শান্তি দিন।

ভবদীয়
শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ

স্বপ্নসায়র   ১৬, বিপিন পাল রোড, পোঃ কালীঘাট,
কলিকাতা-২৬
২৫, ৪, ৫৮

কল্যাণীয়াসু

তোমার ৪ তারিখের চিঠির উত্তর আজ দিচ্ছি এতে তোমার অনুযোগ করবার যথেষ্ট কারণ আছে—কিন্তু আমার সন্তোষজনক কোনো কৈফিয়ৎ নেই। একটা মাত্র কারণ স্বামীজী মহারাজের তিরোধান সম্পর্কে আমি বিশেষ চিন্তা করছিলাম, তোমার এই প্রচণ্ড ও অপ্রত্যাশিত শোকে কি সান্ত্বনা দেবার আছে তা স্থির করতে পারছিলাম না।

তোমার বিনা নিমন্ত্রণেই আমি স্মৃতিবাসরে উপস্থিত হ'ব ঠিক করেছিলাম, কিন্তু প্রতাপদাকে যখন টেলিফোন করলাম তখন তিনি বেরিয়ে গেছেন তোমাদের আশ্রমের দিকে—কাজেই একা আর যাওয়ার সুবিধে হল না। সেজন্য আমার দুঃখও কম নয়।

আমি জানি তোমার উপর যে দুর্বহ ভার এসে পড়ল—সে ভার বহন করবার শক্তি যিনি সর্বশক্তির আধার তিনিই দেবেন—তাছাড়া তোমার উপর গুরু মহারাজের আশীর্বাদ পূর্ণমাত্রায় আছে। তুমি দীর্ঘ দিন নিজের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চয় করে এসেছ—তোমার ক্ষীণ দেহ এতদিন যে কঠোর ব্রত পালনেও অবসন্ন হয়নি, শুধু আত্মিক শক্তিতে তোমাকে অনেক সঙ্কটে রক্ষা করে এসেছে—আজ তোমার জীবনের সেইত অমূল্য পাথেয়—আমি আশীর্বাদ করি তুমি তোমার গুরুর অসমাপ্ত কাজ গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করে প্রসন্নতা লাভ কর।

শ্রদ্ধার নামই বিশ্বাস। সে বিশ্বাস তোমার আছে। যিনি সর্বদা তোমার সম্মুখে ছিলেন—বাহিরের দৃষ্টিতে তাঁর আজ দেহাবসান ঘটেছে, কিন্তু অন্তরের দৃষ্টিতে তিনি আজ সম্পূর্ণ প্রকাশমান। মৃত্যু তাঁর চারিদিকে আজ অনন্ত অবকাশ রচনা করেছে—সেখানে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই—তাঁকে যেমন হারিয়েছ তেমনি লাভও করেছ। তিনি আছেন—তোমার সর্ব কর্মে, সকল চিন্তায়, সমস্ত সাধনায় নিজেকে বিস্তার করে আছেন—এই বিশ্বাসই তোমাকে শক্তি দেবে—এরই নাম শ্রদ্ধা—এরই নাম আত্মনিবেদিত সাধনা। তুমিত এসব জান—তোমাকে বেশি বলা আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

আশাকরি শারীরিক কুশলে আছ। নরনারায়ণ আশ্রমের কল্যাণ কামনা করি—তোমার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করি।

যদি সুযোগ করতে পারি একদিন যাব।

তোমার পোষ্টকার্ড খানা সভার দিনের ২ দিন পরে পেয়েছিলাম—কাজেই তুমি বিশ্বাস করো—নিমন্ত্রণপত্র না পেলেও আমি যেতাম।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

"কর্ম্ম যাহার চোখে পড়িয়া নেশার সৃষ্টি করে না, কর্ম্ম যাহাকে আকর্ষণ করে না, সে কি কাজ করিবে? কর্ম্মের 'ডাক' কানে না পৌঁছিলে কি কাজ করা যায়? কেহ কাহাকেও বলিয়া বলিয়া কাজ করাইতে পারে না। চাই কর্ম্মে রস লাগা। শিশু যেমন মাকে ডাকে, কর্ম্মও তেমনি কর্ম্মীকে ডাকে। 'আমাকে কর, আমাকে কর'—এই আহ্বান কর্ম্মের কাছ হইতে প্রতিনিয়ত আসিতেছে। ইহাও ভগবানের আহ্বান। ভাবুকের কাছে এই ডাক পৌঁছায় না। তাই তাহারা খুঁজিয়াও কর্ম্ম পায় না। এ কি হয়? বেকার হয় একটা মনোবৃত্তির ফলে। ভাবুকের কাছে কর্ম্ম মৃত, কর্ম্মে কোন সাড়া দেয় না। যে পুরুষোত্তম-শরণাগত, কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি তিনই তাহার কাছে জীবন্ত মূর্ত্তিতে সাড়া জাগায়।"

—পুরুষোত্তমানন্দ

—ডাইরী, ১০ই মার্চ, ১৯৫৮

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(১)

তিরোভাব না আবির্ভাব

॥ শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় ॥

'ধরার ধূলি হোক ব্রহ্মধূলি, ধরার মানুষ হোক ব্রহ্মমানুষ'—বলছিলেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ। কিন্তু কি ক'রে?—না প্রতি বস্তুকে ব্রহ্মমূল্যে যাচাই ক'রে তার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দান করলে। আকাশের ভগবানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভারত আজ মুক্তি তথা মোক্ষ পথের যাত্রী। সবাই তাকিয়ে আছে উৎগ্রীব হ'য়ে কবে সেই বৈকুণ্ঠে যাব। সেই ওপারে যেখানে অনন্ত সুখ ও শান্তি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তো মিথ্যা—কেবল ব্রহ্মই সত্য। ফলে আমাদের ঘর গেছে ভেঙ্গে, সমাজ গেছে প'চে—দুর্নীতি দুরাচারে দেশ গেছে ছেয়ে, বিদেশী দস্যুরা বারংবার হানা দিয়ে এই পারলৌকিক শান্তিপ্রিয় জাতিকে দ'লে নিষ্পেষিত ক'রে গেছে—কেড়ে নিয়েছে ধনসম্পদ, নারী; হত্যা করেছে শিশুদের রক্তের প্লাবনের মধ্যে। তবু ভারত সেই সত্ত্ব গুণের কৌলীন্যকে আঁকড়ে ধরে আছে। বজ্র নির্ঘোষে বলে উঠলেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ—ভুল হ'য়ে গেছে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায়, তপস্যায়, দর্শনে; মারাত্মক ত্রুটী হ'য়ে গেছে। সে ভুল বেদান্ত উপনিষদ কিম্বা পুরাণে নয়—ভুল হয়েছে বোঝবার বোঝাবার মধ্যে। সে ভুল ধরে ফেলেছেন কায়স্থ-কুলতিলক, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভাশালী, পরম যোগৈশ্বর্য্যবান ভগবান শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেব। তাঁরই জীবনদর্শনের মধ্যে ফুটে উঠেছে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বলভারতের স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার ভার নিয়ে এসেছেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ—আজীবন ত্যাগী, অক্লান্ত কর্ম্মী, অলৌকিক প্রতিভাধর, দৃঢ়চিত্ত, শ্রেষ্ঠ বাগ্মী, নিত্যগোপাল দেবের সার্থক শিষ্য ও ভক্ত—ভারতের দ্বিতীয় বিবেকানন্দ। আমরা শুনে এসেছি চিরকাল থেকে "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে"। তীব্র প্রতিবাদের স্বরে ব'লে উঠলেন স্বামীজী—না না ছাড়িয়া

যাইব না—কবে তৃষিত এ মরু গড়িয়া তুলিব তোমারি রসাল নন্দনে। চাই একটা বিপ্লব ভারতীয় দর্শনে, চিন্তাধারায় একটা আমূল পরিবর্ত্তন, দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন। চাই না আমরা আকাশের ভগবানের ঐশ্বর্য্য ও শাস্তি—মানিনা মানিনা সেই কেন্দ্রগত বৈকুণ্ঠের ভগবান যিনি আমাদের শাসন এবং শোষণ করেন—চাই আমরা বিকেন্দ্রীভূত ভগবানকে যিনি জগন্নাথ, জগতের—প্রকৃতির প্রজার—দুয়ারে ভিখারী, যিনি আমাদের পোষণ করেন। রাধারে ভজিয়া যিনি রাধাবল্লভ, জগৎকে ভজিয়া তিনিই আজ জগন্নাথ। তিনি আসছেন—আসছেন কি এসেছেন—কান পেতে শোন তাঁর পায়ের ধ্বনি—"তোরা শুনিসনি কি শুনিসনি তাঁর পায়ের ধ্বনি—সে যে আসে আসে আসে।" নদীয়ার অদ্বৈত মহাপ্রভুর সেই দুস্তর তপস্যা, তুলসী গঙ্গাজলের সঙ্গে অশ্রুজল মিশিয়ে সেই কঠোর আরাধনা "হে বৈকুণ্ঠবিহারী, হে ভূভার-হারী, এসো এসো, নেমে এসো এই কাতর ক্লিষ্ট কলির জীবের সামগ্রিক কল্যাণ বিধানের জন্য। ধরা আজ নিপীড়িত, বেদনার্ত্ত ; তার করুণ ক্রন্দন কি তোমার রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত এখনো পৌঁছায়নি ? থেকোনা তুমি অত দূরে, উঁচুতে আকাশে—নাগালের বাইরে। নেমে এসো ধরার ধূলিতে আমাদের সুখ দুঃখ বেদনার ভাগ নিতে এস। তাই নদীয়ায় গোরাচাঁদের উদয়—ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন গোরা জগতে ফেলিল ঢালি। আবার এই যুগে ভগবান নিত্য-গোপালদেবের সেই পরমাশ্চর্য্য বাণী ধ্বনিত হয়ে উঠলো স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের কণ্ঠে "নেমে এসো হে বিধাতা এই ধূলিমলিন পাপতাপ জর্জ্জরিত পৃথিবীর বক্ষে—আমাদের সুখে দুঃখে বেদনায়, আমাদের শাক অন্নের ভাগ নিতে।" তুমি আমাদের সৃষ্টি করেছ—আমরাও তোমাকে সৃষ্টি করেছি। গর্ব্বীর ভাষায় we shall create our own god. আমরা আছি তাই তো তুমি ভগবান—আমরা যখন নাই তখন তুমিও নাই। যেমন বৃন্দাবনে সকল অত্যাচার, সকল দুর্নীতি চূর্ণ ক'রে শোষণমুক্ত সমাজ গঠন ক'রেছিলে, সকল নিপীড়িত নরনারীর মুক্তি বিধান ক'রেছিলে—হীন দরিদ্রতম প্রাণীও তোমার আনন্দ রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়নি, তেমনি ক'রে আমরা গড়ে তুলবো তোমার রাজ্য শোষণমুক্ত পোষণধর্ম্মী। কোথায় পাপ কোথায় পুণ্য ! পাপকে হজম করতে পারলেই তা পুণ্য। কামের বিকৃতিই পাপ, কামকে divine করতে পারলেই তা প্রেম। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তথা স্বামী বিবেকানন্দ জগতে যে সমন্বয়ের বাণী প্রচার করলেন, সে হলো সর্ব্ব

ধর্ম্মের সমন্বয়—যত মত তত পথের ; কিন্তু স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর গুরু শ্রীনিত্যগোপাল দেবের যে সমন্বয়ের বাণী জগতের সামনে তুলে ধরলেন সে হ'লো সর্ব্বক্ষেত্রের সকল বস্তুর সকল মতের সকল তত্ত্বের সকল সমস্যার সমন্বয়। বুদ্ধ ও শঙ্করের মূলে যে সমন্বয়, সর্ব্বমানুষের সম্পর্কের মধ্যে যে সমন্বয়, ধনী নির্ধনে, সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যে, নিত্য ও অনিত্যে, জড় ও অজড়ে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মতত্ত্বে, রাজনীতি ও ধর্ম্মে এবং সংখ্যাতীত ক্ষেত্রে যে সমন্বয়ের মূল সূত্র স্বামীজী ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন, তার মধ্যেই আছে আজিকার হাইড্রোজেন বোমা-ভীত পৃথিবীর বাঁচবার পথ।

বিশ্বশান্তির মূল সুর আছে এর মধ্যে। ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্যই দেবে সেই পরম মঙ্গলের ইঙ্গিত, যে মঙ্গল সমগ্র বিশ্বের। স্বামীজীর জীবন, কর্ম্ম, সমস্তই প্রচলিত রীতি নীতি—যা বিশ্ব সমস্যার সমাধানে অক্ষম—তারই তীব্র প্রতিবাদ। গৈরিক পরিধান করিয়াও তিনি সন্ন্যাস কৌলীন্যের ঘোরতর বিরোধী। গৈরিকের আড়ালে—কায়েমী স্বার্থ স্থাপন ক'রে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে সমাজ শোষণ এবং পরমানন্দে হালুয়া রাবড়ী ভোজনের ধাপ্পা তিনি ধ'রে ফেলেছেন। দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে—নচেৎ এক কণাও অন্ন গ্রহণ করায় কারো অধিকার নেই—সাধু সাবধান! এই তাঁর বাণী। নারী নরকের-দ্বার, দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী এই প্রচলিত ভারতীয় ভাবধারাকে স্বামীজী তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। নারী যদি মায়ার প্রতীক হয়, তবে সে, মায়ার যোগমায়া হবার আপত্তি কোথায় যে মায়া ব্রহ্মের সংযোগ-সেতু? আগে রাম পরে লক্ষ্মণ মধ্যে সীতা—সীতার আড়ালে রাম দেখা যায় না কিন্তু মাঝে মাঝে যায় যখন সীতা একটু সরে যান। সনাতন শাস্ত্রবেত্তারা বললেন—মায়ার বন্ধন না কাটলে ব্রহ্ম পাবে না। শ্রীনিত্যগোপাল বললেন—ব্রহ্ম যদি অনন্ত হন প্রকৃতি বা মায়াও অনন্ত। অতএব? অতএব মায়াতীত হওয়া অসম্ভব। মীমাংসা? যোগমায়া! কি অপূর্ব্ব সমন্বয়। বরিশালের যে শরৎ ঘোষ পলিটিক্যাল প্লাট ফর্ম্ম থেকে উদাত্ত কণ্ঠে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর কর্ণে স্বাধীনতার বাণী, ভারতের মুক্তির বাণী একদা পৌঁছে দিয়েছিলেন, সেই শরৎ ঘোষই আজ ধর্ম্মজগতে আনলেন বিপ্লব, চিন্তার বিপ্লব, বিশ্বসভায় ভারতের স্থান নির্ণয়ের প্রেরণা—স্বামী বিবেকানন্দের অসমাপ্ত কর্ম্মধারাকে সমাপ্তির পথে অগ্রসর কর্ব্বার প্রচেষ্টা—কণ্ঠে তাঁর মাভৈঃ মন্ত্র। তাঁর বাণী কেবল মাত্র চিন্তা ও পাণ্ডিত্যের

বিলাস মাত্র নয়, তাঁর জীবনই একটা বিরাট কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান। প্রতি কথার সঙ্গে তাঁর কাজের মিল! অতি অদ্ভুত এই অবধূত। যাঁরা অতি নিকট থেকে তাঁকে পর্য্যবেক্ষণ কর্ব্বার সৌভাগ্য পেয়েছে কেবল তারাই জানে আর জানবে ভারতের তথা জগতের লোক ভাবীকালের মধ্যে। তাঁকে দেখে যদি প্রথমে কেউ মনে করে নেয় এক বিরাট প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্যের একটী শব্দকোষ—নীরস রুক্ষ সন্ন্যাসী, তবে তিনি বঞ্চিত। নারকেলের কঠোর আচরণ দেখে তিনি ফিরে গেলেন। রস ও শাঁস অজ্ঞাত রয়ে গেল। যারা ফিরে গেলনা তারা পেল আর এক আশ্চর্য মানুষকে—এক প্রাণোচ্ছল ভাবুক, কবি, মানব-প্রেমিক, দরদী, মরমী, হাস্য পরিহাস-প্রিয়, শিশুর মত সরল এক প্রাণকে, যে প্রাণ মানবের দুঃখে কাঁদে, সুখে হাসে, চির-লাঞ্ছিতা-দ্রৌপদীর কথা বলতে গিয়ে চোখের জলে যার বুক ভেসে যায়। বাবা আবু বেন আদম তুমি কি ঈশ্বরকে ভালবাস—না আমি মানুষকে ভালবাসি। দেবদূত স্বর্ণাক্ষরে ভক্ত শ্রেষ্ঠ বলে আবুর নাম লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেই আবু বেন আদমকে আমরা কালস্রোতের আবর্ত্তনে পেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে, পেয়ে আবার হারিয়েছি। "পেয়ে মাণিক হারালাম মা আমি অতি লক্ষ্মীছাড়া।

এক মহান জীবন নাট্যের অভিনয় হয়ে গেল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগরী কলকাতায় যার শেষ অঙ্কের যবনিকা উঠলো কলকাতার উপকণ্ঠে এক ক্ষুদ্র অখ্যাত পল্লী বাগুইআটিতে। এখানকার ক্ষুদ্র-স্বার্থ সঙ্কীর্ণতা দলাদলি বিভেদ সব চূর্ণ করে দিয়ে এক রাজপথ সৃষ্টি করে গেলেন যা চিরদিন তাঁর পুণ্যস্মৃতি বহন কর্ব্বে। এই মহান জীবনের এখানেই পরিসমাপ্তি! কিন্তু সমাপ্তি কি সত্যই আছে? সেই দীর্ঘদেহ, সুন্দর, সদাহাস্যময়, ভাবঘন রস ও প্রাণধর্ম্মে-উজ্জ্বল মহাপুরুষ ঐ নরনারায়ণ আশ্রম-প্রাঙ্গনে "জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি বিরাম" তেমনি চির বিশ্রাম লাভ কচ্ছেন। রণক্লান্ত সৈনিক আজ রণক্ষেত্রে শয়ান—তাঁর সিংহ-গর্জন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর আজ স্তব্ধ! তাঁর মুখে বেদান্তের ভাষ্য আজ ভাষাহারা। ভাগবতের সেই ললিত মধুর বাণী, সেই "শুক-মুখাদমৃত দ্রবসংযুতং রসমালয়ং বাক্যং" আর ভাগবত রসিক ভাবুকেরা অহোরহ পান কর্ব্বেনা, আর মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথীর গীতা শ্রবণ-গোচর হবেনা। তবে এই কি তিরোভাব—মহাপরিনির্ব্বাণ—প্রবল নদীধারা মরুপথে পথ হারিয়ে গেল? না হারায়নি—হারায় মনে করে প্রাণ হায় হায় করে ওঠে

মাত্র। কোন কল্যাণধর্ম্মের বিনাশ নেই। পুরুষোত্তমানন্দ তাঁর জীবনকে ভারতের পুণ্যধূলির অণু-পরমাণুতে মিশিয়ে দিয়ে গেলেন—রেখে গেলেন তাঁর চিন্তা ও দর্শনের বিপ্লব, আকাশে বাতাসে তাঁর ভাবধারার চাপ ভাবিকালে যা ফলে ফুলে বিকশিত হয়ে মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করবে। তাই তাঁর মহাপ্রয়াণ বা তিরোভাবই আমাদের জাতীয় জীবনে পরম আবির্ভাব। জয় হিন্দ্।

(২)

।। শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ ।।

(পুরুলিয়া, মানভূম)

আমাদের সুদীর্ঘকালের অন্তরঙ্গ সুহৃদ, দেশপ্রেমিক, কর্মযোগী, জননায়ক শ্রীপুরুষোত্তমানন্দজীর তিরোধানে অন্তরে গভীর দুঃখ ও আঘাত পাইলাম। মুক্ত পুরুষ তাঁহার নিকট এই যাওয়া আসা দুইই সমান। যাহাদের তিনি ফেলিয়া গেলেন তাহারা আজ পুণ্যময় স্মৃতির মন্দিরে বসিয়া তাঁহার জাগ্রত জীবনের স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা ও ক্ষতি বহন করিতেছে।

আজ তাঁহার তিরোধানের শোকতীর্থে বসিয়া বহু পুরাতন দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে! সেই উদার মহিমাময় জীবনের অতি-সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্যময় এক জীবনের ইতিহাস অন্তরে উদ্ভাসিত হইতেছে! অনাবিল ব্যক্তিগত স্নেহ ভালবাসার পুণ্যবারি বিতরণের সঙ্গে গঙ্গার প্রাণবন্যা ধারায় যেদিন তাঁহার বাগ্মী প্লাবনে আমাদের গ্রামসহর দিকে দিকে প্লাবিত হইয়াছিল, —সেদিনকার সেই অবিস্মরণীয় ইতিহাস আমাদের সহস্র সহস্র মানুষের ভাবোন্মাদ চিত্তের স্মৃতিপটে আজও চির-জাগরুক হইয়া আছে।

নবভারতের মহাউত্থানের ইতিহাসে শ্রীশরৎকুমারের প্রেরণাময়ী অবদান এক অভিনব বৈশিষ্ট্যে চির উজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। তপস্যাময় ভারতের পুণ্যময় ইতিহাসে কর্মযোগী শ্রীপুরুষোত্তমানন্দের সাধন-জীবনের পবিত্র পদচিহ্ন আমাদের জন্য নিত্য উজ্জ্বল পাথেয় হইয়া থাকিবে।

আজ স্মৃতির তীর্থে বসিয়া তাঁহার পবিত্র আদর্শময় জীবনের কথা, তাঁহার ত্যাগ ও তপস্যার কথা, তাঁহার মনীষা ও প্রজ্ঞার কথা, তাঁহার অনাবিল প্রীতি ও করুণার কথা অন্তর দিয়া স্মরণ করি। তাঁহার শোকসন্তপ্ত

পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি। তাঁহার অমর আত্মার প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

(৩)

স্মরণী

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

অনেক মানুষ দেখি : এ পৃথিবী মানুষেতে ভরা ;
তবু মন ক্লান্ত বড়, পায়নাক খুঁজে
এমন একটি প্রাণ, একটি হৃদয়,
যার কাছে তৃপ্তি মেলে ; কাছে এলে মন খুশি হয় ;
মুছে যায় রিক্ততার গ্লানি :
ধূসর ধরিত্রী বুকে শ্যামল শস্যের হাতছানি।

পুরাণ পৃথিবী আজ গরীয়সী ঐশ্বর্যবিলাসে ;
জ্ঞানের ভাণ্ডার নিত্য ভরে ওঠে,
স্ফীত হয় অর্থের পেটিকা ;
মস্তিষ্কের সঞ্চালনে উদ্ভাবন নিত্য নব নব ;
গ্রহান্তরে ছুটে যেতে প্রয়াসী এ বিংশ শতাব্দীর
উচ্চাকাংক্ষী উন্মত্ত মানুষ !

হৃদয় হারিয়ে গেছে : যে হৃদয় ভালবাসে,
যে হৃদয় বেদনায় কাঁদে,
আর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হাসে ;
যে হৃদয় বুকে টেনে নেয় ;
যে হৃদয় বারে বারে হতাশা-বিহ্বল প্রাণে
অমৃত আস্বাদ এনে দেয় !

এমন একটি প্রাণ, একটি হৃদয়
ছিল এ নিভৃতি-ঘেরা একান্তে, তবুও জ্যোতির্ময় ;

আত্মার আলোকে দীপ্ত, তার কাছে কেহ পর নাই,
যে এসেছে একবার, বিশাল হৃদয় মাঝে
সমাদরে পেয়ে গেছে ঠাঁই।

স্পর্শ টুকু কণামাত্র যে পেয়েছে তাঁর,
সে ছুটে এসেছে বারবার।
সে স্পর্শ অমৃতময়—এ দেহের সীমানা ছাড়িয়ে
যেখানেতে মরু-মন কাঁদে শুধু বিফলতা নিয়ে,
সেখানে সে এনে দেয় জীবনের পরম আশ্বাস :
'পূর্ণের' পরশ পেয়ে 'অংশ' মাঝে পূর্ণের বিকাশ।

সে হৃদয়, সেই প্রাণ হারিয়ে সে গেল একেবারে ;
হারাল কি ? সীমা ভেঙ্গে ছড়িয়ে সে গেল চারিধারে।

(৪)

স্বামীজীর সংস্পর্শে কয়েক মুহূর্ত

॥ শ্রীমীরা গঙ্গোপাধ্যায় ॥

আজ আমরা সবাই মিলিত হয়েছি শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রদ্ধাবাসরে। আমাদের অন্তরের বিপুল আকর্ষণে আমরা দূর বহুদূব হ'তে সবাই মিলিত হয়েছি সেই মহান পুরুষের মহাপ্রয়াণ পীঠে। স্বামীজীর সমাধি তীর্থের তীর্থযাত্রী আমরা। আজ তাঁর কথায় শুধু মন প্রাণ ভরে আছে। তিনি যে কত সুন্দর কত মহান কতখানি সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন, তা তাঁর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা খুব ভাল ভাবেই জানেন। আমারও তাঁর সঙ্গলাভ করবার সৌভাগ্য হয়েছিল—কিন্তু তাঁর সময়ের গণ্ডী ছিল বড় কম, মাত্র পনের মিনিট। আমি স্বামীজীকে দেখতে এলাম, যাঁর নামই শুধু এতদিন শুনে এসেছি। কম্পিতবক্ষে এগিয়ে গেলাম—কত প্রশ্ন এসে ভীড় করল মনের দরজায়, কি বলবেন তিনি—কেমন তিনি—এমনি কত সব। কি দেখব, কিভাবে দেখব সেই অতীত বিপ্লবী বর্ত্তমান যুগ-সাধক স্বামীজীর মধ্যে ?

কিন্তু আমার ভুল ভাঙ্গলো তখনই। অনিন্দ্যসুন্দর দেহবল্লরী গৈরিক তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের ছটায় ঘর আলোকিত করে স্বামীজী বসে আছেন। পরিধানে গৈরিক বসন, যে আসনে অধিষ্ঠিত স্বামীজী তাও গৌরিক রঙে রঞ্জিত, আর দেহের বর্ণটিও গৈরিক, সব মিলে ত্যাগের এক পূর্ণরূপকে যেন দেখতে পেলাম আমি। পাশেই ছিল স্বামীজীর গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের চিত্রপট। আমি দেখছিলাম একবার স্বামীজীর দিকে, একবার নিত্যগোপালের চিত্রপটের দিকে, মনে হচ্ছিল কে সত্যি ইনি—না তিনি? অর্থাৎ নিত্যগোপাল ও স্বামীজীর মধ্যে কোন তফাৎ ছিল না—দেহে বর্ণে দুয়ে মিলে আমাকে বিভ্রান্ত করে তুললো! অদ্ভুত মিল গুরু-শিষ্যের। শ্রীভগবান যেন একই ছাঁচে গড়ে পাঠিয়েছেন পর পর দুইটি সংস্করণ আমাদের মধ্যে শান্তির ললিত বাণী শোনাবার জন্য। প্রণতা আমি ধন্য হলাম তাঁর স্নেহময় শীতলস্পর্শে। এখনও আমার মধ্যে যেন সেই শীতল স্নেহস্পর্শের অনুভূতি তরঙ্গিত হচ্ছে। জানি না তিনি আমার অন্তরের আকুতিপূর্ণ এই শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছেন কিনা। যখন শুনলাম স্বামীজী তাঁর ইহলৌকিক বসন ত্যাগ করে পরলোকের পথে যাত্রী হয়েছেন, তখন কি যে মনের অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশযোগ্য নয়। স্বামীজীর নশ্বর দেহের লয় হ'বার পর তাঁর অমর আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চির অমর হলেন। দুর্ভাগ্য আমাদের যাঁরা তাঁর দৈহিক-সঙ্গচ্যুত হলাম, তাঁর মুখ-নিসৃত অমৃতময় বাণী থেকে বঞ্চিত হলাম! কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে তাঁর অনুরক্তদের পাশে এসে সর্বদাই তিনি তাঁর মঙ্গলস্পর্শে সত্য শিব ও সুন্দরের পথে তাদের পরিচালিত করবেন। তাঁর স্নেহের আঙ্গিক হ'বে আরো প্রশস্ত, আরো ব্যাপক।

স্বামীজীর উদ্দেশ্যে বলি—হে পুরুষোত্তমানন্দ, আপনি আমাদের সত্যিকার মানুষ করে তোলবার জন্য যে মহৎ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন তা যেন আপনার স্নেহ-ভাজনদের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ'তে পারে। এখন আপনি আমাদের স্পর্শবহির্ভূত এক জগতের অধিবাসী। কিন্তু সেখান থেকেই আপনি আমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন; আমাদের অন্তর-মথিত শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করুন। আপনি তো বুঝতে পারছেন আপনার শোকে আমরা কত ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। আমরা আশা করি আপনার স্নেহদৃষ্টি চিরদিন আমাদের প্রতি বর্ষিত হবে। আপনার প্রদর্শিত পথে যেন আমরা মানুষের মত অগ্রসর হ'য়ে জগতের যত গৃহহারা কল্যাণহারা পথহারা মানুষদের ভাই বলে আলিঙ্গন

করতে পারি, তাঁদের পথ দেখাতে পারি ; আপনার প্রদত্ত বাণীগুলির নির্দ্দেশে জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারি। আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি আমরা। আপনার মঙ্গলময় অনুভূতিস্পর্শধারায় স্নাত হোক আমাদের আত্মা।

প্রণাম প্রভু, প্রণাম আপনার শ্রীচরণে।

(৫)

॥ শ্রীনিশিকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

—(Secretary for Education and culture in Azad Hind Government, Principal of Azad School, Penang-Director Genl. of Secret Service Training Camp : etc)

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের আকস্মিক মহাপ্রয়াণে তাঁর পরিচিত সকলেই আমরা মর্মাহত, বিশেষতঃ তাঁরই প্রতিবেশী উদ্বাস্তু শিবিরের অধিবাসীবৃন্দ। সাধারণ বাঙ্গালীর আয়ুস্কালের তুলনায় স্বামীজীর বয়েস হয়েছিল যথেষ্টই, তবু যে তাঁর তিরোধানে আমাদের প্রাণে তীক্ষ্ণ এমন ব্যথা বাজে তার কারণ, যে গভীর ধ্যান জ্ঞান ও বিবিধ বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহায়ে—সর্বোপরি জাতির বর্তমান অবস্থা দেখে উদ্‌বেগ-আকুল অথচ অচঞ্চল অবিক্ষুব্ধ ধ্যান-সমাহিত মনে বিপদ উদ্ধারের ও নবজীবন লাভের অভ্রান্ত পরিকল্পনা 'উজ্জ্বল ভারত' মারফত মাসের পর মাস তিনি এঁকে রেখে যাচ্ছিলেন—তারই কথা মনে করে তাঁর অভাবটা আজ এত পীড়া দিচ্ছে। তাঁর কাছে যে কথা ছিল, তাঁর যে জীবন ছিল—সে কথা সে জীবন আজকের মানুষের বড় দরকার—এইটে বোধ করেই বড় বেদনা পাচ্ছি। এই দরকারের বোধ হয়েছিল বলেই তাঁকে একদিন বলেছিলাম আপনাকে আরও দশ বৎসর বেঁচে যেতে হবে। খুব আশা ছিল তাঁর কাছ থেকে জাতি আরও কিছু পাবে। কিন্তু ঘটে গেল অন্যরকম। তাঁর অবর্তমানে তাঁর কথা কি করে চলবে তেমনি নিখুঁত, তেমনি বলিষ্ঠভাবে ? আমি বিশ্বাস করি স্বামীজীর সতর্ক নির্বাচিত এবং তাঁদ্বারা দীক্ষিত অনুপ্রাণিত ও সযত্নে শিক্ষিত এমন কয়েকটী স্নাতক তিনি তৈরী করে রেখে গেছেন, যারা পারবে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের জীবনব্রত চালিয়ে নিতে যদি তারা পায় এই দুর্দিনে জাতির প্রকৃত কল্যাণকামী

মনীষীজনের একান্ত সহানুভূতি ও সহযোগিতা। শত অভাবের মধ্যে থেকেও স্বামীজী-নির্দেশিত পথে অটল দৃঢ় পরিক্ষেপে তারা যে চলতে পারবে, তার অবিসংবাদী বহু সাক্ষর রয়েছে গত কয়েক বৎসরের উজ্জ্বল ভারতের সমুজ্জ্বল পৃষ্ঠায়। এ বৃদ্ধের তাদের প্রতি প্রাণভরা আশীর্বাদ তারা এগিয়ে যাক স্বামীজীর কথা নিয়ে, ভয় নাই।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের তিরোধানের পাঁচ দিন পরে বাগুইআটিতে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত নিরিবিলি নরনারায়ণ আশ্রমে মহতি যে সভা হয় তাতে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত তাঁর গুণ ও প্রীতিমুগ্ধ খ্যাতিবান কয়েকজন বক্তা স্বামীজীর জীবনব্যাপী একনিষ্ঠ দেশসেবার মূল্যবান বহু তথ্যই উদ্ঘাটিত করেন। তেমন কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় আমার খুবই অল্পদিনের। তাঁর আশ্রমের অদূরে দেশবন্ধুনগরে চার পাঁচ বছর থেকেও তাঁর আশ্রম সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমি জানতে পারি নি। আশ্রমের কথা শুনেও তা দেখবার তেমন আগ্রহও আমার হয় নি। জাতির এই দুর্দিনে নিজের এই বৃদ্ধ বয়সেও ধর্মের আকর্ষণ আর নিজের মুক্তির প্রলোভন আমাব নেই। আমি কি জানতাম সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ব্যক্তিগত পারলৌকিক মুক্তির কথা বলেন না—বলেন জাগ্রত মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির কথা? তারপব এই মাস দুই আগে প্রতিবেশী জন দুই বন্ধুব সাথে যখন গেলাম অবশেষে তাঁর আশ্রমে, সাধারণ তাঁর চালাঘরে বসে প্রাণখোলা আলাপ আলোচনা হোল স্বামীজীর সঙ্গে—তখন বিস্ময় আর আনন্দের সীমা রইল না আমার। আমার যে সব কথা শুনে মুক্তিকামী ধর্মানুরক্ত লোক সচরাচর ধৈর্য্য হারান, তা শুনে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বিশাল বক্ষে—বললেন, সুস্থ সুব্যবস্থিত জীবন অবহেলা করে সত্য ধর্ম হয় না। আমার কেমন মনে হোল পুরাণো সত্যব্রতী মহান এক বন্ধু পেলাম আজ অপ্রত্যাশিতভাবে জানি না কোন্ সুকৃতির ফলে।

তারপর এই অল্প সময়ের মধ্যে ঘন ঘন অনেকবার তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। দেখেছি দারুণ অভাবগ্রস্ত ও নানা জটিল সমস্যা জর্জরিত শ্রম-বিমুখ উচ্ছৃঙ্খল আত্মবিস্মৃত তাই দ্রুত অধোগামী বাঙালীর মহা এই সঙ্কটের দিনে যখন দেখে আসছি যশ প্রভাব প্রতিপত্তিশালী এমন কি বিরাট ক্ষমতা ও দায়িত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি বিভ্রাট, ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থান্ধতা, সেইদিনে চমৎকৃত হয়ে দেখলাম ধর্মপন্থী হয়েও দুরূহ জাতীয়

সমস্যাদি সম্বন্ধে কি তাঁর উদ্বেগ, কাতরতা, আর কী বলিষ্ঠ সুস্পষ্ট আশাবাদী চিন্তাধারা! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আমি ঘুরেছি, বহু মানুষের সঙ্গে চিন্তার বিনিময় করে দেখেছি, আই, এন, এ-তে থাকাকালীন জাতির মুক্তির জন্য আপ্রাণ কাজ করার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমার হয়েছিল নেতাজী ও আরও অনেকের সাহচর্যে, দেশেও বহু চিন্তানায়কের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি, আরও অনেকের চিন্তাধারা তাঁদের বইতে পড়েছি—কিন্তু জীবনের সায়াহ্নে এসে যখন ক্লান্ত দুর্বল দেহ, তখন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজীর কাছে পেলাম এক অভূতপূর্ব বলিষ্ঠ সামঞ্জস্য।—সমস্ত দেহেমনে আমার আশাতিরিক্ত আনন্দ হল। তাঁর উজ্জ্বলভারতের প্রথম বর্ষ থেকে এই একাদশ বর্ষ পর্যন্ত সবগুলি বই আমাকে তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বর্তমানে অতি জরুরী ও বড়ই সরসতার চিন্তাধারা সমন্বিত তাঁর উজ্জ্বলভারত বইগুলো পাওয়ার পর থেকে গত মাসখানেকের বেশী সময় আমি অন্য কোন বই আর পড়ি নি—দাগ দিয়ে দিয়ে ঐগুলি পরিপূর্ণ তৃপ্তি নিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম, কারণ ছেলে বয়সে শ্রীঅরবিন্দের আওতায় এসে অবধি সুমহান যে বিপ্লবের আরাধনা করেছি সারা জীবন, তার সঙ্গে চমৎকার মিলে যায় স্বামীজীর অনেকগুলি চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্ত। নানা বিপর্যয় ও অভাবে ক্লিষ্ট দেহ আমার জীর্ণ হয়ে পড়েছে, কিন্তু মন তো আমার বৃদ্ধ হয় নি—তাই পুরুষোত্তমানন্দজীর কাছে গিয়ে দেখলাম দেশসেবার নিষ্ঠাপূর্ণ প্রয়াস—তাঁর উজ্জ্বলভারতের মাধ্যমে তিনি যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন—বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট ভাষায় যে বাণী প্রচার করছিলেন—বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় এবং আর কোন ব্যক্তি ঐ কাজে অগ্রণী হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। কিন্তু অকস্মাৎ অভাবিতরূপে তিনি চলে গেলেন। তাঁর আত্মার উদ্দেশ্যে পাঠাই আমার সৌহার্দ্যসূচক প্রণতি। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, সমস্ত প্রাণ দিয়েই বিশ্বাস করি বর্তমান দিগভ্রান্ত মানুষের কাছে পুরুষোত্তমানন্দজীর বলিষ্ঠ সামঞ্জস্যের এই চিন্তাধারা একদিন নিশ্চয় পৌঁছাবে।

(৬)

॥ জনাব রেজাউল করিম ॥

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের অন্তর্ধানে দেশের ভাগ্যাকাশ হইতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত

হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। তবুও তাঁহার মহিমা গরিমার কিছুটা পরিচয় পাইয়াছি তাঁহার বিবিধ রচনার মাধ্যমে। সেই জন্য তাঁহার প্রতি একটি গভীর শ্রদ্ধা অন্তরে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম। বর্ত্তমান যুগের তিনি একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ছিলেন। তিনি জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন নূতন চিন্তার আলো। পুরাতন কথাকে পরিবর্ত্তিত পরিবেশে নূতন করিয়া দেখাইবার ও বুঝাইবার তাঁহার ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। জাতির জন্য প্রয়োজনীয় কোন দিকটাই তিনি বাদ দেন নাই। আধ্যাত্মিকতা ও ঐহিকতা—এই দুই দিকের বিবিধ সমস্যার উপর স্বামীজী নূতন আলোক-পাত করিয়াছেন। এই মহান সন্ন্যাসীর অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত ছিল একটি অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রীতি। তাঁর সে স্বদেশ-প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি বরিশালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়। তিনি গান্ধীজির স্বরাজ আদর্শের মূল ধারাটি সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার রাজনীতি ছিল স্বাধীনতারও উর্দ্ধে। কেবল বিদেশীকে বিতাড়নই তাঁর স্বরাজের মূল কথা ছিলনা, দেশবাসীর মনের উন্নয়ন, চিত্তের উৎকর্ষ, চরিত্রের উন্নতি ও ধর্ম্মের বিকাশ —এই সব ছিল স্বরাজের উদ্দেশ্য। দেশবাসীর মনে স্বাবলম্বন শক্তির স্ফুরণ করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ না হইলে স্বাধীনতার কোন অর্থ হয় না। স্বামীজী এই প্রকার স্বরাজ চাহিয়াছিলেন আর সেই জন্য প্রথম জীবনে কঠোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন। স্বদেশের জন্য কারাবরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যদি তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি রাজনীতিতে নিয়োজিত করিতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজনীতি তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিলনা, তাই তিনি অন্যভাবে এবং সার্থকভাবে দেশের গণমানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কেমন করিয়া দেশের মানুষকে সত্যকারভাবে মানুষ করা যায় সেই চিন্তাই তাঁকে আকুল করিয়া তুলিল—তিনি দেশবাসীকে মানুষ করার ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁর সন্ন্যাসের কৌপীনের অন্তরালে বিরাজিত ছিল একটা বিরাট আদর্শ—সর্ব্বমানবের কল্যাণ।

তিনি সন্ন্যাসের ব্রত গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু এ সন্ন্যাসী কেবল কৌপীন-ধারী সন্ন্যাসী নন—এ সন্ন্যাসী আত্মমুক্তি-সন্ধানী সন্ন্যাসী নন। তিনি দেশের সর্ব্বশ্রেণীর মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য উৎসর্গিত-প্রাণ মহান সন্ন্যাসী। তিনি শ্রীনিত্যগোপালের আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহাকেই বাস্তবরূপ

দিবার জন্য নরনারায়ণ আশ্রম গঠন করেন। এই আশ্রম বিশ্বমানবতার নব মন্দির। এখানে সর্ব্বমানব এক মোহনায় দাঁড়াইয়া পরস্পরে মিলিত হইতে পারে।

আজ এই বিংশ শতাব্দীতে যখন জড়বাদী সভ্যতা মানুষকে পশুত্বের স্তরে নামাইয়া দিতেছে, যখন মানবতা পদে পদে লাঞ্ছিত ও পদাহত হইতেছে, তখন সেই সভ্যতার সামনে মহান আধ্যাত্মিক আদর্শের নূতন বাণী প্রচার করিয়া স্বামিজী সারা বিশ্বের কল্যাণের ও মুক্তির পথ আবিষ্কার করিবার জন্য আজীবন সাধনা করিয়াছেন এবং সে সাধনায় তিনি সাফল্যলাভ করিয়াছেন। তিনি কোনদিন রক্ষণশীল ছিলেন না। গতানুগতিকতার অচল পথকে আঁকড়াইয়া রাখিতে চাহেন নাই, তিনি ছিলেন সত্যকারের প্রগতি পন্থী। 'চলো চলো, এগিয়ে চলো'—উপনিষদের এই মহান বাণীর তিনি ছিলেন ধারক ও বাহক। তাই তাঁর বিবিধ রচনার মধ্যে আমরা পাই প্রগতিশীল মনের পরিচয়। তিনি ছিলেন প্রকৃত সমাজ-সংস্কারক। নূতনকে বরণ করিবার মত সৎসাহস তাঁহার ছিল। "উজ্জ্বলভারতে" তাঁর বহু প্রবন্ধ পড়িবার সৌভাগ্য হইয়াছে। এ সব প্রবন্ধ জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করিতে প্রচুর সহায়তা করিবে। উদারতা ও বিশ্বপ্রেম—এই দুইটি ছিল তাঁর সমস্ত শিক্ষার মর্ম্মকথা। আজ স্বামীজীর অন্তর্ধানে দেশমাতাই দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। স্বামীজী তাঁর আদর্শেব মধ্যে জাতির অন্তরে চিরজাগ্রত রহিবেন। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

(৭)

।। শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় ।।

বিগত ২৯শে মার্চ শনিবার (১৯৫৮) মহানির্বাণ মঠে শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের ১০৪তম জন্মোৎসব। শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দজী মহারাজ শিল্পমন্ত্রী শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে কথা কইছেন। প্রণাম করে যখন তাঁর পাশে বসলাম স্বামীজী মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার এবং এ বাটীস্থ সকলের সংবাদ নিলেন। সভা আরম্ভ হ'ল—স্বামীজী তাঁর সেই আবেগময়ী ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীনিত্যগোপাল-প্রচারিত

দার্শনিকতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। সভাভঙ্গে আবার যখন আমরা মিলিত হলাম স্বামীজী বললেন, আগামীকাল অর্থাৎ ৩০শে মার্চ রবিবার সভায় আসবেন, দেখা হয়ত আর নাও হতে পারে।

কোন অনিবার্য কারণে রবিবারের সভায় আমি যোগ দিতে পারি নি। শুনলাম সেদিনকার ভাষণের অন্তভাগে তিনি কেবলই তাঁর জীবনসর্বস্ব শ্রীনিত্যগোপালের নাম করেছেন, তাঁর পদপ্রান্তে আশ্রয় দেবার জন্য বার বার প্রার্থনা জানিয়েছেন। তাঁর অন্তরাত্মা হয়ত বুঝেছিল পৃথিবীর খেলা তাঁর শেষ হয়ে আসছে। বক্তৃতান্তে আলোচনাকালে তিনি কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং মঙ্গলবার প্রাতে তাঁর তিরোধান ঘটে। আজ কেবলই আপশোষ হয়—রবিবারের সভায় কেন গেলাম না। তাঁর কথা ভাবি আর মনকে নানা যুক্তি দিয়ে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করি—চোখের সামনে তিনি নেই, মরণশীল দেহ নিয়ে চিরকাল কেউ থাকে না, কিন্তু আমার ভাবনা রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে আছেন, দেহবন্ধন হতে মুক্ত হয়ে তিনি আমার আরও কাছে এসেছেন।

বয়স আমারও নিতান্ত কম নয়। জীবনপথে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে অনেক মানুষের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছে, কোন কথা মনে আছে, অনেক কথা কোথায় তলিয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে স্বামীজীর সঙ্গে আমার প্রথম যেদিন দেখা হ'ল আজও ভুলতে পারি নি। তাঁর সঙ্গে আমার কস্মিনকালে কোন পরিচয় ছিল না, প্রথম সাক্ষাতেই কিন্তু তিনি আমাকে একেবারে আপনজন করে নিলেন। সাংসারিক দুর্বিপাকে আমি তখন আর্ত। তাঁর স্পর্শে শোকের দুরন্ত জ্বালা ভুলে গেলাম, জীবনবীণা নূতন সুরে বেজে উঠল, আমার চিন্তাধারা একেবারে বদলে গেল। তারপর ১০ বছর কেটেছে, তাঁর সঙ্গে আমার কতবার দেখা হয়েছে, ঢাকুরিয়ার বাটীতে তিনি কয়েকবার রাত্রিতেও ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কতবার দেখা হয়েছে, কত ঈশ্বরীয় কথা হয়েছে, গীতার কোন কোন শ্লোকের অর্থ নিয়ে কত তর্ক করেছি, কিন্তু আমাদের মধুর সম্বন্ধ কখনও ক্ষুন্ন হয়নি। তাই আজ বড় দুঃখ হয় রবিবারের সভায় কেন গেলাম না, তিনি যে আমাকে বার বার যেতে বলেছিলেন। কিন্তু পরিচয়ের ঐ প্রথম দিনের কথা যখন মনে ভাসে, তখন সব দুঃখ ভুলে যাই, এক অপূর্ব প্রশান্তিতে দেহ মন ভরে যায়, মনে পড়ে—

নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের জীবন বহু বিচিত্র ঘটনায় পূর্ণ। রাজনীতি নিয়েই তাঁর পথ চলা সুরু, কিন্তু রাজনীতির পঙ্কিলতা কখনও তাঁকে স্পর্শ করে নি। তিনি বলতেন আমি রাজনীতি করি না, রাধানীতি করি। স্বামীজীর কাছে শ্রীরাধা ছিলেন সব রকম শোষণের মূর্ত প্রতিবাদ। রাজনীতিকে উপলক্ষ করেই তিনি তাঁর প্রথম জীবনে বাংলাদেশে এক নূতন ভাবোন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন।

স্বামীজীর জীবন-দর্শনে রাজনীতি কর্মনীতি ধর্মনীতি সমাজনীতি, সংসার ও সন্ন্যাসের মধ্যে কোন কোঠাভাগ ছিল না—জীবন একটা সামগ্রিক বস্তু। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন ব্যক্তিগতজীবন, পরিবারজীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রজীবন এক নূতন পথে যেতে চাইছে। এই নূতন পথের কথা তিনি বাংলাদেশের বহু সহরে বহু গ্রামে অন্তত ১৩।১৪ হাজার বক্তৃতার মধ্য দিয়ে বলে বেড়িয়েছেন এবং তাঁর উজ্জ্বলভারত পত্রিকার লেখার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় দুয়ারে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন। হাজার হাজার বক্তৃতায় যে কথা বলতে গিয়ে তিনি নিজে কেঁদেছেন, শ্রোতাদের কাঁদিয়েছেন, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন প্রাণবাদ।

সমগ্র বিশ্ব আজ একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা মানবসমাজে গড়ে উঠতে চাইছে এবং তা সম্ভব হবে যদি মানুষ মানুষকে ভালবাসে। এই ভালবাসা হৃদয়ের কথা, প্রাণের কথা। বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে পারে না। বুদ্ধি কেবল বিচার করে, বিশ্লেষণ করে, দূরে ঠেলে দেয়। হৃদয় দিয়ে ভালবেসেই মানুষ মানুষকে বুকের কাছে টেনে নেয়, প্রাণের স্পর্শেই মানুষ মানুষের কাছে আসে।

এ-ভাবধারা পৃথিবীর আকাশে বাতাসে এসে গেছে, বিভিন্ন ঘটনায় প্রকাশও পাচ্ছে। এই প্রাণবাদের অর্থই হ'ল ছোট বড় সব কিছুর যথাস্থান মান-মর্যাদা ও মূল্য দেওয়া, শোষণ বন্ধ করে পোষণকে প্রতিষ্ঠিত করা। এই পোষণধর্মী সামগ্রিক জীবনবাদকে দার্শনিক রূপ দেবার জন্যই তাঁর নরনারায়ণ আশ্রম, তাঁর উজ্জ্বলভারত, তাঁর চোখের জল আর বক্তৃতার গর্জন। ধর্ম-অর্থ-কামের ব্যাপারে কারো দ্বারা অপর কারো শোষণ স্বামীজী মেনে নিতে পারেন নি। ধর্মের ক্ষেত্রে ঈশ্বর সর্বময় কর্তা, জীব শুধু তাঁর

দাস—একথা তিনি মানেন নি। নরের আশ্রয় নারায়ণ, আবার নারায়ণের আশ্রয় নর—এই কথাই তিনি বলেছেন, তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের নাম 'নরনারায়ণ আশ্রম'। অর্থের ক্ষেত্রে এতদিনকার ধনিকের দ্বারা শ্রমিক শোষণ, বর্তমানের শ্রমিকের দ্বারা ধনিক শোষণ—তিনি মানেন নি। সমাজে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিম্নবর্ণের শোষণ, পুরুষের দ্বারা নারীর শোষণ, দর্শনের ক্ষেত্রে ব্রহ্মের দ্বারা মায়ার শোষণ—তিনি মানেন নি। প্রকৃতি-পুরুষের সমান মূল্য তিনি স্বীকার করেছেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসী জগতকে (মায়া, প্রকৃতি) অস্বীকার করলে কি হবে, জগৎ অস্বীকৃত হয় নি, পরিবর্তনের মধ্যেও জগৎ আছে।

স্বামীজী পরম ভাগবত। ভাগবত ধর্মে সন্ন্যাসের প্রয়োজন কোথায়? এ-দেশের মানুষ কিন্তু সন্ন্যাসের প্রভাব এড়াতে পারে নি, সাড়ে চারশত বছর আগেও না, আজও না। গৃহে থাকতে এদেশের মানুষ প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গকে চিনল না, তাঁর হরিনাম প্রচার শুনল না। যেই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন অমনি লক্ষ লক্ষ নরনারী ছুটল তাঁর পিছনে, যারা একদিন বিরোধিতা করেছিল তারাও এসে পায়ে লুটাল। তাই দুঃখ করে তিনি বলেছিলেন—

সন্ন্যাস কৈনু যবে ছন্ন হৈল মন।
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

স্বামীজীর মুখে কতদিন যে এ-পয়ার শুনেছি তার বোধ হয় সীমা-সংখ্যা নেই।

আরও একটী কথা স্বামীজীর মুখে শুনেছি বার বার। প্রত্যেক বক্তৃতার শেষে তিনি আবৃত্তি করেছেন ভাগবতের দুটী বিখ্যাত শ্লোক, যা থেকে তাঁর প্রাণের কথা বোঝা যায়, বোঝা যায় যে মুক্তির ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তিগত মুক্তি স্বীকার করেন নি। প্রথম শ্লোকটী ভক্তরাজ প্রহ্লাদের উক্তি—

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে॥ ভাগবত—৭।৯।৪৪

প্রায়ই দেখা যায় মুনিগণ মৌন হয়ে নির্জনে তপস্যা করেন, তাঁরা মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, তাঁরা পরার্থনিষ্ঠ নন, তাঁরা নিজের মুক্তি প্রয়াসী। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে, তাই বলেছেন প্রায়েণ। এই সব কৃপণদিগকে পরিত্যাগ

করে আমি কিন্তু মুক্তি চাই না, অথচ তুমি ছাড়া অন্য কোন শরণও তো দেখি না।

ভাগবতধর্মী নিজের মুক্তির জন্য ব্যগ্র নন। তাঁরা বিশ্বাত্মার উপাসক, বিশ্বকর্মী ; বিশ্বমানবের দুঃখ দুর্দশা উপেক্ষা করে কেবল তাঁরা নিজ মুক্তির জন্য সাধনা করেন না।

দ্বিতীয় শ্লোকটী রন্তিদেবের উক্তি :—

ন কাময়েঽহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তাং অপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাম্
অন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥

আমি ঈশ্বরের কাছে অষ্টসিদ্ধিযুক্ত পরাগতি চাই না, পুনরায় না-জন্মানও চাই না। আমি মানুষের অন্তরে স্থিত থেকে তাদের দুঃখের প্রপন্ন হব, যার ফলে তারা অদুঃখ হবে অর্থাৎ দুঃখ হতে মুক্তি পাবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিধ্বনি করলেন—

চাহিনা ছিঁড়িতে এক বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটী প্রাণী সাথে এক গতি মোর।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
একা আমি বসে র'ব মুক্তি-সমাধিতে ?

(৮)

॥ শ্রীহরেকৃষ্ণ প্রামাণিক ॥

ঊর্দ্ধ দেশে যেই আলো জ্বলে অনির্ব্বাণ
শাশ্বত সে মুক্ত-ধারায় নিত্য তব স্নান ;
　　রেখে গেলে সে আলোর ধারা প্রবাহিত
　　হৃদয়-গোমুখী তলে ছিল যা সঞ্চিত।
মোদের পথের পরে সম্পাতে তাহার
ছিন্ন হবে তমোজাল ঘন কুয়াশার ;
　　উষার উদয়ে নব আনন্দ সঞ্চারি'—
　　উদ্বোধিবে প্রাণ সেই সঞ্জীবনী বারি।

(৯)

বেদনার্ঘ্য

।। শ্রীপ্রতিভা রায় ।।

আকস্মিক ভাবে আমাদের জীবনে কি এক নিদারুণ বিপর্য্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। কেবলি মনে পড়িতেছে কি পাইয়াছিলাম, কিভাবে হারাইলাম। ২৭শে মার্চ্চ বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় কোন কার্য্যবশতঃ বাঁশবেড়িয়া রওনা হইবার কালে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজকে প্রণাম করিয়া বলিলাম আমি এখন আসি, তিনি বলিলেন এস। আর তো কিছুই বলিলেন না। সেই এস কথাটুকুই যে তাঁহার শেষ বাণী ইহা তো মনের অগোচর ছিল। বাঁশবেড়িয়াতে ১লা এপ্রিল সকাল ৯টায় স্বামীজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যব্রতর এক কার্ড পাইলাম 'রবিবার বক্তৃতার পর বাবা অজ্ঞান হন অবস্থা বহুক্ষণ অপরিবর্ত্তনীয় থাকায় পি জি হাসপাতালে দেওয়া হয়; এখন পর্য্যন্ত অবস্থা সঙ্কটজনক, সম্ভব হইলে চলিয়া আসিবেন।'

আমি তখনই ব্যাণ্ডেল হইয়া রওনা হইয়া বেলা ১২টায় কলিকাতা ৮এ রাসবিহারী এভিনিউতে পৌছি, কি শুনিব এই আতঙ্ক লইয়া উপরে উঠিলাম এবং সম্মুখেই রেণুকে দেখিলাম, শুনিলাম আমাদের সকল আনন্দের উৎস থামিয়া গিয়াছে। কয়েক মিনিট পরেই মহানির্ব্বাণমঠ হইতে মহা সমাধি-মগ্ন পুরুষোত্তমানন্দের দেহখানি লরিতে করিয়া তাঁহার প্রিয় নিত্যগোপাল নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে ৮এ রাসবিহারী এভিনিউতে আসিয়া দাঁড়াইল, সেখানে একটু নামানও হইল। কি দেখিলাম, অফুরন্ত যাঁহার কথা ছিল সে কণ্ঠ আজ নীরব। শ্রীনিত্যগোপালের জড়াজড় সমন্বয়ের বাণী যে কণ্ঠ বজ্র নির্ঘোষে হাজার হাজার মানুষকে শুনাইয়াছেন, মন্ত্র মুগ্ধের মত যে কণ্ঠ মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্তব্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই কণ্ঠ আজ নীরব, পোষণ-ঘন পুরুষোত্তমের বাণী লইয়া শোষণের বিরুদ্ধে যে কণ্ঠ একদিন বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জন করিয়া ছিলেন, সে কণ্ঠ আজ নীরব। তাঁহার প্রিয়তম নিত্যগোপালের সমাধির সামনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহার প্রাণ-দর্শন বলিয়া শ্রান্ত শিশুর মত নিত্যগোপাল চরণে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন! কি প্রশান্তি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল সে চোখে মুখে! অগণিত নরনারীর

সমস্যা-পীড়িত জীবনের বেদনায় যে মানুষ দিবানিশি ছটফট করিতেন 'খাইতে সোয়াস্তি নাই, নিদ নাই চোখে,' এই অবস্থা যাঁহার আমরা সর্ব্বদাই দেখিয়াছি, তিনি আজ প্রশান্তির কোলে চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন! যে মুখের বাণী বাংলার হাজার হাজার নর নারীর কর্ণ কুহরে আজও ঝঙ্কার দিতেছে, সে বাণী চির তরে নীরব হইয়া গিয়াছে! যে অভিনব অমৃতবর্ষী বাণী দিনের পর দিন ২৫ বৎসর ধরিয়া কাছে বসিয়া শুনিয়াও শুনিবার তৃষ্ণা মিটে নাই, সে কথা চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে ইহা ভাবিতে পারিতেছি না। ৮এ রাসবিহারী এভিনিউ হইতে দেহ বাগুইআটির পল্লী-আশ্রমে আনীত হইল। তিনি ছিলেন জন নায়ক, তাই তাঁহার তিরোভাব সংবাদে বাগুইআটির নর নারায়ণ আশ্রম লোকে লোকারণ্য। যিনি পল্লী বৃন্দাবন স্থাপনা করিবার জন্য সারা বাংলা দেশ ঘুরিয়া এই বাগুইআটির পল্লী-গ্রামে আসিয়াছিলেন, সেই বাগুইআটির মাটিতে তাঁহার পবিত্র দেহ রক্ষা করা হইল। তাঁহার পূত দেহ বক্ষে ধারণ করিয়া বাগুইআটি মহাতীর্থ স্থানে পরিণত হইল। পুরুষোত্তমানন্দ যখন বাগুইআটি আসিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলিয়াছিলেন আপনি কেন এই পাণ্ডব-বর্জ্জিত গ্রামে আসিলেন, আপনি কি এখানে থাকিতে পারিবেন? সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন 'পাণ্ডব আসিলেই তো ভগবান আসেন।' তাঁহার কথার তো এই অর্থ ই ছিল যেখানে ভক্ত আসেন সেখানেই তো ভগবান আসেন; আর ভগবান যেখানে আসেন সেখানেই তো বৃন্দাবন ধাম গড়িয়া উঠে। একথাও তিনি বলিয়াছেন, ঠাকুর সারা বাংলা ঘুরাইয়া এই পল্লীগ্রামে কেন আনিলেন তিনিই জানেন, এই ক্ষুদ্র গ্রাম যে একদিন বৃন্দাবন হইবে না কে বলিতে পারে? তিনি তাঁহার পবিত্র দেহ বাগুইআটির মাটিতে রক্ষা করিয়া বৃন্দাবনের ভিত্তি স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। আর পরস্পর প্রাণ-খোলা প্রীতির ভিতর দিয়া বৃন্দাবন গড়িয়া তুলিবার দায়িত্ব রাখিয়া গিয়াছেন নরনারায়ণ আশ্রমের সেবক সেবিকা ও বাগুইআটির জনসাধারণের উপর।

জড় এবং চৈতন্যের টানাটানির ভিতর পড়িয়া নাবিকহীন জীবন আমার যেদিন মৃত্যুপথের যাত্রী হইয়াছিল, সেইদিন পাইয়াছিলাম জড়াজড় সমন্বয় শ্রীনিত্যগোপালের জীবনদর্শনের প্রতিমূর্ত্তি পুরুষোত্তমানন্দের আশ্রয়। তিনি বলিয়াছিলেন—ভয় নাই, আমি আছি, থাকিব শত ঝঞ্ঝায়ও। কি অভয় বাণী তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন একাধারে পিতা-মাতা-বন্ধু-গুরু-

আশ্রয়দাতা। তিনি প্রথম দিনেই মাথায় হাত দিয়া বলিয়াছিলেন তোমার জীবনের সমস্ত বেদনা, সমস্ত ভার আমার উপর দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যাও। আমাকে সর্ব্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত রাখিবার জন্য কি প্রচেষ্টাই না তিনি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই স্নেহ-স্পর্শে তো সেদিন আমার জীবন জুড়াইয়া গিয়াছিল। তাঁহার সেই প্রথম দিনের অভয় বাণী তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে সাথীর মত সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। এই কুৎসিত সংসারের জটিল আবহাওয়া হইতে টানিয়া রাখিয়াছিলেন তাঁহার স্নেহময় কোলে, আজ আর সেই প্রত্যক্ষ স্নেহস্পর্শ পাইব না। তিনি বলিতেন এখন বুঝিতেছ না আমি কেমন করিয়া পক্ষীশাবকের মাতার মত ডানা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছি, একদিন বুঝিবে যেদিন আমি থাকিব না, এ সংসার কি ভীষণ স্থান। তাঁহার সেই অহৈতুকী স্নেহের মর্য্যাদা দিতে পারি নাই বরং কত বেদনাই দিয়াছি। তিনি ছিলেন অপরিমেয়! ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়া তাঁহাকে মাপিতে যাইয়া কত আছাড়ই না খাইয়াছি, কত আঘাতই না দিয়াছি! কিন্তু কি অগাধ স্নেহের, কি অপার ক্ষমার আধার ছিলেন তিনি, এমন কোন ভাষা নাই যাহা দ্বারা তাঁহার সেই কোমল প্রাণের কথা জানাই। তিনি ছিলেন মিলনপন্থী, মানুষকে যে তিনি মানুষ হিসাবেই দেখিয়াছেন, তাহার প্রকৃতির যত মলিনতাই থাকুক না কেন, তাহাকে তাঁহার স্নেহের কোলে টানিয়া লইয়াছেন এবং প্রাণপণে মানুষের জীবনের সকল মলিনতা ধুইয়া মুছিয়া তাহার স্বরূপকে ফুটাইয়া তুলিবার কি অক্লান্ত প্রচেষ্টাই না তিনি করিয়া গিয়াছেন। তিনি মানুষ মানুষ করিয়া কত কাঁদিয়া গিয়াছেন, আমরা মানুষ হই নাই।

পুরুষোত্তমানন্দ, আমাদিগকে মানুষ করিয়া দাও। তুমি বলিয়াছিলে 'আমি তো একদিন থাকিব না কিন্তু 'কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।' শ্রীনিত্যগোপালের জীবন দর্শন আমি কাহার নিকট রাখিয়া যাইব।' তুমি সেই গুরু দায়িত্ব অযোগ্য আমরা, আমাদের উপরই রাখিয়া গিয়াছ? তোমার দেওয়া দায়িত্ব বহন করিবার মতন জীবন দাও, শক্তি দাও। তুমি তো বলিয়া গিয়াছ শ্রীনিত্যগোপালের 'শরৎ, যখন যেখানে আছ আমি সঙ্গে সঙ্গে আছি,' 'ভয় কি টেনে তুলব' এই আশীর্ব্বাদ আমি তোমাদের জন্য বহন করিয়া আনিয়াছি, আমার যাহা কিছু সবই তোমাদের জন্য রহিল। তুমি সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছ এই কথা যেন কখনও ভুলিয়া না যা[illegible]

যদি ভ্রান্ত পথে পা বাড়াই, তুমি হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিও, কি আর বলিব। তুমিই তো বলিয়া গিয়াছ আমার কাছে কাহারও কিছু বলিবার প্রয়োজন ছিল না, তোমাদের কথা আমি এতই বুঝি যাহা তোমরাও বোঝ না, তোমাদের শুধু কাজ ছিল আমার উপর নির্ভর করিয়া, নীরবে সেবা করিয়া যাওয়াব। তোমার আদেশ পালন করিবার যোগ্য করিয়া লও এই আমার নিবেদন গ্রহণ কর।

প্রাণ-সাধক, তুমি বলিয়া গিয়াছ আমি নরনারায়ণ "আশ্রমে কিছুই রাখিয়া গেলাম না, আমার কিছু নাই, আমার আছে শুধু প্রাণ, তোমরা যদি পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া একপ্রাণ হইয়া থাকিতে পার তবেই এই নরনারায়ণ আশ্রম চলিবে। পেটের মধ্যেব ভ্রূণ যেমন মায়ের ভিতর হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ শ্রীনিত্যগোপাল-চরণে শরণাগত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছি প্রাণ লইয়া, এই প্রাণই বিশ্ব হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া নরনারায়ণ আশ্রমকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, তোমরাও যদি এই প্রাণসাধনা লও তবেই নরনারায়ণ আশ্রম রক্ষা হইবে। তুমি চোখের জলে বার বার বলিয়া গিয়াছ তোমরা এক-প্রাণ হও, এক-মন হও, একাত্ম হও। তুমি থাকিতে তোমার ইচ্ছা আমরা পূরণ করিতে পারি নাই, আজ এই শূন্যতার ভিতর দিয়া তোমার প্রাণ-সাধনা আমাদের জীবনে জয়যুক্ত হউক। নর-নারায়ন আশ্রমের সঙ্ঘ-জীবন গড়িয়া উঠুক, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, তোমার চরণে চোখের জলে আজ আমাদের এই নিবেদন।

(১০)

মহাপ্রয়াণে

।। শ্রীবিষ্ণুপদ রায় ।।

একি অকস্মাৎ বিদ্যুৎ পাত
উদার স্নিগ্ধ সুনীল গগনে—বাংলার ভাগ্যাকাশে !
কেহ ত ভাবেনি
কেহ ত জানেনি
সহসা সুনীল গগন ঢাকিবে ঘনান্ধকার
তমসাবৃত কালিমাখা মেঘে !

হায়!
আজিকে দিকে দিগন্তে নেহারি শোকাচ্ছন্ন
মসী আবৃত ছবি,
ম্লান মুখ, অশ্রু-সিক্ত ভকত বৃন্দের
করুণ আঁখিধার!
বিচ্ছেদ ব্যথার গভীর হাহাকার
জাগে হৃদয় মাঝে!
শ্রীহীন লাগিছে বিশ্বভূবন, শ্রীহীন তরুলতা।—

হে পুরুষোত্তমানন্দ,
নবীন আলোর বার্তাবাহক—
আজ কি দাবানল জ্বালালে বক্ষে মোদের
বিচ্ছেদ ব্যথার!

বিংশ শতাব্দীর মহাসংকট ক্ষণে,
বিভ্রান্ত মনে
আমরা তোমায় পেয়েছিনু
পথের পাথেয় ক'রে,—
পেয়েছিনু অসময়ের সাথী রূপে!

হায়!
একি করিলে
দিন না নিভিতে ফুরালো আয়ু!
কত কথা ছিল তব বাকী
ধরণীতে বলিবার,
কত আশা ছিল
মাটির মানুষের মাঝে হেরিতে নারায়ণে
ব্রহ্ম রূপে হেরিতে ধরার ধূলি!

আজ সকল জীবন ব্যাপিয়া শুধু
উঠিছে করুণ হাহাকার !
আজ তুমি নেই বলে
শ্লথ মম জীবন স্পন্দন, শ্লথ মম কান্না-হাসি।

হে পুরুষোত্তমানন্দ,
আজ কোন্ আঁধারের ক্রোড়ে
রাখিলে মোদের অসহায় জনে,
কোন্ অসমাপ্ত কর্মের মাঝখানে !

'এক বিশ্ব এক পরিবার'
রচিবার দুনিবার ছিল তব সাধ,
সে সাধ কে সাধিবে আজ
শকতি নাহি দিলে !

কে ছুটিবে কুরঙ্গ সম
বিশ্বের মানব আঙিনা তলে
স্কন্ধে লয়ে সমন্বয়ের বিজয় ঝাণ্ডা !

মৃত্যুঞ্জয়ী তুমি ছিলে,
মৃত্যুকে তুমি করনি ভয়,
মাননি বাধ্যবাধকতার সুদৃঢ় বন্ধন !

হে চির বিপ্লবী বীর !
তোমার বিজয় চরণ-ধ্বনি শুনি
আগামী যুগের স্বর্ণ আঙিনায়।

তুমি বিজয়ী হও—
বিজয়ী হও মোদের ভগ্ন হৃদয়ে,

অটুট, অম্লান, আশা দাও প্রাণে
তব অসমাপ্ত সাধ সাধিবারে।

তুমি মৃত নও, তুমি জীবিত নও,
তুমি চির চঞ্চল—চির গতিমান,
হে চির-দুর্জ্জয় বীর;
তব চরণ-ধ্বনি জাগুক
জীবনে আবার।

তুমি জাগো! তুমি জাগো!
আরবার রঙিয়া বাংলার
পূর্ব্বাকাশ,
লয়ে তব জীবনের অত্যুজ্জ্বল আলোক প্রভা!

আমাদের শোকান্ধকার জীবনে কর
আলোক সম্পাত
অকস্মাৎ!

(১১)

যেমন দেখিয়াছি

॥ শ্রীমন্মথনাথ দাস, এ্যাডভোকেট ॥

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের (বরিশালের শরৎ ঘোষ মহাশয়) খ্যাতি বহুকাল হইতেই শুনিতেছিলাম। গান্ধিজীর ১৯৩০।৩১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি মেদিনীপুর জেলায় গিয়া বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়া অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও নীতি জনসাধারণকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে ঐ আন্দোলনে যোগ দিবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতেছিলেন। ভারতবাসীগণের স্বাভাবিক ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত ঐ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত নীতির মূলতঃ যোগ থাকায় স্বামীজীর হৃদয়াবেগপূর্ণ মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতায় দলে দলে মেদিনীপুর-বাসীগণ ঐ আন্দোলনে যোগ দিতেছিল। সেই সময়ে তাঁহার বক্তৃতার

সারাংশ বহুলভাবে প্রচারিত হইয়া সকলের মুখে মুখে ধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু সে সময়ে মেদিনীপুরে থাকিয়াও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটে নাই। তাঁহাকে প্রথম দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিল ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের সময় আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে কারাবন্দী অবস্থায়। সে সময়ে ঐ আন্দোলন যে সমস্ত নেতৃবৃন্দ পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহারা যাহাতে অন্যান্য কারাবন্দীগণের সহিত মেলামেশা বা বাক্যালাপ না করিতে পারেন সেজন্য তাঁহাদিগকে segregate করিয়া সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সময় তিনি ও গান্ধীজীর অত্যন্ত অনুরক্ত খ্যাতনামা নেতা শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এই দুইজন মাত্র আলিপুর জেলের এক ward-এ ছিলেন। আমিও ডেপুটি জেলার ও প্রহরীগণ বেষ্টিত হইয়া আমার চিরসাথী গড়গড়া ও তাম্রকূট সেবনের অন্যান্য সরঞ্জামাদি সহ ঐ ward-এ নীত হইলাম। পরস্পর পরস্পরের নাম পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত থাকিলেও আমার সহিত কাহারও সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। ঐ ward-এ মাত্র ৪টি সেল ছিল। শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এক প্রান্তে এবং স্বামীজী অপর প্রান্তে ছিলেন। আমি শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পার্শ্ববর্ত্তী সেলে স্থান লাভ করিলাম। আমার সেল ও স্বামীজীর সেলের মধ্যে ১টী সেল তখনও খালি পড়িয়াছিল। ঐ ward-এ প্রবেশ মাত্রই স্বামিজী ও সতীশ বাবু নূতন কে আগন্তুক আসিল দেখিবার জন্য বাহিরে আসিয়া উভয়েই অবাক হইয়া নির্ব্বাকভাবে আমাকে ও আমার গড়গড়া প্রভৃতিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা মুখে কিছু না বলিলেও স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে তাঁহারা মনে মনে ভাবিতেছেন "আমাদের তপস্যারত জীবনে আমাদের যোগসাধনায় ব্যাঘাত ঘটাইবার জন্য এ কোন্ পাষণ্ডকে কোথা হইতে লইয়া আসিল?" আর আমিও একবার সতীশ বাবুকে দেখিয়া ভাবিতেছিলাম "কে এই তপঃক্লিষ্ট মুণ্ডিত মস্তক loin cloth পরিহিত ব্যক্তি যাঁহাকে দেখিলে দ্বিতীয় গান্ধী বলিয়া ভ্রম হয়! এবং আমাকে তাঁহার এত নিকট সান্নিধ্যেই বা লইয়া আসিবার অর্থ কি?" পুনরায় স্বামীজীর গৌরবর্ণ প্রশান্ত বদনমণ্ডলের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইতেছিলাম। কিন্তু তাঁহাকে মুক্তকচ্ছ গেরুয়া বশন পরিহিত দেখিয়া মনে মনে পুনরায় গৃহস্থজীবনে ফিরিয়া যাইবার আশা ত্যাগ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতে-ছিলাম।

যাহা হউক বেশীক্ষণ এই অবস্থা রহিল না। ডেপুটি জেলারের মাধ্যমে পরস্পরের পরিচয় ঘটিবামাত্রই আমি ঢিপ করিয়া দুইজনকেই প্রণাম করিয়া ফেলিলাম এবং স্বামীজী এমন নিবিড়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন যে মনে হইল মা ভাগীরথীর শীতল জলে অবগাহন করিয়া আমার সমস্ত পাপ ধৌত হইয়া গেল। পূর্ব্বে সাধু সন্ন্যাসী দেখিলেই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়া থাকিতাম—কতকটা যে তাঁহাদের প্রতি মনে মনে বিরূপ ভাব পোষণ করিতাম না তাহাও নহে। কিন্তু মনে মনে অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীজীর প্রতি কোনরূপ বিরূপ ভাব আনিতে পারিলাম না। ভাবিলাম এ কি হইল? এক মুহূর্ত্তে আমার মতিগতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল না কি? দুই দিকে দুইজন সাধুর মধ্যে থাকিতে হইবে জানিলে জেলে আসিয়া থাকাটা এত নিরাপদ মনে করিতাম না। কিন্তু উপায় কি? ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাকে খুব সুনজরে দেখিতেন না। সুযোগ ঘটিলেই জেলে ধরিয়া আনিতেন। তাহা না হয় হইল। কিন্তু আমাকে জেলে আনিয়া সাধুদের মধ্যে রাখিয়া দিবেন এ কথা কখনও কল্পনা করি নাই। যাহা হউক উপায়ান্তর না দেখিয়া তাম্রকূট সেবনে সমস্ত দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। সতীশ বাবু চিরকালই অত্যন্ত puritan type-এর লোক। তিনি আমাকে এইরূপ পাপকার্য্যে রত দেখিয়া মুখ ঘুরাইয়া দূরে সরিয়া গিয়া আপন সেলে চরকা কাটিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী আমার নিকটই বসিয়া রহিলেন এবং নানারূপ আলাপ আলোচনা করিতে লাগিলেন। যাহাতে আমার কোনরূপ অসুবিধা না ঘটে সে বিষয়ে যত্নবান হইতে লাগিলেন। ভাবিলাম যাহা হউক সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে বড় তামাক খাইবার রীতি আছে—তাহা তাঁহাদের যোগাভ্যাসের সহায়ক। স্বামীজীরও নিশ্চয় অন্ততঃ ছোট তামাক সেবনে আপত্তি থাকিবার কথা নহে। তাঁহাকে আমার সহিত তাম্রকূট সেবনের জন্য আহ্বান করিলাম। তিনি সবিনয়ে জানাইলেন যে তিনি তাম্রকূট জীবনে কখনও সেবন করেন নাই এবং আমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া যেন লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। আমিও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। বলিলাম "স্বামীজি, আপনি গেরুয়া পরেন অথচ গাঁজা খান না?" স্বামীজী বলিলেন "না! আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। আমি সন্ন্যাসী নহি। আমাকে গেরুয়া পরিয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিতে হইয়াছে কুম্ভমেলায় আমার গুরুদেবের মত (cult) প্রচারের

উদ্দেশ্যে platform পাওয়ার জন্য। আমি সেজন্যই সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছি!" কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও জানাইলেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস স্বামীজীর গুরু শ্রীশ্রীনিত্যগোপালকে এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, তুইও আসিয়াছিস, তোরও আসা দরকার ছিল। যুগধর্ম্ম প্রচারের জন্য আমারও আসা যেমন দরকার ছিল তোরও আসা তেমন দরকার ছিল। পরে জানিয়াছিলাম যে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য বর্ত্তমান সমাজকে যেমন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধিয়া রাখিয়া পঙ্গু করিয়া দিয়াছে ও দিতেছে তাহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক বলিয়া তাঁহার সম্প্রদায় মনে করেন এবং সেজন্য বেদান্তের নূতন ভাষ্য রচনা করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। তিনি ঐ সময় যতদিন জেলে ছিলেন গীতা ও উপনিষৎ সমূহের নূতন ভাষ্য রচনায় তাঁহাকে দিবারাত্রি যে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে দেখিয়াছি তাহা বর্ণনা করা যায় না। মধ্যে মধ্যে তাঁহার রচিত নূতন ব্যাখ্যা আমাদের নিকট পড়িয়া শুনাইতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। আমরা মুগ্ধ হইয়া শুনিতাম। তিনি বলিতেন কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া সত্যকে পাওয়া যায় না—হৃদয় দিয়া তাহার যাচাই করিয়া ঠিক কি না দেখিয়া লইতে হয়। যাহা সহজ যাহা স্বাভাবিক তাহাই সাত্ত্বিক। তিনি নিরামিষ খাইতেন। কিন্তু তিনি বলিতেন যে নিরামিষ খাইলেই যে সাত্ত্বিক আহার হয় তাহা নহে। যেখানে নিরামিষ খাদ্য সংগ্রহের পক্ষে বাধা আছে বা দুষ্প্রাপ্য হয় সেখানে নিরামিষ খাইবার জিদটাকেই তিনি অসাত্ত্বিক বলিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলিতেন যে হঠাৎ অসময়ে কোনও গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া যদি দেখা যায় যে, সেখানে যে সকল আহার প্রস্তুত রহিয়াছে তাহা সকলই আমিষ, অতিথির জন্য নিরামিষভাবে আহার্য্য প্রস্তুত করিতে হইলে গৃহস্থকে কিছু বেগ পাইতে ও কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে সেখানে আমিষ ভোজনই সাত্ত্বিক আহার কারণ তাহা অনায়াসলভ্য এবং নিরামিষ খাইবার গোড়ামিই সেখানে অসাত্ত্বিক। তাঁহার দর্শনের নূতন ব্যাখ্যার একটি উদাহরণ হিসাবেই ইহা বলিলাম। কার্য্যতঃও জেলে যেদিন যখন নিরামিষ আহার্য্য সংগ্রহের পক্ষে সুবিধা থাকিত না, তিনি নির্ব্বিকারভাবে আমিষ আহার্য্যই গ্রহণ করিতেন।

ত্যাগের আদর্শকে তুচ্ছ না করিলেও ভোগের আদর্শকেও তিনি ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার দর্শনের মূলতত্ত্ব ছিল Dialectic—২টি পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য বিষয়ক। তিনি বলিতেন মানুষের জীবনে তাহার

নিজের প্রতি, তাহার পরিবারবর্গের প্রতি, সমাজের প্রতি, দেশ বা রাষ্ট্রের প্রতি ও স্রষ্টার প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার দায়িত্ব রহিয়াছে। যে ব্যক্তি প্রত্যেকটি কর্ত্তব্যই সামঞ্জস্যের মধ্যে সম্পাদন করিয়া যাইতে পারেন তাঁহারই আদর্শ জীবন। এইরূপ জীবন যাপনের আদর্শ লইয়া মানুষকে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। কাহারও প্রতি কর্ত্তব্যের অবহেলা করা চলিবে না। প্রতি সন্ধ্যায় সেলে তালাবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ১ ঘণ্টা ২ ঘণ্টা ধরিয়া এইরূপ কত যে ভাবের আদান প্রদান হইত তাহা স্মরণ করিয়া এখনও তন্ময় হইয়া যাই ও বিমল আনন্দ অনুভব করি। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গল্প বা শরৎচন্দ্রের গল্প হইতে উদাহরণ দিয়া তাঁহার ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিতেন। উজ্জ্বলভারতের বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীরেণু মিত্র তাঁহার প্রধানা শিষ্যা ছিলেন। স্বামীজীর ভাবধারা লইয়া শ্রীরেণু মিত্র রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অনেক গল্প ও উপন্যাসের যে সমস্ত ব্যাখ্যা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব ও পণ্ডিত সমাজে বিশেষভাবে আদরণীয় হইয়াছে।

স্বামীজীর নিকট কত কথা শুনিয়াছি—কত নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছি—আমার জীবনে তাহার প্রভাব কতদূর আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাঁহার নিকট কি পরিমাণে উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে গেলে ধৃষ্টতা হইবে। তাঁহার হৃদয় যে কত মুক্ত, কত উদার ছিল, তাঁহার পরিচিত প্রতিটি জীবের প্রতি তাঁহার অন্তর্নিহিত স্নেহ পার্ব্বত্য ঝরণার ন্যায় যে কিভাবে উৎসারিত হইত, তাহা যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনি ব্যতীত কেহই বোধ হয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। কারাবদ্ধ অবস্থায় থাকা কালে অর্থাভাবজনিত চিকিৎসার অভাবে আমার একটি ষোড়শবর্ষীয় পুত্রের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়ি। সেই সময় স্বামীজী জননীর ন্যায় আমাকে ক্রোড়ে করিয়া যেভাবে আমাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহা আমি যতদিন বাঁচিব আমার স্মরণ থাকিবে।

আজ তিনি মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। বোধ হয় যে কার্য্যের জন্য তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন তাহা সমাপন হওয়ায় ভগবান তাঁহাকে এই পৃথিবী হইতে সরাইয়া লইয়া অপর কোনও কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া অন্য কোথাও প্রেরণ করিয়াছেন। জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধানের ন্যায় এই জীবদেহ পরিত্যাগ করিয়া তিনি অন্য দেহ গ্রহণ করিয়াছেন মাত্র—জ্ঞানীরা এই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন কিন্তু আমরা যাঁহারা তাঁহার স্নেহধারা

লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম, তাঁহার বিয়োগব্যথা মর্মে মর্মে অনুভব করিতেছি। তিনি গ্রাম্য পরিবেশে নরনারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করিতেছি এবং সেজন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইতেছি তাঁহার প্রিয় শিষ্যশিষ্যাগণের সুযোগ্য পরিচালনায় আশ্রমের সমূহ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অচিরেই পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া তাঁহার অমর আত্মাকে তুষ্ট করিবে ও শান্তি দিবে। তাঁহার সহধর্ম্মিণী যিনি তাঁহার সকল সুখের, সকল দুঃখের, সকল ক্লেশের চিরসাথী থাকিয়া দুর্গম পথে তাঁহার সহায় ছিলেন, তিনি তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন—তিনি পরমশান্তি লাভ করুন!

(১২)

শ্রীমৎ স্বামীজীর স্মরণে

॥ অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় ॥

স্বামীজীর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় প্রায় সাত আট বছর আগে উজ্জ্বল ভারতের লেখাপ্রসঙ্গে। প্রথম দর্শন ও আলাপে তিনি আমাকে আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর প্রীতির টানে। ত্যাগ, সেবা ও মানবতার সমুজ্জ্বল প্রতীক ঐ নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর প্রতি হৃদয়ে শ্রদ্ধা জেগে উঠেছিল স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে। পরস্পরের মধ্যে এ প্রীতি ও শ্রদ্ধার বাঁধন পরবর্ত্তীকালে ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে ওঠে, যদিও তাঁর সান্নিধ্য এবং সঙ্গলাভের সুযোগ আমার পক্ষে বড় বেশি ঘটতনা। মাত্র মাস দুই আগে জানিনা কি প্রাণের টানে তিনি এসেছিলেন দেখা করতে আমার বাসায়; কার্যোপলক্ষে কলিকাতার বাইরে ছিলাম বলে তাঁর দর্শন ও সঙ্গলাভের সে সুযোগ এবং সৌভাগ্য আমার ঘটেনি। আশ্রমে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবকাশ আর হলনা—এ-পরিতাপ এবং এ-আঘাত জীবনের বাকীকাল চিরন্তন রেখা হয়ে স্মৃতির উপর আঁকা থাকবে।

প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে বরিশালের শ্রীশরৎকুমার ঘোষ নামে তিনি বাংলার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন দেশবরেণ্য পুণ্যস্মৃতি স্বর্গীয় অশ্বিনী কুমার দত্তের প্রধান আত্মত্যাগী সহকর্মী ও স্বদেশীনেতা হিসাবে। তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের ইতিহাস কারো অজানা নেই। সারাটি জীবন তিনি

কাটিয়ে গেলেন মানুষের সেবায়। মানুষই ছিল তাঁর কাছে নারায়ণ। তাই স্থাপন করে গেছেন নরনারায়ণ আশ্রম, যেখানে দরিদ্র মানুষের সেবা হবে নারায়ণ-জ্ঞানে। বৈচিত্র্য ও আপাত দ্বন্দ্বের মধ্যে যে ঐক্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে, তারই অনুসন্ধান এবং সাধনা করেছেন তিনি জীবনব্যাপী; এবং এ-প্রত্যয়ের প্রচার ছিল তাঁর শেষজীবনের একটি প্রধান ব্রত। প্রাচীন ভারতের বেদবেদান্ত ও দর্শন হতে এবং আপন গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপাল হতে তিনি পেয়েছিলেন এর প্রেরণা। তাঁর সকল কর্ম্মের উৎস ছিল এ-সমন্বয়ের দর্শনে, যাকে বলেছেন তিনি পুরুষোত্তম দর্শন। উজ্জ্বলভারতের পাতায় পাতায় এ সমন্বয়-তত্ত্বের প্রচার করেছেন তিনি অফুরন্ত রচনায়।

বিশ্বজগতের সব কিছুই দ্বন্দ্বমূলক। মানুষের জীবনও গড়ে ওঠে এ দ্বন্দ্বনীতির ভিতর দিয়ে। সৃষ্টির রহস্য রয়েছে এরই মধ্যে অবরুদ্ধ। ভালো মন্দ, আলো আঁধার, শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, জড় অজড়, ভোগ ত্যাগ, পাপ পুণ্য, স্থিতি গতি, হিংসা প্রেম, বন্ধন মুক্তি, স্বার্থ পরার্থ, বিগ্রহ সন্ধি, এরূপ নানাবিধ দ্বন্দ্ব নিয়েই প্রকৃতির বিধান এবং মানুষের নিয়তি আবর্ত্তিত হয়ে চলেছে কোন এক সুদূর লক্ষ্যের অভিমুখে। এ দ্বন্দ্বের সমন্বয় করে দ্বন্দ্বাতীত হতে না পারলে ব্যক্তির এবং সমাজের পক্ষে কল্যাণ ও শান্তির পথ উন্মুক্ত হবার সম্ভাবনা নেই। ইহাই হল সমন্বয় দর্শন বা পুরুষোত্তম দর্শন। উপনিষদ্ এবং গীতার বাণীও তাই।

যে-ঐক্যের শৃঙ্খলে গ্রথিত হয়ে এ-দ্বন্দ্বের প্রকাশ পায়, সে-ঐক্যের উপলব্ধিই হচ্ছে মানবজীবনের ও মানবসভ্যতার চরম লক্ষ্য,—সমাজের পক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠার এবং ব্যক্তির পক্ষে দুঃখমুক্তির একমাত্র সনাতন পন্থা। শ্রীমৎ স্বামীজী আপন জীবনে এ-ঐক্যের, এ-সমন্বয় ও দ্বন্দ্বাতীতের আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন। তাই নরনারায়ণের সেবায় আত্মনিয়োগ করে আজ তিনি প্রয়াণ করেছেন মুক্তিপথের যাত্রী হয়ে। তাঁর এ-আদর্শ হতে তাঁর গুণগ্রাহী ও অনুবর্ত্তী আমরা সবাই পাব কর্ত্তব্যের পথে প্রেরণা, দুঃখদৈন্যে ও দুর্ব্বলতায় সাহস, নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার আলো, এবং সকল বাধাবিঘ্ন ও প্রতিকূলতার মধ্যে একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। তাঁর প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল মর্ত্ত্যজীবনে পার্থিব, আজ উর্দ্ধলোক হতে তিনি তাঁর দিব্যজ্যোতিতে তাঁদের তুলবেন জ্যোতির্ম্ময় করে। তাঁর জড়দেহ আজ মৃত্যুর কবলে আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির রাজ্য হতে অন্তর্হিত; কিন্তু যে জীবন-

আদর্শ ও যে শ্রদ্ধা ভালবাসার স্মৃতি আমাদের অন্তরে তিনি রেখে গেলেন, মৃত্যুর কালিমা তাকে কখনো স্পর্শ করতে পারবে না। আপন জীবনের ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করেছেন নিষ্ঠার সহিত অবিচলিত একাগ্র চিত্তে,—সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়ের সমজ্ঞানে। তাঁর জীবনের এ মহান আদর্শ ক্রমশঃ বহুজীবনে অঙ্কুরিত হয়ে অক্ষুণ্ণ ধারায় অমররূপে বিরাজ করবে। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে মহাজনেরা এভাবেই অমৃতত্ব লাভ করে থাকেন।

আজ আমরা তাঁর পবিত্র ও অমর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে ধন্য হই।

(১৩)

॥ অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজকে প্রথম যখন দেখি তখন আমার বয়স আট ন' বৎসর। বরিশালের মাহিলাড়া গ্রামে প্রকাণ্ড স্বদেশী-সভা হইবে শুনিতে পাইলাম, বক্তৃতা করিবেন বরিশালের শরৎ ঘোষ মহাশয়। মাহিলাড়া গ্রাম আমাদের পাশের গ্রামও বটে—আমার মামা-বাড়িও; সুতরাং বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। দেখিলাম, বয়স্ক পুরুষ, কিন্তু কেমন অদ্ভুত কোমল গঠন, স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দেহবর্ণ; শুভ্র খদ্দরের বসন পরিহিত—গায়ে জড়ান শুভ্র খদ্দরের একখান উত্তরীয়। বক্তৃতা করিতে উঠিয়া প্রথমে মধুর কণ্ঠে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিলেন,—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্॥

শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিজের জীবনের কথা তুলিলেন, ছয় বৎসর পর্যন্ত তিনি বোবা ছিলেন, কথা-বার্তা কিছুই বলিতে পারিতেন না; তারপরে পিতা-মাতার প্রার্থনায় ভগবানের আশীর্বাদ মিলিল, মূক আবার ভাষা লাভ করিল।

তারপরে সুদীর্ঘ তিনঘণ্টা ধরিয়া চলিল তাঁহার বক্তৃতা। আজ সেই তিন ঘণ্টাকে সুদীর্ঘ বলিতেছি বটে, কিন্তু সেদিন সে কথাটা আদৌ মনে আসে নাই; আজ একজন লোকের বক্তৃতা একসঙ্গে তিনঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া শুনিবা কল্পনা করিতেও ভয় হয়—কিন্তু সেদিন তাঁহার বক্তৃতা সেই একাসনে আ

তিনঘণ্টা ধরিয়া যদি শুনিতাম তাহাতে আমার শিশু মনও বিন্দুমাত্র চঞ্চল হইয়া উঠিত না। সেই বক্তৃতা শুনিবার পর তিন চারিদিন কেমন নেশার ঘোরে কাটিতে লাগিল। মনে আছে, হাঁটিতে চলিতে কয়েকদিন ধরিয়া সেই প্রথম কথাটি 'মূকং করোতি বাচালং' স্বামিজীর কণ্ঠের এবং সুরের অনুকরণ করিয়া একা একা আবৃত্তি করিবার চেষ্টা করিয়াছি,—সেদিনকার বক্তৃতায় শোনা অনেকগুলি গানের পদ, অনেকগুলি মর্ম্মস্পর্শী কথার খণ্ড নিজের মনে মনেই আওড়াইতে কেমন ভাল লাগিত। এমন কি তাঁহার মতন করিয়া কোমল দেহে কেমন আলগোছে থপ্ থপ্ করিয়া হাঁটিয়া চলিবারও কত চেষ্টা করিয়াছি। এমন করিয়াই সমস্ত মানুষটি, তাঁহার কথাগুলি, তাঁহার কণ্ঠের সুর আমার সমস্ত শিশুমনকে পাইয়া বসিয়াছিল।

কিন্তু আসল যে কারণে শরৎকুমার ঘোষের সেই প্রথম বক্তৃতার কথা উল্লেখ করিতেছি তাহা হইল এই,—তিনি সেদিন যে বক্তৃতা দিলেন তাহা স্বদেশী বক্তৃতা দিলেন, না ধর্ম্মের বক্তৃতা দিলেন? এ-প্রশ্ন অনেকদিন পর্যন্ত আমার মন হইতে ঘুচে নাই। অবশ্য সেদিন তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার অর্থ বোধগম্য করার আমার বয়স ছিল না—শুধু কতগুলি সুরের টুকরা এবং কথার টুকরাই বিক্ষিপ্তভাবে মনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। স্বদেশীর কথা—অসহযোগ আন্দোলনের কথা—স্বরাজের কথা তিনি অনেক বলিয়াছেন বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু ধর্মের কথাও ত কম বলেন নাই। ধর্ম দিয়া আরম্ভ করিলেন, বক্তৃতা করিতে করিতে চোখের জলে ভাসিয়া গান ধরিয়াছিলেন—

সবাই ছেড়েছে নাই যার কেহ,
তুমি আছ আর আছে তব স্নেহ—
পরিশ্রান্ত জন পথ যার গেহ
সেও আছে তব ভবনে।
রয়েছ নয়নে নয়নে।

আবার সেই স্বদেশী বক্তৃতার মধ্যে সত্য সত্যই অভিমানে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গান করিতে শুনিয়াছি—

মা মা ব'লে আর ডাকব না।
আমি ছিলাম গৃহবাসী করিলি সন্ন্যাসী—
আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকেশী;

না হয় দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব
তবু মা বলে আর ডাকব না।

এ-সব গান গাহিয়া তাঁহাকে ত কাঁদিয়া আকুল হইতে দেখিয়াছি। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে তাঁহার বজ্রনিনাদ শুনিয়াছি—সিংহ-পরাক্রমে সংগ্রামের আহ্বান শুনিয়াছি—পরমুহূর্তেই শুনিয়াছি তাঁহার কোমল কণ্ঠের গান—দেখিয়াছি চোখের অজস্রধারে প্লাবিত তাঁহার দুই গণ্ডস্থল। এই দু'য়ের মধ্যে তবে মিল কোথায়? এই প্রশ্নের জীবন্ত উত্তরই হইল স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের সমগ্র জীবন।

আমরা প্রচলিত যে রাজনীতির কথা জানি তাহার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক নাই। আমাদের মতে, ধর্মের গোলমাল আসিয়া আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাগুলিকে ঘোলাটে করিয়া দেয়; সুতরাং পরিচ্ছন্ন চিন্তার জন্য রাজনীতি হইতে ধর্মকে সর্বথা দূরে সরাইয়া রাখা কর্তব্য। স্বামিজীর সমগ্র জীবন হইল এই মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ। তিনি জীবনের একটা প্রধান অংশে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক কর্মী এবং নেতা হইয়া কতবার কারাবরণ করিলেন; কিন্তু শেষে দেখা গেল, বরিশালের প্রসিদ্ধ কর্মী শরৎকুমার ঘোষ একদিন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সাজিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বসিলেন। ইহা লইয়া ঘরে-ঘরে কত সমালোচনা এবং মন্তব্যই শুনিয়াছি। কিন্তু এখন ভাবিয়া দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি, তিনি যখন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তখনও বৃন্দাবনকে কোনও দিন ছাড়েন নাই; আবার বৃন্দাবনের অবধূত জীবন লাভ করার পরও তাঁহার আইন অমান্য করিয়া কারাবরণ করিতে কিছু বাধে নাই।

এই সত্যটাই স্বামিজীর সমগ্র জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হইয়া দেখা দিয়াছে। ধর্ম মানুষের পরম শ্রেয়োবোধের আশ্রয়—সেই ধর্মকে ছাড়িয়া রাজনীতি—সে ত শ্রেয়কে বাদ দিয়া শুধু প্রেয়ের পথে ছুটিয়া চলা। শ্রেয়কে বাদ দিয়া প্রেয়কে লাভ করা চলে, ভোগ করা চলে—একথা স্বামিজী তাঁহার জীবনে কোনও দিনই মানিতে পারেন নাই। আবার রাজনীতি সমাজ-নীতিকে বাদ দিয়া যে ধর্ম—সে ত প্রেয়ের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত শ্রেয়—সে শ্রেয় ত মানুষের জীবনেরই অস্বীকার—তাহা ত মনুষ্যত্বের অপমান; তাই সে শ্রেয়কেও তিনি বরেণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। স্বামিজীর জীবনদর্শনে প্রেয় আর শ্রেয়ের মধ্যে কোথাও কোন বিরোধ নাই;

যেখানে বিরোধ সেখানে বুঝিতে হইবে সেই প্রেয়ও সর্বনাশা প্রেয়—সেই শ্রেয়ও সর্বনাশা শ্রেয়; আসলে এই প্রেয় এবং শ্রেয় একই সত্যের এদিক আর ওদিক—এই দুই দিককে লইয়াই ত সমগ্রতত্ত্ব, সেই সমগ্রতত্ত্বই ছিল তাঁহার পুরুষোত্তমতত্ত্ব। জীবনকে ভাগ করিয়া টুকরা টুকরা করিয়া দেখিবার যে দৃষ্টি তাহাই কৃপণের দৃষ্টি—তাহাই অসত্য দৃষ্টি। সকল বিরোধের সমন্বয়ে যে সমগ্রতা—সেইখানেই ত পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা। এই পুরুষোত্তম-সাধনাই ছিল তাঁহার সমগ্র জীবনের ব্রত—তাঁহার 'পুরুষোত্তমানন্দ' নাম গ্রহণের মধ্যেও এই সত্যের ইঙ্গিত ছিল বলিয়া মনে করি।

(১৪)

কা'কে দেখ্‌লাম?

॥ শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় ॥

দু'বছর আগে দেখ্‌লাম—উদ্‌বাস্তু-পরিবেষ্টিত এক ফাঁকা মাঠে জনৈক অতিবৃদ্ধ গেরুয়াধারী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কে তিনি? চিনলাম না।

পরিচয় হ'ল সেই গেরুয়াধারীর মানসকন্যা রেণু মিত্রের সঙ্গে। শুনলাম তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী—নব-নারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-পর্ব্বের কথা!

দু'বছরের মধ্যেই দেখ্‌লাম নর-নারায়ণ আশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। পরিকল্পিত কার্যপদ্ধতিও ধাপে ধাপে অনুসৃত হচ্ছে। পুরুষোত্তমানন্দের লাঙল-লাঞ্ছিত গৈরিক-পতাকা আকাশে উড়ছে।

হঠাৎ সে দিন সাধুজী চির-সমাধিস্থ হলেন। রেণু মিত্রের কাঁধেই চাপিয়ে রেখে গেলেন—অসম্পূর্ণ পরিকল্পনা-রূপায়নের দায়িত্ব। রেণু কি পারবেন সে দায়িত্ব-ভার বইতে? এই প্রশ্নটিই আজ মনে জাগে।

ছোটবেলা থেকেই সাধু সন্ন্যাসী খুঁজে বেড়াবার কৌতূহল অনুভব করি। কোথায় কোন্ গৈরিকের অন্তরালে কোন্ মহার্ঘ্য বস্তু লুকানো আছে—তা জান্‌বার ও বুঝবার চেষ্টায় মেতে উঠি। সর্ব্বত্রই যে বিফল-মনোরথ হয়েছি—তা বল্‌বো না। তবে, অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি—এদেশে গৈরিকের অঙ্গরাগ এমনি একটা হজমি-দাওয়াই যার প্রভাবে বহুবিধ চারিত্রিক দুর্ব্বলতা অতি সহজে হজম করা—যে কোন ধূর্ত্ত লোকের পক্ষেই সম্ভব হতে পারে।

অহঙ্কার ও দাম্ভিকতা, স্বার্থচিন্তা ও অর্থ লিপ্সা চরিতার্থ করার পক্ষে—গেরুয়ার রূপসজ্জা বিশেষ সহায়ক। পুরুষোত্তমানন্দকে চিন্বার ও জান্বার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠ্লো।

এই গুরুবাদ ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দেশে জনসাধারণকে শাসন ও শোষণ করবার ক্ষমতা সাধুসন্তদের যত আছে—রাষ্ট্রনেতাদের তত নাই। সারা ভারতের মঠে-মন্দিরে আজও যত সোনারূপা সঞ্চিত আছে, তা' দিয়ে পাঁচটা পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা যুগপৎ রূপায়িত হতে পারে। জমিদারী বিলোপ-সাধনে ভূমিচাষীর অবস্থা-উন্নয়ন যত সহজে নিষ্পন্ন হওয়ার আশা করা যায়—মঠ-মন্দিরের গুপ্তধন আকর্ষণ, তত সহজ-সাধ্য মনে হয় না। এই বিচিত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দেশে—জনসাধারণ অনাহারে মৃত্যু-বরণ করতেও রাজী, তবু মঠ-মন্দিরের গায়ে রাষ্ট্রীয় নখাঘাত সহ্য করবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

নরনারায়ণ-আশ্রমের পুরুষোত্তমানন্দের আলাপ-আলোচনায় বুঝলাম—তিনি একজন বিদ্রোহী-সন্ন্যাসী! সমন্বয়বাদী। রাজনৈতিক শরৎ ঘোষের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদী পুরুষোত্তমানন্দের অপূর্ব্ব সমন্বয়! পরিণত বয়সে দেশব্যাপী বিকৃত ধর্ম্মবুদ্ধির সংস্কার-সাধনই তাঁর শেষ-জীবনের লক্ষ্য। আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে এনে ব্যক্তি-মূল্য নির্দ্ধারণ ও সামগ্রিক সাধনায় কল্যাণ-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ব্যতীত—আত্মবিস্মৃত ভারতের সমৃদ্ধি-কামনা আকাশ-কুসুম বলেই তিনি মনে করেন।

মহানির্ব্বাণ-মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনিত্যগোপাল দেবের অকৃত্রিম ভক্তশিষ্য হিসাবে—পুরুষোত্তমানন্দকে আজ দেখ্লাম বিশ্বশান্তিকামী বিশ্ব-নাগরিক। আর একদিন দেখেছি ও শুনেছি—ভারতের মুক্তিকামী শরৎ ঘোষের অসাধারণ বাগ্মিতা। স্বদেশী-মন্ত্রের অন্যতম উদ্গাতা অশ্বিনী কুমার সেদিন যে-দুটি বাহু বিস্তার করে বাংলাকে আলিঙ্গন করেছিলেন—তার একটি সুবক্তা শরৎ ঘোষ, আর একটি সুগায়ক মুকুন্দ দাস। এই দুটি বক্তা ও গায়ক তৎকালীন তরুণ বাংলার শিরা-উপশিরায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তা' প্রত্যক্ষ করেছি।

আজ সেই সুপণ্ডিত ও সুবক্তা শরৎ ঘোষের মধ্যে পুরুষোত্তমানন্দের আবির্ভাব নবযুগের সূচনা বলেই মনে হ'ল। রাজনৈতিক দেশাত্মবোধের সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্মবুদ্ধির সমন্বয়—যুগধর্ম্মের পরিপোষক। বিশ্বশান্তির পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষোত্তমানন্দের এই ভূমিকাকে মনে মনে স্বাগত জানালাম।

বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর 'সহাবস্থান-নীতির' মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, পুরুষোত্তমানন্দের উদার সমন্বয়বাদ তারই সমর্থক। যে জীবনাদর্শ-প্রচারের উদ্দেশ্যে পুরুষোত্তমানন্দের নর-নারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা, যুগধর্ম্মের সঙ্গে তার সঙ্গতি—বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশ্ব-মানবতা-বোধের উদ্বোধন শুধু নেতিবাচক নিবৃত্তিমার্গে কখনই সম্ভব নয়। প্রবৃত্তি-নিয়ন্ত্রণের উপরেই তা' সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। কোন গতিবেগ বাধাপ্রাপ্ত হলেই তার শক্তিবৃদ্ধি ঘটে। পাপপুণ্য, বা ধর্ম্মাধর্ম্মের সংস্কার যেখানে জাতীয় অগ্রগতির পরিপন্থী, অধ্যাত্মবাদ সেখানে আত্মপ্রতারণা বা আত্মসংকোচনের কারণ হয়ে ওঠে। 'কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য যঃ আস্তে মনসা স্মরন'—তার টিকি-নামাবলী বা গেরুয়ার বহির্বাস—কখনই অন্তরশুদ্ধির পরিচায়ক হতে পারে না। বুঝলাম, পুরুষোত্তমানন্দ খাঁটি সন্ন্যাসী। তাঁর গৈরিক বুকের রংয়ে রাঙানো।

মানব-দরদী পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে লক্ষ্য করলাম—সেই পরিশুদ্ধ অধ্যাত্ম জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ—যা বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞান-বুদ্ধিকে সংযত রেখে প্রবৃত্তির উন্মাদনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—বিশ্বশান্তির পথ-নির্দেশ করতে পারে;

যান্ত্রিক-কৌশলে মানুষ আজ স্থান, কাল ও পাত্রের দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করে ফেলেছে। আজ সবার রংয়ে রং মিশাতেই হবে। শুধু নিজের রংয়ে রঙিন্ হতে থাকার দিন আর নেই। মানুষকে মেসিন তৈরী করে, যে-কোন রাষ্ট্র-যন্ত্রের সমৃদ্ধি-ঘোষণাও মানব-সভ্যতার পক্ষে হিতকর নয়। ব্যক্তি-মূল্য হ্রাস করে সমষ্টির মূল্য বৃদ্ধির প্রয়াস বিপজ্জনক। আকস্মিক বিস্ফোরণের আতঙ্ক, ফ্রাঙ্কেনষ্টাইনের আক্রমণ-আশঙ্কা মানুষকে ছায়ার মতই অনুসরণ করবে। বহু অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য, এবং অসাম্যের মধ্যে সাম্য-সম্পাদনই প্রকৃতির নির্দেশ। আর, সে নির্দেশ একমাত্র সমন্বয়-বাদের দ্বারাই সমর্থিত।

এই পরিবর্ত্তিত বিশ্বে—ভাগবতী বুদ্ধির ভিত্তিতে উদার সমন্বয়-বাদই মানব-সভ্যতার পরমায়ু বাড়িয়ে দিতে পারে। নতুবা এ যুগের একজন চিন্তানায়ক বারট্রাণ্ড্ রাসেলের ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তিন বৎসর আগে রাসেল বলেছেন—বর্ত্তমান যান্ত্রিক সভ্যতা ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতই ধ্বংস ও সৃষ্টির মাঝখানে দুলছে। একদিকে সর্ব্বাত্মিক

উত্থান, অন্যদিকে সামগ্রিক পতন। আগামী দশ বৎসরের মধ্যেই বিজ্ঞান-বুদ্ধির পরিণাম নির্দ্ধারিত হয়ে যাবে।

এই উত্থান-পতনের ইতিহাস রচনার দিনে পুরুষোত্তমানন্দ এসেছিলেন—তরুণ-মনের দিক্‌নির্ণয় ও গতি নিয়ন্ত্রণের সাধু সঙ্কল্প নিয়ে। হঠাৎ সমাধিস্থ হলেও, তাঁর অন্তরের উন্মাদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বাণী রেখে গেছেন তাঁর মানসকন্যা রেণু মিত্রের হেপাজতে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—রেণু যেন পারেন পুরুষোত্তমানন্দের সঙ্কল্পিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে।

আর্কিমিডিসের মত যদি বলি—পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল বাগুইআটি দেশবন্ধু নগরের নরনারায়ণ আশ্রম, যেখানে যুগসাধক পুরুষোত্তমানন্দ সমাধিস্থ আছেন—নিশ্চয়ই কোন জ্যামিতিক ভুল করবোনা।

নর-নারায়ণ আশ্রম থেকেই প্রচারিত হতে পারে—এক বিশ্ব ও এক ভগবানের—যুগোপযোগী অভ্রান্ত মতবাদ। সব ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষ যেন বল্‌তে পারে—অয়মহং ভোঃ! বল্‌তে পারে—

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যেব ধারয়েৎ।

বল্‌তে পারে—

তমসো মা জ্যোতির্গময়!
মৃত্যো র্মা অমৃতং গময়! *

(১৫)

॥ শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার ॥

বাল্মীকি-রামায়ণে কুলগুরু বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"এষ বিগ্রহবান্ ধর্ম্ম এষ বেদবিদাং বরঃ।
এষ বীর্য্যবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যাজ্ঞানতপোনিধিঃ॥

—এই বিশ্বামিত্র মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম স্বরূপ, ইনি বেদজ্ঞ ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান। বিদ্যা, জ্ঞান এবং তপস্যার আধার ইনি বীর্য্যশালী ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

* দেশবন্ধুনগর হিন্দু বিদ্যাপীঠে পুরুষোত্তমানন্দ-স্মৃতি সভায় পঠিত সভাপতি শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়ের ভাষণ।

উপরোক্ত শ্লোকটির প্রায় সব কয়টি কথা স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ সম্বন্ধে খাটে এবং অল্প কথায় ইহাই বোধহয় তাঁর সঠিক পরিচয়। স্বামীজির ধর্ম্মশীলতা এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানে সুগভীর পাণ্ডিত্যের কথা বোধহয় সকলেই জানেন। ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তদর্শন, ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষৎ এবং শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা সম্বন্ধে তাঁর রচিত অবধূত ভাষ্য, এবং অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে তাঁর অসাধারণ মনীষা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, তাঁর সকল রচনায় এবং বক্তৃতায় তাঁর স্বকীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট এবং মৌলিকতায় এবং অভিনবত্বে উহা অপূর্ব্ব।

অসহযোগ আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা হিসাবে তিনি সে যুগে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, যে তেজস্বিতা ও বীর্য্যবত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত থাকবে। তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা এবং আধ্যাত্মিক ও বৈপ্লবিক দর্শন তখনকার রাজনীতিক আন্দোলনকে একটা নূতন রূপ, একটা প্রবল গতিবেগ প্রদান করেছিল। জনচিত্ত জয় করবার ক্ষমতা ছিল তাঁর অপরিসীম এবং এক সময় তিনি বরিশালের মুকুটহীন রাজার গৌরব অর্জ্জন করেছিলেন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে একাধিকবার কারারুদ্ধ করে রেখেছিল এবং রুদ্ধকারার অন্তরালে থেকেই তিনি তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচনা করেন।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভেই স্বামীজির সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলনের মণ্ডপে। সে প্রায় আজ থেকে আটত্রিশ বছর আগের কথা। সেই সম্মেলনেও সভাপতি ছিলেন বাগ্মীবর বিপিন চন্দ্র পাল, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমার দত্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ বহু বরেণ্য নেতা সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় স্বামীজি যে অপূর্ব্ব ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। দেশবন্ধু হর্ষোৎফুল্ল হয়ে স্বামীজিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেছিলেন—এতকাল পরেও সে দৃশ্য আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠে।

এই ঘটনার পর হতেই স্বামীজির নাম যশ ও কর্ম্মশীলতা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। গান্ধীজির সহিতও স্বামীজির কয়েকবার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করেন। তখন স্বামীজি ছিলেন বরিশালের শরৎ কুমার ঘোষ, পরবর্ত্তীকালে সন্ন্যাস নিয়ে তিনি স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

অবধূত নাম ধারণ করেন। তিনি সমন্বয় মূর্ত্তি শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল দেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নিজের জীবনও ছিল সকল প্রকার সমন্বয়ের আদর্শ। সন্ন্যাস নিয়েও তিনি সংসার ত্যাগ করেন নি, আবার সংসারে থেকেও তিনি নির্লিপ্ত সন্ন্যাস-জীবন যাপন করে গেছেন। ইহলোক পরলোক, সেকাল একাল, প্রাচীন নবীন, ধর্ম্ম কর্ম্ম, সন্ন্যাস গার্হস্থ্য—সকলের সমন্বয়ই ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন অবধূত—যিনি নিজ জীবনের সকল সংস্কারকে ধূত, নির্ম্মল করেছেন, শুদ্ধ করেছেন, তিনিই অবধূত।—

"ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী।
ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ॥
ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবশ্চ।
রাজতে হ্যবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥"

—অবধূত যোগীর ন্যায় যোগনিয়মে বশীভূত নহেন, বিষয়ীর ন্যায় ভোগ-পরায়ণ নহেন, জ্ঞানীর ন্যায় মোক্ষাকাঙ্ক্ষী নহেন। তিনি শৈব নহেন, শাক্ত নহেন, বৈষ্ণবও নহেন। তিনি কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিয়মনিষেধের অনুগামী বা বিদ্বেষ্টা নহেন, তিনি পরমানন্দস্বরূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শিবতুল্য বিরাজ করেন।

স্বামীজীর আকৃতি এবং প্রকৃতিতে অবধূতের সকল বৈশিষ্ট্যই সুপরিস্ফুট ছিল।

স্বামীজী সকলেরই প্রিয় ছিলেন, যে হেতু সকলে তাঁর প্রিয় ছিল। 'মদাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা' ইহাই ছিল তাঁর মনের ভাব। তিনি সকলকেই ভালবাসতেন, তাঁর কাছে আপন পর ছিল না। 'বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আপন পর?' তাঁর কাছে সকলেই আপন—'বসুধৈব কুটুম্বকম্', তাঁর জীবন বিশ্বজনীন জীবন। তাঁর জীবন ছিল পরার্থে উৎসৃষ্ট। তাঁর জীবন 'বহু জন হিতায়, বহু জন সুখায়।' মানবতার সেবা, লোককল্যাণ—তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

তিনি নিজের ভোগসুখ কোন কালেই চান নি। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা কোন কালেই তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাই ছিল তাঁর জীবনের নিয়ামক। অর্থাৎ তিনি ছিলেন ভক্ত, মানব-প্রেমিক, বিশ্ব-প্রেমিক। তাঁর অকৃত্রিম দেশপ্রীতি ও মানবপ্রীতি ভগবৎ প্রীতিরই নামান্তর। তাঁর আদর্শ ছিল শুধু স্বাধীন ভারত নয়, তাঁর আদর্শ ছিল উজ্জ্বল ভারত। এই

আদর্শ রূপায়নে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার উদ্দেশ্যে আমরণ অতন্দ্র সাধনা করে গেছেন। একদিকে, তিনি তাঁর সম্পাদিত "উজ্জ্বল ভারত" মাসিক পত্রের মাধ্যমে ধর্ম্ম ও কর্ম্মের সমন্বয়ে ভারতের আশা ও আদর্শকে প্রদীপ্ত করে তোলার আদর্শ প্রচার করেছেন, অপর দিকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'নরনারায়ণ আশ্রমকে' কলিকাতার উপকণ্ঠে বাগুইআটি দেশবন্ধু নগরে স্থানান্তরিত ক'রে সেখানে একটি গ্রন্থাগার, বয়স্ক মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র, মহিলা শিল্প শিক্ষা কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করে উদ্বাস্তু পরিবৃত দুঃস্থ নরনারীর সেবা ও উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন।

স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত নরনারায়ণ আশ্রমের নামটি হতেই তাঁর ধর্ম্মজীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা যায়। নর এবং নারায়ণ, অথবা নরই নারায়ণ এই অর্থে নরনারায়ণ, তাঁর আশ্রম। অন্য হিসাবেও নামটী তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত। মহাভারত ও পুরাণের আদিতেই নরনারায়ণের বন্দনা।—

নারায়ণাং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বামন পুরাণ বলেন—

নরনারায়ণৌ চৈব জগতো হিতকাম্যয়া।
তপ্যেতাঞ্চ তপঃ সৌম্যৌ পুরাণ ঋষি সত্তমৌ॥

—নর ও নারায়ণ উভয়েই দিব্য দেহধারী পুরাণ ঋষি। তাঁরা জগতের হিতকামনায় তপস্যা করেছিলেন। দেবতাত্মা হিমালয়ের ক্রোড়ে বদরিকাশ্রমে তাঁদের আশ্রম ছিল। তাঁদের তীব্র তপস্যায় বিচলিত হয়ে রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাদের পাঠিয়ে ইন্দ্র তাঁদের চিত্ত বিক্ষুব্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। নারায়ণ ঋষি ঊরু হতে উর্ব্বশীকে সৃষ্টি করে ইন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেছিলেন। নরনারায়ণ ঋষির সহিত যুদ্ধ করে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের দর্প চূর্ণ হয়েছিল। বদ্রীনাথের নরপর্ব্বত, নারায়ণ পর্ব্বত, উর্ব্বশী পর্ব্বত প্রভৃতি অদ্যাপি এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর স্মৃতি বহন করে। মহাভারতের নানা স্থলে কথিত হয়েছে, সত্যযুগের এই নরনারায়ণ ঋষিই দ্বাপরের শেষভাগে ধনুর্দ্ধর পার্থ ও যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। মনে হয় গীতার পুরুষোত্তমজীবনই ছিল স্বামীজীর জীবনের আদর্শ—তাই তিনি পুরুষোত্তমানন্দ।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের প্রধান আশ্রম ছিল ব্রহ্মপুরায় বদরিকাশ্রমে যেখানে

ছিল পূর্ব্বে নরনারায়ণ আশ্রম। এখানেই নাকি তিনি মহাভারত ও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি রচনা করেন।

মহাঐতিহ্যমণ্ডিত ও পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত এই নরনারায়ণ আশ্রমকেই স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ বাংলার বুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই আশ্রমই ছিল তাঁর তপস্যার স্থল। আর সেকালের অর্থাৎ সত্যযুগের নরনারায়ণ ঋষি, দ্বাপরের কৃষ্ণার্জ্জুন ও বিশালবুদ্ধি বেদব্যাস এবং একালের শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ, শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল, মহাত্মা গান্ধী, ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সকলেরই আদর্শ এক এবং অভিন্ন—লোককল্যাণ, জগতের হিতসাধন, শিবজ্ঞানে জীবসেবা। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন এই সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরই উত্তরসাধক—তাঁদেব পূত আদর্শে অনুপ্রাণিত ও উৎসৃষ্ট-জীবন। তাই তাঁকে সাধারণ মানুষের পর্য্যায়ে ফেললে ভুল কবা হবে। তিনি মহামানবগোষ্ঠীরই এক জন। তাঁর জীবন মহাজীবন, পুরুষোত্তম জীবন।

স্বামীজীর মহাপ্রয়াণের কাহিনীও কম বিস্ময়কর নহে। তাঁর গুরুভক্তির তুলনা মিলেনা। গত ১৬ই চৈত্র (১৩৬৪) রবিবার দক্ষিণ কলিকাতার মহানির্ব্বাণ মঠে শ্রীশ্রীনিত্যগোপালের স্মৃতি বার্ষিকী সভায় তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা করতে করতে স্বামীজী গুরুদেবের উদ্দেশ্যে শেষ প্রণাম জানিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, সে সমাধি আর ভঙ্গ হয় না। ১৮ই চৈত্র মঙ্গলবার প্রাতে কারনানী হাসপাতালে তিনি মহাসমাধিলাভ করেন। "একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সকল দেহ লুটায়ে পড়ুক তোমার এ সংসারে। একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে, সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীবব পারাবারে। একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে, সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণ-পারে।"

ভগবান্ ভক্তের প্রাণের আকুতি শুনলেন, তাঁকে চরণে ঠাঁই দিলেন।

(১৬)

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

আজ আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে এসেছি তাঁর উদ্দেশ্যে, যাঁকে আমি হৃদয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে জেনেছিলাম। আমার বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ মন দিয়ে অনুভব করেছিলাম—শুধু সেই মনীষার প্রখরতাকে নয়, তাঁর জ্ঞানের মহৎ গভীরতাকে।

স্বামীজির মানবতাবোধ মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতাকে অতিক্রম করেছিল; তাঁর ভক্তিবাদ ঈশ্বরের উপলব্ধিতেই নিমগ্ন থাকেনি। কারণ ঈশ্বরকে জেনেছিলেন তিনি পুরুষোত্তম বলে।

মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য তার অজ্ঞানতা ও আত্মবিস্মৃতি। ভারতবর্ষের মানুষ অশিক্ষা বা অবিদ্যার অন্ধকারে যত না থেকেছে তারচেয়ে বেশী থেকেছে আত্মবিস্মৃতির মোহে। সেই প্রাচীন বেদের যুগ থেকে বারবার জন্ম হয়েছে প্রত্যক্ষজ্ঞানী পুরুষোত্তম মানুষের। কিন্তু মানুষ শোনেনি তাঁদের কথা। নেশাগ্রস্ত মানুষের কাছে পৌঁছায়নি তাঁদের বাণী। তাই আমরা দেখেছি মহিদাসকে যিনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত, দেখেছি গৌতমকে যিনি বুদ্ধ নামে পূজিত, পেয়েছি শ্রীচৈতন্যকে যিনি ছিলেন প্রেমের ঠাকুর। তবুও আমরা শুনিনি তাঁদের কথা, বুঝিনি তাঁদের জীবন। কারণ আত্মবিস্মৃতির নেশায় আমরা আচ্ছন্ন। আর আশ্চর্য্য এই যে, আমি প্রথম যেদিন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দকে দেখেছিলাম সেদিন তাঁকে একজন ধর্ম্মপ্রচারক সন্ন্যাসী বলেই জেনেছিলাম। এমন কি নির্ভয়ে তর্ক করেছিলাম। আর আমার মূঢ়তাকে তিনি অভয় প্রশান্তিতে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

কিন্তু নীল সমুদ্রের অনন্ত প্রসারিত নীলিমাই তার পরিচয় নয়। সমুদ্রের গভীরতার তলে প্রচ্ছন্ন থাকে স্রোত, থাকে বাড়বানল। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দের যে সহাস্য পরিচয় প্রথম দিন পেলাম, তারপরেই জেনেছিলাম কী আকুল চাঞ্চল্যে, বিপুল বিক্ষোভে—আলোড়িত তাঁর হৃদয়।

স্বামীজি অশ্রুপাত করেছেন সারাজীবন। যে ভারতবর্ষকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, ভারতের ঐতিহ্যকে, মহত্বকে সে বহন করেনা। যে উপনিষদের ব্যাখ্যায় আমরা আমাদের ধর্ম্মজীবনকে গড়েছি, সে ব্যাখ্যার মধ্যে উপনিষদের সমগ্রতা নেই, বুদ্ধজীবনের মহত্ব ত নির্ব্বাসিত ভারতভূমি থেকে। মায়াবাদের নেশায় মুগ্ধ আমরা ভুলেছি জীবনের পুরুষোত্তম রূপকে।

তাই গীতার নতুন ভাষ্য দিলেন তিনি। নতুন করে লিখলেন ব্রহ্মসূত্রম্। বললেন উপনিষদের সঙ্গে সত্যিই বিরোধ নেই বুদ্ধবাদের। ব্রহ্ম সত্যিই নয় কোন নিশ্চেতন অধিকার ও নির্গুণ সত্তা। ব্রহ্ম যদি অনন্ত হয় তবে এই বিশ্বজগৎও অনন্ত। ব্রহ্ম যদি সত্য হয় তবে সমান সত্য এই জগৎ। ভূমিকে ত্যাগ করে ভূমার সাধানায় ঈশ্বরকে পূর্ণ ভাবে পাওয়া যায়না।

চরৈবেতি—চলার দর্শনকে তুলে ধরেছিলেন ঐতরেয় মহিদাস। বুদ্ধদর্শন মানুষকে স্থির, অচঞ্চল ব্রহ্মের বন্ধন থেকে মুক্তি দিলো। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দও এই চল ও চঞ্চল, চির ও অচির শক্তির সমন্বয়ে জীবনকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই সমগ্রজীবন-দর্শনের রূপ একান্ত নতুন নয়। কিন্তু প্রয়োজন ছিলো এ কথা নতুন করে বলবার। আজ সমগ্র বিশ্বজগতে সত্য ও অসত্যের মধ্যে হিংসা ও অহিংসায়, শান্তির আকাঙ্ক্ষা ও সংশয়ের প্রকাশে সংঘাতের সৃষ্টি হতে চলেছে—এই মুহূর্ত্তে মানুষকে জোর করে শোনাবার প্রয়োজন হয়েছে।

স্বামীজি বলেছেন যে পৃথিবীতে কিছুই অসত্য নেই, কোথাও অন্ধকার, বিন্দুমাত্র ভয় বা সংশয় নেই। শুধু অন্তরে থাকা চাই সেই জীবনানুভূতি, চলাব প্রেরণা।

স্বামীজিব তিরোধানে এই মুহূর্ত্তে যে শূন্যতাবোধ জেগেছে মনে·········প্রার্থনা করি তিনি শক্তি দিন—সেই শূন্যতাকে যেন অতিক্রম করতে পারি, অনুভব করতে জীবনেব মধ্যে তাঁব পুরুযোত্তম রূপ।

(১৭)

যে-টুকু বুঝেছি

॥ শ্রীফণীভূষণ মালাকর ॥

অবশেষে একদিন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের ডাকে সাড়া দিতেই হল। মনে শঙ্কা ছিল যে বুঝি সন্ন্যাসী আমাকে বুঝাইয়া ছাড়িবেন যে—এ জগৎটা মিথ্যা—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। কে সত্য আর কে মিথ্যা তাহা জানি না। তবে জগৎটা মিথ্যা এ মতবাদে আমার অন্ততঃ বিশ্বাস নাই; তাই তথাকথিত সন্ন্যাসীদের প্রতি আমার একটু ভীতি আছে। কিন্তু আশ্চর্য্য হইলাম স্বামীজীর সন্দর্শনে; বিশেষ করে যখন তিনি প্রসঙ্গতঃ বলিলেন যে, ব্রহ্ম যেমন সত্য, এ জগৎটাও ঠিক তেমনি সত্য। তাই এ জগতের জন্য কাজ করিতে হইবে। স্বামীজী প্রথম দিনেই স্থানীয় জনসাধারণের হিতকর কোন কাজের উল্লেখ করিলেন। ইচ্ছা না থাকিলেও স্বামীজীর কথায় "না" বলিতে পারিলাম না। যিনি সন্ন্যাসী হইয়াও গৃহী

প্রতিবেশীদের এমন করিয়া ডাকিতে পারেন, যিনি অসাধারণ হইয়াও সাধারণকে এমন আপন করিয়া ভাবিতে পারেন, তাঁহার ডাকের মাহাত্ম্য আছে—ইহা মানিতেই হইবে। ইনি যে সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন তাহা বুঝিলাম। বুঝিলাম ইনি একজন পলেটিক্যাল সন্ন্যাসী। ইনি আত্মপ্রতারক সন্ন্যাসী নন, ইনি একজন আত্মজয়ী সন্ন্যাসী। প্রতিবেশীর গরু আসিয়া আশ্রমের তুলসী বৃক্ষ নিষ্পত্র করিলে বা প্রতিবেশীর অলঙ্কার-ভূষিত বধূ আসিলে এঁর আশ্রমধর্ম্মের কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষতি করিতে পারবে না। তিনি কর্ম্মই চান, কর্ম্মই যেন তাঁর জীবন। পুরুষোত্তমের কর্ম্ম-প্রেরণা তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।—তাই এই বৃদ্ধ বয়সেও, কর্ম্ম ক্ষমতা কমিয়া গেলেও কর্ম্মের প্রয়োজনবোধ বিন্দুমাত্রও কমে নাই। কত দিন তাঁর মুখে এ খেদোক্তি শুনিয়াছি "কোন্ কাজের জন্য ঠাকুর এখানে পাঠাইলেন জানি না, এখানে কি কাজ করিব"। এখানে কিছু করিতে না পাওয়ার, বা কিছু করিতে না পারার একটা বেদনা অন্তঃসলীলা ফল্গুনদীর মত তাঁর হৃদয়ে বহিয়া যাইতেছিল। কাজ যারা চান তাঁরা কাজ পানও বটে এবং কিছু দিন পরে কাজই তাহাদের পাইয়া বসে। স্বামীজীর জীবনে এ সত্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি। কাজেই আনন্দ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কাজ সেবাধর্ম্মী—এটা স্বামীজীর বাণীই নয়—এ সত্যকে তিনি নিজের জীবনে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তা নায়ক এইচ, জি, ওয়েল্‌স তাঁর বিখ্যাত পুস্তকে—কর্ম্মবাদের যে মহান সূত্র লিখিয়াছেন—"Work is happiness, Work and enjoy" এ মতবাদ স্বামীজীরই মতবাদ।

স্বামীজী ছিলেন প্রাণ ধর্ম্মী এবং প্রাণই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। তাই স্বর্গের নারায়ণকে পূজা না করিয়া মর্ত্ত্যের নর-নারায়ণের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হইতেন। রাজনৈতিক জীবনে যে লাঞ্ছিত জাতির মুক্তির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, উত্তরকালে সন্ন্যাস জীবনেও সেই অবমানিত হেয় ও লাঞ্ছিত জনগণের ব্যথায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। তাই জীবনের শেষ কয়েকটি দিনেও দুঃস্থ জনের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন "বড় লোকের প্রণাম আমি চাই না, গরীব দুঃস্থকে সেবা করতেই আমি চাই। তাদের পায়ে ধরতেও আমি রাজী আছি।"

ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে তিনি আবদ্ধ ছিলেন না—। তাঁহার গুরু শ্রীনিত্য-গোপালের আদর্শে তিনি বিশ্ব নাগরিগকত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহার

সমন্বয়বাদ বিশ্বের মঙ্গলের জন্য তাঁর এক অমূল্য অবদান। "সমাজ শুধু ভালরই জন্য যাহা শুধু ভাল তাই কেবল সমাজ গ্রহণ করিবে। হে মন্দ! তুমি মরিয়া যাও;" এ মতবাদে তিনি ছিলেন অবিশ্বাসী। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন অধ্যায় নাই যেখানে শুধু ভালরই রাজত্ব ছিল, সত্য যুগেও যদি সকলই সত্য না থাকিয়া থাকে, তবে absolute good এর জন্য প্রয়াস কি ব্যর্থ সাধনা নয়? সকলই আমি হইব বা সকলই তুমি হইবে ইহা সম্ভব নয়। আমাকেও থাকিতে হইবে, তোমাকেও থাকতে হইবে—ইহাই সমন্বয়। এবং এ সমন্বয়বাদের মধ্যেই নিহিত আছে—পঞ্চশীলের সহ অবস্থান নীতির মূল সূত্র। পৃথিবীর বিভিন্ন মরণোন্মুখ শক্তিবর্গ যদি এই সমন্বয়বাদ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন এবং সহ অবস্থিতির নীতি মানিয়া চলিতে পারেন তবেই শুধু পৃথিবী আপতস্থি বিপদ হইতে রক্ষা পাইতে পারে। বৈজ্ঞানিক চরম উন্নতির ফলে পৃথিবী যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়া পড়িয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে দার্শনিকের এই প্রাণধর্ম্মী সমন্বয়বাদই পৃথিবীর পক্ষে মৃতসঞ্জীবনী সুধার কাজ করিতে পারিবে।

সমন্বয়বাদে স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ শুধু বিশ্বাসী ছিলেন তাহা নহে। এই সমন্বয়ই ছিল তাঁহার জীবন। তাই স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ হইয়াও তিনি শরৎ ঘোষ। পুরুষোত্তমকে তিনি জীবনের আদর্শ করিয়া ছিলেন—তাঁহার জীবন পুরুষোত্তমময় হইয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু শরৎ ঘোষকে তিনি কখনই অস্বীকৃতি দেন নাই। সন্ন্যাস ধর্ম্মকে গ্রহণ করিয়াও গার্হস্থ্য জীবনকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। সন্ন্যাসীর কৌলীন্যকে তিনি মানেন নাই, "মানুষের" কৌলীন্যকেই সব চেয়ে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। তিনি বুঝিয়া ছিলেন "সবার উপরে মানুষ সত্য।"

(১৮)

মহাপ্রয়াণ

॥ শ্রীদুর্গামোহন সেন ॥

"উজ্জ্বল ভারতের" সম্পাদক, নরনারায়ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ সহসা এই মাটীর জগৎ ছাড়িয়া উর্দ্ধলোকে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহারি পত্রিকায় শ্রীমতী রেণু মিত্র মহাশয়ার অনুরোধে বা

আদেশে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনে সহকর্মী ছিলাম আমি এবং সুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়। সুরেশবাবু পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তিন জনের মধ্যে অবশিষ্ট রহিলাম আমি, অথচ বয়সে তিনজনের মধ্যে আমিই বড়—অপর দুজন "পিছে এলেন—আগে গেলেন আমি র'লেম পড়ে"—তাঁহাদের জীবনী লিখিতে। অহো দুর্ভাগ্য!

আজ হইতে ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ প্রায় নেতৃশূন্য হইয়া স্তিমিত হইয়া পড়িতেছিল। বরিশালপ্রাণ অশ্বিনীকুমার জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে—কোনও প্রকারে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য নানা স্বাস্থ্যনিবাসে ছুটাছুটি করিতেছেন। ১৯২০ সন—মহাত্মাজি রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নূতন রণকৌশল উদ্ভাবন করিলেন—অসহযোগ। প্রাচীন নরম ও চরমপন্থী নেতৃবর্গ কেহই নব সঞ্জীবনী মন্ত্রের তাৎপর্য্য পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। সে জন্য আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল নূতন রক্তের সঞ্চার। "অবসরমত ভালবাসিও" ভাবের ভাবুক ও কর্ম্মীর সেবায় দেশ-মাতৃকা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না—তিনি "ম্যায় ভুখাহু" বলিয়া সন্তানের আত্মবলিদান চাহিতেছিলেন! একশ্রেণীর নিষ্কর্ম্মা কর্ম্মী পূর্ণাহুতি না দিলে স্বরাজ যজ্ঞ উৎযাপিত হইতে পারেনা। শরৎকুমার তখন ব্রজমোহন স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আস্তানা স্থাপন করিতে উৎগ্রীব। সহসা সাক্ষাৎ এ অধমের সহিত—টানিয়া লইলাম তাঁহাকে স্বদেশী যুগের পুণ্যে বিশাল রাজাবাহাদুরের হাবেলীর পীঠস্থানে। সেই হইল সাধনপীঠ। উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইয়া সহস্র সহস্র শ্রোতৃবর্গ শ্যামল দূর্ব্বাদল মণ্ডিত ভূমির উপরে উপবিষ্ট হইয়া দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁহার বাক্যসুধা পান করিয়াছে—নীরবে নিশ্চল থাকিয়া। তিনি আনিলেন অসহযোগের নূতন ব্যাখ্যা—সে ব্যাখ্যায় মিশ্রিত হইল রাজনীতির নীরস কাঠ কঠিন দর্শনের সহিত নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের আত্মা পরমাত্মার সমন্বয়। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই—তিনি দেখাইয়াছেন ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথীর সহিত বর্ত্তমানের স্বরাজযুদ্ধের কতখানি সামঞ্জস্য। তুলনা উপমা ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি শ্রোতৃবর্গের প্রাণে অভিনব ভাব সঞ্চার করিতেন—মানুষ তখন সর্ব্বপ্রকার ত্যাগদ্বারা স্বরাজ যজ্ঞে আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হইয়াছে—ঐহিক সুখৈশ্বর্য্য অর্ঘ্যদ্বারা মাতৃপূজার জন্য উদগ্র

হইয়া উঠিত—অথচ এ নবযুদ্ধ মহাত্মাজির আবিষ্কৃত নূতন অস্ত্রদ্বারা—অসহযোগ—মার খাইব মারিব না—পরাব না পরব ফাঁসি। এমন করিয়া তিনি এক চতুর্থ শতাব্দী বরিশাল তথা সমগ্র দেশে আত্মিক বলের সহিত দৈহিক বলের সমন্বয় করিয়া লোকের মনে এক নূতন ভাব-বন্যা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি নিজে তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব, স্ত্রীর সকল স্বর্ণালংকার ও ভ্রাতৃবধূর কিছু অলঙ্কার যেমন ঢালিয়া দিলেন, তেমন শত শত নারীর গাত্রালংকার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথমে মহিলাদিগকে এমন কি "বাজারের মা"-দিগকেও স্বরাজ মন্ত্রে দীক্ষিতা করিয়াছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে—প্রকৃত যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি নেতৃত্ব করিয়াছেন চাঁদপুরেব ষ্টীমার ধর্ম্মঘটে। তাঁহারই নির্দ্দেশে বরিশালে একক্রমে ৭ দিন হরতাল পালিত হয়। সরকার কর্ত্তৃক ষ্টীমার ষ্টেশনে কর্ম্মচারী নিয়োগের বিরুদ্ধে তিনি যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা উপলক্ষ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে "যায় ঐ" বলার অপরাধে এক মোকদ্দমা দাঁড় করান হয় ও কারাকক্ষে বিচার করিয়া ছয়মাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই কারাদণ্ডের ফলে বরিশালে আবার সপ্তাহব্যাপী হরতাল হয়—এবং জজ ম্যাজিষ্ট্রেটকে ময়লার গাড়ী টানিতে হয়। তাঁহার অতলস্পর্শী জ্ঞান বারিধির যে উচ্ছ্বাস আগ্নেয়গিরিব গৈরিক নিঃস্রাবের মত উদ্গীরিত হইত, তৎশ্রবণে জনসাগর মথিত হইত।

রাজনৈতিক পটভূমিকায় নূতন রূপ দেখা দিল—মহাত্মাজী ও দেশবন্ধুতে মতান্তর উপস্থিত হইল—No-changer ও Pro changer দলে দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইল। তিনি রহিলেন No-changer—তিনি বলিলেন 'I shall fight with Gandhi in order to maintain his Gandhism.' বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের মুক্ত প্রাঙ্গণে দেশবন্ধু তাঁহার স্বরাজ পার্টির নীতি সমর্থন করিয়া উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের ন্যায় বক্তৃতা করিলেন—প্রতিবাদ করিলেন শরৎ কুমার—জয় হইল শরৎকুমারের। তিনি স্বরাজ সেবকসঙ্ঘ গঠন করিয়া নূতনভাবে দেশের কাজ করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল—আরও কিছু শক্তি সঞ্চয় করা আবশ্যক। ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহার আয়ত্ত ছিল কিন্তু তথাপি যেন কিসের প্রেরণায় তিনি বরিশাল ছাড়িয়া পুরুষোত্তমানন্দ নাম লইয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন। আড়াইটী বৎসর দারুণ কৃচ্ছ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করিয়া তিনি ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই তিনি খোল করতাল সহযোগে সস্ত্রীক লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে বাহির হইলেন। আশী মাইল ঐভাবে

বক্তৃতা করিতে করিতে অতিক্রম করিলে ধৃত হইলেন—কারাদণ্ড ছয় মাস। কারাগারে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া আমাদিগকে শুনাইতে থাকিলেন। কারামুক্ত হইয়া তিনি সপরিবারে কলিকাতা চলিয়া আসেন ও নর নারায়ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পরেও তিনি বরিশাল গমন করিয়া ১০৮ ধারায় নোটীশ অমান্য করিয়া কারাগমন করেন। তৎপর স্থায়ীভাবে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রথমতঃ ৮এ রাসবিহারী এভিনিউতে অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি নানা জিলায় তাঁহার সমন্বয়ের ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকেন। তাঁহার শেষ কার্য্য তাঁহার গুরু প্রতিষ্ঠিত মহানির্ব্বাণ মঠে পুরুষোত্তম গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে চিরনির্ব্বাণ প্রাপ্তি।

আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার জীবনের রাজনৈতিক দিক্ অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম।

কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকাল তাঁহার সঙ্গলাভ করিবার সুযোগ পাইয়া যতটুকু জানিতে পারিয়াছি—শুনিতে পাইয়াছি—বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাই লিপিবদ্ধ করিব। তাঁহার চাল চলন—ধরণ ধারণ কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে কেবলই প্রশ্ন জাগিয়াছে তাঁহার অপূর্ব্ব ধীশক্তি মনন শক্তি বিশ্লেষণ শক্তি ও অপূর্ব্ব প্রকাশ ক্ষমতার মূল উৎস কোথায়! সাধাসিধে বাহিরের এই মানুষটী দেখিয়া তাঁহার অভ্যন্তরের মণি কোঠায় সঞ্চিত ও সঞ্জাত শক্তির পরিচয় পাওয়া মুস্কিল। বাল্যাবধি তিনি জ্ঞানপিপাসু, তাই পাঠ্যাবস্থায়ই তিনি সৌভাগ্যক্রমে এমন এক গুরুর পদাশ্রয় পাইলেন যাহাতে তাঁহার দৈবসম্পদ পূর্ণভাবে স্ফুরিত হইল। তিনি বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তৎপর তিনি বেদবেদান্ত পাঠ করেন এবং সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি আকণ্ঠ মুখাগ্রত ও হৃদগত করিয়া তিনি হইলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী এবং সে-ই অধিকার লইয়া তিনি যখন জনগণ মধ্যে দুর্ব্বার গতিতে প্রবেশ করিলেন তখন তাহাদের স্থবির দেহমন আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। তখন মহাপুরুষ অশ্বিনীকুমার, মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু দাশ, দেশপ্রিয় সেন, নেতাজী সুভাষ, লর্ড রোণাল্ডসে, বীরেন শাসমল, পি, সি রায়, প্রফুল্ল ঘোষ আর অগণিত নরনারী জনসাধারণের অকুণ্ঠ স্নেহ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। দ্বিতীয় বরিশাল কনফারেন্সের বক্তৃতার পরে দেশবন্ধু তাঁহাকে নিবিড় আলিঙ্গন করিলেন—রোণাল্ডসে Heart of Arjyabartaতে নূতন

দর্শন লাভ করিলেন। মহাত্মাজি পরিহাস বকরিয়া লিলেন শরৎবাবুকে আমি কি বলিব—তিনি তো আমার সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে চান।

অতঃপর আসিল কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া বিভেদ—দেশবন্ধু করিলেন স্বরাজপার্টি। তিনি তাঁহার মতবাদ প্রচার করিতে বাহির হইলেন—দেশবন্ধু স্বয়ং, সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি বরিশাল গেলেন—তিনি ব্রজমোহন স্কুলের মুক্ত প্রাঙ্গণে সভা ডাকিলেন। শরৎকুমার তাঁহার যুক্তি খণ্ড বিখণ্ড করিলেন এবং No changer আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। শরৎকুমার—সুরেশ গুপ্ত ও দুর্গা মোহন সেন গড়িলেন স্বরাজ সেবকসঙ্ঘ। মহাত্মাজি অতঃপর বরিশাল গেলেন—তাঁহাকে চরকা প্রদর্শনী প্রদর্শন করা হইল। উদাত্ত কণ্ঠী সঙ্গীতজ্ঞ প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী ৮০ নম্বর সূতা কাটিয়া এক খণ্ড বস্ত্র মহাত্মাজিকে উপহার দিলেন—তিনি সে বস্ত্রখণ্ড মস্তকে জড়াইয়া বলিলেন এত সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিবার অধিকার তখনও তাঁহার হয় নাই। বাজারের মা'য়েরা (শরৎবাবুর ভাষা) ঘৃণ্য জীবন ত্যাগ করিয়া সূতা কাটিয়া খদ্দর বয়ন করিয়া পরিতে আরম্ভ করিল।

তিনি দর্শন শাস্ত্র গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ১৯১৯-এ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিলেন এবং বর্ত্তমান যুগ দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি উজ্জ্বলভারতের মাধ্যমে জড় ও অজড়, দ্বৈত ও অদ্বৈত, সৎ ও অসৎ, সাকার ও নিরাকার, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, বিবর্ত্তবাদ ও পরিণামবাদ, বহু দেববাদ ও এক দেববাদ প্রভৃতি পরস্পর আপাত বিরোধী মতবাদের সুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ের দর্শন প্রস্থাপন করিয়াছেন। সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার একটা অভিনব মৌলিক দৃষ্টি ছিল—গতানুগতিক পন্থার বাহিরে তিনি এক উচ্চাঙ্গের ব্যাখ্যা দিয়াছেন।—অধ্যাত্ম বাদের সহিত বিপ্লববাদের সমন্বয়, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনায় সামঞ্জস্য, প্রাচীন আদর্শের সহিত নূতন সর্ব্বজাগতিক আদর্শ। বর্ত্তমানের সহিত ভবিষ্যতের সামঞ্জস্য সাধনের পথ প্রদর্শনে—নীরস কঠিন ও জটিল বিষয়কে সহজ ও মর্ম্মস্পর্শী করিয়া তোলায় তিনি যেরূপ দক্ষ ছিলেন, তাহা তাঁহার অনন্য-সাধারণ, অসামান্য ও অলোক-সাধারণ মনীষার পরিচায়ক।

কলিকাতা নগরোপকণ্ঠে বাগুইআটী (দেশবন্ধু নগর পোঃ অঃ) নরনারায়ণ আশ্রম স্থানান্তরিত করিয়া যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া গিয়াছেন—তাহা

ব্রহ্মচারিণী—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম শিক্ষায় শিক্ষিতা রেণু মিত্রের গঠন শক্তির পরিচায়ক।

কিন্তু হায়! এই যে কয়েকমাস পূর্ব্বে স্বামীজির ৭৫ বৎসর বয়সাতিক্রমের তিথি পালন করিতে গিয়া যে আশা পোষণ করিতেছিলাম, তাহা যে একটা দমকা হাওয়ায় হঠাৎ নিভিয়া যাইবে তাহা ভাবিতে বড় বাজে মরমে। দেখিলাম তথাকার বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ স্বামীজিকে ঘিরিয়া একটী উৎকৃষ্ট শিক্ষাকেন্দ্র গড়িতে দৃঢ় ও ধৃতব্রত। চারিদিকে উদ্বাস্তু শিবিরের অসংখ্য নরনারায়ণ তাঁহার গৈরিক পতাকাতলে সমবেত। কিন্তু মহাস্তম্ভ ভূগর্ভে প্রোথিত হইল—

কে জাগাবে আজ
কে করিবে কাজ!

একমাত্র রেণুকেই তো দেখি—কিন্তু অবলা নিরাশ্রয়া এই রোগক্ষীণা নারী কি পারিবে গুরুদেবের পরিত্যক্ত অসমাপ্ত কার্য্যগুলি সুষ্ঠুরূপে সম্পূর্ণ করিতে? স্নেহ পাপশঙ্কী, তাই ভয় হয়! তথাপি জানি এমন করে সকল জীবনে তীব্র দাহন জ্বালো! তাঁহার মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থগুলি—ব্রহ্মসূত্র, ঈশোপনিষৎ, কেনোপনিষৎ, অন্যান্য উপনিষৎ, গীতা, স্বরাজের পূর্ণরূপ প্রভৃতি গ্রন্থ—প্রচারিত হউক। তাঁহার গুরুভ্রাতাগণ নিশ্চয় আসিয়া তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইবেন, কারণ একথা অনস্বীকার্য্য যে পুরুষোত্তমানন্দই ছিলেন মহানির্ব্বাণ-মঠের প্রধান স্তম্ভ—তাঁহার সহসা তিরোধানের পরে আজ মহানির্ব্বাণ মঠের সকল শক্তি সংহত ও সংযত করিয়া মঠরক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হউন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোধানের পর নরেন্দ্রনাথ দত্তের অবস্থা যাহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন কি কাণ্ডারীবিহীন অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ সেদিন পড়িয়াছিলেন। অবশ্য যদি নরেন্দ্রনাথ ও মহা-নির্ব্বাণ মঠের কর্ম্মীদের মধ্যে আপাততঃ শক্তির তারতম্যও থাকে তেমন আজ দেশের অবস্থাও উন্নততর হইয়াছে—তাই আমরা রেণুকে বলি—মাভৈঃ তোমার সম্মুখে কত আদর্শ—তুমি নির্ভয়ে তাঁহার চলার পথে অগ্রসর হও, অবশ্য তাঁহার আদর্শ ধরিয়া রাখিতে পারিবে, বিশ্বাস করি।

আর স্বামীজির ভক্ত অনুরক্তদিগের নিকটে আমাদের নিবেদন তাঁহারা যেন নিজেদের দায়িত্ব ও স্বার্থ সম্যক উপলব্ধি করেন। এমন একটী প্রতিষ্ঠান গড়াইয়া তোলা সহজ নহে—অতএব নবগঠিত এই আশ্রমের পৃষ্ঠপোষক হউন

সকলে। স্বামীজির গ্রন্থগুলি প্রকাশ ও অপরাপর কাজে তাঁহারা সহায় হউন। তাহাই হইবে দেশসেবা, ধর্ম্মসেবা, জগৎসেবা—ওঁ তৎসৎ।

(১৯)

॥ শ্রীমাধব দাস সাংখ্যতীর্থ ॥

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতী যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥　শকু

রম্য বস্তুর অবলোকনে ও মধুর শব্দের আকর্ষণে সুখী ব্যক্তিও যে ঔৎসুক্য যুক্ত হইয়া থাকে তাহার কারণ, সে অজ্ঞাতসারে পূর্ব্ব জন্মের চিরস্থির সৌহার্দ্দ মনে করিয়া থাকে। তিন চারি বৎসর, পূর্ব্বে পুরুষোত্তমানন্দের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ইহার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখি নাই কিন্তু বাল্যকাল হইতেই সংবাদ পত্রের মাধ্যমে তাঁহার ও তাঁহার নামের সহিত পরিচিত ছিলাম। প্রথম দর্শনেই সেই পরিচয় তাঁহার মধুর কণ্ঠের বাণী ও উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রগাঢ় হইয়া উঠিল।

কবিপ্রবর রঙ্গলালের–স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়—একটা দেশ-প্রেমের চেতনা মনে জাগাইয়া দিয়াছিল। বাল্য কালেই "দেশকে স্বাধীন করিব" এই প্রতিজ্ঞা মনে মনে করিয়াছিলাম। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া প্রখ্যাত বিপ্লবী পুলিন বাবুর প্রতিষ্ঠিত অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলাম। বাল্যের অবাধ ও উচ্ছৃঙ্খল মন তখন কংগ্রেসী নিয়ম তান্ত্রিক উপায়ে আকৃষ্ট না হইয়া উদ্দাম বিপ্লবী তন্ত্রেই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

বঙ্গভঙ্গের দেশব্যাপী আন্দোলনের সময় বহু দেশ ভক্ত নেতা ও মহাত্মার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছিল। দেশ-ভক্ত ও বাগ্মীপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, দেশবরেণ্য অশ্বিনী কুমার দত্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, বাল গঙ্গাধর তিলক, আনন্দ চন্দ্র রায়, আনন্দ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বহু নেতৃবৃন্দের সহিত দর্শনের ও তাঁহাদের বাণী শ্রবণের

সৌভাগ্য আমার উপস্থিত হয়। এই সময়েই শ্রীযুক্ত শরৎ কুমার ঘোষের উন্মাদিনী ও ওজস্বীনী বক্তৃতা সংবাদ পত্রের মারফতে আমাকে আকৃষ্ট করে। তখন শরৎ কুমার দেশ-প্রেমিক ও দেশ ভক্ত। এই দেশ-প্রেমিকতার মধ্য দিয়াই বোধহয় তাঁহার ভাবী জীবনের আধ্যাত্মিকতার বীজ স্ফুরিত ও অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

অশ্বিনী কুমার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, আমার কুল দেবতা শ্যামসুন্দর যদি মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, অশ্বিনী তুই মুক্তি চাস? তাহা হইলে আমি বলিব, না ঠাকুর! আমি মুক্তি চাই না। যে পর্য্যন্ত দেশের একটী লোকও অমুক্ত থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমি যেন এই ভারতের যে কোন স্থানে যে কোন বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাদের মুক্তির জন্য সাহায্য করিতে পারি। অশ্বিনী কুমারের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শরৎ কুমারও এই ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন।

সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। নিত্যগোপালের পদ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া তিনি জড় চৈতন্যের সমন্বয় বাদের গূঢ়ার্থ অবগত হইলেন এবং উহা মানব জীবনে প্রতিফলিত করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন। জড়-চৈতন্যের সমন্বয় বলিতে যিনি যাহা বুঝেন বুঝুন, আমি বুঝি জড়কে চৈতন্যালিঙ্গিত দেখাই জড় চৈতন্যের সমন্বয়। এইরূপে দর্শন করিতে পারিলেই জড়ত্বের অবসান হয় এবং জীব শিবরূপেতে অবস্থিত থাকেন। ঈশাবাস্যের প্রথম মন্ত্রে এই তথ্যই সুব্যক্ত রহিয়াছে।

ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যস্বিৎ ধনম্॥

পারপার্থিক রূপে জড় বা ক্ষর বলিয়া কোন পদার্থ নাই। উহারা জলের তরঙ্গের ন্যায় ঈশাধিষ্ঠানের উদ্‌ভূতরূপ মাত্র। এই অনুভূতিই মানুষমাত্রকে করিতে হইবে। ইহাই গোলকের কৃষ্ণের সহিত ভূলোকের কৃষ্ণের মিলন। এই মিলনেই জীবের আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়। ইহাই গোরার রূপ। ইহাই রাসেশ্বরের সহিত রাসেশ্বরীর যুগল মিলন।

মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে হইবে। ইহাই অবধূতের শিক্ষা। এই শিক্ষায়ই পুরুষোত্তমানন্দ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই বাণীই তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অবধূতের লক্ষণ তাঁহাতে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত ছিল।

যো বিলঙ্ঘ্যাশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেবস্থিতঃ পুমান্।
অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে ॥

তিনি ছিলেন অতিবর্ণাশ্রমী। তাই তিনি ক্ষরাক্ষর হইতে উত্তম পুরুষোত্তমে আত্ম সমর্পণ করিয়া পরমানন্দে বাস করিতেন। আনন্দময় লোকে অবস্থিত থাকিয়া তিনি তাঁহার আরব্ধ শিক্ষার পরিসমাপ্তি দর্শন করুন। ইহাই আমাদের ঐকান্তিক অভিলাষ।

(২০)

॥ শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় ॥

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ দেহ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁর লোকান্তর খুব আকস্মিকভাবে ঘটিয়াছে। এই মাত্র তিনি ছিলেন, তাঁর সত্যোপেত ভাবাবেগ সমৃদ্ধ বাক্যলহরী শ্রোতার মনে দোলা দিতেছিল; পরক্ষণেই তিনি জ্ঞান হারাইলেন; কিছুপরে জ্ঞান আসিল বটে কিন্তু তিনি আর উঠিতে পারিলেন না। একদিন ঐভাবে কাটিল, পরের দিন—তাঁহার নশ্বর দেহ ধরণীতল আশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিল। জগতে জীবন মৃত্যু পরস্পরের হাত ধরিয়া চলিয়াছে। তারা বিপরীত ধর্ম্মী—একথা আপাত একান্ত হলেও শেষ কথা নহে, বৃহত্তর সমন্বয়ে উভয়ে বিধৃত—এই নিত্য সত্য জীবনে উপলব্ধি করিয়া মরণের আকস্মিকতায় তিনি যেন সেই উপলব্ধিরই পরিচয় রাখিয়া গেলেন।

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ একদা বরিশালের শরৎ ঘোষ নামে সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা ও কর্ম্মশক্তি তাঁর এই খ্যাতি রচনা করিয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠার মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইলে আরও গভীরে নামিতে হয় এবং অনুসন্ধানে পাওয়া যায় তাঁর বলিষ্ঠ মনুষ্যত্ব। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ ছিলেন বিপ্লবের অগ্নি-গর্ভ উপাদানে গঠিত। জীর্ণ ও মলিন যাহা কিছু সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আত্মসাৎ হইয়া যায় আর সেই ভস্মাবশেষ হইতে আহৃত হয় নবসৃষ্টির নূতন উপাদান—শুচিতা, শুভ্রতা, কঠোরতা ও বলিষ্ঠতা। আযৌবন তিনি বিপ্লবের পতাকা বহন করিয়া গিয়াছেন। ভাববিপ্লব, কর্ম্মবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব—তারই তরঙ্গে আন্দোলিত হইতে হইতে সমগ্র জাতির নবীন হইয়া উঠিবার তপস্যা, সেই তপস্যার

বিপুল আনন্দবেগ, গভীর নিষ্ঠা ও অপূর্ব্ব আত্মদান—এ সকলই তাঁর জীবনকে উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নবযুগের একান্ত বাঞ্ছিত সফলতার আস্বাদন দিয়াছে।

রাজনীতির যে দিকটা আশু কার্য্য সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠালাভের মোহে আচ্ছন্ন ও ম্লান, রাজনৈতিক আন্দোলনে নিজেকে ভাসাইয়া দিলেও, সেই অন্ধকার ভূমি তাঁহাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। সন্ন্যাস গ্রহণ যখন তিনি করেন নাই তখন হইতেই তাঁহার মন সন্ন্যাসী হইয়া ছিল। গার্হস্থ্যের বেষ্টনীর মধ্যেই মনে তাঁর গৈরিকের রঞ্জন ধরিয়াছিল। ভারতবর্ষের শক্তি কোথায়, ঐশ্বর্য্য কোথায়, স্বকীয়তা কোথায়, তপস্যা দ্বারা তাহা উপলব্ধি করিয়া কর্ম্মের বন্ধুর পথে বিপুল আনন্দ ও আগ্রহে তিনি বিচরণ করিয়াছেন এবং সেই উপলব্ধিই তাঁর সর্ব্ববিধ কর্ম্মচেষ্টায় ছন্দ রক্ষা করিয়া তাঁহাকে সুষমামণ্ডিত করিয়াছিল। বাংলার যেখানেই তিনি মহাত্মা গান্ধীর বাণী বহন করিয়া গিয়াছেন, সেখানেই জনগণের উন্মাদনা শুধু মাত্র উত্তেজনায় নিঃশেষ না হইয়া, চরকা খাদি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অস্পৃশ্যতা পরিহার, মাদক বর্জ্জন প্রভৃতি নানা গঠন কর্ম্মের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মধ্যে লোকে আশার আলো দেখিয়াছে, পথের ভরসা ও কর্ম্মের দিশা পাইয়াছে; তাঁহার আহ্বানে ত্যাগ ও আত্মদানের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, লোকে ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইয়াছে।

বরিশালের এক সম্মেলনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আপন গলার মালা খুলিয়া আবেগভরে শরৎ ঘোষের গলায় পরাইয়া দিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর নেতৃত্বের মহিমা তখন শিখরদেশ স্পর্শ করিয়াছে। সেই শিখরদেশ হইতে তিনি শরৎ ঘোষের মধ্যে স্বাদেশিকতার যে শক্তি ও সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা সামান্য নহে।

গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় ভবিষ্যৎ মানব সমাজের জন্য অধ্যাত্মভূমি তথা সামাজিক জীবনেরও স্থিতিভূমি রচনার উপাদানের সন্ধান তাঁহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। সে ব্যাখ্যা গভীর, অধ্যাত্মের নূতন ভূমি জয় করিতে অভিলাষী, পাশ্চাত্য চিন্তারাশির মর্ম্মভেদ করিয়া গঠনের নূতন পথের ইঙ্গিত ও আলো দিতে এবং পাথেয় সংগ্রহ করিতে বদ্ধপরিকর। কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়া, ইদানীং সাধনা ও চিন্তার ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তিনি দেশের ও মানবের সেবা করিতেছিলেন।

সন্ত বিনোবাজীর ষষ্টিতম জন্মদিবস পালন উপলক্ষে কলিকাতা সেনেট হলে অনুষ্ঠিত জনসভায় তিনি বক্তৃতা দেন। সে বক্তৃতা হইতে বুঝা গিয়াছিল বিনোবাজীর ভূদান আন্দোলন তাঁর মর্ম্মে টান দিয়াছে।

তাঁর মৃত্যুতে বাঙালী একজন যথার্থ মানুষ হারাইল।

(২১)

।। শ্রীশচীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ।।

সুপারিনটেনডেন্ট, ১১ নং বাগজোলা ক্যাম্প

শ্রীমৎ স্বামীজীর দেহত্যাগের সংবাদ হঠাৎ যখন কানে এসে পৌঁছল, তখন মনে হলো 'বিনা মেঘে বজ্রপাত'। স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হলাম। এই সেদিন যাঁর সাথে হল এত হৃদ্যতা, মর্ম্মস্পর্শী ও প্রাণস্পর্শী মনের আদান প্রদান, যাঁর কৃপা, ভালবাসা ও স্নেহে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলাম, আজ তিনি যে হঠাৎ আমাদের এভাবে ফাঁকি দিয়ে চলে যাবেন, তা একদিনও কল্পনা করিনি। শ্রীমৎ স্বামীজীর সংস্পর্শে এসে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেছিলাম। তাঁর পূতঃ স্পর্শে জীবনের অনেক গ্লানি এবং চিন্তাধারা বদ্‌লে গিয়েছিল। তাঁর ভিতরে এমন এক অলৌকিক শক্তি ছিল, যার দ্বারা এই জীবনের অনেক সমস্যাকে অতি সহজ ও সরলভাবে মীমাংসা করে দিতে পারতেন।

তিনি আমাদের উদ্বাস্তু শিবিরগুলির মাঝখানে একটি ছোট আশ্রম স্থাপন করে এই বছর দুই হল এই গ্রামে এসেছিলেন। উদ্বাস্তুদের ওপর ছিল তাঁর অপার করুণা ও স্নেহ। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় অতি আকস্মিক ও অল্পদিনের। একদিন হঠাৎ আশ্রমের পাশ দিয়ে যাবার সময় নজর পড়ল এক অতি দীর্ঘকায় গৈরিক বসন পরিহিত পরম রূপবান পুরুষ। চম্পক এবং গলিত স্বর্ণের ন্যায় গৌরকান্তি। তাঁহার মুখপদ্ম হতে আনন্দ স্ফুরিত হচ্ছে, মনে হলো তিনি জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানানন্দ।

আলাপ করার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সাহস করে এগিয়ে গেলাম। আলাপ হ'লো অনেকক্ষণ। মুগ্ধ হয়ে গেলাম তাঁর দার্শনিক তত্ত্বে। তাঁর তত্ত্বের ভিতরে পেলাম নূতন করে চিন্তা করার ও ভাববার জিনিষ যা নাকি পূর্বে কোন পুস্তকে বা কোনো মনীষীগণের উপদেশের ভিতরে পাই নি। অদ্ভুত ছিল তাঁর চিন্তাধারা, অনুভূতি ও কর্ম্মশক্তি। যে অনুভূতির দ্বারা তিনি

ভগবান শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ও গৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতেন বিভিন্ন প্রবন্ধে তাঁর মাসিক পত্রিকা উজ্জ্বল ভারতে, তা সত্যই অতুলনীয় ও ভাষায় অবর্ণনীয়।

তাঁর বর্ণনায় মূর্ত হয়ে উঠ্‌ত শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন চরিত্র—যেমন, দার্শনিক, প্রেমিক, রাজা ও সাম্যবাদী। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁর এই নূতন ধরণের ব্যাখ্যা পূর্বে আমরা কখনও পাইনি এবং ভবিষ্যতেও আর পাব কিনা সে বিষয়ে আছে ঘোরতর সন্দেহ।

তিনি উদ্বাস্তুদের প্রায় উপদেশ দিতেন, তোমরা হতাশ হয়ো না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং রাজা হয়েও হলেন উদ্বাস্তু ও বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করে পুনর্ব্বসতি নিলেন দ্বারকায়। দ্বারকাকে তিনি আবার গড়ে তুললেন। প্রায়ই তিনি উদ্বাস্তুদের বলতেন, তোমরাও ঐক্যবদ্ধ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে চল্‌লে মরুভূমিকেও শ্রীবৃন্দাবনে পরিণত করতে পার। তোমরা শ্রমিক, শ্রমের দ্বারা সব কিছু করা সম্ভব, কিন্তু তার সাথে অর্থেরও প্রয়োজন আছে। অর্থহীন শ্রমিকের কোন মূল্য নাই এবং শ্রমবিহীন অর্থেরও কোন মূল্য নাই। অর্থাৎ ধনী এবং শ্রমিক উভয়েই ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। একজনকে বাদ দিয়ে আর একজন চল্‌তে পারে না। কাজেই উভয়ের মিলন অবশ্যম্ভাবী, নতুবা উভয়েরই বিপদ। সুতরাং উভয়ের এই মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত সমাজের সত্যিকারের উন্নতি ও দেশের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আশা করা যায় না। তাই তিনি তাদের প্রায়ই বল্‌তেন যে তোমাদের অর্থের প্রয়োজন এবং এই অর্থের জন্য সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। সেই ভাবে চল্‌লে তোমাদের ভবিষ্যত নিশ্চয়ই উজ্জ্বল হবে। তাঁর এই নিগূঢ় সত্য-তত্ত্ব বাঙ্গলার ধনিক ও শ্রমিকের ঘরে ঘরে গিয়ে পৌছাক এবং উভয়ের মিলনে খণ্ডিত, দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত বঙ্গদেশ আবার হয়ে উঠুক সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা সোনার বাঙ্গলা। এই প্রর্থনা রইল ভগবানের শ্রীচরণে।

উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর একটী সহজ স্নেহ ছিল। তাদের চরিত্র ও মনোবলের সম্বন্ধে যেমন তিনি উপদেশ দিতেন, তেমনি তারা ডাকলে নিজের সুখসুবিধার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তাদের ডাকে সারা দিতেন। বিগত দুর্গা-পূজার সময় তিনি দুদিন উদ্বাস্তুদের মধ্যে এসে তাদের পূজার উদ্বোধন ও বিজয়ার প্রীতি সম্মেলন করে তাদের আনন্দ ও উপদেশ দিয়েছেন। আবার এই সেদিন দোল পূর্ণিমার দিনে রবিবার থাকায় তাঁর আশ্রমে দু'ঘণ্টার বক্তৃতা সেরে আবার রাত আটটায় গিয়ে উদ্বাস্তুদের হরিসভায়

উদ্বোধন করে সেখানে তাদের গৌরাঙ্গদেবের বিশ্বপ্রেম-তত্ত্ব শুনিয়েছিলেন। তাঁর উপদেশ-বঞ্চিত হয়ে উদ্বাস্তুরা সত্যিই অমূল্য জিনিষ হারাল!

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ছিলেন সত্যিকারের তাঁর গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক। 'আমি বিশ্ব নাগরিক' শ্রীনিত্যগোপালের এই বাণীকে জীবনের সকল স্তরে উপস্থিত করা, আস্বাদন করা ও তাকে বিশ্ববাসীর দুয়ারে পৌঁছে দেওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ। এই কাজ তাঁর সাধ্যানুযায়ী শেষ করে তিনি চলে গেলেন আমাদের মধ্য থেকে। তাঁর এই চিন্তাধারাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার বাসনায় তিনি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করলেন উজ্জ্বলভারত মাসিক পত্রিকা, যার ভিতর শ্রীনিত্যগোপালের বহু উপদেশাবলী বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হচ্ছে।

'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি', তিনি দেহরক্ষা করলেও তাঁর সুকীর্ত্তি তাঁকে অমর করে রাখবে। অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে তাঁর এই বৃহৎ কর্ম্মময় জীবনের অবসানে দেশ এবং জাতির যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো তা অবর্ণনীয়।

তাঁকে আজ আমার প্রাণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাই—তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুণ।

(২২)

॥ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ॥

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শরৎকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত কিছুদিন আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের এক বোর্ডিংএ একত্র বাস করিয়াছিলাম। ঐসময় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র বাঙলায় প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল। তখন কিন্তু শরৎকুমারকে রাজনীতি ব্যাপারে ততটা মাথা ঘামাইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

ঐসময় তিনি হাওড়া কিম্বা অপর কোথাও সাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। কোন কোন সময় সেখানে তিনি সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া বোর্ডিংএ ফিরিতেন। কিন্তু ঐ সম্বন্ধে তিনি কখনও কাহারও সহিত আলোচনা করিতেন বলিয়া মনে পড়ে না। কখন কখন দেখিতাম চক্ষু নিমিলিত করিয়া এবং ভাবে বিভোর হইয়া বসিয়া থাকিতেন এবং তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে-থাকিত।

ঐ বোর্ডিংএ থাকাকালীন হ্যারিসন রোডে তিনি একটী কাটা কাপড়ের দোকান খুলিয়া ছিলেন। দোকানে বেশ একটু লোকসান চলিতেছিল। এবং অধিকদিন উহা টিকেও নাই। কিন্তু এই উপলক্ষে তিনি যে একটী কথা বলিয়া ছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্তও ভুলিতে পারি নাই। তিনি বলিয়াছিলেন "নিক্তির ওজনে টাকা পয়সা লাভ লোকসান খতাইয়া দেখা আমার পোষায় না। বালক বালিকারা তাদের মনের মত জামা পাইয়া যে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিত, উহাতে আমি যে আনন্দ পাই টাকা পয়সা দ্বারা সে আনন্দ কেহই লাভ করিতে পারে না।"

উহাব পরে একত্র থাকিবার সৌভাগ্য আমার কখনও হয় নাই।

কবিরাজ প্রসন্ন কুমার আমাদের উভয়ের বন্ধু ছিলেন। বন্ধুকে চির নিদ্রিত দেখিয়া শরৎকুমার যে ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছিলেন, বন্ধুর মৃত্যুতে ঐরূপ ব্যাকুলতা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। আমার যতদূর মনে পড়ে শরৎকুমারের সঙ্গে খুব সম্ভব তাঁহার স্ত্রীও শ্মশানে গিয়াছিলেন।

শরৎকুমারের সঙ্গে একত্র বাসের কিছুদিন পর হইতেই আমি ডুবিয়া যাই চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়নে, অধ্যাপনায় এবং রুগ্ন ব্যক্তির স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে। চিকিৎসক জীবনের প্রথম অবস্থায় তাঁহার সজাতীয় এক বৃদ্ধা রোগীণীকে দেখিতে তিনি আমাকে কালীঘাট নিয়া গিয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে এক সময় দুইজনে অনেক সময় একত্রে কাটাইয়া ছিলাম। ঐ সময়ও তাঁহার হৃদয়ের প্রসারতা উপলব্ধি করিয়াছি। চিকিৎসক জীবনে খবরের কাগজ ব্যতীত বাহিরের সম্বাদ জানিবার উপায় আমার খুব কমই ছিল। তবে চিকিৎসা ব্যপদেশে আমার নিকট যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের নিকট হইতেই কখন কখন কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করার প্রকৃতি আমার ছিল এবং আছে বটে।

অনেক বৎসর পরে জানিলাম যে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌সটিটিউটে শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন। এখানে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার ছিলেন সর্বোদয়, সমন্বয় এবং সংরক্ষণের প্রতীক। এই সময় শরৎকুমারের ভাবধারা ক্রমপ্রকাশ লাভ করিতে লাগিল।

অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র বরিশাল শরৎ কুমারকে একজন সত্যিকারের প্রেমিক, দরদী, এবং বাগ্মী বলিয়া চিনিতে পারিল। শুনিয়াছি যে ঐসময় যেখানেই তিনি বক্তৃতা করিতে যাইতেন সহস্র সহস্র নরনারী সেখানে

উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার আবেগপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন এবং দেশ মাতার উদ্ধারের জন্য অকাতরে অর্থ এবং অলঙ্কারাদি তাঁহার কাছে সমর্পণ করিতেন। আইন অমান্য করিতে গিয়া তাঁহাকে একাধিকবার কারাবরণও করিতে হইয়াছিল।

যখন স্বরাজ প্রাপ্তির সম্ভাবনা সন্নিকট বলিয়া মনে হইল তখন রাজনীতি অন্যান্য নেতাদের উপর ছাড়িয়া দিয়া তিনি ব্রতী হইলেন নীতি এবং ধর্ম্ম চিন্তায় গ্লানি দূর করার ব্যপদেশে প্রচার কার্যে এবং দক্ষিণ কলিকাতায় তিনি তাঁহার কার্য্যারম্ভ করেন। এখানেও শত শত নরনারী ভাগবত গীতা, উপনিষৎ প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থের বাণী এবং ব্যাখ্যা শুনিয়া দিনদিন মুগ্ধ এবং অনুপ্রাণিত হইতে লাগিল। শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদস্থ অনেকের নিকট তাঁহার সংস্কৃত বিশেষতঃ; ধর্ম্ম এবং দর্শন শাস্ত্রে অগাধ কথা শুনিয়াছি। তাঁহার প্রচারিত মাসিক পত্রিকা 'উজ্জ্বল ভারতে'র এখন একাদশ বর্ষ চলিতেছে; তিনি অনেক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। উহার কতকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে অনেকগুলি এখনও মুদ্রিত হয় নাই।

দুই বৎসর গত হইল কলিকাতার উত্তরে বাগুইআটির পূর্ব্বাঞ্চলে নরনারায়ণ আশ্রম স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। উহার সন্নিকটে আমাদের একটি পল্লীনিবাস রহিয়াছে। বার্দ্ধক্য এবং পঙ্গুতার জন্য, বিশেষতঃ ঐ নিবাসটিতে বাস করিবার এতাবৎ কোনও সুবিধা করিতে পারিয়াছিলাম না বলিয়া আমি একদিন মাত্র ঐ আশ্রমের সুশীতল ছায়ায় অল্প কিছুক্ষণ কাটাইতে পারিয়াছিলাম, কেবলমাত্র অল্প সময়ের জন্য তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহার গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের আলেখ্য দর্শন এবং প্রণতির সুযোগ পাইয়াছি। ঐ সময়ে নির্বাক শ্রোতাগণ যেরূপ আগ্রহে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিতেছিল তাহাতে মনে হইয়াছিল যে উক্ত পল্লী তাঁহার আগমনে ধন্য হইয়াছে এবং হইতেছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের যে তাঁহার অনেক ভক্ত এবং গুণমুগ্ধদের কাঁদাইয়া তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইয়াছে।

নরনারায়ণ আশ্রম চিরস্থায়ী হউক, আশ্রমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হউক—ইহা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি। আর প্রার্থনা করি, স্বামীজীর স্মৃতি অমর ও অক্ষয় হউক।

সাময়িকী

উজ্জ্বলভারত-সমস্যা ঃ—উজ্জ্বলভারতের সম্পাদক আজ আর দেহেতে নাই। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে উজ্জ্বলভারত চলিবে কি করিয়া? যিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর, যিনি ছিলেন কর্মের সাগর, যিনি ছিলেন সমস্ত প্রেরণার খনি, সমস্ত আনন্দের উৎস—তিনিই নাই—তাহা হইলে উজ্জ্বল-ভারত চলিবে কি করিয়া? প্রশ্ন সঙ্গতই বটে। বুকের কাছ থেকে যখন মায়ের সন্তান নাই হইয়া যায়, একান্ত ভাবে নির্ভরশীল সন্তানের কাছ থেকে পিতা মাতা যখন নাই হইয়া যান, স্ত্রীর কাছ থেকে যখন স্বামী নাই হইয়া যায় কিংবা স্বামীর কাছ থেকে যখন স্ত্রী নাই হইয়া যায়, তখন সে না-থাকা যে কী বস্তু, সে কথা যাহাদের এমন ঘটনা হইয়াছে এবং যাহারা সংসারে ভালবাসিতে জানেন এবং ভালবাসা পাইয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে সংবেদনশীল, মানুষের হৃদয়ের মর্যাদা ছিল যাহার কাছে সর্বাপেক্ষা বড় কথা—তাঁহার স্নেহ লাভ করিবার, দীর্ঘদিন তাঁহার ছায়ায় বাস করিবার সৌভাগ্য যাহার হইয়াছে, তিনিই বুঝিবেন সেই শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের না থাকাটা আজ কি! সংসার এবং সন্ন্যাস দুই-ই যাঁহার চলার পথ ছিল—অর্থাৎ প্রচলিত সংসারের পথে চলিতেন না বলিয়া সংসারের সুযোগ সুবিধা যিনি লন নাই এবং প্রচলিত সন্ন্যাসের পথেও চলিতেন না বলিয়া সন্ন্যাসের সুযোগ সুবিধাও যিনি গ্রহণ করেন নাই—যাঁহাকে এক নূতন পথে চলিতে হইয়াছে অথচ প্রতি পদে যিনি ছিলেন অতন্দ্র ও অচ্যুত, তাঁহারই প্রত্যক্ষ পথ-নির্দেশ হইতে আজ বঞ্চিত হইয়া তাঁহারই পথে চলা যে কি বস্তু, তাহা ভাষায় বুঝানো সম্ভব নয়। তাই উজ্জ্বলভারত চলিবে কি করিয়া—এ প্রশ্ন সঙ্গত প্রশ্ন, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই এ প্রশ্ন মনে উঠিয়া যায়।

কিন্তু—এই কিন্তুর যাহা উত্তর তাহা স্থূল যোগ-বিয়োগের হিসাব নহে—খাতার পাতা উল্টাইলেই তাহা স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়িবে না—তাহা জীবনের পাতা উল্টাইয়া দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে প্রমাণ পাইতে হইবে, প্রমাণ দিতে হইবে। এইখানে যাহা আসিয়া পড়ে তাহা বুঝিতে হইলে বাস্তবের দৃঢ়ভূমিতে

দাঁড়াইয়া আদর্শ ও কল্পনার পথের খোঁজ লইতে হইবে। যে আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তব জীবনকে ভাগবত রূপায়নের আদর্শ—তাহা আকাশ কুসুম নহে। যে সত্যটী আজ আকাশে বাতাশে ভাসিতেছে, দ্বান্দ্বিক জীবন-যাপনে ক্লান্ত মানুষের অবচেতন সত্তা যাহা আজ সত্যই চাহিতেছে, পারস্পরিক হিংসাদ্বেষে অবসন্ন বিশ্বের রাজনীতির মধ্যে যখন একদিকে আধুনিকতম মারণাস্ত্র অপর দিকে সহাবস্থান নীতি আত্মপ্রকাশ করিয়া বসিয়া আছে—তেমনই একটী অবস্থাকে মানসনেত্রে দেখিতে পাইয়াই পুরুষোত্তমানন্দ ১৯১৯-এ রচিত তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের অবধূত ভাষ্যে সর্বসমন্বয়ের এক মহারাসের ছবি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। মানুষের অন্তরাত্মা যে মিলন চাহিতেছে তাহাকেই তিনি ভারতের প্রস্থানত্রয়ের মধ্য হইতে তুলিয়া ধরিয়া মানুষের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। কোনো চিন্তাধারাই একটা দার্শনিক কাঠামো না হইলে টিকিয়া থাকিতে পারে না! শ্রীনিত্যগোপাল তাঁহার বহু গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ তত্ত্বের সমন্বয়ের যে সূত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, পুরুষোত্তমানন্দ তাহা প্রস্থানত্রয়ের (ব্রহ্মসূত্র, উপনিষৎ, গীতা) মধ্য দিয়া ব্যাখ্যা করিয়া ধরিয়াছেন। তিনি তো কোনো সম্প্রদায় গড়িতে আসেন নাই—সর্ব সম্প্রদায়ের মিলনের গান গাহিবার জন্য শ্রীনিত্যগোপাল-ব্রহ্মবিদ্যাপীঠ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেখানে বসিয়া সকলে মিলনের গান গাহিবে, উজ্জ্বলভারতের মারফত সেই মিলনের গান ছড়াইয়া দিবে। যাহা সকলের কথা, যাহা সকলের মিলনের কথা, তাহা না চলিবে কেন? তাহা যে চলিতেইছে—অচল কথা তো তাঁহার নহে। যাহা সকলের অন্তরাত্মায় ফল্গুধারার ন্যায় চলিতেছে, তাহাকে সাজাইয়া গুছাইয়া সামঞ্জস্য আনিয়া মানুষের কাছে উপস্থিত করিবে উজ্জ্বলভারত। মানুষের যে ভাগবত স্বরূপ তাহা তো মানুষের মধ্যেই আছে, সে ভাগবত স্বরূপের আস্বাদনের কথা তিনি আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন, প্রত্যক্ষে থাকিলেও ইহা তাঁহার কাজ, তাঁহার দায়িত্ব, নেপথ্যে থাকিলেও ইহা তাঁহারই কাজ, তাঁহারই দায়িত্ব। মানুষের মধ্যে যাহা সচল, সে চলা-কথাকে তিনিই চালাইতেছিলেন, চালাইবেন। আদর্শ তাহার নিজস্ব গতিতে চলিবে—উহা কর্মকর্তৃবাচ্য বিশেষ, কাহাকেও করিতে হয় না—আপনি চলে।

তাই উজ্জ্বলভারতও চলিবে। তবে যে আমরা আছি?—হ্যাঁ, আমাদের কিছু করণীয় অবশ্যই আছে—আমরা তাঁহাকে ধ্যান করিব,

তাঁহার কথাকে ধ্যান করিব, আমাদিগকে তিনি যে ভাবে চলিতে বলিয়াছেন সেই চলার পথকে ধ্যান করিব। এই ধ্যানকে আমরা কর্মে রূপ দিব, আমরা অনলস অতন্দ্র থাকিয়া ত্যাগে তিতিক্ষায় প্রেমে তাঁহার কাজ করিয়া যাইব। আমাদের প্রতি কাজ আমাদের খেয়ালখুসীকে চরিতার্থ করিবার জন্য নয়, আমাদের প্রতি কাজ হইবে তাঁহার সেবা, তাঁহার এত প্রিয় বিশ্বের সেবা, আমাদেরও সেবা। সেবা বুদ্ধি ছাড়া, মানুষের সহিত মিলনের বুদ্ধি ছাড়া আমাদের যেন অন্য কোন বুদ্ধি না থাকে। শ্রীনিত্য-গোপালের যাহা শেষ বাণী ছিল, তাহা তাঁহারও শেষ বাণী—এ কথা তিনি যেমন অন্য অনেক সময়ে বলিয়াছেন, তেমনি যেদিন তিনি অজ্ঞান হইলেন সেই দিন অজ্ঞান হওয়ার আগে তিনি তাঁর শেষ বক্তৃতায় শ্রীনিত্যগোপালের শেষ বাণী উদ্ধৃত করিয়া তাহা আমাদের শেষ বারের মত স্মরণ করাইয়া দিয়া গিয়াছেন—'আমার শিষ্যগণের প্রতি আমার এই শেষ উপদেশ যে তাঁহারা পরস্পর ভ্রাতৃভাবে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বিপদে পড়িলে অন্য সকলে তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। যদ্যপি কাহারো কোন কষ্ট হয় তবে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন। পৃথিবীস্থ যাবতীয় লোককে ভ্রাতৃভাবে দেখিবেন ও পরস্পর সাহায্য করিবেন। অনাথ আতুর দেখিলে সাহায্য করিবেন, পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন না। সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবেন।'—এই বাণী আমাদের প্রতিদিনের সাধ্য বস্তু হউক।

পারস্পরিক এতটুকু অপ্রীতির গন্ধ পাইলে তিনি বেদনাতুর হইতেন। তাই আমাদের চলার পথ সামান্যতম অপ্রীতিদ্বারা যেন কলুষিত না হয়—এ বিষয়ে আমাদের খুব বেশী সচেতন হইতে হইবে। কেবল ব্যক্তিগত জীবন যাপন তিনি কখনো সহিতে পারিতেন না—নিজের খাওয়াপরার মান বাড়াইয়া নিজে সুখে শান্তিতে থাকা তাঁহার ধাতে ছিল না। কাহারো দুই তরকারী দিয়া খাইবার পয়সা থাকিলে বলিতেন এক তরকারী দিয়া খাইয়া সুস্থ থাকিবার মানসিক বল লাভ কর, আর এক তরকারীর পয়সা আর একজনের খাবারের জন্য দাও। নিজে তিনি সারাজীবন কৃচ্ছ্রতার মধ্যে আনন্দ পাইয়াছেন, আমাদেরও তাহারই কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। খাই দাই ঘুমাই বা দৈনন্দিন কাজটুকু শুধু সারিয়া রাখি—বস্, দিন কাটিয়া গেল—এমন নিরুদ্বিগ্ন বিপ্লবহীন জীবন তিনি সহিতে পারিতেন না। তাঁহার

কথা ছিল খাওয়া দাওয়া ঘুম যত অল্প সময়ে সম্ভব শেষ কর—তারপর বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিশ্বসেবা কর—কোথায় মানুষের দুঃখ, কোথায় মানুষের সমস্যা তাহা বুঝিয়া সেইখানে প্রাণ ঢালিয়া সেবা কর।

মানুষের দুঃখ নানারকমের, তাহার দেহের দুঃখ দূর করা যেমন কাজ, মানুষের মনের দুঃখ, চিন্তার দৈন্য, সমস্যার আলো দেখানও তেমনি মানুষের সেবা। বর্ত্তমান বিশ্বের জটিল আবেষ্টনে যেখানে সত্য তাহার সর্বাঙ্গীণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যেখানে কাহারো জন্যই কোন নির্দিষ্ট পথ নাই, প্রতি পথই সকলের পথ, সেই জন্যই কোন্ পথে কাহার চলিলে যে তাহার আত্মস্বরূপ তৃপ্ত হয় অথচ বিশ্বের ছন্দ বজায় থাকে, সেইটি বাহির করাই আজ সর্বাপেক্ষা দুরূহ। সেইখানে তাঁহার কাজ ছিল, কথা ছিল—আমরা সেই কাজকে, সেই কথাকে অনুসরণ করিয়া চলিব—তাহা হইলেই উজ্জ্বলভারত চলিবে। আমরা যেন নিজেদের চালাইতে পারি, তাহা হইলে ভিন্ন করিয়া উজ্জ্বলভারত চালাইবার ভাবনা আমাদিগকে ভাবিতে হইবেনা। এই তো বুঝি।

এই তো গেল উজ্জ্বলভারতের কথা—উজ্জ্বলভারতের সহিত যে কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের প্রতি আমাদের আরও দুইটী আবেদন আছে। প্রথমতঃ শ্রীমৎ স্বামীজী ১৯৪২-এর অগাষ্ট আন্দোলনে যখন জেলে গিয়াছিলেন, তখন ঈশ-কেন-কঠ-প্রশ্ন প্রভৃতি এগারখানা উপনিষদের ও গীতার অবধূত-ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ঈশ ও কেন পৃথক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে, গীতার ভাষ্য প্রায় ৬।৭ বৎসর ধরিয়া উজ্জ্বলভারতে প্রকাশিত হইয়াছে। কঠ-উপনিষদখানা ছাপা হইতেছে। সকলের প্রতি আমাদের আবেদন এই যে, তাহার বইগুলি প্রকাশের জন্য যিনি যতটুকু পারেন সাহায্য করিলে আমরা সেদিকে অগ্রসর হইতে পারিতাম।

আমাদের দ্বিতীয় আবেদন এই যে, নরনারায়ণ আশ্রমে শ্রীমৎ স্বামীজীর দেহ যেখানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে, সেখানে একখানি মন্দির উঠান একটী জরুরী প্রয়োজন। এ বিষয়েও যিনি যতটুকু পারেন সাহায্য করিলে আমরা এ কাজে অগ্রসর হইতে পারি। আমাদের একক ক্ষমতা কিছুই নাই। সকলকে আমাদের সকল কথা জানাইয়া রাখিলাম, তাঁহাদের সহযোগিতা ছাড়া আমরা কিছু করিতে পারিব না।

শ্রীনিত্যগোপাল-বাণী

'জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র সত্য চন্দ্র নয়। দূর হইতে মরুভূমির স্বচ্ছ বালুকারাশি দেখিয়া মৃগের জল বোধ হয়। বালুকাময় প্রদেশ সত্য, সেটা যাহা, তাহা সত্য, কিন্তু জলভ্রমটা মিথ্যা। জগৎ সত্য কিন্তু মায়াবশতঃ জগতকে আমাদের যাহা বোধ হয় তাহা মিথ্যা।'

* * *

'ভগবান সম্বন্ধে যত পুস্তক আছে, ভগবান সম্বন্ধে যত পুস্তক লুপ্ত হইয়াছে, ভগবান সম্বন্ধে যত পুস্তক প্রকাশিত হইবে সে সমস্তই আমার ভাগবতের অন্তর্গত। আমার ভাগবত কোন সঙ্কীর্ণ গ্রন্থ নহে।'

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩া১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

জ্যৈষ্ঠ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

১

সান্ধ্য-ভাষণ

।। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ।।

[শ্রীমৎ স্বামীজী সন্ধ্যারতির পর মাঝে মাঝে কিছু বলিতেন। পূর্ব্বে যখন তাঁহার দেহ অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিল, তখন প্রায় রোজই বলিতেন। ইদানিং তিনি দেহে মনে একটা ক্লান্তি বোধ করিতেন, তাই রোজ বলিতেন না। আমরা এইখানে ১১-ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮-তে সন্ধ্যাবেলা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার যতটুকু লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছিলাম, তাহা প্রকাশিত করিলাম। তাঁহার ভাষণ এত দ্রুত হয় যে সকল কথা লেখা সম্ভব হয় না। যতটুকু লিখিয়াছিলাম তাহাই প্রকাশ করিলাম।—স, উঃ ভাঃ]

(শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রীনিত্যগোপাল-প্রণাম মন্ত্র—)

ওঁ নমঃ তত্ত্বমূর্ত্তয়ে ভক্ত-ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্মপরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায় নমো নমঃ—ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। ওঁ হরি ওঁ ॥

আমরা যারা আশ্রমে থাকি তাদের সকলেরই একটা কথা মনে রাখতে হবে যে এটা আশ্রম। আমরা আশ্রম-দেবতা শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শনকে রূপ দেব এইজন্য এখানে এসেছি। সংসারের লোকেরাও খায়-দায় ঘুমায়, এখানেও সকলে খায় দায় ঘুমায়। তবু এটা সংসার নয়। কেন নয়, সেইটে তোমাদের বুঝতে হবে।···সংসারেও ভগবান প্রয়োজন হয়, কিন্তু সেটা পাহারাদারের মত—সংসারীরা ভগবানকে চায় তাদের সংসারটাকে নানাভাবে সুন্দর ও নিরাপদ করার প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে। ভগবানকে ডেকে বলে, ওগো দেখো, আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি,···তুমি যেন রক্ষা করো। ওগো, ব্যবসা করতে যাচ্ছি, তুমি রক্ষা করো। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার কাজ আমি করব, ভগবানের শুধু রক্ষা করার দায়। সেখানে

ভাগবত জীবন যাপন করার কোন প্রশ্ন নেই। সংসারে আমার জীবন আমি যাপন করব, ভগবান তুমি এসে সেখানে প্রয়োজন পূরণ করো। আর আশ্রমে? আশ্রমে আমার বিষয়, আমার সংসার, আমার সব কিছু, আমার জীবন বলে কিছু নাই। আশ্রম-দেবতাকে ভালবাসব, তাঁর জীবনের আলোকে নিজের জীবনকে গড়ব, তাঁর প্রয়োজন পূরণ করব—এইটে আশ্রমে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ। সংসারী অভিসন্ধিপূর্ণ, সে ভগবানকে নিজের কাজে লাগাতে চায়, আশ্রমী ভগবানের কাজে নিজেকে লাগাতে চায়। ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য আশ্রমে কারো থাকা চলবে না।…নদী কোন্ প্রয়োজনে সাগরকে ডাকে?…সংসারী শালগ্রাম দিয়ে বাটনা বাটাতে চায়, নিজেকে দিয়ে বাটনা বাটিয়ে শালগ্রামকে দিতে চায় না।…আশ্রমে থাকতে হবে সমগ্র দৃষ্টি নিয়ে।…মাটির সঙ্গে যদি গাছের মূল যুক্ত না থাকে, রস পাবে কোথা থেকে?…শ্রীনিত্যগোপালের কথা প্রতি মুহূর্ত্তে মনে রাখতে হবে—তাঁর প্রয়োজন পূরণ করতে এসেছ—তাঁর প্রতিষ্ঠা হলে তোমাদের সকলের প্রতিষ্ঠা হবে…নিজের প্রয়োজন ভুলে যাও।…আমার যা সামর্থ্য নেই, আমি তার থেকে বেশী করি মানুষের জন্য কেবল প্রাণের জোরে, প্রাণের ভরসায়। আমার টাকা নেই—আমি প্রাণের দায়ে দায়িত্ব নিয়েছি। সেই প্রাণের দিকে চেয়ে তোমাদের চলতে হবে।…নিত্যগোপাল একদল মানুষ চেয়েছেন। …সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।…দেহযন্ত্র হল সঙ্ঘের সার্থক রূপ—দেহযন্ত্র যেমন করে চলে তেমন করে আশ্রম করতে হবে।…সংসারী আশ্রমে এসে দেখবে কেমন করে পারস্পরিক প্রীতির মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে…আশ্রম হবে বিশ্রামস্থল—যেখানে একপ্রাণতা ছাড়া আর কোন কাজ নেই।·চোখের কাজ কাণ করে না, কাণের কাজ নাক করে না,…একদিক দিয়ে প্রত্যেকে পৃথক। কিন্তু আর এক দিক দিয়ে পৃথক নয়—জীবনের দিক দিয়ে তারা এক। দেহযন্ত্রে জীবন রক্ষার জন্য প্রত্যেকে দায়ী।

আশ্রমের দায়িত্বও সামগ্রিক—কাজের বিভাগ থাকতে পারে, থাকবেই; কিন্তু দায়িত্ব সকলের সমগ্রভাবে।…দাঁতে কাঁটা ফুটলে যতক্ষণ না সেটা বের হয় জিহ্বা সমানে খোঁচাতে থাকে, তার নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবার জো নেই। সে মনে করলেই পারত দাঁতে কাঁটা ফুটেছে, দাঁত বুঝুক গে, আমার কি? কিন্তু জীবনবোধ এমনই সামগ্রিক যে জিহ্বার সোয়াস্তিতে থাকবার উপায় নেই। পায়ের কনে আঙ্গুলে কাটা ফুটে বিষাক্ত হয়েছে,

মাথা টনটন করে ওঠে কেন? সমগ্র দেহ জ্বরাক্রান্ত হয়ে টিটানাস হয় কেন? কী অদ্ভুৎ সামগ্রিকতা-বোধ! প্রত্যেকে আলাদা হয়েও এক। আশ্রমে ঠিক এমনটি দরকার···প্রত্যেকের সঙ্গে এক জীবনের মধ্যে একাত্মতার সম্বন্ধ। আশ্রম-দেবতার জীবনের মধ্যে এক।···প্রত্যেকের আলাদা কাজ থাকলেও কোন্ কাজ হল, কোন্ কাজ হল না, সেজন্য প্রত্যেকের দৃষ্টি রাখতে হবে।···সম্পদ সকলের, বিপদও সকলের।···যার যার কাজ নিয়ে সে চলেছে, অন্য বিভাগ ডুবে গেলেও কিছু করবে না, এটা ব্যুরোক্রাটিক মনোবৃত্তি। প্রত্যেক কাজের জন্য প্রত্যেকে দায়ী।···অলসতা আশ্রমে চলছে।···এটা কিছুতেই চালাতে দেওয়া চলবে না।···ভাগের মা গঙ্গা পায় না—নিত্যগোপালের দায় কার দায়? কে তাঁর দায় নেবে? এখনও বোধহয় নিত্যগোপালের ৫০ জন শিষ্য আছেন। শতবার্ষিকীর সময় নবদ্বীপে নিত্যগোপালের প্রচার হবে না, কেননা টাকা নাই। আমি বলি আমি টাকা দেব—প্রচার হতেই হবে।···জীবন্ত সঙ্ঘে প্রত্যেকের দায়িত্ব সমান, মৃত যন্ত্রে যার যার তার তার।···যেখানে পারস্পরিক মিলন, সেইখানেই টাকা, যেখানে মিলন সেইখানেই বিপদের উদ্ধার।···প্রাণের মিলন চাই·· নিজের নির্দোষত্ব প্রমাণ করলে তো কাজ হবে না।···তোমার মত কাজ হবে, না কাজের মত তুমি হবে।···কাজের মত তোমাকে নিজকে গড়ে তুলতে হবে, তোমার খেয়ালখুশী মত কাজকে পিটিয়ে নিতে চাইলে বেশীদূর আর এগোতে পারবে না।···আশ্রমের মত তুমি হবে, না তোমার মত করে আশ্রমকে চালাবে?···

কী মুক্তি যে নিত্যগোপাল আমায় দিয়ে গেছেন! আমি আস্তিকের দলে যেতে পারি, আমি নাস্তিকের দলে যেতে পারি, আমি অদ্বৈতবাদীর দলে যেতে পারি, দ্বৈতবাদীর দলে যেতে পারি।···আমি কর্মীর দলে যেতে পারি, জ্ঞানীর দলে গিয়েও বসতে পাই, ভক্তের দলে গিয়েও চোখের জলে আকুল প্রাণে কাঁদতে পারি—কী অপূর্ব মুক্তি! শিবাণী নন্দন (আশ্রমের দুইটী বিড়াল) শুধু মাছ দুধ খেতে পারে—তারা কী বদ্ধ জীব! কিন্তু মানুষ সব অর্থাৎ বহু কিছু খেতে পারে—অনেকটা তার বিচরণ ক্ষেত্র! অনেকটা তার মুক্তি।···মানুষকে সংসারী হতে হবে, সন্ন্যাসী হতে হবে।···নিত্য-গোপাল লিখলেন সর্ব ধর্মের সমন্বয় করতে পারেন একমাত্র নারায়ণ!···

রসিক সব রসের থেকেই রস আহরণ করে…মধুকরের মত সব স্থান থেকেই জীবন ধারণের রস সংগ্রহ করতে হবে।…

যেখানে কাজ হচ্ছে না, সেইখানে ছুটে যেতে হবে।…প্রাণ খুলে খাট। অলসের অর্থ আসে না যেমন, অলসের ভগবানও হয় না।…আমি কোন চার্ট করে দিতে পারব না…কোন কাজ পড়ে রইল আর তুমি বসে রইলে—এ হতে পারে না। সেই গল্প জান না—এক বাবুর চাকর লিখিয়ে নিয়েছিল কি কি কাজ করতে হবে—বাবুর ছেলে জলে পড়েছে, চাকরকে বলছে তোল্ তোল্, চাকর বলে দেখে নি চার্টে লেখা আছে কিনা!—এ তো কর্মীর কথা নয়, এ প্রাণবান লোকেরও কথা নয়। যেখানে যে কাজ করার রইল, তোমার সাধ্যমত কাজ করে যাবে।…কোনো কাজ কে করবে, তা নিয়ে যদি ঠেলাঠেলি হয়, সে বড় বেদনাদায়ক।… প্রাণ নিয়ে থাক, প্রাণ নিয়ে চল—প্রত্যেকের ভার প্রত্যেকে নাও।…আশ্রম সেবার জন্য; যারা সেবক, যারা ত্যাগী, তারা কোথায় কোন্ কাজ পড়ে রইল, তাই খুঁজে খুঁজে বেড়াবে।…অংশ-দৃষ্টি নিয়ে থেকো না…বাইরে যদি পথ কারো আছে মনে কর, তাহালে আশ্রমে না থাকাই শ্রেয়ঃ।—থাকতে হলে একমনা হয়ে থাকাই প্রয়োজন। · প্রাণস্পর্শ পেলে আজও আমি অসুরের মত খাটতে পারি।…বন্ধুর বাড়ীর কাজে পাতা ফেলা পর্যন্ত আমি উপস্থিত।… যেখানে ভাগাভাগি নেই, সেইখানে শিব—শ্মশানে ভাগাভাগি নেই, শ্মশান নিয়ে কাড়াকাড়ি নেই, তাই শ্মশানেই শিব থাকেন।…কারো অসুখ হলে আমি যতটা সম্ভব তার জন্য ব্যবস্থা করি।…আমার অবস্থা হয়েছে যত পাই বেত, না পাই বেতন।…তাই এক এক সময় মনে হয় এত করেও মানুষের মন পেলাম না।·· আগের বুদ্ধিই যদি চলত, তাহালে এখানে আসা কেন?—এখানে ভগবান জাগ্রত, তাঁর প্রয়োজনানুযায়ী কাজ করতে হবে।…সংসারে রক্তের টানে ঝগড়া করেও আবার মেলে, এখানে রক্তের টান নেই—সমগ্রের মাঝে অধিকতরভাবে মিলতে হবে।…আমি প্রণামের জন্য, দীক্ষার জন্য কোন জোর করি নি, করব না—কিন্তু আশ্রমের শৃঙ্খলা ও নিয়ম মানতেই হবে—যতক্ষণ আশ্রমে আছ।…প্রার্থনা কর—বুদ্ধি দাও, হৃদয় দাও।…আমি মূর্খ, কিন্তু নিত্যগোপাল আমাকে সব সম্প্রদায়ে মিশবার মত প্রাণ দিয়েছেন।… আমার এখানে পণ্ডিত নয় কেউ…কিন্তু মানুষ হতে হবে।…পণ্ডিত না হলেও মানুষ হওয়া যায়।…তোমাদের এই সব যা বললাম, এগুলি তোমাদের প্রতি

আমার অনুরোধও বটে, ultimatum-ও বটে, কেননা মানুষ না হলে নরনারায়ণ আশ্রম চলবে না।···নিত্যগোপাল,·· মানুষ নিয়ে ঝঞ্ঝাট আর যেন আমার সয় না,···এদের তুমি মানুষ করে দাও···লক্ষ লোকের আশ্রয় যেন হয় এই নরনারায়ণ আশ্রম।···অদ্বৈতবাদের সঙ্গে দ্বৈতবাদের মিলন যেখানে আমি বলি···সেখানে দুই ভাইতে ছোটখাট ব্যাপারে মিলতে পারবে না?··· নিত্যগোপাল, তোমার প্রয়োজনে তুমি আশ্রম করেছ—তুমি প্রতিষ্ঠিত হবে...।

'ঠাকুর, সঙ্গী আমার, দুর্য্যোগময় এই পথ চলার মধ্যে তুমিই আমার সঙ্গী। আমি তোমার সঙ্গ চাই-ই। তোমার বিশ্বভুবনের মাঝে দাঁড়াইয়া সকলের পাওয়ার সঙ্গে পাওয়া মিলাইয়া আমি তোমার সঙ্গে থাকিতে চাই। আমার মত করিয়া তোমায় পাইলে ত তোমার 'জগন্নাথ' রূপের কোনও অর্থ হয় না। আমি তোমার মত করিয়া, তোমার বিশ্বের মত করিয়া তোমাকে পাইতে চাই। তোমাকে সত্য করিয়া পাইতে হইলে 'আমি'-র ব্যবধান থাকিলে তো পাওয়া হইবে না। আমি প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গ পাইতে চাই। নির্ব্বিকল্প না হইলে, নিজের সর্ব্ব-সংস্কার মুছিয়া ফেলিতে না পারিলে কি করিয়া সত্যের সঙ্গে দেখা হইবে? বস্তু তাহার নিজ সত্তা আড়াল করিবে, যদি আমি আমার পরিচ্ছিন্ন 'আমি' লইয়া তাহার কাছে হাজির হই। আমার 'আমি'র ছাপ সে নিতে চাহিবে কেন? বিশ্ব তোমার চিহ্নেই চিহ্নিত হউক, তোমার বিশ্বের জয় হউক।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী, ১১ই জুলাই, ১৯৫৪।

শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

অনেকদিন পূর্ব্বে এই প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম। শুনিয়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ বলিয়াছিলেন—"লেখা তো ভালই হইয়াছে, কিন্তু এগুলি এখন ছাপাও ইহা আমি ইচ্ছা করি না"—তাই আর ছাপানো হইয়াছিল না। আজ তাঁহার তিরোধানে তাঁহার জীবন কথা একটু বলার লালসায় এই প্রবন্ধ ছাপাইতে প্রয়াস পাইলাম।

বিশ্বময় ভাঙ্গনের বুকে শ্রীমৎ স্বামীজী এই বিশ্ব-প্রকৃতির উন্মাদিনী গতির মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া সকল দর্শন শাস্ত্রের ভিতর দিয়া তাহার একটা সার্থক ও সুষ্ঠু মীমাংসা দিবার জন্য বিশ্বের বুকে দণ্ডায়মান। বর্ত্তমানের বিক্ষিপ্ত সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র এবং স্ব স্ব জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গড়িয়া তুলিবার দুর্জ্জয় সাহস, তীব্র প্রাণের বেদনা লইয়া তাঁহার অভিযান। আজ সকলের বর্ণ ধর্ম্ম ও আশ্রম প্রকৃতি পুরুষের বৈষম্যের ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া চুরমার। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যের বৈশ্যত্ব, শূদ্রের শূদ্রত্ব এবং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সংসারাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম সমস্তই আজ পুরুষ-প্রকৃতির পরস্পরের চাপে অতল জলে নিমজ্জিত। এইভাবে বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বস্তরে ধর্ম্মের গ্লানি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥'—পুরুষোত্তম কৃষ্ণ নিজ মুখের এই বাণী সার্থক করিতে তাই বুঝি জীবের সব হারানোর বেদনা বুকে লইয়া ক্ষরের বুকে অক্ষর হইয়া পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালরূপে অবতীর্ণ হইলেন। আমরা দেখিতেছি শ্রীনিত্যগোপাল-চরণাশ্রিত শ্রীমৎ স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজ পুরুষোত্তম শ্রীনিত্যগোপালের সেই বেদনায় বেদনাতুর। অতীতের সকল ভুলের অভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমানের সকল ক্ষেত্রের সকল সমস্যার সুমীমাংসা দিবার প্রচেষ্টায় তাঁহার তত্ত্বময় জীবনের ভিতর দিয়া সেই বেদনাই প্রতিনিয়ত স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছে।

সমাজে এতদিন চলিয়া আসিয়াছে ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের উচ্চ নীচ ভেদের উপর। সত্ত্বগুণ-

শ্রেষ্ঠ। সত্ত্বগুণী ব্রাহ্মণ; তাহার স্বভাব-জাত কর্ম্ম শম দম তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য। এই ব্রাহ্মণ হইলে মানুষ শ্রীভগবানের নিকটতম স্তরে আসিল। তাহার নীচের স্তর ক্ষত্রিয়, তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম পরাক্রম, তেজ, ধৈর্য্য, দক্ষতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, দান এবং সকলকে আয়ত্ত করিবার শক্তি। তাহার নীচের স্তর বৈশ্যের, তাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতেছে, কৃষিকর্ম্ম, গবাদি পশুপালন ও বানিজ্য। সর্ব্বশেষ নীচের স্তর শূদ্রের, যাহার স্বাভাবিক কর্ম্ম হইতেছে পরিচর্য্যা। এইভাবেই সন্ন্যাসাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া অন্যান্য আশ্রমে হেয়ত্ব আরোপ করিয়া চতুরাশ্রমের কাঠামো গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। কোথায় আজ সেই সমাজের শৃঙ্খলা? একদিকের উপর জোর দিয়া শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করিয়া, অপরগুলির উপর হেয়ত্ব আরোপ করিলে পরস্পরের সংঘর্ষে সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট হওয়া অনিবার্য্য। এইভাবে বর্ত্তমান ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, সংসারাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম, সন্ন্যাসাশ্রম সমস্তই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের কেন্দ্র হইতে চ্যূত হইয়া পড়িয়াছে।

স্বামীজী বলেন—ঋষি মুনিরা যে সত্ত্বগুণকে সর্ব্ব উচ্চ স্তরে রাখিয়াছেন তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করিয়াছেন জীবনের স্থিতিই সবখানি সত্য কথা। এইজন্যই তাঁহারা সত্ত্বগুণকে সামনে রাখিয়াছেন কেননা সত্ত্বগুণে স্থিতির দিক বেশী, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থিতিই কি মানুষের জীবনে একমাত্র কথা? স্থিতি এবং গতি দুই দিক মিলিয়াই মানুষের সমগ্রজীবন। কিন্তু গতিকে যদি স্থিতির সমান গৌরব না দেওয়া যায়, তবে যে স্থিতি-গতির সংঘর্ষে জীবন নাজেহাল হইবে, জীবন ক্লৈব্যে দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিবে ইহাতে আর সন্দেহ কি আছে। বর্ত্তমানের আমরা কি তাহারই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নই? শ্রীভগবানের মুখবিনিসৃত 'সমগ্রং মাং' বাক্যের সমগ্রতার দৃষ্টান্ত আমরা স্বামীজীর জীবনে দেখিতে পাইতেছি এবং এই সমগ্র জীবনের বার্ত্তাই নরনারায়ণ আশ্রম বিচ্ছিন্ন বিশ্বের বুকে বহন করিয়া আনিয়াছে। যে কোনও একটা গুণ বা কর্ম্মের উপর জোর দিলে অন্যদিক যায় শুকাইয়া, কিন্তু এই সনাতন বিশ্বে প্রতি গুণ-কর্ম্মেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে, কেহই মরিবেনা, মানুষের সমগ্র জীবনের মধ্যে সকলেরই তুল্যভাবে স্থান ও মূল্য রহিয়াছে, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। সমগ্র জীবনই যে বর্ত্তমান বিশ্বের সর্ব্ব সমস্যার সমাধান দান করিবে এই সত্যই বিশ্ব-বিপ্লবের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। মানুষ এই সত্যকে ধরিতে পারিতেছে না

অথচ এই তত্ত্বময় জীবনের সন্ধান না পাইলে যে তাহার বাঁচিবার অন্য কোন পথ নাই। শ্রীনিত্যগোপাল বার বার বলিয়া গিয়াছেন 'আমি বিশ্ব নাগরিক'। একজন সমাধিস্থ পুরুষ, আমি বিশ্ব নাগরিক বলিয়া তাঁহার জীবনে জড় এবং অজড়ের সমমূল্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এই পথের সন্ধান দিবার জন্য স্বামীজীর প্রাণের কি গভীর বেদনা! তাঁহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থের ভিতর দিয়া এবং তাঁহার জীবনে এই বেদনাই পরিস্ফুট।

বর্ত্তমান বিশ্বের মতনই দুর্য্যোগময় বিপ্লবের মাঝে ভগবান বেদব্যাস প্রণীত ভাগবতের বিপ্লবঘন ঠাকুর তাঁহার সমগ্রজীবন খানি লইয়া, সকল ভাঙ্গা বর্ণাশ্রমের বুকে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সর্ব্বসমন্বয়পূর্ণ ভাগবত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। আমরাও দেখিতেছি আজ এই বিশ্বময় ভাঙ্গনের বুকে সেই বিপ্লবঘন শ্রীনিত্যগোপালের জীবনখানি বুকে লইয়া তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রেরিত হইয়া স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ ভাগবত ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কি আকুলি বিকুলিই না করিতেছেন। তাঁহার লিখিত গীতা, উপনিষদ, বেদান্তের ভাষ্য শুধু পুরুষোত্তম-বিশ্ব গড়িবার কৌশলে ভরপুর। তাঁহার লিখিত শ্রীমদ্ভগবত গীতা ভাষ্যের অষ্টাদশাধ্যায়ে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥

শ্লোকের ব্যাখ্যাতে লিখিয়াছেন—"ক্রিয়া কারকফল-লক্ষণ; সত্ত্বরজস্তমো-গুণাত্মক এই সংসারকে উর্দ্ধমূল, পুরুষোত্তমমূল দেখিতে পাইলে এই সংসারই দিব্যজ্ঞানের কর্ম্মাত্মকরূপে আস্বাদন ক্ষেত্র, লীলা ক্ষেত্র; পুরুষোত্তমমূল ছাড়িয়া রাগদ্বেষময় কর্ত্তৃতন্ত্রমূল দেখিলে এই সংসারই পরস্পর প্রতিস্পর্দ্ধী অনন্ত টুকরা টুকরা সংসারে গড়িয়া উঠিয়া অনর্থের সৃষ্টি করে। দ্বন্দ্ব-মোহের সুরে দাঁড়ান মিথ্যাজ্ঞানময়ী অবিদ্যাসৃষ্ট সংসারকে পুরুষোত্তম শরণাগতি রূপ দিব্য অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া দিব্য জ্ঞানময় শ্রীক্ষেত্র, পুরুষোত্তমক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে, ইহাই শ্রীভগবানের নিগূঢ় অভিপ্রায়। সংসারকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার জন্যই বর্ণাশ্রম বিভাগের সৃষ্টি; এই বর্ণবিভাগ কোন্ কৌশলে পরিচালিত হইলে পুরুষোত্তম সমাজ, পুরুষোত্তম বিশ্ব গড়িয়া তুলিতে পারে, তাহারই বর্ণনা এইবার করিবেন। পুরুষোত্তম নিজে সর্ব্ববর্ণময় অবর্ণ, তিনি একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র; তিনি প্রত্যেকের সুনিকট অথচ প্রত্যেকের অতীত। তিনি দিব্য ব্রাহ্মণ বলিয়াই ব্রহ্মণ্য দেবায় বলিয়া নমস্কৃত; তিনি

বসুদেব-নন্দন রূপে দিব্য ক্ষত্রিয়, তিনি নন্দ-নন্দন, গো-গোপ সংঘাবৃত হইয়া দিব্য বৈশ্য, তিনি বিশ্বের ভজনা করিয়া রাজসূয়ে পা ধোয়াইয়া দিব্য শূদ্র। তাঁহার জীবনে জীবন মিলাইয়া তাঁহার জীবনের ঢং-এ সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। যদিও ধারণ পোষণ ও অগ্রগতির জন্য বর্ণ বিভাগের প্রয়োজন, কিন্তু সেই বর্ণ বিভাগ যে কোনও গুণকে বাড়াইয়া দিয়া এবং অপরগুলিকে তাহার চাপে নিষ্পেষিত করিয়া পরিণামে গুণ সংঘর্ষ সৃষ্টি করিবার জন্য নয়। প্রত্যেক গুণ যে পুরুষোত্তমগুণে গুণী হইয়া অভাগে পুরুষোত্তমাসনে আসীন হওয়ার জন্য, সর্ব্বগুণ সমন্বিত নিগুর্ণ পুরুষোত্তম-জীবন লাভের জন্যই, পুরুষোত্তম সংঘরচনা জন্যই, ইহাই বর্ণ বিভাগের মধ্য দিয়া পুরুষোত্তম পরোক্ষে প্রচার করিলেন। বর্ণ বিভাগের নিগূঢ় কৌশলই ঘন হইয়া পুরুষোত্তম যোগ। ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব, শূদ্রত্ব এক একটা দৃষ্টিকোণ মাত্র। এই দৃষ্টিকোণ হইতে যিনি প্রত্যেকের স্বনিকট প্রতিভাত হইয়াও, সকলকে স্বয়ংপূর্ণ করিয়াও প্রত্যেকে প্রত্যেকের মধ্যে বিনিময় ধর্ম্মের সাহায্যে গলাইয়া দিয়া, গুণ-কৌলীন্য বা দৈন্য মুছিয়া ফেলিয়া, প্রতি গুণকে স্বয়ম্পূর্ণ সর্ব্বগুণময়ের নিগুর্ণে গড়িয়া তুলিয়া এক অখণ্ড সংঘ রচনা করিবার জন্য লীলা বিস্তার করিয়াছেন—তিনিই সর্ব্ববেদসার এই গীতা শাস্ত্রের ইষ্ট। তাঁহার জীবনের ছাঁচে সংসারকে গড়িয়া তোলা, ধর্ম্মক্ষেত্র, পুরুষোত্তমক্ষেত্র রচনা করাই এই অষ্টাদশাধ্যায়ের পরম প্রয়োজন। পুরুষোত্তম-দৃষ্টিতে মুক্তির ঘন আস্বাদন ক্ষেত্র হইবে এই পুরুষোত্তম-মূল, ঊর্দ্ধমূল সংসার।”

সকল হারানো বিশ্বের সকল ক্ষেত্রকে সমন্বিত ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে চাই এমনি একটী পরিপূর্ণ জীবনের আদর্শ এবং সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি বর্ত্তমান যুগোপযোগী দর্শন শাস্ত্র। সর্ব্ব হারার দল আমরা তাঁহার কাছে পাইয়াছি এই সর্ব্বক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার মন্ত্র। দর্শন ক্ষেত্র, রাষ্ট্র ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং সেবা ক্ষেত্রের ইহা পরিপূর্ণ সমন্বয় শাস্ত্র. যাহার কৌশলে বিচ্ছিন্ন সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র ও স্ব স্ব জীবন গড়িয়া উঠিবে এক মিলন মঞ্চে। শুধু শাস্ত্রই নয় আমরা দেখিতেছি শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সেই শাস্ত্রানুযায়ী স্বামীজীর আদর্শমণ্ডিত জীবনখানি—একটী জীবনের ভিতর কেমন করিয়া চতুর্ব্বর্গ, চতুরাশ্রম মিলিয়া মিশিয়া একটী পরিপূর্ণ জীবন। তিনি দিব্য ব্রাহ্মণ. দিব্য ক্ষত্রিয়, দিব্য বৈশ্য, দিব্য শূদ্র, দিব্য ব্রহ্মচারী, দিব্য সংসারী, দিব্য বাণপ্রস্থী, দিব্য সন্ন্যাসী।

স্বামীজীর দিব্য ব্রাহ্মণত্বের দিক সারা বাংলায় প্রকাশমান। "ব্রহ্ম জানাতি যঃ স ব্রাহ্মণঃ"। ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বেদও হয়। তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ, তাঁহার লিখিত উপনিষদ, বেদান্ত গীতা-ভাষ্যই এই ব্রহ্মজ্ঞানের পরিপূর্ণ সাক্ষী। ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত এই নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান দিবার যোগ্যতা অন্যের পক্ষে অসম্ভব। একটী যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া ব্রহ্মভাবে ব্রহ্মদৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার মত যোগ বা কৌশল যাঁহার ব্রহ্ম-ভাবিত হৃদয়ে এবং ব্রহ্ম-দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে, তিনি যে ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

নবীন যুগ রচনা করিবার দায়িত্ব লইয়া যাঁহারা আসেন তাঁহাদের নিকট অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তিনই অনেকখানি বর্ত্তমান থাকে। এই রূপ দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন মহাপুরুষগণই দিতে পারেন যুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া আশার আলোকময় এক নূতন পথের সন্ধান। আমরা দেখিতে পাইতেছি প্রতি নিয়তই স্বামীজীর জীবনে এই নবীন সৃষ্টির বেদনা। যাহার রূপ অতীতের ভিত্তির উপরই নবীনতার ছাঁচে গড়া, তাহা বর্ত্তমান যুগের উপযোগী। সেখানে নাই উচ্চনীচের হুড়াহুড়ি, কাড়াকাড়ি; আছে শুধু প্রাণভরা সেবা-লালসা। এমনই একটী পুরুষোত্তম-বিশ্ব, পুরুষোত্তম-পরিবার গড়িবার পরিকল্পনা স্বামীজীর সারা জীবনের চলার ভঙ্গিতে এবং তাঁহার লিখিত সমস্ত গ্রন্থের প্রতি ছত্রে স্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে। এই বেদনাময় জীবনের বেদনা লইয়া তিনি সারা বাঙ্গলার প্রতি জেলায় তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায়, চোখের জলে পুরুষোত্তম-বিশ্ব রচনার কৌশল তাঁহার দেশবাসীকে বলিয়াছেন, পুরুষোত্তম বিশ্ব গড়িয়া তুলিবার জন্য জ্বালাময় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যেখানে যেখানে বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই স্থানের শিক্ষিত অশিক্ষিত, জ্ঞানী অজ্ঞানী, পণ্ডিত অপণ্ডিত, সংসারী সন্ন্যাসী, কংগ্রেসী অকংগ্রেসী সবাই স্তম্ভিত হইয়া শুনিয়াছেন, তাঁহার শাস্ত্রালোচনা শুনিয়া কাহারো উঠিয়া যাইবার উপায় ছিলনা। তিনি কমপক্ষে ৩০।৪০ হাজার বক্তৃতা দিয়াছেন; শুধু বাংলায় নয়, সুরাট, বরোদা, বৃন্দাবন, গয়া, কাশী, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানেও। যদিও মানুষের জীবনে পুরুষোত্তম-তত্ত্বজ্ঞান এবং পুরুষোত্তম-তত্ত্ব-দৃষ্টি না থাকায় তাঁহার কথা আজও মানুষ সম্যকরূপে বুঝিতে বা ধরিতে পারে নাই, কিন্তু হৃদয়ের শাস্ত্র তাঁহার হৃদয় দিয়া বলা, সেই জন্যই সকলের হৃদয় তাহা স্তম্ভিত হইয়া শুনিয়াছে।

তাঁহার জীবন অপূর্ব্ব মাধুর্য্যমণ্ডিত; একই সঙ্গে ধর্ম্ম-জীবন, রাজ-নৈতিক-জীবন, কর্ম্ম-জীবন, জ্ঞান-জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র জীবনের মাঝে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই, সকলেই যে যার স্তরে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া মিলিয়া মিশিয়া এক। তাঁহার অধ্যাত্মজীবন তাঁহার রাষ্ট্র ক্ষেত্রকে, সংসার ক্ষেত্রকে বাধা দেয় নাই। তাঁহার কঠোর দর্শন শাস্ত্রের আলোচনায় তাঁহার ভক্তিপ্লাবিত হৃদয়ের ব্যতিক্রম হয় নাই, তিনি সর্ব্বম্, তাই বহু রূপে তিনি দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। বেদান্ত ভাগবত লইয়া তাঁহাকে কলিকাতার থিওসফিক্যাল সোসাইটিতে দিনের পর দিন দেশবাসী দেখিয়াছিল ব্রহ্মণ্য মূর্ত্তিতে। সেই সময় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত বরিশাল হিতৈষী পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—"যে বাংলায় শ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার প্রত্যেক ধূলিকণাকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, সেই বাংলায় অদূর ভবিষ্যতে জানিনা কোন্ এক মহাপুরুষ আসিতেছেন যাহার সূচনা বাংলার সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান জগতে কি কর্ম্ম, কি সমাজ, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন এমন এক জায়গায় আসিযা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে স্থান হইতে আবার এক নূতন আলো, নূতন শক্তি ব্যতীত তাহারা যেন পথ পাইতেছে না, চলিতে পারিতেছেনা। আবার সে দিন আসিতেছে, তাহার অগ্রদূতগণ অলক্ষিত ভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় আসিয়া সারা দিতেছে, এই মৃত জাতির নিস্পন্দ অন্তরে আবার আশার একটু ক্ষীণ স্পন্দন অনুভব হইতেছে। সম্প্রতি কলিকাতা মহানগরীতে আমরা ঐ প্রকার একটী সাধককে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি; তাঁহার নাম শ্রীশরৎ কুমার ঘোষ। তাঁহার পবিত্র তেজোদ্দীপ্ত সৌম্যমূর্ত্তি। তিনি ভগবৎদত্ত প্রেরণায় অন্তরে বাহিরে ভরপুর হইয়া সুদূর বরিশালের পল্লীবাস হইতে এই মহানগরীতে এক নূতন আলো লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যে আলো বেদান্তের নূতন মূর্ত্তি। বেদান্ত যে একটা দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ নহে, বেদান্ত যে একটা কঠিন, কঠোর, নিরস, কর্কশ বিষয় নহে, বেদান্ত যে জনকত পণ্ডিতের সঙ্কীর্ণ মতে সীমাবদ্ধ নহে, উহা মাতৃ-স্তনেরই মত সরল, উহা যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতই স্বচ্ছ, উহা যে নির্ম্মল চন্দ্রালোকের মতই ধনী, নির্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ, সভ্য, অসভ্য সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়ের সমান উপভোগ্য বিষয়, উহা যে মানুষকে মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলে, অশান্তির অশ্রুজলে কাঁদায় না, উহা যে আমাদের

দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, নিত্য প্রয়োজনীয় কথা, তাহা তিনি বঙ্গীয় তত্ত্ববিদ্যা সমিতিতে ক্রমান্বয়ে ৬।৭টী বক্তৃতায় বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ভাব ও ভাষা এমনই সুনিপুণ, এমনই সুললিত, এমনই গভীর গবেষণাপূর্ণ, উহাতে এমনই একটা উন্মাদক মদিরা আছে, যাহা শ্রোত্রীবর্গ মন্ত্র-মুগ্ধের মত তাঁহার শেষ বাক্যটী উচ্চারণ পর্য্যন্ত ,আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিয়া থাকেন। তিনি সোজা ঘরকন্নার কথা লইয়া দেশ পাত্র কালোপযোগী বেদান্তের যে নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আগের ঋষি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি তত্ত্ববিদ্যাসমিতি ব্যতীত গড়পাড়া, ভাটপাড়া, বারাসত, নাথের বাগান, রামমোহন লাইব্রেরী, বিবেকানন্দ সোসাইটি প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে সাত লক্ষ নরনারী, ভ্রাতাভগিনীর নিকট সর্ব্বকল্যাণকারী বেদান্তের নূতন তত্ত্ব শুনাইবার সঞ্জীবনী মন্ত্র লইয়া এই বিরাট ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভগবান তাঁহার সহায় হউন।" এপ্রিল, ১৯২০।

এমনই করিয়াই দিনের পর দিন দেশবাসীর নিকট স্বামীজীর জ্ঞান, স্বামীজীর ক্ষমা, স্বামীজীর ত্যাগের দ্বারা তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের দিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বামীজীর ক্ষমার জাজ্বল্যমান প্রমাণ আমরা, যাঁহারা তাঁহার নিকট প্রতিনিয়ত শত শত অপরাধ করিয়াও তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ের নিকট পাইতেছি ক্ষমা ও বুকভরা স্নেহ। তাঁহার ত্যাগ সকল ক্ষেত্রে সর্ব্বজন-সুবিদিত। তিনি সংসারক্ষেত্রে ত্যাগী; স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া পথে পথে বেড়াইয়াছেন, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য পিতৃ-বিত্ত লইয়া ভাইয়ের সহিত করেন নাই দ্বন্দ্ব, স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়াই দেশমঙ্গল ব্রতে সহধর্ম্মিণীকে নিরাভরণা করিয়া তাঁহাদের উভয়ের শেষ সম্বল ৪০ ভরি পরিমিত স্বর্ণালঙ্কার স্বরাজ ভাণ্ডারে দান করিয়া নিঃস্ব হইয়া লইয়া ছিলেন। সেই সময় বরিশাল পত্রিকায় দধীচি শরৎকুমার বলিয়া তাঁহার ত্যাগের ভূয়সী প্রশংসা ছাপাইয়া বাহির হইয়াছিল। তিনি কর্ম্মক্ষেত্রে ত্যাগী; দেশের কাজ করিতে গিয়া তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত লড়াই করেন নাই, মতের অমিল হইলে নিজেই সেস্থান হইতে সরিয়া আসিয়াছেন। তিনি চলিয়াছেন 'ধাম্ন স্বেন'—নিজের জ্যোতিতে নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার গন্তব্য পথে। শোষণ তাঁহার জীবনে নাই, তিনি শোষণের বিরুদ্ধেই সারা জীবন করিয়া আসিয়াছেন যুদ্ধ ঘোষণা; নতুবা নব যুগ রচনায় এত সম্পদ যাঁহার জীবনে ভরপুর, তিনি আজ নিঃস্ব, ভিখারী? তাঁহার ধন নাই, জন নাই? ভারতবর্ষ

আজ আদর্শ-ভ্রষ্ট, সেই জন্যই প্রকৃত সত্য আদর্শ লইয়া স্বামীজী এই ভারতের বুকে চলিয়া আসিয়াছেন একা। অথচ এই ভারতবর্ষে কত সম্প্রদায়, কত মঠ-মন্দির, কত শিষ্য, কত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হইতেছে ধর্ম্মের নামে। তিনি যদি প্রচলিত গুরুদের মত শিষ্য করিতেন, কত হাজার হাজার শিষ্য তিনি করিতে পারিতেন। তিনি চাহেন বাস্তব জীবনকে ভাগবত ভাবে গড়িয়া তুলিতে। বর্ত্তমান সময়ে এই জীবনলাভের প্রকৃত প্রয়াসী বিরল, সবাই চায় বাহিরের একটা হৈ চৈ, বাহিরের একটা জৌলস, প্রকৃত জীবন কেহ চাহে না, এই কারণেই তাঁহার আশ্রম আজও জনশূন্য। এই কোলাহলপূর্ণ ভারতের বুকে তিনি একা দাঁড়াইয়া; তাঁহার প্রশ্ন শুধু, কিছুই তো গড়িল না? সকল ক্ষেত্রে তো ফুটিয়া উঠিতেছে মরণের এক বীভৎস চিত্র, পুরুষোত্তম-বিশ্ব, পুরুষোত্তম-জীবন গড়িল কই? বিশ্ব আজ শোষণে ভরা, সেই জন্যই তাহার পরিণতি হইতেছে খুনাখুনি, গড়িয়া উঠিতেছে না কিছুই। সব চাইতে প্রয়োজন আজ জীবন গঠন। এই দাবীই তিনি আমাদের নিকট, তাঁহার আদরের বাংলার নিকট করিয়া গিয়াছেন।

প্রচলিত কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি গড়িতে তো পারিতেছে না কিছুই, কেবল সকল ক্ষেত্রকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে। কেননা কর্ম্ম জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি সকলেই আজ অহম্ প্রাথমিকঃ দোষে দুষ্ট, যে যার প্রাধান্য বিস্তার লালসায় অন্যগুলিকে অস্বীকার করিবার দ্বন্দ্বে পরস্পরে ধংসোন্মুখ, সৃষ্টি-ক্ষমতা তাহাদের নাই। স্বামীজীর জীবন ছিল অপূর্ব্ব সমন্বয়-ঘন—তাই তাঁহাকে কেহ বুঝিতে পারে নাই তিনি জ্ঞানী, না ভক্ত; তিনি সন্ন্যাসী না সংসারী; তিনি কর্ম্মী না দার্শনিক—কিছুই মানুষ ঠিক করিতে পারে নাই। তিনি আজ সকলের বুদ্ধি-ক্ষেত্রে অধর, কিন্তু ধরা পড়িবার জন্য তাঁহার প্রাণে তীব্র বেদনা! প্রাণ ছাড়া এ প্রাণ তো কেহ বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে পারিবে না। তাঁহার জীবনে যে সমন্বয়-ঘন পুরুষোত্তম জীবনাদর্শ প্রকাশিত। এই পুরুষোত্তম-জীবনই যে জীবের স্বরূপ। এই স্বরূপের মধ্যে ঝাঁপ না দিয়া যে যত কিছু গ্রহণ ও বর্জ্জন করুক কিছুতেই বিশ্ব-সমস্যার সমাধান কেহ করিতে পারিবে না।

ক্রমশঃ

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের মহাপ্রয়াণে

॥ শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু ॥

বজ্রাহতের ন্যায় হলাম, যখন সংবাদপত্রে পড়লাম স্বামীজী দেহত্যাগ করেছেন। তিনি ছিলেন সকল ব্যক্তির ও সকল দেশের, তবুও বলতে ইচ্ছা হয় তিনি ছিলেন আমার একান্ত আপনার। সত্যই ত তিনি আমার অত্যন্ত আপনার ছিলেন। যিনিই তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন তিনিই ভাবতেন স্বামীজী তাঁরই একান্ত আপনার; আর যাঁরা তাঁর প্রাণের অনুসন্ধান পেয়েছেন, ভাষণ শুনেছেন বা তাঁর লেখা পড়েছেন, তাঁরাও ভাববেন স্বামীজী তাঁদেরই একান্ত আপনার। সেজন্যই ত এটা সত্য তিনি সকলের, তিনি আমারও। আজ সকলেই তাঁর অভাবে সেজন্যই ত মুহ্যমান। কি উপায়ে তাঁর অভাব পূরণ করা যায়, এ প্রশ্নই মনে উঁকি মারে। তাঁর শূন্যস্থান পূর্ণ করা সম্ভব বলে মনে হয় না, কারণ ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের শক্তি সাধারণ মানুষ সঞ্চয় করতে পারে না। তবে কি আমরা, যাঁরা তাঁর আপনার ছিলাম বা অন্তরংগ ছিলাম কিছুই করবোনা? তাঁর জীবন ও জীবনদর্শন ত তিনি রেখে গেছেন; আমরা ভাল করে তাঁর অমূল্য অবদান,—তাঁর পূতজীবন ও জীবনদর্শন জানবার চেষ্টা করি, আমরা পথের সন্ধান পাবো এবং তাঁর ইচ্ছা ও অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করার প্রয়াস করতে পারবো। সবটা না হলেও তাঁর অভাব এতে খানিকটা পূর্ণ হতেও পারে।

তাঁর আদর্শ কি ছিল? সবিস্তারে তা' বলা সহজসাধ্য নয় বলে সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করছি। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতাকে তিনি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে রেখে বিচার করতেন না। তিনি বলতেন কোনওটাকে ছেড়ে এর কোনওটাই চলবেনা। তাঁর গুরুদেব শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল যে সমন্বয়বাদের কথা নতুন ভাবে শুনিয়েছিলেন,—সেই বাণীই ছিল স্বামীজীর চলার পথের দিক্‌দর্শন ও আলোকবর্তিকা। তিনি অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। আমরা সকলেই নানা আদর্শের কথা বলি, কিন্তু সকলেই জীবনে কোনও আদর্শই অনুসরণ করে চলিনা। তাঁর আদর্শ ও কাজ ছিল এক। আদর্শ জীবনে আচরিত না হ'লে আদর্শ হয় বন্ধ্যা; স্বামীজীর দৈনন্দিন জীবনই তাঁর বাণী ও আদর্শ।

যৌবনে তিনি শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী ছিলেন। শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীরূপে যুবক যুবতী, ছাত্র ছাত্রীর নিরলস ও অকৃত্রিম সেবা করেছেন স্বামীজী। গান্ধীজীর অহিংস মন্ত্র প্রাণবন্ত করেছেন তিনি। ১৯২১ সালে নিজেকে ও নিজের পরিবারের সকলকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রের সেবায়। তাঁর তেজোদৃপ্ত ও প্রাণস্পর্শী আবেদন হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বংগোপসাগর পর্যন্ত ভূমিকে চঞ্চল করেছিল; দেশের নরনারী, যুবক ও বৃদ্ধকে পাগল করে স্বাধীনতা সংগ্রামে নামিয়েছিল,—ঘরছাড়া করেছিল। নারী দিয়েছিলেন স্বর্ণাভরণ নিঃশেষে দেশের সেবায়, আর নরনারী দিয়েছিলেন তাঁদের সকল সময় ও জীবন উৎসর্গ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে। তিনি বরিশাল ও বাংলাকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন প্রেমের বন্যায়। তিনি ছিলেন প্রেমিক শ্রেষ্ঠ। সত্যকার প্রেম অন্তরে না থাকলে অকৃত্রিম সেবা হয়না। প্রেম না থাকলে সেবা হয়ে উঠে বোঝা। মা যেমন নিঃস্বার্থ সেবা করেন সন্তানের, লাভা-লাভের গণনা না করে,—স্বামীজীও তেমনই সেবা করতেন; সেবায় তিনি আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতেন।

দীর্ঘজীবনব্যাপী প্রেমিক স্বামীজী ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সেবা করে গেলেন যে আদর্শ অনুসরণ করে,—তাই হোক আমাদের সকলের জীবনপথে চলার অফুরন্ত উৎস। তাঁর প্রিয় কাজ করে ও তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রীতি সাধন করে আজ তাঁর প্রতি আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে ধন্য হই।

তিনি শেষ জীবনে তাঁর "নরনারায়ণ আশ্রম" প্রতিষ্ঠা করে গেলেন গ্রামে, কারণ গ্রামের লোক ও গ্রামের সভ্যতাকে তিনি ভালবাসতেন। পরম কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণু মিত্রের উপর তাঁর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব বর্তেছে। শ্রীভগবান শ্রীমতীকে সাহস, শক্তি ও ধৈর্য দিন এই ন্যস্ত দায়িত্ব প্রতিপালনে, শ্রীভগবানের চরণে এ প্রার্থনা জানাই। আর বিনীত নিবেদন জানাই মহানুভবগণকে তাঁদের অকৃপণ সমর্থন ও সহানুভূতি দান করতে শ্রীমতী রেণুকে।

স্বামীজীর জড় দেহের সংগ আমরা পাবোনা, তাঁর ভাষা আজ নীরব হয়েছে সত্য, কিন্তু তিনি যে ভাবাদর্শ ও বাণী রেখে গেছেন সেবার পথে তাইত যথেষ্ট; সুতরাং ভয় নেই, মাভৈঃ।

টফ্‌টে দম্পতির আতিথ্য

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

স্কিবির সমাজ

প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কারু না কারুর বাড়িতে মজলিস বসত। টফ্‌টে সাহেব অতি মজলিসী লোক। পথে হাঁটছেন—প্রতি পাঁচ পা অন্তর একবার থামছেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সবার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্য। টুপী তুলে আগেই অপরকে অভিবাদন করা টফ্‌টে সাহেবের রীতি। সবার সঙ্গেই হেসে দু'টো কথা বলবেন। নিজের পাদরী সমাজের সকলের সঙ্গেই তাঁর সম্প্রীতি, কিন্তু এ-ভাবটা ভদ্রলোকের একান্তই সহজাত, এর মধ্যে এতটুকু কৃত্রিমতা নেই।

আমাদের সান্ধ্য-আড্ডা প্রায়ই বসত ঘোড়ার দালাল (Horse dealer) মিঃ হ্যামা লারসেনের বাড়িতে (Hamma Larsen)। ইনি আর এক মজার মানুষ। খাঁটি দালাল মানুষ, মুখের আর বিরাম নেই, সারাক্ষণ বকুনি চল্‌ছে। গিন্নী ঠিক উল্টো—সুশীলা ও প্রিয়ভাষিনী। দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে বাণিজ্য-বহরে কাজ করে। সওয়া নিয়ে দুনিয়ার হাটে বন্দরে বন্দরে ঘুরে বেড়ায়। বহুবার ভারতে এসেছে। কলকাতা বন্দরের ছবি এল্‌ব্যামে আঁটা আছে। শ্রীমতি লারসেন দেখালেন। এক সুশ্রী সুবেশা বাঙালী ললনার সঙ্গে তোলা পুত্রের ছবি, একটু অবাক হলাম। তা অসম্ভব কিছুই নয়! লারসেন সাহেবের মুখে খই ফুটছে। মেয়েদের বিয়ের কথা উঠল। এক মেয়ে বিয়ের পূর্বেই পুত্রবতী হয়েছিল—লারসেন সাহেব খোলাখুলি বল্লেন (শ্রীমতি লারসেন বিদেশীর কাছে এ-হেন উক্তিতে একটু বিব্রতই হলেন)। ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্য সমাজে প্রাক্-বিবাহ মাতৃত্ব আজ গা-সওয়া হয়ে গেছে। এ-হল যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামেশার অনিবার্য পরিণাম। তবে এ-বিষয়ে ডেনদের আবার একটু বিশেষত্ব আছে। প্রেম ও বিবাহাদি ব্যাপারে তারা যেন অন্য ইউরোপীয় তথা ইংরাজদের থেকে অনেকখানি পৃথক। ডেনরা যেন কিছুটা বেশী বাস্তববাদী। বিবাহ ও সন্তান-ধারণ এরা অন্য দশটা জৈব প্রক্রিয়ার সামিল মনে করে। সোনালী স্বপ্নের রঙীন জাল এরা ততটা বোনেনা। রোমান্সের ধার ধারে কম।

জনৈক ড্যানিশ লেখকের জবানীতেই জিনিসটা বেশ পরিষ্কার বলা হয়েছে :

"The Dane is much too sensible to fall in love in the Anglo-Saxon Celtic sense, for that is the stuff of which dreams are made, and the Dane is no dreamer. Neither he nor she is the subject of Complex love-emotions. The Danish flapper has not that look of the eyes slightly staring, which one so often sees in the English girl of 15 or 16. The face of a Danish girl is round and comfortable and pleasant in the age when her sister across the North sea is sometimes haggard and hard, unpleasing to the eye, but stimulating and suggestive. The Danish flapper has no 'wonderful' eyes. To the Danish girl courting-time, like marriage-time is not the time to build up barriers, rather to break them down. Mating is the ordinary course of life, like the birds and the beasts, with nothing wonderful or curious about it."

হ্যামা লারসেনকে দেখতাম সারাদিন গাড়ি হাঁকাতে। দু'তিন দিন আমাকে সঙ্গে নিয়েও বেরিয়েছে। মুখে খই ফুটছে আর ও-দিকে হাওয়ার বেগে গাড়ি ছুটেছে। স্পিড-মিটারের কাঁটা ষাট পেরিয়ে সত্তর ধরেছে। আমার বুক ধুক্ ধুক্ করছে। লারসেন সাহেব ভ্রূক্ষেপহীন। যা'হোক লারেসন সাহেবের আনুকূল্যে ডেনমার্কের পল্লী-অঞ্চলের বহু জায়গা আমার নিখরচায় দেখা হল।

স্কিবি গাঁয়ের আরও কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে দিন কয়েকের মধ্যেই বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল। পশু-চিকিৎসক ঠ্যামড্রুপের কথা আগেই বলেছি। তাঁর বাড়ি থেকেও আমন্ত্রণ এল। শ্রীমতি ঠ্যামড্রুপ সন্তানসম্ভবা, শরীরটা ভাল নয়, তবু নিজ হাতে কেক, পুডিং ইত্যাদি বিস্তর তৈরি করে খাওয়ালেন। খাওয়ান-দাওয়ান ব্যাপারে সর্বদেশের মেয়েরা প্রায় একই প্রকৃতির। লোককে খাইয়েই এদের সুখ।

একদিন ভোরে ঠ্যামড্রুপ সাহেব মোটর গাড়ি নিয়ে হাজির, ওঁর বাড়িতে

যেতে হবে, ছেলে হয়েছে দেখবার জন্য। এই তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তান কন্যা—বছর তিনেক বয়স। শ্রীমতি ঠ্যামড্রুপ হাসপাতালে গিয়েছিলেন। গতরাত্রে নবজাত শিশুসহ ফিরে এসেছেন। ঠ্যামড্রুপদের বাড়ি গেলাম। একটা দোলনায় (cradle) শিশু ঘুমুচ্ছে। শ্রীমতী ঠ্যামড্রুপ নিজেই ছেলে দেখালেন। বল্লেন: "বলুন আমার ছেলে দেখতে কেমন হবে?"। আমি বল্লুম: "He will be a handsome person"—প্রিয়দর্শন হবে আপনার ছেলে। এরি মধ্যে ঠ্যামড্রুপের বৃদ্ধ পিতা (তিনিও পশু চিকিৎসক) এসে হাজির হলেন। প্রথমটা ড্যানিশ ভাষায় পুত্রবধূকে অভিনন্দিত করলেন, এবং পরে নবজাতকের শিয়রে একটা পাকা কলা রেখে নাতির মুখদর্শন করলেন। জানিনা এটা এদেশের রীতি কিনা, কাউকে জিজ্ঞাসাও করিনি। তবে আমাদের দেশে নেহাৎ অকিঞ্চনেও কদলী দিয়ে নাতি-মুখ দর্শন করে না। স্কিবি গাঁয়ের আর একজন উল্লেখযোগ্য লোক হচ্ছেন মিঃ ক্রীচ্‌টেন্‌সেন—ঔষধ বিক্রেতা। ভদ্রলোক স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী কিন্তু অতি অমায়িক ও আন্তরিকতা-পূর্ণ। শ্রীমতী ক্রীচ্‌টেন্‌সেনও অতি ভালমানুষ। এঁদের বাড়িতে দুদিন একদিন অন্তরই ব্রেকফাষ্ট বা লাঞ্চের নিমন্ত্রণ হত। মিঃ ক্রীচ্‌টেন্‌সেন প্রথম জীবনে দূর প্রাচ্যদেশে জাভার ইক্ষু ক্ষেত্রে কাজ করতেন। স্বল্পকথায় পূর্ব জীবনের কাহিনী কিছু কিছু বলতেন, আর খুব সাগ্রহে ভারতবর্ষের কথা শুনতে চাইতেন। ক্রীচ্‌টেন্‌সেন দম্পতি ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কথা শুনে যেতেন। এমন ধৈর্যশীল ও উৎসুক শ্রোতা আমি আমার জীবনে আর পাই নি।

স্কিবি একটি অতি নগন্য ছোট্ট গ্রাম। শ' চারেক বাসিন্দা। কিন্তু আধুনিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রায় যাবতীয় উপকরণই হাতের কাছে। একটা হাই-ওয়ে গাঁয়ের মধ্য দিয়ে গেছে। তাতে গাঁয়ের মর্যাদা ও গুরুত্ব দুই-ই বেড়েছে। গাঁয়ের চারদিকেই দিগন্ত-ব্যাপ্ত তরঙ্গায়িত শস্য-ক্ষেত্র—গম, রাই, লবঙ্গ ও সব্জীর চাষ। মাঝে মাঝে জলা।

একটা উঁচু টিলার উপর দাঁড়িয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে সবুজ গ্রামখানি আকাশে মেশে। প্রায় অন্তহীন নানা ফসলের ক্ষেত—মাঝে মাঝে বৃক্ষ-সুশোভিত গ্রাম। গ্রামের ঘর বাড়ি বেশীর ভাগই লালটালির ছাওয়া বাংলো ধরণের, ক্বচিৎ দু'একটা দালান। প্রত্যেক গ্রামের মাঝখানেই আছে গীর্জা। গীর্জার চূড়া দূর

থেকেই নজরে পড়ে। অনেকটা গীর্জাকে কেন্দ্র করেই যেন গ্রামগুলি গড়ে উঠেছে। মধ্যযুগের রীতি অবশ্য তাই ছিল। মধ্যযুগীয় সমাজ জীবনে গীর্জার প্রভাব ছিল অসামান্য—রাজাও ছিলেন যাজকতন্ত্রের বশবর্তী। স্কিবি গ্রামের গীর্জাটি অতি প্রাচীন—গৃহটি আগাগোড়া কালো পাথরের তৈরী। টফ্‌টে সাহেব এই গীর্জাতেই প্রতি রবিবার সারমন (sermon) দেন। আমিও প্রতি রবিবার সার্ভিসে উপস্থিত থাকতাম। গীর্জার আর সে-দিন নাই। বিশেষ বিশেষ দিন ছাড়া, যেমন ব্যাপটাইজ্‌মেণ্ট (baptisement), বিবাহ অথবা মেমোরিয়্যাল-সার্ভিস, গীর্জায় বড় একটা কেউ আসে না। দু'চার জন অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সার্ভিসে উপস্থিত থাকতেন দেখতাম।

টফ্‌টে সাহেব ড্যানিশ ভাষায় প্রার্থনা করতেন আর সারমন দিতেন। আমি একবর্ণও বুঝতে পারতাম না। চুপ করে বসে ইষ্টনাম জপ করতাম। গীর্জা বা চার্চ সাধারণভাবে জনপ্রিয়তা হারিয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে সাধারণ মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়েছে। বিজ্ঞানবলে মানুষ আজ নানা সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী—পার্থিব ভোগ-সুখই তার প্রধান কাম্য। ধর্ম-ঈশ্বর-গীর্জা প্রভৃতির মর্যাদা হয়ে এসেছে ক্ষীয়মান।

গ্রামগুলি যতো ছোটই হোক না কেন, প্রায় প্রতি গ্রামেই আছে একটি ছোটখাট পৌরসভা। একদিন গেলাম স্কিবির পৌরসভায়। দশজন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে এই সংস্থা। গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামত, স্কুল-পরিচালনা, গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষণ, হোটেল-সরাইখানা-খাবারের দোকান ইত্যাদির তত্ত্বাবধান, গ্রামের পার্ক ও খেলাধূলার মাঠের রক্ষণাবেক্ষণ, আলো ও পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি নানা কাজের ভার ন্যস্ত থাকে গাঁয়ের মিউনিসিপ্যালিটির উপর। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যেরা একটা একটা বিষয়ের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন। স্কিবি মিউনিসিপ্যালিটির স্থায়ী এবং বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র একজন—সেক্রেটারী।

সেক্রেটারী মিঃ হেনিংসেন (Heningsen) একাই এক'শ। দু'হাতে কাজ করছেন। মিউনিসিপ্যালিটির রাজস্ব আদায়, হিসেবপত্র রাখা, ঠিকাদার-দের কাজকর্ম তদারক, আর কাউন্সিলের সভা ডাকা ইত্যাদি যাবতীয় কাজ সেক্রেটারী একাই করেন। অফিস ঘরে ভিন্ন ভিন্ন index-cabinetএ কাগজপত্র এমন সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো আছে যে, হাত বাড়িয়ে যে কোন জিনিস বের করতে মুহূর্তের বেশী সময় লাগে না। অল্প সংখ্যক লোক

অনেক বেশী পরিমাণ কাজ অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করতে পারে, তার কারণ প্রধানতঃ তিনটি ঃ

(১) শৃঙ্খলাবোধ ও সময়নিষ্ঠা,

(২) প্রত্যেকেই কর্ম্মনিষ্ঠ,

(৩) উন্নত ধরণের কার্য কৌশল।

এ-সব দেশে কি সরকারী কি বে-সরকারী প্রত্তি প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাই বৎসরে একমাস পুরো বেতনে ছুটি উপভোগ করতে পারেন, এবং করেও থাকেন।

হপ্তায় পাঁচ দিন এরা কাজ করে, আর তুইদিন উপভোগ করে ছুটি। এদের কাজের পরিমাণ আর উৎকর্ষ কিছুমাত্র কম নয়। তার সঙ্গে তুলনা করি আমাদের দেশের অবস্থার। বে-সরকারী সওদাগরী অফিস, বিশেষ ক'রে যেগুলি বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,—সেখানকার অবস্থা অনেকটা ভাল। কর্মী ও কর্মচারীদের মাহিনাপত্র বেশ ভাল, মাগ্‌গিভাতা আরও ভাল, বাৎসরিক বোনাস একটা লোভনীয় জিনিস। স-বেতন ছুটি, কোম্পানীর খরচে দেশ-বিহার ইত্যাদি নানা সুবিধাই এ-সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে থাকে। কিন্তু সরকারী আফিসগুলির অবস্থা ঠিক এর উল্টো। মাহিনা-পত্রের হার অপেক্ষাকৃত অতি কম। যার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছেলেরা আজকাল আব সরকারী চাকুরীর দিকে ঝুঁকছে না। শাসন-সৌকর্য এতে ব্যাহত হচ্ছে। তারপর সরকারী চাকুরীতে ছুটি নেওয়া সে এক হাঙ্গামার ব্যাপার! যদি গেজেটেড অফিসার না হও তবে ছুটি নেওয়ার বিড়ম্বনার অবধি নেই! পাকাপোক্ত অফিসার না হ'লে ছুটি নিলে মাহিনা পাওয়া যাবে কিনা সে একটা প্রশ্ন। মাহিনা পাওয়া গেলেও তার সাত বায়নাক্কা। ছুটি গেজেট হবে, একাউণ্ট্যাণ্ট-জেনারেলের সাতফিরিস্তি প্রশ্নের জবাব দিতে হবে, তবে গিয়ে ছুটির বেতন মঞ্জুর হবে। এ-সব আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে ২।৩ মাস সময় অনায়াসে কেটে যেতে পারে, যে বেচারা ছুটি নিল এ-দিকে তার অবস্থা অত্যভক্ষ্যধনুর্গুণঃ। তাই সহজে কেউ ছুটি নিতে চায় না। মানুষ কাজ করবে অথচ বিশ্রাম করবেনা—এ কেমন যুক্তি! স্বাধীন ভারতে সরকারী চাকুরেদের দশা অনেকটা তাই। দিনরাত কাজ, আর কাজ। সাধারণ মানুষ ভাবে যে-হেতু গভর্ণমেণ্ট চাকুরে, সুতরাং সে সব্বারই চাকর। তার আবার ছুটি

কি! আবার এক শ্রেণীর লোক আছেন যাদের ধারণা গভর্ণমেণ্ট কর্মচারী-মাত্রেই চোর আর অকর্মা। কথাটা হয়তো খানিকটা সত্য। কিন্তু তা কেবল গভর্ণমেণ্ট কর্মচারীর বেলাতেই প্রযুজ্য নয়। আজ সরকারী বে-সরকারী নির্বিচারে দেশের জনসাধারণ সকলেই কম-বেশী এই বিশেষণের অংশীদার, নতুবা সারা দেশে কালোবাজারের এতো প্রাবল্য সম্ভব হয় কিরূপে?

যা'হোক যে কথা বলছিলাম, এ-সব দেশের লোক কর্মঠ ও পরিশ্রমী। আর এরা কাজ ও অবসরের মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছে, যার ফলে মানুষ কাজের ফাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম উপভোগ করে, আর তাতে তার কার্যক্ষমতাও অব্যাহত থাকে। অনেকটা আবশ্যিক ভাবেই অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মচারিগণকে অবকাশ গ্রহণে উৎসাহিত করেন, ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্যও করেন। মোট কথা এরা ছুটি নেয় আর ছুটি উপভোগ করে। কাজের উৎকর্ষ বাড়াতে গেলে উপযুক্ত পরিমাণ অবসর ও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী—তারই নির্ভুল প্রমাণ এ-সব দেশের ব্যবস্থায়।

পূর্বেই বলেছি স্কিবি গ্রামটি নেহাৎ ছোট, কিন্তু আধুনিকতায় অনগ্রসর নয়। ছোটখাট উৎসব আয়োজন লেগেই আছে। গ্রামের এক প্রান্তে একটি খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম। গ্রামের মুক্ত-অঙ্গন সভা, খেলা ধূলা, পতাকা-দিবস ইত্যাদি যাবতীয় অনুষ্ঠান এই স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একদিন ভোরবেলা ব্রেকফাষ্টের পর থেকেই গাঁয়ে খুব সোরগোল পড়ে গেল। আজ গাঁয়ের খেলাধূলা প্রতিযোগিতা। ছেলেমেয়েরা দলে দলে ব্যাণ্ডের তালে রাস্তায় কুচকাওয়াজ করে যাচ্ছে। বালকদের সবুজ পোষাক—হাফ্‌ প্যাণ্ট ও হাফ্‌ সার্ট। যুবকদের পোষাক গাঢ় নীল রংয়ের, আর মেয়েরা পরেছে সাদা হাফ্‌ প্যাণ্ট ও হাতকাটা কমিজ। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে ও যুবক-যুবতীর দৈহিক গঠন সুন্দর ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল। কী অনিন্দ্য সুন্দর গতিচ্ছন্দে এরা মার্চ করে যাচ্ছে। দুপুর থেকে স্টেডিয়ামে খেলাধূলা শুরু। মেয়েদের কয়েকটা দল নানা খেলায় প্রতিযোগিতা করল।

একটা খেলা হল—হ্যাণ্ডবল খেলা। নিয়মকানুন অনেকটা ফুটবলের মতো, তবে পায়ে বল ধরলেই 'ফুটবল'। হাতে যতো খুশি বল ধর। মেয়েরা

খুবই ভাল খেলল। আঁটা সাঁটা পোষাকে স্বাস্থ্যবতী যুবতী মেয়েদের ক্ষিপ্রগতি খেলা এক অতি জনপ্রিয় আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান।

স্কিবি গ্রামে সিনেমা আছে, ব্যাঙ্কও আছে। ব্যাঙ্কে ট্র্যাভলার্স চেক্ পর্যন্ত ভাঙ্গান সম্ভব। শহরের যাবতীয় সুখ সুবিধাই আছে অথচ শহরের হৈ-চৈ হট্টগোল আদৌ নেই। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ—ভারী চমৎকার!

টফ্‌টে দম্পতির আতিথেয়তা আন্তরিকতার মাধুর্যে অবিস্মরণীয়। রোজ রাত্রে ডিনারের পর ড্রয়িংরুমে আসর বসত। ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে—বাইরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া, ঘরের ভিতরটা কবোষ্ণ আরামপ্রদ। শ্রীমতী টফ্‌টে পিয়ানোতে বসেছেন। অঙ্গুলির ক্ষিপ্র সঞ্চালনে ছন্দের টুংটাং বেজে চলেছে।

কোনদিন বা খুকী বীরগিটা গান গাইত। কথাগুলি ড্যানিশ, কিন্তু সুর ও ছন্দের আকুতি সর্বজনীন। অমৃতং বালাভাষিতম্। কিশোরী বীরগিটার গানের কথাগুলি না বুঝলেও, ভাল লাগত তার কোমল কণ্ঠস্বর। কোনদিন টফ্‌টে সাহেব গল্প জুড়ে দিতেন—সে গল্পের শেষ নেই—নানা কথা—তার স্কুলজীবনের কথা, তার পড়াশুনার কথা, গাঁয়ের নানা সংবাদ, পশুপাখী, গাছপালা আর বাগানের কথা। বেশীদিন আমিই শ্রোতা। আবার মাঝে আমার উপর ফরমাশ হত কিছু বলবার বা গান গাইবার। আমি গান গাইতে জানিনা বলায় নিস্তার নাই, তাই অগত্যা দু-চারটা ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করে রেহাই পেতাম। কোনদিন বা আমার দেশের কথা ওঁরা শুনতে চাইতেন। আমিও কিছু কিছু বলতুম।

একদিন বিদায়ের দিন এসে গেল। প্রাতরাশের পর বাস আসবে তাতেই আমাকে ফিরতে হবে এলসিনোর। দেখতে দেখতে কীভাবে পনরটা দিন কেটেছে সেদিকে হুঁস ছিল না। সেদিনও বীরগিটা ডাকতে এল, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর ভারী ভারী। বলল, "It is sad you are going away।" একখানা ছবির বই আগেই কিনে এনেছিলুম তাই উপহার দিলাম। টফ্‌টে সাহেবকে আমাদের ফ্যামিলি-গ্রুপের একখানা ফটো আর শ্রীমতী টফ্‌টেকে একখানা সিল্কের রুমাল উপহার দিলাম।

যাবার আগে শ্রীমতী টফ্‌টে একটা কাগজে মোড়া প্যাকেট আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, "Dry lunch, please eat on the way।" বাস গাড়ী এলসিনোর পৌছুবে অনেক বেলায়। শ্রীমতী টফ্‌টের ছোটখাট নানা

কাজের ভিতর দিয়ে এম্নিতর একটি মমতাময়ী নারীর রূপটি দেখেছি। আমার গেঞ্জী, মোজা নিজ হাতে কেচে দিতেন। আমার মোজাজোড়া গোড়ালির দিকটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছিল তা রিপু করে দিলেন। বিকল্পে মিঃ টফ্‌টের একজোড়া মোজা পরতে দিলেন। প্রতি রাত্রে এসে আমার ঘরের ফায়ার-প্লেসে আগুন ঠিক আছে কিনা দেখে যেতেন। আমার বিছানা পত্র, কাপড়-চোপড় নিজ হাতে গুছিয়ে 'রাখতেন। দেশ থেকে চিঠিপত্র ঠিকমতো পাচ্ছি কি না খোঁজ নিতেন। ফিরে গিয়ে যেন চিঠি দেই—বারবার এই অনুরোধ করতেন। এই মমতাময়ী বিদেশিনী মহিলার ভগ্নীসুলভ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

'বর্ত্তমানে বুদ্ধি লইয়া মানুষ বিপদে পড়িয়াছে, অতি তার্কিক হইয়া পড়িয়াছে। প্রতি বস্তুর যে হাঁ-এর দিক ও না-এর দিক আছে, ইহা বুদ্ধি জানিয়া বসিয়াছে। অথচ সে বুদ্ধি উপরের স্তরের সমন্বয় বিধায়িকা বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় সুবিধামত কখনও হাঁ-এর দিক, আবার সে দিকে বাধা পাইলে না-এর দিকের সঙ্গে identified হইতেছে। এইভাবে বুদ্ধি আসল সমস্যাকে এড়াইয়াই চলিয়াছে।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী

৩০।১২।১৯৫১

তথাগত

॥ শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ॥

বহুদুঃখে পরিপূর্ণ এই পৃথিবী।
জরা রোগ ও মৃত্যুর যন্ত্রণায় অভিভূত,
বিপর্য্যস্ত,
ত্রস্ত মানুষের মনে সুখ কোথায়?
জয় করেছে সে মৃত্তিকা ও আকাশ
তবু প্রতিরোধ করতে পারেনা জরার আক্রমণ।
বিশ্বের সকল সম্পদ দিয়েও
কেনা যায়না চির শান্তির মাধুর্য্যকে।
মৃত্যুকে কে করেছে জয়?
জীবনকে কে করবে অনিন্দ্য
দুঃখহীন মধুর!

জীবনের অনিত্যতায়
আকুল হ'য়ে উঠলো একদিন
এক তরুণ রাজকুমারের চিত্ত।
নিরঙ্কুশ রাজসিংহাসনের অধিকারবোধ—
স্বপ্রমত্ত করলো না তার হৃদয়কে;
কাতর হ'লোনা সে বৃদ্ধ পিতার
ব্যাকুল মর্ম্মবেদনায়।
কিশোরীবধূর অশ্রু উচ্ছ্বসিত চোখে
খুঁজে পেলোনা সে বেঁচে থাকবার কোন মোহ,
মায়া বা মমত্বের বন্ধন বেদনা।
তুচ্ছ করলো সে রাজসিংহাসন
তুচ্ছ করলো শিশুপুত্রের মধুরতম বাহু।

বিশ্ব উন্মুক্ত করেছে যার বুক
ক্ষুদ্র গৃহ নয়, বৃহত্তর বস্তুজগতের অহনিশি ক্রন্দনের
আকুল মর্ম্মদাহে ছন্দিত তার চিত্ত।
এ জীবন কঠিন, নির্ম্মম, শান্তিহীন ;
সুখ তার ক্ষণিক বিলাস মাত্র।

কোথা শান্তি তবে ?
কোথা এই অনির্বাণ অগ্নিজ্বালা নিভাবার মত
শীতল সায়র ?
সে কি মৃত্যু ?
সে কি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আত্মনির্য্যাতন ?
সে কি জীবনের এই পরিপূর্ণ উত্তপ্ত রক্তের
নিস্পন্দ বিরতি ?
কোথা পরিত্রাণ তবে ?
সে কি নির্ব্বাসন
অরণ্যে পর্ব্বতে দূর মৃত্যুর বিজনে ?

কঠোর আত্মকৃচ্ছ্র তার সাধনায়
বিক্ষত করলো সে তার দেহ ;
অনশনে বিশীর্ণ হ'য়ে এলো
রসহীন মৃত বল্কলের মত।
প্রখর রৌদ্রতাপে পাণ্ডুর মুমূর্ষু চোখ তুলে
আর্তনাদে চীৎকার করে উঠলো সে—
......কোথা পরিত্রাণ মানুষের ?
গেল দিন,
গেল অন্ধকার দীর্ঘরাত্রি।
গেল গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতের অকরুণ পদক্ষেপ।
বর্ষ গেল বৃথা তপস্যার কৃচ্ছ্র তায় ;
নিশ্চেতন মৃত্তিকার বুকে
হয়ত নিরুত্তর হয়েই গেল

এক জীবন-সন্ধানী আকুল মানবাত্মার—
অপ্রমেয় জীবন-জিজ্ঞাসা!
অন্ধকার স্তব্ধ দীর্ঘ রাত্রি
শব্দহীন মহাঅরণ্যের হৃদয় থেকে
মিলিয়ে গিয়েছে চেতনার সমস্ত আলোক।
স্থির বিজন নির্জনতার বুক দিয়ে
জেগে উঠ্‌লো চেতনার পদক্ষেপ।
স্পন্দনহীন বাতাসের পক্ষে ভর ক'রে
ভেসে এলো আলোর সূচনা।
কি এক নির্ব্বাক বিস্ময়ে—
চোখ মেললো অজস্র অরণ্যশিশুরা;
আকাশের শ্যামল মেঘের বুকে
ধরা পড়লো ধরিত্রীর শীতলতার আত্তি।
নামলো বৃষ্টি।

সেই বৃষ্টির ধারাকে
প্রাণ ভরে পান করলো পিপাসার্ত্তের ওষ্ঠপুট;
মুমূর্ষু সঞ্জীবিত হ'লো
অমৃতের ধারাবর্ষণে।
স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ হ'লো
জ্ঞানীর জীবনতৃষ্ণা।
অকস্মাৎ দৈববাণীর মত বেজে উঠ্‌লো কণ্ঠ।
মৃত্যুর পথে, কৃচ্ছ্রতায় নেই
জীবনের পরিপূর্ণতা।
আপন সিক্ত বসনের নির্মাল্যে
বসলো সে বোধিবৃক্ষের মূলে।
বলে উঠ্‌লো অন্তরের বেদনার গভীরতায়
—আমি পেয়েছি সেই জ্ঞান,
যে জ্ঞান মানুষকে দেবে দীপালোক;
যে জ্ঞানের আলোকে খুঁজে পাবে সে শান্তি ও প্রেম

পাবে আনন্দ
　　　　মহানির্বাণের।

মুক্তি চাই মানুষের।
দুঃখ জরা ও মৃত্যুর কারাগার হ'তে মুক্তি চাই।
বারবার জন্ম ও মৃত্যুর
দেহের যন্ত্রণার হাত হ'তে মুক্তি চাই।
চাই অন্তহীন কালের অনুদ্দেশ যাত্রাপথে
প্রবহমান একাত্মভূতি ;
নির্বাণ
চেতনার ও সংশয়ের ॥

এ'জীবন ব্যর্থ নয় ;
এ দেহ মরণশীল
তবুও সত্য তার জীবন-পরিমিতি।
আত্মকৃচ্ছ্র তার যন্ত্রণায় দেহকে শীর্ণ ক'রে
দুর্ব্বল মানুষ, অশক্ত মানুষ
কেমন ক'রে লাভ করবে মহাজীবনের
নিগূঢ়তম জ্ঞান ?
যে জীবনে নেই শক্তির সদিচ্ছাপূর্ণ উপস্থিতি,
সে শুধু ভীরুতার, আত্মসঙ্কোচের বেড়া।

তখন নবপ্রভাতের জ্যোতির্লোকে স্নান ক'রে
নতুন হ'য়ে জেগে উঠ্‌ছে তমসাক্করা আকাশ।
তখন বাতাসের স্নিগ্ধতায় মধুর হ'য়ে আছে
প্রস্ফুটিত কুসুমের পরাগ শতদল।
শোনা যাচ্ছে দূর পথে পথে
মন্দিরের প্রথম আরতির ঘণ্টাধ্বনি।
আর সেই মুহূর্তের পৃথিবী
পূজার্থিনী বালিকার বেশ ধরে

দেবতার ভোগের জন্য নিয়ে এলো
আহার্য্য।
প্রসারিত কর এগিয়ে দিলো সে
বোধিবৃক্ষের তলায়,
আর উল্লসিত হ'লো মহাআনন্দের ধারায়
যখন গ্রহণ করলেন বুদ্ধ।
—সেই যে সুজাতা।

পরিতৃপ্ত শান্তির ছায়ায় ধ্যানমগ্ন
নিস্পন্দ হ'য়ে রইলেন বুদ্ধ।
অন্ধকারের অপসরণের সঙ্গে সঙ্গে
ঘটছে সে কোন্ নবসূর্য্যের অভ্যুদয় ?
কী প্রেরণার আনন্দ-ছন্দে আজ
নৃত্যরত জীবনজয়ীর চিত্ত !
ভঙ্গুরতার অনিশ্চয়তার দুঃখপথ দিয়ে
এ কোন্ মহাশক্তির আনন্দধারা ?
মৃত্যুর জগৎ থেকে জেগে উঠে
সূর্য্যের আলোর মত ছড়িয়ে দিলেন বাণী—
বুদ্ধ বললেন,—
আমি পেয়েছি সেই জ্ঞান,
যে জ্ঞানের আলোয় মানুষ পাবে শান্তি ;
ধ্বংস ও বিপর্য্যয়ের পথে পাবে প্রেম ;
জগতের কল্যাণের অনুভূতি।

সে এক নতুন অভ্যুদয় পৃথিবীর।
এই যন্ত্রণা ও দুঃখের বিকৃতিভরা
হতাশা ও মৃত্যুর বালুচরে আচ্ছন্ন ধরিত্রীকে
নতুন ক'রে জান্‌লো মানুষ।
জীবনের এ এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।
জ্ঞানের অনির্বাণ দীপশিখার আলোকে

চূর্ণ হ'লো অজ্ঞতা ও
অক্ষমতার দৈন্যের অহঙ্কার।
এ জীবনকে
সেই নবলব্ধ জ্ঞানের জ্যোতির্লোক দিয়ে যে জেনেছে,
যে উত্তীর্ণ হ'য়েছে সমকালের
সংস্কার ও সংশয়ের ছায়া থেকে,
দূর অন্তহীন পথযাত্রার ধূসর ছায়ালোকে,—
সেই কি তথাগত ?

ভারতবর্ষের তপোবনের ছায়ায় ছায়ায়
মানুষের তখনও কি সংশয়ের কুহেলিকা ?
বেদের মন্ত্র উচ্চারণের মুগ্ধ সৌন্দর্য্যে
ছন্দময় সঙ্গীতের সামগানে
ওরা পূজা করছিলো বহুরূপের দেবতাকে।
যে দেবতা সূর্য্যের মত ভাস্বর ও মহান,
যে দেবতা ঝঞ্চার মত নিষ্ঠুর ও দুর্ব্বার ;
যে দেবতা অগ্নির মত উজ্জ্বল
তবু অকরুণ,—
মানুষ তার প্রসাদ ভিক্ষা করলো পূজার নৈবেদ্য দিয়ে।
যাগযজ্ঞের সহস্রাধিক আচরণের
তোষামোদে।
দেবতার খুসীর প্রয়োজনে
তারা হনন করলো প্রাণ,
বলি দিলো নিরীহ ছাগশিশুকে।
ওরা জানতোনা ঈশ্বরের সেই লোকাতীত মহত্ত্ব,
যে ঈশ্বর অধিষ্ঠিত শুধু আত্মার
অনুভবের মধ্যে ;
যাকে পাওয়া যায়না উপাসনা দিয়ে,
নৈবেদ্য দিয়ে……পূজার মিথ্যা উপকরণে।

আত্মানম্ বিদ্ধি……
মন্ত্র দিলেন উপনিষদের রচয়িতা।
উচ্চারিত হলো ঋষির কণ্ঠধ্বনি,
"তমীশ্বরম্ একমেবাদ্বিতীয়ম্……"
তাঁরা বললেন—"ভূমাকে লাভ করো।"
লাভ করো সেই জ্ঞানের ঐশ্বর্য্যকে—
যে আলোকে ব্রহ্মকে জানা যায়।
বললেন তাঁরা—মিথ্যা এই জগৎ,
মিথ্যা পৃথিবীর মোহ।
আলোককে বিচ্যুত করলে থাকে অন্ধকার,
ব্রহ্মকে বিস্মৃত হ'লে থাকে মায়া;
ব্রহ্মজ্ঞানহীন মানুষের পৃথিবী
মায়ায় ভরা অপ্রয়োজনের অন্ধকার।

এমনই একদিনে
ভারতবর্ষের রাজপথ দিয়ে হেঁটে এলো
এক মুণ্ডিতশির তরুণ শ্রমন।
তখন দিগন্ত আকাশ জুড়ে নতুন সূর্য্যের মহিমা।
রক্তরাগের দীপ্তিতে উজ্জ্বল তার মুখ।
অকস্মাৎ বিদ্যুতের চমক দিয়ে নয়,
আত্মমগ্ন জ্ঞানের জ্যোতি দিয়ে
নিমেষেই জয় করলো সে
ভারতবর্ষের আত্মাকে।
হাজার বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে
সে এক নতুন দিগন্তের অভ্যুদয়।

এমনই ভাবেই আবির্ভূত হ'লেন তথাগত।
বুদ্ধ দিলেন মানুষকে আপন প্রত্যক্ষ পরিচয়;
এলো রাজা ঐশ্বর্য্যের পাহাড়চূড়ো থেকে নেমে,
এলো ভিক্ষু, অনাথ, অসহায়……

স্বপ্রমত্ত ব্রাহ্মণ নয়, নয় সকুণ্ঠচিত্ত অস্পৃশ্য সে।
মানুষ আপন অধিকারে এলো
তার সত্যের কাছে, প্রেমের কাছে, মুক্তির কাছে ;
বললো,
বুদ্ধং শরণং গচ্ছাম্যহম্।
মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ হলো দেবত্ব ;
সে তার মানবতা

বুদ্ধ বাণী দিলেন।
এ জীবন ক্ষণস্থায়ী......মরশুমী ফুলের মতই
ক্ষুদ্র তার আয়ু ;
মুহূর্তে মুহূর্তে জন্ম আর মৃত্যুর—
অনন্ত পরিবর্তনের রূপলীলা।
এ জগৎ তবু স্থাণু নয়, এ জীবনও অলীক নয়,
ক্ষণিককে আশ্রয় করে আছে অনন্তকাল।
তুচ্ছতে ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে পূর্ণতার রূপ।
সে আপন সম্পূর্ণ, প্রকাশমান ;
সত্যকে সন্ধান করে সে—
আত্মদীপের জ্ঞানের আলোকে।

মানুষকে মানবতার সত্যে
অজেয় হ'য়েই বাঁচতে হ'বে ;
মানুষকে আত্মজ্ঞানের মন্ত্রে
অমেয় হ'য়েই বাঁচতে হ'বে।
যে মানুষ আর্ত, যে ব্যথিত, ত্রস্ত, বিপর্য্যস্ত ;—
তাকে দাও দয়া, করো করুণা ;
বেদনার মধ্যে দিয়ে আর প্রেমের মধ্যে দিয়ে
প্রতিষ্ঠিত হোক জীবনের একাত্মবোধ।

যে ঈশ্বর প্রেমিক হ'য়ে

মুছিয়ে দেয়না মানুষের অন্তহীন যন্ত্রণার আর্তনাদ,
সে ঈশ্বরের অন্ধ উপাসনার মন্ত্র পড়ে—
মুক্তি নেই জীবনের।
মানুষকে জান্‌তে শেখো আপন আত্মার
পরিচয়ে।
লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে
সন্ধান করো আত্মার অন্তহীন সত্যকে।

পৃথিবীর বেদনার অগ্নিস্রোতে
লুপ্ত হোক আত্মবোধের তুচ্ছতার গ্লানি।
সহানুভূতির আনন্দলোকে
অধিষ্ঠিত হোক সচেতন ঈশ্বরত্ব।
হও প্রেমিক, করো প্রেম আর্তজনে—
মাতা যথা নিয়ং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সর্ব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।
সৃষ্টি করো অপরিমিত মানসের
অক্রোধ মৈত্রীতে,
অমেয় করুণাতে।

* * *

তুমি যে তথাগত।
আশ্রয়প্রার্থী শরণার্থী এই পৃথিবী;
দুঃখে ব্যাকুল, হিংসায় বিচ্ছিন্ন;
অহমিকার নিঃশ্বাসে পরিম্লান……
জাতীয়তার সঙ্কীর্ণ রন্ধ্র পথে
সে রুদ্ধ করেছে প্রেমিকতার সত্যবোধে,
জীবনকে জটিল করেছে সে
ভোগের অতৃপ্তিতে;

সংশয়ের রক্তিম আলোকে
সে পরিশ্রান্ত, মৃত্যুমুখী।

যেমন করে প্রত্যূষের পথে জ্বলে ওঠে সূর্য্য,
তেমনি করেই
আবির্ভাব হোক তোমার।
আমরা উচ্চারণ করি নির্ভয় নির্ভরতায়
—বুদ্ধং শরণং গচ্ছাম্যহম্॥

'কাল যদি মায়া, তবে 'দীর্ঘ' ও 'অল্প' দুই-ই তো মায়া। পুরুষোত্তমে প্রতি ক্ষণও অনন্ত উৎসবময়।…পূর্ব্ব ক্ষণ পূর্ব্ব ক্ষণ থাকিয়াই পর ক্ষণকে গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে। কেবল স্মৃতির ভরসায় জীবন চালাইও না; প্রত্যক্ষের দিকে, শ্রুতির দিকেও জাগ্রত থাকিও।…এ বিশ্ব তো সংরাধনের দেশ, আরাধনার দেশ, রাধারাণীর দেশ।…'

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ বিরচিত
গীতার অবধূত ভাষ্য—ভাষ্যপ্রদীপ
পৃঃ—১৬৩—৬৪

ভারত-সেবক

।। শ্রীজগন্নাথ সাহা, এড্‌ভোকেট ।।

ভারতবর্ষ ত্যাগের দেশ। বৈদিক যুগ হইতে বিবেকানন্দের যুগ পর্য্যন্ত ত্যাগের এই অমিয় ধারা ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্যকে প্রাণবান রাখিয়াছে। ভোগ স্বার্থপরতা; ত্যাগ পরার্থপরতা। ভোগে সুখ নাই। তাই,

"—পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি এ জীবন মন সকলি দাও
তার মত সুখ কোথাও কি আছে আপনার কথা ভুলিয়া যাও—"

ইহাই ভারত-আত্মার মর্ম্মবাণী। আর এই চিরন্তণী বাণী বহন করিয়াছেন ভারত-সেবক মহাত্মা গান্ধী।

ত্যাগীর ধর্ম্ম সেবা,—ধর্ম্ম প্রেম। 'যে প্রেম বাঁধিয়া রাখিয়া দেয় না,—বাঁধিয়া লইয়া যায়।' গান্ধীজীর প্রেম ভারতবর্ষকে শুধু বাঁধে নাই,—বাঁধিয়া স্বাধীনতার পথে লইয়া গিয়াছে। গান্ধীজী নাই। আমাদিগকে স্বাধীনতার প্রথম সোপানে রাখিয়া তিনি অন্তরালে গিয়াছেন। তাই, প্রেমের বন্ধনে বাঁধিয়া দেশটাকে পূর্ণতার পথে টানিতে একদল ত্যাগধর্ম্মী ও প্রেমধর্ম্মী সেবকের প্রয়োজন।

গান্ধীজী অহিংসার শক্তি লইয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন—সেবকের প্রেম লইয়া দেশকে ভালবাসিয়াছেন। অহিংসার জয় হইয়াছে—বৃটিশ শাসন পরাজিত হইয়াছে। কিন্তু প্রেমিকের জয় হইলেও প্রেমের জয় হয় নাই। স্বাধীনতার পরে দেশের মানুষ হইয়াছে ব্যক্তিকৈন্দ্রিক ও স্বার্থপর—সেবক হইয়াছে শাসক। দেশপ্রেম আইন ও শৃঙ্খলার যুপকাষ্ঠে বলি দিয়া পার্লামেণ্টারী রাজনীতির মালা পরিয়া পুরাতন নামাবলী গায়ে নেতৃবৃন্দ সাজিয়াছেন দেশ-পুরোহিত, আর বঞ্চিত জনভক্তের দল ইহাদের মুখে অনুস্বার বিসর্গ সংযুক্ত দুর্বোধ্য মন্ত্র শুনিয়া প্রার্থিত পাইবার দুরাশায় স্বাধীন ভারতের জীর্ণ মন্দিরে ছুটাছুটি করিতেছে। কংগ্রেস-পরিত্যক্ত বিরোধীদলের ভূমিকায় দলত্যাগী নেতৃবৃন্দ সরকারী দলে পরিণত হইবার অপচেষ্টায় ব্যাঘ্র-চর্ম্মাবৃত জীববিশেষের মত সেবক-চর্ম্মাবৃত হইয়া জনগণের সম্মুখীন। মুখোস খুলিয়া পড়িবার ভয়ে ইহারা ভীত শঙ্কিত। ইহাদের কর্ম্মসূচীও নাই,—কর্ম্মপন্থাও

নাই। আজ উদ্বাস্তু আন্দোলন, কাল শিক্ষক আন্দোলন, পরদিন ছাত্র আন্দোলন, ঠিক তারপর দিন বস্তী আন্দোলন করিয়া ইহারা জনগণের সরলতার সুযোগে ক্ষমতা অধিকারের নেশায় মাতিয়াছেন। ইহাদের সত্যাগ্রহ সুপরিকল্পিত অভিনয়,—ইহাদের ধর্ম্মঘট বহুরূপীর ছেলে-ভোলান রূপ। অন্যথায় বাড়ী হইতে ল্যাণ্ডমাষ্টার গাড়ীতে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে নামিয়া উদ্বাস্তুর পয়সায় মূল্যবান মালা পরিয়া লালবাজারের মোড়ে গ্রেপ্তার বরণ করিয়া সস্তা শহীদ সাজিতেন না—পূজাবকাশে বাস্তুহারা আন্দোলন স্থগিত রাখিয়া বস্তী আন্দোলনের মহড়া সুরু করিতেন না। এই রাজনৈতিক চাতুর্য্যের গোলক ধাঁধা ছিন্ন করিয়া দেশকে সত্য ও প্রেমের মঙ্গল শুভ্র আলোকে উদ্ভাসিত করিতে হইবে। তবে দেশ বাঁচিবে। অন্যথায় অন্ধপথে ঠোকর খাইয়া পড়িয়া দেশ চিরপঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইবে। এই গুরুদায়িত্ব সেবকের—ভারত সেবক মন্ত্রে দীক্ষিত সেবাব্রতীর।

গান্ধীজীর কংগ্রেস এই সেবকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিল—কংগ্রেস কর্ম্মীদল এই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ম্মীরা আজও বাঁচিয়া আছেন—মরিয়াছে তাহাদের সেবার প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথের কাদম্বিনীর মত নিজে মরিয়া কর্ম্মীদের আজ প্রমাণ করিতে হইবে কংগ্রেস মরে নাই। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থাটা ঠিক যেন রথের মত। রথী আছে, সারথি আছে, ঘোড়াও দুইটী আছে। তবুও রথ চলে না। কারণ রথ রথী সারথী ঘোড়া সবই তো কাঠের। ভক্তের দল দড়ি বাঁধিয়া না টানিলে রথ চলিবে কেন? রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী সবই তো আছে। দেশ চলে না। কারণ দড়ি বাঁধিয়া টানিবার সেবক কর্ম্মী নাই। দেশ-প্রেমের বন্ধন রজ্জু দিয়া দেশকে উন্নতির পথে চালাইবার স্বার্থহীন সেবক নাই। রথের বাহিরে দণ্ডায়মান সর্ব্বস্ব-পণকারী ভক্তবৃন্দের মত শাসন যন্ত্রের বাহিরে একদল বলিষ্ঠ কর্ম্মী সৃষ্টি না হইলে বিরাট এই দেশরথ আর চলিবে না। দুর্নীতির ক্লেদ জমিয়া ইহার চাকা অচল হইয়াছে—স্বার্থপরতার জঞ্জাল জমিয়া অগ্রগতির পথ হইয়াছে দুর্গম, বন্ধুর।

সেবক চাই। সেবক সৃষ্টির আনন্দমঠ চাই। সেবা ধর্ম্মের দীক্ষাগুরু সত্যানন্দও চাই। দেশরথ দাঁড়াইয়া আছে। ইহাকে টানিতে হইবে। একদল দেশপ্রেমিক আজও আছেন যাহারা রথে উঠিতে পারেন নাই—নীচে দাঁড়াইয়া—দড়ি টানিবার অখ্যাত কর্ম্মভার তাঁহাদিগকেই গ্রহণ করিতে

হইবে—অভিমান করিয়া দূরে দাঁড়াইয়া থাকিলে রথের চাকা কাঁদার পাঁকে পাঁকে ডুবিয়া যাইবে। একটু জোরে টানিলেই জনদেবতাকে বঞ্চিত করিয়া যাহারা ফাঁকি দিয়া রথের উপর উঠিয়াছে, গতিবেগের ঝাকুনিতে ছিটকাইয়া নীচে পড়িয়া পিষ্ট হইবে তাহারাই; চলিবে জগন্নাথের রথ—'চক্রনেমির ঘর্ঘর রবে নির্ঘোষি রাজ পথ'।

কংগ্রেস কর্ম্মীদলের যাহারা সরকারী কাঠামোতে স্থান সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, সরকার বিরোধীদলে ভিড়িয়া সুযোগের আশায় দাপাদাপিও করেন নাই—সত্যানন্দ স্বামীর মত নিজের পল্লীতে একটি আনন্দমঠ গড়িয়া তাঁহারা কিশোর দলের কানে মাতৃ-আরাধনার মহামন্ত্র শুনাইলে অতি অল্প সময়ে একদল দীক্ষিত কর্ম্মী সৃষ্টি হইবে—ইহারাই দেশটাকে টানিতে পারিবে—বাঁশের অগ্রভাগে লাল বস্ত্রখণ্ড বাঁধিয়া মেকি 'ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ' করিবে না।

ইহার জন্য প্রয়োজন প্রতি পল্লীতে একটী করিয়া ক্ষুদ্র পাঠাগার—আর শাসক গোষ্ঠীর ছোঁয়াচের বাহিরের একজন গ্রন্থাগারিক। সেখানে থাকিবে ভারতের বুকে বিদেশী অত্যাচারের ইতিহাস—থাকিবে পরাধীনতার শৃঙ্খল-মোচনে শহীদগণের আত্মদানের গৌরবময় কাহিনী। কিশোর পাঠকদল বুঝিবে তাহাদের প্রতি ধমনীতে প্রবাহিত সর্ব্বত্যাগী শহীদের শোণিত। পাঠাগারে থাকিবে জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ছবি—তেষট্টি দিন অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু বরণের চিত্র—বিয়াল্লিশ বিপ্লবের রক্তক্ষয়ী রূপ। কিশোর তরুণদল বুঝিবে পরাধীনতা যে পাপের সহজ পথে আসিয়াছিল স্বাধীনতা সে পথে আসে নাই। স্বাধীনতার পথ ছিল দুর্গম দুস্তর। জীবনের মূল্যে অর্জ্জিত স্বাধীনতা জীবনের মূলেই রক্ষা করিতে হইবে। আর এই কিশোর তরুণদল হইবে ভারত সেবক।

জনগনের দৈনন্দিন জীবনের সাথী হইবে এই ভারত সেবক দল। শাসনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় ইহারা জনগণের খবরদারি করিবেনা—বিরোধী-দলে দাঁড়াইয়া মেকি আন্দোলনে মূক জনগণের নেতৃত্বও করিবে না। আর্ত্তের সেবা করিয়া, রোগীকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া, দরিদ্র ছাত্রকে বই সংগ্রহ করিয়া দিয়া, সঙ্গতিহীন পরিবারে শিশুদের বিনা পয়সায় শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া জনগণের আত্মীয় হইবে—দেশ সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করিবে। জনগণ বুঝিবে রাজনৈতিক দাবা খেলায় চালের ভুলে

শাসন-ক্ষমতা দল-বিশেষের হাতে আসিবে ও যাইবে। থাকিবে দেশ, থাকিবে জনগণ আবহমান কাল অচল অপরিবর্ত্তিত।

পল্লীর গ্রন্থাগারে থাকিবে একটী হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা। গ্রন্থাগারের পুস্তকে যাহা শিখিবে কিশোর বালক দল তাহাই নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে লিখিয়া এই মাসিক পত্রে লিপিবদ্ধ করিবে; আর এই লেখাগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতি সপ্তাহে করিতে হইবে বিতর্ক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। এইভাবে সেবকদল দেশ-সেবা শিখিবে—রাজ-নৈতিক জ্যেঠামি শিখিবেনা।

সাহিত্য হইবে পাঠাগারের মূলসুর। বঙ্কিমের আনন্দমঠ, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী, রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ সমগ্র জাতিকে একদিন পরাধীনতার পাষাণপ্রাচীর ভাঙ্গিয়া মুক্তিস্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। বিদ্রোহী নজরুলের সুরে গ্রন্থাগারিকের কণ্ঠে সেই সর্ব্বজয়ী সুর ধ্বনিত হইলে কিশোর তরুণদল সত্যের সন্ধান পাইবে—মিথ্যা আলেয়ায় ভুলিয়া দিশাহারা হইবেনা।

ইহাই পথ,—বাঁচিবার পথ। জনগণ ও শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে অবিশ্বাসের পাষাণ প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছে। একদল ভারত সেবক পুরোভাগে দাঁড়াইয়া দেশের কিশোর তরুণ দলকে দেশপ্রেমের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ না করিলে স্বার্থান্বেষী দলের বিভ্রান্তিকর প্রচারে সমগ্র দেশ একদিন সর্ব্বনাশা ধ্বংসের পাষাণ চাপে পিষ্ট হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে—কাণ্ডারী হুশিয়ার!

স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীভূপতি মোহন সেন ॥

সে আজ ৪৩।৪৪ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা যখন বরিশাল সহরে ছিলাম এবং কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত শরৎ ঘোষকে জানিতাম এবং সেই সময়েই মহাত্মা অশ্বিনী কুমারের সংস্পর্শে আসিয়া জীবনে কতকগুলি নূতন প্রেরণা পাইয়াছিলাম। বরিশাল হইতে চলিয়া আসার পর শ্রীশরৎ কুমারকে ভুলিয়া গেলেও মহাত্মা অশ্বিনী কুমারকে ভুলিয়া যাই নাই। তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পল্লীর অপর পাড়ায় "নরনারায়ণ আশ্রম" প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাইয়া এবং উহার প্রতিষ্ঠাতা সেই শ্রীশরৎকুমার জানিতে পারিয়া বিশেষ উৎসাহের সহিত আশ্রমের জমিতে যে সভা হইয়াছিল তথায় উপস্থিত হইলাম। সুদীর্ঘ ৪৪ বৎসর পর শ্রীশরৎকুমারকে শ্রীনিত্যগোপালের শিষ্য স্বামী পুরুষোত্তমানন্দরূপে দেখিয়া অন্তরে আনন্দ পাইয়াছিলাম। দৈবক্রমে ঐ সভার সভাপতিত্বের ভার আমার উপর পড়িয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রীনিত্যগোপালের বাণী এবং স্বামীজীর বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে কতকটা জানিয়া সভার কাজ চালাইয়া গেলেও একটা সংকল্প লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

আজ ৩০ বৎসরের ঊর্দ্ধকাল আমি আশ্রম মন্দির, মস্‌জিদ এবং গীর্জাগুলিকে একই দৃষ্টিতে দেখিতে অভ্যস্থ। মন্দিরের নিকট আসিলে যেমন উহার দরজার ধূলা মাথায় ঠেকাই, আশ্রম মস্‌জিদ এবং গীর্জার ধূলিও সেইরূপ শ্রদ্ধার সহিত মাথায় গ্রহণ করি। সেইদিন আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা জানিয়া মনে এত আনন্দ হইল যে ইহা যাহাতে সত্বর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা সম্ভব আত্মনিয়োগ করিতে সচেষ্ট হইলাম। আমার ধারণা আশ্রম বা মন্দিরের কাঁশী ঘণ্টা ও শঙ্খের ধ্বনি যত দূর যায় অথবা মস্‌জিদের "আজানের" ধ্বনি যতদূরে লোকের কানে প্রবেশ করে ততদূর স্থান সাময়িক ভাবে পবিত্র হইয়া উঠে। আমার ব্যক্তিগত কথা বলিলে আমি এইটুকু বলিতে পারি একবার ইণ্টালী মিড্‌ল রোডের একটি মস্‌জিদের মধুর "আজান" শুনিয়া আমি এত মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে প্রত্যহ মাসের পর মাস আপিসের ছুটীর সময় ঘড়ি দেখিয়া তথায় ছুটিয়া

আসিয়া একমনে সেই "আজান" শুনিয়া আনন্দিত চিত্তে বাড়ী ফিরিতাম। অবশ্য সে সময় আমার ট্রামের মান্থলি টিকিট ছিল। আশ্রমের ঘর দরজা প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়া যাহাতে সত্বর উহা সম্পন্ন হয় তজ্জন্য আমার অন্যতম বন্ধু শ্রীযুত জিতেন্দ্র নাথ রায় সহ অগ্রসর হইলাম এবং বন্ধুবর প্রাণান্ত খাটিয়া উহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দিলেন এবং আশ্রম প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল।

এখানে আমার একটু স্বার্থ যে ছিল না তা নয়। আমি যে পল্লীর অধিবাসী সেই পল্লীতে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে স্থানীয় জনসাধারণের নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে এবং এই উচ্ছৃঙ্খলতার যুগে জনসাধারণ স্বামীজীর সান্নিধ্যে আসিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত হইবে ইহা আমার পক্ষে অতি আনন্দের বিষয় বলিয়াই মনে হইয়াছিল। আশ্রম স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই পল্লীর বিভিন্ন-স্থানে সভা আহ্বান করতঃ স্বামীজীর সহিত স্থানীয় লোকের পরিচয়ের সুযোগ করিয়া দিতে চেষ্টা করিলাম। আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলকেই তাঁহার সান্নিধ্যে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছি এবং কিছুদিন যাবত দেখিয়াছি যাহাদের বিষয়ে অন্ততঃ আমি আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম তাঁহারাও অবশেষে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। আমার বিশ্বাস স্বামীজীর আত্মিক প্রেরণাই ইহা সম্ভব করিয়াছে। শ্রীনিত্য-গোপালের শিষ্য স্বামীজী সমন্বয়বাদ অতীব জোরের সহিত প্রচার করিয়াছেন। ইহা অবশ্য নূতন নয়। বিদেশীর প্রচারের মোহে শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতের সকল উচ্চ আদর্শকেও কৃপার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভারতের পুরাণ, ভাগবত, উপনিষদের বাণীও গাঁজাখোরী গল্প বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় কাব্যে এবং প্রবন্ধে যখন ঐ সকল বাণী যুগধর্ম্ম উপযোগী হইয়া বাহির হইতে লাগিল তখন দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ আগ্রহ সহকারে "ভারতের বাণী" মুগ্ধচিত্তে শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং অনেক বিদেশী বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া কবিগুরুর নিজ ভাষায় লিখিত তত্ত্ব উদ্ঘাটনে তৎপর হইলেন। কবিগুরু নূতন বাণী প্রচার করেন নাই, সকল বাণী আমাদের পুরাণ, ভাগবত এবং উপনিষদে আছে। তিনি নূতন ভাবধারায় অন্তরের স্পর্শযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সৎ ও অসৎ এবং জড় ও অজড় উভয়ের সমন্বয়েই সকল বিষয় সম্পাদিত হইতেছে। দূরদৃষ্টি এবং বিশ্বাস লইয়া স্বামীজীকে বিচার করিলে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইবার পথ পাওয়া যাইবে। মহাপুরুষদের

জানিতে বুঝিতে কতকটা সময়ের প্রয়োজন হয়। তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানের সহিত পরিচিত হইতে হইলে তাঁহার সম্পূর্ণ আলোচনাগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে, তবেই আমরা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব। তিনি আমাদের মধ্যে ছিলেন এবং এখনও আছেন। তাঁহার আত্মা নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিলেও তিনি ভিন্নরূপে পুনরায় আরও শক্তিশালী হইয়া আমাদের মধ্যে আসিতেছেন। আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, মন্দিরে, মস্‌জিদে ও গীর্জায় যখন সমবেতভাবে ভক্তির সহিত উপাসনা হয় তখন সর্ব্বশক্তিমান ৺ভগবান সেইস্থানে উপস্থিত হয়েন। যদি তাহা না হয় তবে সকলই মিথ্যা, উপাসনাও মিথ্যা। আশ্রমের স্থিতি স্থায়ী হইলে তাঁহাকে আমরা সর্ব্বদাই আমাদের মধ্যে পাইব, ইহার অন্যথা হইতে পারে না। আমি অন্তরের মধ্যে ইহা উপলব্ধি করি। ছাত্রাবস্থায় জীবন গঠনে এক শিক্ষকের আদর্শকে মনে প্রাণে আকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম, তারপর যৌবনের প্রথমে এক মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার কতকগুলি আদর্শকে মানিয়া নিয়াছিলাম, তারপর যৌবনের দ্বিতীয়ভাগে এক ব্রহ্মচারী অধ্যাপক ঋষি সবল হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। তাঁহারা এই মরজগতে উপস্থিত না থাকিলেও প্রত্যহ দুই বেলা আমার উপাসনার সময় উপস্থিত হন এবং আমি প্রণাম জানাই। স্বামীজীর দেহরক্ষার দিন হইতে তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আসিতেছেন। দুই বেলাই প্রার্থনা জানাই—তোমাদের মহত্ত্বতার কনিকামাত্র আমাকে প্রদান করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য করিয়া তোল। আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি যেন তাঁহাদের আদর্শকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার সহিত একাগ্রমনে অনুসরণ করিয়া যাইতে পারি। তাঁহারা আমার কাছে নাই ইহা কখনও মনে হয় না। আজ স্বামীজীকে হারাইয়াছি বলিয়া মনে হয়না এবং কোন প্রকার শোকের কারণ হইয়াছে বলিয়াও বোধ হয়না। তাঁহার মহৎ আদর্শগুলি আমাদের মধ্য দিয়া উত্তরোত্তর জয়যুক্ত হইয়া উঠুক, ইহাই কায়মনোবাক্যে কামনা করি।

ব্রহ্মসূত্রম্

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(২০)

এই লিঙ্গই ভজনার বিশেষ বিশেষ ধারাসমূহের স্বাতন্ত্র্য প্রচার করিতেছে। জৈমিনিকৃত পূর্ব্ব মীমাংসায় 'তাহাই বলা হইয়াছে' (তদপি)। 'শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ'—জৈঃ পূঃ ৩।৩।১৪। জড় যদি পুরুষোত্তম-বস্তুর অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অজড়ের অপেক্ষা করিত, অথচ অজড় যদি জড়ের অপেক্ষা না করিয়াই, জড়কে নিজের অঙ্গরূপে পাইয়াই সাক্ষাৎভাবে মুখ্য ভাবে পুরুষোত্তম-অর্থ ফুটাইয়া তুলিতে পারিত, জড় নিশ্চয়ই অজড়ের অঙ্গ হইত। কিন্তু পুরুষোত্তম-মহাবিদ্যায় ধরা পড়িয়াছে যে, জড় ও অজড় দুই-ই অঙ্গাঙ্গিভাবে, সমভাবে, অব্যবহিতভাবে পুরুষোত্তম-বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিতেছে; এখানে দুই-ই দুইয়ের কাছে মুখ্য ও গৌণ, antagonistic ও complementary, এবং এইখানেই দুইয়ের সামর্থ্য বা লিঙ্গত্ব। দুইয়ের কাহারো কাছেই পুরুষোত্তম-অর্থ আর বিপ্রকর্ষে নয়। উভয়েরই সন্নিকর্ষে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম। জড়-অজড় সমন্বয় হইলে জড়কে আশ্রয় করিয়া যত ভিন্ন ভিন্ন ভজনধারা স্ফুরিত হয়, তাহাদেরও সম আস্বাদন, সম মূল্য রহিয়াছে।

পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥৩।৩।৪৫

(শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যকে ডিঙ্গাইয়া) প্রকরণাৎ [প্রকরণের উপর দাঁড়াইয়া দেখিলে] পূর্ব্ববিকল্পঃ [পূর্ব্বেরই বিভিন্ন কল্পনবিশেষ রূপে] স্যাৎ [পরিণত হইবে পরেরটী] ক্রিয়ামানসবৎ [যেমন ক্রিয়ামানস]।

শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্যকে অতিক্রম করিয়া প্রকরণের উপর দাঁড়াইয়া বিচার করিলে যেখান হইতে পূর্ব্বের রওয়ানা, সেই পূর্ব্বেরই বিভিন্ন কল্পনাবিশেষ হইবে পরেরটী। যাহারা জড়বাদী, তাহাদের কাছে জড় হইতেছে 'পূর্ব্ব', অজড় হইতেছে 'অপর'। তাহাদের কাছে জড়েরই বিভিন্ন কল্পনা হইতেছে জড়েরই বিপরীত পরিণতি ঐ অজড়। অজড়কে একান্তভাবে না মানিলে

জড় ব্যাখ্যাতই হয় না, অজড়ের অপেক্ষা জড়কে করিতেই হয়। অথচ অজড়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা একান্ত জড়বাদীর পক্ষে সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হয়; তাই অজড়কে জড়েরই পরিণাম-বিশেষ বলিয়া স্বীকার করে এবং অজড়কে দিয়া নিজের প্রতিষ্ঠাও স্থাপন করে। এই ভাবে জড় করিতেছে অজড়কে শোষণ (exploitation); পক্ষান্তরে অজড়বাদীও জড়ের স্বয়ংমূল্য না দিয়া, জড়কে অজড়েরই 'অধ্যাস', বিকল্প বলিয়া জড়ের ব্যবহারিক সত্তামাত্র স্বীকার করিয়াছে; অথচ প্রথম হইতেই জড়ের অপেক্ষা না করিলে অজড়ের পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠাই সম্ভব হইত না। জড়-অজড়ের মধ্যে এই সম্বন্ধগত গোঁজামিল-যুক্ত পরস্পরাকাঙ্ক্ষাই হইতেছে প্রকরণের অন্তরের কথা। লিঙ্গ এই গোঁজা-মিলের বিরোধী। উহারা জড়-অজড়ের, দ্বৈতাদ্বৈতের, ভজনের প্রতি বিশেষ ধারার স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিয়াছে, প্রতি ভজন-ধারার সঙ্গেই পুরুষোত্তমের অব্যবহিত, সন্নিকর্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। ইহার নিদর্শনস্বরূপে সূত্রকার বলিতেছেন 'ক্রিয়ামানসবৎ'। ক্রিয়াকে 'পূর্ব্ব' করিলে 'মানস' হয় ক্রিয়ার বিকল্প, ক্রিয়ারই প্রকারভেদ, অঙ্গমাত্র; আবার 'মানস'কে পূর্ব্ব করিলে 'ক্রিয়া' হয় মানস-বিকল্প। ক্রিয়া-বিকল্প যখন মানস, তখন অন্তর্জ্জগৎ হয় শব্দা-জ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্য ভ্রান্তিময় বিকল্প; পক্ষান্তরে যখন মানসের বিকল্প হয় ক্রিয়া, তখন বহির্জ্জগৎ হয় বিকল্প, ভ্রান্তি। জড়বাদীর কাছে অন্তর্জ্জগৎ বহির্জ্জগতের বিকল্প, অজড়বাদীর দৃষ্টিতে বহির্জ্জগৎ অন্তর্জ্জগতের বিকল্প। এই বিকল্প-দর্শন কাটিতে পারে জড়-অজড়ের নির্ব্বিকল্প সমন্বয়-দর্শনেই।

অতিদেশাচ্চ ॥৩।৩।৪৬

(প্রকরণের মত) অতিদেশাৎ চ [অতিদেশ হেতুও—extended application—এই বিকল্প সম্ভব হইতেছে]।

'Philosophical method is analytical as well as synthetical, not indeed in the sense of a bare juxtaposition or mere alternating employment of these two methods of finite and cognition, but rather in such a way that it holds them merged in itself. In every one of its movements therefore it displays an attitude atonce analytical and synthetical. Philosophical thought proceeds analy-

tically, in so far as it only accepts its object, the Idea, and while allowing it its own way, is only, as it were, an on-looker at its movement and development (দৃগেব আত্মা). To this extent philosophising is wholly passive (ব্রহ্মযোনিঃ). Philosophic thought however is equally synthetic, and evinces itself to be the action of the notion itself. To that end, however, there is required an effort to keep back the incessant impertinence of our own fancies and private opinions'—Hegels Logic P. 376-77

অবতারকে ভালবাসিতে গিয়াই আমরা আপনাআপনি বিশ্লেষনের সাধন অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; আত্মসমর্পণই বিশ্লেষনের অর্থ, তিনি তখন শেষ-মূর্ত্তি। এই শেষ তখন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় সমন্বয়ে আমি কিংবা তিনি হন। অবতারলীলা জগতের মানব-মনে যতরকম প্রশ্ন উঠিতে পারে এবং তাহার মীমাংসার্থ যত প্রকার শাস্ত্র এ যাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সকলেরই living harmony। লজিক, মেটাফিজিক, বিজ্ঞান, চারুকলা ইত্যাদি ঘন হইয়াই পরাপ্রকৃতি আলিঙ্গিত তনু অবতার। সকলে ইহার ধারণে সমর্থ নহে।

'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।'

বিদ্যাসাধনের ভিতর দিয়া পূর্ব্বপক্ষীয় দুইটী সূত্রকেও আমাদের সহিত অন্বিত করিয়া আস্বাদন করিতে পারি। 'The objection in metaphysic is the part of the forgotton and unknown facts. To suppress the objection, or to express it softly, is to suppress one set of the facts, it is to present the part of the things that suits us, and to dissemble that which does not suit us, it is to take more care of our opinion than of the truth itself'—Paul Janet.

'পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ' সূত্র সত্যার্থ প্রতিপাদক। অবতারতত্ত্বের অদ্বৈত প্রকরণে অদ্বৈতেরই প্রকারভেদ দ্বৈত, আবার উপনিষদ-পুরুষের দ্বৈত-প্রকরণেরই অদ্বৈতবাদ একটী শাখা মাত্র। তখন বিকল্প অর্থ বিশেষ বিশেষ কল্পনা বা সামর্থ্য। ক্লৃপ্ সামর্থ্যে। গোবিন্দে মনঃ কল্পনই ভজন। 'ভক্তিরস্য'

ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্তেন অমুষ্মিন্ মনঃ কল্পনম্ এতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যম্'—গোপালতাপনীয়। শ্রুতির কোলেই অদ্বৈতের বিকল্প দ্বৈত এবং দ্বৈতের বিকল্প অদ্বৈত। এই বিকল্প ভজনরাসাস্বাদনঘন; ইহা নির্ব্বিকল্প। কোন একটী বিশেষকে স্বীকার করায় শ্রুতি অপেক্ষা প্রকরণেরই বল অধিক স্বীকৃত হইয়া থাকে। 'অতিদেশাচ্চ'-সূত্রও এইভাবে শ্রুতিসমন্বয়ে মধুরলীলাপ্রচারক; অতিদেশই লীলার প্রাণ। বৃন্দাবন অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের সমন্বয় বিধান করিতেছেন। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে ব্রজগোপীগণ বলিয়াছেন, 'মনসি উদীয়ৎ নঃ'—আমাদের মনে শ্রীকৃষ্ণ উদিত হউন। এই মনসি পদের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিতেছেন

'অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি মানি।'

অজড়ের বিশেষ অবদানকে জড় নিজের প্রয়োজনে লাগাইয়াছে, যেখানে জড়ের গতি নাই, নিজের দেশ অতিক্রম করিয়া সেই অজড়ের দেশের ঘটনাও ব্যাখ্যা দিতে চাহিতেছে। অথচ এই অতিদেশের জন্য জড়ের ঋণ সে একটুকুও স্বীকার করে নাই। ঋণ-গর্বিত জড় ভাবিতেছে সে বুঝি নিজের যোগ্যতাতেই এই 'অতিদেশ' লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। স্বাধিকার-প্রমত্ত জড়ের অজড়ের-প্রতি এই অকৃতজ্ঞতার ফলই হইতেছে বিকল্প-দর্শন। অজড়বাদীদের সম্বন্ধেও ইহা তুল্যভাবে প্রযোজ্য। অজড়বাদীও নিজের দেশ অতিক্রম করিয়া জড়ের দেশের ঘটনাপুঞ্জের ব্যাখ্যা দিতে চাহিতেছে, অথচ এই অতিদেশের জন্য সে জড়ের কাছে ঋণ স্বীকার করিবার মত কোনও সৎ সাহস দেখায় নাই। তাই অজড়ের দৃষ্টিতে জড় অজড়েরই বিকল্প; জড়কে বিকল্প বলার ফলে অজড় নিজেও বিকল্প হইয়া পড়িতেছে। আজও অদ্বৈতবাদের বিকল্প দ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদের বিকল্প অদ্বৈতবাদ।

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ ॥ ৩।৩।৪৭
দর্শনাচ্চ ॥ ৩।৩।৪৮

—শঙ্করাচার্য্যের পাঠ

বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ দর্শনাচ্চ—নিম্বার্কের পাঠ

বস্তুতন্ত্রতাই তত্ত্বনির্দ্ধারণ ও দর্শনহেতু বিদ্যা; কর্ত্তৃতন্ত্র জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, যোগ বা যে কোন ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ বলিয়া শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার কিছুই বিদ্যা নহে। বিদ্যা সরস্বতী, 'সরো নীরং তত্ত্বৎ রসো বা অস্তি অস্যাঃ'

(Natural First Water), ব্রহ্মযোনি। কেনোপনিষদে ইনি উমা হৈমবতী বহুশোভমানা। বর্ত্তমান সমাজ এই বিদ্যার সাধনে বঞ্চিত থাকিয়া দলাদলির সৃষ্টি করিতেছে। বিদ্যার সাধনে যাহারা বঞ্চিত তাহারাই বিদ্যা ও অবিদ্যার সহভাব উপলব্ধি করিতে পারে না; জড়-চেতন, subject ও object, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, analysis ও synthesis চিরদিনই তাহাদের কাছে দ্বন্দ্বময়। বিদ্যাসাধক যে নয়, তাহার প্রথম বিকল্প বা ভ্রান্তি হইতেছে, 'To think a thing was the means of finding its very self and nature....These terms of thought were cut off from their connection, their soliderity; each was believed valid by itself and capable of serving as a predicate of the truth. It was the general assumption of this metaphysic that a knowdge of the Absolute was gained by assigning predicate to it. It neither inquired what the terms of the understanding specially meant or what they were worth, nor did it test the method which characterises the Absolute by the assignment of predicates.'

Post mortem dissection-ই এই বিষম বিপদের জনক। অনন্তের অর্থই জানি না, অথচ ভগবানকে অনন্ত বলিতেছি। কি ধৃষ্টতা!

দ্বিতীয় বিকল্প বা ভ্রান্তি: ভগবানের একটী mode and ready মূর্ত্তি স্বীকার। 'The metaphysical systems adopted a wrong criterion....these totalities—God, the soul, the world,—were taken by the metaphysician as subjects made and ready, to form the basis for an application of the categories of the understanding. They were assumed from popular conception....The common conceptions of God, the soul, the world, may be supposed to afford thought a firm and fast footing. They donot really do so. Besides having a particular and subjective character clinging to them, and thus leaving room for great variety of interpretation, they themselves first of all require a firm and

fast definition by thought. This metaphysic was not free or objective thinking. Instead of letting the object freely and spontaneouly expound its own characteristics, metaphysic pre-supposed it ready-made.'—Hegel.

তৃতীয় বিকল্প বা ভ্রান্তি :—'This system of metaphysic turned into Dogmatism. When our thought never ranges beyond narrow and rigid terms, we are forced to assume that of two opposite assertions,...the one must be true and the other false,...Dogmatism consists in the tenacity which draws a hard and fast line between certain terms and others opposite to them.'

'মনসি উদীয়ৎ' বাক্যের অর্থ তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে, 'বৃন্দাবনে উদয় হউন।' মন কি করিয়া বৃন্দাবন হইল? তাহারই উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন, অন্যের কাছে দেহের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়ই মন-পদবাচ্য; কিন্তু আমার কাছে মন অর্থ বৃন্দাবন। কেননা আমি মন ও বনকে এক করিয়া মানিতে পারিয়াছি। বিদ্যাসাধনায়ও মন-বন এক।

অন্যের হৃদয় মন আমার মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি মানি।
তাঁহা তোমার পাদদ্বয় করহে যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥
প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন।
ব্রজ আমার সদন তাহা তোমার সঙ্গম
না পাইলে না রহে জীবন॥
পূর্ব্বে উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগজ্ঞানের কহিলে উপায়।
তুমি বিদগ্ধ কৃপাময়, জান আমার হৃদয়
মোরে ঐছে কহিতে না জুয়ায়॥
চিত্ত কাড়ি তোমা হইতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে
যত্ন করি, নারি কাড়িবারে।

তারে ধ্যান শিক্ষা কর,　　　লোক হাসাইয়া মার
স্থানাস্থান না কর বিচার ॥
নহে গোপী যোগেশ্বর,　　　তোমার পদ কমল
ধ্যান করি পাইবে সন্তোষ।
তোমার বাক্য পরিপাটী,　　　তার মধ্যে কুটীনাটী
শুনে গোপীর বাঢ়ে আর রোষ
দেহ-স্মৃতি নাহি যার,　　　সংসার কূপ কাঁহা তাঁর
তাহা হইতে না চাহে উদ্ধার
বিরহ সমুদ্রজলে　　　কাম তিমিঙ্গিলে গিলে
গোপীগণের লহ তাহার পার।

মন ও বনকে এক করিয়া গোপীগণ জানিতেন বলিয়াই তাঁহাদের সামান্য জ্ঞান মাটীতে প্রসারিত হইয়াছিল। ধ্যানে সংসার ও ঈশ্বর দুই; গোপীদের ধ্যান ছিল না। বন হইতে স্বতন্ত্র করিয়া মনকে ভগবানে স্থাপন করিলে মনের বিজিজ্ঞাস্য স্বরূপ কখনও প্রাণের আদরের অবিজ্ঞাত "জনম ভরিয়া হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল" এমন রূপ-তত্ত্বকে আলিঙ্গন করিতে পারিত না।

"মনেতে ভাবিলে স্বরূপ হয়।
বর্ত্তমান বিনে কিছুই নয় ॥"—চণ্ডীদাস।

বন বর্ত্তমান রূপ এবং মন স্বরূপ; মন ও বনের অদ্বৈতই শ্রুতি প্রচারিত "রসো বৈ সঃ।" গোপী কেবল যোগেশ্বর নহেন যে, কেবল চিন্তা করিয়াই জীবন কাটাইবেন; তাহার যোগ ভোগের সমন্বয় মনোময় বনতত্ত্ব আস্বাদনে ধন্য হইয়াছিলেন। ধ্যান ও যোগ যাহাদের নাই, তাঁহাদের সংসার কৃষ্ণময় বলিয়াই তাহা কূপ নহে, কাজেই উদ্ধারের কোন কথাই তাহাদের মনে উদিত হয় না। যাহারা ধ্যান করিয়াই সন্তোষ পায়, তাঁহাদের লোকাপত্তি কোথায়? তাহারাই আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয় ঘুড়িয়া ঘুড়িয়া বেড়ায় এবং সুযোগ উপস্থিত হইলেই আবার কাম ভোগের জন্য জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। দেহ-স্মৃতি দূর হইয়া গোপীদের দেহশ্রুতি লাভ হইয়াছিল বলিয়াই সংসার বৃন্দাবন। ভগবান বলিতেছেন, "নিজাঙ্গমপি যে গোপ্য মমেতি উপাসতে। তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ় প্রেম-ভাজনম্॥" ব্রজই গোপীর সদন; ব্রজ চঞ্চল, গমনশীল জগৎ। তাহাদের ব্রজই একমাত্র গতি, ব্রজ

ব্যতীত অন্য কোথায়ও তাহারা কৃষ্ণকে পাইতে চান না। অনিত্য সংসারে অবতীর্ণ মাটির দেবতাই গোপীভাবের আস্বাদ্য পূর্ণ ব্রহ্ম।

শ্রুত্যাদি বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ৩।৩।৪৯

শ্রুত্যাদির বলীয়স্ত্বহেতুতেও (প্রকরণাদির নিজস্ব সিদ্ধান্তের সঙ্গে) কোনও বাধা নাই।

শ্রুতি, বল ও বাক্য যখন প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা হইতে বলবৎ তখনই প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যার নিত্যত্বে কোন বাধা হয় না। শ্রুতি যখন বলাধান করেন তখন আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, আস্তিকতার অন্তর্গত দ্বৈত ও অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, কালীকৃষ্ণ শিবরাম আল্লা যীশু, মোক্ষজ্ঞান ও শিল্পশাস্ত্রবিজ্ঞান কিছুরই সহিতই কিছুর বাধাভাব নাই। প্রত্যেকেরই এক একটী স্বতন্ত্র বিশেষত্ব আছে বলিয়াই একের কার্য্য অন্যদ্বারা চলিতে পারে না। অবতারই সমঞ্জন-দর্শন, 'শ্রুতিবলীয়স্ত্বাৎ'। নিরপেক্ষ শ্রুতি সার্থক করে লিঙ্গকে, লিঙ্গ করে বাক্যকে, বাক্য করে প্রকরণকে, প্রকরণ করে স্থানকে, স্থান করে সমাখ্যাকে। শ্রুতি তাঁহারই নির্ব্বিশেষ টান। শ্রুতিহীন জীবনেই 'বাধনালক্ষণা দুঃখম্' ; শ্রুতির কোলেই অবাধে লীলারসাস্বাদন।

ভজনের বিশেষ বিশেষ ধারার স্বাতন্ত্র্য একান্ত বিদ্যার মধ্যে মুছিয়া ফেলিলে সেই বিদ্যা কিছুতেই গড়িতে পারিবে না ; উহা যে জীবনের একটী আধ্যাত্মিক মৃত্যুই আনিয়া দিবে, বাস্তব জগতে সেই বিদ্যার কোনও প্রতিষ্ঠা হইবে না, ভাগবত পরিবার সমাজ কিছুই গড়িয়া উঠিবে না। পক্ষান্তরে পুরুষোত্তম বিদ্যায় ভক্ত পুরুষোত্তম কামের ভিতর ঝাঁপ দিয়া এই বিশ্বকে পুরুষোত্তম ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে পারে, সৃষ্টির অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারে। সাধনায় গড়া এই দ্বিতীয় সৃষ্টির অভিজ্ঞান লাভের তত্ত্বই পরবর্ত্তী সূত্রে আলোচিত হইয়াছে।

অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তর পৃথকত্ত্ববদ্ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥৩।৩।৫০

ক্রমশঃ

সাময়িকী

আত্মশুদ্ধি ঃ—ব্যক্তির, পরিবারের, সমাজের ও সমস্ত বিশ্বের বর্ত্তমান অবস্থা ভেবে দেখলে যে বস্তুটীর প্রয়োজন খুব বেশী বলে মনে হয়, সেটী আত্মশুদ্ধি। ব্যক্তিগত আত্মশুদ্ধির যেমন প্রয়োজন তেমনি সমষ্টিগতও। কিন্তু সেটা আসবে কোন্ পথে ?

দীর্ঘ দিনের নিরিবিলি ব্যক্তিগত জীবন যাপনের একটা সুপ্তি থেকে একদা যেদিন রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-ক্ষুদিরাম-মহাত্মাজী একটা দেশকে এক টান মেরে একটা জাতীয়তা বোধের তথা বিশ্ব-বোধের দুয়ার গোড়ায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেদিনও ব্যক্তিগত সৌন্দর্য আমাদের জীবনে কিছু ছিল। আমরা সেদিনও সত্য কথা বলব, সত্য আচরণ করব, স্বল্পের মধ্যে, সরলতার মধ্যে জীবনযাপন করব, দুস্থের আর্ত্তের সেবা করব—এমন কতকগুলি সদা কালীন সত্যকে গ্রহণ করার প্রয়াস করেছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের সন্তানদের শিশু বা কিশোর জীবনের সামনে তেমন কোন আদর্শ সামনে এসে দাঁড়ায় না। মানুষের জীবন যাপনের মান গেছে বেড়ে, অথচ সমগ্রভাবে লোক সংখ্যার তুলনায় দেশ গেছে দরিদ্র হয়ে—তাই ঐ বর্দ্ধিত মানকে বজায় রাখতে গিয়ে তথাকথিত আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে মানুষকে যে পরিমাণ পরিশ্রম ও মনোযোগ ব্যয় করতে হয়, মনে হয় মানুষের সবটুকু শক্তি তাতেই আজ নিঃশেষ হয়ে যায়। সকলেই—শিশুও যেন—ঐ রকম আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যগ্র ও ব্যস্ত। সে আত্মপ্রতিষ্ঠা শক্তির দ্বারা, প্রেমের দ্বারা নয়। সকলেই শক্তিমান হ'তে চায়। শিশুর শিশুকাল থেকেই চারিত্রিক কোন সৌন্দর্য বা আদর্শ আয়ত্ত করানর দিকে অভিভাবকের দৃষ্টিই বা কতটুকু আছে ? ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যে একটা বিকৃত রূপ বর্ত্তমান জগৎকে পেয়ে বসেছে, বোধকরি শিশুর আট দশ মাস বয়স থেকেই আজকের শিশুর জীবনে এই বিকৃত আত্ম-স্বাতন্ত্র্য-বোধ স্ফুরিত হতে থাকে। সেই সঙ্গে মিলিত হয় আমাদের অভি-ভাবকদের সামঞ্জস্যহীন ছন্দহীন জীবন যাপনের পথরেখা। আমরা এতটা বেশী বহির্মুখীন হয়ে গেছি বলেই আমাদের সন্তানেরা আরও এক ডিগ্রী করে বেশী হচ্ছে। শিশুর জীবনে আমরা কি তুলে ধরি একটা শান্ত স্বস্থ আত্মস্থ

জীবনধারা যা সত্য ভাষণ, সত্য আচরণ দ্বারা স্নিগ্ধ, যা অপরকে বিস্মৃত হয়ে কেবল আমিত্বের ব্যক্তি সত্তার সুখসুবিধাদ্বারা ক্লিন্ন নয় ?

তাই আত্মশুদ্ধির আজ প্রয়োজন অভিভাবকের, আত্মশুদ্ধির আজ প্রয়োজন শিশুর, আত্মশুদ্ধির আজ প্রয়োজন ব্যক্তিগত ভাবে, আত্মশুদ্ধির আজ প্রয়োজন সমষ্টিগত ভাবে।

বাইরের আবেষ্টনটা ভাল নয়—সে কথা খুব সত্য। এ আবেষ্টনের মধ্যে সত্য ভাষণ সত্য আচরণ অসম্ভব হয়ে ওঠে। সবই সত্য। তবু আমরা আদর্শ বিসর্জন দিয়ে, প্রচেষ্টা ধুয়ে মুছে ফেলে বাঁচব কেমন করে ? আমরা প্রত্যেকেই একটা চেষ্টা আরম্ভ করে চালিয়ে যেতে প্রয়াস পাই না কেন যে, আমি সত্য আচরণ করব, সত্য ভাষণ করব, নিজের বোঝাটাকেই সব চেয়ে বড় করে অন্যের উপর চাপাতে যাব না, অন্যের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনব, অপরকে অশ্রদ্ধা করে কোন বাক্য বলব না বা কোন আচরণ করব না—এমনি কতকগুলি ছোট অথচ জীবনের সৌন্দর্যের পক্ষে গভীরভাবে প্রয়োজনীয় কথা প্রত্যেকেই আমরা আরম্ভ করে দেই না কেন ? আমি যদি মেনে চলি, আমার পাঁচ সাত বছরের সন্তানকে হয়তো আজ আর মানাতে পারব না, কিন্তু আমার এক দুই তিন বছরের সন্তানকে তো মানাতে পারব, তাকেই শেখাতে চেষ্টা করি না কেন ? আমাদের কিশোররা যদি মনে করে যে আমরা একটা দল করে এই সমস্ত কতকগুলি কথা মেনে চলব, আমাদের যুবকেরা যদি এমনি সংকল্প নেয়—তাহালে এমনি করে কি একটা শুদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি করা যায় না ? কিছুই যদি আরম্ভ না করি, কোথায় আমরা তলিয়ে যাব ? দেশে এত ক্লাব আছে, সঙ্ঘ সমিতি এত গড়ে উঠেছে, কেউ এই মূল থেকে আরম্ভ করে না কেন ? আত্মানুসন্ধানের পথে, আত্মবিশ্লেষণের পথে, আত্মশুদ্ধির সদর রাস্তায় কেউ যায় না কেন ? কেউ কি নেই যে ঐ মূল ভিত্তি থেকে জীবন গঠন সুরু করবার সংকল্প নেবে, আরম্ভ করে দেবে ?

উপনিষদ বলেছেন যা কিছুকে আমরা আত্মা থেকে পৃথক বলে জানব,—আত্মা থেকে ভিন্ন করে জানব, নিজের বাইরের মনে করব—তা-ই কিছুই আমাদেরকে পরাজিত করবে। আজকে যে আমরা সত্য-শিব-সুন্দরের দেবতার কাছে এমন করে পরাজিত হয়ে গেছি তার কারণ 'সর্ব্ব-ভূতে' আমাদের আত্মোপলব্ধি নেই, অপরকে আমরা নিজ বলে মনে করি না—নিজেদেরকে আমরা একান্তভাবে পরিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত করে তুলেছি। অথচ

যুগটা কিন্তু ছিল গণতন্ত্রের—সর্ব্বভূতে আত্ম-দর্শনের এই-ই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট কাল। যেজন্য ভাগবত বলেন 'কৃতাদিষু প্রজা রাজন্ কলাবিচ্ছন্তি সম্ভবম্। কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণ-পরায়ণাঃ', সেই কারণেই এ যুগে সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনের পথ সুগম। কিন্তু কেমন সব গোলমেলে হয়ে গেলো—আমরা গণতন্ত্রের যুগে বাস করেও কেমন অদ্ভুত বিশ্রীভাবে আত্মকৈন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছি বা গেছি, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। আত্মাতে সর্ব্বভূতোপলব্ধি ও সর্ব্বভূতে আত্মোপলব্ধির সাধনা না নিলে এই আত্মকৈন্দ্রিকতা কেমন করে দূর হবে? কেবল আমার বুদ্ধির কসরৎ বা তার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়ে নয়, মানুষকে আমরা ভালবাসব, সত্যিকারের ভালবাসব, মানুষকে ঠকিয়ে নিজের বড় হওয়া বা নিজের অস্তিত্ব চাইব না, নিজেকেও অন্যের দ্বারা ঠকতে দেবো না—আর সেই ভালবাসায় প্রতিষ্ঠিত হব—এমন করে কোন কিশোর ভাবে না কেন? একদা বহু কিশোরের চোখে যে স্বপ্ন—নূতন জগতের স্বপ্ন, সত্য প্রেম পবিত্রতার যে আনন্দোজ্জ্বল চিত্র ভেসে উঠত, আজকের কিশোরের চিত্তে সে স্বপ্ন ভেসে ওঠে না কেন? আজকের কিশোর কি ভাবে? কিশোর স্বভাবধর্ম অনুসারে কল্পনা তো সে করবেই—কি দিয়ে আজকের কিশোরের কল্পনা ভরে? আর সেজন্য দায়ী কি সে? একটা বিরাট বিশ্ব আজ সকলের সামনে হুড়মুড় করে এসে পড়ল, কিন্তু তাকে কেউ হজম করে আত্মভূত করে নিতে পারল না—তাই কেবল বহির্মুখীনতা সমাজের সর্ব্বস্তরকে চূড়ান্তভাবে গ্রাস করে বসে আছে।

আরও একটা অবস্থা আছে যে সময় সমস্যাটা আমরা বুঝি কিন্তু তাকে পেরিয়ে সমাধানের স্তরে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না। এ অবস্থাটা অসহনীয়। ব্যক্তিগত ও জাতীয় ক্ষেত্রে আজ আমরা খানিকটা এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি—সমস্যা কি তা জানি, সমাধানও হয়তো বা কিছু জানি—কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে পারি না। চলার পথটা কি হবে জানি না বোধহয় সেইটা। তখন মনে পড়ে 'a push from within, a pull from without'—ভিতরে বাইরে একটা প্রচণ্ড ঠেলার দরকার হয়ে পড়েছে। অথচ বোঝা যাচ্ছে না এ ঠেলাটা কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্য দিয়ে আসবে না গণতন্ত্রের যুগে সমষ্টির মধ্য দিয়ে আসবে। যেখান দিয়েই আসুক আসবে সেটা পুরুষোত্তম-স্তর থেকে—জীবন-চেতনার যে স্তরের খোঁজ দিয়ে গেলেন

পুরুষোত্তম সেই দীর্ঘ কয়েক হাজার বৎসর আগে, আজকের শ্রীনিত্যগোপালের মধ্যে যে সুরকে বোঝবার অনুকূল দর্শন পাবো। প্রচণ্ড একটা ঠেলা যেমন চাই, তেমনি চলার পথটা যে আজ পুরুষোত্তমের নির্গুণ সুরের, সেটাও বোঝা চাই। এটা সাত্ত্বিক, রাজস, তামস সুর নয়—এটা নির্গুণ সুর—এটা বিশ্ববোধের মধ্যে শরণাগতির সুর। আজকের আবেষ্টনে আমাদেব এটা বুঝতে হবে।

মনে হয় প্রতিটি ক্লাব, সমিতি, সভার এইটে সাধা হোক যে বর্ত্তমানের জটিলতম জীবন-আবেষ্টনের সঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জীবনদর্শনের যোগসূত্র বের করা আর তাঁরই আলোকে নিজেদের জীবন পরিচালনার পথের খোঁজ করা। বন্দেমাতরম্।

শ্রীরেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

আষাঢ়, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ　　　১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

দ্রৌপদী ও গীতা

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

কেশাকর্ষণনির্ধূতগৌরবা কে ঐ রমণী কুরু-রাজসভায় দাঁড়াইয়া? কুরু-পাণ্ডবকুলের বউ, ধৃতরাষ্ট্রের ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ, দুর্য্যোধন-দুঃশাসনের ভ্রাতৃজায়া, যুধিষ্ঠিরাদির সহধর্ম্মিণী, রাজা দুর্য্যোধনেব নারী-প্রজা, ভীষ্ম-পিতামহের আদরের পুত্তলী, দ্রোণ-কর্ণাদির রক্ষণ-যোগ্যা দ্রৌপদী নয় কি? সে আজ অন্তঃপুব ছাড়িয়া রাজসভায় অপরাধিনীর মত দাঁড়াইয়া কেন? বিশ্বের বুকে এমন কি ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহার ফলে এই অঘটন ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে? তাঁহার দাঁড়াইবার কি ঐ যোগ্যস্থান? সে তো এমনভাবে এমন স্থানে এমন মুক্তির স্বাদ পাইতে অভ্যস্ত ছিল না। কোন্ নটবর তাঁহার এই লাঞ্ছনাকে, দুর্যোগময় ইতিহাসকে তাঁহার নটন-কৌশলের মাঝে মুক্তানুশাসনরূপে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ খুঁজিতেছেন, কে জানে? দ্রৌপদীর উপর দিয়া আজ একটা চরম লাঞ্ছনার ঝড় বহিয়া যাইতেছে। দ্রৌপদীও বুঝি জানে না কে, কেন, কোথায় তাহাকে এই লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া টানিতেছেন? দ্রৌপদী তো রাজার ঝিয়ারী, রাজার পিয়ারী, কুলধর্ম্ম রক্ষার মূল আধার ক্ষত্রিয় রমণী, ভীষ্মের নাতনী। তাঁহার কি বিশ্বের বুকে নিজের স্থানে দাঁড়াইবার স্থানটুকুও নাই? কে তাহাকে স্থানচ্যুত করিল? কেন করিল? ভারতবর্ষ, ইহার জবাব কি তুমি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছে দিতে পারিয়াছ? না পারিবে? দ্রৌপদী তো তোমাদের স্বধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সবই মানিয়া চলিয়াছে। তবুও তো তাহার সবই গেল। তাহার রাজা তাহাকে রক্ষা করে নাই, তাহার প্রজা ভ্রাতাগণ তাহার অপমানে গর্জ্জন করে নাই,

তাহার কুলধার্ম্মিকদল তাহার কেশাকর্ষণে লেশমাত্র বিচলিত হয় নাই, তাহার সগোত্রা রমণীকুল তাহার বস্ত্রহরণে নিজেদেরই বসন হৃত হইল ভাবিতে পারে নাই, বেদমন্ত্রোচ্চারণে পাণিগ্রহণকারী স্বামীরা তো মৌন বদনেই বসিয়া ছিল ; সেদিন তো অর্জ্জুনের গাণ্ডীব হাত হইতে খসিয়া পড়ে নাই, ক্ষত্রিয় ভীম ক্ষিপ্ত হন নাই, ব্রহ্মচারী পিতামহ ভীষ্ম পৌত্রীর নয়ন জলে নিজের বক্ষ সিক্ত করিয়াছিলেন কিনা কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই, রাজপরিবারের দীনা একটী রমণী অপমানিতা হইল ভাবিয়া পরিবারের কেহ তো সেদিন অন্নজল পরিত্যাগ করে নাই, কোনও ব্রাহ্মণ তো সেদিন তপস্যার আগুনে দুর্য্যোধনকে দগ্ধ করে নাই, কোনও বৈশ্য তো দুর্যোধনের রাজ্যে কৃষি-গো-বাণিজ্য বন্ধ করে নাই, কোনও শূদ্র তো পরিচর্য্যা-ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া রাজার অপ্রীতিভাজন হয় নাই, কোনও ব্রহ্মচারী সেদিন প্রকৃতির অপমানে সকল ব্রহ্মচর্য্যের পথ রুদ্ধ হইল বলিয়া কাঁদে নাই, কোনও গৃহী সেদিন গৃহিণীর অপমানে গৃহ পুড়িয়া গেল, গৃহশূন্য হইলাম ভাবিয়া শিহরিত হয় নাই, ঘরের বাহির হইয়া পথে পথে পাগলের মত ছুটিয়া বেড়ায় নাই, কোনও বানপ্রস্থী সেদিন সংসার পরিত্যাগের আয়োজনে বিরত হয় নাই, কোনও সন্ন্যাসী তো সেদিন ভাবে নাই যে নারীর তপ্ত নিঃশ্বাস তাহার সন্ন্যাসের পথ চির অর্গলবদ্ধ করিবে, পিতৃপুরুষগণ তো সেদিন লুপ্ত-পিণ্ডোদক হইলাম বলিয়া চোখের জলে ধরণীর মাটী সিক্ত করে নাই, যজ্ঞসংযোগিণী নারীর অপমানে সকল যজ্ঞ পণ্ড হইতে দেখিয়া দেবতাগণ সেদিন কুরুরাজ্যে কোন অনর্থের সৃষ্টি করে নাই, ঋষিগণ তো সেদিনও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিবার কোন অসুবিধা বোধ করে নাই। সবই বুঝি ঠিকঠাক চলিয়াছিল—সূর্য্যও উঠিয়াছিল, পৃথিবীও ছুটিয়াছিল, হাসি-খেলা-নাচ-গান মুখরিত দুর্য্যোধনের রাজ্য বোধহয় যেমন তেমনটিই ছিল, শুধু দ্রৌপদী একাই নিজের দৈন্য নিজের মধ্যে বহিয়া, নিজের উচ্ছ্বসিত বুক নিজেই চাপিয়া রাখিয়া, নিজের চোখের জল নিজের হাতেই মুছিয়া একা, একেবারেই একা এত বড় একটা লোকবহুল, বেদ-পরিচালিত, রাজশাসিত বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া ভীতিবিহ্বল, অশ্রুভারাক্রান্ত, কম্পিত, পুলকিত। তাহার দুঃখ কাহারও নয় ; সে একাই বাঁচিবে নয় একাই মরিবে। বিশ্বে তাহার কেউ নাই ; মানুষ নাই, পুরুষ নাই, নারী নাই ; তাহার ধর্ম্ম নাই, মোক্ষ নাই, তাহার ইহকাল নাই, পরকাল নাই, তাহার কিছু নাই, তাহার নিজের শক্তিও তাহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে ; তাহার সহযাত্রী কেউ নাই, সব তাহার সহ পরিত্যাগ করিয়াছে।

তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এই সবও সর্ব্বকে হারাইয়াছে, শব সাজিয়াছে, সর্ব্ব ধর্ম্ম মরিয়াছে।

কিন্তু সতী দ্রৌপদী, তোমার ভয় নাই; ঐ দেখিতেছ না তোমার একা-কেবলা হওয়ার সুযোগে কৈবল্যপতি নামিয়া আসিতেছেন, তোমার একা হওয়ার বুক চিরিয়া পরম এক তোমাকে চুম্বন করিতেছেন। তোমার অহম্‌কে অহম্ রাখিয়াই যে তিনি পুরুষোত্তম-অহম্-রূপে তোমার মুখখানি যত্নে মুছাইতেছেন, তোমার মুখের পানে চাহিতেছেন। তোমার হাসিতে যিনি চিরদিন হাসিয়াছিলেন, আজও তিনিই তোমার চোখের জলে জল মিলাইতেছেন, তুমি আজ একা হইয়াই একের খোঁজ পাইয়াছ, কেবল হইয়াই কেবলাত্মার দেখা পাইয়াছ। এপাশে-ওপাশে, উপরে-নীচে তোমার শক্তি পর্য্যন্ত আজ তোমার নয়, তোমার মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার পর্য্যন্ত তোমার 'পর'। এই শূন্যস্থানে দেখিতেছ না শূন্য-সাক্ষী তোমার পরম দেবতা সকল আনন্দ লইয়া তোমার সেই এক হওয়াকেই অনন্ত একে পরিণত করিতেছেন, তোমার এক-বসনকে অনন্ত বসনে গড়িয়া তুলিতেছেন? তুমি আজ একা অনন্ত, অনন্ত একা; সকলের বাহির হইয়াই তুমি আজ সকলের অন্তরে। তুমি আজ নিত্য-কৃষ্ণ-কামিনী। তোমার কুল কৃষ্ণ, তোমার ধর্ম্ম কৃষ্ণ, তোমার অর্থ কৃষ্ণ, তোমার কাম কৃষ্ণ, তোমার মোক্ষ কৃষ্ণ, তোমার বেদ কৃষ্ণ, তুমি সাক্ষাৎ কৃষ্ণা। তোমার অভিভাবক 'নাস্তি' দেবতা। কৃষ্ণ-রাজার প্রজা তুমি, কৃষ্ণ-কুলের বউ তুমি, কৃষ্ণ-যজ্ঞের যজমান তুমি, হোতা তুমি। কৃষ্ণ-সন্ন্যাসেই তুমি সন্ন্যাসিনী, কৃষ্ণ-গৃহের তুমি গৃহিণী, তুমিই কৃষ্ণ-ব্রহ্মচারিণী, তুমি আজ কৃষ্ণ-সোহাগিণী, কৃষ্ণ-মনোমোহিণী। যাহারা তোমার এই দুর্দ্দিনে নাই, তাহারা কোনও দিনই ছিল না। যিনি তখন ছিলেন, চিরকাল তিনিই থাকিবেন ও আছেন। তুমি জীর্ণ রাজার জীর্ণ রাজ্যের, জীর্ণ শাস্ত্রীদের জীর্ণ শাস্ত্রের, জীর্ণ কুলধর্ম্মের, জীর্ণ বেদধর্ম্মের, জীর্ণ ইহলোক-পরলোকের বাইরে। তুমি নবীনকে পাইবে, তুমি বাস্তবকে পাইবে, তোমার সত্য-বাস্তব নিতুই-নূতন ভর্ত্তাকে পাইবে। অগতি তোমার গতি হইবে, ভর্ত্তা মিলিবে, তোমার প্রভু যোগ্যক্ষম বহন করিবেন। তোমার লাঞ্ছনা সাক্ষাৎ দেখিবার জন্য তিনি যে নিত্য সাক্ষী; যাহারা সাক্ষাতে আছে, তাহারা মিথ্যা সাক্ষী; সাক্ষাতে থাকিলেই তো সব সাক্ষাৎ নয়। দ্রৌপদী, তোমার নিবাস স্থির হইয়াছে, শরণ নামিয়া আসিয়াছে। তিনিই যে তোমার নিত্য সুহৃৎ।

তাঁহাতেই তোমার প্রভব, তাঁহাতেই তোমার ডুবিয়া যাওয়া। তিনিই যে তোমার নিত্যস্থান, সেই অব্যয় জীবনেরই তো তুমি সকল সম্ভাবনাময়, সকল সুষমাভরা একটী পুষ্পমাত্র পুরুষোত্তম-শ্রীচরণে নিবেদিতা।

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥

দ্রৌপদী গ্লানিগ্রস্ত সমাজের জীবন্ত প্রতীক। ধর্ম্ম-গ্লানি কোন্ চরম সীমায়, কত গভীর ও ব্যাপকভাবে পরিণত হইতে পারে, দ্রৌপদীর জীবন-চিত্রে তাহাই সম্যক ফুটিয়াছে। এত বড় একটা বিরাট দেশের বুকে এমন একটা জঘন্য অত্যাচার যে রাষ্ট্র, যে কুল, যে বেদ, যে বর্ণাশ্রম, যে দেবশক্তি অবাধে হজম করিয়াছে, কেউ টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করে নাই, সে সমাজব্যবস্থা, সে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, কুল-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম যে নিজের মধ্যেই নিজের ভবিষ্য মরণের বীজ বপন করিয়াছিল, তাহা কি খুবই দুর্ব্বোধ্য? দুর্ভাগ্য এদেশের যে, এমন একটা কুৎসিৎ ঘটনা সম্ভব হইয়াছিল। দুঃশাসন উরু দেখাইল, আর কর্ণ তাহা হাসিয়া বেশ-আস্বাদন করিয়া লইল! কি নিকৃষ্টতা!

গীতা এমনই একটী বাস্তবের সামনে দাঁড়াইয়া সোজাসুজিভাবে ধ্বংসোন্মুখ একটা জাতির সকল প্রশ্নের মীমাংসা দান করিয়াছেন। ইহাই গীতার প্রকরণ, প্রকৃতি (context) এবং এখানেই গীতার আত্মাশক্তি। প্রকরণ ভুলিয়া গীতার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গীতা নিঃশক্তি। প্রকরণ (context) বাদ দিলে একজন লুণ্ঠনকারীও গীতার শ্লোকগুলিকে তাহার লুটের সহায়করূপে ব্যবহার করিতে পারে; কিম্বা কোনও সাধু লুটের স্থান এই সংসার হইতে পালাইয়া বাঁচিবার যোগরূপেই গ্রহণ করিতে পারে। 'সংসার যখন মিথ্যা, আত্মাই যখন একমাত্র সত্য, গীতার সাহায্যে তখন লুট করায় আর পাপ কোথায়? বাঁচাও মিথ্যা, মরণও যখন মিথ্যা, তখন বাঁচ কিম্বা মর, কিছুই আসে যায় না। সংসার যখন মিথ্যা, তখন পরের জুতা মাথায় বহাও যাহা, নিজের রাজত্ব করাও তাহা।'

প্রত্যেক গীতা-আলোচককে সর্ব্বপ্রথমে এই গীতা-প্রকৃতির ধারণা করিতে হইবে। কেন, কোন্ আবেষ্টনে কাহাদের মধ্যে গীতার আবির্ভাব হইয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহা দেখিয়া লইতে হইবে। দুই পক্ষের মাঝে দাঁড়াইয়া ভগবান গীতা বলিয়াছিলেন, অর্জ্জুন শুনিয়াছিলেন। আমাদিগকেও

পক্ষপাতবিনির্মুক্ত হইয়াই গীতা পড়িতে হইবে, শুনিতে হইবে, স্মরণ করিতে হইবে।

গীতা সর্ব্বপ্রথমে যুদ্ধশাস্ত্র। যুদ্ধ ছাড়া জীবন চলে না; ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সবই জীবনের আস্বাদন। গীতা তাইতো যুদ্ধশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, কামশাস্ত্র ও মোক্ষশাস্ত্র। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষকে মূর্ত্ত করিতে হইলে চাই লোকসংগ্রহ অর্থাৎ পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্বের সংগঠন। গীতা তাই পারিবারিক শাস্ত্র, সামাজিক শাস্ত্র, রাষ্ট্রীয় শাস্ত্র, বিশ্বজনীন শাস্ত্র। পরিবার-সমাজকে সুপরিচালিত করিবার জন্য চাই যোগ বা কৌশল-শাস্ত্র; গীতা পরিবার-বেদ, সমাজ-বেদান্ত, রাষ্ট্র-পুরাণ, জাতি-তন্ত্র, বিশ্ব-ব্যাকরণ, স্ব স্ব জীবন-শাস্ত্র। গীতা সাহিত্য কাব্য অলঙ্কার। গীতা চিকিৎসাগ্রন্থ, হৃদয়রোগের মহৌষধ। গীতা অদ্বৈতবাদ-গ্রন্থ, গীতা দ্বৈত-বাদগ্রন্থ, গীতা দ্বৈতাদ্বৈতবাদগ্রন্থ। গীতার মীমাংসা পূর্ব্বমীমাংসা, গীতার মীমাংসা উত্তরমীমাংসা। গীতার দর্শন বেদান্ত-ন্যায়-বৈশেষিক-সাংখ্য-পাতঞ্জল। গীতা আস্তিকের অস্তিদেবতার, নাস্তিকের নাস্তিদেবতার প্রতিষ্ঠা-শাস্ত্র। গীতা নিরীশ্বর শাস্ত্র; গীতা পূর্ণ সেশ্বর শাস্ত্র; গীতা চার্ব্বাক শাস্ত্র। গীতা প্রত্যক্ষবাদী, গীতা অনুমানবাদী, উপমানবাদী, বেদবাদী, অতিবাদী। গীতা অভ্যুদয়শাস্ত্র, গীতা নিঃশ্রেয়স শাস্ত্র। গীতা জ্ঞান-শাস্ত্র, কর্ম্মশাস্ত্র, গীতা ভক্তিশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র। গীতা বুদ্ধিশাস্ত্র, শ্রদ্ধাশাস্ত্র। গীতা 'সর্ব্বতোসংপ্লুতোদক' শাস্ত্র; গীতা উদপান শাস্ত্র। গীতা সাগর, গীতা কূপ। গীতা বিস্তীর্ণ, গীতা গম্ভীর। গীতা সকল হাঁ-এর শাস্ত্র; সকল না-এর শাস্ত্র। গীতা চিৎ ও অচিৎরূপিনী মহাশক্তি।*

---

* ১৩৪১শে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অবধূত-ভাষ্যের ভাষ্যপ্রদীপ—১ম খণ্ড। পৃঃ ১১১—১১৬

বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা

(১)

॥ শিক্ষাবিদ্ ॥

১৯৩৭ সালে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাযুক্ত প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন প্রবর্ত্তিত হয় ও কংগ্রেস কর্ত্তৃক বিভিন্ন প্রদেশে শাসন-দায়িত্ব গৃহীত হয়। তৎকালে গান্ধীজী কংগ্রেসের নৈতিক পরিচালক ছিলেন। তাঁহারই প্রেরণায় কংগ্রেস কয়েকটি গঠনমূলক উদ্দেশ্য লইয়া উক্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতাযুক্ত শাসন-দায়িত্ব গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মাদক দ্রব্য বর্জ্জন ও প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সাধন অন্যতম। মাদ্রাজ প্রদেশে আংশিক ভাবে এই দুইটি উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করিতে গিয়া এক প্রচণ্ড আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইল। দেখা গেল মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের উপর ট্যাক্স প্রাদেশিক সরকারের একটি বড় আয়। মাদক দ্রব্য বর্জ্জন করিলে এই আয়ের পথ রুদ্ধ হয়। অধিকন্তু মাদক দ্রব্য বর্জ্জনকে বাস্তব করিয়া তুলিতে হইলে প্রচার ও নিরোধ ব্যবস্থায় প্রচুর খরচ করিতে হয়। প্রাদেশিক সরকারের আয়ের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। তদুপরি দেশরক্ষা খাতে যে মোটা ব্যয় হয় তাহা সংকোচনের হাত প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে ছিলনা। নূতন ট্যাক্স বসাইবার মত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থাও ছিলনা, রাজনৈতিক অসুবিধাও ছিল। এমতাবস্থায় প্রাদেশিক শাসনদায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁরা গান্ধীজীর শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন যে, যেহেতু মাদক দ্রব্য হইতে সরকারের যে আয় হয়, তাহা দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়, তজ্জন্য উক্ত উভয়বিধ কর্ম্মসূচী একই সঙ্গে অনুসৃত না হইয়া আপাততঃ মাদক দ্রব্য বর্জ্জন কর্ম্মসূচী স্থগিত রাখা হউক এবং প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ঘটানো হউক। বলা বাহুল্য গান্ধীজীর উক্ত প্রস্তাব মনঃপুত হইল না। তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, যদি অবস্থা এই রূপই হয় যে, দেশের অভিভাবকবর্গ মদ্যপ হইলে তবেই শিশুগণ প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে পারেন, তবে বরঞ্চ প্রাথমিক শিক্ষাই বন্ধ করা হউক—

কারণ মদ্যপ অভিভাবকের পরিবর্তন না আনিয়া শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়া দেশের অধিক কিছু কল্যাণ সাধিত হইবার আশা নাই। কিন্তু গান্ধীজী দেশের এইরূপ সংকটজনক অবস্থা মানিয়া নিলেন না এবং এরই প্রতি-বিধান হিসাবে তিনি বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব আনয়ন করেন। তখন গান্ধীজী দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা "হরিজন" পত্রিকায় প্রকাশ করিতেন। তিনি উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ মারফৎ তাঁহার নূতন শিক্ষা সংক্রান্ত মতবাদ প্রকাশ করিলে এদেশীয় শিক্ষাবিদ্‌গণের মধ্যে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁর ঐ শিক্ষা-চিন্তার মধ্যে এমন কতকগুলি দিক ছিল যাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবিদগণের শিক্ষা-চিন্তার সহিত সঙ্গতিযুক্ত। আবার এমন কতকগুলি দিক ছিল যাহা উচ্চ শিক্ষিত মহল খুবই অদ্ভুত ও নূতন বলিয়া মনে করিলেন।

প্রসঙ্গতঃ গান্ধীজীর শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার যোগ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষা চিকিৎসাবিদ্যার মতই একটি বিশেষ বিষয়—যে কোনও সাধারণ মতবাদের অধিকারী ব্যক্তির পক্ষে এই বিশেষ ব্যাপারে মাথা গলানো সঙ্গত নয়। তাই ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, গান্ধীজী ব্যারিষ্টার হইতে পারেন—দেশনেতা হইতে পারেন কিন্তু শিক্ষাবিদ্ নহেন—সুতরাং একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হইতে তিনি হঠাৎ শিক্ষা লইয়া পরীক্ষামূলক প্রস্তাব করিলে তাহার যুক্তিযুক্ততা সন্দেহাতীত নহে। কিন্তু শিক্ষাকে জীবন হইতে পৃথক করিয়া দেখিবার প্রয়োজন নাই—একজন ব্যক্তির যদি একটী সুসম্পূর্ণ জীবন-দর্শন থাকে এবং শিক্ষকতা কার্য্যে কিছু অভিজ্ঞতা থাকে তবে তিনি শিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব দিবার অধিকার পাইতে পারেন—অবশ্য বিশেষজ্ঞগণ তাহা যাচাই করিয়া মতামত প্রকাশ করিলে তবেই উহা গৃহীত অথবা বর্জ্জিত হইবে। দার্শনিক রুশো একজন শিক্ষাবিদ্ ছিলেন না, তবু তাঁহার শিক্ষা-চিন্তা পৃথিবীর শিক্ষা-জগতে এক বিরাট যুগান্তর ঘটাইয়াছে। গান্ধীজীর শিশু-শিক্ষার অভিজ্ঞতা নেহাত কম নহে। যখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়গণের মনুষ্যত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ব্যাপ্ত ছিলেন তখন মহামতি টলষ্টয়ের নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। উহার নাম ছিল টলষ্টয় ফার্ম। ঐ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল সকল কাজ সকলে মিলিয়া সম্পাদন করা। ঐ ফার্মে কৃষিকাজ, রন্ধন, বস্ত্রধৌতি, মলমূত্র পরিষ্কার প্রভৃতি জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্মে সকলেই অংশ

গ্রহণ করিতেন। "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" নামক পত্রিকা ঐ ফার্ম হইতেই প্রকাশিত হইত। গান্ধীজী পত্রিকা মুদ্রণ প্রকাশন ডাকে দেওয়া প্রভৃতি কাজ নিজ হাতে করিতেন এবং ফার্মের অন্যান্য কাজে অংশ নিতেন। শিশুরা গান্ধীজীকে পছন্দ করিত। ভারতীয়গণ ইউরোপীয় পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহ হইতে তাঁহাদের শিশুদিগকে সরাইয়া লইয়াছিলেন—কারণ সেখানে তাহারা মনুষ্যত্বের সম্মান পাইত না। গান্ধীজী শিশুদের শিক্ষার ভার লইয়া ছিলেন। শিশুরা স্বভাতঃই তাঁহার সঙ্গ পছন্দ করিত তাই স্বাভাবিক ভাবে কাজটি তাঁহার উপর বর্ত্তাইয়াছিল। তিনি তাঁহার কাজ-কর্মে শিশুদের সাহায্য লইতেন। শিশুরা ঐরূপ সাহায্য করিয়া আনন্দ পাইত। কাজগুলি সম্বন্ধে শিশুদিগের সহিত তিনি আলোচনা করিতেন—ছোট বলিয়া তাহাদিগকে উপেক্ষা করিতেন না। তিনি দেখিতেন শিশুরা কাজে খুব আনন্দ পায় এবং কাজগুলির প্রসঙ্গে তাহারা অনেক কিছু শিখিবার সুযোগ পায়। ঐ শিক্ষা শিশুদের পক্ষে মনোজ্ঞ তো হয়ই—এমনকি উহা দীর্ঘস্থায়ী হয়। এইভাবে কর্মকে শিক্ষার মাধ্যম করার কৌশল তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জীবনে গান্ধীজী সবরমতীতে ও সেবাগ্রামে আশ্রম গঠন করেন। ইহার গঠন টলষ্টয় ফার্মের অনুরূপ ও এখানেও তিনি শিশুদের সহিত মেলামেশা করিতেন। পূর্ব্বোক্ত ধরণের কাজের মাধ্যমে শিশু-শিক্ষা দিবার সুযোগ এই সব আশ্রমেও তিনি পাইয়া-ছিলেন। এইভাবে কর্মকেন্দ্রী শিশুশিক্ষায় তাঁহার প্রয়োগসিদ্ধ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। তাই পূর্ব্বে আলোচিত প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সংকট সমাধানে তিনি তাঁহার লব্ধ অভিজ্ঞতার কথাই ঘোষণা করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবের বিষয়বস্তু ছিল :—(১) শিশুকে কোনও উৎপাদনাত্মক কর্ম—বিশেষতঃ শিল্পকর্ম মাধ্যমে ভালভাবেই শিক্ষা দেওয়া যায়, (২) শিশুর কাজ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে বিদ্যালয়কে স্বাবলম্বী করা যায়, (৩) ইহার দ্বারা শিশুর বিকাশ অনেক বেশী সুষম ও পূর্ণতর হয়, (৪) সরকার যদি এইরূপ শিল্প ও উৎপাদনকেন্দ্রী বিদ্যালয় গড়িয়া তোলা—উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত—উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয় ও কাঁচামাল সরবরাহ প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করিতে পারেন, তবে মাদক দ্রব্য বিক্রয় লব্ধ অর্থ অথবা ট্যাক্সের উপর নির্ভর না করিয়াও তাঁহারা ভারতের সর্ব্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইবেন।

তখন ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। ঐরূপ দেশের অপেক্ষাতে কম পরিচিত একটি পত্রিকায় একজন শিক্ষা সংক্রান্ত ডিগ্রীর অনধিকারী ব্যক্তির লিখিত কয়েকটি শিক্ষামূলক প্রবন্ধ উপেক্ষিত হইবারই কথা। কিন্তু গান্ধীজী ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের জনগণ-মানসে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন—তাঁহার মতামত, সে মতামত যে বিষয়েরই হউক, উপেক্ষিত হইতে পারে না। বহু শিক্ষাবিদ্ তাঁহার প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলেন। অনেকেই ইহা সমর্থন করিলেন না। শিশুর উপার্জ্জন হইতে বিদ্যালয় চলিবে এই চিন্তাকে অনেকে "শিশু শ্রমের শোষণ" বলিয়াই অভিহিত করিলেন। প্রচলিত শিক্ষা হাতের কাজকে ছোট ভাবিতেই শেখায়—তাই সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাকে উদ্ভট কল্পনা মনে করিলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষাবিদ্ ইহার মধ্যে চিন্তার খোরাক পাইলেন। তখন শিশু-শিক্ষায় কর্মের স্থান বা কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা নূতন কিছু নয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে ফ্রবেল মন্টেসরী ডিউই প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্গণ ইহা প্রচলিত করিয়াছেন ও উহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। অবশ্য সে দেশে অর্থের সাশ্রয় জন্য কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় নাই—পরন্তু তাহাদের কর্ম-কেন্দ্রী শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা অপেক্ষা বেশী ব্যয়-সাধ্য। আর সেইজন্যই ভারতে এইরূপ শিক্ষার প্রচলন ঘটে নাই। কিন্তু তাহারা উৎপাদনের প্রতি গুরুত্ব দেন নাই বলিয়াই কর্মকেন্দ্রী শিক্ষা উৎপাদন-ধর্মী হয় নাই। যদি ভারতবর্ষের বিশেষ সমস্যা বিবেচনায় কর্মকেন্দ্রী শিশু-শিক্ষাকে উৎপাদনধর্মী করা হয় তাহাতে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার মাহাত্ম্য নষ্ট হইবার কোনও কারণ ইহারা দেখিলেন না। বরং ইহার শিক্ষাগত মূল্য অধিক হইবে বলিয়াই তাঁহারা মত প্রকাশ করিলেন। এই সব অনুকূল মত প্রদানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ডাক্তার জাকীর হোসেন প্রভৃতি শিক্ষাজগতে প্রথিতযশ ব্যক্তিগণ ছিলেন। সুতরাং গান্ধীজীর মতের শক্তিশালী সমর্থক জুটিল।

গান্ধীজী কাজের লোক। প্রবন্ধ লিখিয়া কর্ত্তব্য শেষ করার মত লোক তিনি ছিলেন না। তিনি ঐ সমস্ত সমর্থককে আহ্বান করিলেন ও তাহাদিগকে বলিলেন যে, যেহেতু তাঁহারা তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছেন সুতরাং উহাকে রূপ প্রদানের ব্যাপারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহাদের সম্মতি পাওয়া গেল ও ওয়ার্ধায় ঐ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি সম্মেলন আহূত হইল। গুজরাট বিদ্যাপীঠ সম্মেলনটির উদ্যোক্তা হইলেন। এই সম্মেলনে ডাক্তার জাকীর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রথম যে শিক্ষা-পরিকল্পনা রচিত হয়

তাহাকেই ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা বলা হয়। প্রথমে উহার নাম দেওয়া হয় বিদ্যামন্দির পরিকল্পনা। কিন্তু মন্দির কথাটি সাম্প্রদায়িকতা দুষ্ট বলিয়া পরে বজ্জিত হয়। জাতির ভিত্তি বা বুনিয়াদ শিক্ষা দ্বারা গঠিত হইবে এই অর্থে ইহার নাম দেওয়া হয় বুনিয়াদী শিক্ষা-পরিকল্পনা। পরে ইহাকে নঈ-তালিম বা নূতন শিক্ষাও বলা হয়। ঐ পরিকল্পনার রূপদান কার্য্যে ব্রতী হইবার জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হয়। তাহার নাম হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘ। শ্রীযুক্ত আর্থার উইলিমস আর্যনায়কম্ ও তাঁহার সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী আশাদেবী আর্য্যনায়কম্ সঙ্ঘের যুগ্ম সচীব ও ডাক্তার জাকীর হোসেন সভাপতি মনোনীত হন। সেবাগ্রামে সঙ্ঘের স্থায়ী অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার জাকীর হোসেন দিল্লির জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং আর্য্যনায়কম্ দম্পতি বিশ্বভারতীর সুপরিচিত শিক্ষাবিদ্। সুতরাং সহজেই তাঁহারা সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। সংঘের সভ্য সভ্যাদের মধ্যে ভারতীয় শিক্ষাজগতের সুপরিচিত অনেক ব্যক্তি থাকায় সংঘটি একটি আস্থা-ভাজন সংস্থার রূপ পায়। ইহারা গান্ধীজীর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিয়া কাজ পরিচালিত করেন।

হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ নিম্নলিখিত আদর্শের ভিত্তিতে বুনিয়াদী শিক্ষার একটি খসড়া পাঠ্যক্রম রচনা করেন :—

(১) এই শিক্ষা ভারতের সর্ব্ব-সাধারণের উপর আবিশ্যিকভাবে প্রবর্ত্তিত হইবে।

(২) ৭ বৎসর হইতে ১৪ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সকল শিশু এই শিক্ষা গ্রহণ করিবে।

(৩) কোনও একটি পূর্ণাঙ্গ উৎপাদনাত্মক শিক্ষাকে শিক্ষার বাহন হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) শিল্পটির সহিত সম্বন্ধিত আকারে বিভিন্ন শিক্ষনীয় বিষয় শিশুকে শিখিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

(৫) শিল্পটির সম্পাদনায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইবে যেন উহার উৎপাদনাত্মক দিকটি বিকশিত হয় এবং শিশুদের কর্মসম্পাদনার মাধ্যমে শৃঙ্খলাবোধ, হিসাববোধ, পরিকল্পনা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ ঘটে।

(৬) ঠিকভাবে শিল্প শিক্ষার পরিচালিত হইলে শিশুরা ঐ কার্য্যে আনন্দ

লাভ করিবে এবং যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগ পাইবে ; তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটিবে। অধিকন্তু শিল্পোৎপাদনের আয় হইতে বিদ্যালয়ের চলতি খরচ (Current Expenditure) শিক্ষকবর্গের বেতন নির্ব্বাহ হইবে। সরকার শিক্ষকের শিক্ষণ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, কাঁচামাল ও সরঞ্জাম সরবরাহ ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের দায়িত্ব লইবেন।

(৭) শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে শিল্পকর্ম ছাড়া সামুদায়িক জীবন (শিশুদের বিদ্যালয়ের যৌথ জীবন), সমাজ ও প্রকৃতি-পরিবেশ-পরিচিতি ও সমাজ সেবা-মূলক কাজ—এইগুলিকেও সদ্ব্যবহার করা হইবে।

(৮) শিক্ষা এমনভাবে পরিচালিত হইবে যেন শিশু শিক্ষার শেষে আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী হয় ও নিজ উৎপাদনের দ্বারা নিজের অভাব পূরণ কবিতে সক্ষম হয়। সে যেন নিজ চেষ্টায় পরবর্ত্তী জীবনে অধিকতর জ্ঞান অর্জ্জন করিবার কৌশল আয়ত্ব করিতে পারে ও দৈনন্দিন জীবন যাপনে আপনার বুদ্ধি বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে পারে।

(৯) যে শিল্পটি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে নির্ব্বাচিত হইবে তাহাকেই প্রধান শিল্প হিসাবে শিশুরা আয়ত্ব করিবে ও কাঁচা মাল হইতে সম্পূর্ণ ব্যবহার যোগ্য বস্তু উৎপাদন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াগুলিই সে ভালভাবে আয়ত্ব করিবে। বস্ত্রোৎপাদন যদি ঐরূপ আক্ষরিক শিল্প হিসাবে নির্ব্বাচিত হয় তবে তূলা উৎপাদন হইতে বস্ত্র বয়ন ও ধৌতি পর্য্যন্ত সকল প্রক্রিয়াই পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসাবে বিবেচিত হইবে। অনুরূপভাবে কাঠের কাজকে আক্ষরিক শিল্প হিসাবে নির্ব্বাচিত করিলে কাষ্ঠ নির্ব্বাচন ও সংরক্ষণ হইতে কাঠের আসবাব প্রস্তুত পর্য্যন্ত সমস্ত প্রক্রিয়াই ঐ শিল্পের অন্তর্গত হইবে। প্রতি বিদ্যালয়ে এক বা একাধিক অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ শিল্প থাকিবে—শিশু যে শিল্পটিকে আক্ষরিক শিল্প হিসাবে গ্রহণ করিবে তাহার প্রক্রিয়াগুলি উক্ত ৭ বৎসর ধরিয়াই আয়ত্ব করিবে ও কুশলতা অর্জ্জন করিবে। কুশলতা অর্জ্জনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইবে। শিল্প নির্ব্বাচনে স্থানীয় সমাজের চাহিদা, কাঁচামাল, শিক্ষা-সম্ভাবনা প্রভৃতি বিবেচনা করা হইবে।

(১০) বিদ্যালয়ে শিশুদের আদর্শ যৌথ জীবন যাপনের পরিবেশ রচনা করিয়া তাহার মাধ্যমে যে শিশুকে ব্যক্তিগত ও সামুদায়িক পরিচ্ছন্নতা বোধ, পরস্পর সহযোগিতা, নেতৃত্ব করা ও নেতৃত্ব মানিয়া চলার শিক্ষা, গণতান্ত্রিক

অধিকার ও দায়িত্ব বোধ, সুরুচি ও শালীনতা বোধ, সহযোগিতা প্রভৃতি গুণাবলী বুদ্ধিগত ও আচরণগত ভাবে শিখিবার সুযোগ দেওয়া হইবে।

(১১) বিদ্যালয়ের সহিত বৃহত্তর সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ থাকিবে। শিক্ষক-বর্গ ও শিশুগণ বৃহত্তর সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য-সচেতন হইবেন ও তাহার কল্যাণ ও উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই তৎপর থাকিবেন। তাঁহারা বৃহত্তর সমাজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন থাকিবেন ও তাহা পরিহার করিবেন। বৃহত্তর সমাজ হইতে উক্ত দোষত্রুটিগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হইবেন, কিন্তু বৃহত্তর সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখিতে যত্নশীল হইবেন। এইভাবে বুনিয়াদী শিক্ষা বৃহত্তর সমাজের শুভকর পরিবর্ত্তনের অগ্রদূত হইবে।

(১২) শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করিতেছে উপযুক্ত শিক্ষকের উপর। দৃঢ়চেতা উদ্যমশীল, কর্ম্মিৎকর্মা এবং সামাজিক গুণসম্পন্ন না হইলে এইরূপ শিক্ষক হওয়া সম্ভব নহে। পরন্তু শিক্ষককে যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, শিক্ষিত, জ্ঞানান্বেষী, শিশু-মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞ সমন্বিত ভাবে পাঠদানে অভ্যস্থ ও মূল শিল্পে যথেষ্ট কুশলতার অধিকারী হইতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন ও তাহাদিগকে শিক্ষাদান কার্য্যের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকার লইবেন এবং স্থানীয় পরিবেশ অনুসারে পাঠ্যক্রম রচনা করিবেন। হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের পাঠ্যক্রম ঐরূপ পাঠ্যক্রম রচনায় সহায়তা করিবে, কিন্তু ইহাকে অপরিবর্ত্তনীয় গণ্য করিবার কারণ নাই।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ ৭ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক শিশুদের উপযোগী বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম রচনা করেন। তৎকালে জাতীয় কংগ্রেস সর্ব্বভারতের রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে অধিকাংশ কর্ত্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান ছিল। এই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বুনিয়াদী শিক্ষা ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের জাতীয় শিক্ষারূপে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্ত্তী জীবনে যিনি সোস্যালিষ্ট পার্টি ও প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব লাভ করেন সেই সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ্ ৺আচার্য নরেন্দ্র দেব ঐ প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় এই শিক্ষা শুধু গান্ধীজীর অনুগতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই পরন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ সম্পন্ন ব্যক্তি উহার গুণগ্রাহী হইয়াছিলেন। পরলোকগত ইউসুফ মেহের আলি ইহার ভুয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তিনি গান্ধীজীর একান্ত অনুগামী

বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। বিদেশেও বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করা হয়।

কিন্তু ইহার বিরুদ্ধবাদীরও অভাব ছিল না। অনেক প্রাচীন শিক্ষাবিদ্ ইহাকে Liberal Education-এর পরিপন্থী বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা মনে করেন শিক্ষাকে মাত্র দৈনন্দিন জীবনের গণ্ডীতে টানিয়া আনিলে উহার মহত্তর দিককে ব্যাহত করা হইবে। তাঁহাদের এই যুক্তির মধ্যে অহেতুক ভীতি রহিয়াছে সন্দেহ নাই, তবু তাঁহারা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিকে আলোক সম্পাত করিয়াছেন সন্দেহ নাই। উৎপাদনের উপর অধিক গুরুত্ব দিলেন ঐরূপ ভ্রান্তি ঘটা বিচিত্র নয়। সুখের বিষয় জাকীর হোসেন কমিটী ঐ বিপদ সম্বন্ধেও অবহিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী Liberal Educationকে খুবই উচ্চে স্থান দেন এবং আর্যনায়কম্ দম্পতি তাঁহাদের প্রথম জীবনে বিশ্বভারতীয় সহিত গভীর ভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ঐ বিষয় অবহিত থাকিবেন আশা করা যায়। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্র নাথের প্রভাব বুনিয়াদী শিক্ষায় পরিয়াছে—ইহার ফল শুভকর সন্দেহ নাই।

অতঃপর বুনিয়াদী শিক্ষার বিকাশ ও রূপায়ন সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

ক্রমশঃ

'নিঠুর গরজী,
তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে ?
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে ?
দেখ্ না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল তাড়াহুড়া নাই।'

উদ্বাস্তু সম্মেলন

॥ শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ॥

[৩০শে মার্চ, ১৯৫৮ টালিগঞ্জ থানা উদ্বাস্তু সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।]

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়, মাননীয় মেয়র মহোদয়, বরেণ্য প্রধান অতিথি মহাশয়, সমাগত ভদ্রমহিলা ও মনীষীবৃন্দ এবং টালিগঞ্জ এলাকার বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধি বন্ধুবর্গ,

টালিগঞ্জ থানার উদ্বাস্তু সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আমি আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। বহু বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আমরা যে আজ এই সম্মেলনে মিলিত হতে পেরেছি, তাতেই আমরা আনন্দিত এবং আপনাদেরই সাহায্য ও সমর্থনে এই সম্মেলন সম্ভবপর হয়েছে বলে আপনাদিগকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

বাংলা দেশের বাস্তুহারা সম্প্রদায় আজ একটা আলাদা জাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা রিফিউজী নামে অভিহিত হচ্ছি। আমাদের এ নামটা বড় একটা সুনাম নয়। নানা সুযোগ-সুবিধা পাবার আশায় আমরাও আমাদিগকে এই নামে অভিহিত করতে ব্যস্ত। তার ফলে আমরা আমাদের আত্মসম্মান বোধটা যেন হারিয়ে ফেলেছি। তাই আমার মতে, যত শীঘ্র সম্ভব আমরা এই নামটা ত্যাগ করতে পারবো, ততই আমাদের পক্ষেও মঙ্গল, দেশের পক্ষেও মঙ্গল।

৪০ লক্ষাধিক লোক পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তুহারা হয়ে ভারতে চলে এসেছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে ৩৪ লক্ষ। পূর্ববঙ্গে তাদের যে সমাজ ছিল, সে সমাজ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে তারা এখানে এসে এখনো নূতন সমাজ গড়ে তুলতে পারেনি। তাই তাদিগকে সমাজবদ্ধ মানুষ বলা যায় না। তারা এখন অবস্থাগতিকে অসামাজিক জীবের পর্যায়ভুক্ত। তারা প্রত্যেকে সর্বদা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত—কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না—তাদের ভবিষ্যৎ নিতান্তই অনিশ্চিত বলে সর্বদা একটা অস্থির-চিত্ততা নিয়ে বাস করতে বাধ্য হয়। এগুলিই তো অসামাজিকতার লক্ষণ। বাস্তুহারাদের

মধ্যে এই লক্ষণে লক্ষণান্বিত নয়, এমন মানুষের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়—এমনকি নেই বললেই চলে। যদি থাকে, তবে তারা নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। এই অবস্থা দেশের পক্ষে অতিশয় সর্বনাশকর। এরূপ অস্থিরতার আবহাওয়ায় একটা সুদৃঢ় চরিত্র গড়ে ওঠে না—ছাত্রদের শিক্ষা নেবার মনোভাব থাকে না—শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার মনোভাব থাকে না—ছেলে-মেয়েরা উচ্ছৃঙ্খল ও চরিত্রহীন হয়ে ওঠে। সকলেরই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান হয়ে ওঠে ছলে-বলে-কৌশলে যেমন করে হোক কোনো দিক দিয়ে কিছুটা লাভবান হওয়া। সদ্ অসদ্ উপায়ের বাচবিচার করার মনোভাব থাকে না। যে দেশের ৩৪ লক্ষ লোক এই অবস্থাপন্ন, সে দেশে সর্বদার তরে যে একটা অরাজকতার আবহাওয়া লেগে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কি? সে দেশের ছেলে-মেয়েরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত ও চরিত্র বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে না বলে তাদের নিজেদের ভবিষ্যৎও অন্ধকারময় এবং দেশের ভবিষ্যৎও অন্ধকারময়।

কিন্তু বাস্তুহারা হয়ে এ দেশে আসার পূর্বে তো তারা এমনটা ছিল না। এই পূর্ববঙ্গেরই যুবক সম্প্রদায় দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা হিসেবে অসামান্য শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়েছে—চরিত্রবলে ও কর্মকুশলতায় অপরের বিস্ময়ের বস্তু হয়েছে। এরা যে দেশের লোক, সে দেশটা হচ্ছে আনন্দমোহন বোস, জগদীশচন্দ্র বোস, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, নবীনচন্দ্র সেন, আনন্দ রায়, অনাথবন্ধু সেন, সূর্যকান্ত আচার্যচৌধুরী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, হরদয়াল নাগ, চিত্ত-রঞ্জন দাস, যতীন্দ্রমোহন সেন, যতীন রায়, বসন্ত মজুমদার, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, পুলিন দাস, সতীন সেন, পূর্ণচন্দ্র দাস প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিবর্গের দেশ। সে দেশ হচ্ছে সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওদেদার, নির্মল সেন, জীবন ঘোষাল, নলিনী বাকচী, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন দাসগুপ্ত, বিনয় বোস, বাদল গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, অনুজা সেন, তারক সেন প্রভৃতি মরণজয়ী অসংখ্য শহীদবৃন্দের দেশ। তাদের অকুণ্ঠ আত্মদান ও দেশের অন্যান্য কর্মবীর ও মনীষিগণের অনলস কর্মোদ্যমে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সেই পূর্ববঙ্গের লোকেরা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের ফলে সে দেশে টিকতে না পেরে ভিটামাটি ছেড়ে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে এসে ভারতের মাটিতে পা দিয়ে দেখছে যে, এখানে তারা অনভিপ্রেত আগন্তুক—স্বাধীন ভারতের পক্ষে তারা এক মস্তবড় সমস্যা—এতবড় সমস্যা যে প্রাণপণ চেষ্টা করেও

সে তার কূলকিনারা করতে পারছে না। ফলে বাস্তহারা হওয়ার দরুণ যারা দুর্দশাগ্রস্ত, তাদের দুর্দশার উপশম হচ্ছে না বলে তাদের ভিতরে একটা তীব্র অসন্তোষের মনোভাব ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠছে। অপরদিকে পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসীরা দেখছে যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ৩৪ লক্ষ লোক বাইরে থেকে এসে তাদের ঘাড়ের উপরে চেপে বসেছে, যার ফলে তাদের অবস্থার আশু উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দলে দলে বাস্তহারার আগমনে তারাও অতিমাত্র অসন্তুষ্ট। কিন্তু প্রকাশ্যে কারো পক্ষেই সে অসন্তোষ প্রকাশ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। কেননা, সবাই জানে যে এই বাস্তহারার দলই স্বাধীনতা যজ্ঞের প্রধান বলি। যখন স্বাধীনতার সম্ভাবনা দ্বারে এসে উপস্থিত, তখন এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল যে দেশ ভাগে রাজি না হলে সেই সময়ে অন্ততঃ স্বাধীনতা অধিগত হয় না। তাই দেশভাগে মত বা সম্মতি না থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজী পর্যন্ত বিরুদ্ধতা করেননি। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যারা দেশভাগে রাজি হয়েছিলেন, তারা আজকের এই বাস্তহারাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে রাজি হয়েই, তা করেছিলেন। তার মানে বহু সংখ্যকের স্বার্থে অল্প সংখ্যকের আত্মবলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যারা বলি হয়েছেন, তাদের নিজেদের সে বোধটা থাকলে যে মনোভাব নিয়ে তাদের চলা উচিত, সে মনোভাব তারা বজায় রাখতে পারছেন না এবং অন্যেরাও তাদের সে চোখে দেখতে পারছে না। তার ফলে সমস্যাটা এত ঘোরালো হয়ে উঠেছে।

সমস্যাটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে আরো এক কারণে। কারণটা হচ্ছে এই যে, বর্ত্তমানে আমাদের এ দেশে বাস্তহারা সমস্যা রাজনৈতিক খেলার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যারা সর্বদা একটা অনিশ্চয়তা ও অস্থির-চিত্ততা নিয়ে বাস করছে, রাজনৈতিক দলগুলি তাদের কথায় কথায় রাজনৈতিক আইন অমান্য আন্দোলনের ভিতর টেনে এনে, তাদিগকে আরো উদ্‌ভ্রান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল করে তুলছে। এরা ক্রমেই কোনো স্বাধীন দেশের ভব্য সভ্য সম্মানিত নাগরিক হওয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলছে। অরাজকতা সৃষ্টির কাজে অনবরত হৈ-হৈ করার ফলে এরা ধীর স্থির ভাবে কোনো কাজ করার অভ্যাস হারিয়ে ফেলছে এবং তার ফলে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই অবস্থার জন্যে রাজনৈতিক দলগুলিই

সম্পূর্ণভাবে দায়ী। এতে করে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করছে বটে, কিন্তু বস্তুহারাদের ভবিষ্যৎ যে ঝরঝরে করে দিচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাস্তুহারা সমস্যা বাংলা দেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা। বাংলাকে সমস্যাবহুল প্রদেশ বলা হয়। সমস্যাবহুল হওয়াব প্রধান কারণই হচ্ছে এই বাস্তুহারা সমস্যা। এই সমস্যাই অন্যান্য প্রায় সব সমস্যারই জনক। এ সমস্যা না থাকলে অন্যান্য সমস্যা সমস্যা বলেই অনুভূত হত না, কিংবা অতি সহজেই তার সমাধান সম্ভবপব হত। এতবড় যে সমস্যা, যার সমাধানের উপরে বাংলা দেশের বাঁচা মরা নির্ভর করছে, এ সমস্যার সমাধানই বা কি এবং সমাধানের দায়িত্ব বা কার? এ সমস্যা আদতে সর্বভারতীয় সমস্যা—জাতীয় সমস্যা। তাই কেন্দ্রীয় সরকারই এ সমস্যা সমাধানেব দায়িত্ব ঘাড় পেতে নিয়েছেন এবং বাস্তুহারাদের জন্য যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকারই বহন করছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এই বাবদ বছরে ১৪।১৫ কোটি টাকার বেশি খরচ করা সম্ভবপর হচ্ছে না। অথচ এ টাকা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। তাই তাড়াতাড়ি এ সমস্যা সমাধানের উপায় নাই। কিন্তু এ কথা সমালোচকরা নিজেরাও বুঝতে চান না এবং বাস্তুহারারাও যাতে বুঝতে না চায় তার জন্যতাঁরা যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। এর ফলেও সমস্যা ক্রমেই আরও ঘোরাল হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পৃথিবীর নানা দেশে—বিশেষতঃ ইউরোপে বারবার বাস্তুহারা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। প্রতিবারেই সে সব দেশে আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হয়েছে। এখনও ইউরোপে এ সমস্যা নিয়ে কাজ করবার জন্য নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে, যাঁরা সমস্ত পৃথিবী থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে। কিন্তু ভারতের পক্ষে কেবল মাত্র নিজের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে এ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান অতিশয় দুঃসাধ্য এবং বহু সময়সাপেক্ষ। পাকিস্তান সরকারের দুর্ব্যবহারের ফলেই হোক কিংবা তাদের অক্ষমতার ফলেই হোক, সে দেশের সংখ্যাল্প সম্প্রদায় দেশে টিকতে না পেরে এখনও বাস্তুহারা হিসেবে এদেশে আসছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের মতে ভারতের পক্ষ থেকে বিশ্বসভায় এই দাবী উত্থাপন করা উচিত যে, এই সমস্যার জন্য পাকিস্তানই দায়ী বলে এই সমস্যা সমাধানের যাবতীয় ব্যয়ভার তাকেই বহন করতে বাধ্য করা হোক।

বাংলা দেশে বাস্তহারা সমস্যা নিয়ে আমরা হিমসিম খাচ্ছি; কিন্তু পাঞ্জাবের সমস্যা প্রায় ইতিমধ্যেই সমাধান হয়ে গেছে। তার কারণ যে পন্থায় পাঞ্জাবের সমস্যা সমাধান সম্ভবপর হয়েছে, সে পন্থায় বাংলা দেশের সমস্যা সমাধান হতে পারে না। অথচ সেই পন্থায় সমাধান করতে গিয়ে আমরা যে বিফলকাম হয়েছি তাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আসল কথা উভয় প্রদেশের সমস্যা এক নয়। উভয় প্রদেশের মানুষ এক নয়—তাদের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা-প্রণালী এক নয়। দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুই রকমের। তাছাড়া পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে যাদের চলে আসার প্রয়োজন ছিল, তারা সবাই একসঙ্গে চলে এসেছে। এবং যত সংখ্যক লোক এসেছে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক লোক দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাদের বাড়ি ঘর জমি-জমা, বিষয়-সম্পত্তি সব ফেলে চলে গিয়েছে। যারা এসেছে, তাদের মধ্যে সেই পরিত্যক্ত বাড়ি-ঘর, জমি-জমা বণ্টন করে দিয়ে বসিয়ে দিলেই পাঞ্জাবের সমস্যা সমাধান সম্ভবপর। তাই যতদিন না এই ভাগবাটোয়ারা করে দেবার কাজ সুসম্পন্ন হচ্ছে, ততদিন বাস্তহারাদিগকে নানা রকমে সাহায্য করা হয়েছে, প্রয়োজনমত ডোল দেওয়া হয়েছে এবং টাকাও ধার দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ব্যবস্থা করে পাঞ্জাবের সমস্যার মোটামুটি সমাধান হয়ে গেছে। কিন্তু সেই একই ব্যবস্থা বাংলা দেশে চালু করার ফলে বাংলার সমস্যা সমাধানের পথে এক পাও এগোয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। এর একমাত্র কারণ এই যে বাংলার সমস্যা আলাদা বলে তার প্রতিকারের পথও আলাদা হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

বাংলা দেশের বাস্তহারারা সবাই একসঙ্গে আসে নাই। ১৯৫৬ সালে এসেছে আড়াই লক্ষ এবং ১৯৫৭ সালে নয় হাজার মাত্র। এত কম আসার কারণ এ নয় যে পূর্ববঙ্গ থেকে কেউ আর আসতে চাচ্ছে না—আসতে দেওয়া হচ্ছে না বলেই আসতে পারছে না। পূর্ববঙ্গে এখনও আশি লক্ষ থেকে নব্বই লক্ষ হিন্দু আছে। আসতে দিলে তারা যে সবাই আসতে চাইবে, তাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পূর্ববঙ্গের অবস্থা যে কোন দিন এমন ঘোরাল হয়ে উঠতে পারে যে সেখানকার হিন্দুরা এখানে আসবার জন্য হয়ত সদলবলে অভিযানই আরম্ভ করে দিবে। তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে তাদের না আসতে দেবার কথা চিন্তা করাও সম্ভবপর হবে না। এবং আসতে দিলে তাদের পুনর্বাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করাও অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই

বাংলা দেশের বাস্তুহারা সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা করতে এই কথাটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

তারপরেই পূর্ববঙ্গ থেকে এ পর্যন্ত ৩৪ লক্ষ বাস্তুহারা পশ্চিমবঙ্গে এসেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলমান সম্প্রদায় যারা চলে গিয়েছিল, তারা প্রায় সবাই ফিরে এসেছে। কাজেই এখানে পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ি জমি-জমা নেই বললেই চলে। তাই এখানকার সমস্যা হচ্ছে, যারা এসেছে, কোথায় তাদের ঘর-বাড়ি করার জায়গা দেওয়া যায় এবং কেমন করেই বা তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় এবং এর পরে যারা আসবে, তাদের সম্বন্ধেই বা কি ব্যবস্থা করা যাবে।

সবাই জানে বাংলা দেশের পরিধির তুলনায় তার লোকসংখ্যা অত্যধিক। তার উপরে বাস্তুহারা এসেছে ৩৪ লক্ষ। এইসঙ্গে এই কথা মনে রাখতে হবে যে, জন্মের হার হিসাব করে দেখা যাচ্ছে, প্রতি বছর বাংলা দেশের লোকসংখ্যা সাড়ে চার লক্ষ করে বাড়ছে। এই যে প্রভূত লোকসংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, এদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা কেমন করে হতে পারে? বাংলা দেশে ২৯ লক্ষ পরিবার (দেড় কোটি লোক) কৃষিকার্যে ব্যাপৃত। তার মধ্যে ৬ লক্ষ পরিবারের (৩০ লক্ষ লোক) কোন জমি-জমা নাই। ১৪ লক্ষ পরিবারের (৭০ লক্ষ লোক) জমি-জমা যা আছে, তা এত কম যে তার আয়ে তাদের জীবিকানির্বাহের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না। জমিদারী দখলের ফলে যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাবে তার আনুমানিক পরিমাণ ২ লক্ষ একর এবং পতিত জমির পরিমাণ ৫ লক্ষ একর। বহু অর্থ ব্যয়ে এই ৫ লক্ষ একর পতিত জমিকে যদি কর্ষণযোগ্য করার চেষ্টা করা যায় তাহলেও তা ভাল চাষের জমিতে পরিণত হতে পারে না। এরূপ জমি চাষ করে কতটি পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহ হতে পারে? এদেশে যে ছয় লক্ষ ভূমিহীন কৃষক পরিবার আছে, এই জমি তো তাদের প্রয়োজন মিটাবার পক্ষেও যথেষ্ট নয় এবং তাদের দাবিই সর্বাগ্রগণ্য হওয়া উচিত। এরূপ অবস্থায় বাস্তুহারাদিগকে এদেশে জমি দিতে হলে সেই জমি আসবে কোথা থেকে। কাজেই বাস্তুহারা যারা এসেছে, যারা ভবিষ্যতে আসবে এবং বছর বছর যে লোকসংখ্যা বাড়ছে তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা বাংলা দেশের জমির উপর নির্ভর করে হতে পারে না।

সরকার এ পর্যন্ত ১৬ হাজার বাস্তুহারা পরিবারকে (৮০ হাজার লোক)

৫০ হাজার একর জমি বণ্টন করে দিয়েছে। এরূপ খবর পাওয়া গিয়েছে যে এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পরিবার যে জমি পেয়েছে তার উপস্বত্ব দ্বারা তাদের সকলের ভরণপোষণের ব্যয় সঙ্কুলান হচ্ছে না। কোথাও কোথাও তারা পুনর্বাসনের স্থান ছেড়ে চলে এসে রাস্তার পাশে বা শিয়ালদহ স্টেশনে স্থান গ্রহণ করেছে। একথা বললে নিশ্চয়ই সত্যের মর্যাদা রক্ষা হবে না যে তারা সকলেই কর্মবিমুখ বলে কৃষিকার্যে সফলতা লাভ করতে পারেনি। পূর্ববঙ্গের কৃষক যথেষ্ট পরিশ্রমী ও কর্মকুশল। উপযুক্ত জমি পেলে যে তারা জমিতে সোনা ফলাতে পারে, তার প্রমাণ তারা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দিয়েছে। তাদের পরিশ্রমের ফলেই গত ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে পাটের ফসল বেড়েছে শতকরা দু'শ ভাগ এবং ধানের ফসল বেড়েছে শতকরা ৯ ভাগ। অফলা জমিতে তারা কেমন করে ফসল ফলাবে? কেউ পারবে না। এরূপ অবস্থায় বাংলা দেশে ও বাঙ্গালীর বাঁচবার একমাত্র পথ হচ্ছে কুটীর শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও বৃহৎ শিল্পের বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে সে সব প্রতিষ্ঠানে সকলের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। বাংলা দেশের বাস্তুহারার সমস্যারও একমাত্র সমাধান হচ্ছে প্রত্যেক বাস্তুহারার রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং সে রোজগার যখন বাংলা দেশে কৃষিকার্য দ্বারা সম্ভব নয়, তখন দেশের নানান জায়গায় নূতন নূতন শিল্পের পত্তন করে সেখানে বাস্তুহারাদের নিয়োজিত করা। তা না করে একদল বাস্তুহারাদের ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে তাদের ডোল দেওয়া হচ্ছে। তাতে তাদের সমস্যার তো কোন সমাধানই হচ্ছে না, উপরন্তু বছরের পর বছর তাদের বিনা কাজে বসিয়ে রেখে অমানুষ করে তোলা হচ্ছে। পাঞ্জাবে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্যে এরূপ ব্যবস্থার হয়ত সত্যি প্রয়োজন ছিল, তাই সেখানে এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল এবং বাস্তুহারাদিগকে মুসলমানদের পরিত্যক্ত ঘর-বাড়িতে বসিয়ে দেবার কিছুদিন পরেই সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। এখানে বহু বছর ধরে ডোল দিয়েও সমস্যার সমাধানের পথে এগোন যাচ্ছে না। যারা এইসব ক্যাম্পে আছে তারা হয় কৃষিজীবী কিংবা কৃষির উপরে নির্ভরশীল ছিল। এখানে এসে তাদের পূর্বের পন্থায় রুজি-রোজগার যে অসম্ভব সে কথা সবাই জানে। এ অবস্থার ডোল দিয়ে কোটি কোটি টাকা অপব্যয় না করে, প্রথম থেকেই নূতন নূতন বড়, ছোট, মাঝারি, নানা প্রকারের শিল্প গড়ে তোলার কাজে তাদের লাগিয়ে দিলে এতদিনে এ সমস্যা সমাধানের পথে অনেকটা অগ্রসর হয়ে যেত।

কিন্তু বাংলা দেশে কতই বা শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যাবে সে কথাও বিবেচ্য। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বাংলা দেশও কৃষিপ্রধান। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রদেশে যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে, তার মধ্যে বাংলা দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কেন্দ্রীয় সরকার দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সব প্রদেশে মোটামুটি সমানভাবে ছড়িয়ে থাক, এই নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী। কোন একটা প্রদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কেন্দ্রীভূত হয় এটা প্রাদেশিক সরকার-গুলি কিংবা কেন্দ্রীয় সরকার কেহই চান না। তাই বর্তমানে বাংলা দেশে কোন একটা বড় রকমের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অনুমতি পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান কতই বা গড়ে তোলা যাবে? তার তো একটা সীমা আছে। শিল্প দ্রব্যের বাজার তো থাকা চাই। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন বেশি হয়ে পড়লে পণ্যদ্রব্যের দাম কমে যাবে। ফলে ব্যবসায়ে লোকসান দেখা দেবে এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠানই উঠে যাবে। এরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কোনই অর্থ হয় না।

এই পরিস্থিতিতে বাংলা দেশে অতিরিক্ত লোকসংখ্যার জন্যে এই প্রদেশের বাহিরে স্থান সংগ্রহের চেষ্টা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। বাংলা দেশের সামগ্রিক সমস্যার বিষয় চিন্তা করলে যে কোন বিবেচনাশীল ব্যক্তি একথায় সায় না দিয়ে পারে না। তবে যে কোন প্রদেশে কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী বাস্তুহারা পাঠিয়ে দেবার আমি পক্ষপাতী নই। বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা প্রণালী ও সাধারণ মনোভাবের বিষয় চিন্তা করে আমার মনে হয় অন্য ভাষাভাষীদের মাঝখানে থেকে বাঙ্গালী জনগণ—বিশেষতঃ শিক্ষায় অনগ্রসর জনসাধারণ সোয়াস্তি বোধ করবে না। এছাড়া অন্য আরও অনেক অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু আমি দণ্ড-কারণ্য পরিকল্পনার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আমার মতে সেখানে মনুষ্য বাসোপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। তারপরে বাস্তুহারাদের মধ্যে যাদের সঙ্গে যাদের আচার-ব্যবহার, ধরণ-ধারণ ও ভাষাগত নৈকট্য আছে, তাদের একসঙ্গে বসাতে পারলে ভাল হয়। আর পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক কর্মিবৃন্দ যাতে সেখানে যেতে রাজী হয়, তার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার যাবতীয় ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করতে রাজী হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থব্যয়ে বাংলা দেশের চেয়েও অনেক বড় আর একটা বাংলা দেশ গড়ে উঠবে, যাতে বাংলা দেশের সমস্যা সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর—এই প্রস্তাবে বাঙ্গালীরা কেন যে বাধা দেবে তার অর্থ খুঁজে পাওয়া

যায় না। বন্ধুরা যতই বাধা দিন না, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে এই দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার মত কোন পরিকল্পনা কিংবা বিহার অথবা আসামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ছাড়া বাংলা দেশের সামগ্রিক সমস্যার সমাধান একেবারেই অসম্ভব।

বাস্তুহারা সমস্যা সমাধান সম্পর্কে সাধারণভাবে মোটামুটি দু-চার কথা বলা গেল। টালিগঞ্জ থানা উদ্বাস্তু সম্মিলনের উদ্দেশ্য বাস্তুহারা সমস্যার সাধারণ আলোচনা নয়। আমাদের বিশেষ উদ্দেশ্য আমাদের নিজেদের সমস্যার আলোচনা ও প্রতিকার নির্ধারণ এবং সেই প্রতিকারকে রূপায়িত করে তুলবার জন্যে একটা স্থায়ী সংস্থা সংগঠন। টালিগঞ্জ থানা এলাকায় ৫৮টি জবরদখল কলোনী ও ৫টি সরকারী কলোনী, মোট ৬৩টি কলোনী আছে। এইসব কলোনীগুলিতে প্রায় ২০ হাজার পরিবার বসতি স্থাপন করেছে। এছাড়া টালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া, কসবা প্রভৃতি জায়গায় বহু বাস্তুহারা পরিবার রয়েছে যারা কোন কলোনীর অন্তর্ভুক্ত নয়। এইসব পরিবার অধিকাংশই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা এখানে এসে চাকরিবাকরি করে' কিংবা ছোটখাট ব্যবসা চালিয়ে কোন রকমে কষ্টেসৃষ্টে জীবনধারণ করছে। তাদের পক্ষে মানুষের মত স্বচ্ছলভাবে জীবনধারণ করবার পর্যায়ে পৌছান এখনও বহুদূরে। তারা বাস্তুভিটা গড়ে তুলবার জন্যে জমি দখল করে বসেছে বটে, কিন্তু এখনও তারা সকলে সে জমির মালিকানা স্বত্ব পায়নি। সে জমিতে নিজেদের চেষ্টায় মাথা গুজবার মত একটুখানি ডেরা তুলে নিয়েছে বটে, কিন্তু সে ডেরা ঝড়, জল, রৌদ্র, বৃষ্টিতে বাসোপযোগী ও শীতাতপ নিবারণ উপযোগী হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের গৃহনির্মাণ ঋণ না দিলে কলিকাতার বুকে আবার নূতন পূতিগন্ধময় বস্তি গড়ে উঠবে। তারা যে সব জায়গায় বসতি স্থাপন করেছে, সে সব জায়গায় ঘন বসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অথচ এই ঘন বসতিপূর্ণ জায়গায় রাস্তা, ঘাট, আলো, জল নিষ্কাষণের ব্যবস্থার একান্ত অভাব। এছাড়া কলোনী-বিশেষের কিংবা ব্যক্তিবিশেষের হয়ত বিশেষ অসুবিধা ও অভাব অভিযোগ আছে। যে স্থায়ী সংস্থা আমরা গড়ে তুলব বলে সংকল্প করেছি, তার কাজ হবে এইসব অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার প্রতিকারের উপায় চিন্তা করে তদনুসারে কাজে অগ্রসর হওয়া।

বাস্তুহারা সমস্যা নিয়ে অনেক বন্ধুরাই আন্দোলন আলোচনা করছেন। এই ব্যাপারে যেরূপ কর্মপন্থা তাঁরা অনুসরণ করে চলেন, তাতে

তাঁদের রাজনৈতিক মতলব সিদ্ধ হতে পারে, কিন্তু আমরা মনে করি তাতে বাস্তুহারা সমস্যা সমাধানের অন্তরায়ই সৃষ্টি হয়। এবং এইভাবে চলার ফলে তাঁরা বাস্তুহারাদের যতটা উপকার সাধন করেন, তার চাইতে তাদের অনিষ্ট সাধিত হয় অনেক বেশি। তাদের নিয়ে কথায় কথায় অতিরিক্ত হৈ-চৈ করার ফলে তাদের ক্রমে আরও অস্থিরচিত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। এরূপ অবস্থায় তাদের পক্ষে একটা স্বাধীন দেশের ভব্য, সভ্য, সম্মানিত নাগরিক হয়ে ওঠার পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে তাদেরও যেমন অমঙ্গল, দেশেরও অমঙ্গল। তাই তাদের পথ অনুসরণ করা আমরা অন্যায় মনে করি। আমরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার পথে আলাপ-আলোচনার দ্বারা আমাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করব।

মনে রাখতে হবে যে, আজকের দিনে সরকার হচ্ছে আমাদের জাতীয় সরকার—বিদেশী সরকার নয়। জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করা দেশের প্রত্যেক দায়িত্বশীল নাগরিকের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য।

জয় হিন্দ্!

'হে মহাপথিক,
অবারিত তব দশ দিক।
তোমার মন্দির নাই, নাই স্বর্গধাম,
নাইকো চরম পরিণাম;
তীর্থ তব পদে পদে,
চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে—
চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে,
চঞ্চলের সর্বভোলা দানে।
আঁধারে আলোকে,
সৃজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে।'

—পান্থ, পরিশেষ—

ঝিক্‌মিক্‌

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

চাহিনা দেবতা হতে স্বর্গ অধিবাসী,
দেবলোক নহে কাম্য মোর,
বারে বারে ফিরে যেন মর্ত্যলোকে আসি,
ছিন্ন যেন নাহি হয় মৃত্তিকার ডোর।

* *

শুকনো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে নবীন কিশলয়
জাগে আবার রিক্ত তরুশাখে;
এই জগতে নিঃশেষে তো হয় না কিছু ক্ষয়
ভালবাসি তাইতো আপনাকে।

* *

আমার জীবনে তোমার পরশ পেয়েছি যে বারেবারে
তাইতো করি না ভয়;
জানি এ আঁধার শুধু ক্ষণিকের ঘিরেছে যা চারিধারে,
হবে আলোকের জয়।

* *

দুঃখের ঘন আধারের মাঝে যাত্রী আমরা সবে,
চলি নিশিদিন আলোকের সন্ধানে;
সন্দেহ যেন কভু নাহি আসে দুঃখের বৈভবে
অশ্রু যেন না নিরাশা জাগায় প্রাণে।

* *

আলো ও আঁধার একই ধরণীর বুকে
পরম প্রীতিতে বাস করে দোঁহে সুখে;
আলো-সন্ধানী আলোকেরে চিনে লয়,
দৃষ্টিহীনের শুধু আঁধারের ভয়।

সম্মুখে চলি ; পিছনের কথা বুঝি থাকে নাকো মনে,
চেয়ে দেখি, সে তো রয়েছে আমার দু'টি নয়নের কোণে।

*　　*

রবি দেয় আলো সবাকার 'পরে কৃপণতা নাহি তার ;
আলোর আশিস্ পায় না যে জন খোলে না রুদ্ধ দ্বার।

*　　*

চির সুন্দর গান গেয়ে যায় দিকে দিকে অকারণে,
শোনার মতন কান আছে যার, সেই তো সে গান শোনে।

'বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশে ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে,
একটি শিশিরবিন্দু॥

—শিশিরবিন্দু, স্ফুলিঙ্গ

'পল্লীসমাজ'—শরৎচন্দ্র

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

।। শ্রীরেণু মিত্র ।।

পীরপুরের মুসলমানদের প্রসঙ্গে বিশ্বেশ্বরীর সঙ্গে রমেশের হিন্দুসমাজের জাতিভেদ নিয়ে আলোচনা উঠল। রমেশের কাজ তিনি পছন্দ করেন, তাকে এগিয়ে যেতে সাহস ও উৎসাহও দেন—কিন্তু প্রশ্নও করেন, '…কিন্তু হাঁ রে রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতের জল খাস।' সেদিনে শরৎচন্দ্রের মত বিপ্লবীও বিশ্বেশ্বরীকে এতখানি সমাজ-সচেতন করতে পারেন নি যে, মুসলমানের হাতে হিন্দু ব্রাহ্মণ জল খেতে পারে, এ সংবাদ তিনি বরদাস্ত করে নিতে পারেন। রমেশ জবাব দিল, '…এখনো খাই নি বটে, কিন্তু খেতে তো আমি কোন দোষ দেখি নে। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানি নে।'

'জ্যাঠাইমা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, মানিস নে কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবি নে?'

—এর পরে বিশ্বেশ্বরী আরও কতকগুলি কথা বললেন, যা ধোপে টেকে না। বর্ণাশ্রম-অন্তর্গত জাতিভেদের ছোট বড়র ভেদ-ব্যবস্থা কিংবা হিন্দু-অহিন্দুর ভেদ-ব্যবস্থা বর্তমান রেখে দিয়ে 'যাকে যথার্থ ধর্ম বলে', তেমন সত্যিকাবের ধর্ম যে আজ কিছু হতে পারে না, বিশ্বেশ্বরীর দলকে এ কথা আজ বুঝতেই হবে। ঐ ভেদ-ব্যবস্থা গোড়াতেই দুষ্ট, ভ্রান্তিকর;—গোড়ার এ ভুল রেখে দিলে ধর্মকে কিছুতেই 'কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি'-র অবস্থা থেকে রক্ষা করা যাবে না। যে কাঠামোর ফলে ছোট-বড়র ভেদ-ব্যবস্থাটা কায়েম হয়ে উঠতে পেরেছিল, সেই প্রচলিত মূল কাঠামোকে গোড়ায় বজায় রেখে দিলে বিপ্লবকে কিছুতেই শেষ পর্য্যন্ত নেওয়াও যাবে না, রক্ষা করাও যাবে না। মানুষের সঙ্গে মানুষের জাতি নিয়ে জন্মগত একটা ছোটবড়র ভেদ আছে—একথাটাই গোড়ায় ভুল। আত্মার প্রকাশিত হওয়ার তারতম্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য যেটা আছে, সেটার সঙ্গে জাতির কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই জ্যাঠাইমা যখন বলেন, 'মানিস নে

কি রে? এ কি মিছে কথা, না জাতিভেদ নেই যে তুই মানবি নে?'—তখন তিনি নূতন যুগের কথা বলেন না। মানুষের সঙ্গে মানুষের জন্মগত জাতিগত ভেদ স্বীকার করে সত্যিকারের কোনো ধর্ম্ম হয় না—এটা সকলের আগে স্বীকার করতেই হবে।

শ্রীনিত্যগোপাল লিখছেন তাঁর 'জাতিদর্পণ বা নিত্যদর্শন' বইতে—'নানা শাস্ত্রানুসারে পুত্রকে অঙ্গজ বলা হয়। নানা অভিধানানুসারেও অঙ্গজ শব্দের অর্থ পুত্র। ঋগ্বেদীয় পুরুষের, মনুসংহিতার হিরণ্যগর্ভের এবং নানা পুরাণীয় মতে ব্রহ্মার অঙ্গ হইতে ব্রাহ্মণেরও উৎপত্তি, ক্ষত্রিয়েরও উৎপত্তি, বৈশ্যেরও উৎপত্তি এবং শূদ্রেরও উৎপত্তি। পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার মুখ যেমন পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গের এক অংশ তদ্রূপ পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার বাহু, বক্ষ, উরু এবং পদও সেই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গের চার অংশ। সুতরাং ব্রহ্মার মুখোৎপন্ন যিনি তিনিও ব্রহ্মার অঙ্গজ, সুতরাং ব্রহ্মার বাহু হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ, সুতরাং পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার বক্ষ হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও সেই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ। সুতরাং পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার উরু হইতে যিনি উৎপন্ন তিনিও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ। সুতরাং পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার পদ হইতে যিনি উৎপন্ন, তিনিও সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ। তুমি নানা শাস্ত্রানুসারেই কেবল ব্রাহ্মণকেই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ বলিতে পার না। নানা শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রও সেই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ। কোন শাস্ত্রমতেই ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র অপুরুষের অহিরণ্য-গর্ভের কিম্বা অব্রহ্মার অঙ্গজ নহেন। তবে পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণ সেই পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অপর তিন অঙ্গজের অন্ন ভক্ষণ করিতে সঙ্কুচিত হন কেন? পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণ সেই পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার সমস্ত অঙ্গের কোন্ অংশকে অপবিত্র বলিতে সাহসী হইতেছেন? প্রকৃত পুরুষ হিরণ্যগর্ভ বা ব্রহ্মার ভক্ত যে ব্যক্তি তিনি সেই পুরুষের, হিরণ্যগর্ভের বা ব্রহ্মার শরীরের কোন অংশকেই অপবিত্র বলিতে পারেন না। পরম পবিত্র স্রষ্টা ব্রহ্মার অঙ্গের সকল অংশই পবিত্র। তাঁহার পরম পবিত্র অঙ্গ হইতে যাঁহারা উৎপন্ন, তাঁহারা সকলেই পরম পবিত্র। আমি বলি পরম পবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ ব্রাহ্মণও পরম পবিত্র, আমি

বলি পরম পবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ ক্ষত্রিয়ও পরম পবিত্র, আমি বলি পরম পবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ বৈশ্যও পরম পবিত্র, আমি বলি পরম পবিত্র ব্রহ্মার অঙ্গজ শূদ্রও পরম পবিত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র স্বরূপতঃ একই বটেন। ঐ পনসবৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ অংশে যে পনস হইয়াছে তাহাও ঐ পনসবৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, ঐ পনসবৃক্ষের মধ্যদেশের কিঞ্চিদূর্দ্ধে যে পনস হইয়াছে তাহাও ঐ পনস বৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, ঐ পনসবৃক্ষের মধ্যাংশে বা মধ্যদেশে যে পনস হইয়াছে তাহাও ঐ পনসবৃক্ষের অংশ পনসবৃক্ষ, ঐ পনসবৃক্ষেরই সর্ব্ব নিম্নাংশে যে পনস হইয়াছে, তাহাও ঐ পনসবৃক্ষের অংশই পনসবৃক্ষ। ব্রহ্মাঙ্গের সর্ব্বোচ্চ অংশে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মার অঙ্গের অংশ সেই ব্রহ্মাঙ্গ, ব্রহ্মাঙ্গের সর্ব্বোচ্চ অংশের পরবর্ত্তী অংশ হইতে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মাঙ্গের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ, ব্রহ্মাঙ্গের মধ্যাংশের বা মধ্যদেশের উরু হইতে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মাঙ্গের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ। ব্রহ্মাঙ্গের সর্ব্ব নিম্নাংশে যাঁহার উৎপত্তি তিনিও সেই ব্রহ্মাঙ্গের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ। ব্রহ্মা যেমন এক, তাঁহার অঙ্গ বা শরীরও এক। স্বতরাং তাঁহার সেই অঙ্গ বা শরীর হইতে যাঁহারা উৎপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই সেই ব্রহ্মাঙ্গ বা ব্রহ্মশরীরের অংশ ব্রহ্মাঙ্গ বা ব্রহ্মশরীর। অতএব জন্মানুসারে ঐ চারি বর্ণই অভেদ। তবে ঐ চারি বর্ণ একই ব্রহ্মাঙ্গের চারি বিকাশ মাত্র। একই বীজ বৃক্ষ হইলে সেই একেরই নানা প্রকার বিকাশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ঐ প্রকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র একই ব্রহ্মাঙ্গের চারি প্রকার বিকাশ বা manifestation মাত্র। স্বতরাং ঐ চারি বর্ণেরই পরস্পরের প্রতি যে পরস্পরের বৈরীতা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ঐ চারি বর্ণেরই স্বরূপ অভিন্ন, সম্পূর্ণ এক বোধ করিয়া ঐ চারি বর্ণেরই পরস্পরের প্রতি শুদ্ধ প্রেম হওয়া উচিৎ। চারি বর্ণই এক বর্ণ বোধ হইলেই চারি বর্ণেরই দিব্য স্থখশান্তি লাভ হইয়া থাকে। অদ্বৈতবোধে, অদ্বৈতভাবে অদ্বৈতানন্দ সম্ভোগ অপেক্ষা পরম লাভ আর কি হইতে পারে। দ্বৈতই বিবাদের মূল। অদ্বৈতই নির্ব্বিবাদের মূল।'—জাতি-সমন্বয়, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃঃ ৪৪৩।

—এইটেই আজ শাস্ত্রদ্বারা বুঝতে হবে যে জন্মানুসারে চারি বর্ণই অভেদ, অদ্বৈত; বুঝতে হবে যে চারি বর্ণই স্বরূপতঃ অভিন্ন; বুঝতে হবে যে চারি বর্ণের মধ্যে অদ্বৈতানন্দ সম্ভোগ ছাড়া সামাজিক জীবন যেমন

ব্যর্থ, ব্যক্তিগত জীবনও অসম্পূর্ণ। একদল মানুষ চিরদিন আর একদল থেকে জন্মগতভাবেই ছোট থেকে যাবে—সেই ছোটকে যত সম্মানই করি না কেন—এ কিছুতেই হতে পারবে না। ছোট জাতেরা সত্যিই ছোট জাত বলে জাত দিয়েছে। জ্যাঠাইমার একথা একেবারেই সত্যি নয় যে, "এখানে (গাঁয়ে) কায়েত বামুন হয় নি বলে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্ত্তও কায়েতের সমান হবার জন্যে একটুও চেষ্টা করে না। বড় ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোট ভাইয়ের যেমন লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমনি কায়েত বামুনের একটুখানি পায়ের ধূলো নিতে একটুও কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদ-টেদ হিংসে-বিদ্বেষের হেতুই নয়'। বিশ্বেশ্বরীর দিন পর্যন্ত ছোট-জাতের অন্তরের ব্রহ্ম যদি জাগ্রত হয়ে না-ও ওঠেন, তবু তিনি যে চিরদিন ঘুমিয়ে থাকবেন না, একথা বিপ্লবী শরৎচন্দ্র অবশ্যই জানতেন, সমাজের বিশ্বেশ্বরীর দল না জানলেও। আজ মানুষের সুপ্ত ব্রহ্মস্বরূপ জেগে উঠেছেন। আজ একথা শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে বুঝতেই হবে যে জন্মানুসারে চারি বর্ণই অভেদ। ভারতীয় সংবিধান আজ আইনের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় প্রযত্নশীল, সেই ঐক্যকে ভারতের মাটীতে জীবন্ত করতে হলে সংবিধানের আইনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যগোপাল-প্রদত্ত শাস্ত্রব্যাখ্যা দ্বারা তাকে বুঝতে হবে।

পল্লীসমাজের যে চিত্র শরৎচন্দ্র দিয়েছেন, তা যে শুধু একান্তভাবে পল্লীরই নয়, এ কথা বলেছি। হিন্দু-সমাজেরই এই অবস্থা মোটামুটিভাবে সত্য। এই সমাজকে ভেঙ্গে নূতন সমাজ গড়বার আহ্বান যেমন এসেছে সেই কবে, আজ বহু বছরের পথের প্রান্তে এসে দেখি, গড়বার মাল মসলাও বিধাতা পৌঁছে দিয়েছেন। মানুষকে মানুষ ব্যক্তিগতভাবে হিংসে করবে, অপরের ক্ষতি করে নিজের সুবিধে করে নেবে—মানুষের এসব ব্যক্তি-স্বভাব কোন দিন পুরো মাত্রায় শুধরে যাবে, এ কথা সত্য না হলেও এ কথা সত্য হতেই হবে যে, কোনো দল বা সম্প্রদায়ের উপর সামাজিক পীড়া আজ আর চলবে না।—তাই পল্লী সমাজ তথা হিন্দুর সমাজকে নূতন রূপ দিতে হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের এ ভেদ-ব্যবস্থাকে সমূলে বিনাশ সকলের আগে করতেই হবে—এবং তা করতে হবে আমাদের শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে—যে কাজটা শ্রীনিত্য-গোপাল আরম্ভ করে রেখে গেছেন।

গোড়ায় এই দার্শনিক ও শাস্ত্রগত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে একের উপরে

অপরের অত্যাচার করবার প্রধান অবলম্বনই ভেঙ্গে যাবে। একের উপরে আর একের অত্যাচার করবার প্রধান অস্ত্র হচ্ছে কৌলীন্য—ধনের কৌলীন্য, কুলের কৌলীন্য, পাণ্ডিত্যের কৌলীন্য ইত্যাদি। অর্থনীতিক্ষেত্রে ধনের কৌলীন্যকে মুছে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে, হচ্ছে, হবে—অনেকখান তা সফলও হয়েছে। হিন্দুর সমাজে কুলের কৌলীন্যের আজও তেমান অপ্রতিহত আধিপত্য বাইরের দিক দিয়ে অটুট নেই বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ যে (জন্মগত হলেও) সত্যি সত্যি বড়ই, একথার আজও সাধারণ হিন্দুর রক্তের মধ্যে স্বীকৃতি আছে। আর পাণ্ডিত্যের অত্যাচার-এর খবরও আমাদের অজানা নেই—আজও ভারতবর্ষে বহু ভেদের উপরে ইংরেজী সভ্যতায় শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ যুক্ত হয়ে অত্যাচারের এক সূক্ষ্ম যন্ত্র তৈরী হয়ে আছে। জাতি ও কুল-কৌলীন্যের এই অত্যাচার বন্ধ করতে শাস্ত্রগতভাবে গুণ-কৌলীন্য যে অসত্য এইটে বুঝতে হবে। বহুকাল ধরে আমরা ভারতবাসীরা এ কথা জেনে আসছি যে, সত্ত্বগুণ—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ইত্যাদি—শ্রেষ্ঠ—যে কোন কালে, যে কোন পাত্রে, যে কোন অবস্থায়। কিন্তু আজ জানতে হবে যে এমন নির্বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব বিধাতার রাজ্যে কোন কিছুরই নেই। আর এই শম, দম, তপস্যা, ক্ষমা, সরলতা কেবল যে একদল মানুষেরই জন্য চিরদিন বরাদ্দ হয়ে আছে, আর একদল মানুষ যে কোনোদিনই এর অধিকারী হতে পারবে না—এমন বন্দোবস্ত বিধাতা করেন নি, হিন্দুর সত্যিকারের শাস্ত্রও করে নি। জীবনের এক এক অবস্থায় এক একটা গুণ অপরিহার্য—কোনো সময়ে সত্ত্বগুণ নিশ্চয়ই একান্ত অপরিহার্য, কোনো সময়ে রজোগুণ, কোনো সময়ে তমোগুণ। কেবল তাই নয়, প্রত্যেক মানুষেরই প্রতিটি গুণ কমবেশী প্রয়োজন আছেই, কেননা জীবনটা একটা সমগ্র বস্তু। এই ভাবে দেখতে পারলে এবং জন্মগত গুণাধিকারত্ব মেনে না নিলেই শুধু গুণ-কৌলীন্য ও তার কুফল থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

পল্লীর সমাজ তথা হিন্দুর সমাজকে যদি সুস্থ করতে হয় তাহালে তার অর্থনীতির পরিবর্তন, গুণ ও কুল-কৌলীন্যের অত্যাচার দূর করবার শাস্ত্র যেমন দরকার, তেমনি তার সমাজে নারীর স্থান সম্বন্ধে পুনর্বিচার করার প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ বিধাতাকে একদিন প্রশ্ন করলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবারে কেন নাহি দিবে অধিকার, হে বিধাতা'? নারী দেহে দুর্বল, চিত্তে দুর্বল, অর্থে দুর্বল—তার জীবনে যা ঘটে তা তাকে মেনে

নিতেই হয়। সমাজও সেই বিধানই তার জন্য করেছে। নারী যে দেহে দুর্বল, এর মধ্যে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই। সাধারণভাবে বুদ্ধিতেও সে পুরুষের থেকে দুর্ব্বল নিশ্চয়ই। নারী চিত্তে দুর্বল—যত্র তত্র নিজেকে দিয়ে সে বসে আছে, পুরুষের এবং নিজেরও আসক্তিকে ভালবাসা বলে ভুল করতে তার জুড়ি নেই, নিজেকে একবার দিলে ঘটনাচক্রে সেখান থেকে নিজেকে যদি সরিয়ে আনবার প্রয়োজন হয়, নারীর সত্তা তাহালে রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। সাধাবণ নারীর এই-ই পরিচয়। আর নারীর আর্থিক স্বাধীনতা তো নিতান্ত দু' দিনের কথা। শরৎচন্দ্র যখন রমাকে এঁকেছিলেন, তখন সমাজে নারীর যে স্থান ছিল তা নিতান্তই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যহীন চির অধীন একটী জীবের যোগ্য। রমা বিধবা, রমা নিঃসন্তান—রমাকে সারা জীবন তার সমস্ত সত্তার নিষ্পেষনের অভিশাপ গৃহের অন্তরালে বসে গোপনে নিঃশব্দে সহ্য করে যেতে হবে। সমস্ত জীবন ধরে এই ব্যর্থ যৌবনকে বহন করা যে কী, সে কথা বলা যাবে কোন্ ভাষায়? এ-ও মানুষ সইতে পারে যদি তাকে বিরাটের ক্ষেত্রে বিচরণের অবকাশ দেওয়া যায়। কিন্তু সেদিনের নারীর তো —বিশেষতঃ যার সংসার করা ঘুচে গেছে নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে—গৃহ-কোণ ছাড়া আর কোনো স্থান ছিল না। রমার ছোট্ট ঘর ভেঙ্গে গিয়েছিল বলে সে তো সমাজ সেবার বৃহৎ অঙ্গনে নেমে এসে বিরাট ঘরের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবাব সুযোগ পায় নি। ছোট ভাই নিয়ে আর ঐ রকম একজন মাসীকে অভিভাবক করে তাকে দিন কাটাতে হয়েছিল। সব চেয়ে দুর্ভাগ্য এই যে, রমার নিজের মধ্যেও বৃহতের ক্ষেত্রে বিচরণের কোনো আবেদন ছিল না। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা রমার ছিল সে কথাও বলা যায় না, কেননা সম্পত্তির অধিকারিণী হলেও বেণী ঘোষালের পদানুশরণ করে চলা ছাড়া তার কোনো স্বাধীন বিচরণের যোগ্যতা ছিল না। এ হেন নারীর দুঃখের শেষ কোথায়?

আরও আছে। সামাজিক জীবনে রমার কিছুই ছিল না, কিন্তু সে দৈন্যকে ছাপিয়ে ভগবান তাকে আরও দীনতার দুঃখ দিয়েছিলেন। একে তো ব্যক্তিগত জীবন যাপনের বাইরে কোন বৃহত্তর মহত্তর জীবন-চেতনার আদর্শ ভগবান তাকে দেন নি, তদুপরি প্রেমের দরবারেও রমা হয়ে পড়েছিল নিতান্ত সামান্য—ভালবাসার প্রথম সূত্রেই সে ভুল করে বসেছিল। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত নানা কারণে ভারতীয় নারীর জীবন গণ্ডীবদ্ধ হয়ে সীমায়িত

হয়ে পড়েছিল, যেজন্য সাধারণভাবে বলা যায় কেবল ঘরকন্না করা ছাড়া কোন বৃহত্তর আদর্শের বালাই মেয়েদের নেই—একথা রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও প্রকাশ পেয়েছে; কিন্তু প্রেম তো চিরন্তন—সেই চিরন্তন প্রেমের চিরন্তন সম্পদ তো তার থাকলেও পারত। তাই রমার দুঃখের কথা মনে করে হৃদয় স্তব্ধ হয়! রমেশ মনে করিয়ে দিয়েছিল রমাকে প্রেমের দরবারে কোথায় সে দীন হয়ে পড়েছিল। রমেশ বলছে,……'সেদিন আমার কেমন জানিনে, অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল তুমি যা ইচ্ছে বল, যা খুশি কর, কিন্তু আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পারবে না……।' হয়তো উত্তর হবে যে-সমাজে রমা বাস করত সেখানে রমেশের প্রতি কোনো সহানুভূতি দেখান তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু একথা সত্য নয়—রমা আসক্তি বিদ্বেষের দ্বন্দ্বমোহে পড়েই পথ চলেছে, রমেশের সঙ্গে ব্যবহার চালিয়েছে—তার ছিল আক্রোশ। সেইখানে সে অসুন্দর। যে সামাজে সে বাস করত সেখানে রমেশের সঙ্গে তিল মাত্র সম্বন্ধের আভাসও তাকে নরকের ব্যবস্থা দেবে সেটা তো সত্যি কথাই—সে সমাজ যে নরনারীর শুধু একটি মাত্র সম্বন্ধকেই জানে। তথাপি এ কথা সত্যি যে প্রেমের বীর্য থাকলে রমেশের অমঙ্গল না করেও রমা পারত।

হৃদয়বান মানুষ আর যাই-ই করুক, ভালবাসার পাত্রের অমঙ্গল কখনই জ্ঞানতঃ করতে পারে না। সেইখানে সে নিজের হৃদয়ের কাছেই দায়বদ্ধ। হৃদয়ের মধ্য দিয়ে মানুষ যাকে পেল, তার সঙ্গে তার অদ্বৈতসিদ্ধির একত্ব আস্বাদিত হয়ে গেছে। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু এই অদ্বৈতসিদ্ধিকেই সর্ব ঘটে ছড়িয়ে দিয়ে আত্মোপলব্ধির ব্যাপকতা আস্বাদন করে। সাধারণ মানুষ অন্ততঃ দুই-চারটী ক্ষেত্রে এই আত্ম-আস্বাদন যদি না করতে পেল—তবে তার চিত্তের দৈন্য ঘুচবে কি দিয়ে? রমা এইখানে দীন। আর বোধকরি এরই জ্বালায় জ্বলে—না পাওয়ার জ্বালা নয়—তার দেহ মন সবই পুড়ে গেল। তাই রমার জন্য কেবলই বেদনা হয়—দুঃসহ বেদনা। জীবনটাকে বড় করে দেখবার কোন শিক্ষা বা ক্ষেত্র সেদিনকার সমাজে ছিল না—আবার প্রেমের দরবারেও সে হয়ে গেলো সামান্য—অন্তরের মধ্যেও তার কোন আদর্শ-বোধ ছিল না—তাই তার জন্য একটা দুঃসহ বেদনায় বুক ভরে ওঠে। হিন্দুর সমাজে এমনি কত নারীর ব্যর্থ জীবনের হাহাকার শূন্যে মিলিয়ে গেছে, কে তার হিসাব রেখেছে?

তখনকার দিনে রমার মত ব্যর্থ একটী নারী-জীবনের যে একমাত্র পথ খোলা ছিল তা কাশী গিয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে পড়ে থাকা। শরৎচন্দ্রও রমাকে দিয়ে তাই-ই করিয়েছেন। রমেশের মধ্যে সমাজ সেবার এক আকুতি এনে দিয়ে তদানীন্তন সমাজের সঙ্গে তাকে পর্যন্ত খাপ খাওয়ানো যায় নি সেদিন—আর একটী নারীর মধ্যে সে আদর্শ দেখাতে গেলে লেখককে কত নাস্তানাবুদই না হতে হত। কিন্তু আজকের দিন হলে রমাকে সর্বতোভাবে ব্যর্থ হতে হতো না। কেননা ভারতীয় সমাজ যদিও রাষ্ট্র-ক্ষেত্র থেকে পরিচালিত হয় নি, অধ্যাত্ম সাধনার রকমফের দিয়ে সমাজ-ব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে, এবং আজও কমবেশী তাই হতে হবে, তথাপি সামাজিকভাবে হিন্দুর শাস্ত্র দিয়ে নারীর স্বাধীনতা ঘোষিত না হলেও রাষ্ট্রক্ষেত্র থেকে তা ঘোষিত হয়েছে এবং বর্তমান আবেষ্টন নারীকে তার ভাগ্য নির্ধারণ করার কমবেশী সুযোগ দিয়েছে। তবে দীর্ঘ কালের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া নারীর যে রূপ আজকের সমাজে আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে সৌন্দর্যের থেকে অসৌন্দর্যই বেশী সন্দেহ নেই, তবু নিশ্চয় আশা করব পুরুষের উপর একান্তভাবে নির্ভর না করে চলতে না পারার এবং পুরুষকে অপমান করবার এই উভয়বিধ ক্লীবত্ব থেকে একদিন নারী সত্যিকারের মুক্তি পাবে এবং সেইদিন পুরুষের পাশে আত্মসম্মান নিয়ে, প্রেমের বীর্য নিয়ে সে দাঁড়াতে পারবে। সেইদিনের অপেক্ষায় আছি।

রমার সে উপায় ছিল না। দুটি নবনারী হয় ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সংসার করবে, নয়তো আর কিছুই করবে না—এই-ই ছিল এতদিনকার কথা। কিন্তু পারস্পরিক প্রীতি নিয়ে দুজনে সমাজসেবায়, দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ করবে সে কি আজও হতে পারে না? হওয়া তো উচিত। ব্যক্তিগত জীবন যদি কারো শেষ হয়েই যায়, তার আর কোন জীবনই কি থাকতে পারবে না? নারী নারী হয়েও যখন মানুষ, পুরুষ পুরুষ হয়েও যখন মানুষ এবং সমাজ বলে, দেশ বলে একটা সত্য বস্তু যখন আছে, তখন না পারলে চলবে কেন? তাই সেদিনের রমার কাছে পথ ছিল না, কিন্তু আজকের দিনের রমার কাছে পথ আছে।

পথ আছে বটে কিন্তু সেদিন রমা রমেশকে কিংবা তার সংসারকেই যে ভাবে দেখেছিল, সে ভাবে দেখলে চলবে না। এ কথা সকলের পক্ষেই সত্য কথা, সেদিনও, আজও। নিজেকে নিঃশেষে একস্থানে দিতে সকলকেই হয়,

পুরুষকেও দিতে হয়, নারীকেও হয়। কিন্তু এই সংসারের বস্তু-বিজ্ঞান আমাদের বলে দিচ্ছে নিজেকে নিঃশেষে দেবে, অথচ দিয়েও নিজে অব্যয় থাকবে। ঋষি যখন উচ্চারণ করলেন

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

তখন তিনি সেটা কেবল ব্রহ্ম-পুরুষোত্তম সম্বন্ধে বলেন নি, তাঁরই আনন্দ থেকে জাত এই বিশ্বের সব কিছু সম্বন্ধেই বলেছেন। মানুষও তাঁরই ছাঁচে গড়া—তাই তাঁর তত্ত্বই মানুষেরও চলার পথের তত্ত্ব—অন্ততঃ প্রয়াসের ক্ষেত্রে তাই। তাই নিজেকে দিয়েও নিজের অব্যয় ধর্ম বজায় রাখতে হবে—বস্তুর সঙ্গে সংসারের এই রকমই সম্বন্ধ। এটা চিত্তবৃত্তির একটা সাধনার কথা। প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে বিশ্বের সম্পর্কটা এই রকম। এই আমার বাড়ী-ঘর থেকে স্থাবর অস্থাবর বস্তু বা আমার মা-বাবা-ভাইবোন স্বামী-পুত্র-বন্ধু অথবা যা কিছু সবই তত্ত্বের ক্ষেত্রে বস্তুপদবাচ্য। এই বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধের সূত্রটা হচ্ছে—তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই—দুটো একসঙ্গে সত্য। সেইখানে বস্তুকে আমি অতিক্রম করে যাই। আমার সঙ্গে যে লক্ষকোটী বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ—কোন একটাতে তো আমি নেই। তাহালেই আমার সেই আমি ছড়িয়ে পড়ল বিশ্বে, গিয়ে পৌছল বিশ্বেশ্বরে। এতখানি করে না দেখলে মানুষের সবটুকু পরিচয় মেলে না। তাই এই দিক দিয়ে সেদিনের রমা যে ব্যর্থতা বহন করেছে, তার খানিকটা যেমন সামাজিক নিপীড়ন হওয়ায় তা দূর করতে হবে, তেমনি তার যে বাকিটা ব্যক্তিগত চলার পথের সাধনার কথা সে সাধনার খবরে আজ দরকার হয়েছে। নইলে আজকের দিনের রমার কি ব্যর্থতা নেই? আজ তো নারীর আথিক স্বাধীনতা হয়েছে। এই সেদিন পর্যন্তও একটী পুরুষ মানুষকে—নিতান্ত ঠেকলে সে পুরুষটীর বয়স তিনচার বৎসর হলেও চলবে—সঙ্গে না নিয়ে রমার দল বাইরে বেরোতে পারত না, কাহিনীর রমাকেও রমেশের ওখানে যেতে হয়েছিল তার ছোটভাইর পাহারায়—তাও সমাজ রেহাই দেয় নি! কিন্তু আজ তো তার দরকার নেই, আজ তো কত স্বাধীনতা কত সুযোগ সুবিধা হয়ে গেছে। তবু আজকের রমা বলুক তো সত্য করে অন্তরে সে মুক্তি পেয়েছে কি না, মুক্তি পেয়েছে কি না সে ভালবেসে? না, পায় নি—সেদিন বেশীর ভাগ দোষটা ছিল সমাজের,

ব্যক্তিগত চলার পথের দোষের কথা তোলবার প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু আজ হয়েছে। আজ দোষ আবেষ্টনগত স্বাধীনতার মধ্যে এবং বস্তু-বিশ্বের মধ্যে চলতে হয় কোন্ সাধনা নিয়ে, চিত্তবৃত্তির সেই শিক্ষাদীক্ষা না থাকার মধ্যে। সেদিনের রমা দুই দিক দিয়ে পিষ্ট হয়েছে, বর্তমান বিশ্বের সাইকোলজিকাল জীবনে আজকের আমরা নিজের মধ্যে নিজে পিষ্ট হচ্ছি। তাই বলি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাই শান্তির শেষ কথা নয়—যদিও মস্ত বড় কথা। দুনিয়ার মজুরের জন্য, নিপীড়িত নারীর জন্য আবেষ্টনিক সে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বলা যেতে পারে মার্কসীয় দর্শন এনে দিয়েছে, তার পরের শান্তির দর্শন দেবে আবার ভারতবর্ষ তার পুরুষোত্তম স্তরের দিব্য জীবন থেকে। নরনারী নির্বিশেষে এইটেই আজ সকলের সাধ্য।

তাহালে সেদিনের হিন্দুসমাজে ব্যর্থ রমা আজ ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে কি করে সার্থক হতে পারে, তার হিসেব নিয়ে দেখা গেল। ভরসা রাখব আজকের রমা প্রেমের ক্ষেত্রে সার্থক হবে, ব্যক্তিগত পরিচ্ছিন্নতার মধ্যেই নিজেকে নিঃশেষ করে না দিয়ে সমাজ-সেবার, বিশ্ব-সেবার আঙিনায় নিজেকে ব্যাপৃত করে সার্থক হবে। সার্থকতার রূপ আজ চোখে তেমন পড়ছে না, কিন্তু সার্থকতার পথের আভাস আকাশে বাতাসে ভেসে এসেছে।

আর রমেশ? রমেশও সেদিনের সমাজে বেখাপ। তার চিত্তবৃত্তি সাধারণ আর দশটা মানুষের মত নয়। নিজের ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে সামাজিক সমস্যাগুলি তার চিত্তে অধিকতর জাগ্রত। এ ক্ষেত্রে প্রথম পথিক হিসাবে চলার পথে কিছু ভুল তার হয়েছিল। সে ভুলের কথা আমরা আলোচনা করেছি। ভুলের শাস্তিও রমেশ পেয়েছে। মানুষের এমনকি রমার পর্যন্ত ক্ষুদ্রতা তাকে পাগল করে তুলেছে—সে একা পথ চলেছে! এমন ছেলের দরকার ছিল—আজও আছে। রমেশের কেবল ছিল বিশ্বেশ্বরীর স্নেহাশীর্বাদ—শেষপর্যন্ত তিনিও তাঁকে ছেড়ে গেলেন, আর গেলো রমাও। তবে সে বাঁচবে কি নিয়ে? সে তো সামাজিক মানুষ—সে তো ভগবানের নামে নিজেকে উৎসর্গ করে সমাজসেবা আরম্ভ করেনি—সামাজিক মানুষ হয়ে স্বভাবতঃই সমাজ তার কাছে বেশী জাগ্রত ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত লেখক তাঁর বাঁচবার রসটুকু জুগিয়ে দিয়েছেন—বিশ্বেশ্বরীর মুখ দিয়ে তাঁকে শুনিয়েছেন যে রমা তাকে ভালবাসে। ব্যস্, ঐ আবেষ্টনে ঐটুকুই যথেষ্ট। এর থেকে বেশী রমেশের হিসেবে মিলতে পারে না। রমা যদি তার সঙ্গে সমাজ সেবার কাজে লাগত,

তাহালে উভয় দিকেরই চরিতার্থতা হোত এটা কল্পনা। সেদিন তা সম্ভব ছিল না। ভরসা রাখব আজ যেন সম্ভব হয়।

হিন্দুর সমাজের যে সমস্যাগুলি সেদিনের পল্লীসমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে, তার কতকগুলি সামাজিক, কতকগুলি ব্যক্তিগত আর কতকগুলি নূতন যুগের আদর্শ নিয়ে মনস্তত্ত্বগত। সামাজিক সমস্যাগুলি দূর করা যেমন কর্তব্য, ব্যক্তিগত সমস্যাগুলিও দূর করার সাধনা নেওয়া দরকার—নইলেও সমাজ অচল হয়। ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে চরিত্রবান করে তোলা কঠিন বটে এবং এ সমস্যাটা চিরন্তনও বটে, তবু চেষ্টা না করে উপায় নেই। অপরকে ঠকিয়ে নিজের দু পয়সা করে নেওয়ার মনোবৃত্তি ব্যক্তিগত চরিত্রদোষ হলেও এবং চিরদিন মানুষের সমাজে এমন লোক থাকলেও চেষ্টা করতে হবে মানুষের এ স্বভাব যাতে সামাজিক জীবনকে পর্যুদস্ত না করে দেয়। নিজের স্বার্থছাড়া কোন মানুষ কোন ঘটনা ঘটায় না—সংসারে এইটেই সাধারণ সত্য কথা, তথাপি কাহিনীর রমেশের মত লোকও যে আছে সে কথা যখন সত্য তখন আমারো জীবনের অন্ততঃ কিছু যেন কেবল আমার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার বাইরের কাজ হয়, এ সাধনাও প্রতি মানুষেই যাতে নেয়—সে প্রয়াসও যুক্তি-যুক্ত। মানুষ একই সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষ ও বিশ্ব-মানুষ—এ কথাটা মনে রেখেই আজকের মানুষের চলার পথ ঠিক করতে হবে। কোন মানুষই শুধু ব্যক্তিই নয়, আবার সবটুকু তার শুধু সমাজও নয়। সবটুকু তার সব কিছুর অতীতও নয়।

শরৎচন্দ্র সেদিনকার সমস্যা নিয়ে যে চিত্র এঁকে রেখে গেছেন, তার মধ্য দিয়ে আজকের দিনের আমাদের কাছে অনেক ঘটনাই সামনে এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্নের জবাব চাইছে। আজকের জীবন-চেতনা বিশেষ যুগের হলেও তাকে যতটা বেশী সম্ভব চিরন্তন কালের পটভূমিকায় দাঁড় করিয়ে দেখতে হবে। কেননা অতীতের অনেক অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে, আমাদের সামনে মুক্ত বিশ্বের মুক্ত মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-যাপনের পরিকল্পনা। মানুষ ব্যক্তিগত ভাবে সার্থক হয়ে পরিবারগত, সমাজগত সার্থক জীবনের অধিকারী হোক, ক্রান্তদর্শী শরৎচন্দ্র তারই ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর পল্লীসমাজ শেষ করেছেন। এর পরের পথরেখা ও জীবনচিত্র রচনা করে তোলবার ভার পরবর্তীয়দের উপর, আমাদের উপর।

ব্রহ্মসূত্রম্

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(২১)

অনুবন্ধাদি হইতে (শরণাগতিসাধনার আরম্ভ হইলে শরণাগত ভক্তের) সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে প্রজ্ঞান্তরের পৃথকত্বের অনুরূপ দৃষ্টি লাভ হয়; (এই নিমিত্তই বেদে কামক্রতু অনুসারে) ফলভেদ উক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির অনুবন্ধ (উপক্রম) কাম; 'সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম্ অসৃজত। যদিদং কিঞ্চ।' অনুবন্ধ কাম হইতেছে আদি যাহাদের, তাহারাই অনুবন্ধাদি। অনুবন্ধ কাম আদি, তৎপরে জ্ঞানময়ী তপস্যা, তৎপরে সৃষ্টি। কামই সৃষ্টির সূত্ররূপে অনুবৃত্ত, সেজন্যও কাম অনুবন্ধ। অনুবন্ধ এই কাম ও তপস্যা হইতে যে শরণাগতদের সাধনার আরম্ভ, তাহাদের যিরূপ জ্ঞানদৃষ্টি লাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন—'প্রজ্ঞান্তর পৃথকত্ববদ্ দৃষ্টিঃ'—প্রজ্ঞান্তরের পৃথকত্বের মত দৃষ্টি তাহার লাভ হয়। প্রজ্ঞান্তর শব্দের অর্থ অভিজ্ঞান। পূর্ব্ব জ্ঞাতের পুনরায় জ্ঞানই অভিজ্ঞান। যেমন 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'। কাম-পূরণই জীবের নূতন সাধনায় নূতন সৃষ্টির প্রকাশ; ইহাই New Jerusalem বা নববৃন্দাবনতত্ত্ব।

ভগবৎকামেই শরণাগতদের সাধনের অনুবন্ধ; তাহাদের জ্ঞান অভিজ্ঞানই, 'পূর্ব্বজ্ঞাতজ্ঞানম্'। যাহাকে না জানিয়া শুনিয়া এত দিন আলিঙ্গন করিয়াছি, আজ ব্রহ্মকামনায় আত্মকাম সমর্পণ করিয়া নূতন সামর্থ্য দ্বারা নূতন সৃষ্টির রচনা করিব। জ্ঞানের অভিজ্ঞান ব্রহ্মকর্ম্মপূর্ব্ব। উপাসনাকে যাহারা কেবলমাত্র 'মানস' বলিতে চান, তাহাদের অসম্পূর্ণতা প্রদর্শনই এই সূত্রের একটী প্রয়োজন। মানসপূজা ও বাহ্যপূজার এরূপ একটা ব্যবধান রচনা করাতেই প্রকৃতির ক্ষেত্র জটিল হইতে জটিলতর। বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, কর্ম্ম ও অগ্নিদ্বারা চয়ন—creation—দ্বারাই জগৎকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। বাহ্যহীন একান্ত মানস কল্পনামাত্র, স্বপ্নময়। মন ও দেহের শক্তি যখন পরস্পর পরস্পরের সহিত আলিঙ্গনাবদ্ধ হইতে না পারে তখনই মল বা স্বর্গ নরক সৃষ্টি। জ্ঞান কামের সহিত সমন্বিত হইয়াই কর্ম্মময় অভিজ্ঞান, এই অভিজ্ঞানই

প্রজ্ঞান্তর হইয়া পৃথকের মতন। তপস্যাই জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয়; জ্ঞানময়ী ও কামময়ী তপঃ শক্তিই ভগবানের নূতন সৃষ্টির অনুবন্ধ। কেবল জ্ঞান বা কেবল কর্ম্ম জগৎ সৃজন করিতে পারে না, যেমন কেবল পুরুষ বা কেবল প্রকৃতি সৃষ্টি-রচনায় অযোগ্য। 'Genius is barren' খুবই সত্য কথা যদি তাহা কামমূল না হয়। জ্ঞানতপস্যা কামপূর্ব্বা হইলেই সৃষ্টিব্যাপার সঙ্ঘটনা। রসবস্তু প্রকাশ হইতে গিয়াই এক অর্দ্ধ জ্ঞান ও অপরার্দ্ধ কর্ম্মরূপে ফুটিয়া উঠিবে। কর্ম্মের জন্য জ্ঞান বা জ্ঞানের জন্য কর্ম্ম, ইহার কোনটীই একমাত্র সত্য নহে। কাম অনুবন্ধে জ্ঞানই প্রজ্ঞান্তর অভিজ্ঞার মতন স্বতন্ত্র বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্ব দর্শন তরল, পর দর্শন ঘন। ব্রহ্মও এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞানের বৈচিত্র্যানুযায়ী রূপটী প্রকট করেন। জ্ঞান—ব্রহ্ম, অভিজ্ঞান—অবতার। অবতার কর্ম্মযোগজ্ঞানভক্তি-শিল্পবিজ্ঞানঘন পূর্ণ রসাবধৃত দেবতা, ইনিই সুকৃত ও প্রকৃত। 'বাহ্যপূজাধমাধমা' নহে; বাহ্যপূজা ও মানস পূজা সমন্বয়েই প্রকৃত পূর্ণ পূজা, নচেৎ দুই-ই কল্পনা। এই ভাবেই ভগবানের পূজা ও তাঁহার প্রকৃতির পূজা; ভগবানের ও ভক্তের যুগলপূজা সমাজের প্রাণ। কাম প্রেরণায় ব্রহ্ম-ঈশ্বরও দ্বিধা হন, সেই কামে ঝাপ দিয়া ভক্ত অহং ও সর্ব্ব, form ও content হন। বাহ্যপূজাহীন মানস পূজা এবং ভক্তবিহীন ভগবানপূজা ধর্ম্মধ্বজিত্বই।

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দান্ তদীয়ান্ নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥

ভগবান নিজ মুখেই বলিয়াছেন,

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূণাং হৃদয়স্ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যঃ মনাগপি॥

শ্রুতি বলিতেছেন, 'অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়স্তে···যোঽনিষ্ঠস্তন্মনঃ'—অন্নের সূক্ষ্মভাব মন, অন্নহীন মনের মূল্য কি? 'অন্নময়ং হি সৌম্য মন আপোময় প্রাণস্তেজোময়ী বাগিতি'—মানসপূজা অন্নপূজাময়ী—ইহা উপনিষদ তারস্বরে বলিতেছেন, তাই বাহ্যপূজাময়ী মানস পূজা আর্য্যশাস্ত্রে সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে। কেবল চিন্তায় জগৎ হয় নাই, কাম তাহার গোড়ায় ছিল। কাম যাহার বীজ, জ্ঞান সেখানেই কর্ম্মময় অভিজ্ঞান।

একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।

কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীঃ চেতাঃ কেবলঃ নির্গুণশ্চ ॥

এই গূঢ় বস্তুটীকেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ধ্যান ও নির্ম্মন্থনদ্বারাই দর্শন করিতে বলিয়াছেন।

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবং চোত্তরারণিম্।
ধ্যাননির্ম্মন্থনাভ্যাসাদ্দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ ॥
তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিরাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ যত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরং তদ্ব্রহ্মোপনিষৎপরং ॥

ব্রহ্ম স্থষ্টির মাঝে Lost sheep; তাহার টানে তাঁহাকে প্রগাঢ় ধ্যান সহায়ে কর্ম্মশক্তির তুমুল আলোড়ন তুলিয়া সংসার হইতে ছাকিয়া তুলিতে হইবে। চাই বাহিরের অরণিস্বরূপ স্বদেহ ও উত্তরারণিস্বরূপ অন্তরের ধ্যানের নির্মন্থন। তিলে যেমন তৈল আছে, দধিতে যেমন মাখন আছে, তেমনি সারা স্থষ্টির মাঝে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম। তাঁহাকে শুধু মন্থন করিয়া জমাইয়া তুলিতে হইবে। ইনিই 'বাক্‌চিতঃ প্রাণচিতঃ চক্ষুশ্চিতঃ শ্রোত্রচিতঃ কর্ম্মচিতঃ অগ্নিচিতঃ' প্রাণেশ্বর জ্ঞানকর্ম্মশুদ্ধ নির্ম্মল রসময় দেবতা। Creation-ই তপস্যা; ধ্যান তৎপূর্ব্ব, কামরূপেই তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রকট হন। অগ্নিময়ী সর্ব্বেন্দ্রিয়শক্তির ঘনীভবনই ব্রহ্মঘনপ্রতিষ্ঠা। এই নিমিত্তই বেদশাস্ত্রে সর্ব্বত্র কামভেদে, ক্রতুভেদে ভিন্ন ভিন্ন ফলের কথা উক্ত হইয়াছে—সূত্রোক্ত 'তদুক্তম্' পদদ্বারা ইহাই সূচিত হইয়াছে। 'স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।'

ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্ম্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ ॥৩।৩।৫১

সামান্য ভজন হইতেও যে উপলব্ধি স্ফুরিত হয়, তাহার মোচকত্ব নাই, যেমন মৃত্যু। ভাগবতলোকপ্রাপ্তি নিশ্চই হয় না। সামান্য উপলব্ধিতেও সংশয় মোচনের কোন সম্ভাবনাই নাই; সূত্রোক্ত 'অপি' পদদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, একান্ত বিশেষের উপলব্ধিতেও মোচকত্ব নাই। সামান্যের বিশেষাশ্রয় না হওয়া পর্য্যন্ত সামান্যের কোন প্রমাণই নাই। ধ্যানের প্রমাণ নির্ম্মন্থন, সত্যের তপস্যা এবং আত্মবিদ্যারও তপস্যা; ইহাতেই ব্রহ্মও জীবনে

প্রমাণিত হন। ধ্যান ও নির্মন্থনেই ব্রহ্ম প্রকট হন। জ্ঞান সামান্য, কর্ম্ম বিশেষ; কামই জ্ঞানকর্ম্মের সমন্বয় বিধাতা। ব্যষ্টিবিহীন সমষ্টি শূন্যগর্ভ, ফাঁপা; ইহার নিদর্শন কোথায় তাহাই বলিতেছেন—মৃত্যুবৎ। সামান্য নিদ্রা জাগরণে প্রমাণীকৃত, সামান্য মৃত্যুও জীবনেই বিশিষ্টতা-বিধাতা। মৃত্যুতে সকলেই সমান, কাহার কোন্ বিশেষত্ব তাহা ধরা যায় না। জীবনই বিশিষ্টের খেলা খেলিয়া মরণের সামান্যভাবকে ঘন করিয়া বুঝাইয়া দেয়। জীবন সামান্য ও বিশেষের সমন্বয় ছাড়া কেবল সামান্য বা কেবল বিশেষ নহে। ব্রহ্মের সামান্য মূর্ত্তিই যাহারা ধরিতে চান, তাহাদের ভাগবত-লোকপ্রাপ্তি হয় না, তাঁহারা লোক-প্রতিষ্ঠা না করিয়া মৃত্যু-প্রতিষ্ঠাই করিবেন। তাই সূত্রকার বলিতেছেন, 'ন হি লোকাপত্তিঃ'। মৃত্যু আর তাঁহাদের নচিকেতার মত ব্রহ্মজ্ঞানদাতা গুরু নহেন। সামান্য ভাবে লোকসৃষ্টি হয় না; তাই ব্রহ্মা ব্যাকুল হইয়া ভগবানের শরণ লইয়াছিলেন। তপস্যাদ্বারা যুগের বিশেষ ভাবটী তাঁহার প্রাণে স্ফুরণ হইলে পরই তবে সৃষ্টিকার্যে সক্ষম হইলেন। বৈচিত্র্যহীন সামান্য ভাব মৃতের, জীবিতের নহে। বিচিত্রতা ধ্বংস করিয়া যে একীকরণ তাহা মৃত্যুই।

সামান্য ও বিশেষের সমন্বয়ই অলোক লোকাপত্তি। যাহারা কেবল সামান্য ভাবেই ভগবানের নাম ও রূপের পূজা করেন, তাহারা মুক্তি পান না, কেবল চন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ভোগ লাভে সমর্থ হন। অবতারের ভাববিহীন সামান্য দর্শনেও উৎকৃষ্ট ফল লাভ হইয়া থাকে। সামান্যদর্শনাৎ লোকা মুক্তির্যোগ্যাত্মদর্শনাদিতি—নারায়ণতন্ত্র।

এখানে সংশয় হইতেছে যে, ভক্তের যদি ভগবান না হইলে চলে না বলিয়া সে ভজনা করে অথচ ভক্ত না হইলেও ভগবানের চলে বলিয়া ভগবান ভজন সম্বন্ধে একান্ত উদাসীনই রহিতেছেন, তাহা হইলে ভক্তের দিক হইতে এই একতরফা ভজনের ফলে তাহার একান্ত গৌণত্ব, একান্ত দাসত্ব, ভগবানের একান্ত অঙ্গত্ব, একান্ত ব্যবহারিকত্বই ফুটিয়া উঠিবে; তাহা হইলে ভক্তের আর কোনও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কথাই উঠিতে পারে না। ইহারই মীমাংসার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইয়াছে।

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যে ভূয়স্ত্বাৎ ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৩।৩।৫২

শ্রুত্যুক্ত বরণ শব্দের পর বাক্যদ্বারা এবং বাক্যান্তর দ্বারা ভজনবিধতাই

(অবগত হওয়া যাইতেছে); (ভগবানের বরণেই যে ভজনের) অনুবন্ধ, নিশ্চয়ই ইহার ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিদর্শন রহিয়াছে।

মুণ্ডক ও কঠ উপনিষৎ শুনাইতেছেন—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
　　ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
　　স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

এই মন্ত্রে পুরুষোত্তমের বরণের কথা বলা হইয়াছে। যাহাকে তিনি বরণ করেন তাহাদ্বারাই তিনি লভ্য হন, তাহার কাছেই তিনি স্বতনু বরণ করেন। পুরুষোত্তমের এই বরণেই ভক্তের ভজনার অনুবন্ধ। তিনি যখন ভক্তকে চান, তখনই ভক্তের চাওয়ার সার্থকতা আছে, মূল্যও হয়। একান্ত উদাসীন পুরুষকে চাওয়ার মধ্যে রহিয়াছে নিজেরই শুধু দীনতা। তিনি আমাকে চান না, আমি তাঁহাকে চাই, আমাকে না হইলেও তাঁহার চলে, অথচ তাঁহাকে না হইলে আমার চলে না—কি দৈন্য আমার! ভজনে এই দৈন্য নাই। ভজনে দুই-ই সমভাবে দুইয়ের ভজনা করেন।

পুরুষোত্তম আগে বাঁশী বাজান, নাম ধরিয়া ডাকেন, তাই না ভক্তের হৃদয়ে ভজনের স্ফুরণ হয়? ভগবানের বরণ ভক্তের ভজনেরই অনুরূপ; তাই সূত্রকার বলিলেন, 'তাদ্বিধাম্'—ভগবানের বরণে ভক্ত-ভজনবিধাতা রহিয়াছে। ভগবানের বরণই ভক্তের ভজনরূপে প্রকাশিত হয়; ভগবানের বরণ ও ভক্তের ভজন দুই মিলিয়া এক অখণ্ড ভজন। বরণের এই ভজন-বিধাতা পরের অর্থাৎ পরবাক্যদ্বারাই অবগত হওয়া যাইতেছে। 'নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ। নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ' ॥ কঠ—২।১।৫৩। মুণ্ডকও বলিয়াছেন

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
　　ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং
　　স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥ ৩।২।৪

একান্ত ঈশ্বর বা একান্ত জীব কেহই কাহাকে পাইবেন না; দুইয়ের বুকে যখন দুইকেই পাইবার 'কাম' জাগ্রত হইবে, তখনই হইবে 'পাওয়া'। ভগবান বরণ করিলেন, ভক্ত সেই বরণে সাড়া দিল না, তখন বরণ হয়

ব্যর্থ। তখন ভগবান হন ঈশ্বর, ভক্ত হন জীবপদবাচ্য। ভজনার যেখানে অন্যোন্যভাব, তখনই জীব হন ভক্ত, ঈশ্বর হন ভগবান। ভগবান বরণ করেন, ভক্ত সেই বরণকে নিজ জীবনে 'এতৈরুপায়ৈঃ' বরিয়া লইবার জন্য যখন 'যততে', তখনই হয় তাহার ব্রহ্মধামে প্রবেশ। ভগবানের বরণে সাড়া দিলেই তবে দুশ্চরিত হইতে বিরত হওয়া সম্ভব, শান্ত সমাহিত হওয়া সহজ, তখনই মনের শান্তি লাভ বাস্তব। বরণকে বরণ না করিলে একান্ত প্রজ্ঞান-দ্বারা কি হইবে? বরণকে বরণ করাতেই ভক্তের সত্য বাস্তব বল; এই বল না থাকিলে শত সহস্র বৎসরের উপাসনায়ও তিনি লভ্য হন না। এই বরণ সম্বন্ধে প্রমাদ কিম্বা বরণ-লিঙ্গহীন তপস্যা দ্বারাও তিনি লভ্য হন না। চাই সর্ব্বাগ্রে সাধনার উপক্রমে তাঁহার বরণকে বরণ করিয়া লওয়া। নিশ্চয়ই ভগবানের বরণেই ভক্তের যাত্রার অনুবন্ধ এবং শ্রুতিতে সর্ব্বত্র ভূয়ঃ ভূয়ঃ এই অনুবন্ধের উল্লেখ রহিয়াছে; সূত্রকার তাই বলিলেন, 'ভূয়স্ত্বাৎ তু অনুবন্ধঃ'। ভজনের ভিতর দিয়া ভক্ত ঈশ্বর ও জগৎকে সৃষ্টি করিবে। এই সৃষ্টির অনুবন্ধস্বরূপ শ্রুতি বহুবার 'সদেব সৌম্য ইদম্ অগ্র আসীৎ', 'স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত' বলিয়াছেন। এই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার দ্বারাই তিনি জীবকে বরণ করিতেছেন। জীবের যদি সৃষ্টি করিতে হয়, তাহাকেও পুরু-ষোত্তমে আত্মসমর্পণ করিয়া এই সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে নিজ জীবনে বরণ করিয়া লইয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্যে সম অংশীদার হইতে হইবে। ভক্তকে সৃষ্টি কৌশলের ইঙ্গিত দিবার জন্য সমস্ত শ্রুতি স্মৃতি বারবার সৃষ্টি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। যে সৃষ্টির মধ্যে আমি থাকিব না, যাহা আমার ঘাড়ে শুধু চাপাইয়া দেওয়া একটা বোঝা, তাহার কথা বারবার জীবকে শুনাইয়া শ্রুতিমাতার কি আনন্দ? সব কিছুর সৃষ্টির অনুবন্ধ পুরুষোত্তম, সেই অনু-বন্ধে অনুবন্ধী হওয়াই ভজনের গূঢ় রহস্য। ভক্তের ভজনা ভগবানের বরণেরই প্রকাশভেদ মাত্র।

বর্ত্তমান ভজনের মধ্যে শরীর ও আত্মা এমনভাবে ব্যতিরেকে ও অব্যতিরেকে দুই দুইয়ের মাঝে জড়াইয়া পড়িয়াছে যে, কোনও একটীকেই একান্তভাবে ধরিয়া না চলিবে সাধনা, না মিলিবে সিদ্ধি। কাজেই এই-খানে শরীর ও আত্মা সম্বন্ধে একটী স্পষ্ট ধারণা দিবার জন্য (যাহা পূর্ব্বে কখনও এমন স্পষ্টভাবে দেওয়া হয় নাই) পরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়ের অবতারণা করা হইতেছে।

এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ৩।৩।৫৩

শরীরে আত্মার ভাব (আশ্রয় করিয়া অনেক) এক সম্প্রদায় (প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।)

শরীরে আত্মার ভাব রহিয়াছে, স্থিতি রহিয়াছে, প্রেম রহিয়াছে— এই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে অনেক সম্প্রদায় অনেকরূপে ব্যাখ্যা দিয়াছেন। লোকায়তিকগণ দেহমাত্রকেই আত্মা বলিয়া দর্শন করেন, দেহব্যতিরিক্ত কোনও আত্মার অভাব তাহাদের সম্মত, সমস্ত ও ব্যস্ত পৃথিব্যাদিতে অদৃষ্ট চৈতন্যকে শরীরাকার পরিণত ভূত সমূহের মধ্যে থাকিবার সম্ভাবনা মনে করিয়া সেই সমস্ত ভূত সমূহ হইতে মদশক্তির মত বিজ্ঞান চৈতন্যের স্ফুরণ ব্যাখ্যা করেন এবং চৈতন্য বিশিষ্ট কায়কেই পুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। ইহারা জীবদ্দশার ভোগকেই চরম সুখ মনে করেন, দেহত্যাগকেই মুক্তি বলেন। স্বর্গাপবর্গ গমনে সমর্থ আত্মা বলিয়া কিছু আছে, ইহারা স্বীকার করেন না। অপর এক ভাবুক সম্প্রদায় শরীরে আত্মার ভাবকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিয়া শরীর হইতে আত্মার বিবেক দর্শন করিয়া কৈবল্য লাভে তৎপর, অপর অদ্বৈতবাদীও শরীরকে অধ্যাস মনে করিয়া একান্ত আত্ম-জ্ঞান লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। কাহারও মুক্তিতে দেহ নাই। লোকায়তিকের দেহত্যাগ হয় প্রাকৃতিক নিয়মে, কৈবল্যবাদীদের মুক্তি হয় জ্ঞানপূর্ব্বক দেহ সম্বন্ধ ছিন্ন করাতে, দেহ সম্বন্ধে বিকল্পজ্ঞান দূরীভূত হওয়ায়। দেহ সম্বন্ধ কাহারও মুক্তিতেই নাই। অবশ্য মুক্তির পরও প্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত মুক্তের দেহ অদ্বৈতবাদী স্বীকার করেন। প্রচলিত ভক্তিবাদীগণও অপ্রাকৃত শরীর মানিয়া লইয়া মুক্তিকে এই দেহের ওপারে রাখিয়াছেন, অথচ এই দেহ ও ভাগবত দেহের মাঝে সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তাঁহারা মনে করেন। ভাগবতী তনু অপ্রাকৃত অচিন্ত্য; 'ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ'। দেহ-ব্যতিরিক্ত আত্মবাদী সব দলই নোংড়া দেহের ওপারে মুক্তিকে রাখিয়া দেহের কোনও না কোন অংশে আত্মার ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর, উর্দ্ধতম গ্রামে উপনীত হইয়া পরম পুরুষকে পাইতে হয় বলিয়া সাধনার একটী সিঁড়ির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং সাধনার স্তরসমূহকে এমনভাবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন যে, কাহারও সাধনা কাহারও হইবার যো নাই। অথচ সিদ্ধি নাকি সকলেরই এক। সাধনা আরম্ভ করিতে হইলে দেহের কোনও না কোন অংশ অবলম্বনে আরম্ভ করিতেই হইবে, স্তরের

পর স্তরও আসিবে। কিন্তু উহার মধ্যে উচ্চাবচ, সন্নিকর্ষ-বিপ্রকর্ষ স্থাপন বর্ত্তমান ভজন করে না। উচ্চ-অবচ-ভাব আনয়ন করার ফলে দেহই শেষে বাদ পড়িয়া যায়, দেহহীন আত্মাই অবশেষ থাকেন। অবশ্য ভক্তগণ সেইখানে একটী অপ্রাকৃত সবিশেষ দেহবান ভগবান স্বীকার করেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী নির্ব্বিশেষই বলেন। শরীরের অংশ অবলম্বনে ভজনার উপদেশ শাস্ত্র দিয়াছেন। 'উদরং ব্রহ্মেতি শার্করাক্ষ্যা উপাসতে হৃদয়ং ব্রহ্মেতি আরুণয়ো ব্রহ্মা হ বৈ তা ঊর্দ্ধ্বত্বে চোদসর্পৎ তচ্ছিরোঽশ্রয়ত তচ্ছিরোঽভবৎ তচ্ছিরসঃ শিবত্বমিত্যাদি।' পুরুষোত্তম-স্তরে ইহার মীমাংসা কিরূপ হইবে, তাহারই জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥৩।৩।৫৪

(কাহারও সিদ্ধান্তই) একান্ত সত্যও নয়, একান্ত অসত্যও নয়; তদ্ভাবাভাবিত্ববশতঃ (পুরুষোত্তম) ব্যতিরেক ; উপলব্ধিবৎ ইহা নিশ্চিত সত্য।

লোকায়তিকের 'শরীর সত্য' এই দাবী সত্য, কিন্তু যেখানে অতিদেশ দ্বারা আত্মার ক্ষেত্রের ঘটনাবলী শরীর দ্বারাই ব্যাখ্যা দিতে চাহিতেছে, সেখানেই সে হাস্যাস্পদ হইতেছে। একান্ত আত্মবাদীদের 'আত্মা সত্য' এই দাবীও সত্য, কিন্তু আত্মার অতিদেশদ্বারা যেখানে জড়ের দেশের ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তাহাদিগকে ব্যবহারিক সত্যরূপে প্রমাণিত করিতে চাহিতেছে, পুরুষোত্তম দৃষ্টিতে সেখানেই সে হাস্যাস্পদ হইয়াছে। পুরুষোত্তম ও তাঁহার সাধনা শরীর ও আত্মার, সর্ব্বভূত ও আত্মার ব্যতিরেক। ইহা 'সর্ব্বভূতেষু চাত্মানম্' এবং 'সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি' এই শ্রুতিমন্ত্র দ্বয়ের মধ্যে সর্ব্বভূত ও আত্মাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিবার মধ্য দিয়া ব্যতিরেকই ব্যক্ত হইয়াছে। এই ব্যতিরেকের প্রমাণস্বরূপ বলিতেছেন 'তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ'। পুরুষোত্তমে সর্ব্বভূতের একান্ত আত্মভাবভাবিত্ব বা আত্মার সর্ব্বভূতভাবভাবিত্ব নাই। পুরুষোত্তম দৃষ্টিতে আত্মা ও সর্ব্বভূত পরস্পরের পরকীয়; আত্মভাবভাবিত সর্ব্বভূতের ও সর্ব্বভূতভাবভাবিত আত্মার কাছে পুরুষোত্তম পরকীয়। 'যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহম্ অক্ষরাদপি চোত্তমঃ। অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ।' আত্মা পুরুষোত্তমের বিভূতি।

ক্রমশঃ

পুস্তক সমালোচনা

বেশ কিছু দিন হইল আমরা কয়েকটী পুস্তক সমালোচনার জন্য পাইয়াছি। কিছুদিন হইল আমাদের নানা হাঙ্গামার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে বলিয়া কিছুতেই সেগুলি সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এজন্য আমরা বড় লজ্জিত ও দুঃখিত। আমরা কয়েকটী বইর নাম, লেখকের নাম ইত্যাদি এখানে উদ্ধৃত করিয়া আনন্দের সহিত উহাদের প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। সময়মত উহাদের বিস্তারিত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

১। **প্রণাম তোমায়**—শ্রীশান্তশীল দাশ। প্রকাশক অন্নদা পাবলিশার্স, ৩০।৫৩ আটাপাড়া লেন, কলিকাতা ২। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা তেইশ।

২। **রসায়ন ও সভ্যতা**—শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ। প্রকাশক বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭। মূল্য আট আনা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫৭।

৩। **গান্ধীজী স্মরণে**—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী। প্রকাশক শ্রীযতীন্দ্র কুমার ঘোষ, অধ্যয়ন, ১৪ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচসিকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৭।

৪। **আত্মবাদ**—শ্রীললিতকুমার সেন। প্রকাশক দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ১০৲ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮৭২।

৫। **গীতাজয়ন্তী**—সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী। প্রকাশক রথীন্দ্র গীতা প্রচার প্রতিষ্ঠান, ১ রথীন ব্যানার্জী লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা ৩১। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠা ২০৭।

৬। **গ্রন্থাগার বিজ্ঞান**—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীগোপালদাস মজুমদার, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য দশ টাকা। পৃষ্ঠা ৩৯২।

৭। **আপন দেশ**—শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। প্রকাশক বেঙ্গল পাবলি-

শার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১২। মূল্য দুইটাকা পঞ্চাশ নয়াপয়সা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৩২।

৮। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি—শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। প্রকাশক শ্রীদেব কুমার বসু, ৭ জে পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা ২৯। মূল্য দুই টাকা। পৃষ্ঠা ৬৭।

৯। একতারা—শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক চলতি নাটক নভেল এজেন্সী, ১৪৩ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। মূল্য দুইটাকা। পৃষ্ঠা ১০৫।

১০। একটি প্রসন্ন সুর—শ্রীশান্তশীল দাশ। প্রকাশক শ্রীকল্যাণব্রত দত্ত, তুলি-কলম। ৫৭-এ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য এক টাকা। পৃষ্ঠা ৩১।

নূতন ও পুরাতন আদর্শের সমন্বয়

॥ শ্রীভারতী ॥

বর্ত্তমান কালে মানুষের জীবনের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে যে প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে তাকে প্রাচীন ও নবীনের মত ও পথের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। কি একাল আর কি ওকাল, কি প্রাচীন আর কি নবীন সবকালেই এবং সব চিত্তেই ভাল এবং মন্দ এই দুই ধারা ও ধারণা নিয়ে সংশয় ও সংঘাত চলতে থাকে এবং সেই দ্বন্দ্বের মধ্য থেকেই নিত্য নূতন ভাব ও চিন্তার আবির্ভাব হয়; তবুও পূর্বতন শতাব্দীগুলোতে ঝড় অতটা প্রবল হয়ত ছিল না, কারণ বাইরের জগতে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ এবং নানা পরিবর্ত্তন ঘটতে থাকলেও ভারতের কৃষিকৈন্দ্রিক গ্রামীণ জীবন প্রায় স্থাণু হয়েই থেকেছে। সেই স্থির জলে আলোড়ন ইংরেজ শাসন ও শোষণের অধ্যায় থেকেই সুরু হয়েছিল। গ্রাম থেকে সহুরে জীবনের পত্তনে ও ইংরেজ

জাতির সঙ্গে অনেক ভালো মন্দ বস্তুর অনুপ্রবেশের ফলে সেদিনকার ভারতবর্ষ বেশ একটু জোরের সঙ্গেই নড়ে চড়ে উঠেছিল। পরবর্ত্তীকালে সেই ভূমিকম্পই প্রবলতর হয়ে জাতিকে পরবশতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি এনে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে কালের গতি এসে পৌচেছে স্পূটনিকের যুগে। মানুষের চিন্তা ও জীবনের ধারাও তার সঙ্গে পাল্লা রেখে আজ প্রচণ্ডবেগে ধাবমান। ভালো মন্দ দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই রথ ছুটে চলেছে—সামলানো অসাধ্য।

কেউ কেউ বলছেন, সামলাতে হবেই। পেছনে ফিরে তাকাও, ভারতবর্ষের সেই শান্ত সুন্দর জীবনে ফিরে চল, শান্তি আছে সেই পুরাতন ধর্ম ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ স্থিতিশীল জীবনের মধ্যেই। শুধু ছোটাতে অপঘাত ছাড়া আর কিছুই লাভ নেই।

অপর দল বলছেন—না, জানা এবং শেখার শেষ নেই, আপনাদের শাস্ত্রও তো বলেছে 'চরৈবেতি'; চলা মানেই কি জীবন নয়? স্থিতিশীলতা তো মৃতের শান্তি, নয়তো বদ্ধ জলায় আটকে থেকে কেবলই খাবি খাওয়া।

প্রাচীনেরা প্রশ্ন করেন—কিন্তু চলেছ কোথায়? লক্ষ্য তো একটা চাই। বিনা দ্বিধায় নবীনেরা উত্তর দেয় লক্ষ্য মানবমঙ্গলের জন্য নব নব জ্ঞানের সন্ধান ও প্রসার এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে তার যোগ-সাধন।—প্রবীনেরা হাসেন—জ্ঞান কাকে বলে? অসন্তোষ ও অবিনয়কে? দলাদলির প্রচণ্ড মোহ ও উত্তেজনাকে? ধৈর্য্য ক্ষমা, আশ্রিত পালন, পাতিব্রত্য, একান্নবর্ত্তী পরিবার, গুরুজনদের ও ধর্মের প্রতি বিরাগের নামই কি তোমাদের জ্ঞান ও মানব-মঙ্গল?

উভয় পক্ষেই সত্য এবং ভুল দুইই আছে। অর্থনৈতিক কাঠামোতে এসেছে আমূল পরিবর্ত্তন; সে পরিবর্ত্তনের ফল মনের ওপর অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। কাজেই পুরণো জীবনধারাতে ফিরে যাওয়াও যেমন আর সম্ভব নয় তেমনি পুরণো মনেরও আর পুনরাবৃত্তি ঘটবে না। তাছাড়া আজকের ভারতবর্ষ এখন আর একক অথবা কেবলমাত্র রাজারাজড়ার ইতিহাসের মধ্যেই আবদ্ধ নেই; ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সমস্ত জগতের সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞান ও বস্তুসম্ভারের আদান প্রদানে সে আজ সচেতন সমৃদ্ধ ও বেগবান। অবশ্য চারদিকের ভালোমন্দের মধ্য থেকে ভারতীয় মন যে পরমহংসের মত কেবলমাত্র ভালোটাকেই গ্রহণ করতে পেরেছে এমন নয়, অনেক অবাঞ্ছিত বস্তুও অনিবার্য ভাবেই এসে বিপুল জন-মানসকে প্রভাবিত করেছে ও করছে। বিচ্ছিন্ন-জীবন প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতের সব কিছুই ভালো ছিল এ যেমন

একপেশে দেখা, তেমনি বহুধা বিস্তৃত আধুনিক জীবনের যা কিছু তারও সবই ভালো এ বলাও সেই একচক্ষু হরিণের দৃষ্টির মতই ভুল।

কিন্তু ভালো ও মন্দের প্রকৃত মাপকাঠিটাই বা কি? আমরা জানি পৃথিবী যত জোরেই ঘুরুক পায়ের তলার মাটি থেকে আমরা কখনো বিচ্যুত হইনা; তেমনি চলার বেগ দ্রুতই হোক আর শ্লথই হোক—মনুষ্যত্ব নামক একটা ভিত্তির ওপর গোটা মানবসমাজটাকেই ভর দিয়ে থাকতে হয়, আর যা আমাদের ধারণ করে থাকে তাকেই আমরা বলি ধর্ম। কিন্তু এই মনুষ্যত্ব বা ধর্মের ধারণাও আবার কালে কালে কিছু না কিছু বদলায়, বিপদ বা দ্বন্দ্বও এখানেই। এককালে রাজা, মনিব, পিতামাতা, স্বামী প্রভৃতির আজ্ঞাকে নির্বিচারে শিরোধার্য করাটাই ছিল মানবধর্মের একটা প্রধান লক্ষণ; কিন্তু সেখানে আজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে (সে অন্যায় যার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হোক না কেন) মাথা তুলে দাঁড়ানোটাকেই মনুষ্যোচিত ব্যবহার বলে গণ্য করা হয়। পিতার ভুলের জন্য আজকের রামচন্দ্রদের কেউ নিশ্চয়ই বনবাসী হতে কিম্বা ভীষ্মের মত এমন অসাধারণ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হতে চাইবেন না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার খেলার নেশার দায়ে পাণ্ডবদের মত নিজেদের অধীনতার পায়ে বিকিয়ে দিতেও কেউ রাজী হবেন না। বিনা দোষে পরিত্যক্তা হয়ে কোনো পত্নীও একালে আর সীতার মত স্বামীর অনুগতা থাকবেন এমন আশা করা চলে না।

সন্তোষে শান্তি একথা একদিক থেকে সত্য কিন্তু অপরদিকে অসন্তোষ না থাকলে মানুষের অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব হত না। তাছাড়া তেঁতুল পাতার ঝোলে বিশেষ একজন পণ্ডিতের তৃপ্তি থাকলেও সেটা সর্বসাধারণের জন্য নয়, সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার জন্যে যথাযথ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করাকে এযুগের লোকেরা বলবে অজ্ঞতা, বলবে পাপ। ভিক্ষান্ন ভোজনে বৈরাগ্যের শিক্ষা যেমন একালে পরিত্যক্ত তেমনি যথার্থ অক্ষমবাদে একদল গ্রহীতাকে দান করে দাতা পুণ্য সঞ্চয় করবেন বা খ্যাতনামা হবেন এ ধারণাও অচল। দানে এবং প্রতিদানে আজকের মানুষ তুল্য মূল্যকেই মর্য্যাদা দানে আগ্রহশীল। নিতান্ত ভদ্রতার খাতির ছাড়া 'অনুগ্রহ' কথাটাকেই এযুগ মুছে ফেলতে চাইছে। মানুষকে উপেক্ষা করে শুধু মন্ত্র তন্ত্র ও পূজার্চনার মধ্যেই যে-ধর্মের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়, তাকে ধর্ম বলে অভিহিত করতেও একাল আর প্রস্তুত নয়।

তাহলে ধর্ম্ম কি ? সর্বকালের আদর্শ বলতে কোনো একটা নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ই কি তবে মানুষের নেই ? না থেকে পারে না, আর তাকে সংযম বললেই বোধহয় ঠিক বলা হয়। ঠিক জায়গায় থামতে জানা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ না করাটাই ভারতীয় আদর্শের মূল কথা এবং একাল ওকাল জুড়ে এইটেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে আমরা অত্যন্ত গর্ববোধ করি। আজও পররাষ্ট্রনীতিতে ভারত সকলের আদর্শ। অহিংসা, ত্যাগ, সাম্য মৈত্র ও শান্তির বাণীতে ভারতের আকাশ বাতাস আজও মুখরিত। আদর্শের মধ্যে বাস্তবকে পৌছানোর অক্লান্ত চেষ্টাতেই আদর্শের সার্থকতা কিন্তু বর্ত্তমানকালে ব্যক্তি বা সমাজের আভ্যন্তরীণ চিত্র তার কিছুমাত্র সাক্ষ্য বহন করে না। এখানে আর্থিক দৈন্যের চাপ যেমন, বিরাট অশিক্ষার সমারোহ তেমনি প্রবল। জন সাধারণের মধ্যে সংযমের অভাবকে অনেকটা এরই ফল বলা যায়। চলা মানেই নিশ্চয়ই প্রগতি নয়, অপথে কুপথে চলাও চলা। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থাৎ সত্যকার অগ্রগতির পথে যেখানে বাধা এসে দাঁড়ায়, সেখানে আদর্শগত সংগ্রামের প্রয়োজন অবশ্যই থাকে কিন্তু প্রতি দিনের সাধারণ চলা ফেরার মধ্যেও সর্বত্রই একটা অকারণ ঔদ্ধত্য ও অবিনয়কে বীরত্ব বলে ভাববার যে অদ্ভুত মনোবৃত্তি এ যুগকে পেয়ে বসেছে তাকে সমর্থন করা একেবারেই সম্ভব নয়। স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাকে বলব এ যুগের বিশেষত্ব, কিন্তু স্বৈরাচারী হওয়া কোনোকালেই কল্যাণের পথ নয়। জ্ঞানের প্রথম পাঠই হল নম্রতা ও বিনয়। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করতে জানার এবং গুণ আহরণের শিক্ষা যেখানে আছে সংস্কৃতির পরিচয়ও সেখানেই। দুঃখের বিষয় সেই সংস্কৃতি থেকে আজ আমরা চ্যুত; এবং তার একমাত্র কারণ প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক খাদ্যের অভাব।

অসংযমের অপর দিকটা আরো ভয়ংকর। সেখানে 'নাল্পে সুখমস্তি'র দোহাই দিলে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করা হয়। সেটা ধন সম্পদ প্রভৃতির অপরিমিত কামনা। ব্যক্তিগত ভাবে নানাবিধ বিলাসোপকরণ বা ভোগের বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে প্রাচীন ভারতের রাজারাও থেকেছেন কিন্তু আমাদের কাছে আদর্শ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন রাজর্ষি জনক ও এক-পত্নীক রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজারাই। রাজা রাজড়াদের যুগ গত, কিন্তু রাষ্ট্র-প্রধানেরা এবং ধনপতিরা আজো আছেন এবং এখানেও অধিকাংশ স্থলেই

মাত্রাজ্ঞান অতিমাত্রায় অনুপস্থিত। লোভকে বাড়তে দিলে সে বেড়ে গিয়ে নিজেকেও ডোবায়, চারদিককেও ডোবায়। রামায়ণ মহাভারতও আমাদের এই শিক্ষাই দেয়। লোভ একেবারেই থাকবে না এমন কথা বললে মনো-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা হয় কিন্তু পরিমিতি বোধের শিক্ষা না থাকলেই নয়। পুরাকালের তপোবন বা গুরুগৃহে থেকে কঠিন নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে শিক্ষালাভের দিনকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় কিন্তু সুন্দর সংযত ও ভদ্র জীবন যাপন করবার মত সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ রচনা ও শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন করা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয়।

মেয়েদের সম্পর্কেও প্রাচীন ও নবীনেরা একমত নন। বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনা হয়ে থাকার প্রবচনও এখন আর খুব শ্রদ্ধেয় নয়। মৈত্রেয়ীর মত 'যেনাহং নামৃত স্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্' বলা আদর্শ হিসেবে সুন্দর হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে একালে মেয়েদের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার লাভের জন্য আইন পাশ করবার প্রয়োজন দেখা দেয়। সতী এবং সৎ এই দুটো কথাও এখন প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। শোচনীয় আর্থিক দৈন্য পণ প্রথা ও মর্মান্তিক বেকারত্বের ফলে বাল্যবিবাহ তো দূরের কথা, প্রয়োজনীয় সময়েও এখন আর ছেলে মেয়েরা বিবাহিত জীবন যাপন করতে পারছে না। স্বামী সন্তান পরিবৃতা হয়ে নিশ্চিন্ত ও সুস্নিগ্ধ গৃহ পরিবেশের মধ্যে যে বয়সটা আগেকার দিনে কেটেছে সে সময়টা এখন কাটছে নিরানন্দময় চাকুরী জীবনে কিম্বা বিড়ম্বিত গৃহের আবেষ্টনে। প্রাকৃতিক বিধানকে লঙ্ঘন করা হবে অথচ প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নেবে না এমন আশা করা চলে না। বর্ত্তমান অবস্থা যেখানে আছে সেখানেই রেখে দিয়ে শুধু আদেশ উপদেশ আশীর্বাদ বর্ষণ বা বিলাপ করতে থাকলে লাভ কিছুই হবে না।

নানাকারণেই বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ কাল আর ঠিক পূর্বতন আদর্শের মধ্যে ফিরে যেতে পারবে না, কিন্তু তার মধ্যে অনেক ভাল যা এ সমাজের পক্ষেও অত্যাবশ্যকীয় তাকে গ্রহণ করায় কল্যাণ আছে। কি নর এবং কি নারী বিশেষ প্রতিভা নিয়ে সব যুগেই কিছু না কিছু জন্মেছেন এবং তাঁদের জ্বালানো আলো দিয়েই আমরা পথ চিনে এবং প্রয়োজন মত পথ প্রশস্তও করে নিতে পারি।

কৃষ্ণ-ভগ্নী সুভদ্রাকে নবীনচন্দ্র সেন তার সাহিত্যে সেবা ও করুণার প্রতিমূর্ত্তি করে গড়েছেন, সেই সেবা ও মমতাকে এ যুগের মানুষও শ্রদ্ধা ও সম্মান করেন। এই সুভদ্রাই আবার সারথ্যেও অতুলনীয়া ছিলেন, দ্রৌপদী ছিলেন একাধারে তেজস্বিনী সেবাপরায়ণা ও রন্ধনে সুনিপুণা, একালেও এ সবের সমাদর আছে এবং থাকা উচিত। স্বয়ংবর প্রথা সে যুগের নিন্দনীয় ছিল না, এ যুগেও পরিবর্ত্তিত রূপে সেটা সমাজে ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং একেও স্বাভাবিক ভাবে সুস্থ মনে গ্রহণ করতে পারলে অন্যায় হবে না বরঞ্চ বহুক্ষেত্রেই পারিবারিক শান্তি ও বন্ধন অটুট থাকবে। গার্গী খনা লীলাবতী বিশ্বধারা প্রভৃতি মহিলারা পাণ্ডিত্যে অতুলনীয়া ছিলেন; সেই জ্ঞান ও বিদ্যা আবার মেয়েদের মধ্যে ফিরে আসছে এ আমাদের গৌরবের কথা। গান্ধারীর মত দৃঢ়চেতা জননী তো সর্বযুগেরই কাম্য। পত্নীর পক্ষেও গৃহিণী সাধ্বী ও সখী তথা সহকর্মিনী, সহধর্মিনী ও সৎ পরামর্শদায়িনী হওয়াটাই বা কোন্ যুগের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়?

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যুগবদলের ফলে অনেক কিছুর পরিবর্ত্তন ঘটলেও মূল আদর্শের মধ্যে বিরোধ খুব বেশী হয় না। তবুও প্রত্যেক যুগেরই কতকগুলি বিশেষ গুণ ও বিশেষ গ্লানিও থাকে। যুগোপযোগী ভাবে মনুষ্যত্বের বিকাশ লাভের জন্য ভেতরকার সেই দোষ গ্লানি বা অনাচারের যন্ত্রণাগুলোকে কঠিন হস্তে সরিয়ে দেবার প্রয়োজন ঘটে এবং তখনই আমরা শুনি—'সম্ভবামি যুগে যুগে'; কামনা করি 'যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব'। আজও তাই সর্বমানবের হিত সাধনের জন্য সমস্ত দেশের এবং সমস্ত কালের যা কিছু ভালো তাকে গ্রহণ করেই ভারতীয় সংস্কৃতির মহান বৈশিষ্ট্যকে সার্থক করবার চেষ্টায় সমস্ত চিন্তাশীল মানুষেরা ব্যাপৃত আছেন।

'স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু,'

সাময়িকী

[উজ্জ্বলভারত—পূর্ব্ব পর্য্যায় ১ম বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ২৩শে আষাঢ় ১৩৩৩]

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ঃ জগৎ + নাথ = জগন্নাথ। জগতের সঙ্গে নাথের যোগ করলে জগন্নাথ হয়। জগৎ হচ্ছেন বলরাম, নাথ হচ্ছেন কৃষ্ণ, যোগচিহ্ন হচ্ছেন সুভদ্রা যোগমায়া। কিম্বা জগৎ হচ্ছেন সঙ্ঘ, নাথ হচ্ছেন বুদ্ধত্ব, যোগ চিহ্ন হচ্ছেন ধর্ম্ম। আমরা কেউ জগৎ চাই, নাথ চাই না; কেউ বা নাথ চাই জগৎ চাই না; তাই আমাদের আর ত্যাগরূপিনী যোগমায়া সুভদ্রা দেবীর দরকারও নেই। জগৎ ও নাথের যোগসূত্র হারিয়ে, জাতিশুদ্ধ লোক সুভদ্রার কৃপাদৃষ্টিতে বঞ্চিত। আমরা আর ভদ্রতার দাবী করবার অধিকারী নই; কেউ আমরা আর সুভদ্র নই, জাতিশুদ্ধ সব আমরা অভদ্রের দল। আমরা সঙ্ঘ গড়ি কিন্তু তাতে বুদ্ধত্ব ফুটে না। কেন? ঐ সুভদ্র ধর্ম্মসূত্র আমরা প্রতি মুহূর্ত্তে ছিঁড়ে ফেলবার জন্য ব্যগ্র। আমরা বাস্তববাদী হবার জন্য এত লোলুপ যে, সুভদ্রাকে বাদ দিয়েই আমরা সঙ্ঘ সৃষ্টি করতে চাই, তাকে বাঁচিয়ে ও বাড়িয়ে রাখতে চাই। সুভদ্রাই যে সঙ্ঘকে বুদ্ধত্বের স্পর্শ এনে দিয়ে ধন্য করতে পারেন, তা আমরা কেউ ভাবতেও রাজী নই। বুদ্ধ হতে চাইও সকলেই, জগৎকেও মান্‌তে রাজী আছি, কিন্তু চাই না হতভাগী সুভদ্রাকে, যে আমার সামনে সর্বদা মরণের আদর্শ দাঁড় করিয়ে রাখতেই চায়। সমাজ এতদিন জগতের পূজা বাদ দিয়ে শুধু নাথের পূজা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল বলেই আজ জগৎও ডুবতে বসেছে, নাথ প্রায় অন্তর্হিত। গোটা মানুষ হতে হলে চাই জীবনে জগতের পূজা, জগতের নাথের পূজা। নাথ বাদ দিয়ে জগৎ-পূজায় আজ আমরা ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিচ্ছি। নাথহীন সমাজ স্বার্থপরতায় পূতিগন্ধময়, নাথহীন রাষ্ট্র আজ ছিন্নবিচ্ছিন্ন। নাথ না থাকলে সতী ত বাঁচে না। নাথের নিন্দায় সতীর দেহত্যাগ হয়েছিল; কেমন করে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র নাথহীন হয়ে বাঁচবে? আজ সর্বত্র চলছে ধর্ম্ম বাদ দিয়ে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র গড়বার একটা প্রয়াস। ব্যর্থতাও তাই লেগেই রয়েছে। এক একবার কাজ যেন হয়ে আসে প্রায়,

তারপরেই সেটা থমকে যায়। ঔষধের শক্তি ত ঔষধ দেখায়, কিন্তু রোগীর ত ব্যারাম সারে না। তখন চিকিৎসক জীবনীশক্তির অভাব মনে করে সেদিকেই ঔষধের চেয়েও বেশী দৃষ্টি দেন। জাতীয় জীবনে, ধর্ম্ম-জীবনে সর্বত্র চল্‌ছে এই বিফলতা। যারা ভগবানকে লাভ করতে চান, তাদের নজর যাতে জগতের কথা এসে তাদের হরি-কথায় বাধা না জন্মায়, আবার যারা জগতের উন্নতি চায়, তাদের প্রখর দৃষ্টি যে আদর্শবাদ এসে কর্মক্ষেত্রকে স্পর্শ করতে না পারে। ধার্মিক আজ এগিয়ে যেতে পারছে না; কর্মিদলও পদে পদে বিফল-মনোরথ হচ্ছে, ক্রমেই তাদের ভিতর অবসন্নতা ভরে উঠ্‌ছে। ২৪ প্রহর খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্ত্তন করার পরও যখন দেখ্‌ছি যে, কীর্ত্তনীয়া জুয়া খেলায় সমাজের অর্থ শোষণকে পাপ মনে করে না, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা আমলাতন্ত্র কর্ত্তৃক প্রতিক্ষণে ক্ষুণ্ণ হলেও তার বিরুদ্ধে একটি অঙ্গুলি উত্তোলন করতে সাহসী হয় না, তখনও কি মনে করব ধর্ম্ম হচ্ছে? চোখের উপর মহামানবের উপর অত্যাচার চলতে দেখেও যদি ধার্মিকের তাতে কিছু না আসে যায়, তাতে যে কেমন করে তার ধর্ম হয়, তা মোটেই বুঝি না। নির্ভীকতাই মুক্তি, নির্ভীকতাই ধর্ম্ম। যারা সরকার-ভয়ে ভীত, সত্য প্রচার করতে যাদের বুক দুর দুর করে, তারা কোন্ সত্য ভগবান্‌কে পাবে? ভগবান্ আচারে সত্য, প্রচারে সত্য। আচার ও প্রচার একই আত্মার দুইটি বিকাশ। আচার ব্যতীত প্রচার বস্তুতন্ত্রহীন; প্রচার ব্যতীত আচার জীবনহীন সঙ্কীর্ণ লোকাচার মাত্র। যাদের জীবনে আচার ও প্রচার আছে, তারাই সমাজের, ধর্ম্মের আদর্শ। বুদ্ধ, শঙ্কর, গৌর সকলেই ত আচারবান্ হয়ে প্রচারকার্য্যে জীবনপাত করেছেন। সত্য প্রচার না থাকলে সত্য-আচারও টেকে না। ধর্ম্মের আচার ও প্রচার দুই মিলে গেলেই ত জগতের সঙ্গে ধর্ম্মের যোগ আপনা আপনি হয়ে যায়। সত্য আচার সত্য প্রচারে ফুটে উঠবেই। যে ধর্ম্ম পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে নিজ প্রতিষ্ঠা খোঁজে না, সে তথাকথিত ধর্ম্ম মানুষকে মরণের হাত থেকে রক্ষা করতে ত পারেই না, বরং মানুষের মনুষ্যত্বের উপর এক জগদ্দল পাষাণ চাপিয়ে নিষ্পেষিতই করে।

*　　　*　　　*

ধর্ম্মই জগতের বুকে নাথের আসন এবং নাথের হৃদয়ে জগতের প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলে। ধর্ম্ম নেই বলে আজ জগৎ ও নাথ দুই-ই আমাদের কাছে ভেসে গিয়েছে। যে ধর্ম্ম মানুষকে "মানুষ" করে না, অত্যাচারের

বিরুদ্ধে বীরের মত দাঁড়াবার সামর্থ্য প্রদান করে না, যে ধর্ম্ম মানুষকে গো বেচারা, কেবল ভাল মানুষটি সেজে সংসারের পাশ কেটে যাবার মনোবৃত্তি দান করে, যে ধর্ম্ম সংসারের জটিলতা কুটিলতা হতে দূরে সরে এসে আত্মরক্ষা করতে মানুষকে প্রণোদিত করে, সে ধর্ম্ম যত শীঘ্র বিদায় নেয়, ততই মঙ্গল। পক্ষান্তরে সেই স্বদেশী যুগ থেকে স্বাধীনতার আন্দোলন নূতন নূতন মূর্ত্তিতে এল বটে, কিন্তু কোন স্থায়ী ফলই লাভ হল না! এর রহস্য কোথায়? এখন পর্য্যন্ত যত আন্দোলন এসেছে, কোনটিই আমাদের স্বরাজকে স্পর্শ করতে পারে নি; বাহির অবলম্বনে এসেছে, বাহির নিয়ে নাড়াচাড়া করে আবার বাহির থেকে বিদায় নিয়েছে। অসহযোগ আন্দোলন এসেছিল নূতন বার্ত্তা নিয়ে, ঘরের কথা বলবার জন্য; তাকেও আমরা কত চতুরালী ক'রে বর্জ্জন করেছি। ও যে আত্মসমর্পণের আন্দোলন, পূর্ণ যোগের প্রচার! আমরা জগতের কল্যাণের জন্য জগতের মাঝেই সূত্র খুঁজছি; যেটি ধরি সেইটাই আমাদের বঞ্চিত কচ্ছে। আন্দোলন কচ্ছি বটে, কিন্তু মানুষ ত হলেম না। নাথকে বিদায় দিয়ে জগতের মাঝে সূত্র খোঁজাও যা, স্বামী ত্যাগ করে নারীর নিজ জড়া প্রকৃতির মাঝে নিজ সার্থকতাও তা। আজ নাথহীন পারিবারিক আন্দোলন, নাথহীন সামাজীক হৈ চৈ, নাথহীন স্বাধীনতার প্রচার সবই আমাদের কাছে ফাঁকিতে পরিণত। জগতের মধ্যে কি জগতের স্থিতি? জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রসার যে জগতের বাইরে, 'নাথের হৃদয়ে'—এ তত্ত্ব ভুলে আমরা দিনের পর দিন অবসন্ন হয়ে পড়ছি। জগতের স্বরূপ নাথ; নাথের রূপ জগৎ। নাথকে না পেয়ে জাগতিক যে কোন সমস্যা কেমন করে যে সমাহিত হবে, তা আমরা ভেবে উঠতে পারিনি। অথচ বর্ত্তমানে শিক্ষিতের মাঝে জগৎ থেকে নাথকে তাড়িয়ে দিয়ে অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি চালাবার একটা প্রকাণ্ড ঝোঁক এসেছে; এই সর্বনেশে আত্মঘাতী প্রচেষ্টা হতে জাতিকে রক্ষা করতেই হবে। 'নাথ'কে পেলে জগত যে সর্ববিধ রত্নের অধিকারী হবে। স্বামী যার ঘরে, তার আনন্দের অভাব নেই, সে যে পরিপূর্ণ বিচিত্রতা নিয়ে সুন্দর, তার মানের কাছে স্বামী পর্য্যন্ত পদানত, তার অপরের ক্ষুধা তৃষ্ণার মাঝে নিজ ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ করবার লালসা কত তীব্র, তার দেহের সর্ববিধ পুষ্টির তুলনা নেই, তার অন্ন-স্বাস্থ্য-পোষাক সবইত সহজ, গৌরবে ভরপুর। স্বামীহীনার কপালে আছে নিরানন্দ। তাকে স্ব স্ব ভোগে লাগাবার জন্যে দুনিয়ার কামুকদল কতই না ব্যাকুল! তার মানইজ্জত রাখবার জন্যে কারও

কোন প্রয়োজন বোধ হয়না, তার অন্তের প্রতি দরদ দেখাবার সুযোগই জোটেনা, তার অন্ন-বসন কিছুই জোটেনা। আজি ভারতের পরিবার, সমাজ ও জাতির এই বৈধব্য। তাই আমাদের মত অসতী আর নেই। আমরা ব্যভিচারিণীর মত দিন যাপন কচ্ছি, উপপতির কাছ থেকে পাওয়া অপমান-মাখা বাজারের খাওয়া-পরায় মেতে কোন ব্যথাই যে আমাদের নেই,—এইতো আমাদের রোগ। ব্যাধি না চিনে হৈ চৈ করলে লাভ হবেনা। ঔষধকে ধারণ করবার ক্ষমতাই যখন রক্তের নেই, তখন আশা কোথায়? আজ তাই রক্ত যাতে জন্মে, মনুষ্যত্ব লাভের পিপাসা যাতে বাড়ে, এমন পন্থা বের করতে হবে! ভারতের ধারণাত্মিকা-শক্তি লোপ পেয়েছে। স্বামীর বীর্য্য গর্ভে ধারণ করবার ক্ষমতা আজ ভারতের কই? এইজন্য চাই শ্রদ্ধার সাধন। শ্রদ্ধাহীন হয়েই আমরা "বর" পাবার অধিকারে বঞ্চিত।

*　　　*　　　*

বহু শতাব্দী থেকে প্রাচ্য জগত বাদ দিয়ে নাথকে নিয়ে ডুবে যাবার সাধনা নিয়েছিল, যার ফলে সে পেয়েছে পরাধীনতা; আবার পাশ্চাত্যও নাথকে বাদ দিয়ে জগতকে মহিমান্বিত করতে গিয়ে নূতন রকমের পরাধীনতার সৃষ্টি করেছে। কোন একটি দিয়ে বর্ত্তমান যুগ চলছেনা। বর্ত্তমান যুগে জগন্নাথ চক্রই একমাত্র সকল লীলার সমন্বয়ে বিশ্ববিজয়ী। জগতের মানে নাথের মান এবং নাথের মানে জগতের মান—এই মীমাংসা যেদিন জগত ধারণ করবে, সেইদিন তার অন্তর ও বাহির জুড়াবে। বাহির উপবাসী থাকলে যেমন বাহিরের মরণ, অন্তর উপবাসী থাকলেও অন্তরের মরণ। দ্বিবিধ মরণের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হইলে চাই "জগৎ+নাথ=জগন্নাথ"—এই মহাতত্ত্বের প্রচার। ঐ দেখনা, এই তত্ত্ব মূর্ত্ত হয়েই শ্রীধাম পুরীক্ষেত্রে লীলা বিস্তার করছেন! তিনি যে জগতের বুকে এই তত্ত্বকে নিত্য অঙ্কিত করবার জন্য আজ রথযাত্রার যাত্রী। ওগো কে আছ যাত্রী, ঐ মহাযাত্রীর সঙ্গে অনন্ত যাত্রায় রওনা হও। অচল জগন্নাথ আজ সচল গৌর; এক মূর্ত্তি রথে, অপর মূর্ত্তি পথে। যে জগতকে একদিন অচল মনে করে কতই না বিড়ম্বিত করছে, আজ নাথের স্পর্শে সে যে চঞ্চল, বিলাসী। কি শোভন রূপ! কি মূর্ত্তিমান্ বিশ্বের সৌভাগ্য। একবার নয়ন ভরে দূতী সুভদ্রার দৌত্যের ফল ঐ জগৎ ও নাথের যুগল মিলন দর্শন করে কৃতার্থ হও। জগতের স্থিতি, ধৈর্য্য তিতিক্ষা, অহিংসা আজ নাথের আদর্শ, আশা, সাহস,

নিতুই নূতন হবার লোভের সঙ্গে মিলেমিশে কি এক অদ্ভুদ রামায়ণের না সৃষ্টি করেছে? এই রস-রাজ মহাভাব-রূপই না একদিন গরুড় স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে শ্রীগৌর নয়ন ভরে পান করেছিলেন? এইরূপ মাধুরী পানে বিভোর শ্রীগৌরকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার জন্য স্বরূপ দামোদর আকর্ষণ করলে শ্রীগৌর কেঁদে কেঁদেই কি বলেন নি, "সখি, আর একবার শ্যামসুন্দরকে দেখে নিই?" এই রূপের তুলনা নাই। তাইতো এই রূপের চরণ তলে শ্রীগৌর অন্ত্যলীলার শেষ সমাধান করলেন। ওগো, এমন রূপ কি কেউ কখনও দেখছে? আজ স্বয়ং জগন্নাথ দেব সর্ব্বকে কৃতার্থ করবার জন্য রথারূঢ়! কে আছ ভাগ্যবান্, রথরজ্জু ধরে রথকে এগিয়ে দিবার লালসা রাখ! পার ত, ঐ রথচক্রের নীচে নিষ্পেষিত হয়ে অমৃত লাভ কর। এই রথেই জগতের পরাকাষ্ঠা, পরাগতি-মূর্ত্ত। যারা এই রথচক্রের নীচে মরবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, তারা বীভৎস মরণ লাভ করবে। জাতিকে এই বীভৎস মরণ থেকে উদ্ধার করতে হলে, চাই জগন্নাথ দেবের মাঝে আত্ম-সমর্পণ, তাঁর চক্রে নিজ দেহ-মন-প্রাণকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া; জগতের লীলাচক্র যতই ভীষণ হোক—বজ্রপাত, শত নির্য্যাতন—মেনে নেবার দুঃসাহস। জগত বীরের জন্য, ক্লীবের জন্য নয়। ক্লীব এ চক্রে শতধা খণ্ডিত হয়, পুরুষের মস্তক এ চক্রে অধিকতর উন্নত হয়। ভাগ্যবান্ ভারতবর্ষ তোমার সুভগ—মূর্ত্তিমান্ ঐ জগন্নাথদেবের শ্রীচরণে এখনও শরণ নেও। তিনি যে সদাই ডেকে বলছেন্—উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত "ওরে ভারতবাসী, ওঠ্, জাগ্, আর কতকাল মরার মত গোলামী নিয়ে পড়ে থাক্‌বি? একবার চেয়ে দেখ দেখি আমার এই মনমোহন রূপ তোমারা মনে ওঠে কিনা? আমি যে আজ বর দেব বলে তোদেরই দুয়ারে! আমিই যে তোমার বর, তোমরা যে আমার ক'নে। কতকাল তোমারা বর হারিয়ে অপরের কনে হয়ে তাদের কাম উপভোগের বস্তু হয়ে থাক্‌বে? একবার নিজের বর নিজে চিনে নিয়ে জাগ্রত হও: বরের সঙ্গে বর হয়ে বিশ্বখেলায় রসলীলার সৃষ্টি কর। আমার রথযাত্রা সার্থক হোক, তোমরা সার্থক হও। আমার রথযাত্রা সার্থক হবেই।* মাভৈঃ। বন্দে মাতরম্।

শ্রীরেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

শ্রাবণ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা

বেদান্ত ও রাজনীতি

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[পূর্ব্ব পর্য্যায় উজ্জ্বল ভারত, ১৬ই পৌষ, ১৩৩২ সন, হইতে উদ্ধৃত]

আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমার নিকট এক চিঠিতে লিখ্‌ছেন :—"আপনার মত যে, রাজনীতি ও ধর্ম্ম পৃথক নহে; পরস্পরের নিকট সম্বন্ধ আছে। হিন্দুর ধর্ম্ম রাজনীতির ভিত্তি স্বরূপ। এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ আপনার কাগজে বাহির হইলে সুখী হইব। ধর্ম্ম সভায় (যেমন আমাদের হরি সভায়) রাজনীতি আলোচনা হইলে ধর্ম্মের অঙ্গহানি হয় কি না?" অনেকের মনে এ খটকা লেগেই আছে। বন্ধুবর যে আমায় এবিষয়ে সম্যক আলোচনা করবার সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এক প্রবন্ধে এর বিস্তৃত আলোচনা হওয়া আদৌ সম্ভবপর নয়; উজ্জ্বলভারতের লক্ষ্যও ধর্ম্ম ও রাজনীতির সমন্বয়ে "রাধানীতি" গড়ে তোলা। উজ্জ্বলভারতের সব প্রবন্ধই ঐ ছাঁচে লিখিত হচ্ছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার ছাঁচে আমরা যে-'মানুষ' গড়ে উঠেছি, তার কাছে গোটা (whole) মানুষ, গোটা জগৎ বলে কিছু নেই; আমরা এমন সম্পূর্ণ জিনিষটাকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে মেরে ফেলেছি যে, এখন তাকে যোড়া লাগান এক বিষম সমস্যা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জগৎ আজ বহু;—ধর্ম্ম জগৎ, সৌর জগৎ, নাট্য জগৎ, রাষ্ট্র জগৎ; জগন্নাথও তাই বহু। আজ জগন্নাথের দল মাথা ঠোকাঠোকি ক'রে জগন্নাথের রূপকে মহা ব্যর্থতায় পরিণত কর্চ্ছে। আসল জগন্নাথ তাই দূরে দাঁড়িয়ে হেসে আটখানা। মানুষ আমরা আজ কত রকমের—কেউবা ধার্ম্মিক, কেউবা বৈজ্ঞানিক, কেউবা কবি, কেউবা বৈদান্তিক, কেউবা রাজনীতিজ্ঞ!

আমরা হ'তে চাইনে শুধু 'মানুষ' যার চেয়ে সহজ, মহান ও মধুর আর কিছুই নেই। 'মানুষ' ছেড়ে আমরা যতই রাজনীতির উপাধি, বৈজ্ঞানিকের উপাধি, ধার্ম্মিকের উপাধি জড়িয়ে আরাম উপভোগ করতে চেষ্টা কচ্ছি—ততই উপাধি উপ-'আধি'তে অর্থাৎ ঘৃণিত মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হচ্ছে। আমরা ভক্ত, জ্ঞানী, কর্ম্মী, কবি, বৈজ্ঞানিক সবই; কেবল নই শুধু 'মানুষ', যা হ'লে সব হওয়ার চরম সার্থকতা সম্পন্ন হ'ত; যার ভিতর সব উপাধি রূপ হয়ে বিলাস করত এবং যা না হওয়ার জন্যই আজ বৈজ্ঞানিক পরপদদলিত, ধার্ম্মিক শ্রীহীন ও বলহীন, কবি পরানুগ্রহের বিলাসিতায় নিজের ঘর সাজাতে অপমান বোধহীন। পরমহংসদেব বল্‌তেন—একের পর যত শূন্য দেও, দশ গুণ বাড়বে; এককে সরিয়ে নেও, শূন্য কেবলই ফাঁকি। "মানুষ হওয়া"ই এক বস্তু; তার সঙ্গে ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, কাব্য, রাজনীতি প্রভৃতি যত শূন্য বসিয়ে দাওনা কেন, জীবনের ক্ষেত্র দশগুণ করেই তা বেড়ে যাবে কিন্তু মানুষকে বাদ দিলে সব ফাঁকি; তখন ধর্ম্মও বিলাসিতা, রাজনীতিও বিলাসিতা, বিজ্ঞানও বিলাসিতা। আজ বিলাস-ব্যসন ভারতের ঘর বাইর সব গ্রাস করেছে; তাই আমরা সব হ'তে গিয়ে আজও কিছুই হ'তে পারিনি। অথচ সব হওয়ার রাজ্যে নাকি এখন পর্য্যন্তও আমরা বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারিনি। 'পূর্ব্ব' একবার 'পশ্চিম' ব'নে না গেলে নাকি 'পূর্ব্বে'র কোন আশা ভরসাই নেই।

ভারতবর্ষ অখণ্ড, নির্ব্বিকল্প জ্ঞানের উপাসক; সে মানুষকে বিশেষ কোন জ্ঞানের সঙ্গে অভিন্নভাবে জড়িয়ে থাকতে দিতে চায়নি। সে জপে "স ভূমিং সর্ব্বতো স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্"। সব-জ্ঞান লাভ হওয়ার পরও যে জ্ঞানের রাজ্য আছে, তা ভারতবর্ষ জানত বলেই সে আজ এত উৎপীড়ন, এত পরপদদলনের ভিতরও মনুষ্যত্বের দাবী করে। ভারতের বিশ্বামিত্র যখন দেখলেন তারকা রাক্ষসী তাদের সাধন ভজনে উপদ্রব জন্মাচ্ছে, তখন রাজা দশরথের নিকট থেকে রাম লক্ষ্মণকে চেয়ে নিয়ে গেলেন; তারকা বধ হল। এখানে কি সাধন ভজন রাজনীতি ক্ষেত্র বাদ দিয়ে ফুটে উঠেছিল? ভারতের পার্থসারথী একদিন যুদ্ধের ভিতর আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন; 'মানুষের যুদ্ধ' কি সম্ভব হয়, যদি তার সঙ্গে আত্মতত্ত্বালোচনা মাখামাখি না থাকে? ভারতের শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করেছিলেন; ভারতের শ্রীকৃষ্ণ কংস শিশুপালের অনুগত থেকে প্রেমের ঠাকুর হতে পারেন নি; বাংলার মহাপ্রভু, খোলকরতাল-চোখের-জলের বিগ্রহ মহাপ্রভু কি কাজীর সঙ্গে লড়াই না করেই প্রেমধর্ম্ম

আস্বাদন করতে সক্ষম হয়েছিলেন? বিশ্ব-নাগরিকের আদি সাধক প্রহ্লাদ কি হিরণ্যকশিপুর সঙ্গে প্রকাশ্য আইন-অমান্যের সাধনা গ্রহণ না করেই পূর্ণ ভক্তিবাদ শিখিয়ে যেতে পেরেছেন? ভক্ত হরিদাস কি কাজীর নিকট হতে 'বাইশ বাজারের প্রহার' বরণ না করেই কাজীর উপর 'কাজী' হয়েছিলেন? যিনি রাজরাজেশ্বরীর খাসতালুকে বাস করেন, তার আবার দুনিয়ার নৃপ-কীটক হতে ভয়?

আশা যস্য পাদদ্বন্দ্বে চৈতন্যস্য মহাপ্রভোঃ।
তস্যেন্দ্রো দাসবদ্ভাতি কা কথা নৃপকীটকে॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত।

"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্মে যার আশা-ভরসা ন্যস্ত হয়েছে, ইন্দ্রও তার নিকট 'দাস,' সামান্য কীটতুল্য অত্যাচারী রাজার দলকে সে গ্রাহ্য করে না।" কেউ ত আমাদের মত এমন শান্ত-শিষ্ট গো-বেচারী নন্! সকলেই যে যোদ্ধা, রাজদর্প চূর্ণকারী; কেউ ত গোলাম থাকা-কালীন ভক্ত হন নি। তবে কেউ বা অহিংস, কেউ বা হিংস। যার ভিতর যত ভক্তভাব, যত মানুষ-ভাব বেশী, তিনি তত মধুর, সর্ব্বজন-মনোহারী, অহিংস। যিনি যত ঐশ্বর্য্য ছেড়ে মাধুর্য্য ছড়াতে এসেছেন, তিনি তত অহিংস। হিংসার সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধ, অহিংসার সঙ্গে সম্বন্ধ মাধুর্য্যের। বর্ত্তমান যুগ ঐশ্বর্য্যের ও শোষণের চাপে ম্রিয়মান, তাই হিংসার লড়াই আর চলবে না; এখন অহিংস "আমি-তত্ত্বে"র লড়াই; যে-"আমি" আগুনে পোড়ে না, জলে পচে না, অস্ত্রেতে কাটে না, জেলের বেত্রাঘাতে নোয় না, এমন 'আমি'র শুদ্ধ, শান্ত, সরল, তেজোপূর্ণ প্রকাশ্য হুঙ্কার সমগ্র অসুর ভাবের হন্তা। ভারতের সাধনা সর্ব্বাগ্রে "মানুষ হওয়া", তৎপর আর যা কিছু। ভয় বলে কোন বস্তুকে মানতে তার সাধনা তাকে শেখায় নি। সে জানে সে অভয়ার সন্তান; তার মন্ত্র হচ্ছে অভীঃ।

কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্ব্বোত্তম নর লীলা
নরবপু তাঁহারই স্বরূপ।

মানুষ হ'য়ে আর যা কিছু হব, তা সবই আমার অলঙ্কার; নচেৎ মানুষ না হ'য়ে কবিত্ব, বৈজ্ঞানিকত্ব, দার্শনিকত্ব সবই অহঙ্কার ও পরিণামে অপমান। বৃন্দাবনের ঠাকুর মানুষ হিসাবেই পূর্ণতম, অন্যত্র পূর্ণতর ও পূর্ণ। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত এই বিশ্বে কোন

পাকাপাকি ভাগ-বাঁটারা না থাকলেও ঋষিবৃন্দ ভাগের মত, দুইয়ের মত (দ্বৈতমিব) কিছু একটা স্থাপন ক'রে গোটা অখণ্ড বিশ্বকে আস্বাদন ক'রে গিয়েছেন। গোটা বস্তুকে দুই দিক দিয়ে দেখা যায়—বিদ্যার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এবং অবিদ্যার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে। যিনি বিদ্যার মাঝেও পূর্ণ, অবিদ্যার মাঝেও পূর্ণ, তিনিই অখণ্ড, পূর্ণবস্তু; তাঁকে শিরে বহন করেই আর্য্য শাস্ত্রের সনাতনত্ব। বিদ্যা ও অবিদ্যা দুয়েরই স্বয়ংরূপত্ব আছে, বিশেষ বিশেষ ফলও আছে। কোন একটিকে বাদ দিয়ে বা কোন একটিকে মেনে নিয়ে বাস্তব অদ্বৈত বস্তুর নাগাল পাবে না। যেখানে দ্বৈত অদ্বৈতের সমন্বয়, বহু ও একের পরস্পর আনুগত্য, সেখানেই বস্তুতন্ত্রতা। অবিদ্যারও বহু দিক্ আছে—রাজনীতি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, সমাজ, পরিবার ইত্যাদি। বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার মিলন বাস্তব হ'লে, ধর্ম্মনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ অপরিহার্য্য থাকবে। ঠাকুর ঘরেও রাজনীতি চলতে বাধ্য। রাজনীতি বাদ দিয়ে ঠাকুরঘর হয়না, ঠাকুরঘর বাদ দিয়েও রাজনীতি চলে না। রাজনীতি-শূন্য ঠাকুরঘর ধর্ম্মবিলাসের প্রশ্রয় দেয়; ঠাকুরঘর-বিরহিত রাজনীতি লোকপ্রতিষ্ঠাবহুল অন্তঃসারশূন্যতার সৃষ্টি করে। যে জীবনে দুই দুয়ের অনুগমন ক'রে প্রবর্ত্তিত হয়, সেই জীবনই ঋষি-জীবন। ঋষি বিদ্যায় পারদর্শী, অবিদ্যায় তত্ত্বজ্ঞ। দুনিয়াতে যা কিছু লীলা-চঞ্চল, সকলের ভিতর যিনি "রস" বের করতে পারেন তিনি ঋষি। ঋষিত্বের ভিতর দিয়েই ফুটে ওঠে বেদান্ত দর্শন, সাংখ্য দর্শন, নাস্তিক দর্শন, জ্যোতিষ্ শাস্ত্র কামশাস্ত্র, চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীত শাস্ত্র, বৃক্ষলতাদির মহিমাকীর্তন, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, কাব্য, অলঙ্কার বিজ্ঞান। ঋষিত্বকে বরণ করেই বিদ্যাশাস্ত্র ও অবিদ্যাশাস্ত্র ভারতকে এক অখণ্ড বেদশাস্ত্রের মাঝে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। তবে বিদ্যা ও অবিদ্যা একই সময়ে তুল্যভাবে ফুটে ওঠে না—যখন রাজনীতি থাকে সামনে, ধর্ম্ম থাকেন তার পিছনে; যখন ধর্ম্ম থাকেন সামনে, রাজনীতি থাকে তার পিছনে। পরস্পরের শক্তি দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ঈশোপনিষদ্ অতি পরিষ্কার করে এর মীমাংসা দিয়েছেন।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে অবিদ্যামুপাসতে।
ততঃ ভূয় এব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা॥

—"যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাঁহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে, যাহারা বিদ্যারত, তাহারা ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে।" কি গুরুতর কথা!

বিদ্যার উপাসনার ফল অবিদ্যা উপাসনার ফল থেকে কেমন ক'রে ভীষণ—এর তাৎপর্য্য আস্বাদন করলেই বিষয়টি সহজ সরল হ'য়ে আসবে।

একটি দৃষ্টান্তের আশ্রয় লওয়া যাক্। ইংরেজকে আমরা সাধারণতঃ অবিদ্যার-উপাসনারত বলে নিন্দাবাদ ক'রে থাকি। আর "ভারতবর্ষ বিদ্যা-সাধনার দেশ" ব'লে কত না গর্ব্বিত হই, অথচ বিদ্যার দেশই অবিদ্যা-সাধকদের পায়ের জুতো টেনে টেনে দিনের পর দিন শ্রান্ত, ক্লান্ত হ'য়ে উঠছে, অবিদ্যার উচ্ছিষ্ট খেয়ে বিদ্যা আজ নিজকে ধন্যাতিধন্য মনে কর্চ্ছে! হরিসভার বিদ্যা-সাধকদের দলও অবিদ্যা-সাধকদের হাতের মুষ্টিভিক্ষা পাবার জন্য কত না হুড়াহুড়ি কর্চ্ছে। হরি-সভা ও রাজনীতি-সভা যে দুই, তার মূলে কি আমাদের ভয় নয়? হরি-সভায় সরকারের এতদিন পর্য্যন্ত কোন আপত্তি ছিল না, কেননা তারা জান্ত যে হরিসভার লোকেরা যতই আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা বলুক না কেন, দেশের মুক্তির সঙ্গে এই সব হরিসভার সভ্যদের যোগ থাকা তাদের হাতগড়া শাস্ত্র সমর্থন করে না। এরা নিতান্ত ভাল মানুষ। হরিসভার সভ্যদের পরপদানত থাকতে কোনই আপত্তি নেই; আধ্যাত্মিক মুক্তি হলেই হল। সরকারের মনোভাব এই যে, প্রচলিত অধ্যাত্ম-উন্নতি ভারতের খুব হোক, অন্নময় কোষের প্রতি ভক্তজ্ঞানীদের দৃষ্টি না থাকলেই হল; তারা অর্থকে অনর্থ বলুক, আর পাশ্চাত্য অর্থকে অর্থ মনে ক'রে শোষণ করুক। ভক্তদের জুতোপেটা করেও যদি দু' মুষ্টি অন্ন দেওয়া যায়, তাতে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন বাধাই হয় না। যে ধর্ম্মের সামান্য অনুষ্ঠান করলে ভয় ত দূরের কথা, মহাভয় থেকেও ভক্ত মুক্ত হয়, আজ কিনা সেখানে দু'মুঠো অন্নের ভয়ও আমাদের গেল না? আমরা যা-কিছুর, যার-তার জন্য সেলাম দিতেও কোন অপমান বোধ করি না! "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"—শ্রীগীতা। সামান্য পুলিসের ভয়ই যায়নি, মহাভয় দূর ত অনেক দূরে। যে ধর্ম্ম মানুষকে নির্ভিক করেনা, যে ধর্ম্ম পুরুষোত্তম-"আমি"র গরবে গরব করতে শেখায় না, যে ধর্ম্ম দুনিয়ার বুক চিরে সেখান থেকে অমৃত রস আহরণ করতে শেখায় না, সে হীন ধর্ম্ম ভারতের নয়। হরিসভা যতই ভাগবত, গীতা, উপনিষদ্, কীর্ত্তনের বন্দোবস্ত করুন না, ঠাকুর কিন্তু তার চতুঃসীমানায়ও আসবেন না। ধর্ম্মের বিলাসিতা ও কর্ম্মের বিলাসিতা আমাদিগকে আক্রমণ করেছে, যেদিন থেকে ধর্ম্ম ও কর্ম্ম আলাদা হয়ে ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে। বিদ্যাহীন অবিদ্যা বরং ভাল, কিন্তু অবিদ্যাহীন বিদ্যা মারাত্মক; সংসারহীন সন্ন্যাস, সন্ন্যাসহীন সংসারের চেয়ে জীবনে অধিকতর

অন্ধকার এনে দেয়। সংসারী ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক কতখানি ত্যাগী, বৈরাগী, সহিষ্ণু, উদার হ'তে বাধ্য; স্ত্রী-পুত্রকে ফেলে কোন্ সংসারী নিজের জন্য ষোল আনা ভাবতে পারে? তার আবেষ্টনই তাকে জোর করে ত্যাগী সাজায়! সন্ন্যাসীর বাইরের কোন বন্ধন না থাকায় তার পক্ষে উদারতা, সহিষ্ণুতার সাধনা অনেক সময়েই হ'য়ে ওঠে না। কৃষক কত কর্ম্ম করে, অন্ন সৃষ্টি করে, আর আমরা কত সহজে তা হজম করি; কৃষকের পক্ষে আরামপ্রিয় হবার পথ রুদ্ধ, আমাদের পক্ষে আরামপ্রিয় হবার সুযোগ খুবই বেশী। বিদ্যা খাবে পরবে, হাসবে খেলবে, বেঁচে থাকবে অবিদ্যার রক্ত শোষণ ক'রে, আবার হেয়, মিথ্যা ব'লে গালও দেবে তাকেই। বিদ্যার পক্ষে এই যে exploitation, ইহাই ঋষির চক্ষে বিদ্বানের জন্য অধিকতর অন্ধকারের রাজ্য। বিদ্বানের শোষণ-কার্য্য যত সহজ ও আপদ-মুক্ত, অবিদ্বানের শোষণ-চেষ্টা ততই বাধাযুক্ত। বিদ্যা ও অবিদ্যার সমীকরণ, পরস্পরের সসম্মান সন্নিবেশ ব্যবস্থা করতেই উপনিষদ বলেছেন—

বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চৈব যস্তদ্বেদ উভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে॥

"যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যাকে সহভাবে জানেন, তিনি অবিদ্যার সাহায্যে মরণ জয় করেন, বিদ্যার সাহায্যে অমৃত হন।"

বিদ্যার অর্থ ঠাকুরঘর, অবিদ্যার অর্থ রাজনীতিসভা; বিদ্যার অর্থ জ্ঞানভক্তি, অবিদ্যার অর্থ কর্ম্ম; বিদ্যার অর্থ বিশেষ ভাব, অবিদ্যার অর্থ সামান্যভাব; বিদ্যার অর্থ সন্ন্যাস, অবিদ্যার অর্থ সংসার; বিদ্যার অর্থ "এক," অবিদ্যার অর্থ "বহু"। দার্শনিক ব্র্যাডলি সহভাবের অনুরূপ একটী শব্দ দিয়েছেন—Togetherness। কখনও ঠাকুর ঘরের পিছনে রাজনীতির স্থান, কখনও বা রাজনীতির পিছনে ঠাকুর ঘরের সাধনা সন্নিবেশ। রাজনীতি বাদ দিলে মরণ আসবেই আসবে, কেবল ঠাকুর ঘরের বিদ্যা-সাধনা সাধককে রক্ষা করতে পারবে না। সকলের সঙ্গে "সমান" হয়ে "সাধারণ" আসনে বসে যে সাধনা, তাই অবিদ্যার সাধনা; সকলের থেকে "বিশেষ" হয়ে যে সাধনা তাই বিদ্যা সাধনা। সামান্য ভাবই পারিবারিকতা, সামাজিকতা, জাতীয়তা ও বিশ্বজনীন ভাব। যে ধর্ম্ম পরিবার সমাজ ও জাতির উন্নতি বিধানের জন্য অনুষ্ঠিত হয় না, তা কখনও মরণ-ভয় দূর করে না। "দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি"—উপনিষদ্। আমার পরিবারে পিতামাতা, ভাইবন্ধু, স্ত্রীপুত্র

সবার ভিতরে এক অদ্বিতীয় "আমি" আছি; এক সমাজের এক উত্তম-পুরুষ "আমি"ই আছি। এই অবিদ্যার জ্ঞানলাভ হলেই না তবে আমার বিশেষত্ব দিয়ে রাস লীলায় যোগদান সম্ভব হবে? "সকলের হয়ে যাওয়াই" ধর্ম্মের অবিদ্যা অংশ; আবার সকলের মধ্যেও আমি একটী "বিশেষ" সত্তা, ইহাই বিদ্যার অংশ। সকলের মধ্যে হারিয়ে গেলেই মরণ জয়, হারিয়ে গিয়ে মানুষ যখন বিশেষ করে নিজকে ফিরিয়ে পায়, তখনই অমৃতাস্বাদন।

বর্ত্তমান যুগ এই "সকলের মাঝে ডুবে যাওয়ার" দিকটাকে ধর্ম্ম সাধনা হতে এত অতি মাত্রায় ডুবিয়ে দিতে যাচ্ছে যে, কেবল ব্যক্তিগত নামজপ, ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা, ব্যক্তিগত মুক্তিকে একমাত্র পরমার্থ বলে বুঝছি, বোঝাতেও প্রচার কচ্ছি। ফলে কিন্তু অর্থ ও পরমার্থ দুইই হারিয়েছি। অবিদ্যাকে তাড়াতে যেয়ে অর্থাৎ পরিবার সমাজ ও জাতীয় সাধনা বর্জ্জন করে মরণ ডেকে ঘরে এনেছি; বিদ্যার সাধনাও তার অবশ্যম্ভাবী ফলরূপে অমৃত না দিয়ে এনেছে ক্লীবত্ব। যার পারিবারিক "আমি" জাগেনি, যার সামাজিক ও জাতীয় "আমি" এখনও অত্যাচারের সামনে গর্জ্জন করে উঠতে দ্বিধা বোধ করে, তার বিশেষ রসাস্বাদন আকাশ-কুসুমবৎ কল্পনা; সে নিজেই মরণের টানে হা-হুতাশ কর্চ্ছে, কেমন করে অমৃতের আস্বাদনে কৃতার্থ হবে? যে ধর্ম্ম মানুষকে "আত্মা"-পদ-বাচ্য করে, সে ধর্ম্মকে সরকার ভয় করে, কিন্তু যে ধর্ম্মে মানুষ ঘরের কোণে লুকিয়ে নিত্য নারী হরণ, নিত্য চরমনাইর ও জালিয়ানওয়ালা, শ্বেতাঙ্গের পদাঘাতে কৃষ্ণাঙ্গের নিত্য প্লীহাফাটা প্রভৃতি দৃশ্য হজম করতে শেখায়, সে ধর্ম্মের ধার্ম্মিক যত বেশী হবে, সরকার পক্ষ তাদের জন্য ততই সুযোগ সুবিধা করে দিতেও রাজি!

যে বাস্তব ধর্ম্ম একদিন অত বড় কংসের আহার নিদ্রা কেড়ে নিয়েছিল, শিশুপাল-দন্তবক্রের মরণ এনে দিয়েছিল, হিরণ্যকশিপুকে হয়রাণ করে তুলেছিল, সে ধর্ম্ম কিনা অত্যাচারী শাসন-যন্ত্রের দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম হচ্ছে না! ধর্ম্ম নাই, আছে শুধু ধর্ম্ম-বিলাস। হিরণ্যকশিপুর রাজ্যে যে হরিনাম-কীর্ত্তন বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই নাম কীর্ত্তনই বটে নাম-ব্রহ্মকীর্ত্তন। যে দিন খোল করতাল, হরিনামে চোখের জল, ঠাকুর-ঘর সব seditious বলে ঘোষিত হবে, সে দিন বুঝব ভারতে বাস্তব জাতীয় "আমি"র জাগরণ এসেছে, নচেৎ ৬০ লক্ষ সন্ন্যাসী বৈরাগী থাকৃতেও যে দেশ "আমি"র নিত্য অপমান চোখের উপর দেখছে, তাদের কি একটা ধর্ম্ম?

নিছক তা ক্লীবত্ব। যে মন্ত্রে একদিন ভগবান্ অর্জ্জুনকে ক্লীবত্বের পাপাবর্ত্ত থেকে টেনে তুলেছিলেন, আজ পরপদদলিত ভারতের অন্তরাত্মা সেই মন্ত্রে দীক্ষালাভ করবার জন্য রুদ্ধ-আবেগে সব বাহ্য আন্দোলন থামিয়ে ধ্যান নিমগ্ন! ভগবান নেমে আস্‌ছেন, ভয় কি?

প্রলয়-পয়োধি জলে ধৃতবানসি বেদম্,
বিহিত-বহিত্র-চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীন শরীর
জয় জগদীশ হরে। বন্দে মাতরম্।

"ধনবান অম্লশূল রোগী বেদনায় ছট্‌ফট্ করিয়া সারা রাত ঘুমায় নাই। সকালে দেখিল ফুটপাথের ওপরে পড়িয়া কুলী আরামে নিদ্রা যাইতেছে। তখন তেতলার ধনী রোগী চীৎকার করিয়া বলিতেছে, 'ঐ দরিদ্রের মতন আমাকে রাস্তার ধারে একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে দাও হে ভগবান। চাই না আমি তেতলা, চাই না আমি টাকা।' এই ঘুমের প্রতি যে লোভ, প্রকৃতির ভাব ও কান্তির প্রতি এই জাতীয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গৌর হইলেন। ঐশ্বর্য্যের ঝাঁঝ আজ দারিদ্র্যের নিশ্চিন্ততার জন্য লুব্ধ।......।"

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী
১৮ই মার্চ, ১৯৫৭

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

॥ শ্রীপ্রতিভা রায় ॥

স্বামীজী ছিলেন দিব্য ক্ষত্রিয়, রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বীর যোদ্ধা। বরিশালের শরৎ কুমার ঘোষের নাম সর্ব্বজন সুপরিচিত। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা এবং দেশ-সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও সর্ব্বস্ব ত্যাগে বাংলায় এক বিরাট উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার জীবন ছিল কি এক বৈচিত্র্যময় সমন্বয়পূর্ণ। কোনটীকে বাদ দিয়া কোনটী তিনি করেন নাই। সংসার এবং সন্ন্যাসের কোন কঠিন ভেদের প্রাচীর তাঁহার জীবনে ছিল না। সেই জন্যই তিনি সংসার আশ্রমের যাবতীয় বিভাগে, যথা সমাজ-নীতি, পরিবারনীতি, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সকলক্ষেত্রেই সমানভাবে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন। পৃথক ভাব তাঁহার জীবনে ছিল না বলিয়াই এই সকল পরস্পর • পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিয়াই অথচ কোন ক্ষেত্রে আটকাইয়া না রাখিয়াই তাঁহার জীবনকে সমগ্রতার এক পরিপূর্ণ রূপ দান করিয়াছিল।

স্বামীজীর লিখিত উজ্জ্বল ভারত পত্রিকার একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন— "আমরা বৈরাগ্যকে যত ভালবাসি বলিয়া মনে করি, ভগবানকে তত ভালবাসি না। বৈরাগ্যের পথে আমরা সংসারকে সর্ব্বদাই বাধা প্রদান করিতেছি, তাই সংসারও আমাদিগকে তার মধ্যে লীন করিবার জন্য আকর্ষণ করিতেছে। যতখানি সংসার-বিদ্বেষ আমাদের আছে ততখানি কেন, তার শতাংশের একাংশও ভগবানে প্রীতি নাই। স্ত্রীপুত্রকে মায়ার মূর্ত্তি মনে করিয়া যতই ত্যাগ করিতে চাহিব, স্ত্রীপুত্র ততই মায়ামূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবনকে ডুবাইবে। ঘৃণা আসক্তিরই নামান্তর মাত্র। কামিনী কাঞ্চনকে ঘৃণা করি ভালবাসি বলিয়াই।"

স্বামীজীর পুরুষোত্তম-জীবনে স্ত্রী পুত্র কন্যা কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই, শ্রীরাধা কৃষ্ণের ভাব ও রসে ভাবিত জীবনের ভিতর ভাবিত ও রসিত হইয়া তাঁহার চলার পথে সাহায্যই করিয়াছেন। মায়ার সর্ব্বমঙ্গলা মূর্ত্তি তাঁহার আদর্শে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংসার এবং সন্ন্যাস, ব্রহ্ম এবং

মায়ায় সমন্বয়ই তাঁহার আদর্শ। সেই জন্যই দেশবাসী বহু রূপেই বহু ক্ষেত্রেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সময় তাঁহার দেশাত্মবোধের গর্জ্জনে মৃতপ্রায় বাংলার নরনারীকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে দেশবাসী দেখিয়াছেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী পুরুষ। যেদিন তাঁহার সেই দেশাত্মবোধের গর্জ্জনে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট চঞ্চল হইয়া বক্তৃতা বন্ধ করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছিল, তিনি তখন বরিশাল জেলার ভোলাতে ছিলেন, এই আদেশের প্রতি উত্তরে তিনি ৭ দিন অনশন করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া তিনি সারাজীবন অন্যায়ের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছেন। সেই সময় তিনি বরিশালে বিলাতী কাপড় বয়কটের জন্য ১৮ দিন অনশন করিয়া দেশবাসীকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিলেন। কাপড়ের ব্যবসায়ী মহাজন সমিতির লোকেরা আসিয়া তাঁহার নিকট বিলাতী কাপড়ের ব্যবসা বন্ধ করিবার স্বীকৃতি দিয়া তবে তাঁহার অনশন ভঙ্গ করাইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে বেদান্ত ও কংগ্রেসে কোনও বিরোধ ছিল না। তিনি উজ্জ্বল ভারতের একস্থানে লিখিয়াছেন—"কংগ্রেসকে জগন্নাথ ক্ষেত্র বুঝিয়াই ঝাঁপ দিয়াছিলাম, কংগ্রেস ছিল আমার নিকট ভারতের কুম্ভমেলা। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদক, নির্ব্বিশেষ বেদান্ত ও ভাগবত যে ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিশেষ কোনও নীতির এক চেটিয়া সম্পত্তি হইতে পারে না, বেদান্তের এই যুগোপযোগী মূর্ত্তিই আমার প্রাণের কাছে প্রতিভাত হইয়াছিল। আমি বেদান্তকে সর্ব্বনীতির সমন্বিত ভাগবত নীতির লীলাক্ষেত্র বলিয়া চিনিয়াছি। ভারতের বেদান্ত একাধারে ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার সকলকে এক অদ্বৈত-রস প্রচারে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল। যিনি ছিলেন মনে, বনে ও কোণে তাহাকেই দিবালোকে বিশ্বের দরবারে প্রকাশ্য রাজপথে ছড়াইয়া দিতে হইবে, তবেই না বেদান্ত বিশেষ কোন যুগ, দেশ বা সম্প্রদায়ের না হইয়া, সর্ব্ব যুগের, সর্ব্ব দেশের, সর্ব্ব সম্প্রদায়ের হইবে? বেদান্তের এই আলোকেই কংগ্রেসে উজ্জ্বলভারতের ভবিষ্যৎ কুম্ভমেলার বীজ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাই তাহাতে ঝাপাইয়া পড়িয়াছিলাম।" যেদিন তিনি বুঝিয়েন কংগ্রেস তাহার আদর্শ ভ্রষ্ট হইতে চলিয়াছে, কংগ্রেস কুম্ভমেলা হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইদিন তিনি সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া স্বরাজ-সেবকসঙ্ঘ গঠন করিয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মূল নীতিকে তিনি কখনও বর্জ্জন করেন নাই।

হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষে যখন পাবনা আদি স্থান ঘোর বিপদাপন্ন, সেইসময় তিনি 'গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী' স্থাপন করিয়া প্রেম-ঘন বিপ্লবী ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন আদর্শ লইয়া সেই সকল স্থানে গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজের শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু প্রেমের ঠাকুর, অথচ তিনি যে ঘোর বিপ্লবী পুরুষ, কাজীর বিরুদ্ধে অভিযান যে রাজবিদ্রোহ একথা কি কেহ ভাবিয়াছে? তিনি যে সমাজের সকল বৈদিক নিয়ম পদ্ধতি, বৈদিক পূজা পার্ব্বণ সব ধর্ম্ম গঙ্গার জলে ভাসাইয়া হরিনামের, হরিপ্রেমের বন্যায় নদীয়ার তথা বাংলার এবং ভারতের নরনারীকে ভাসাইয়াছিলেন, একি ভীষণ বিপ্লবী পুরুষের কার্য্য নয়? স্বামীজীর উজ্জ্বল ভারত পত্রিকার একস্থানে লেখা আছে—"মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম মানুষকে ক্লীব করে না। ভগবদ্দত্ত স্বাধিকার রক্ষা যে স্বরূপের আস্বাদন। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ভগবানের দান; জগতে এত বড় কোন্ কাজী আছে যার আহ্বান আমাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। যে ধর্ম্ম মানুষকে অধিকার রক্ষা করিবার জন্য উন্মাদ করে না, সে কি আবার ধর্ম্ম! এমন ধর্ম্মই বর্ত্তমানে প্রয়োজন যার আস্বাদনে ভারতবর্ষ তার প্রকৃতি-দত্ত অন্নের অধিকার, বস্ত্রের অধিকার, নুনের অধিকার, ধর্ম্মের অধিকার অটুট রাখার জন্য কাজীর সকল ক্রোধ সকল বন্ধন অম্লান বদনে হাসিমুখে বরণ করিতে পারে।" শ্রীগৌরাঙ্গের এই জীবন-আদর্শ সেই সময় স্বামীজী বাংলার দুয়ারে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমময় বিরাট প্রাণের ভিতরই হইতে পারে হিন্দু-মুসলমানের মিলন। যিনি সব হইয়া, সবকে হজম করিয়া পূর্ণ মানব, তাঁহার জীবনেই হয় সকলের সকল ভেদ বুদ্ধির অবসান।

এইরূপভাবে দেশবাসীকে দেখা দিবার কিছু পরই পুরুষোত্তমের টানে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন চলিয়া যান। পুরুষোত্তম-প্রেমে পাগল-প্রাণ পুরুষোত্তমের লীলা ভূমিতে পুরুষোত্তমের লীলা-আস্বাদনের ভিতর দিয়া বৈরাগ্যপূর্ণ জীবন যাপন করিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার জীবনে ঝুর ঝুর করিয়া তত্ত্ব বৃষ্টি হইত। আড়াই বৎসর বৃন্দাবন ছিলেন, সেখানেও তিনি শোষণের বিরুদ্ধে সভা করিয়া বার বার বিপ্লব ঘোষণা করিয়াছেন। বৃন্দাবনের কূপগুলিতে মুসলমানেরা জল তুলিতে পারিত, কিন্তু চামার মেথর কূপ ছুঁইতে পারিত না। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সভা করিয়া তাঁহার ওজস্বী ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাঁহার এই প্রতিবাদের পর বৃন্দাবনের কূপের জল লইবার অধিকার চামার মেথর সকলেরই হইয়াছিল।

এইরূপভাবে তিনি মালা তিলক ধারণ না করিয়াও বৈষ্ণব সমাজের ভালবাসা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাণখোলা ভালবাসার ভিতর দিয়াই তিনি সকল সম্প্রদায়ের সকলের হৃদয় জয় করিয়াছেন। নিজের আদর্শে অচ্যুত থাকিয়া প্রীতি ও ভালবাসা দিয়া বহুলোকের প্রীতি ও ভালবাসা লইয়া আড়াই বৎসর বৃন্দাবন বাসের পর, স্বপ্নে মহাপ্রভুর আদেশে তিনি পুনরায় বাংলায় ফিরিয়া আসেন।

তিনি যখন বরিশাল আসেন, তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলের চিন্তা, শরৎবাবু সন্ন্যাসী হইয়া আসিতেছেন, তিনি কোথায় উঠিবেন? কিন্তু বীর সন্ন্যাসী পুরুষোত্তমানন্দ বরিশাল আসিয়া এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, আমি আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা যেখানে আছে সেইখানেই উঠিব। শ্রীনিত্যগোপাল বলিয়াছেন—"স্বভাবে সন্ন্যাসী হও"। তাঁহার প্রিয় শিষ্য পুরুষোত্তমানন্দ তাঁহার জীবন দিয়া গুরুর আদেশ পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছিলেন আজন্ম সন্ন্যাসী। মহাত্মাজী যখন শুনিলেন শরৎ ঘোষ সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তিনি বলিয়াছিলেন —"শরৎবাবু আগে কি কম সন্ন্যাসী ছিলেন, গেরুয়া পরিয়া বেশী কি সন্ন্যাসী হইলেন?"

বৃন্দাবন হইতে পুরুষোত্তমানন্দজী যখন বরিশাল আসিলেন সেই সময় বরিশালের কর্ম্মীবৃন্দ যোগ্য নেতা বিহনে ম্রিয়মান ছিলেন। এমন সময় তিনি আসিয়া ১৯৩০ সনের লবণ আইন অমান্যে যোগদান করিয়া পুনরায় বরিশালে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন নিরলস অভিমানশূন্য কর্ম্মী। সেই সময় তাঁহার জনৈক সহকর্ম্মী বলিয়াছিলেন, শরৎ বাবু, আপনি আসিয়াছেন, আমরা আপনাকে ডাকিব তবে তো আপনি আসিবেন আমাদের সহিত কাজে যোগদান করিতে। কিন্তু আপনি আমাদের ডাকিবার অবসরও দিলেন না, আসিয়া লবণ আইন অমান্য করিবার যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিনি এমনই দেশ মাতৃকার সেবক ছিলেন যে তাঁহাকে কর্ম্মের জন্য কাহাকেও ডাকিতে হয় নাই। তিনি স্ত্রী পুত্র কন্যা লইয়া সদলবলে কীর্ত্তন করিতে করিতে লবণ আইন অমান্যে বাহির হন। গ্রামে গ্রামে লবণ আইন অমান্য করিয়া ৮০ মাইল পদব্রজে যাওয়ার পর রাজরোষে পতিত হইয়া পুনরায় ৬ মাসের জন্যে জেলে চলিয়া যান। তিনি এইরূপ ভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তিন বার জেলে গিয়াছিলেন। ১৯৪২ সনের আগষ্ট আন্দোলনেও তিনি এক বৎসর আলীপুর জেলে ছিলেন। তাঁহার সেই জেলে বাস

করিবার সময় তিনি এগারখানা উপনিষদ্ ও গীতার অবধূত ভাষ্য লিখিয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় দুর্ভিক্ষের বক্তৃতা দিবার পূর্ব্বে তিনি নিজে ৪ দিন অনশন করিয়া অন্নহীন দেশবাসীর সম-দুঃখে দুঃখী হইয়া তবে তাহাদের নিকট বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়খানি ছিল করুণ কোমলতায় ভরা। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে মান্দালয়ের জেলে রাজবন্দীদিগের উপর রাজশক্তির অন্যায় অত্যাচারের বেদনায় ব্যথিত হইয়া ১৮ দিন অনশন করেন। তাঁহার সেই অনশনে বাংলার দেশ সেবকেরা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহার প্রমাণ বহু পত্রাদির ভিতর দিয়া আমরা পাইয়াছি। বরিশাল টাউন হলকে সিনেমা কোম্পানির নিকট ভাড়া দিবার প্রতিবাদে ৪৫ দিন অনশন করিয়া বরিশালের সিনেমা বন্ধ করিয়াছিলেন। জাতীয় বিদ্যালয় গঠন করিবার সংকল্প হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি ২১ দিন অনশন বরণ করেন। এইরূপে তিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে বার বার অভিযান করিয়াছেন। দেশবাসী ভাইদের কিম্বা রাজার কিম্বা আত্মীয় স্বজনের কাহারও অন্যায় তিনি নীরবে সমর্থন করেন নাই, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি বার বার গর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার ক্ষত্রিয়ত্বের পরিচয়।

তিনি ছিলেন দিব্য বৈশ্য—এক পয়সার হিসাবও তিনি রাখিতেন। বেহিসাবি খরচ তিনি কখনও করেন নাই, কেহ করিলে বেদনা বোধ করিতেন। তাঁহার পাঠ্যজীবন সমাপনের পর কিছুদিন তিনি কলিকাতার উপর একটি কাটা কাপড়ের দোকান দিয়াছিলেন কিন্তু বেশী দিন সেই কার্য্য করিতে পারেন নাই, রাধারাণীর আকর্ষণে একদিন দোকান ফেলিয়া রাখিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছিলেন। সে বারে ৬ মাস বৃন্দাবনে ছিলেন। এক সময় প্রয়োজন বোধে তিনি নিজ হাতে হিসাব রাখিতেন। একজন ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ কেমন করিয়া সকল খুঁটিনাটির সহিত যুক্ত থাকিয়াও সত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারে, কেমন করিয়া মানুষ বিষয়কে বিশ্বসেবায় লাগাইতে পারে, তাহা আমরা স্বামীজীর জীবনে প্রতি নিয়তই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত সুদূর প্রসারী দৃষ্টি তাঁহার ছিল! তিনি প্রত্যেক ঘটনাকে একটা বিশ্বরূপ দৃষ্টি দিয়া দেখিতেন। বিষয়ের ভিতর সত্যানন্দের আস্বাদনই তাঁহার প্রতি কর্ম্মের ভিতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

তিনি ছিলেন দিব্যশূদ্র। তাহার প্রমাণ তাঁহার সারাজীবন ব্যাপী বিশ্ব সেবার প্রচেষ্টা। সত্যব্রত সমিতি, বিশ্বকল্যাণ সভা, স্বরাজ সেবকসঙ্ঘ,

গৌরাঙ্গ গোষ্ঠী, আনন্দমঠ, শেষ নরনারায়ণ আশ্রম। এতগুলি প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া তিনি বাংলা তথা বিশ্বের সেবা করিয়া গিয়াছেন। তিনি দিব্যশূদ্র, তাই তাঁহার সেবা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা—যাহাতে মানুষ তাহার লুপ্ত চৈতন্য শক্তিকে জাগ্রত করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে সেই প্রচেষ্টা তিনি প্রাণপণে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য, প্রত্যেক ব্যবহার, প্রত্যেক কর্ম্ম, প্রতি ক্ষণ শুধু বিশ্বরূপের সেবায় ব্যয়িত হইয়াছে। চারিবর্ণের মিলন-ক্ষেত্র যে হৃদয় সেই পুরুষোত্তমের হৃদয়কে নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি ছিলেন চারিবর্ণের, অথচ চারিবর্ণের অতীত পুরুষও। দর্শন ক্ষেত্র, রাষ্ট্র ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র এবং সেবা ক্ষেত্র এই চারি ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি, তাঁহার জীবনেই হয় চারিবর্ণের সমন্বয়। স্বামীজী উজ্জ্বল-ভারত পত্রিকার একস্থানে লিখিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের মত তৃণ হতেও নীচ, ক্ষত্রিয়ের মত তরু হতেও সহিষ্ণু, বৈশ্যের মত অভিমান-শূন্যতা, শূদ্রের মত মানদানী না হলে জগৎ-মঙ্গল আন্দোলনে পূর্ণাধিকার জন্মাবে না। পদদলিত হয়েও সুখ প্রদান করার সাধনা তৃণের কাছ থেকে তোমার শিখতে হবে, তুমি যে নিত্য ব্রাহ্মণ; শত বজ্র মাথায় নেমে এলেও বৃক্ষের মত মাথা উঁচু করে তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, তুমি যে নিত্য ক্ষত্রিয়; পুনঃপুনঃ হয়রাণ করলেও যে তার দুয়ারে তোমার প্রেমের পশরা বয়ে নিয়ে যেতে হবে, তুমি যে নিত্য বৈশ্য; পায়ে ধরেও যে তোমায় প্রাণের বারতা দ্বারে দ্বারে পৌছিয়ে দিতে হবে, তুমি যে নিত্যশূদ্র।" ইহাই স্বামীজীর জীবনে তাঁহার গুরুদেব শ্রীনিত্যগোপালের দান। সমন্বয়ের আলোকে স্বামীজীর জীবন-খানি ছিল সমুদ্ভাসিত। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিয়াছেন—"যাহার গুণ নাই সেই নির্গুণ, গুণের গুণ নাই, তাই-ই গুণই নির্গুণ"। এইভাবে পুরুষোত্তম স্তরে সত্ত্বগুণও নির্গুণ, রজোগুণও নির্গুণ, তমোগুণও নির্গুণ। আজ এই নির্গুণের স্তরে বিশ্বকে তুলিবার জন্য পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ টানাটানি করিতেছেন। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

পশু্রাম কি জরথুস্ত্র ?

(৩)

।। শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ।।

সর্ববিদ্যাঙ্গগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্বেদস্য পারগম্।
রামং ক্ষত্রিয়হন্তারং প্রদীপ্তম্ ইব পাবকম্॥
হরি বংশ—হরিবংশ পর্ব—২৭-৪০

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বভেবু (Babylon) প্রদেশের অন্তর্গত উর নগরের অধিবাসী ইব্রাহিম নামক একজন মহাপুরুষের কর্ণে, জমদগ্নি জরথুস্ত্রের মহাবাণী, একান্তিকতার উদাত্ত আহ্বান অকস্মাৎ প্রবিষ্ট হয়। তিনি চমকিত হইয়া নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠি সেমেতিক জাতিকে এই মহাসত্য গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিল না, বরং উহার অভিনবত্বে উত্তেজিত হইয়া তাহারা ইব্রাহিমকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। ইব্রাহিম আরবের পূর্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে সরিয়া গিয়া কানায়ান (Palestine) প্রদেশে বসতি স্থাপন করিলেন। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ইহুদি জাতির এই প্রথম প্রবেশ।

ইব্রাহিম (Abraham) ছিলেন একজন তাপস—ইহুদি খ্রীষ্টান ও মুসলমান, এই তিন জাতিই তাঁহাকে একজন নবী (প্রেরিত পুরুষ) বলিয়া গণনা করে। ইব্রাহিম দেশ ছাড়িয়া গেলেন, তবু যে মহাসত্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বর্জন করিতে রাজী হইলেন না। জরথুস্ত্রের মহাবাণী প্রচারকে তিনি জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়া একলব্যের নীরব সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; গুরুর সাক্ষাৎ-সংস্পর্শের অভাব তাঁহার উৎসাহ ক্ষুণ্ণ করিল না।

গুরুর পদাঙ্কানুসরণে ইব্রাহিম এতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছিলেন যে, মুসলমান ঐতিহাসিক ও আভিধানিকগণ ইব্রাহিমকে জরথুস্ত্র হইতে অভিন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (Haug—Essays on the Parsis—P. 13); আমেরিকান পণ্ডিত প্রবর Jackson তাঁহার Zaroastrian Studies নামক গ্রন্থে (পৃ—২০৫) পদে পদে গণনা করিয়া এই ঋণ দেখাইয়া দিয়াছেন; বিচারপতি আমির আলির মত একজন গোঁড়া মুসলমানও স্বীকার করিয়াছেন

(Spirit of Islam—P. 232) যে ইহুদিগণ পরিত্রাতার (Messiah) ধারণা জারথুস্ত্রদিগ হইতেই লাভ করিয়াছে।

আরও পাঁচশত বৎসর চলিয়া গেল। ইব্রাহিমের সুযোগ্য বংশধর মহাত্মা মুশা (Moses) হিব্রু ভাষার মাধ্যমে জমদগ্নি জরথুস্ত্রের * বাণী প্রচার করিলেন। ইহার নাম তোরা গ্রন্থ (Penta tench)। ইহা ইহুদিদিগের বেদ "পুরাতন-বিধানের" (Old Testament) মূল ভাগ। যীশুখ্রীষ্টের জীবন চরিত এবং বাণীর নাম "নব-বিধান" (New Testament)। ইহুদিদিগের পুরাতন-বিধান, আর খ্রীষ্টানদিগের নব-বিধান, উভয়ে মিলিয়া বাইবেল গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বাইবেলের উপর জারথুস্ত্র-তন্ত্রের প্রভাবের বিষয় জানিতে হইলে (1) Historian's History of the World—Vol 11 পৃ—১২৬ এবং (2) Comparative Religion—Macdonell —পৃ ১৩৮ দ্রষ্টব্য।

আরও দুই হাজার বৎসর পরে, আরবী ভাষায় তরজমা করিয়া হজরত মহম্মদ কোরাণে এই বাণী প্রচার করিলেন। মহম্মদ বার বার বলিয়া গিয়াছেন "আমি নূতন কথা কিছুই বলি নাই। ইব্রাহিম এবং মুসা যাহা বলিয়া গিয়াছেন আমি আরবী ভাষায় তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছি"। [কোরাণ—১৬-১২৪, ১০-৩৮, ৪৩-২, ৩০-২০, ৪৬-১২]

ইহার পোষকতায় আমরা পণ্ডিত Hurgronji-র মন্তব্য উল্লেখ করিতে পারি "Lammer's assertion that Islam was the Jewish Relegian simplified according to Arabic wants and amplified by some Christian and Arabic traditions, contains a great deal of truth." † অর্থাৎ ইসলাম ইহুদিধর্মের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র, কিন্তু খ্রীষ্টান ও আরবীয় ঐতিহ্যদ্বারা বিবর্ধিত।

পশুরাম চিরঞ্জীব—সত্য কখনও মরেনা—

মরেনা মরেনা কভু সত্য যাহা
শত শতাব্দীর বিস্মৃতির তলে।

* জমদগ্নি = যিনি অগ্নিকে খাইয়া দেখেন। অর্থাৎ অগ্নি যাহার নিকট নিষ্প্রভ। জরথুস্ত্র = যিনি উষ্ট্রকে (সূর্য্যকে) জীর্ণ করেন। অর্থাৎ সূর্য্য যাহার নিকট নিষ্প্রভ। উভয় নামের একই অর্থ—অত্যুজ্জ্বল।

† Hurgronji—Muhammadianism P. 61

নাহি মরে উপেক্ষায় অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে ॥　রবীন্দ্রনাথ—শিবাজী

ভগবান পশুরাম যে শাশ্বত সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, যাহা আমরা অবজ্ঞাভরে বামাচার বলিয়া উপহাস করিয়াছিলাম, দর্পভরে আসুরিক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, তাহাই আজ আবার আমাদিগকে শুনিতে হইতেছে, তবে জমদগ্নি জরথুস্ত্রের নিজ ভাষায় নহে, হিব্রুর মাধ্যমে, আরবিক তর্জমায়। তাই পদ্মা ব্রহ্মপুত্র এবং সিন্ধুনদের পবিত্র বেলাভূমিতে বৈদিক সুক্তের সামগান আজ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

ইহা হইতে পারিত না, যদি আমরা ভগবান পশুরামের অবতারত্বের সম্যক্ সম্মান করিতে জানিতাম, যে অমিত বলে পশুরাম বলীয়ান ছিলেন, তাহার কণিকা মাত্রও যদি নিজদিগে সঞ্চারিত করিতে পারিতাম।

আমাদিগের ভ্রম যদি আমরা সংশোধন করিতে পারি, কেবল আঙ্গিরস বেদেই সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ভার্গববেদ উপস্থাকে (আবেস্তাকে) যদি আমরা অথর্ববেদের অবিচ্ছেদ্য অপরার্দ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি, তবেই প্রায়শ্চিত্ত (change of heart) দ্বারা আমাদের পাপ খণ্ডিত হইয়া যাইতে পারে।

যদি আমরা বুঝিতে পারি যে কেবল হিন্দু নহে, পার্শীজাতিও বৈদিক সংঘের অবিচ্ছেদ্য অংশ, হিন্দু ও পার্শী দুইটী বিভিন্ন জাতি নহে, উভয়ে মিলিয়া একই জাতি, একই সমাজ, দক্ষিণ ও বাম বাহুর ন্যায় উভয়েই উভয়ের অনন্যসহায়, তবে পূর্বে পীতসমুদ্র হইতে পশ্চিমে ভূমধ্য-সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগ আবার বেদ-নির্ঘোষে আরাবিত হইবে, সাম গানের বিপুল স্পন্দনে সমস্ত এশিয়া জাগিয়া উঠিবে।

একদিন তো এমনই ছিল। দেখিতে পাই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে (হজরত মুসা কর্তৃক ইহুদিজাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠারও পূর্বে) হিটাইটের সম্রাট সব্ব-ললাম, ইন্দ্র ও বরুণের, মিত্র ও নাসত্যের, নাম উচ্চারণ করিয়া মিতানি সম্রাটের সহিত সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিতেছেন।

মিত্রস্য ইলদনি　　বরুণস্য ইলানি।
ইন্দ্র ইলানি　　নাসত্যৌ অন্যৌ ॥ *

[ইলানি = ঈড়ে = পূজা করি]

* (i) Bannerjee Sastri—Asura India P. 89
(ii) উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন—মানবের আদি জন্মভূমি পৃ ২৪৭

ইহা ঔপন্যাসিকের অলীক কল্পনা নহে, ঐতিহাসিকের কঠোর সত্য। বঘাজ-কোই পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ শিলালিপি (পণ্ডিতবর উইনক্লার যাহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন) সাড়ে তিন হাজার বৎসর ধরিয়া বৈদিক দেবতার শান্তিবাণী আজ পর্য্যন্ত বহন করিয়া আসিতেছে।*

পূর্বে যাহার নাম ছিল হিটাইট প্রদেশ, বর্তমানে তাহার নাম এশিয়া মাইনর, কিম্বা এশিয়াতিক তুরস্ক। ইহা ছিল প্রাচ্য আর্য্য পারসিক, আর প্রতীচ্য আর্য্য গ্রীকের মিলন ভূমি। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী এই অঞ্চল গ্রীক ও পারসিক উভয় জাতি দ্বারা অধ্যুষিত হইলেও পারসিক প্রভাবই ছিল প্রবলতর। এথায় গ্রীক নৃপতি ক্রোশাস, পারসিক সম্রাট কুরুকে (Cyrus) কর-প্রদান পূর্বক তদধীন সামন্তরাজারূপে লিডিয়াতে রাজত্ব করিতেন।† ভূমধ্যসাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইত ভার্গব-বেদ উপস্থার (Avesta) মনোহর নিনাদ।

আবার কেন সেইরূপ হইবে না? ভগবান পশুরামের অবতারত্বের দাবী পূর্ণরূপে স্বীকার করিয়া নিলেই বৈদিক সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে।

তান্ত্রিক আচার্য্যদিগের দৃষ্টি তো এই লক্ষ্যেই নিবদ্ধ ছিল। তাই তাঁহারা দক্ষিণ এশিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—অশ্বাক্রান্তা, রথক্রান্তা আর বিষ্ণুক্রান্তা। মধ্যস্থলে বিষ্ণুক্রান্তা ভারতবর্ষ, পূর্বে ব্রহ্ম-আনাম-কম্বোডিয়া গঠিত রথক্রান্তা, আর পশ্চিমে পারস্য-আর্মেনিয়া-তুরস্ক সংগঠিত অশ্বাক্রান্তা। পারস্যোপসাগর হইতে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম ছিল অশ্বাক্রান্তা ভূমি।

প্রাচীনকালে এই তিনটী ভূভাগই বেদের প্রভাবের অধীন ছিল। কালক্রমে অশ্বাক্রান্তা প্রদেশ ম্লেচ্ছদিগের প্রভাবের কবলিত হয়। তান্ত্রিক আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় ছিল অশ্বাক্রান্তাকে আবার বেদের গণ্ডীতে ফিরাইয়া আনা। তাই তাঁহারা বৈদিক আচারের কঠোরতা অনেকটা হ্রাস করিয়া দিয়াছিলেন; যাহাতে বৈদিক সাধনার মূলতত্ত্বও বজায় থাকে, অথচ আচার বাহুল্যের প্রপীড়নে কর্মচঞ্চল সাধারণ লোক ম্লেচ্ছ ধর্মের দিকে আকৃষ্টও না হয়।

কৌলমার্গের মর্মকথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন শ্রেষ্ঠ কৌল, মূর্ধাভিষিক্ত শাক্ত,

* Griswold—God Varuna in the Regveda P. 29

† Wells—History of the World—Chap 24.

চক্রপাণি একনাথ গুরু গোবিন্দ সিংহ। তাই তিনি মনে করিতেন যে কেবল অশ্বাক্রান্তা-রথক্রান্তা-বিষ্ণুক্রান্তা নহে, সমগ্র ভূমণ্ডলই একদিন বৈদিক সাধনা প্রণালী গ্রহণ করিবে।

সকল জগৎমে খালা পন্থ গাজে।
জাগে ধর্ম হিন্দু তুরক ধন্ধ ভাজে॥

[গাজে = গর্জন করে, জয়যুক্ত হয়। ভাজে = ভাঙ্গে]

গোবিন্দ সিং—ছক্কা—১

—সকল জগতে শিখপন্থার বিজয় ঘোষিত হউক। হিন্দুধর্ম জাগিয়া উঠুক। তুরকের মোহ (বৈদিক ধর্মের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা) কাটিয়া যাউক।

গজমূর্খ তাহারা যাহারা মনে করে ধর্মাচরণের আবরণে মদ্য-মাংস-মৎস-মৈথুন-মুদ্রার নিরর্গল ভোগের অনুমোদন দিবার জন্যই কৌলমার্গ প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইন্দ্রিয়-সংযমের আবশ্যকতা বিষয়ে তান্ত্রিকগণ উদাসীন ছিলেন না। তন্ত্রশাস্ত্র তারস্বরে রটনা করিয়াছেন

জিহ্বা দগ্ধা পরান্নেন করৌ দগ্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ।
মনো দগ্ধং পরস্ত্রীভির্ কথং সিদ্ধির্ বরাননে॥

কুলার্ণবতন্ত্র—১৫-৯

যে পর্য্যন্ত মিষ্টান্নের প্রতি লোভ থাকে, পরের দ্রব্য আহরণ করিতে ইচ্ছা হয়, পর-স্ত্রী দেখিলেই মনে লালসা জাগে, সে পর্য্যন্ত ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভের আশা সুদূর পরাহত।

তবে কিনা তান্ত্রিক আচার্য্যগণ মানুষের দুর্বলতার কথা জানিতেন, আর বৈদিক আচারের আত্যন্তিক কঠোরতা হ্রাস করারও প্রয়োজন আছে এমন মনে করিতেন। কাহারও যদি দৈবাৎ পদস্খলন হইয়া থাকে, তজ্জন্য তাহাকে চিরদিনের জন্য ধর্মচক্রের গণ্ডীর বাহিরে ঠেলিয়া দেওয়া মূর্খতা মাত্র। তাহা হইলে অশ্বাক্রান্তাকে আর বৈদিক গণ্ডীতে ফিরাইয়া আনা যাইবে না। ইহাই তাহাদের পঞ্চ মকার মর্ষণের (toleration) হেতু। কিন্তু তাঁহারা বৈদিক আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই। পঞ্চ মকারকে পশ্বাচার বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। [মহানির্বাণতন্ত্র স্পষ্ট বলিয়াছেন (১৪—২০৪) যে, যাহাতে বংশে কেহ আর পশু না থাকে, তাহাই মহানির্বাণতন্ত্র প্রচারের হেতু।] বীরাচারের (ত্যাগের) মধ্য দিয়া পশ্বাচার (ভোগ) হইতে দিব্যাচারে (তন্ময়তায়) আরোহণই তন্ত্রের আশয়।

যাহারা আচার বাহুল্যের পীড়নে বৈদিক সংঘ ছাড়িয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে বৈদিক চক্রে ফিরাইয়া আনাই ছিল কৌলমার্গ প্রবর্তনের প্রধান হেতু। কৌলমার্গের মূল রহস্য অবগত ছিলেন বলিয়াই মুখ্য কুলীন, মূর্দ্ধাভিষিক্ত চক্রেশ্বর, গুরু গোবিন্দ সিংহ কৌলসাধনার বিশুদ্ধ রূপ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। চণ্ডী ছিল তাঁহার অতি প্রিয় গ্রন্থ। তিনি দুইটী বিভিন্ন ছন্দে চণ্ডীর দুইটী অনুবাদ করিয়া, উভয়কেই "দশম পাতপাহাকী গ্রন্থে" অন্তর্ভূক্ত করিয়া চণ্ডীকে যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিয়া গিয়াছেন। "ভগবতী দী বার" (ভগবতীর স্তোত্র) শিখদের নিত্য-পাঠ্য স্তবরূপে তিনি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

গুরু-গোবিন্দের বিনায়কত্ব (Leadership) যদি আমরা স্বীকার করিয়া লই, তবে অশ্বাক্রান্তা ভূভাগ অচিরেই আসিয়া আবার বৈদিক-সংঘে যোগ দিবে।

কারণ পারস্য আর্মেনিয়া ও তুরস্কের আর্য্য অধিবাসীগণ তখন বুঝিতে পারিবে যে, ইসলাম ভগবান্ জরথুস্ত্র-প্রচারিত ধর্মতন্ত্রের আরব্য সংস্করণ মাত্র, সাধনার মূলতত্ত্ব হিসাবে কোরাণ গাথারই প্রতিবিম্ব। তখন তাহারা উপলব্ধি করিবে যে, মজ্দা-যস্কের সহিত বিবাদ একটা নিরর্থক শক্তিক্ষয় মাত্র—রামচন্দ্রের সহিত লবকুশের যুদ্ধের ন্যায় অহৈতুক, রোস্তমের সহিত সোহ্রাবের যুদ্ধের ন্যায় মর্মান্তিক।

তখন অসুর পূজার মূল প্রবর্তক জরথুস্ত্রকে, বামাচারের আদি প্রচারক পশুরামকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুসলমানও আসিয়া হিন্দু-পার্শীর সহিত মিলিত হইবে, গুরু গোবিন্দ সিংহের স্বপ্ন সার্থক হইবে। কারণ মুসলমানের নিকট এই আবেদনই তিনি করিয়াছিলেন। কোরাণকে বর্জন করিতে তিনি বলেন নাই,—কোরাণের মূল যে অথর্ব-ভার্গব বেদ তাহাকেও গ্রহণ করিতে তিনি বলিয়াছেন।

কলিমহি বেদ অথর্বন্ হুয়া।
নাম খুদাই অল্লহু ভইয়া ॥—আদিগ্রন্থ—রাগ আশা, মহল্লা—১।

'অথর্ব বেদই কলিযুগের বেদ,' ইহা বুঝিয়া লও। পরে ঈশ্বরকে 'আল্লা' নামেও ডাকিতে পার।

হিন্দু-পার্শী সাধনার সমন্বয়ই হইবে পাকিস্থান সৃষ্টির সার্থকতা। ভগবান পশুরাম ফিরিয়া আসিয়া আবার আমাদের পূজার মন্দিরে শ্রেষ্ঠ অবতারের গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া লইবেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ হইবেন এই

মহাযজ্ঞের বরেণ্য পুরোহিত। কৌলমার্গের বাহক বাঙ্গালীই হইবে এই সমন্বয়ের অগ্রদূত। পশুর্রাম ও রামচন্দ্রের সমন্বয়িত উপাসনাদ্বারা বাঙলার অন্তরের সমস্ত গ্লানি মুছিয়া যাইবে। আসুন আমরা এই দিনকে ত্বরান্বিত করি, আর ভগবান জরথুস্ত্রের ভাষা আবৃত্তি করিয়া বলি

হমেম্ তৎ বহিস্তা চিৎ যে উশুরুয়ে স্বস্থা চিৎ দস্তহ্বা।

ক্ষয়াংস্ মঝ্‌দা অহুরা যে হ্বা মা আইথিশ্ দ্বয়েথা ॥ যস্ন—৩২-১৬

—নিশ্চয়ই ইহা শ্রেষ্ঠ কাজ যে, নিজের স্বার্থপরতাকে (দস্তস্থ) জয় করিব, যেন হে অহুর মঝ্‌দা, আমার সমস্ত দ্বৈতের অবসান হয়।

"আইথিশ্ দ্বয়েথা"—দ্বৈতের অবসান। বৈষম্যবাদের প্রবল শত্রু পশুর্রামের যোগ্য ধ্বনি বটে।

তাই তারক ব্রহ্ম নামের নবসংস্করণে পশুর্রামের সমন্বয়ও আমাদের ইষ্টাপূর্তি

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

ভৃগু রাম রঘু রাম রাম রাম হরে হরে ॥

"তারকক ব্রহ্ম" কথার অর্থ হইল সেই ব্রহ্ম (মন্ত্র) যাহা জাতিকে বাঁচাইতে (ত্রাণ করিতে) পারে। শক্তির উৎস পশুর্রামের স্মরণদ্বারা জাতির শক্তি সহস্র গুণ বর্ধিত হইবে।

ওঁ তৎ সৎ

'ভেবেচ, দেশের দরিদ্র-নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্য্যাদা-বোধকেই মানুষ হওয়া বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।'

—ডাক্তার, পথের দাবী

বুনিয়াদী শিক্ষার ধারা

(২)

॥ শিক্ষাবিদ্ ॥

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসনের যুগেই বুনিয়াদী শিক্ষার প্রস্তাব গৃহীত হয়—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং উহার প্রয়োগ-ক্ষেত্র প্রস্তুতই ছিল। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে এই শিক্ষা-পদ্ধতি নিষ্ঠার সহিত পরীক্ষিত হইতে থাকে। বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে ইহা কিছু পরিবর্তিত কিন্তু অপেক্ষাকৃত ব্যাপক আকারে প্রযুক্ত হইতে থাকে। তাছাড়া কাশ্মীরে ইহা প্রচলিত হয়, যদিও কাশ্মীর দেশীয় রাজ্য ছিল। ওয়ার্ধাতে হিন্দুস্থানী তালিমী সংঘ এবং দিল্লীতে জামিয়া মিলিয়া শিক্ষক শিক্ষণ সুরু করেন এবং তাঁহারা একটি করিয়া বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া উহার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঘটান। ইহার মধ্যে বিহারের একটি অঞ্চলে গভীরতর প্রয়োগ-ফল পরীক্ষার পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য। পাটনাতে ট্রেনিং-কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার শিক্ষকগণকে চম্পারণ জেলার বৃন্দাবন অঞ্চলে ঘন সন্নিবেশিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কর্ম রত করায় পরিকল্পনাটির মধ্যে একটি বলিষ্ঠতা ছিল। আসামে ও বঙ্গদেশে কংগ্রেসী সরকার গঠিত না হওয়ায় এখানে বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ আরম্ভ হয় নাই।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইল এবং যুদ্ধবস্থায় ভারতবর্ষের জনসাধারণকে নিজ মাতৃভূমি রক্ষায় অগ্রসর হইবার উপযোগী প্রেরণা দিবার মত শাসন কর্তৃত্ব না দেওয়ার প্রতিবাদে কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসন দায়িত্ব ত্যাগ করিলেন। ফলে বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণরের শাসন প্রযুক্ত হইল। ঐ সব প্রদেশের আমলাতান্ত্রিক শাসকবৃন্দ বুনিয়াদী শিক্ষা-প্রচেষ্টা বন্ধ করিলেন। মাত্র বিহারের শিক্ষা-বিভাগ এই শিক্ষার সুফল সম্বন্ধে অবহিত হইয়া তাহার পরীক্ষাকার্য্য অব্যাহত রাখিলেন। উড়িষ্যার শিক্ষা-বিভাগের অনেক কর্মচারী সরকারী কর্মনীতির পরিবর্ত্তনের প্রতিবাদে সরকারী চাকুরীতে ইস্তফা দিয়া বেসরকারী ভাবে উহা চালাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের ধাক্কায় তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টাও ব্যাহত হইল। সেবাগ্রামের

পরীক্ষাও জাতীয় আন্দোলনের ধাক্কায় সাময়িকভাবে ব্যাহত হইল। সুতরাং একমাত্র বিহারের চম্পারণ এলাকা ছাড়া বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম প্রচেষ্টা কোনও পরীক্ষাসিদ্ধ ফল প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলন শেষ হইল ও যুদ্ধও শেষ হইয়া আসিল। যুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গের অন্তর্গত দেশসমূহের জনগণকে ভবিষ্যৎ উন্নতির আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। সেই অঙ্গীকারকে সার্থক করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে যুদ্ধোত্তর গঠন-পরিকল্পনা রচিত হইতে লাগিল। ভারতবর্ষও মিত্র-শক্তির অন্তর্গত যুদ্ধরত দেশ। সুতরাং তাহার জন্যও যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনা রচিত হইতে লাগিল। এদেশের শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা রচনার জন্য একটি শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হইল। উক্ত কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার জন সার্জেণ্ট। কমিশনে ডাঃ জাকীর হোসেন, শ্রী অনাথ নাথ বসু প্রভৃতি বুনিয়াদী শিক্ষার অনুরাগী ব্যক্তিগণ ছিলেন। তাছাড়া বিহারের ঘন সন্নিবিষ্ট এলাকায় বুনিয়াদী শিক্ষা যে সুফল দেখাইতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সুতরাং সার্জেণ্ট কমিশন যুদ্ধোত্তর ভারতের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাকে কিছুটা স্বীকৃতি না দিয়া পরিলেন না। কিন্তু তাঁহারা ইহাকে আংশিক স্বীকৃতি দিলেন।

সার্জেণ্ট কমিশনের শিক্ষা-পরিকল্পনা শুধু প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা নহে—সমগ্র শিক্ষা কাঠামোই ইহার দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছে। তাহার স্তরগুলি নিম্নরূপ (১) নার্শারী বা পূর্ব্ব বুনিয়াদী (২) নিম্ন বুনিয়াদী (৩) উচ্চ বুনিয়াদী ও নিম্ন হাইস্কুলের শিক্ষা (৪) নিম্ন টেকনিক্যাল অথবা উচ্চ হাইস্কুলের শিক্ষা (৫) উচ্চ টেকনিক্যাল বা কলেজী শিক্ষা। নিম্ন বুনিয়াদীর শিক্ষাকাল ৬+ হইতে ১১+, ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষাকাল ১১+ হইতে ১৪+। কিন্তু নিম্ন বুনিয়াদীর ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে না গিয়া নিম্ন হাইস্কুলে যাইতে পারিবে। ঐরূপ বিদ্যালয়ে সাধারণ পড়াশুনাই হইবে। নিম্ন টেকনিক্যাল অথবা উচ্চ হাইস্কুলের শিক্ষাকাল ৩ বৎসর। কলেজী শিক্ষার স্নাতক হইতে হইলে ৩ বৎসর পড়িতে হইবে।

নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম দুই বৎসর শিশুরা বিভিন্ন রুচি প্রকৃতির কাজ-কর্ম করিবে। তাহার মধ্যে শিল্পকর্মও থাকিবে—কিন্তু উহা খেলাচ্ছলেই করিবে —উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিতে নহে। তৎপরের ৩ বৎসর শিশুরা একটী শিল্পকে উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিতে সম্পাদন করিতে শিখিবে। শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ

অপেক্ষা দক্ষতা অর্জ্জন বিষয়েই গুরুত্ব দেওয়া হইবে এবং বৌদ্ধিক শিক্ষার সম্ভাবনাকে পুরাপুরি গ্রহণ করার প্রতি অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

নিম্ন বুনিয়াদী স্তরে প্রথম দুই বছরে বিভিন্ন শিল্প শিক্ষা ও অন্য কাজ কর্মের ব্যবস্থাকে ওয়ার্ধা পদ্ধতির সমর্থকগণ ভাল বলেন নাই—কারণ ইহা দ্বারা শিশুর অনন্যমনা হইয়া একটি শিল্প শেখার মত নিষ্ঠা নষ্ট হয় বলিয়া তাঁহারা মনে করিয়াছেন। কিন্তু ওয়ার্ধা পদ্ধতিতে ৭+ হইতে বুনিয়াদী শিক্ষা সুরু করার কথা বলা হইয়াছে এবং সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুসারে ৮+ হইতে উৎপাদনাত্মক ভাবে একটি শিল্প শিক্ষার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপত্তি করিবার কারণ খুব বেশী নাই। বস্তুতঃ ৬+ বৎসর বয়সের শিশুরা উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিতে কোনও শিল্প করিতে পারিবে ইহা সাধারণ ব্যাপার মনে করা যায় না। অবশ্য বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ইহা কিছুটা সম্ভব হইতে পারে। প্রথমে বিভিন্ন শিল্পের সুযোগ দিয়া শিশুর আগ্রহ বিচারে একটিকে নির্ব্বাচন করার মধ্যে বেশ যুক্তির অবকাশ রহিয়াছে। সুতরাং সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার এই অংশ সম্বন্ধে ওয়ার্ধা সমর্থক গণের আপত্তি জোরালো নহে। তাহাদের দ্বিতীয় আপত্তি হইতেছে শিল্প শিক্ষায় উৎপাদনের উপর গুরুত্ব প্রদান লইয়া। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই—ওয়ার্ধা-সমর্থকগণ ইহাকে খুব ক্ষতিকর মনে করেন। কিন্তু দক্ষতার প্রতি যখন গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তখন সঙ্গে সঙ্গেই যে উৎপাদনও বেশ কিছু হইবে, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। অবশ্য ঐ উৎপাদনের আর্থিক মূল্য কিরূপ হইবে তাহা বলা শক্ত। কারণ উহা কাঁচামাল ও উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য তথা হস্ত শিল্পের সহিত কুটির শিল্পের অসম প্রতিযোগিতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা সম্বন্ধে ওয়ার্ধা সমর্থক গণের সহজ ও জোরালো আপত্তি হইতেছে ১১+ বয়সের পর শিক্ষাব্যবস্থার দুইটি শাখা রাখা বিষয়ে। ঐ বয়সের পর ইচ্ছা করিলে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার পরিবর্ত্তে সাধারণ বিদ্যালয়েব শিক্ষা গ্রহণ করা যায় এই ব্যবস্থা থাকিলে যাহারা সঙ্গতিসম্পন্ন হইবেন, তাঁহারা সাধারণ বিদ্যালয়ে শিশুকে দিতে প্রলুব্ধ হইবেন। ফলে উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিম্ন মানের শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা হইবে এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ যে শিশুরা ১১+ পর্য্যন্ত নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে কাজকর্ম ও দৈনন্দিন জীবন যাপনের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করিল, তাহারা পুস্তকাশ্রয়ী সাধারণ

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে গেলে কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার যা কিছু সুফল তাহা হারাইবে এরূপ সম্ভাবনা আছে। ১১+ বয়সে শিশুদের অভ্যাস গঠন সমূহ দৃঢ় হয় না এবং সামাজিক বিকাশ জন্মে না। ১১+ হইতে ১৪+ শিশুদের বয়ঃসন্ধির সময়। এই সময় তাহাদের সামাজিক শিক্ষা ও অভ্যাস দ্রুত হয়। সুতরাং ঐ সময়ে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রভাব হইতে তাহাদিগকে বিযুক্ত করা বুনিয়াদী শিক্ষার সুফলকে ব্যাহত করারই সমতুল্য। ডাঃ জাকীর হোসেন এমন অভিমতও ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যদি সরকার ৫ বৎসরের অধিক সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা না করিতে সমর্থ হন, তবে তাঁহারা বরং বুনিয়াদী শিক্ষাকালকে ৯+ হইতে ১৪+করুন; তথাপি ১১+এর পরে বুনিয়াদী শিক্ষার সুযোগ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতে বিরত থাকুন। বস্তুতঃ ১১+হইতে শিক্ষাকে দ্বি-ধারায় বিভক্ত করার বিষয়ে ওয়ার্ধা-মতাবলম্বী গণের আপত্তি যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ওয়ার্ধা-পন্থীগণ শিক্ষাকে উৎপাদনাত্মক দৃষ্টিতে পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। ইহার একটা কারণ আছে। গান্ধীজী মনে করেন বর্ত্তমান যুগে যা কিছু অশান্তি তাহার অন্তর্নিহিত কারণ কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা। যন্ত্র ঐরূপ উৎপাদন ব্যবস্থা সৃষ্টির অন্যতম বাহন। সুতরাং যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে হস্ত সম্পাদ্য শিল্প উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন দ্বারা প্রতি মানুষকে তাহার দৈনন্দিন জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সম্পদ সৃষ্টির ক্ষমতা প্রদান করা দ্বারাই সমাজে স্থায়ী শান্তি ও ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। ওয়ার্ধা-পন্থীগণ গান্ধীজীর এই সমাজ-দর্শনে আস্থা রাখেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষাকে উক্ত আদর্শ-সহায়ক রূপেই দেখিতে চাহেন। সুতরাং প্রতিটি শিশু ও প্রতিটি বিদ্যালয় উৎপাদন দ্বারা স্বাবলম্বী হইয়া উঠিলে তবেই বুনিয়াদী শিক্ষা সফল হইল বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

এখানে এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, শিক্ষাকে একটি বিশেষ সমাজদর্শন অনুযায়ী পরিচালিত করা সঙ্গত কিনা? বিশেষতঃ যখন সেই সমাজদর্শন সর্ব্বজন-গ্রাহ্য নহে, তখন কোনও গণতান্ত্রিক দেশের সরকার কর্ত্তৃক তাহাকে জনসাধারণের উপর চাপাইয়া দেওয়া যায় না। শিক্ষার ব্যাপারে অভিভাবক দিগের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। যদি অভিভাবকগণ কোনও শিক্ষা-ব্যবস্থা মানিয়া না লয়েন, তবে তাহা চাপাইয়া দিতে গেলে ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং ওয়ার্ধা-পন্থীগণের ঐ আদর্শ যতই মনোজ্ঞ হউক উহার সহিত জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গীর একটা রফা হওয়ার প্রয়োজন আছে। কিন্তু ওয়ার্ধাপন্থীগণ তাহা করিতে নারাজ। তাঁহারা বুনিয়াদী শিক্ষাকে ক্রমান্বয়েই ঐ খাতে প্রবাহিত করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা সপ্তবর্ষব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার স্থলে সমগ্র নঈতালিম পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে উত্তর বুনিয়াদী ও স্নাতক স্তরের শিক্ষাকে উক্ত বিকেন্দ্রীভূত সমাজ-ব্যবস্থাসম্মত ভাবে পরিচালনের চেষ্টা দেখা যাইতেছে। কিন্তু শিক্ষা তো বাস্তব জীবনের পরিপ্রেক্ষিতেই প্রদত্ত হওয়া উচিত। বিকেন্দ্রীভূত সমাজ-ব্যবস্থার শিক্ষাপ্রাপ্ত শিশু যখন বৃহত্তর সমাজে আপনার স্থান করিতে যাইতেছে, তখন খাপ খাওয়াইতে পারিতেছেনা। এইজন্য তাহাদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইতেছে।

অপর পক্ষে সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় পশ্চাতে কোনও জীবনাদর্শ নাই। পাশ্চাত্ত শিক্ষায় যে কর্মকেন্দ্রিকতা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার সহিত বুনিয়াদী শিক্ষার যেটুকু সাদৃশ্য আছে, সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনায় মাত্র সেইটুই গৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে শিল্প শিক্ষাকে শুধু বৌদ্ধিক ও কর্মক্ষমতার বিকাশমাধ্যম হিসাবেই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার পশ্চাতে একটি দর্শন থাকা উচিত। ঐ দর্শনের ভিত্তি যতটা সর্ব্বজন-গ্রাহ্য হয় ততই ভালো, কিন্তু কোনও দর্শন থাকিবে না এরূপ হইলে কোনও শিক্ষা-পরিকল্পনা একটি সুস্পষ্ট রূপ পাইতে সক্ষম হয় না। বিশেতঃ যে জাতি একটি গঠন প্রক্রিয়ায় প্রারম্ভিক স্তরে রহিয়াছে, তাহার পক্ষে একটা সমাজ-দর্শনের প্রয়োজন শিক্ষা, শিক্ষায়ন প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই রহিয়াছে। বস্তুতঃ আমরা কোনও কিছু পরিকল্পনা করিতে গেলেই একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা দর্শন আমাদের চিন্তাতে প্রচ্ছন্ন ভাবে না থাকিয়া পারে না। সুতরাং যাহাকে আমরা দর্শন-বর্জ্জিত বলিয়া মনে করিব, তাহার পশ্চাতেও একটি প্রচলিত দর্শন কাজ করিতে থাকিবে। পাশ্চাত্ত দেশের যে সব কর্মকেন্দ্রী শিক্ষার কোনও স্পষ্টোল্লিখিত দর্শন নাই, তাহারা তাহাদের দেশের প্রচলিত সমাজ দর্শন স্বীকার করিয়া লইয়াছে—অর্থাৎ তাহারা ধনতন্ত্রবাদের স্বীকৃতি দিয়াছে। ডিউই তাঁহার শিক্ষায় গণতন্ত্রকে উচ্চ মূল্য দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গণতন্ত্র ধনতান্ত্রিক দেশের গণতন্ত্র। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ধনতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেক অনগ্রসরশীল দেশে তাহাদের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকায় ধনতান্ত্রিক কাঠামোতেও

তাহারা নিজ দেশের সর্ব্ব সাধারণকে সুখী ও সমৃদ্ধ করিতে সক্ষম হইতে পারেন—কাজেই গণতন্ত্র ও দেশের আপামর জন সাধারণের কল্যাণ চিন্তার জন্য তিনি ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে পরিবর্ত্তন করার আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। এইসব ধনতান্ত্রিক দেশ নিজ দেশবাসীর ক্ষেত্রে যথেষ্ট উদার-নীতি অনুসরণ করিতে সক্ষম—তাহাদের বীভৎস শোষক রূপ অন্য দেশে যেমন সুপ্রকট, নিজ দেশে তাদৃশ নহে। তাই ঐ সব দেশীয় মনীষীবৃন্দ সামাজিক ন্যায় বিচারের জন্য ধনতান্ত্রিক কাঠামোর পরিবর্ত্তনকে তেমন জরুরী মনে না করিলে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। গান্ধীজী অনগ্রসরশীল দেশের লোক। তিনি ধনতন্ত্রের বীভৎস শোষক মূর্ত্তি দেখিয়াছেন। তাই তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন-চিন্তা এত প্রকট রহিয়াছে। কিন্তু ধনতন্ত্রের পরিবর্ত্ত ব্যবস্থা হিসাবে তিনি যে বিকেন্দ্রিভূত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে বিশ্বাসী, ভারতীয় সর্ব্বসাধারণ তৎসম্বন্ধে অবহিত বা বিশ্বাসী নহে—তথাপি তাঁহার শিক্ষা-ব্যবস্থায় উহাকে দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ করা হইয়াছে। ফলে উহা সর্ব্বভারতীয় শিক্ষা-ব্যবস্থারূপে গৃহীত হইবার যোগ্যতা হারাইয়াছে। কিন্তু আমরা তাঁহার শিক্ষাদর্শন হইতে একটা শিক্ষা অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। তাহা হইতেছে শিক্ষার পশ্চাতে যে-দর্শন থাকিবে, জাতি গঠনের অন্যান্য স্তরেও সেই একই সমাজদর্শন কাজ করিবে, তবেই একটির অগ্রগতি অপরটির সহায়ক হইবে।

বর্ত্তমান ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রণিধান করিলে আমরা দেখিব যে, এদেশের সকল প্রধান রাজনৈতিক দলই জাতীয় অগ্রগতির ক্ষেত্রে সমাজ-তন্ত্রকেই গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছেন। কারণ ভারতবর্ষ বিদেশের উপর কি বাণিজ্যিক কি রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের চিন্তা করে না। একটি দেশকে সেই দেশের ধনসম্পদের উপর নির্ভর করিয়া সর্ব্বসাধারণের উন্নতি চিন্তা করিতে হইলে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক আদর্শই ভারতের সর্ব্বজনগ্রাহ্য আদর্শ হইয়াছে—বর্ত্তমান শাসক-বর্গও এই আদর্শকেই বিভিন্ন জাতি-গঠনাত্মক পরিকল্পনার নিয়ামক ঘোষণা করিয়াছেন। অবশ্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ঐ আদর্শে পৌছানো বিষয়ে মৌলিক মতভেদ আছে। কিন্তু উক্ত আদর্শকে জাতীয় শিক্ষা-পরিকল্পনার নিয়ামক আদর্শ রূপে গ্রহণ করিলে এমন একটি ভিত্তিভূমি পাওয়া যাইবে, যাহার উপর দাঁড়াইয়া সকলেই সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে পারিবেন।

সুতরাং সমাজতন্ত্রের উপযোগী যোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করাই বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য শিশুকে শৈশব হইতেই সমষ্টিকল্যাণ জন্য চিন্তা ও কাজ করার শিক্ষা দিতে হইবে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে একটি ছোট সমাজ ধরিয়া শিশুগণ নিজদিগকে সেই সমাজের অংশরূপে মনে করিবে এবং তাহার কল্যাণার্থ বিভিন্ন সৃজনাত্মক ও উৎপাদনাত্মক কাজ করিবে। তাহারা বিদ্যালয়ের আসবাব উপকরণ প্রস্তুত করিবে—বিদ্যালয়কে সাজাইবার জন্য ফুলের বাগান করিবে ও নিজদের জলযোগ বিষয়ে কিছুটা নিজ চেষ্টায় উৎপাদন করার জন্য ফল ও সব্জীর বাগান করিবে। নিজদের বিদ্যালয়টি পরিচ্ছন্ন রাখিবে ও মাঝে মাঝে উৎসবানুষ্ঠান দ্বারা নিজেদের চিত্ত বিনোদন করিবে। বৃহত্তর সমাজ ও প্রকৃতি-পরিবেশ সম্বন্ধে সহজেই তাহারা আগ্রহান্বিত হইবে—ঐ সমাজ ও প্রকৃতিকে শুধু তাহারা জানিয়াই ক্ষান্ত হইবে না—উহাকে আরও সুন্দর করিতে প্রয়াসী হইয়া সমাজ সেবামূলক কাজ করিবে। কারণ তাহারা বুঝিতে শিখিবে যে, তাহাদের বিদ্যালয়ের সমাজ বৃহত্তর সমাজেরই একটি অংশ। শিশুদের সাফল্য বিচার ও পুরস্কারাদি বিতরণে ব্যক্তিগত যোগ্যতা অপেক্ষা সামুদায়িক অগ্রগতিকেই প্রাধান্য দেওয়া হইবে। তাহাদের সমাজ-পরিচালনাকে যতদূর সম্ভব গণতান্ত্রিক করা হইবে—কিন্তু ঐ গণতন্ত্রও সমাজ-কল্যাণবোধ দ্বারাই পরিচালিত হইবে। শিশুদের উৎপাদন ক্ষমতা বিচারে স্বভাবতঃই প্রাথমিক স্তরে উৎপাদন ব্যবস্থা কুটির শিল্পানুগ হইবে—কিন্তু বয়ঃবৃদ্ধির সহিত তাহারা কিছু কিছু যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থাতেও অভ্যস্থ হইবে। প্রথম দিকে শিশুরা জ্ঞানের পিপাসাদ্বারা পরিচালিত হয় না—বাস্তব জীবন যাপনের ও নানা কর্ম-সম্পাদনে আগ্রহী হয়। এইজন্য প্রথমে কাজ-কর্ম ও পরিবেশ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য অবলম্বনেই শিক্ষা দেওয়া হইবে। পরিবর্ত্তী স্তরে শিক্ষাকে অনেকটাই পুস্তকাশ্রয়ী করার প্রয়োজন হইবে, তবে শুধু জ্ঞানই জীবনের প্রধান ব্যাপার নহে—সমাজের জন্য উৎপাদন করাও অবশ্য কর্ত্তব্য এই বোধে শিশুরা সকল স্তরেই নানা কাজ করিবে ও কাজের মধ্যে যাহা-কিছু শিক্ষনীয় তাহা শিখিবে। মনে হয় এইভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে সংগঠিত করিলে তাহাতে সার্জ্জেণ্ট ও ওয়ার্ধা উভয় পরিকল্পনারই শ্রেষ্ঠ দিকগুলি গৃহীত হয় এবং দেশের অন্যান্য গঠনধারার সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রকার—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বুনিয়াদী শিক্ষার প্রথম প্রসারের যুগে পশ্চিমবঙ্গে বুনিয়াদী শিক্ষা প্রচলিত হয় নাই। ১৯৪৩ সালের ঝড় ও বন্যায় বঙ্গদেশের অনেকস্থান নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও তার ফলে অনেক শিশু অনাথ হয়। ঐ সব অনাথ শিশুদের অনেকগুলিকে লইয়া অখিল ভারত শিশুরক্ষা সমিতি গঠিত হয়। ঐ শিশুগুলিকে স্বাবলম্বী হইয়া গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করিবে এই আশায় ১৯৪৪ সালে ঝাড়গ্রামে প্রধানতঃ শিশুরক্ষা সমিতির শিক্ষা-ব্যবস্থাকে বুনিয়াদী করার উদ্দেশ্যে প্রথম ৩ মাসের বুনিয়াদী শিক্ষায়তন শিবির পরিচালনা করা হয় ও ঐ শিশুসদনগুলিতে বুনিয়াদী শিক্ষার পত্তন করা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় কয়েকটী গ্রাম্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ও চলিতে থাকে। অনেক বাঙ্গালী ছাত্র ওয়ার্ধা হইতে ট্রেনিং লইয়া আসেন এবং বলরামপুরে একটি বুনিয়াদী শিক্ষণ বিদ্যালয় খোলা হয়। বেসরকারী প্রচেষ্টায় যাহারা বুনিয়াদী বিদ্যালয় পরিচালন করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য্য অন্যতম।

দেশ বিভাগের পর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষের মন্ত্রীত্বকালে বুনিয়াদী শিক্ষা সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের একদল শিক্ষাবিদ্‌কে ওয়ার্ধায় বুনিয়াদী শিক্ষা গ্রহণ করিতে পাঠানো হয়। তাঁহারা ১৯৪৮ সালে বাণীপুরে বুনিয়াদী শিক্ষা-বিভাগ খোলেন। ঐস্থানে একটি স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় ও দুইটি প্রাক স্নাতক শিক্ষণ বিদ্যালয় কর্ম্মরত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে স্কুলবোর্ড সমূহের পরিচালনাধীনে সরকারী সাহায্যে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইতে থাকে। তদবধি অন্ততক সরকারী বিভাগের সাহায্য পরিচালনায় ও তাহাদের মঞ্জুরী ও অর্থ সাহায্যে তেরটী প্রাক স্নাতক বুনিয়াদী শিক্ষায়তন ও একটি স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় গঠিত হইয়াছে এবং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া বলরামপুর নঈতালিম সংঘ কর্ত্তৃক বুনিয়াদী শিক্ষার কাজ বেসরকারীভাবে পরিচালিত হইতেছে। কিন্তু তথাপি সমগ্র রাজ্যে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখনো নগণ্য এবং এই হারে অগ্রগতি চলিলে সমগ্র রাজ্যে সার্ব্বজনীন বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্ত্তনে অন্যূন একশত বৎসর সময় লাগিবার কথা। বিদ্যালয়ের সাংগঠনিক পরিবর্ত্তন ছাড়াও পাঠদান প্রণালীর যথাযথ রূপায়ন সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে

অগ্রগতি আরো মন্থর প্রতিপন্ন হইবে। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা-পদ্ধতি অধিকাংশ অভিভাবকের পক্ষে নূতন এবং তাঁহারা সহজে এই নূতন পদ্ধতিকে স্বাগতঃ জানাইবেন না—ইহার উপযোগিতা বুঝিবার জন্য তাঁহাদের নিকট যথেষ্ট প্রচার আলোচনা ও প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। তদুপরি একটী নূতন পদ্ধতির যথাযথ রূপায়ন জন্য যে ধরণের শিক্ষক প্রয়োজন, বর্ত্তমান বেতনের হার সেরূপ শিক্ষক আকর্ষণ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে এবং স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয়তা ও সমাজ-সেবার মনোভাব জনসাধারণের মধ্য হইতে কমিয়াছে। এইসব কারণে বুনিয়াদী শিক্ষার অগ্রগতিকে খুব উৎসাহব্যঞ্জক বলা যায় না। তবে আশা করা যায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাজ কিছুটা দ্রুতি লাভ করিবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠ্যক্রম বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, তাঁহারা ওয়ার্ধা ও সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনার মধ্যপন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথম দুই বৎসর একটি আধারিক শিল্পের পরিবর্ত্তে নানাবিধ সৃজনাত্মক কাজ ও পরিবেশ পরিচিতি মাধ্যমে শিশুর বৌদ্ধিক শিক্ষার চাহিদা সৃষ্টি করিয়া শিশুর জীবনের সহিত সম্বন্ধিত ভাবে বৌদ্ধিক শিক্ষার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী বৎসরসমূহে শুধু সম্বন্ধিত পাঠদানের উপর নির্ভর না করিয়া শিশুমনোবিজ্ঞান-সম্মত নানা আধুনিক পদ্ধতি সহায়ে একটি সুনির্দ্ধারিত বৌদ্ধিক মানে শিশুকে অগ্রগতি প্রদান-নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা উৎপাদনের উপর কিছুটা গুরুত্ব দিয়াছেন সত্য, কিন্তু ওয়ার্ধা-পন্থীদের মত উহার প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। আধারিক শিল্প ছাড়াও তাঁহারা বাগানের কাজ এবং প্রকৃতি ও সমাজ পর্য্যবেক্ষণে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন—ইহা খুবই সঙ্গত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বুনিয়াদী শিক্ষাকে নিম্ন ও উচ্চ দুইটি স্তরে বিভক্ত করা, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা গড়িয়া না তোলা এবং অতি অল্প সংখ্যক উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন জন্য পূর্ব্বে আলোচিত অসম্পূর্ণতা জনিত ত্রুটি জনসাধারণকে এই শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে না। তাহারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহিত বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের কোনও পার্থক্যই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেছে না। বস্তুতঃ বর্ত্তমানে সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান প্রণালীর সহিত সবিশেষ পার্থক্য যুক্ত কোনও পাঠদান পদ্ধতি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে

প্রযুক্ত হইতে দেখা যাইতেছে না। তদুপরি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় যে কয়টি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহারা সাধারণ উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসরণ করিতেছে ও তাহাও প্রচলিত পদ্ধতিতেই—কেবল কিছু শিল্প-কর্ম উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে রাখা হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। কোনও নূতন শিক্ষা-প্রচেষ্টা চালু করিতে হইলে প্রথমে যথেষ্ট সংখ্যক সুপরিচালিত মডেল বিদ্যালয় গঠন করার একান্ত প্রয়োজন। ইহা করা হয় নাই; এমনকি শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় সমূহের সন্নিকটেও ঐরূপ বিদ্যালয় নাই। তাহার ফলে শিক্ষা-প্রদানও অনেকটাই তাত্ত্বিক হইতেছে—শিক্ষকগণ একটা সুস্পষ্ট বাস্তব ধারণার অধিকারী হইয়া শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী হইবার সুযোগ পাইতেছেন না। শিক্ষণ প্রদানকারী অধ্যাপকবৃন্দও অনেক সময় শিক্ষাদান কার্য্যে সুস্পষ্ট নীতি পদ্ধতি শিক্ষক-ছাত্র গণের মানস পটে অঙ্কিত করিতে পারিতেছেন না—কেহ ওয়ার্ধা শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি অধিক অনুরক্তিবশে কাজ কর্মের উৎপাদনাত্মক দিকে গুরুত্ব প্রদানকেই প্রাধান্য দিতেছেন—কেহ বা পাশ্চাত্ত দেশীয় কর্মকেন্দ্রী শিক্ষায় যে সৃজনাত্মক কাজ কর্মের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাকেই প্রাধান্য দিতেছেন।

উপরোক্ত হতাশাব্যঞ্জক বর্ণনা হইতে কেহ যেন না মনে করেন যে, কোনও অগ্রগতিই হইতেছে না। বস্তুতঃ কোনও নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার, বিশেষতঃ শিক্ষা-ক্ষেত্রে। কারণ শিক্ষা যাহারা প্রদান করিবেন তাঁহারা পুরাতন আদর্শেই অভ্যস্ত, নূতনকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে তাঁহাদের মনেও সন্দেহ স্বাভাবিক ভাবেই থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘ পরাধীনতায় ভারতের অধিবাসীগণ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এত পিছাইয়া আছে যে, তাহারা এখনো শিক্ষাক্ষেত্রে কোনও আগ্রহ অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। শুধু ইংরাজ রাজত্ব কাল নহে, সুদূর অতীত কালেও এদেশের সাধারণ শিল্পী ও কৃষি জীবিগণের জীবনের মান অত্যন্ত নিম্নে ছিল এবং সাধারণ শিক্ষা হইতে তাহারা বঞ্চিত ছিল। এই জড়তা কাটিতে সময় লাগা স্বাভাবিক।

বর্ত্তমান প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালন অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। উহার উপর স্কুল বোর্ড ও রাজ্য সরকার এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব রহিয়াছে। তন্মধ্যে বর্ত্তমানে স্কুল বোর্ডের সভ্যবৃন্দের মধ্যে শিক্ষার উন্নতি চিন্তা অপেক্ষা নিজের প্রভাব বৃদ্ধিই সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার প্রেরণা যোগায় এবং নির্ব্বাচনের সীমাবদ্ধতা হেতু অনেক অযোগ্য ব্যক্তি সভ্য পদ লাভ করেন। শিক্ষা-

পরিচালন ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ রাজনীতি প্রবেশ করায় শিক্ষার অগ্রগতি যে কতদূর ব্যাহত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত স্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে স্কুলবোর্ডগুলি। শিক্ষকগণ অনেক সময় শিক্ষাদান কার্য্যে সাফল্য দ্বারা প্রভাব অর্জ্জন করার পন্থা ত্যাগ করিয়া স্কুলবোর্ডের সভ্যগণের সংকীর্ণ রাজনৈতিক কার্য্যকলাপে সাহায্য করিয়া প্রভাব ও পদের উন্নতি সাধনের হীন পন্থা গ্রহণ করেন। এই সকল কারণে অজস্র সরকারী অর্থ ব্যয়িত হইলেও বিদ্যালয়গুলির বাস্তব উন্নতি ঘটিতেছে না। সরকারী দপ্তরখানা হইতে বিদ্যালয়ের কতকগুলি নীতি পরিচালিত হওয়ায় আরো জটিলতা সৃষ্টি হইতেছে। কারণ বুনিয়াদী শিক্ষা স্থানীয় সমস্যা বিচারেই রূপায়িত হইবে ইহাই সঙ্গত, কিন্তু বিদ্যালয়-গৃহ আসবাব প্রভৃতি ব্যাপারে সুদূরে অবস্থিত দপ্তরখানার কর্ত্তৃত্বে ঐরূপ ঘটার কোনও সম্ভাবনা দেখা যায় না। আঞ্চলিক কর্ত্তৃত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্থানীয় আগ্রহ সৃষ্টি করিয়া তবে বিদ্যালয় স্থাপন করিলে অধিক সুফল প্রত্যাশা করা যায়।

বর্ত্তমানে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে তাহার অনেকগুলি মিশন প্রভৃতি বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রাধীনে আছে। ইহারা অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাকার্য্যকে তাহাদের অন্যান্যদিকে প্রভাব বিস্তারের উপায় স্বরূপ লইয়াছেন। এজন্য সেই সব প্রতিষ্ঠানের অধীন শিক্ষাদান ক্রটিপূর্ণ হইতেছে। ইংরাজ সরকার শিক্ষা বিস্তারের প্রথম যুগে মিশনারীগণের হস্তে শিক্ষার ভার দিয়া যে ভুল পন্থা অনুসরণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সরকারের শিক্ষার ব্যাপারে মিশন ও অন্যবিধ প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের হস্তে ভারার্পণ তাহার সহিত তুলনীয়। ইহার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন। বুনিয়াদী শিক্ষার উন্নতিকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারী শিক্ষা-বিভাগকে উপদেশাদি দিবার উদ্দেশ্যে একটি এডভাইসরী কমিটী গঠিত হইয়াছে। সুতরাং আশা করা যায় শীঘ্রমধ্যে এইসব অসুবিধার বিষয়ে কমিটীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে এবং সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণের উৎসাহ সৃষ্টি করার বিষয় সর্ব্বাগ্রে ভাবিবার প্রয়োজন। এইজন্য সরকার যদি স্কুলবোর্ডের হাতে বিদ্যালয় পরিবর্ত্তনের সমগ্র দায়িত্ব প্রদান না করিয়া অবৈতনিক শিক্ষা-উপদেষ্টা সমিতি গঠন করেন, তবে বোধহয় অধিকতর স্থানীয় উৎসাহ সৃষ্টি হইবে। জনসাধারণের আস্থাভাজন শিক্ষাবিদগণই উক্ত উপদেষ্টা সমিতির সভ্য হইতে পারিবেন এরূপ বিধি থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের উৎপন্ন দ্রব্যের আয় শিশু ও বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পেই ব্যয়িত হইবে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে উৎপাদনাত্মক কাজে জনসাধারণের ও

শিশুদের আগ্রহ সৃষ্টি হইবে। তাছাড়া নির্ধারিত ঘনসন্নিবিষ্ট এলাকায় সযত্ন পরিচালিত বুনিয়াদী বিদ্যালয় গঠন ও প্রতি এলাকায় মডেল বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজন হইবে। সমাজ উন্নয়ন ব্লকগুলিতে ঐরূপ মডেল বিদ্যালয় স্থাপন অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। যতশীঘ্র সম্ভব নিম্ন ও উচ্চ এই দুই বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের একীকরণ দ্বারা ৮ বৎসর ব্যাপী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন—কারণ ইহা ব্যতীত সত্যকার বুনিয়াদী বিদ্যালয় গড়িয়া উঠার সম্ভাবনা কম। বুনিয়াদী শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা ও সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত সমূহের প্রচার-ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে নূতন শিক্ষাপদ্ধতির অগ্রগতি ও সমস্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করার উপযোগী কোনও প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকা এখনো গড়িয়া উঠে নাই ইহা অত্যন্ত আফশোষের বিষয়! অবিলম্বে সরকারী প্রচেষ্টায় উহার ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া সাধারণভাবে শিশু শিক্ষা বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ এদেশে কমই হইতেছে। আমাদের দেশের উপযোগী বুদ্ধি পরীক্ষা, aptitude test, social adoptability test প্রভৃতি এখনো গড়িয়া উঠে নাই বা ঐ বিষয়ে কোনও ব্যাপক পরীক্ষা হয় নাই ইহা গৌরবের নহে। শিক্ষার আধারিক শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা মূলক কাজকর্ম ও সাধারণভাবে বিদ্যালয় সমূহের শিল্পের মান উন্নয়ন প্রচেষ্টার কোনও ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে নাই। শিশুদের শারীর শিক্ষা দিবার ও তাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইবার জন্য যে প্রতিষ্ঠান আছে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। এমন কি যথেষ্ট সংখ্যক বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেকটারের অভাবে এখন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির ঠিকভাবে পরিদর্শন ঘটে না। এইসব ব্যবস্থার উন্নতি না করিতে পারিলে বুনিয়াদী শিক্ষার আশানুযায়ী অগ্রগতি ঘটিবে কিনা সন্দেহ আছে। আশা করা যায় দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এইসব অসুবিধার কিছু কিছু সমাধান মিলিবে।

এই দুর্দিনে জাগিবে না তুমি ?

॥ শ্রীশশাংকশেখর চক্রবর্তী ॥

দানবে দলিতে এই ধরণীতে যুগে যুগে বারে বার,
জাগিয়াছ তুমি বিশ্ব-দেবতা, করুণার পারাবার !
অধর্ম যবে ধর্মের বোধ করিয়াছে নিঃশেষ,
কলুষ-গ্লানিতে ভরিয়া দিয়াছে ভুবনের দিগ্‌দেশ,
এই ধরণীতে ধর্মের পুন করিবারে উত্থান,
হে মধুসূদন, আসিয়াছ তুমি, জাগিয়াছ ভগবান !

অসুর প্রতাপে ভ'রে গেল যবে সারা ঠাঁই পৃথিবীর,
উদ্ধত হ'য়ে উঠিল যখন অহংকারের শির,
অত্যাচারের ভীম প্রহরণ হয়ে যবে উত্থিত,
আর্ত-নিরীহ-ব্যাথাতুর হিয়া করিল বিকম্পিত,
তুমি নেমে এলে মাটির বক্ষে করিতে সবারে ত্রাণ,
আর্তেরে তুমি করিলে রক্ষা আর্তের ভগবান্ !

কংসারি তুমি জন্ম নিয়েছ কংসের কারাগারে,
অসুরের প্রাণ কাঁপায়ে তুলেছ শৃংখল-ঝংকারে !
নির্মমতার রুদ্ধ-দুয়ারে প্রবল আঘাত হানি',
বন্দীরে তুমি দিয়েছ মুক্তি, হে দেব চক্রপাণি !
ত্রিলোকাশংকা করিয়াছ দূর হরি' কংসের প্রাণ,
দুষ্ট-দলন মূর্তিতে তুমি জাগিয়াছ ভগবান্ !

ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ঘোষি' ধর্মের জয়,
পাঞ্চজন্য-শংখ-আরাব জাগালে বিশ্বময় !
টুটি পার্থের হীন ক্লীবত্ব আর জড়তার গ্লানি,
গাহিলে গীতার নব নব শ্লোক, হৃদয়ে প্রেরণা আনি'

ক্ষত্রিয়-তেজে শাসিয়াছ ধরা ক'রি নব অভিযান,
তুমি আসিয়াছ জীবন-সারথি, জাগিয়াছ ভগবান্‌!

দিকে দিকে আজ জাগে অন্যায় দানব-অত্যাচারে,
আকাশ বাতাস হতেছে মুখর আর্তের হাহাকারে।
কাঁদে নর-নারী-বৃদ্ধ-বনিতা, কাঁদে যত অসহায়,
কাঁদে নিরন্ন আশ্রয়-হীন—তুমি আজ কোথা হায়!
অধর্ম আজ শাসিছে ধরণী, নাই ধর্মের স্থান,
এই দুর্দিনে জাগিবে না তুমি বিশ্বের ভগবান্‌ ?

'ছন্দর সঙ্গে অছন্দর তফাত এই যে, কথা একটাতে চলে, আর-একটাতে শুধু বলে কিন্তু চলে না। যে চলে সে কখনো খেলে, কখনো নাচে, কখনো লড়াই করে, হাসে কাঁদে; যে স্থির বসে থাকে সে আপিস চালায়, তর্ক করে, বিচার করে, হিসাব দেখে, দল পাকায়। ব্যবসায়ীর শুষ্ক বীণতা ছন্দোহীন বাক্যে, অব্যবসায়ীর সরস চঞ্চল প্রাণের বেগ ছন্দোময় ছবিতে কাব্যে গানে।'

—ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ

শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রজ্ঞা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

॥ শ্রী সুশীলকুমার ঘোষ ॥

শিবনাথ দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে যখন ভর্ত্তি হন, তখন তাঁহার পূর্ণ-মেধা সর্ব্বতোমুখী হইয়া বিকশিত না হইলেও অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় তৎকালীন অধ্যক্ষ প্রাতঃ-স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও কীর্ত্তিমান অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বিশেষভাবে পাইয়াছিলেন। বালক অবস্থায় শিবনাথ মাতুলালয়ে বাস করিতেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইলে পিতা হরানন্দ প্রসন্নময়ী নামধেয়া দশমবর্ষীয়া এক বালিকার সহিত তাঁহার শুভ উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার কিছুকাল পরে, শুনা যায়, পুত্রবধূ প্রসন্নময়ীর প্রতি কোন কারণে বিরাগভাজন হইয়া বিরাজমোহিনী নাম্নী আর একটি কুমারীর সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। ইহাতে বালক শিবনাথ মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন ও প্রাণে ব্যথা পাইলেন। অতঃপর তিনি মাতুলের বাসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভবানীপুরে গিয়া হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব বদান্যধর মহেশচন্দ্র চৌধুরীর ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

মহাত্মা শিবনাথ মহেশ চৌধুরীর গৃহ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার মার্জিত বুদ্ধি এইবার বিকাশোন্মুখ বলা যাইতে পারে, কেননা এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। অনন্তর তিনি সংস্কৃত কলেজে এফ-এ (অধুনা আই-এ) পড়িতে থাকেন। মহেশবাবুর বাসভবনের নিকট যে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল তথায় কলেজীয় ছাত্র শিবনাথ গমন করিয়া মধ্যে মধ্যে বঙ্গমাতার যশস্বী সন্তান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগ্মী ও ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষীদের বক্তৃতা শ্রবণে মুগ্ধ হন। মেধাবী ছাত্র শিবনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য অভিনিবেশ সহকারে শুনিয়াই ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তথায় নিয়মিত যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কল্পনা-রঞ্জিত মনে ও প্রখর বুদ্ধি-প্রণোদিত হৃদয়ে

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিবাহ-সংস্কার পদ্ধতি প্রচুর রেখাপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

প্রজ্ঞার পরিচয়—তাঁহার ধৃতি ও প্রজ্ঞার পরিচয় এইবার ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইতে লাগিল—তিনি যথাসময়ে এফ-এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীর বত্রিশ টাকার বৃত্তি লাভ করেন। ঐ সময়ে তিনি ডাফ স্কলারশিপ (Duff Scholarship) পনর টাকা এবং সংস্কৃত কলেজের প্রথম বৃত্তি বার টাকা—মোট উনষাট টাকার বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া সকলকে চমৎকৃত করেন। তাহার পর তিনি সোৎসাহে বি-এ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিবার কালে তাঁহার ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী মন ঐ ধর্ম্মের পূর্ণ আস্বাদনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়া উঠিল। তিনি সে প্রেরণা প্রশমিত করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যভাবে উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। অগত্যা একদিন মহাত্মা কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা লইয়া উপবীত পরিত্যাগ করিলেন (১৮৬৯)। কেহ কেহ মনে ভাবিলেন—বাতুল বালক! পিতৃদেবও স্বল্প রুষ্ট হইলেন না। হরানন্দ ঠাকুর ছিলেন নিষ্ঠাবান তেজস্বী ব্রাহ্মণ—তাঁহার ক্রোধের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিল, অধীর হইয়া স্বকীয় আত্মজকে তিনি বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত করিলেন। শিবনাথ তখন বাধ্য হইয়া জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রসন্নময়ী ও শিশু-কন্যা হেমলতাকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। মেধার প্রোজ্জ্বল বিভায় আলোকিত হইয়া তিনি যথাসময়ে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে শাস্ত্রী উপাধি লাভ করিলেন। অনন্তর তিনি কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী তাঁহার নিকটে কন্যা লইয়া বাস করিতেন। অন্যান্য ব্রাহ্ম প্রচারকগণও ঐস্থানে সপরিবারে বাস করিতেন বলিয়া নিয়ত ধর্ম্ম আলোচনায় তাঁহার সুবিধা হইয়া গেল। তিনি তথাকার নারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া অচিরে বিদ্যাদান ব্রতে ব্রতী হইয়া উঠিলেন। ইহা ভিন্ন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণীকে শিক্ষা-দানের ভার গ্রহণ করেন। এখন হইতে উত্তরোত্তর তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

কর্ম্ম সাধনা—একদা শিবনাথ পণ্ডিতের মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বাস্থ্য-ভঙ্গ নিবন্ধন উত্তর পশ্চিম ভারতে যাইবার মানসে শাস্ত্রী

মহাশয়কে আহ্বান করেন। তিনি হরিনাভিতে উপস্থিত হইলে ভাগিনেয় শিবনাথের হস্তে মাতুল দ্বারকানাথ স্বীয় সোমপ্রকাশ পত্রিকার সম্পাদনভার এবং স্থানীয় বিদ্যালয়ের পরিচালনাভার সানন্দে অর্পণ করেন। শিবনাথ সাগ্রহে উহা গ্রহণ করিলে মাতুল ভাবিলেন যোগ্যতর ব্যক্তি আর কোথায় পাওয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, এই দুই দুরূহ কার্য্য তিনি পরম যত্নের সহিত সম্পাদন করিয়া ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইভাবে অতীত হইল। অনন্তর তাঁহার কর্ম্ম সাধনায় বিভিন্ন স্তর দেখা দিল,—কলিকাতা মহানগরীতে কিছুকাল পরে ফিরিয়া তিনি প্রথমে ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্য্য গ্রহণ করিলেন। অতঃপর কালচক্রে তিনি ঐ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হন। তাঁহার অধ্যাপনায় অল্পকাল মধ্যে ছাত্রগণ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়ে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে রত ছিলেন।

এই সময়ে সুবিজ্ঞ শাস্ত্রী মহাশয় "সমদর্শী" নাম দিয়া একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে থাকিত সারগর্ভ প্রবন্ধ, চিন্তাশীল নীতিমূলক নিবন্ধ, ধর্ম্ম ও দর্শন সম্পর্কীয় আলোচনা। সমাজহিতৈষী আদর্শ এই পত্রিকাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিত। এই সুমনোহর পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁহার সর্ব্বজনপ্রিয় মনোজ্ঞ কবিতাটি যাহা "নিমাই-সন্ন্যাস" নামে পরিচিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত।

সাহিত্য-সাধনা—"নিমাই সন্ন্যাস" কবিতাটি সরলতা, মাধুর্য্য ও প্রসাদগুণে সকলকে অচিরে আকৃষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা হইতে বুঝা গেল তাঁহার প্রাণের পরিচয়, রচনার ঐশ্বর্য্য ও ভাব প্রকাশনের সম্মোহন ভঙ্গী। কবিতা পুস্তকের মধ্যে তিনি পুষ্প-মালা, পুষ্পাঞ্জলি, নির্ব্বাসিতের বিলাপ, হিমাদ্রি-কুসুম প্রভৃতিতে প্রচুর ভাবসম্পদ ও সরল বাক্য বিন্যাস ও মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন। রস গ্রহণে তাঁহার অপূর্ব্ব অধিকার, রস-সৃষ্টিতে অপার কৃতিত্ব অতীব হৃদয়গ্রাহী। 'পুষ্পমালা' নামক বাঙ্গলা কাব্য-গ্রন্থে তিনি সামাজিক, ভক্তিতত্ত্বমূলক, আত্মতত্ত্ব বিষয়ক ও শোকোদ্দীপক কতকগুলি মনোহর কবিতা সন্নিবিষ্ট করিয়া মালা গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।

কবি-মন বিস্ফারিত হইয়াছে ও বিস্তার লাভ করিয়াছে—'নির্ব্বাসিতের

বিলাপে।' ইহাতে তিনি কবিপ্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন নানা ছন্দে—হত্যাপরাধে চির নির্ব্বাসিতের আক্ষেপ মনোজ্ঞ আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ ইহাতে আছে বৈচিত্র্য, ভাব-বিশ্লেষণের মাধুর্য্য এবং অনুতাপের আন্তরিকতা। ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি কিভাবে সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া বিলাপ করে, কখন কৃতকার্য্যের জন্য মর্ম্মন্তুদ আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়, তাহার মনোরম কাহিনী ইহাতে বিবৃত। ইহা ভিন্ন, এই কাব্যগ্রন্থ কল্পনা-বিলাসে পরিপূর্ণ—যেমন কল্পনায় সমুদ্র পার হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং পুত্রকলত্রাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া বিপুল আনন্দরস উপভোগ করিতে থাকে। এই সকল বর্ণনা বিশেষ চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নাই।

উপন্যাস রচনায়ও পণ্ডিত শিবনাথ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ ঔপন্যাসিক ব্যক্তির চরিত্র ঘটিত ক্রমোন্নতি সবিশেষ উপভোগ্য। মেজবউ, নয়নতারা, যুগান্তর, বিধবার ছেলে প্রভৃতি মনোরম উপন্যাসগুলিতে তিনি উদ্ঘাটিত করিয়াছেন সামাজিক চিত্র। 'মেজবউ' উপন্যাসে পণ্ডিতবর দেখাইয়াছেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের মেজবউ প্রমদার উজ্জল চরিত্র। পতি-সুখে সুখী, পতি-দুঃখে দুঃখিনীর চিত্র ইহাতে প্রতিভাত এবং সকলের সহিত সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রাখিয়া সংসারে কিরূপে শান্তি আনিতে পারা যায়, তাহার চিত্র ইহাতে প্রকটিত। ইহার বৈলক্ষণ্য ঘটিলে সংসারে আসিবে অশান্তি, দুঃখ-কষ্ট প্রভৃতি। মনস্বী শিবনাথ দেখাইয়াছেন বাঙ্গালী সংসারে বধূদিগের ও গৃহিণীদের কিরূপ ধৈর্য্যশীলা ও বুদ্ধিমতী হইতে হয়, কিরূপ নম্রস্বভাবা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণা হওয়া প্রয়োজন। এই উপাদেয় উপন্যাসে তিনি আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর প্রতি ভক্তিমতী হইলে, আত্মীয় পরিজনবর্গের প্রতি স্নেহপরায়ণা হইলে সোনার সংসার রচনা করা দুরূহ হইবে না।

প্রবন্ধ রচনায় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অসাধারণ নৈপুণ্য দেখাইয়া গিয়াছেন। প্রবন্ধ-মালা, ধর্ম্মজীবন, গৃহ-ধর্ম্ম প্রভৃতি সদ্ গ্রন্থগুলি তাঁহার রচনা-শৈলীর উদারতা ও বৈশিষ্ট্য এবং ভাবগ্রাহিতার ঐশ্বর্যে পরিপুষ্ট। তবে রামতনু লাহিড়ীর জীবনী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ তাঁহার সাহিত্য সাধনার অসাধারণ কীর্ত্তি-স্তম্ভ। ধর্ম্ম বিষয়ক বক্তৃতাবলী ও আত্মচিন্তা তাঁহার মানস-জগতের অভ্রান্ত ও সুপরিস্ফুট প্রতিকৃতি।

ধর্ম্ম-সাধনা—একবার এক সংবাদ প্রচার লাভ করিল যে, মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন "কুচবিহারের অপ্রাপ্ত ব্যবহার রাজকুমারের সহিত স্বকীয় অপ্রাপ্ত

বয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতেছেন।” তৎপূর্ব্বে তিনি বরাবর বাল্যবিবাহের বিরোধী ছিলেন। মনীষা-সম্পন্ন ধর্ম্মনেতা কেশবচন্দ্র স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া পরম উৎসাহে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন,—ঐ আইনের সর্ত্ত অনুসারে পাত্রীর বয়স ন্যূনকল্পে চৌদ্দ ও পাত্রের বয়স ন্যূনকল্পে আঠার বৎসর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালে ঐ সর্ত্তের উপযোগিতা ও উৎসাহ ভঙ্গ করিতে বসিলেন। পূর্ব্বাপর কার্য্যে পরম্পরার অভাব ও মতবাদে শিথিলতা এবং বিরুদ্ধাচরণ দেখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় ও ব্রাহ্ম প্রচারকগণ এই কর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ উপলব্ধি করিয়া এবিষয়ে নীরব হইয়া রহিলেন এবং নিষ্ঠার সহিত স্বকীয় কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

এদিকে শাস্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্য ব্রাহ্ম-নেতৃবৃন্দ কেশবচন্দ্রের দল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ গঠন করিলেন। এই নব প্রতিষ্টিত সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি স্থাপিত হইল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শাস্ত্রী মহাশয় ইহার আচার্য্য পদে ব্রতী হইলেন। স্বয়ং আচার্য্য পদ গ্রহণ করিয়া তিনি অতীব নিষ্ঠা ও কঠোর কর্ত্তব্যবোধ দ্বারা এই নবীন সমাজ পরিচালনা করিতে লাগিলেন—তাঁহার প্রজ্ঞাযুত মানসিক শক্তি ও কর্ম্মদক্ষতা ইহাকে অচিরে শ্রীসম্পন্ন করিয়া তুলিল। এই নব নির্ম্মিত ব্রাহ্ম সমাজের ব্যবহারিক রীতি-নীতি আদর্শ-বিধান, কর্ত্তব্য সাধন, আইনবিধি প্রভৃতি পালন ব্যবস্থা নিজ পক্ষপুটে পরম যত্ন ও সমাদরে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে তিনি মধ্যে মধ্যে বহির্গত হইতেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। তাঁহার সারগ্রাহী সুমধুর উপদেশ শুনিবার জন্য বহু লোক-সমাগম হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে বিলম্ব হইল না। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দির জনতায় পূর্ণ ও ধর্ম্মীয় গাম্ভীর্য্য ও পবিত্র নীরবতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে যখন দেখা গেল, তখন শাস্ত্রী মহাশয়ের অকপট প্রচেষ্টা, অকৃত্রিম ধর্ম্মপ্রাণতা ও নেতৃবৃন্দের উৎসাহপূর্ণ উদ্যমের সার্থকতা সকলে হৃদয়ঙ্গম করিলেন।

শুনা যায় “ইংরাজ জাতির নানা সদ্‌গুণ দৃষ্টে শাস্ত্রী মহাশয় চিরদিনই তাঁহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে ইনি স্বচক্ষে ইংলণ্ড দর্শন মানসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিলাত যাত্রা করিলেন।” ধর্ম প্রচার তাঁহার যে গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না

তাহা নহে, তদ্দেশের প্রচারকার্য্য স্বয়ং দর্শন করিয়া পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া ও অভিজ্ঞতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অন্তর তৎকালে হইয়া উঠিয়াছিল উদ্বিগ্ন। ছয় মাস কাল যাবৎ বিলাতে অবস্থান করিয়া নানা বিদ্বান, ধর্ম্মযাজক ও সহৃদয় ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ আলোচনায় প্রচুর অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি দেশে ফিরেন এবং পুনরায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম প্রচারে মন নিবিষ্ট করেন। এই সকল নানা পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে বিশ্রাম লাভ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৯১৯ খৃঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর বাঞ্ছিতলোকে প্রয়াণ করেন।

'শুধু কথা যখন খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তখন কেবলমাত্র অর্থকে প্রকাশ করে। কিন্তু সেই কথাকে যখন তির্যক ভঙ্গি ও বিশেষ গতি দেওয়া যায় তখন সে আপন অর্থের চেয়ে আরও কিছু বেশি প্রকাশ করে। সেই বেশিটুকু যে কী তা বলাই শক্ত। কেননা তা কথার অতীত, সুতরাং অনির্বচনীয়। যা আমরা দেখছি শুনছি জানছি তার সঙ্গে যখন অনির্বচনীয়ের যোগ হয় তখন তাকেই আমরা বলি রস। অর্থাৎ সে জিনিষটাকে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না। সকলে জানেন, এই রসই হচ্ছে কাব্যের বিষয়।'

ছন্দ—রবীন্দ্রনাথ

ব্রহ্মসূত্রম্

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

(১২)

বিভূতি যোগের প্রথমেই ভগবান বলিয়াছেন, 'অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয় স্থিতঃ'। পুরুষোত্তমই আত্মা ও সর্ব্বভূতের সত্য বাস্তব অতিদেশ বা ব্যতিরেক। পুরুষোত্তম-জীবনেই আত্মা ও সর্ব্বভূত স্ব স্ব দেশের স্বয়ংমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া পরস্পর ভাবভাবিত্বের আস্বাদন করিতে পারে। ইহার নিদর্শন উপলব্ধির মধ্যেই খুঁজিলে মিলিবে। তাই সূত্রকার বলিতেছেন, 'উপলব্ধিবৎ'। প্রেমের উপলব্ধির মধ্যে যেমন প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও নিজেকে ডিঙ্গাইয়া, অতিদেশ লাভ করিয়া পরস্পরভাবাভাবিত্বের আস্বাদন করে, যেমন ব্রজধামের রাধা-কৃষ্ণ তত্তদ্ভাবাভাবিত্ব ও তত্তদ্ভাবভাবিত্ব আস্বাদন করিতে করিতে গৌররূপে নদীয়ায় প্রকট হন, এখানেও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে।

কোনও কোনও ভাষ্যকার 'তদ্ভাবাভাবিত্বাৎ' পরিবর্ত্তে 'তদ্ভাবভাবিত্বাৎ' পাঠ করেন। পুরুষোত্তম- বস্তুতে দুই পাঠই সার্থক। এই পুরুষোত্তম অতিদেশের উপলব্ধি হইলে সাধনার প্রতি স্তরের সঙ্গে পুরুষোত্তমের সম, অব্যবহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তখন একের সাধনা অন্যের মধ্যে অতিদেশ লাভ করে, ছড়াইয়া পড়ে। তখন প্রতি অঙ্গসাধনা সর্ব্বাঙ্গসাধনায় পরিণত হয়। এইরূপে স্বয়ংপূর্ণ প্রতি অঙ্গসাধনার সমন্বয়ে তখন স্তরভেদ থাকিলেও উচ্চ নীচের, দূর নিকটের ঝগড়া আর থাকে না। একের সাধনা ও সিদ্ধির অন্যের মাঝে ছড়াইয়া পড়ার কথাই পরবর্ত্তী সূত্রে আলোচিত হইতেছে।

ভূম্ন ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩।৩।৫৫

ভূমারই ক্রতুর মত জ্যায়স্ত্ব রহিয়াছে ; শ্রুতি সেইরূপই দেখাইতেছেন।

বহু শব্দ হইতে ভূমা শব্দ নিষ্পন্ন ; সর্ব্বের সাধন হয় না, অল্প কিংবা বহুরই সাধনা সম্ভব। অল্পও খণ্ড, বহুও খণ্ড। যেখানে অল্পও পূর্ণ, বহুও পূর্ণ, তাহাই ভূমাপদবাচ্য। পুরুষোত্তম এমনই একটী ভূমাবস্তু। শ্রীনিত্যগোপাল

লিখিতেছেন, 'অল্প অগ্নিও পূর্ণ, অধিক অগ্নিও পূর্ণ। অল্প অগ্নিও অধিক অগ্নি হইতে পারে। পরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ, অপরিমিত সচ্চিদানন্দও পূর্ণ। পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপরিমিত সচ্চিদানন্দ হইতে পারে।' পুরুষোত্তমে সকল মিতিই পূর্ণ। কাজেই যাহাদের অল্প ও পূর্ণের সমন্বয়দর্শন হয় নাই তাহাদের একান্ত বহু সাধনাও ব্রহ্মসাধনা নহে। ভূমারই জ্যায়স্ত্ব, যখন অল্প-বহু এক পুরুষোত্তম-রস। ইহার নিদর্শন হইতেছে ক্রতু; তাই 'ক্রতুবৎ'। ক্রতু (mission) যখন তাহার পত্নী ক্রিয়ার সহযোগে প্রকাশ পায়, তখন ক্রিয়া সবিশেষ হইলেও তাহার সহিত ক্রতুর কোন বিরোধ থাকে না। ক্রতু ও ক্রিয়া যেমন অভেদ, পুরুষোত্তমে অল্প ও বহুও তেমনি জ্যায়ান্। পুরুষোত্তমের প্রতি কলা নিষ্কল, প্রতি প্রদেশ পূর্ণ; এইরূপ নিষ্কল অনন্ত কলার সমন্বয়ই সর্ব্বের ক্ষেত্র। সর্ব্বের আস্বাদন ভূমার ক্ষেত্রে। সর্ব্ব ভাব ব্রহ্মভাব; সুখ বা দুঃখ কিছুরই বিকাশ নাই, নাস্তিমূর্ত্তি (negative fact)। তাই নির্ব্বিশেষ-সবিশেষ ভূমাই পুরুষোত্তম; দেহহীন আত্মা ভূমা নহেন। আত্মার creative evolution-ই ভূমা ভাব; ক্রতুর creative faculty কর্ম্মরূপে ভাসমান। যুগে যুগে এই ভূমা পুরুষের মূর্ত্তি নূতন নূতন। শ্রুতিও এইরূপই দেখাইতেছেন, 'প্রাচীনশালঃ ঔপমন্যবঃ' ইত্যাদি ছান্দোগ্যোক্ত আখ্যায়িকার প্রথমে প্রাদেশমাত্র উপাসনার ফল উক্ত হওয়ার পর অংশ-অংশী সমন্বিত 'প্রাদেশমাত্রমভিবিমানম্'-এর উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। যিনি প্রতি প্রদেশকে অভিবিমানের অবতরণে স্বয়ংপূর্ণ দেখিয়াছেন এবং স্বয়ংপূর্ণ প্রদেশসমূহের সমন্বয়ে সমগ্র বৈশ্বানরকে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, 'স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষাত্মস্বন্নমত্তি'।

মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥৩।৩।৫৬

অথবা বিরোধের কোন আশঙ্কাই নাই, যেমন মন্ত্রাদির অবিরোধ উপপন্ন হইতেছে। মন্ত্রাদি পদদ্বারা মন্ত্র, কর্ম্ম ও গুণ বুঝিতে হইবে। মন্ত্র, কর্ম্ম, গুণ যেমন নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও ক্ষেত্রান্তরে ছড়াইয়া পড়ে, বিশেষ কোনও শাখার ভজনাও তেমনি যে শুধু সেই বেদেরই শাখান্তরে ছড়াইয়া পড়ে তাহা নয়, অন্যান্য বেদের শাখা সমূহেও ছড়াইয়া পড়ে। যাস্ক বলিতেছেন, 'মন্ত্রাঃ মননাৎ', 'তেভ্যো হি অধ্যাত্ম্যাধিদৈবিকাদিমন্তারবা মন্যন্তে'—যাহাদ্বারা মনন করা যায়, তাহাই মন্ত্র; মন্ত্রসমূহ হইতেই মননকারিগণ অধ্যাত্ম

ও অধিদেবাদি বিষয়ে নিজেকে ছড়াইয়া দেন। সাম্যবাদের উদ্গীথ ভক্তির অঙ্গ ওঁকারে কেমন করিয়া উপাসকের অধ্যাত্ম প্রাণে, অধিদৈবত সূর্য্যাদিতে ছড়াইয়া পড়েন, তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা ছান্দোগ্য দিয়াছেন। যজ্ঞকর্ম্ম কেমন করিয়া পুরুষের জীবনের বাল্য কাল হইতে মরণ পর্য্যন্ত অধিকার করে, ছান্দোগ্য তাহারও চিত্র আঁকিয়াছেন। এক সঙ্গে লব্ধ সত্য বাস্তব ভজনার গুণও তেমনি সর্ব্বাঙ্গেই ছড়াইয়া পড়ে; সর্ব্বাঙ্গকেই, অঙ্গীকেই পুষ্ট করিয়া তোলে। মন্ত্র, কর্ম্ম ও গুণ ভূমা বলিয়াই তাহারা জ্যায়ানও বটে।

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৩।৩।৫৭ ॥

শব্দাদিভেদ হেতুই (প্রাদেশমাত্র ও অভিবিজ্ঞানের) নানাদর্শন হয়।

উপাসনা যখন শ্রুতিপ্রেরণার মধ্য দিয়া স্ফুরিত না হইয়া, শ্রুতি হইতে দূরে সরিয়া কর্ত্তৃতন্ত্র হয়, তখনকার শব্দ, কর্ম্ম ও গুণভেদ অল্প-বহুর মধ্যে, প্রাদেশমাত্র ও অভি-বিজ্ঞানের মধ্যে নানাভাবের, অসহ ভাবের, পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবেরই সৃষ্টি করে। ভজনা যখন শ্রুতিময়, বস্তুতন্ত্র, তখন সমগ্র জীবনের মাঝে অঙ্গ-অঙ্গীর শব্দগত, কর্ম্মগত, গুণগত ভেদ বিলুপ্ত হইয়া জীবনের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আস্বাদন জমিয়া উঠে। জীবনের মাঝে অঙ্গ নিজের মধ্যে পূর্ণ, আত্মতৃপ্ত; অথচ অঙ্গীর অঙ্গও বটে। জীবনে অঙ্গীও অঙ্গের অঙ্গ, অঙ্গ তো অঙ্গীর অঙ্গ বটেই। অঙ্গ অঙ্গীর নানাত্ব শ্রুতির বাহিরে।

ভজনা করিতে হইলে অল্পকেই আশ্রয় করিতে হইবে কিম্বা বহুকেই আশ্রয় করিতে হইবে, তাহারই মীমাংসার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা।

বিকল্পোঽবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৩।৩।৫৮ ॥

(অল্প কিম্বা বহু) ইহার যে কোনও একটীকে বাছিয়া নিয়ম পূর্ব্বক অবলম্বন করিতে হইবে, কেননা প্রত্যেকেরই ফলের অবশিষ্টত্ব রহিয়াছে।

ভজনা করিতে হইলে মনবুদ্ধি লইয়াই রওয়ানা হইতে হইবে। মনের পক্ষে যুগপৎ সর্ব্ব সাধনা অসম্ভব। তাহার পক্ষে কোনও একটীকে আশ্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কোনও একটীকে অবলম্বন করাই বিকল্প। আত্মসমর্পণময় ভজনের প্রতিটী ধারা শুধু স্বয়ংপূর্ণই নয়, পরন্তু অপরাপর ধারার সহিত প্রাণের স্তরে অন্যোন্যভাবে ভাবিত। প্রাণতত্ত্বে প্রতিটী ধারার সহিত অন্য ধারার সমুচ্চয় থাকায় উহার নির্বিকল্পত্ব লাভ হয়; ফলস্বরূপ

উহাদ্বারা অবশিষ্ট পুরুষোত্তম ফলই লাভ হইয়া থাকে। মনের ক্ষেত্রে যাহারা ছিল বিকল্পবৎ, ভিন্নবৎ, প্রাণের স্তরে তাহারা ভিন্ন থাকিয়াও নির্বিকল্প ও যুগপৎ। প্রাণের স্তরে বিশেষ সামান্যের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়া ভক্ত নিঃসংশয় হন। 'যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি' ॥—ছা ৩।১৪।৪। গীতা বলিতেছেন, 'স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'। জড়ের ক্ষেত্রই অল্পের ক্ষেত্র, চৈতন্যের ক্ষেত্রই বহুর ক্ষেত্র। সু-অল্প অর্থাৎ জড়ের খণ্ড বিকাশকে অবলম্বন করিয়া আত্ম-সমর্পণময় ভজনকারী পুরুষের মহা ভয় হইতে ত্রাণ হয়, কেননা জীবন লাভ হওয়ার ফলে তাহার অল্পও বিশ্বরূপ। জীবন-বল্লভ পুরুষোত্তম-জীবনের স্তরেই অল্প-বহুর বিকল্প তিরোহিত। মনের স্তরে উপাসনা ধারার বিকল্পত্ব থাকিতে বাধ্য, ফলপ্রাপ্তিও তাই সেখানে নিশ্চয়ই নির্বিশেষ। কিন্তু প্রাণের স্তরের নির্ব্বিকল্প প্রাপ্তি যতক্ষণ না মনের স্তরে বাস্তবের দেশে অবতরণ করে, ততক্ষণ সেই নির্ব্বিকল্পত্ব ভাবুকতামাত্র। বাস্তবের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ও অ-বিশিষ্ট ফলপ্রাপ্তিও দেখিতেছি। সনক-সনাতনাদি ও রাধারাণীর প্রাপ্তি কি এক না বিশিষ্ট? সনক-সনাতনাদির ঠাকুর অকাম, রাধারাণীর ঠাকুর সর্ব্বকাম মদনমোহন। দৃষ্ট ফল যখন বিশেষ বিশেষ, তখন সাধনায়ও নিশ্চয়ই কোনও বিশেষ আছে। 'সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা।' 'যৎ কর্ম্ম করোতি তৎ সম্পদ্যতে'। সেই বিশেষত্ব কি, তাহাই সূত্রকার বলিতেছেন।

কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৩।৩।৫৯॥

পূর্ব্বহেতুর অভাব থাকা হেতু কাম্য বিদ্যাসমূহকে নিশ্চয়ই (উপাসকগণদ্বারা) অনিয়মে যথেচ্ছভাবে সমুচ্চয় করিতে হইবে কিম্বা করিতে হইবে না।

ফল-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যখন বিশিষ্ট ফল-প্রাপ্তি ও অ-বিশিষ্ট প্রাপ্তি ভিন্ন দেখিতেছি, তখন নিশ্চয়ই সাধনা-ক্ষেত্রেও বিশিষ্টত্ব আছে। প্রাপ্তির স্বরূপ হিসাবে সনক-সনাতন ও রাধারাণীর সম, নির্ব্বিশেষ। কিন্তু প্রাপ্তির রূপ হিসাবে দুইয়ের প্রাপ্তি বিশেষ বিশেষ। পূর্ব্বক্ষেত্রে যে-হেতুতে ফলপ্রাপ্তির স্বরূপ নির্ব্বিশেষ হইয়াছে, এখানে তাহার অভাব রহিয়াছে। তাই সূত্রকার বলিতেছেন, 'পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ'। স্বরূপগত নির্ব্বিশেষ প্রাপ্তিরূপ হেতুর অভাব থাকা বশতঃ অনুমান করিতে হইবে যে, সাধনাগত নির্ব্বিশেষত্বও নিশ্চয়ই নাই। তাহা হইলে পূর্ব্ব সূত্রের নিয়মপূর্ব্বক বিকল্প সর্ব্বক্ষেত্রে চলিতে পারে না। যাহাদের জীবনের লক্ষ্য মদনমোহন, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ইষ্টে ও

সাধনায় অকাম ও সর্ব্ব কামের সমুচ্চয় করিতে হইবে—ইহাই সূত্রকার বলিতেছেন, 'কাম্যাস্তু সমুচ্চীয়েরন্'। সূত্রোক্ত 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ। 'যঃ অকামো নিষ্কামঃ সর্ব্বকামঃ আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।' ভক্ত যখন অকাম নিষ্কাম সর্ব্বকাম আত্মকাম, তখন ভক্তের ভগবানও নিশ্চয়ই অকাম নিষ্কাম সর্ব্বকাম ও আত্মকাম, মদনমোহন। এই মদনমোহনকে পাইতে হইলে একান্ত অকামের পথে চলিতে হইবে না—ইহা সূত্রকারের নির্দেশ। তাহাকে নিশ্চয়ই সকামবিদ্যাবাচক সব সাধনাকে অকাম সাধনার সঙ্গে সমুচ্চয় করিতে হইবে। মনের স্তরে, দৃষ্ট ফলের ক্ষেত্রে এই সমুচ্চয় সম্ভব হয় শুধু প্রাণবল্লভ প্রজ্ঞাঘন পুরুষোত্তমে আত্মসমর্পণের মধ্যে। শ্রুতির সকাম মন্ত্রগুলির রহস্য এই মদনমোহন-তত্ত্বের দিকটীকে খুলিয়া দেখাইবার জন্য, শুধু কামুক মানুষকে ধাপে ধাপে অকামের দেশে লইয়া যাইবার জন্যই। যেখানে অকাম-আত্মকাম সমন্বয় হয় না, সেখানে কামকে নিগ্রহ করিয়া অকামের দেশে যাওয়া সম্ভবপর নয়। নিগৃহীত কাম এমনভাবে বাধা উপস্থিত করে যে, অকাম-সাধক কামের ক্ষেত্রে ধূলায় লুটাইতে থাকে। ইহার নিদর্শনের অভাব নাই। তাই পুরুষোত্তমকে মদনমোহনরূপে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব নির্দ্দেশ দিতে আসিতে হইয়াছিল। যিনি মোক্ষ-ক্ষেত্র ও কাম-ক্ষেত্রের সমন্বয় বিধান করিয়া শ্রীক্ষেত্র, পুরুষোত্তম-ক্ষেত্র রচনা করিয়াছেন, তিনিই পুরুষোত্তম মোক্ষকাম। ভগবান নিজমুখে বলিতেছেন,

নির্গুণে ব্রহ্মণি ময়ি ধারয়ন্ বিশদং মনঃ।
পরমানন্দং আপ্নোতি যত্র কামোঽবশীয়তে ॥

এই পুরুষোত্তমকে পাওয়ার কৌশল সম্বন্ধে ভাগবত বলিতেছেন,

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেন ভক্তিযোগেন যজতে পুরুষং পরম্ ॥

মোক্ষহীন কাম নিতান্ত নোংরা, ব্যর্থ; কামহীন মোক্ষ নিছক ভাবুকতা, বাস্তবের দেশে উহা অচল। কামের জন্ম মন হইতেই বলিয়া কাম মনোজ। মনোজের ক্ষেত্রে মোক্ষের আস্বাদনই ব্রজের আস্বাদন। এই সমুচ্চয়কে সমুচ্চয় না-ও বলা যাইতে পারে, কেননা সমুচ্চয় যদি একান্ত হয়, তবে মনোবুদ্ধির স্তরে অবতরণ করিতে পারে না, উহা একান্ত হইয়া যায়, 'closed circle' হইয়া পড়ে। শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিখিতেছেন 'অসমন্বয়ও ব্রহ্ম'। সূত্রকার তাই বলিলেন 'ন বা'। প্রাণের ক্ষেত্রে যৌগপদ্য আছে সত্য, কিন্তু মনের

ক্ষেত্রে উহা ক্রম-অন্বয়ে ফুটিয়া উঠে বলিয়া সূত্রকার 'সমুচ্চীয়েরন্ ন বা' বলিয়াছেন। কামের ক্ষেত্রে এই সমুচ্চয় ভজনাকারীর 'যথাকাম' হইয়া থাকে। কামের ছন্দ যথাযথভাবে বজায় রাখাই যথাকাম। কাম শুধু যে দ্বৈতেরই প্রতিষ্ঠা করে তাহাই নয়, কাম অদ্বৈতেরও পোষক। কামার্ত্তা হি প্রকৃতি-কৃপণা শ্চেতনাচেতনাসু। ব্রজগোপীগণ কখনও দ্বৈতভাবে, কখনও 'অহম্ কৃষ্ণাস্মি' বুঝিতে আস্বাদন করিয়াছিলেন। এই সাধনা তাহাদের কাছে 'যথাকামম্'। কামের ছন্দেই তাহারা দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী; কিন্তু এই দ্বৈত ও অদ্বৈত ক্রমান্বয়। যখন দ্বৈতাস্বাদন, তখন অদ্বৈত থাকে দ্বৈতের মাঝে 'ন'-রূপে; যখন অদ্বৈতাস্বাদন, তখন দ্বৈত থাকে অদ্বৈতের মাঝে 'ন'-রূপে। এই হিসাবে 'ন বা' বলা যুক্তিযুক্ত। পুরুষোত্তমদর্শন একান্ত দ্বৈত বা অদ্বৈত মানে না; অথচ আস্বাদনের সময়ে ইহার কোনও একটীরই মুখ্য-ভাব ফুটিয়া উঠে। তাই 'সমুচ্চীয়েরন্ ন ব' খুবই যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। 'সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তঃ লভতে অঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গম্ মদ্ধাম কথঞ্চিৎ যদি বাঞ্ছসি।' এই বাঞ্ছাই সূত্রের যথাকাম।

অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৩।৩।৬০ ॥

(কাম-মোক্ষসমন্বিত পুরুষোত্তমের) মুখাদি যে যে অঙ্গে যে যে দেবতা ও গুণ আশ্রয় লাভ করিয়াছে, ভগবানের সেই সেই অঙ্গে এবং ভগবানের সেই সেই অঙ্গের পরশের ভিতর দিয়া ভক্তের না-ধর্ম্মী অনুরূপ (corresponding) সেই সেই অঙ্গে সেই সেই দেবতা ও গুণের ভাবনাই বিধেয় হইতেছে।

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥'

পুরুষোত্তমের প্রতি অঙ্গের জন্য ভক্তের প্রতি অঙ্গের এই কান্নার মধ্যে রহিয়াছে পরস্পরের অঙ্গগত মিলনের ভিতর দিয়া অঙ্গের নির্গুণত্ব, নির্ব্বিকল্পত্ব বিধান। ভগবানের অঙ্গ নির্গুণ ভক্তের অঙ্গ রমণে, ভক্তের অঙ্গ নির্গুণ বিশ্বরূপ ভগবানের অঙ্গ রমণে।

শ্রুতি বলিতেছেন, 'অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিতাংশ্চ বেদাঃ। বায়ু প্রাণো হৃদয়ম্ বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'। পুরুষোত্তম সর্ব্বভূতের ঘনীভূত আত্মা। পুরুষোত্তমের ভাবে যাহারা ভাবিত তাহারাও সর্ব্বভূতান্তরত্ব লাভ করেন। শিরঃপ্রদেশ তাঁহার অগ্নিময়; তিনি

সর্ব্বদা মস্তকে অগ্নি বহন করিয়া জগন্ময় আগুন ছড়াইয়া বেড়ান। তাঁহার নয়নে যাহার নয়ন মিলিয়া গিয়াছে, তাহার কাছে চন্দ্রসূর্য্যরাজ্যের কোন বস্তুই গোপন থাকে না, সে চন্দ্রসূর্য্যের মধুপান করিয়া অমর। তাহার কানে অনন্ত দেশকালের কত সঙ্গীত সর্ব্বদা প্রবেশ করিয়া পাগল করিয়া তোলে, তাহার কর্ণ মধুময় হয়। সে অনায়াসেই দেখিতে পায় যে, পুরুষোত্তম-বাক্যই যুগে যুগে বেদার্থ বিবৃত করিয়া বেদের নিত্যত্ব রক্ষা করিতেছে; পুরুষোত্তম ব্যতীত বেদ কোন যুগেরই নহে। পুরুষোত্তম-প্রাণ তাহাকে প্রাণ দান করিয়া বায়ুর মতন সকলের মিলন সংঘটন করিয়া বিচরণ করে; সে ত বিশ্বের স্নেহসূত্র। পুরুষোত্তমের হৃদয়ই বিশ্ব; ভক্তও এই বিশ্বকে তাঁহার হৃদয় বলিয়া গ্রহণ করতঃ হৃদয়বান হয়। হৃদয় কেমন করিয়া বিশ্ব, তাহার জীবন পুরুষোত্তম। তাঁহার শ্রীচরণই সর্ব্বপ্রতিষ্ঠা পূজা; ভক্ত তাই ত শূদ্রভাবে চরণ স্মরণ করিয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাধনা যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে হইবে, রূপকভাবে নয়। পুরুষোত্তমময় ভক্ত পুরুষোত্তমের ভিতর দিয়া অগ্নি, চন্দ্রসূর্য্য, দিক, বেদ ও পৃথিবীর সহিত মধুযোগে যুক্ত হইয়া সর্ব্বচয়নদ্বারা সর্ব্বভূতাস্তরত্ব লাভ করেন। **পূর্ণ তত্ত্বের অহং এক অংশ, সর্ব্ব অপরাংশ**; পুরুষোত্তম এই সমন্বয় তত্ত্বের আদর্শ গুরু। 'আমি'-র 'সর্ব্ব' হওয়ার কৌশল পুরুষোত্তমের জীবন অনুসরণ না করিয়া কেহ আস্বাদন করিতে পারে না। সৃষ্টি যাহার আস্বাদনীয় নহে, সে রসসাধনার মর্ম্ম আদৌ অবগত নহে। পুরুষোত্তম-চরিত্র জীবনের সর্ব্বস্ব হইলে পুরুষোত্তমই ধীরে ধীরে জগৎজোড়া মূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'অহং'-এর সর্ব্ব-ভবন জীবকেও সাধন করান। সকল ইন্দ্রিয় যখন হৃষীকেশে অর্পিত হয়, তখন তাহার কিছুই শেষ থাকে না কিম্বা সকলই তখন তাহার শেষ হইয়া যায়—'আনন্ত্যায় কল্পতে।' বিরহে সকল হারাইয়া অনন্ত, মিলনে সকল পূর্ণ জ্ঞানে পাইয়া অনন্ত। আদি ও নিধন এই দুই অনন্তই অব্যক্ত। মহাভাবে সর্ব্বেন্দ্রিয়েরই বিশিষ্টাস্বাদন বা সর্ব্ব সমাধি সত্য।

সখি হে, শুন মোর দুঃখের কারণ।
মোর পঞ্চেন্দ্রিয়গণ মহা লম্পট দস্যুগণ
সভে করে, হরে পরধন।
এক অশ্ব এক ক্ষণে পাঁচ পাঁচ দিকে টানে
এক মন কোন্‌দিকে ধায়?

এক কালে সভে টানে　　　গেল ঘোড়ার পরাণে
এ দুঃখ সহন না যায় ॥
ইন্দ্রিয়ে না করি রোষ　　　ইহ সভার কাহাঁ দোষ
কৃষ্ণরূপাদি মহা আকর্ষণ।
রূপাদি পাঁচ পাঁচে টানে　　　গেল ঘোড়ার পরাণে
মোর দেহে না রহে জীবন ॥

মনের এই সর্ব্বসমাধানময় বিনাশ দ্বারাই সর্ব্বভূতাত্মভাব জীবন; নচেৎ উহা ভাষা মাত্র। মহাপ্রভু জীবন দিয়া বেদান্তের সৃষ্টি ও প্রলয়তত্ত্ব আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। শ্রুতির 'নৈব বা ইদমগ্রে সদাসীন্নাপি অসৎ'—এই মহাবাণী যাহার জীবনে উপলব্ধ তিনিই সার্থক; তিনি ইহাও আস্বাদন করিয়াছেন, 'স যথেসাঃ হন্তঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে একমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুরায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং চোচ্যতে স এষোঽকলোমৃতো ভবতি।' মহাপ্রভু পুরুষায়ণ দ্বারা পুরুষই হঃ ছিলেন, পুরুষই যুগবর্ত্তিক হস্তে অগ্রগামী দূত

সমাধি দুইভাবে হয়—এক সর্ব্বাভাবে আর এক সর্ব্বভাবে। মহাভাব এই দ্বিবিধ ভাব ও অভাবের সমন্বয়ে সর্ব্ব সমাধি বা সর্ব্ব সমাধান। অঙ্গ সমাধি ও অঙ্গী সমাধি সমন্বয়েই সর্ব্ব সমাধি; অঙ্গ সমাধি সর্ব্বভাবময়, অঙ্গী সমাধি সর্ব্বাভাবময়। বর্ত্তমান তথাকথিত অদ্বৈতবাদ এই কেবল অঙ্গী সমাধান এবং দ্বৈতবাদিগণ কেবল অঙ্গ-সমাধান গ্রহণ করিয়াছেন; উভয়ের সমন্বয়ই মহাসিদ্ধ মহাভাব সমাধি। দেহে ভাবের সমাধি; রস এক ও বহু এই দ্বিবিধ দেহে মহাভাবময় পূর্ণ রস। অঙ্গ, গুণ ও আমির সমাধানই মহাভাব।

মহাভাবচিন্তামণি রাধার স্বরূপ।　　　ললিতাদি সখী তার কায়ব্যূহরূপ ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ স্নেহ সুগন্ধি উদ্বর্ত্তন।　　　তাতে অতি সুগন্ধি দেহ উজ্জ্বলবরণ ॥
কারুণ্যামৃতধারায় স্নান প্রথম।　　　তারুণ্যামৃতধারায় স্নান মধ্যম ॥
লাবণ্যামৃতধারায় তদুপরি স্নান।　　　নিজ লজ্জা-শ্যাম-পরিপাটী-পরিধান ॥
কৃষ্ণ-অনুরাগে রক্ত দ্বিতীয় বসন।　　　প্রণয়-মান-কঞ্চুলিকায় বক্ষ আচ্ছাদন ॥
সৌন্দর্য্য কুঙ্কুম, সখী প্রণয় চন্দন।　　　স্মিত-কান্তি-কর্পূর তিনে অঙ্গ বিলেপন ॥

ক্রমশঃ।

সাময়িকী

বন-মহোৎসব ঃ গ্রাম-প্রধান ভারতবর্ষে বনমহোৎসব কথাটী নূতন নয় নিশ্চয়ই, তবু স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে কথাটী আবার যেন নূতন ইঙ্গিত লইয়া দেখা দিয়াছে। পরাধীন ভারতবর্ষ অনেক কিছুই ভুলিয়াছিল, অনেক কিছুই তাহার করা হয় নাই। স্বাধীন ভারতবর্ষকে অনেক কিছুকে বিস্মৃতির অতল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে, অনেক কিছু করিয়া তাহার জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাই সরকার পক্ষ হইতে বন-মহোৎসব পালন করা হইয়া থাকে। রাষ্ট্রের প্রধানেরা শহরে গ্রামে সর্বত্র এই সময় বৃক্ষ রোপন করিয়া আমাদিগকে ভাবিবার বুঝিবার আচরণ করিবার সুযোগ দেন যে, বৃক্ষ জাতীয় জীবনে কতখানি প্রয়োজনীয়। এজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

কথা উঠিবে, রাষ্ট্রীয় বন মহোৎসব খাতাপত্রের ব্যাপার—একটী চাড়াও বাড়িয়া বৃক্ষে পরিণত হয় না, উহা শুধু মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান মাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি শুধু ব্যয়ের অঙ্কে নাম লিখাইয়া সার্থক। এ কথা সত্য হইতে পারে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি এ অনুষ্ঠানের মূল্য আছে। সত্য হইতে পারে কেননা ঘরে বাইরে, বড়তে ছোটতে দেখিতেছিই যে, সততা ও আন্তরিকতা বলিয়া যে চরিত্র-ধর্ম, জাতির জীবন হইতে তাহা উঠিয়া গিয়াছে। তাই বন-মহোৎসব কেন বলা যাইতে পারে কোন অনুষ্ঠানের মধ্যেই আজ কোন সততা বা আন্তরিকতা নাই। তবু অনুষ্ঠানটী রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে এইজন্য যে, জাতির চরিত্র নিশ্চয় ক্রমে ক্রমে নির্মল হইবে, শুদ্ধ হইবে—সেদিন এই সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া জাতি নিজেকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইবে। এইখানে মনে পড়ে আমাদের সুপ্রাচীন দুর্গাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান-গুলিও তো আজ শুধু অনুষ্ঠানমাত্র। তাহাদের মধ্য দিয়া জাতীয় চরিত্র গড়িয়া উঠিতেছে—এ কথা তো আজ আর সত্য নয়; তবু সেগুলিকে ধরিয়া রাখিতে হইবে কেননা মানুষের বহিরঙ্গ জীবনকে রক্ষা করিতে, ধরিয়া রাখিতে, এক কাল হইতে অপর কালে পৌছাইয়া দিতে এই অনুষ্ঠানগুলি অপরিহার্য। তবে সর্বদা চেষ্টা রাখিতে হইবে যাহাতে সেগুলি শুদ্ধ হয়,

গঠনাত্মক হয়। তবেই আবর্জনা যেদিন বহুলাংশে কাটিয়া যাইবে, সেদিন এইসব অনুষ্ঠানগুলি জাতিকে শক্তি জোগাইবে।

তাই বন-মহোৎসব থাকুক। কিন্তু কি ভাবে ইহাকে সার্থক করা যায়, শুদ্ধ করা যায়, গঠনাত্মক করা যায়—তাহার জন্যও একটী প্রয়াস চলিতে থাকুক। জাতীয় চরিত্রে আজিকার অপেক্ষা সুদিন অবশ্যই আসিবে।

আজ একথা সত্য যে, ভারতবর্ষ গ্রাম-প্রধান হইলেও গ্রাম-মুখী মনোবৃত্তি আজও মানুষের মধ্যে সহজ চিত্তবৃত্তি হিসাবে প্রকাশ পায় নাই। একথা সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাহারা গ্রামে থাকে তাহারাও যেন মাথা উঁচু করিয়া শহরের দিকেই তাকাইয়া থাকে, শহরের সুখ সুবিধা না পাইবার জন্য মর্মাহত হইয়া থাকে। গ্রাম-মুখী মনোবৃত্তি কাহাকে বলি? গ্রাম-মুখী মনোবৃত্তির প্রথম কথাটা হইতেছে একটা আত্মতৃপ্তি—নিজের মধ্যে নিজে তৃপ্ত থাকিবার একটা সহজ প্রশান্তি। এটা চাই, সেটা চাই, এ রকমের ধুতি পাঞ্জাবী চাই, ওরকমের শাড়ী গহনা চাই, সিনেমা চাই, শুধু চাই চাই—এ মনোবৃত্তিটা গ্রাম-মুখী মনোবৃত্তি নয়। অস্বাস্থ্যকর ভাবে, অসুন্দর ভাবে, অবৈজ্ঞানিকভাবে বাস করাকেই আমরা গ্রাম-মুখী মনোবৃত্তি বলি না—সেটা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে। যে-আত্মতৃপ্তি সম্মুখের পথে আগাইতে প্রেরণা যোগায় না, যাহা শত লাঞ্ছনার মধ্যেও নিশ্চল থাকিবার মত ক্লীব বানায়, আমরা সে আত্মতৃপ্তির কথা নিশ্চয়ই বলিতেছি না। নূতনকে গ্রহণ করিবার চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াও একটা আত্মতৃপ্তি আছে, থাকিতে বাধ্য, আমরা সেই আত্মতৃপ্তির কথা বলিতেছি—যেখানে সহজ সরল জীবনযাত্রা অক্ষমের ক্লীবত্ব নহে, সংস্কৃতির পরাকাষ্ঠায় তা সমাজ-সচেতনার সহজ প্রকাশ।

এই যে একটা 'দাও' 'দাও', 'চাই' 'চাই' মনোবৃত্তি, একটা বিকৃত ক্ষুধার উগ্র প্রকাশ—ইহা গ্রামীণ মনোবৃত্তি নয়, ইহা শহুরে সভ্যতার বিকৃত রূপ। ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলে দেখি সেখানেও শিশু, যুবক যুবতী সকলেরই 'দাও', 'দাও', 'চাই' 'চাই' মনোভাব; অফিসে, কারখানায়, ট্রেনে, ষ্টীমারে যে দিকে চাই না কেন প্রত্যেকের কেবলি 'দাও' 'দাও', 'চাই' 'চাই' মনোভাব। দেখিলে মনে হয় কেমন যেন একটা ঘৃণ্য বুভুক্ষার কাল ছায়া! যেন সৃষ্টি করিতে কেউ চায় না কেবল ফাঁকি দিয়া পাইতে চায়, তাই কেবলই খাই খাই মনোভাব! সকলের মধ্যেই এ মনোভাবটা এত প্রবল যে, বন-মহোৎসবের মত ব্যাপার যাহা মানুষকে সৃষ্টির আহ্বান জানায়, যাহা মানুষকে মাটীর ডাক

শোনায়, তেমন ব্যাপার মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিবার পথই খুঁজিয়া পায় না।

মনে হয় মান উন্নয়নের একটা বিকৃত ধারণা এ জিনিষটাকে জন্ম দিয়াছে। শাড়ী গহনা ধূতি পাঞ্জাবী, রেডিও, ড্রয়ইং রুম, স্নো, পাউডার বাড়ানই যে মান-উন্নয়ন নয় কিংবা সভাসমিতি করা, দেশবিদেশের সংবাদ রাখা বা পত্র ব্যবহার রাখাই যে মান-উন্নয়ন নয়—একথাটা বোঝা দরকার। ইহা মান-উন্নয়নও নয়, বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিও নয়। চিত্তবৃত্তির ঐ যে বহির্মুখীন বিহার, বাস্তব ও মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাহা অবশ্যই সত্য বস্তু, কিন্তু নিশ্চয়ই এতখানি সত্য নয় যাহা মানুষের ঘরকে ভুলাইয়া দেয়, মানুষের অন্তর্মুখিনতাকে, আত্মতৃপ্তিকে অতলে ডুবাইয়া দেয়। চাই দুইয়ের সামঞ্জস্য, দুইয়ের মধ্যে মাত্রা-জ্ঞান। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এই মাত্রাবোধ তিরোহিত হইয়া যাইয়াই আমরা আমাদের চরিত্র হারাইয়াছি, সততা হারাইয়াছি, আন্তরিকতা হারাইয়াছি। আর সেইজন্যই মাটীকে ভালবাসিতে ভুলিয়াছি, সেইজন্যই বন-মহোৎসবের তাৎপর্য আমাদের কাছে ব্যর্থ হইয়া যায়!

যাহারা শহরে বাস করেন তাঁহারা তিনতলার উপরে টবে দুই চারিটা ফুল গাছ বা দুই একটা কুমড়া গাছ বা পুঁই গাছ বুনিতে পারেন মাত্র—বন-মহোৎসবের ব্যাপারে তাঁহাদের কিছু করিবার নাই—একথা ঠিক হইলেও ঠিক নয়। তাঁহারা বাস্তবের মাটীতে বুনিতে না পারেন, কিন্তু মনের মটীতেও বোনেন না। অর্থাৎ বুনিবার সুযোগ যদি আজ তাঁহাদের আসে, তাহা হইলেও তাঁহারা বুনিবেন না—অর্থাৎ বুনিবার মত একটা মনোবৃত্তিই তাঁহাদের তথা জাতীয় চরিত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

তাই গাছ বুনিবার একটা মনোবৃত্তি দৃষ্টি করিতে হইবে। কিভাবে এই মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা যায়? গোড়ায় সৃষ্টি করিবার— জীব সৃষ্টি নয়—মনোবৃত্তিই সর্বপ্রথমে সৃষ্টি করা দরকার।

একথা সত্য যে, 'সত্য' আজ সর্বাঙ্গীণরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং সেজন্য আজিকার দিনের আমাদের পক্ষে সুবিধাও হইয়াছে, অসুবিধাও হইয়াছে। ধরা-বাঁধা একটা কাঠামোকে একান্ত সত্য বলিয়া প্রাণপণে আকড়াইয়া ধরিয়া চক্ষু বুজিয়া নিশ্চিন্তে চলার দিন আজ নাই। ইহাই মুস্কিল। চক্ষু বুজিয়া এক দল লোককে চলিতেই হয়—কেননা তাহাদের চেতন-সত্তার

দৌড় তাহার বেশী যাইতে পারে না। আজ যখন সকল বাঁধনই আলগা হইয়া গিয়াছে, তখন গণতান্ত্রিক আত্মস্বাতন্ত্র্যের অধিকারের মিথ্যা অজুহাতে সমাজের অধিকাংশ লোক যে পথে চলিয়াছে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতার রাজপথ—কেননা সে পথে ছাড়া আজ অন্য কোন পথেই চোখ বুজিয়া চলিবার সম্ভাবনা নাই। ঐ উচ্ছৃঙ্খলতার মুগ্ধতাই মানুষের সৃষ্টি-ক্ষমতা আজ কাড়িয়া লইয়াছে।

সহজে কাজ সারিবার বুঝি মানুষের মধ্যে কেন, বোধহয় জীবমাত্রের মধ্যেই, স্বতঃসিদ্ধ, তাই মাঠ পার হইতে কুকুরটাও স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই ডায়গোনালের পথে চলে। কিন্তু এই সহজে কাজ সারিবার বুদ্ধি মানুষকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে জীবনটা একান্তভাবে টেবিল চেয়ারের নয়, ঘরে বসিয়া দল রক্ষার বুদ্ধির কারসাজিতেও নয়। এ যেমন বুদ্ধিবৃত্তির বেলায়, তেমনই বস্তুর বেলাতেও—তাই যাহাও সে উৎপন্ন করিতে পারে, তাহাও না করিয়া উহা সে 'সহজে' বাজার হইতে কিনিয়া আনে অথচ অবসর সময়ে গল্প করিয়া কাটাইয়া দেয়।

তাই গাছ বুনিবার ও তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে প্রথমে চাই সবলের, সক্ষমের আত্মতৃপ্তি, দ্বিতীয়তঃ চাই মাত্রাবোধ, তৃতীয়তঃ চাই কৌশলে বা সহজে কাল সিদ্ধি করার আগ্রহ না রাখিয়া কঠিনকে আপন বলিয়া বোধ করার মত চৈতন্যসত্তার জাগরণ। কেননা সহজ জীবনকে সহজ রাখিতে গেলে তাহাকে কঠিনের ঘুর-পথে আসিতেই হইবে। মাত্রাবোধ লোপ পাইয়াছে বলিয়াই আত্মতৃপ্তি গিয়াছে। সত্যকে তো আর আজ ধামা-চাপা দিয়া রাখা যাইবে না—তাহাকে প্রকাশ পাইতে দিতেই হইবে। কিন্তু কোন সত্যই আজ যেন একান্ত হইয়া উঠিয়া অপরের প্রকাশের পথকে রোধ করিয়া না দাঁড়ায়—সেই মাত্রা-জ্ঞান আজিকার দিনের সাধ্য। বহির্জীবনকে শুদ্ধ করিয়া ঘর লইয়া থাকিলে যেমন আজ চলিবে না, ঘরকে পুড়াইয়া দিয়া বেদুইন সাজিলেও মানুষের চলিবে না—চাই কোন্‌টাকে কতখানি রাখিলে ঘরের ও বাহিরের জীবন সুশৃঙ্খল ও সুষ্ঠু হয়, কেহ কাহাকেও অস্বীকার করিয়া অতিদেশ লাভ না করে, তাহারই মাত্রা-জ্ঞানটুকু। আর তৃপ্তি মানুষের তখনই নষ্ট হয়, যখন তাহার আন্তর জীবন অথবা বহির্জীবনের খাদ্যাভাব ঘটিয়া দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে বুভুক্ষিত রাখে। কিন্তু মাত্রা-জ্ঞান হইলে কেহই একান্তভাবে অনাহারে থাকার অতৃপ্তি দ্বারা বিকৃত হইবার ভয় হইতে রক্ষা পাইবে। আর মনস্তত্ত্বগত বিকৃতি কাটিলেই মানুষ কেবলই সহজে কাজ হাসিল করিবার

অভিসন্ধি হইতে রক্ষা পাইবে। তাই বন-মহোৎসবই হউক কিংবা অপরাপর অনেক স্থলেই হউক—বিকৃত মনস্তত্ত্বের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া মাত্রা-জ্ঞানে স্থিতিলাভ করিতে না পারিলে কিছুতেই সৃষ্টি ক্ষমতা আসিবে না, বীজও রোপিত হইবে না, বোনা হইলেও তাহা গাছ পর্যন্ত হইয়া উঠিবে না। চাই আজ মাত্রা-জ্ঞানে স্থিতি, বিকৃত মনস্তত্ত্বের হাত হইতে মুক্তি।

'তারপরে দাও আমাকে ছুটি
জীবনের কালো-সাদা-সূত্রে গাঁথা
সকল পরিচয়ের অন্তরালে,
নির্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সংগীতের গভীরতায়॥'

—বীথিকা

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

ভাদ্র, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা

মদন-মোহন

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[২৩শে বৈশাখ, ১৩৩৩ পূর্ব পর্য্যায় উজ্জ্বলভারত হইতে উদ্ধৃত]

শিব মদন দহন করে গৌরীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন, কৃষ্ণ মদন-মোহন করে ব্রজ রচনা করেছিলেন। মদনকে মোহন করতে না পারলে, কোন সৃষ্টিই সৃষ্টি-পদবাচ্য হয় না; তাই বিশ্বে সকলেই কাম দমনে ব্যস্ত। কিন্তু কাম যে কোন ইন্দ্রিয়-বিশেষেই আবদ্ধ নেই, সে যে সর্ব্বেন্দ্রিয়েই ছড়িয়ে রয়েছে, এ ধারণা আমাদের নেই। আমরা কামের রূপ চিনি না, কামের জন্মভূমি জানিনা; তাই কাম দমন করতে গিয়ে এদিক ওদিক হাতড়িয়ে অবসন্ন হয়ে ঘরে ফিরি। কামের এক নাম 'মনসিজ' অর্থাৎ মনে যার জন্ম। কামকে মোহন করতে হলে মনকেও মোহন করতে হবে। যিনি মনোমোহন, তিনিই মদন-মোহন। মনের দুটী ধর্ম্ম—সঙ্কল্প ও বিকল্প। সঙ্কল্প দিয়ে মন বিশ্বকে সামান্য চক্ষে দেখে, বিকল্প দিয়ে সে বিশেষ চক্ষে দেখে। প্রত্যেক বস্তুরও দুটি দিক—সামান্য ও বিশেষ। আমি মানুষ, এটী আমার সামান্য ভাব, আমি অমুক—এটী আমার বিশেষ ভাব। মনের যদিও বস্তুকে দুই ভাবেই দেখবার সামর্থ্য আছে, তার কিন্তু এই সামান্য-দর্শন ও বিশেষ-দর্শনের মধ্যে সমন্বয় আনবার সাধ্য নেই। মনের যে এই দুর্ব্বলতা, এই দুর্ব্বলতাই হচ্ছে কামের জননী। মনের এই দুর্ব্বলতা মেনে নিয়ে যতই মদনকে মোহন করবার জন্য ঠেলা-ঠেলি কর না কেন, মদন কিন্তু মুগ্ধ হবে না। কাম দমনের জন্য বর্ত্তমান যুগে অল্প বিস্তর চেষ্টা অনেকেই করেন, কিন্তু ফল হয় রক্তারক্তি, অবশেষে স্নায়ুদৌর্ব্বল্য। কেবল কৌপীন এটে, নিরামিষ খেয়ে কিম্বা বাইরের কতগুলি প্রক্রিয়া করে কাম জয় হবে না। কাম যে খাওয়ায়, পরায়, দেখায়, শোনায় সর্ব্বত্র রয়েছে। যে পর্য্যন্ত সব জায়গা হতে কামের বিষ দূর করতে না

পারবে, কেবল কোন একটী জায়গায় কামের বাইরের মূর্ত্তির সঙ্গে লড়াই করে আর ফল হবে কি ?

বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অতি মধুর করে ঠিক উপরের তত্ত্বটাই বর্ণনা করেছেন। 'রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদন-মোহন। অন্যথা বিশ্বমোহঽসি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ।' 'শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদন-মোহন। শারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নইলে শুধুই মদন'॥ বাম পাশ থেকে রাধাকে সরিয়ে আনলেই মদনের প্রকাশ হয়, মদন-মোহন আর থাকেন না। রাধাহীন কৃষ্ণ উপাসনায় পরিবার, সমাজ, জাতি অন্ধ মদনানলে জ্বলে পুড়ে মরছে। মনের খেয়াল পূর্ণ করতে যে দিন রাধা ও কৃষ্ণকে, অনাত্মা ও আত্মাকে, মায়া ও ব্রহ্মকে কেবল স্বতন্ত্রই দেখতে শিখেছি, সেদিন মনের ময়লার ভিতর মনোজ ঠাকুর প্রকাশিত হলেন। মন থাকতে কাম যাবে না, মনো-লয় ব্যতীত মদন-মোহনকেও পাবে না। যখন আমি ব্যক্তিগত জীবনে ও জাতীয় জীবনে দুই, যখন জাতীয়তা বাদ দিয়ে আমার ব্যক্তিত্ব চলতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি, তখন ত কামই আমার হল নায়ক। পরিবার, সমাজ বা জাতির বুকে লাথি মেরে আমি মুখে লক্ষ লক্ষ বার "কৃষ্ণ" নামও যদি করি, ঐ কৃষ্ণ-নাম ত আমার মদনই বাড়াবে। কৃষ্ণনামের বাম পাশে পরিবার সেবা, সমাজ-সেবা, জাতির সেবা করতে হবে, তবে কৃষ্ণ নাম মদন-মোহন হবে। মহাপ্রভু বলছেন—

নাম-সঙ্কীর্ত্তন আর বৈষ্ণব সেবন।
দুই করহ শীঘ্র মিলিবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

দেশ-সেবার জন্য কোন ব্যক্তি-বিশেষকে আহ্বান করলে স্বভাবতঃই উত্তর আসে, 'মহাশয়, আগে পরিবার প্রতিপালন, তবে না ধীরে ধীরে দেশ-সেবা ?' কবে যে পরিবার-প্রতিপালন শেষ হবে, আর দেশ-সেবা সুরু হবে, এ পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারেন নি। পরিবার-সেবার যদি একটা শেষ থাকত, তবে বরং সেখানে দেশ-সেবা আরম্ভ হতে পারত। ব্যক্তিগত জীবনও অশেষ, পরিবার জীবনও অনন্ত, জাতীয় জীবনও অনন্ত। কারও শেষে কেউ নেই, করলে সমন্বয় করেই আরম্ভ করতে হবে। আর কে যে অগ্রে, কে যে পশ্চাতে, তার ঠিক কি কিছু আছে ? আমি আগে না আমার পরিবার আগে, আমার পরিবার আগে, না আমার দেশ আগে, কেউ বলতে পারে

কি? বীজ আগে না বৃক্ষ আগে—এর যেমন মীমাংসা নেই, তেমনি পরিবার আগে, না জাতি আগে—এরও কোন উত্তর নেই। আমি যেমন আমার একটা দিক, আমার পরিবার, আমার সমাজ, আমার জাতি, আমার বিশ্ব তেমনি আমারই অপর দিক। আমিই কৃষ্ণ-স্বরূপে 'অহম্', আবার রাধা রূপে পরিবার, সমাজ, জাতি, বিশ্ব অর্থাৎ সর্ব্বভূত। আমি যখন মনের প্ররোচনায় নিজেকে কেটে দু'ভাগ করি, তখন আমি কামার্ত্ত; আর এই দুই ভাগ যখন প্রাণের আগমনে জোড়া লেগে যায়, তখন প্রাণবল্লভ মনোমোহন মদন-মোহন শ্যামসুন্দরের আবির্ভাবে কৃতার্থ হই। আমি ও সর্ব্বভূতের বিচ্ছিন্ন ভাব বজায় রেখে মুখে ব্রহ্মচর্য্য বললে কি আর ফল? ব্রহ্মচর্য্য হচ্ছে আমি ও সর্ব্বভূতের মধ্যের শুষ্ক কাঠিন্য গলে যাবার অবস্থাটা।

*　　　*

কাম দূর করতে হলে চাই মনের অন্তরটা প্রাণতত্ত্বের অবতরণ দিয়ে সাফ করে নেওয়া; মন যেন বিশ্বটাকে যখন তখন দ্বিধা বিভাগ করে একটা হেয়, অপরটীকে উপাদেয় বলে আলিঙ্গন-রত হয়ে না থাকে। মন যখনই প্রাণ-তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করে স্বয়ংরূপে জাগ্রত হয়, তখন আমারই এক দিক হয় ভোক্তা (exploiter), অন্য দিক ভোগ্য (exploited)। যে দিকে আমি ভোক্তা, সেদিকে আমি বুঝতেও পারি না আমি কেমন করে অপর দিককে অপমানিত কচ্ছি, আবার আমার যেদিক ভুক্ত হয়ে অহরহ অবমানিতই হচ্ছে, তাকে শত বললেও সে বুঝবেনা যে সে অবমানিত হচ্ছে। অভিমান হল ভোক্তার রূপ—অপমান হল ভোগ্যের রূপ। যাতে অভিমান বাড়ে, সেই বেশ-ভূষায় পুরুষ লালায়িত; আবার যাতে অপমানিত হবারই সুযোগ বেশী, তেমন আচরণই নারীর প্রিয়। অলঙ্কার যে পুরুষের কাছে থেকে পাওয়া বন্ধন, বিরাট শৃঙ্খল, বীভৎস অপমান, একথা বললেও কি নারী বুঝবে? কাম পুরুষদের দেয় অভিমানের গৌরব, প্রকৃতিকে দেয় অপমানের গৌরব। প্রেমময় ব্রজে তাই শ্যামসুন্দরকে রাধার অপমান-ভঞ্জন করতে হয়েছিল। কাম-বশে নারী বোঝেনা সে কেমন করে ভুক্ত হয়ে দিন রাত কাটাচ্ছে; কাম তাকে আরো অপমানিত হবার বেশ-ভূষার জন্য প্রলুব্ধ কচ্ছে। আমি অর্দ্ধ নারীশ্বর, বিশ্বের প্রতি অণুটীও অর্দ্ধ নারীশ্বর। কাম আমাকে দুই করেছে, বিশ্বকে দুই করেছে; প্রেমে আবার সেই দুই এক হবে। প্রাণতত্ত্ব যেদিন পুরুষের অভিমান ও নারীর অপমান কেড়ে নেবে,

সেদিন প্রতি হৃদয়ে হবে মদনমোহন-তত্ত্বের লীলাবিলাস। আমি ভোক্তা হয়ে, আমারই অংশ—যার নাম দিয়েছি ভোগ্য, তাকে ঘৃণা করে আত্মহত্যা কচ্ছি। কাম বাড়ে ঘৃণায়; এই ঘৃণা হচ্ছে মনের বিশ্বকে দুই করে দেখবার যে একটা প্রকৃতি রয়েছে, তারই সঙ্গিনী। ঘৃণা দূর করা হল ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম সাধনা। যে মন আমাকে ভোক্তা বানিয়েছে, সেই মনই আমার অপর অর্দ্ধেককে কামিনী সাজিয়ে আমাকে নিয়ে টানাটানি করাচ্ছে। মনকে "মন" রেখে কামিনী-নিন্দায় মন অমনা হয় না, বরং মন আরও শক্ত হয়। মন শিখিয়েছে আমাকে ভোগের মন্ত্র, সর্ব্বভূতকে দিয়েছে ভুক্ত হবার মন্ত্র।

মনের এই মন্ত্র উল্‌টিয়ে দিয়ে যদি আমার ভোগ্য-বস্তুকে আমি সম্মান করতে পারি, তবে মন জব্দ হবে। যাকে ভোগ করাই মনের উচ্চশিক্ষায় আমার জন্মগত অধিকার ছিল, সেই অস্পৃশ্য জাতিদের পায়ের কাছে যদি গড়াগড়ি দিতে পারি, মন গলে যাবে, সে'ও প্রাণের এই আচরণে মুগ্ধ হয়ে পড়বে। মনের শিক্ষার আর একটি মজা এই যে, সে যাকে ভোগ করবে, ভোগ ত করবেই, পরন্তু তার ভোগ্য যে নিতান্তই হেয়, এ-কথা'ও সহস্র কণ্ঠে সে ভোগ্যকে শোনাবে। ভোগ্য'ও আবার ঐ কথা শুনতে শুনতে অপমানিত হওয়াটাকেই তার স্ব-রূপ বলে বিশ্বাস করে এবং তদানুসারে চলা-ফেরা করে। পুরুষের অভিমান-ভঞ্জন ও নারীত্বের অপমান-ভঞ্জন যুগপৎ হবে। মনেরই 'মান"; সেই মানই পুরুষে "অভিমান," নারীতে অপমান। অভিমান ও অপমানের সম্বন্ধ ঘোচাতে হলে চাই ব্রহ্মবুদ্ধিতে সেই অনাত্মা ও মায়ার সামনে প্রাণখোলা মাথা নোয়ানো। রাধার পা ধরে একদিন শ্যামসুন্দর ব্রজধামে মায়াকে, অনাত্মাকে ঘৃণা করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। সমাজময় চলছে যে অনাত্মার উপর আত্মার জুলুম। এই জুলুমের প্রতিবাদ করতেই উল্‌টো আচরণ নিয়ে আসেন যুগে যুগে ব্রহ্ম-অবতার। ব্রজের আচরণই ব্রহ্মচর্য্যা বা ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম শিক্ষা প্রকৃতি-ভজন। প্রকৃতি অর্থ বৃক্ষ-লতা, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মন, বুদ্ধি, অহংকার প্রভৃতি, প্রকৃতি অর্থ নারী, প্রকৃতি অর্থ প্রজা। প্রকৃতিতে অনাত্মভাব প্রবল, পুরুষে আত্মভাব প্রবল। প্রাণকে সরিয়ে রেখে যেদিন বিশ্ব মনের (Intellectualism) উপর ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার-জীবন, সমাজ-জীবন ও বিশ্ব-জীবন চালাবার নেতৃত্ব দিয়েছে, সেদিন থেকে গ্রামের সহজ প্রকৃতি আর মনে ধরেনা, বিকৃত শহরের বিকৃত শিক্ষা, বিকৃত সভ্যতা, বিকৃত মিলন, বিকৃত জল-বায়ু

আমাদের কাম সাগরে ডুবিয়েছে ; আমরা সেদিন থেকে লাঙ্গল চরকা ছুড়ে ফেলে তারই খেয়ে পরে তাকেই পায়ে দলেছি, কলম নিয়ে বিশ্বের হৃদয় থেকে ভগবৎ শুক্র সোনার খনি লুঠ কচ্ছি : সেদিনই কৃষি, শিল্প, কলাবিদ্যা সব অপমানিত হয়ে বাজারের পণ্যদ্রব্যে পরিণত হল, তারা আত্মার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হল ; বিশ্ব নিজের মূল হারিয়ে আকাশস্থ, নিরালম্ব, নিরাশ্রয়, কাম-ক্রীড়া-ভূমিতে পরিণত হল। প্রকৃতির নির্ম্মল আলিঙ্গনশূন্য শহরের দূষিত হাওযার মাঝে সেদিন প্রচারিত হল আত্মধর্ম্মা পুরুষের কণ্ঠে নারীর নিন্দা ; নারী নাকি পরিবার-সমাজ-জাতির মোক্ষ-সাধনার প্রতিকূল। সেদিনই রাজা প্রজার ভজনা বর্জ্জন করে শোষণ-নিরত হলেন। বিশ্বপ্রকৃতি আজ অপমানিত, পুরুষ অভিমানী, আত্মা কলঙ্কিত, রাজশক্তি স্বাধিকার-প্রমত্ত। যখনই মদনের আগুনে আত্মা মরছে, অনাত্মা মরছে, পুরুষ বিশ্রী, মলিন, ভীরু, ক্লীব হচ্ছে, নারী নিতান্তই খেলার পুতুল হয়ে আছে, রাজা শক্তিগর্ব্বে প্রজাকে যখন-তখন যে-সে ভাবে ভোগ করেও সাধ মিটাতে পাচ্ছে না, প্রজা ভোগের অবমাননা আর সহ্য করতে না পারলেও মুখ ফুটে বলবার সাহসও করেনা—তখনই ত নেমে এসেছেন বিপ্লব-ঘন মদনমোহন-তত্ত্ব। বর্ত্তমান যুগেও তার অন্যথা হয়নি। তাই ত বিশ্বে এমন এক ব্রজের বিপ্লব এসেছে, যাতে আত্মা ধরবে অনাত্মার পা' ; রাজা "দেহি মে পাদপল্লবমুদারম্" ব'লে প্রজার চরণধূলি সার করবেন ; পুরুষ মহাযোগিনী, বিলাসবর্জিতা সতীমূর্ত্তির-চরণতলে "ত্রায়স্ব" "ত্রায়স্ব" বলে পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাইবে ; আর এই রসলীলা অনুষ্ঠিত হবে ব্রজের সহজ সরল প্রাণের স্পর্শে যেখানে সহরের বাজারে' শিল্প-সভ্যতা, বাজারে' চাল চলন, বাজারের অন্তঃসারশূন্য অথচ বহিঃ চাকচিক্যময় খাবার-পরবার, বাজারের আইন-আদালত, বাজারের স্কুল-কলেজ উঁকি মারতেও সাহস পাবেনা। এসেছে সেদিন, নিশ্চয়ই এসেছে। বৃন্দাবন হচ্ছে Land of Divine Democracy ; সেখানে পরিপূর্ণ আত্মভাবের সঙ্গে পরিপূর্ণ অনাত্মসুষমার রাসলীলা সর্ব্বত্র চলবে, সব হবে কামমুক্ত। যমুনার জল রাধাগোবিন্দকে বুকে করে কল কলিয়ে বুক উঁচু করে আবার চলবে, সেতু বন্ধন তার কাছেও এগোতে পারবে না। যমুনার তীরে কালী-কমলার মিলনে নিকুঞ্জে যে লীলা ফুটে উঠবে, তার তুলনা কি বিশ্বে মিলবে ? গাছে ফুল ফুটবে, ফল ধরবে, পাখী গান গাইবে, সবই যেন স্বয়ং, সবই যেন জীবন্ত, সবই যেন ব্রহ্ম। মোটা মোটা ধেনুপাল উর্দ্ধপুচ্ছে বংশীধ্বনি শ্রবণে

পাগল হয়ে ছুটবে, কি হিন্দু কি মুসলমান কারও কাছ থেকে হত হবার ভয় আর রবেনা। ব্রজের বালক শুদ্ধ সখ্যে ধনীর কাঁধে উঠবে, কুলীনের আদর পেয়ে নিজেদের কামের জ্বালা দূর করবে, রাজার অভিমান চূর্ণ ক'রে নিজেরাই "রাখালরাজ" হয়ে গাছের তলে বনমালী সেজে বস্‌বে। কত পুলিন ভোজন হবে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, কালাজ্বর সব আনন্দের হিল্লোলে কোথায় ভেসে যাবে। মুক্তির গানে ব্রজ-ভারতের সবদিক চঞ্চল হয়ে উঠবে। মরণ দূর হয়ে অমরণের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। মদনানন্দ, মদনমোহনের রস-বিলাসে নির্ম্মল হয়ে উঠবে, ভারত ধন্য হবে, জগৎ ধনী হবে, মদনমোহনের রসলীলার জয় জয়কার হবে।

বন্দেমাতরম্।

'এই বিশ্ব আকাশদ্বারা আবৃত। আকাশ ছিদ্রদাতা। এই সংসারে যে-কোন ক্ষেত্র হইতে যে-কোনও ছিদ্রপথে যে-কোন ক্ষেত্রে যাওয়া যায়। অহঙ্কারের ক্ষেত্রে এইরূপ যাতায়াতের ছিদ্রপথ রুদ্ধ। শরণাগতের পক্ষে এই ছিদ্রপথ উন্মুক্ত। কোথায় হরিশ্চন্দ্র, কোথায় শৈব্যা-রোহিতাশ্ব! শেষে সব কুহক শ্মশানের বুকে নিরস্ত হইল। দুর্য্যোগ দেখিয়া ঘাবড়াইতে নাই। যাহারা দুর্য্যোগকে face করিতে পারে তাহাদের কাছে মায়া নিরস্ত হয়। 'ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত কুহকম্' পুরুষোত্তমই দুর্য্যোগের ঠাকুর। দুর্য্যোগের ভিতর দিয়া পথ চলিবার শাস্ত্র ভাগবত। পথ নাই এমন কোন অবস্থা মানুষের হইতেই পারে না। আবেষ্টনকে যথাযথভাবে প্রাণ খুলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেই পথ বাহির হইয়া যায়।...যে সব অবস্থা সহ্য করিতে পারে, সে-ই পথ পায়।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী

১৭ই মার্চ, ১৯৫৭

কথা সাহিত্যের একদিক

(বাংলা-ছড়া)

॥ শ্রীভূপতি কুমার দত্ত ॥

গোষ্ঠী-কৈন্দ্রিক সমাজ জীবনের সুরু হতেই মানুষ পরস্পরের উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল হয়ে উঠে। সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্ম উৎসব-পরবে ব্যক্তিহৃদয়ে গড়া গোষ্ঠী-হৃদয়ের রূপ ভাষায় প্রতিবিম্বিত হওয়ার সুযোগ আসে। সেখানে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সহজ হয় না। অভিজ্ঞতা, সুখ-দুঃখ, আশা-উল্লাসের ঢেউ ব্যক্তিহৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েও সমাজ-হৃদয়ের তরঙ্গ হয়ে শোভা পায়। সমুদ্রের এক-একটি তরঙ্গের পৃথক সত্তা যেমন স্বীকার করা যায় না তেমনি ব্যক্তি-হৃদয়কে গোষ্ঠীহৃদয় থেকে পৃথক করে দেখলে তারও কোন পরিচয় নেই। উৎসবে পরবে, দুঃখে বেদনায় পারস্পরিক সহানুভূতিতে সমাজ-হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভাষার যে রসরূপ, তা-ই মৌখিক সাহিত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। অলিখিত বলেই তা মৌখিক, স্মৃতির মধ্য দিয়েই তা উদ্বোর্ত্তিত হয়।

এই মৌখিক সাহিত্য সমাজের অন্তর-রূপটিকে উদ্‌ঘাটিত করে সহজেই। ভাষার পার্থক্য, উচ্চারণপদ্ধতির পার্থক্য অঞ্চল বিশেষে স্বতন্ত্র হলেও তার ভাবসংহতি সার্ব্বজনীন। অনেক সময় রূপের (form) মিলও দৃষ্টিগোচর হয়। অনুভূতি ও প্রবৃত্তির চিরন্তনতাই এর একমাত্র কারণ। মৌখিক-সাহিত্য বা লোক-সাহিত্য গীতি, গীতিকা, ছড়া প্রভৃতি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এখানে আমাদের একটি বিশেষ অঞ্চলের ছড়াই আলোচ্য।

'ছড়া' নামটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে এর বৈশিষ্ট্য। বহু ভাব-রেখা এলোমেলো ভাবে যার মধ্যে ছড়িয়ে আছে তা-ই হল ছড়া। এক একটি রেখা স্বতন্ত্র ও বর্ণোজ্জ্বল। একাধিক ভাব-রেখার খেয়ালী সমন্বয়ে সামাজিক ভাষায় সমাজ-মানসের প্রতিবিম্বনই ছড়া। সামাজিক ভাষার প্রয়োজনের কারণ কোন কৃত্রিম ভাষার স্থান ছড়ায় নেই। 'ছড়া' নামটিতে এর আরও একটি পরিচয় আছে। সমাজে যা ছড়িয়ে আছে তা-ই ছড়া। কোন একটি মানুষের দ্বারা তা রচিত নয়। ব্যক্তিবিশেষের রচনা স্বীকার করলেও

কালক্রমে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের মধ্য দিয়ে ছড়া এমন একটা স্বতন্ত্র রূপ লাভ করেছে যাতে সমাজ-মানসের চিহ্নই পরিস্ফুট, ব্যক্তি-মানসের নয়।

ধ্বনিই ছড়ার প্রাণ। দূরাগত সঙ্গীতের মত একটা অস্পষ্ট মাদকতা এর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে। শৃঙ্খলা ও স্পষ্টতা নেই তবু একটা আবেদন আছে। সে আবেদন বুদ্ধির কাছে নয়, হৃদয়ের কাছে। সেই জন্যেই শিশু-হৃদয়ের সঙ্গে এর যোগসূত্র এত ঘনিষ্ট। শুধু শিশু নয় বয়স্করাও ছড়ার স্বপ্নময় প্রভাব এড়িয়ে উঠতে পারেনি।

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের ছড়ায় সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষার প্রলেপ থাকলেও ছড়ার সর্ব্বজনীনত্ব বা মূল বৈশিষ্ট্য সেগুলির মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আছে। এবারে আলোচনায় আসা যাক।

শিশুর মন স্বভাবতই চঞ্চল। মা তাই শিশুকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে গুন্‌গুন্ করে ছড়া উচ্চারণ করেন। ঘুমপাড়ানী ছড়া দামাল ছেলেকে বশে আনবার যাদুমন্ত্র। এই প্রকার ছড়ার মধ্যে যেমন ঘুমপাড়ানী মাসি-পিসিকে আহ্বান জানিয়ে রোমাণ্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করা হয় তেমনি প্লাবন ও অত্যাচারের ভীতিকর মায়াজাল রচনা করেও শিশুকে সম্মোহিত করা হয়। নির্জ্জন অন্ধকার রাত্রিতে দামাল ছেলেকে কোলে বসিয়ে মা বর্গী অত্যাচারের চিরপরিচিত ছড়াটির মত প্লাবনের ছড়া কাটেন :

হাতি ঝুলু ঝুলু আইল বান।
হাজিয়া গেল জলার ধান ॥
হাতি যাবে রে বর্দ্ধমান।
হাতির কঁপায় পাকা পান ॥
কে খাবেরে গঙ্গারাম।
গঙ্গারামের পঙ্গা ফাটে।
তা ধেই ধেই কল্লা লাচে ॥

শিশু কেবল ছন্দের দোলায় সম্মোহিত হয়। বান আসে, শস্য বিনষ্ট হয়। তাতে কিছু আসে যায়না তার। কেবল একটা অপরিচিত রহস্যময় অনুভূতিই তাকে আচ্ছন্ন করে। মায়ের দুশ্চিন্তা কিন্তু এরমধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে। খোকাকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে বন্যায় শস্য নষ্ট হওয়ার জন্য ভবিষ্যতের অন্নচিন্তা মায়ের মনে অঙ্কুরিত হয়। ঘুমপাড়ানী ছড়ার মধ্যে মায়ের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লক্ষ্য করবার মত। শিশুর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হলেও কেবল স্বপ্নজাল রচনা

করে এই সমস্ত ছড়ার শেষ নয়। মা-ই উচ্চারণ করেন বলে অপরিহার্যভাবে তাঁর সুখ-দুঃখ সমবেদনা এর মধ্যে জড়িয়ে রয়। আর একটি ছড়ায় তাই দেখি :

আয় আয়রে টকা মনে মাছ ধরতে যাব।
মাছের কাঁটা পায় পশনে দলায় উঠ্যা রইব॥
দলায় আছে ছপন কড়ি গনতে গনতে যাব॥
লাড়া গাছে ঝাড়া দিনে কিছু নাইক পড়ে।
তুলসিমঞ্চে জল দিনে বত্রিশ টাকা পড়ে॥
বত্রিশ টাকার ঘি কলসি গো সরু ধানের ভাত।
রাম যাইছন ব্যা হইতে ষোল পোর বাপ॥
এত টাকা লিলু বাফু দিলু বুড়া বরে।
আর যেদি লিতু দুটাকা দিতু আধোড় বরে।
খাইত চিরকাল—॥

ছডাটির শেষ অংশে মায়ের সমবেদনা একটি অপরিচিত অল্পবয়স্কা কুমারীর উপর বর্ষিত হয়েছে। সে কুমারীর ভবিষ্যৎ সুখের নয়। এক অতিবৃদ্ধ বরকে বরণ করে নিতে হবে তাকে। কনের বাবা আরো কিছু বেশি পণ দিল হয়ত তরুণ বর পেতে পারতেন। মা নিজের অন্তরে কুমারীর বেদনা আশ্চর্যভাবে উপলব্ধি করেন।

শিশুকে শুধু ঘুমপাড়ানো নয়, তাকে ভুলানোরও প্রয়োজন আছে। সংসারে অনটন। মা তাই কটা-ভানার জন্যে প্রতিবেশীর গৃহে যান। অতি অল্পবয়স্কা দিদি শিশুটিকে কোলে নিয়ে বেড়ায়। কিন্তু কান্না আর থামেনা শিশুর—মায়ের কোলে যেতে চায় সে। ছোট্ট দিদিটি তখন আশ্চর্য কৌশলে তার মন ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করে। একটি বড় তেঁতুল কিংবা অন্য কোন গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলে :

তেঁতুল গাছে হুম্মু।
মা যাইছে ধান কুটতে
আইলে দিবে হুম্মু॥

হয়ত সেখানে কোন 'হুম্মু' নেই, হয়ত বা আছে। হঠাৎ শিশুর কান্না যায় থেমে। বিস্ময়বিমুগ্ধ চোখদুটি গাছের প্রসারিত শাখা-প্রশাখার মধ্যে মেলে ধরে সে।

শিশুর যখন আর একটু বয়স বাড়ে তখন কিন্তু তাকে এভাবে ভোলানো যায় না। কান্না থামাবার জন্য তখন মা কতকগুলি লোভনীয় উপহারের প্রতিশ্রুতি শিশুর সম্মুখে তুলে ধরেন :

কচিয়া কেনি কাঁদুরে শ্বশুর ঘর যাইতে।
আম দুব কাঁঠাল দুব কনে বুস্থা খাইতে ॥
হাল করতে হাল্যা দুব দুধ খাইতে গাই।
রাখাল রাখিতে দুব শ্যামের ছোট ভাই ॥
ঘেঁচি ঘেঁচি কৌড় দুব পাশা খেলিতে।
ছিট কাপড়ের ছাতা দুব মাথায় দিতে ॥

শিশুকে ভুলাতে গিয়ে মা একটি সুখী পরিবারের চিত্র মনে মনে কল্পনা করেন। আম কাঁঠাল খেতে পাওয়া এবং 'হাল করতে হাল্যা ও দুধ খাইতে গাই' পাওয়া কম সৌভাগ্যের কথা নয়। শুধু তাই নয় যে পরিবারে গোয়াল ভরা গরু আছে তাদের তো একজন আদর্শ রাখাল চাই-ই, আবার অবসর বিনোদনের জন্য পাশা খেলা এবং ছিট কাপড়ের ছাতা মাথায় দিয়ে পথচলা একজন সৌভাগ্যবান গৃহস্থের পক্ষেই সম্ভব। মা শিশুকে সেই আদর্শ ও সৌভাগ্যবান গৃহস্থরূপে দেখতে চান। মা-এর মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের কামনাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে। শিশুর কিন্তু ভাগ্যবান গৃহস্থ হবার বোধ নেই—লোভও নেই, তবুও তার কান্না থামে। একটা অস্পষ্ট ধারণা ও বিচিত্র কামনা নিয়ে সে লোভনীয় সামগ্রীগুলির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এমনি করে শিশু ধরা পড়ে মায়ের ছড়ার ফাঁদে।

শিশু আরও বড় হয়। এবারে নানাবিধ কৌতুক ও খেলার আনন্দ উপলব্ধি করতে পারে সে। এই পর্যায়ের ছড়াগুলি তাই পূর্বেকার মত নয়। শিশুর বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছড়াগুলিও তাল রাখবার চেষ্টা করে।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি করে মাড়ি থেকে পুরাণ দাঁত তুলে ফেলে খোকা। ফলে সহজেই সঙ্গী-সাথীদের কৌতুকের পাত্র হয়ে দাঁড়ায় সে। সাথীরা তালি দিতে দিতে বলতে থাকে :

সকল টাকা খেল খ্যালাঠে
মালুয়া টকা কাই।
গেড়িয়া তলে গু খায়েঠে
ছামুর দাঁত নাই ॥

খুকুর সঙ্গিনীরাও খুকুকে বলে :

আম গাছে কুরোল ঘা।
ফক্‌ড়া দাঁতির ব্যা যা॥

খুকুর নাকটা হয়ত কিছু খাঁদা। সে নিয়েও সঙ্গিনীরা কৌতুক করতে ছাড়েনা :

খাঁদি বিড়ায় বাঁধি
চালতা গাছে মউ।
কৌড় কড়াটা টিপ্যা দিনে
জমাদারের বউ॥

খুকুর পদোন্নতি হয়। দাদা বিয়ে করে অল্পবয়স্কা বধূকে ঘরে আনে। খুকু তখন ঠাকুরঝির পদে অধিষ্ঠিতা। অল্পবয়স্কা বৌদির সঙ্গে তার নিবিড় সম্পর্ক আভাসিত হয় অনাবিল কৌতুকের মধ্যে :

গরম ভাতে তরতরানি
পাথাল ভাতে মউ।
দাদা আইস্থ কয়্যা ছুব
ফুটকি লাচা বউ॥

ঠাকুরঝির সঙ্গে বধূটির মাঝে মাঝে মনোমালিন্য যে হয় না, তা নয়। কিন্তু এই মনোমালিন্যের বেদনা ঠাকুরঝির কাছে অসহনীয় হয়ে উঠে। বৌদির ঝাঁঝালো কথাকে সে ভয় করে। তবুও স্থির থাকতে পারে না সে। ভয়ে ভয়ে বলে :

আঁতাগাছে তাঁতা বাঁসা
ডাল্‌মি গাছে মউ।
কথা কইস না কেন বউ॥
কথা কইনে গা জলে।
কথা কইব কুন ছলে॥

খোকাখুকু হাস্যকৌতুক ছাড়া খেলাধূলা নিয়েও সময় কাটায়। এই খেলাধূলা আবার বিচিত্র রকমের। ছড়ার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এদের খেলাও অগ্রসর হতে থাকে। সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে একত্র মিলিত হয় তারা। একটি মেয়ে বা ছেলে বাহু তুলে দাঁড়ায়। ওর চারদিকে আর সকলে হাত ধরাধরি করে বৃত্তাকারে নাচতে থাকে। মুখে সমবেতভাবে উচ্চারণ করে :

আলুক মালুক শালুক গো
বন শালুকের পাতা।
হরিণ বলে কাট্যা দুব গো
ছোট ঠাকুরের মাথা ॥
ছোট ঠাকুরের জামা জোড়া
রঘুনাথকে সাজে।
রঘুনাথের মরণ দশা
বেল তলার মাঝে ॥
বেল বুড়ি গো বেল বুড়ি
কাপড় কাচ্যা দে।
মামুদরকে খ্যালতে যাব
ঝুমকা কিন্যা দে ॥
ঝুমকার ভিত্‌রে পাক্কা পান।
দিদির ভাতার মুসলমান ॥

শেষের লাইনটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই সকলে হাত ছেড়ে দিয়ে তালি দেয় ও কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলে বা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে। যে আগে জড়িয়ে ধরতে পারে সেই আবার দাঁড়িয়ে থাকবার সুযোগ পায়। আবার পূর্ব্বের মত ছড়ার সঙ্গে নাচ চলতে থাকে। কখন বা ঘরের মধ্যে বসে খেলা চলে। এই খেলার প্রকৃতি বাইরের খেলার চেয়ে একটু স্বতন্ত্র। চার পাঁচজন নিয়ে এই খেলা চলতে থাকে। দুজনের কমে হয় না। কেউ একজন কাপড়ের কোঁচর করে। হাতে একটি ফুল কিংবা অনুরূপ ছোট ও সুন্দর বস্তু নিয়ে একবার কোঁচড়ের মধ্যে ও একবার বাইরে ইতস্তত হস্ত সঞ্চালন করতে থাকে ও মুখে বলে :

উবুর ডুবুর পান মৌরী।
হিচকা নাথের ঘর চৌরী ॥
সারি কি শুয়া।
কার পেটে গুয়া ॥
আজাদরে বাজল ঢোল।
ড্যাংরা কাবা হইল চোর ॥
চোর পালিল হরিবোল ॥

গাছে না পেটে ?—

বলেই সে মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে সকলের দিকে তাকায়—কেউ বলতে পারে কিনা ফুলটি হাতে না কোঁচড়ে ? এই খেলার ছড়াটি আবার পৃথকভাবে বলা হয়ে থাকে :

এক দোল দুদোল দোল্‌কি মাদল।
কাঁইচ কুঁচ ভাঙ্গা পিতল॥
অরিচ মরিচ খরিচ কে।
দাদার কোড়ে দিদিকে দে॥
ঠারে ঠুরে উনিশা বিশ॥
গাছে না পেটে ?

খুকুর বিয়ের বয়েস আসে। এতদিন পর্যন্ত বাপের বাড়িতে খেলাধূলা হাসি তামাসার মধ্যে মুক্ত জীবন যাপন করেছে সে। পরের ঘরে (স্বামীর বাড়িতে) তাই সেই স্বাধীনতা ব্যাহত হয়। বাপের বাড়িতে দুধের সর তুলে খেতেও তার সংকোচ ছিল না কিন্তু 'পরের ঘরে' সে সুযোগ কোথায় ? নতুন বালিকাবধূর বেদনায় তাই সমব্যথীর চিত্ত বিগলিত হয় :

কাঞ্চন কাঞ্চন দুধের সর।
কাঞ্চন যাবে পরের ঘর॥
হইত যেদি বাপের ঘর।
তুল্যা খাইত দুধের সর॥
এ ত হইল পরের ঘর।
কোই পাবেরে দুধের সর॥
খুড়া দিল বুড়া বর।
ও খুড়া তুই জলে ডুব্যা মর॥

শুধু বদ্ধ জীবন যাপন নয়, বৃদ্ধ স্বামীর সেবায় জীবনের মধু মুহূর্ত্ত নিঃশেষে উজাড় করে ফেলতে হবে তাকে। যে খুড়া তাই বুড়া বরে কাঞ্চনকে অর্পণ করেছে তার প্রতি সমব্যথীর অভিশাপ ঝরে পড়ে।

নববধূর পতিগৃহে যাত্রা-মুহূর্ত্তটি একান্তই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। পিতৃগৃহের অজস্র স্মৃতি তাকে পীড়া দেয়। মায়ের দেওয়া শাড়ি পরে ও বাপের দেওয়া 'ডুলি'তে চেপে সে পতিগৃহে যাবে :

আঁকো কুল কি ঝাঁকো কুল
বৈঁচ ফুলের পিড়ি।
কঞ্জা যাবে পরের ঘর
মাকে মাগে শাড়ি॥
বাপ দিল তার যাইতে ডুলি
মা দিল তার শাড়ি।
এই শাড়ি খঁড় পর্যা কঞ্জা
যাবে শ্বশুর বাড়ি॥

এই শাড়িতেই মায়ের স্মৃতি মাখানো রইবে। বাবা, খুড়া, ভাই, দিদি সকলের প্রতি তার অভিমান। এদের সবার কাছেই একদিন বকুনি খেয়েছে সে। আজকের দিনে তবে কেন তারা কাঁদছে? মায়ের বেদনায় সে দিতে চায় সান্ত্বনা। 'ডুলি' বাহকদের সে থেমে থেমে চলতে বলে:

আগু চলে বাজ বাজনদার
পিছু ডুলিয়ে যাই।
থাম্যা থাম্যা চল গো
মাকে প্রবোধ দেই॥

স্বামী-গৃহে বধূর দুঃখের সীমা থাকে না। সেখানে দারিদ্র্য তাকে অহরহ পীড়া দেয়। গায়ে ময়লা জমে, মাথা উকুনে পরিপূর্ণ হয়। দাদা অনেকদিন পরে যখন বোনের খোঁজ নিতে আসে, তখন অভাগিনী বোন না কেঁদে পারে না:

গায়ে যে মলা গো দাদা শামুকে চাঁছি।
মার কোতে কইবু দাদা বোড় সুখে আছি॥
মাথায় যে উকুন গো দাদা বাঁদরে বাছে।
মার কোতে কইবু কন্যা বোড় সুখে আছে॥

শুধু তাই নয় শ্বাশুড়ী ননদের গঞ্জনাও তার জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে:

বিসিরি গাছের যত কাঁটা।
শাউড়ি ননদের তত খঁটা॥

এখানকার সমাজের নারী যে পতিগৃহের দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতি মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে উঠে, তার নিদর্শনও দুর্লভ নয়। অন্তরের সত্যকে তাই কৌতুকের রসে রসিয়ে সে বলে:

চাবাস দিদি চাবাস লো।
রাম ধন্যা মোর ভাতার লো॥
রাম ধন্যার ঘর করবনি।
সিঁতায় সিঁদুর পরবনি॥

সে নারী একান্তই ভীরু নয়। সে সাহসী ও কর্মী। পুরুষের মত কঠিন কর্মেও সে এগিয়ে আসতে দ্বিধাবোধ করে না। ডিঙ্গা বাইতেও পারে সে :

লক্ষ্মীবাঁড়ি কাঁবাস কাঁড়ি
　　ষোল ডিঙ্গা বায়।
চেঁওয়া মাছের বাস পাইনে
　　ভাতার পুড়্যা খায়॥

ছড়াগুলির মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অলংকারের পরিচয়ও পাওয়া যায়। ব্যাসর, ঝুঁটিয়া, টিকিফুল প্রভৃতি অলংকার ও তসর ব্যবহৃত হত তখন। আর পাল্কীর বদলে 'ডুলি'ই ছিল সমাজে প্রচলিত। নীচের ছড়া ও ছড়ার অংশবিশেষের মধ্যে তা-ই লক্ষ্য করি :

১) কান্তা মড়া মাড় মারলু ভাঙলু হাতের **তাড়**
　　হানি হবে কার।

২) ষোল বছ্‌রি মায়া জলকে যাইছে
　　ঝুঁটিয়ার বাজনা।

৩) টিয়া নাকে **টিকি ফুল**
　　খাঁদা নাকে **ব্যাসর**।
গুরিয়া পঁদে লাল শাড়ী
　　ঢেঁকুয়া পঁদে **তসর**॥
তসর কবে খসর মসর
　　টেন্যা পরা ভাল।
ডুলি করে হ্যাঁচর প্যাঁচর
　　চেল্যা যাওয়া ভাল॥

সমাজে যে সমস্ত রসিকতা প্রচলিত ছিল তা অনেক সময় স্থুল। শাশুড়ি জামাইর সম্পর্ক নিয়ে ঠাট্টা তামাসা সেই স্থুল রসিকতারই পরিচয় বহন করে :

মাউসি টক টাউসি
কলাবনে ঘর।
একটা কলা দেনা মাউসি
জামাী ভাতার কর॥

বৌদি ও দেবরের সম্পর্ক নিয়েও রসিকতার অন্ত নেই:

গাঙের পানি গৰ্জ্জে টানি
পুকুরের পানি জড়।
সত্যি কর‍্যা কইঠি দিদি
দেউর ভাতারটি ছাড়॥

আর এক জাতীয় ছড়া পাওয়া যায় যাতে একটির পর একটি কথা বসিয়ে শৃঙ্খলিত করবার রীতি লক্ষ্যণীয়। কোন কোন সময় খেলা বিষয়ক ছড়ায়, কখন বা নিছক কৌতুক সৃষ্টির প্রয়োজনে এই প্রকার ছডার আবির্ভাব।

ব্যাঙাব ভাই চ্যাঙারে
হাঁড়ি বসিল তিনটা।
দুটা হাঁড়ি তার যমন তমন,
একটা হাঁড়ি তার পঁদ নাই।
যোউ হাঁড়িটার পঁদ নাই
চাউল ফুটল তিন লোট।
দুলোট তার যমন তমন
এক লোৎট তাঁর ফুটলনি।
যোউ লোস্‌টা ফুটলনি
লোক খাইল তিন শ।
দুশ তার যমন তমন
এক শ তার খাইলনি।
যোউ শটা খাইলনি
পুকুর খুলল তিনটা।
দুটা পুকুর তার যমন তমন
একটা পুকুর তার জল নাই।

যোউ পুকুরটায় জল নাই
জাল পড়ল তিনটা।
দুটা জাল তার যমন তমন
একটা জালের ঘাই নাই।
যোউ জালটার ঘাই নাই
রুই পড়ল তিনটা।
দুটো রুই তার যমন তমন
একটা রুইর আঁৎ নাই।
আমার কথার সৎ নাই॥

ছড়ায় সবচেয়ে যে জিনিষটি বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি কবিত্বের দিক। সম্পূর্ণ অসতর্ক গ্রাম্য মানুষের মনে রূপ ও সৌন্দর্যের যে অনুভূতি দানা বাঁধে, তারই অনায়াস-লব্ধ আত্মপ্রকাশ ছড়ার মধ্যে। সুর, সৌন্দর্যবোধ এবং বাস্তবানুভূতি আশ্চর্যভাবে একত্র মিলিত হয়েছে নীচের ছড়াটিতে :

শানফুলের বার বাটি মধু ফুলের ঘটা।
কি ফুলটি ফুটছে গো কদম গটা গটা॥
কদম গাছের ছাই গো মরিচ গাছের ছাই!
বোড় মামী যে ভাত খাইছেনি কাই পাব গায়্যা দই॥
গাই যাইছে ঘাঘরা বন বাছুর তুলছে ফেনা।
ষোল বছারি মায়া জলকে যাইছে ঝুঁটিয়ার বাজনা॥
ঝুঁটিয়া করে ঝুমুর ঝুমুর সুবদি কত দূর।
একলা বুড়ি ধানকুটে ঠুকুর মুকুর॥

'ষোল বছরি' মেয়ের 'ঝুঁটিয়ার বাজনা' যেন দূরাগত নৃত্যধ্বনির মত কানে বাজে। জল আনতে গিয়েছে সে। একাকিনী বৃদ্ধার শ্রান্ত-মন্থর গতিতে ধানভানার বাস্তব চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত হয় চোখের সামনে। শনফুল, মধুফুল ও ঘাঘরাবন বর্ণ-গন্ধ ছড়িয়ে সৃষ্টি করে পরিচয় ও অপরিচয়ের এক মায়ালোক। সুন্দরী নারীর রূপও আশ্চর্য কৌশলে গ্রাম্য ছড়ায় চিত্রিত হয়েছে। ভাষা-গ্রাম্য হলেও কবিত্ব অনস্বীকার্য।

কুসুম কুসুম কুন্‌থানে।
জবাফুলের মাঝখানে॥

কুসুম যখন ঝুল ঝাড়ে।
থপা থপা ফুল পড়ে ॥

জবাফুলের মাঝখানে যে সৌন্দর্যলোক সেইখানেই কুসুম থাকে। কালো ঝুলও কুসুমের স্পর্শে ফুল হয়ে ঝরে পড়ে।

মানুষের বহুদিনের অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, মানব-চরিত্রের সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণাও বিভিন্ন প্রকার প্রবাদমূলক ছড়ার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। যেমন,

১। বাপের পোঁদে চাম নাই তার
মুচির সাথে সয়্যা।
হাট করতে পইসা নাই তার
বারি বুসসে গয়া ॥

২। খাইতে ভাল চাউল ভুজা দ্যাখতে ভাল মুড়ি।
রসিক ভাল এক টকার মা দ্যাখতে ভাল ছুঁড়ি ॥

৩। কর্ম কপাল তালু।
কার কপালে মাচ চ্যাকা চ্যাকা
কার কপালে আলু ॥

এছাড়া আরও অনেক ছড়া আছে যার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে ছেলে-ভুলানো অদ্ভুত রকমের সব কাহিনী। শিশুমনের উপর কেবল ছড়ার প্রভাব যাদুকাঠির ন্যায়। এই কাহিনী মিশ্রিত ছড়াগুলি তারও বাড়া। অজানা মানুষ-পাখি, রাক্ষস-খোক্ষস, জন্তুজানোয়ারের দেশে ছড়ার পাখায় ভর করে শিশু মুহূর্তে গিয়ে হাজির হয়।

এমনিভাবে বিচিত্র বিস্তার নিয়ে সমাজমনে ছড়িয়ে আছে ছড়া। এগুলি মানুষের অন্তরের মৌলিক রূপ। কোন কৃত্রিম সৃষ্টির আবরণে তা ঢাকা পড়েনি। অশিক্ষিতা গ্রাম্য কুমারী ও বৃদ্ধা দিদিমা ঠাকুমাদের স্মৃতিতে এখনো তা বিধৃত। ছড়ায় এমন একটা সজীব অনুপ্রেরণা রয়েছে যে বৃদ্ধাও ছড়া উচ্চারণের সময় কিশোরী কুমারীর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। তাদের উচ্ছ্বাসের সামান্যতম অংশ তুলে ধরলুম সকলের সামনে।

গুজরাতীভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি

॥ শ্রীসচ ঠাকুর ॥

সংস্কৃত ও প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে ক্রমশঃ ভারতের নানা প্রান্তে আধুনিক ভাষাগুলির সৃষ্টি হয়।

অপভ্রংশ ভাষাগুলির মধ্যে পশ্চিম এবং মধ্য প্রান্তে 'নাগর' নামক শাখার এক উপশাখা ছিল 'অবন্তী'। গুজরাটের আদিকালীন ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি 'নাগর ব্রাহ্মণ' বলে পরিচিত। নাগরী জুতা-ও গুজরাটী। বাংলা গীতি-কবিতার পদে আছে :

এখন আমায় চিনবে কেন
রাজা হয়েছ হরি
মাথায় বেঁধে পাগড়ী !
পায় দিয়ে নাগরী।

[কৃষ্ণ ব্রজ ত্যাগ করে মথুরায় এলেন, প্রভাসে গেলেন। ব্রজগোপীরা কৃষ্ণকে কথা শুনিয়ে গেল মথুরায়। মথুরা এখনো মহাগুর্জরের সীমান্ত থেকে বেশি দূরে নয়।]

'নাগরী' অপভ্রংশের আর এক উপশাখা 'গুঞ্জরা' অপভ্রংশ নামে প্রচলিত। গুঞ্জরের সঙ্গে গুর্জর, গুজরাট, গুজরাতীর সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

গুজরাট সম্পর্কে প্রাচীনতম গ্রন্থ হেমচন্দ্র কৃত 'সরস্বতী কণ্ঠাভরণ'। তাহাতে 'লাট' জনপদের কথা পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে এই 'লাট্'ই 'সুরাট্' বা সৌরাষ্ট্র। অধিবাসিগণের সম্বন্ধে হেমচন্দ্র বলেন, 'এঁরা চমৎকার প্রাকৃত বলে, কিন্তু গুঞ্জরেরা তাদের নিজস্ব অপভ্রংশেই খুশী।' হেমচন্দ্রই সবার আগে এইরূপ নানাবিধ অপভ্রংশের ব্যাকরণ রচনা করেন। অদ্যাপি জৈন মহারাষ্ট্রীয় অপভ্রংশ এবং অবন্তী প্রাদেশিক ভাষায় তারতম্য বিবেচনায় হেমচন্দ্রের শরণাপন্ন হতে হয়।

গুজরাত অঞ্চলের অপভ্রংশের প্রাচীনতম উল্লেখ পাই খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর

কাছাকাছি 'অল্-বেরুণী'র বিবরণে। একাদশ শতাব্দীর সর্বপ্রাচীন গুজরাতী কবি 'নহল' তাঁর ভিঙ্গল ভাষার গাথায় বলেছেন—নন্দভারো থেকে আরম্ভ করে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত এই সমগ্র অঞ্চলই হল গুজরাট। প্রাচীন গুজরাট-সম্পৃক্ত অনেক প্রাত্নতাত্ত্বিক শিলালিপি ও তাম্রলিপির উল্লেখ রয়েছে বটে, কিন্তু একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ভাষারূপে গুজরাতী কখন যে আত্মপ্রকাশ করল এবং রাজস্থানী ভাষার উদ্ভব হল, তা সঠিক বলা কঠিন। তথাপি গুজরাতী সাহিত্য সম্বন্ধে একথা অবশ্য বলা যায় যে, আদিকালীন গুজরাতী সাহিত্য নিম্নোক্ত চারি পর্বে বিভক্ত করা চলে। (১) আদিতম গুজরাতী ১২০০-১৪০০ বিক্রমাব্দ; এর আবার দুইটি যুগ—(ক) হেমচন্দ্র যুগ, (খ) রসযুগ। (২) মধ্যকালীন গুজরাতী (১৫০০-১৭০০ বিক্রমাব্দ); ইহা তিনভাগে বিভক্ত (ক) আদিকালীন; (খ) ভক্তিমূলক কাব্য যুগ; (গ) বর্ণনাত্মক কাব্যযুগ; (ঘ) আধুনিক যুগ (১৮০০-২০০০ বিক্রমাব্দ)। এই আধুনিক যুগ আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, প্রাথমিক ভক্তিমূলক কাব্য এবং পরবর্তী আধুনিক। এই শেষোক্ত যুগের মহত্ত্ব সমধিক।

হেমচন্দ্রের পরই রসযুগ। রস এক বিশেষ কাব্যরীতি—রসিকজন যা সানন্দে নিরবধি পান করেন। এই রস বা চলিত কথার 'রসো' নানা প্রকারের। রাজস্থানের প্রাচীন ভাষা 'ভিঙ্গল' এবং আদি গুজরাতের ভাষায় রসোর বিবরণ পাওয়া যায়। ক্রমে ভাষা আরো স্বচ্ছ এবং সঙ্গীতময় হয়ে ওঠে। সঙ্গীত মাধুর্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আরম্ভ হল। ভাষা গীত-ধর্মী হতে চলল।

আদিযুগের রসকর্তাদের অনেকেই বেনামী পদকর্তা। জৈন পণ্ডিতদের এ-জাতীয় কবিতাকে 'ফাগু' বলা হয়। রসজাতীয় কবিতা বীর-রসে পূর্ণ, কীর্তিগাথায় ভরপূর। এর গান বিবাহে অন্নপ্রাশনে গাওয়া হয়। লোক-কাহিনী ও বিশিষ্ট আখ্যায়িকা সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত। বিজয়ভদ্র সুরী, ভীম হীরানন্দ প্রভৃতি রসকর্তারা লোক-কাহিনীর যথেষ্ট ব্যবহার করেছেন।

এ সব কবিতার অপর এক বৈশিষ্ট্য হল 'বারোমাসিয়া' ও 'মাতৃকা'। ঠিক এই ভাবের কবিতা পাঞ্জাবের আদিযুগের লোক-গাথায়ও পাওয়া যায়। শ্রীদেবেন্দ্র সত্যার্থী অনেক-কিছু সংগ্রহ করেছেন।

পঞ্জাবের এক বিখ্যাত অঞ্চলের নাম গুজরাট, অপর একটি আবার মালব্য নামে অভিহিত। এই নাম দুইটির উপর গবেষণা করলে হয়তো বেরিয়ে

পড়তে পারে এর কারণতত্ত্ব। দক্ষিণাপথের 'মধুরা' (Madura) যে উত্তরের মথুরা নগরীর অনুকরণ তা আজ সবাই স্বীকার করছেন।

বিক্রমাব্দ পঞ্চদশ শতক থেকে সন্ত কবি নরসিংহ মেহতার সঙ্গে সঙ্গে গুজরাতী সাহিত্যের প্রকৃত বিকাশ, আধুনিক যুগ। মহাত্মা গান্ধীর অতি প্রিয় গানটি নরসিংহ মেহতার রচিত। উহা এখানে উদ্ধৃত হল।

(রাগ খাম্বাজ বা খমাজ; তাল ধুমালী)

বৈষ্ণব জন তো তেনে কহীএ
　　জে পীড় পরাই জানে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তোরে
　　মন অভিমান ন আনে রে ॥ ধ্রুব ॥
সকল লোকমাঁ সহুনে বন্দে,
　　নিন্দা ন করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে
　　ধন ধন জননী তেনী রে ॥ ১
সমদৃষ্টি যে তৃষ্ণা ত্যাগী,
　　পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে
　　পরধন নব ঝালে হাথ রে ॥ ২
মোহ মায়া ব্যাগে নহী জেনে,
　　দৃঢ় বৈরাগ্য জেনে মনমাঁরে।
রাম নাম শুঁতালী লাগী,
　　সকল তীরথ তেনা তনমাঁরে ॥ ৩
বন লোভী নে কপট রহিত ছে,
　　কাম ক্রোধ নিবার্য্য রে।
ভনে নর সৈঁয়ো তমু দরশন করতাঁ,
　　কুল একোতের তার্যাং রে ॥ ৪

মহাত্মার জীবনাদর্শ এই গানটিতে ব্যক্ত রয়েছে। কাহাকে বৈষ্ণব জন বলা যেতে পারে তার একটি পূর্ণ সংজ্ঞা সন্ত নরসিংহজী দিলেন। সেই তো বৈষ্ণব জন বলে গৃহীত হতে পারে যে পরপীড়ন জানে না, পরদুঃখে যার মন বিগলিত হয়ে যায়, দুঃখ মোচনের জন্য পরের উপকারে লেগে যায়, মনে অভিমান

রাখে না ; গানের ভিতর এই কথা কটি ধুয়া (ধ্রুব) রূপে বারংবার আসে। মূল পড়লেই মানে হৃদয়ঙ্গম হয়ে যাবে। গুজরাতী শিক্ষা বাংলা-ভাষীর পক্ষে বেশি কষ্টসাধ্য নয়।

মধ্যযুগের সন্ত কবি তুকারাম যেমন মহারাষ্ট্রের, সুরদাস যেমন উত্তর-ভারতের, চৈতন্য যেমন পূর্বাঞ্চলের, সেইরূপ নরসিংহ মেহতা গুজরাটের।

গুজরাটের আদি বৈষ্ণব কবি ছিলেন চক্রধর (খৃঃ ১২শ শতক)। মহানুভাব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুগণের প্রচারে এই সময় সারা দেশ জুড়ে কৃষ্ণভক্তির স্রোত বয়ে গেছিল আসমুদ্র হিমাচল পর্য্যন্ত। ভারতীয় অন্যান্য ভাষাসাহিত্যেও চক্রধরের প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। সকল প্রান্তীয় ভাষায়ই কৃষ্ণভক্তির প্রবল বান ডাকিল।

নরসিংহ মেহতার পরই সংগীতধর্মী লিরিক কবিতার পূর্ণতর বিকাশ দেখা যায় প্রথমে ভালন কবির হাতে, যাঁর আদর্শ ছিল শ্রীমদ্ভাগবতম্। ভালন ব্রজভাষায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ বলেন যে, সর্বপ্রথম ব্রজভাষার কবি কবি গুজরাতী—কেননা, সুরদাস, নন্দদাস প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কবিদের রচনায় ভালন-কবির প্রভাব সুপরিস্ফুট। প্রয়াগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জগদীশ গুপ্ত হিন্দীতে হিন্দী ও গুজরাতী বৈষ্ণব কাব্যের তুলনাত্মক আলোচনা করেছেন। তাতে জানা যায় ভালন কবির দর্শন মথুরা ও দ্বারকা এই দুইটি অঞ্চলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই যুগের কাব্য ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভরপুর। পদগুলিরও পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

এর পর উচ্ছ্বাসের বহর কমে গিয়ে ভাষা স্বাভাবিক উন্নতি লাভ করে। ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য রক্ষিত হতে থাকে। এসবকে 'আখ্যান সাহিত্য' নাম দেওয়া হয়। নল-দময়ন্তী, ধ্রুব, নচিকেতা প্রভৃতি উপাখ্যান দীর্ঘ কবিতার বিষয়বস্তু হয়।

এই সময় গুজরাতী ভাষায় আরবী পারশী প্রভৃতি বিদেশী শব্দের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। খৃষ্টীয় ১৫—১৬ শতকে অনেক গাথা-সাহিত্য রচিত হয়। কাব্যের দৃষ্টিতে তন্মধ্যে উৎকর্ষ বিশেষ না থাকিলেও তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার এক পরিচয়-চিত্র উহাতে পাওয়া যায়। এই যুগে প্রেমানন্দ ও দয়ারাম কবিদ্বয় গুজরাতী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। প্রেমানন্দের কাব্যিক রীতির সঙ্গে আশ্চর্য রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ নৈসর্গিক বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

সগুণ ভক্তির ভিত্তিতে রচিত কবিতা গুজরাটে জনপ্রিয়। সাম্প্রতিক কালে কিছু কিছু পুরাতন লোক-গীতি আবিষ্কৃত হওয়ায় ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণাও অগ্রসর হচ্ছে।

গুজরাতী সাহিত্যের আধুনিক যুগ, বলতে গেলে, উনবিংশ খ্রীষ্টশতাব্দীর প্রথম থেকে আরম্ভ। অবশ্য অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে উহার সূচনা। নর্মদাশঙ্করকে এ যুগের আদি কবি বলা যেতে পারে। তিনি বীর রসের কবি এবং অতীত গৌরব কাহিনী ব্যলাডের স্রষ্টিকর্তা। তিনিই জাতীয় ভাবের অগ্রদূত। সুরাটের সরকারী পার্কে তাঁর এক সুন্দর ব্রোঞ্জ প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে।

ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সর্বত্র কবি রসিকগণ য়ুরোপীয় রোমান্টিক কবিদের রচনাদ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গুজরাট তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, ব্রাউনিং দম্পতী প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের রচনা আদর্শ হয়ে উঠে। ইংরাজী থেকে ভাষান্তর ও অনুবাদ কম হয়নি। আবার দেশীয় অন্যান্য সাহিত্য থেকেও আহরণ ও ভাষান্তর সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

গুজরাতীতে লীরিক কবিতাকে বলা হয় 'উর্মি কবিতা'। ইহা একদিকে যেমন উৎসাহবর্দ্ধক তেমনি অপর দিকে স্বচ্ছন্দতাপ্রবণ। গোড়ার দিকে নরসিংহ রাও, মণিলাল ও বালশঙ্কর প্রভৃতি কবিরা এ-জাতীয় কবিতায় হস্তক্ষেপ করেন। ইহার একটি গুণ হচ্ছে আত্ম-অনুসন্ধান। কলাপী এ-যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। বাংলা সাহিত্যের মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং মরাঠী মাধব জুলিয়নের মতো গুজরাতী সাহিত্যে কলাপী কবির প্রতিষ্ঠা হয়। রোমান্টিক উচ্ছ্বাস এবং বিদেশী সাহিত্যের রূপায়ন কর্ম্ম নিজস্বীকরণে এক নূতন ধারা স্বতঃই প্রবর্তিত হয়ে যায়। মাইকেল যেমন বাংলা সাহিত্যে মিল্টনী অমৃতাক্ষর ছন্দের উদ্‌গাতা, গুজরাতীতে তেমনি ফার্সী অনুকরণে 'গজল'-কবিতা রচনার প্রবর্ত্তন কলাপীর যুগে হতে থাকে। কলাপীর জীবনবৃত্তও বিশেষভাবে রোমান্টিক, তাঁর প্রেমপত্রগুলি স্বতঃই ইংরেজ কবিদের রোমান্টিকতা স্মরণ করিয়ে দ্যায়। কলাপী কবির অনুকরণে ত্রিভুবন, প্রেমশঙ্কর ও জগন্নাথ ত্রিপাঠী হাত পাকিয়েছেন। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের শেষের দিকে লীরিক কবিতা আদর্শ বা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়ায়। কণ্ঠ এ ধরণের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।

এই কালে নন্দলাল দলপতরাও গুর্জর সাহিত্যাকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র-

রূপে দেখা দেন। প্রায় ধ্রুব-নক্ষত্রের মতো-ই কএক দশক ধরে তিনি আদর্শ রূপে পরিগণিত হন, নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের দর্শনে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর কাব্যের বৈচিত্র্য যথেষ্ট। তিনি অমৃত্রচ্ছন্দ প্রবর্তন করেন। গুজরাতে এই ছন্দকে বলা হয় 'অপদ্য-পদ্য'। বর্ণনাত্মক কবিতায় তিনি সিদ্ধহস্ত। নীতিমূলক ভক্তি-রসান্বিত গীতি কবিতা তিনি অনেক রচনা করে গেছেন। সে সব ভারতীয় চিরন্তন সাহিত্যে স্থানলাভ করেছে। তন্মধ্যে অনেকগুলি বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে এসে যায়।

গদ্য কবিতা ও সনেটের ক্ষেত্রে বলবন্ত রাও ঠক্কর (ঠাকুর, সংস্কৃত ঠক্কুর) নানাজাতীয় আধুনিক শৈলী প্রবর্ত্তন করেন।

পার্শী সম্প্রদায়ী কবি আর্দেশির ফরামজী খবরদার গুজরাতী সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। অনেক পার্শী গুজরাতী সাহিত্যিক। মাতৃভাষাও বহু পার্শীর গুজরাতী। কাশী সেণ্ট্রাল হিন্দু স্কুলে এক কালে প্রসিদ্ধ ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর ইরাচ্ জ, স, তারাপুরওয়ালা হেড্ মাস্টার ছিলেন। পরে তাঁকে বঙ্গ-ব্যাঘ্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপক করে নিয়ে যান। কাশীতে আরেক জন বৃদ্ধ অধ্যাপক থিওসফিস্ট উন্ওয়ালা সাহেবও পার্শী ছিলেন। তাঁহার ঈপ্সিত কাশীপ্রাপ্তি হয়েছিল। গুজরাতী মাতৃভাষা হলেও ইংরাজী ইঁহাদের একপ্রকার ঘরানা ভাষা। সিন্ধীদেরও তথৈবচ। অনেক সিন্ধী গুজরাতীকে আপনার করেছেন। কবি মেঘানী সিন্ধী; আবার মারাঠা কাকা কালেলকর বেশির ভাগ গুজরাতীকে লেখেন। মরাঠা বঙ্গ-সাহিত্য রথী সখারাম গণেশ দেউস্কর একাধারে শ্রেষ্ঠ বাংলা পত্রিকা সম্পাদক ও তদানীন্তন বেঙ্গল ন্যাসনাল কলেজে ইতিহাস ও বঙ্গ সাহিত্যের অধ্যাপক। এই পংক্তিগুলির লেখকের বেশ মনে আছে কী সুন্দর তিনি হেমচন্দ্রের 'বৃত্র সংহার' এবং 'বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে' প্রভৃতি কবিতা পড়াইতেন। তিনি 'দেশের কথা'র গ্রন্থকার। ব্রিটিশদ্বারা বাজেয়াপ্ত বইএর মধ্যে এটি প্রকাশিত।

সাধারণ ভাবে গুজরাতী সাহিত্য সম্বন্ধে যা-কিছু বলা হল তা এবং-বিধ সমৃদ্ধ ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট নয়।

অতঃপর বিশেষভাবে বর্তমান কবিতা নাটক ও নিবন্ধ সাহিত্য সম্বন্ধেও কিছু তথ্য দেওয়া যাক্।

১) কবিতা

বলবন্ত রাও ঠক্করের সঙ্গেই গুজরাতী কবিতার নূতন যুগের সূত্রপাত। এর নাম করণ তিনি করেছেন "অর্থঘন"—অর্থঘন কবিতা ভাবপূর্ণ; ভাব বা রস সম্বন্ধে সেটি ঘন হওয়া চাই। 'বিশুদ্ধ বে-সুরেলা কবিতা' শীর্ষক এক নিবন্ধও তিনি লিখেছেন। ১৯৩৫ সনে তাঁর 'সনেট সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। কণ্ঠ প্রভৃতি কোন কোন কবির রচনায় শূন্য এবং নৈরাশ্যবাদ ফুটে উঠে। ১৯৩০-৪০ এর দশকে ভারতের প্রায় সকল ভাষায় এই নৈরাশ্যবাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। পূর্বাঞ্চলে বাঙালী কবি নজরুলের 'বিদ্রোহী বীর', পশ্চিমে মারাঠা কবি তাম্বেব 'রুদ্র চা আহ্বান' (রুদ্রের আহ্বান) এই যুগের-ই। কিন্তু গুজরাতী ভাষায় মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে এই নঙ-অর্থক সুর প্রবল হতে পারে নি। শেষে, জাতীয়তা ভাবের বন্যা দেখতে পাই এই সকল আধুনিক কবির রচনায়। মেঘানী, সুন্দরম্, স্নেহরশ্মি, উমাশঙ্কর, পূজালাল, করসনদাস মানেক, স্বপ্নেষ্ঠ ও সুন্দরজী বেতাই প্রভৃতির লীরিক এবং দীর্ঘ কবিতায় এবংবিধ জাতীয় ভাব ফুটে উঠে।

মেঘানী সৌরাষ্ট্রের লোকসংগীত সংগ্রহ করেছেন, গাথা-জাতীয় কাব্য-শৈলীতে যশস্বী হয়েছেন। সুন্দরম্ মার্ক্সীয় প্রভাবে তিক্তরস পরিবেশন করেছেন—চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন ভারতের দৈন্য। শেষে তিনি পণ্ডীচারীতে শ্রীঅরবিন্দাশ্রমী হয়েছেন। সবার উপরে নাম করতে হয় উমাশঙ্কর যোশীর। প্রভাকর মাচওয়ে তাঁর 'ব্যক্তি এবং ব্যঙ্গমা' নামক হিন্দী পুস্তকে উমাশঙ্করের বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। উমাশঙ্করের প্রথম কবিতা-পুস্তক 'গঙ্গোত্রী' (১৯৩০) প্রকাশিত হয় তাঁর কৈশোরে। তদবধি তিনি শ্রেষ্ঠ কবির আসন পেয়ে আসছেন। তাঁর দীর্ঘ কবিতা 'বিশ্বশান্তি' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের লেখা হলেও আজো তাহা সমাদৃত। যুদ্ধবিরোধের বাণী তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে সেই কালেই ঘোষিত হয়। তাঁর কবিতা ও সংগ্রহপুস্তক-ও অনেক ; একাঙ্ক নাটকসংগ্রহ, শকুন্তলার ভাষান্তর এবং অসংখ্য নিবন্ধবলি রয়েছে। 'সংস্কৃতি' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা তিনি আহমেদাবাদ থেকে সম্পাদন করেন।

কবি করমদাস বিদ্রূপাত্মক কবিতায় সিদ্ধহস্ত। নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে নিরঞ্জন ভগত, উষ্ণীশ, রাজেন্দ্র শাহ্, গীতা পরেখ্, হংসমুখ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

২) নাটক

গুজরাতে অনেক পেশাদার নাট্যসজ্ঞ,—অনেকটা বাংলা দেশের সেকালের যাত্রার দলের মতো—রয়েছে। সিনেমার প্রচলনে সেগুলি প্রায় বিগতপ্রায়। উচ্চাঙ্গের পার্শী থিয়েটার পার্টিগুলি গুজরাতী অভিনয়ই বেশির ভাগ করতো। কিছু কিছু অবশ্য ইংরাজী ও হিন্দীতেও রয়েছে। চিরায়ত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ গুজরাতীতে যথেষ্ট। শেকস্পীয়রের নাটকের অনুবাদ রয়েছে, মোলেয়ায়ের প্রহসনের অনুবাদও আছে। আবার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনেক নাটকের গুজরাতী রূপ, এবং শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' 'অলকা' নামে অনূদিত হয়েছে। এ সব অনুবাদ জনপ্রিয়।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে কন্হৈয়ালাল মানেকলাল মুন্সীর নাটকগুলি তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ন্যায় উৎরায় নি বলে অনেকের ধারণা। কিন্তু অনুধাবন করে দেখলে বুঝা যায় মুন্শীর সব লেখাই সার্থক। রমণলাল দেশাই কমপক্ষে আধ ডজন নাটক পরিবেশন করে জনপ্রিয় হয়েছেন। তিনি একাঙ্কীও লিখতে আরম্ভ করেছেন। সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ক ঐতিহাসিক নাটক সফল মঞ্চস্থ হয়েছে। চন্দ্রবদন মেহ্তাও একজন খ্যাত নাট্যকার; কিছু কিছু তিনি রেডিওতে পরিবেশন করেছেন। বটুভাই ওয়াডিয়া, চুণিলাল মাদিয়া, ক, শ্রীধরাণী ও ধনসুখলাল মেহতা প্রভৃতির দানও কম নয়। শ্রীমতী দীনা গান্ধী এবং তাঁর ভগিনী তরলা গান্ধীর নাটকগুলি গুজরাটে নবজীবন এনেছে। এঁদের 'মেনা গুর্জরী' ও 'মিথ্যাভিমান' বেশ জনপ্রিয় হয়েছে।

এত সব ভালো সৃষ্টি সত্ত্বেও কেহ কেহ নাট্যসাহিত্যে গুজরাতীর দৈন্য স্বীকার করেন। কিন্তু তুলনা করে দেখলে বলতে হয়, আমাদের অন্যান্য ভাষার অনেকগুলিই গুজরাতীর মতন এগিয়ে যেতে পারে নি। আমাদের বাংলা দেশেই-বা আজকাল সফল নাট্যকার কটি আছেন?

৩) উপন্যাস ও ছোটগল্প

ছোট গল্প ও বৃহৎ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও গুজরাটে অনেক লেখক প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন। ১৮৭৩ থেকে গুজরাতী ছোটগল্পের সঙ্কলন প্রথম প্রকাশিত হয়। আধুনিক ছোটগল্পের প্রবর্তন করেন শ্রীমলয়ানিল। 'দ্বিরেফ' ছদ্মনামী রামনারায়ণ পাঠক, ধূমকেতু, র. ভ. দেশাঈ, মুন্শীজী, সোপান, পান্নালাল

পাঠক, ঈশ্বর পেতলীকর, চুনীলাল মাদিয়া, জয়ন্ত দলাল, গুলাবদাস ব্রোকার প্রভৃতি ছোটগল্পের আসরে বিখ্যাত হয়েছেন।

অন্যান্য ভাষায় ছোটগল্পের পূর্বেই উপন্যাসের বিকাশ দেখা যায়। কিন্তু গুজরাতে ইহার ব্যতিক্রম। উপন্যাস শেষে হয়। ১৮৮৬ সালে প্রথম উৎকৃষ্ট উপন্যাস 'করণ খেলো' বের করে নন্দশঙ্কর মেহ্‌তা যশস্বী হন।. উহা হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগে বী-এর পাঠ্য নির্বাচিত হয়েছিল। 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' আরেকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

এর পর আধুনিক যুগে অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। এই ধারায়ও কন্হৈয়ালাল মুন্‌শীর দান সামান্য নয়। তাঁর 'গুজরাত নো নাথ', ধূমকেতুকৃত 'চৌলা দেবী' এবং র. ভ. দেশাঈ রচিত 'কালভোজ' বিখ্যাত হয়েছে।

সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম গোবর্দ্ধন ত্রিপাঠী 'সরস্বতী চন্দ্র' (১৮৮৭) বের করে যশস্বী হন। ইনি গুজরাতী সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র। মুন্‌শীজীর 'বর্গী বস্থলাভ' (১৯১৪) জনপ্রিয়। ইনি বরোদা কলেজে শ্রীঅরবিন্দের ছাত্র ছিলেন। এই সেদিনও তিনি উত্তর প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। গুজরাতী সাহিত্যে মুন্‌শী-দম্পতীর অবদান চিরস্মরণীয় থাকবে। বম্বের 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' এঁদের সৃষ্টি। শ্রী র. ভ. দেশাঈর সামাজিক উপন্যাসগুলি অসাধারণ রূপে জনপ্রিয়। কমপক্ষে ১৫ খানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের রচয়িতা ইনি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপন্যাসকারগণের ভিতর পান্নালাল পটেলের খুব নাম। অন্যান্য ভাষায়ও তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'মলিনা জিভ' অনূদিত হওয়ার সুযোগ দিয়েছেন ভারতীয় আকাদামি। ঈশ্বর পেতলীকর নবীন শৈলীর সফল লেখক। এঁর ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবান্বিত সাম্প্রতিক উপন্যাস মীরার ভজনের একটি কলির অনুসরণে লেখা নাম 'আমি জেনেই বিষ খেয়েছি'।

৪) নিবন্ধ ও সমালোচনা

নিবন্ধ সাহিত্যে গুজরাতী অগ্রসর। সাংবাদিকতা এ অঞ্চলে অনেক কাল পূর্বেই শুরু হওয়ায় অনেক নিবন্ধকারের উদ্ভব হয়েছে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যে ও শিশু সাহিত্যে গুজরাতী সমৃদ্ধ।

'ভদ্রমভদ্র' নামক এক আদিযুগের লেখা অদ্যাবধি জনপ্রিয়। সহজ প্রচলিত

গুজরাতী শব্দ থাকা সত্ত্বেও অপ্রচলিত উদ্ভট সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগকে ব্যঙ্গ করে এ গ্রন্থটি লেখা হয়।

র. ভ. পাঠক, যতীন্দ্র বাবে, গগনবিহারী মেহতা ও ধূমকেতু বিখ্যাত নিবন্ধকার।

জীবনচরিত্রের ক্ষেত্রেও গুজরাতীর শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। গান্ধিজীর আত্ম-কথা থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বহু জীবনচিত্র বেরিয়েছে। নর্মদ, মুন্‌শী চ. চ. মেহতা, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক সবাই চরিতকার। জীবনস্মৃতি (স্বরচিত জীবন চরিত্র) অনেকে লিখেছেন। গান্ধীর আত্মকথার পর অনেকে স্মৃতি-কথা লিখে গেছেন। মহাদেব দেশাই, ঈশ্বরলাল মশরুওয়ালা, নগিন দাস পারিখ, প্রভৃতি অনেকেই নিজ নিজ স্মৃতিকথা লিখেছেন।

রম্যরচনা ও নক্‌সার ক্ষেত্রে শ্রীমতী লীলাবতী মুনশী অগ্রগণ্য। অন্যান্য প্রান্তীয় ভাষায় কোনো মহিলা এতটা হাস্যরসের আমদানী করেছেন বলে জানা নেই। ডক্টর কিষণ সিং চৌরা রসরচনা ও নক্‌সায় সিদ্ধহস্ত।

কাকা কালেলকরের ভ্রমণ কাহিনী অনবদ্য, যেন জলধর সেনের হিমালয় ভ্রমণ।

সমালোচনা সাহিত্যে আনন্দশঙ্কর ধ্রুবের নাম প্রথমেই করতে হয়। ইনি অনেক কাল হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস্ চ্যান্সেলর এবং আর্টস কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ব. ক. ঠাকুর, বিশ্বনাথ ভট্ট, র. ব. ত্রিবেদী, অনন্তলাল রাবল প্রভৃতি অনেক সমালোচক রয়েছেন। 'মডার্ন রিভিউ'এ তিনহাজার গ্রন্থ-সমালোচক বৃদ্ধ কৃষ্ণলাল ঝাবেরী প্রায় দুই বৎসর হল মারা গিয়াছেন। শ্রী ক. ক. শাস্ত্রী গুজরাতী সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন। ডক্টর সন্দেসর, মুনি দিগ্‌বিজয়, মুনি জিনবিজয় ও ডক্টর মুনি কান্তিসাগরের দানও সামান্য নয়। এঁরা ঐতিহাসিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা সাহিত্যে স্মরণীয় থাকবেন। জন্মান্ধ পণ্ডিত সুখলাল সিঙ্ঘবী ঐতিহাসিক ও কৃষ্টিগত কার্যে আপন স্থান পেয়েছেন। বিশেষতঃ জৈন সাহিত্য ও দর্শনে তাঁর দান অতুলনীয়। গ্রন্থপঞ্জীকরণে এই অসাধারণ অন্ধ সুধী আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়ে দেশবাসীকে অবাক্ করে দিয়েছেন।

বিদ্যাগৌরী নীলকণ্ঠ, হংসা মেহতা, লীলাবতী মুন্‌শী, কুন্দনিকা কাপড়িয় প্রমুখ মহিলা সাহিত্যিকগণ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের নানাদিক উজ্জ্বল করেছেন। লীলাবতী মুন্‌শী উত্তর ভারতে বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশে মহিলা-

প্রগতির পথপ্রদর্শিকা। শ্রীমতী হংসা মেহতা বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলর রূপে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কেবল সাহিত্যিক রচনায়-ই নয়, পরন্তু গবেষণা ও গঠনমূলক কর্মে, গ্রন্থ ও পত্রিকাদি সম্পাদনে এবং বৃহৎ কার্য্যানুষ্ঠান সম্পন্নে কদাচিৎ এরূপ মহীয়সী নারী দেখতে পাওয়া যায়। সম্প্রতি বরোদায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ পেন কনফারেন্সের অভ্যর্থনা সমিতির পুরোধা-রূপে সুষ্ঠুভাবে এই বৃহৎ কর্ম সম্পাদনে হংসা মেহতার কৃতিত্ব অপরিসীম।

গুজরাতী অভিধান রচনায়-ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। 'ভগবতী গো-মণ্ডল শব্দকোষ' এক বিরাট আভিধানিক কীর্তি। সয়াজী রাও গায়কওয়াড়—নির্দেশিত ভারতীয় নয়টি ভাষার সম্মিলিত অভিধান ভারতে শ্রেষ্ঠ বহুভাষিক অভিধান।

গায়কওয়াড় প্রাচ্য পুস্তকমালায় বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও ভাষা প্রকাশিত হয়েছে। এদেশে পর্যায়ক্রমে পুস্তকের ছড়াছড়ি।

শিশু সাহিত্যও গুজরাটে সমৃদ্ধ। লেখক-লেখিকা অসংখ্য। সয়াজী রাও গায়কোয়াড়ের আমল থেকে হু হু করে সাক্ষরতা বাড়ছে। তাঁর আওতায় বরোদায়ই ভারতের লাইব্রেরী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তিনি অন্যান্য স্থানের মতো তখন বিশ্ববিদ্যালয় না গড়ে বরং লাইব্রেরী আন্দোলনে প্রচুর অর্থব্যয় করে ভারতবর্ষে এক মহান্ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর বরোদায় সয়াজী রাও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে, যার পুরোধা শ্রীমতী হংসা মেহতার কৃতিত্ব সম্বন্ধে কিছু পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। চলন্ত গ্রন্থাগার বরোদায় সয়াজী রাও গায়কওয়াড়ের আমলে প্রবর্ত্তিত হয়, পরে তদনুকরণে মাদ্রাসে ও অন্যত্র এই প্রথার প্রচলন হচ্ছে।

গুজরাতী ভাষার সঙ্গেও বাংলার সামীপ্য সমধিক। গুর্জর-গৌরবে সর্ব ভারত গৌরবান্বিত।

গত বৎসর, ১৯৫৭ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বৈঠক বসেছে গুজরাতের প্রধান নগর আমেদাবাদে। সাহিত্য-শাখার সভাপতি শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায় তাঁর সুচিন্তিত সারগর্ভ অভিভাষণে গুজরাতী সাহিত্য-সেবিগণের সহিত যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে সুপরামর্শ দিয়েছেন। আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতারূপে তিনি নর্মদাশঙ্কর, দলপতরাম, গোবর্দ্ধনরাম, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহারথীর নামোল্লেখ করেছেন। তাঁদের উত্তর-সাধকরূপে যাঁরা গুজরাতী সাহিত্যের স্তম্ভরূপে বিরাজমান তাঁদেরও

উল্লেখ করেন ; যথা উমাশঙ্কর, শ্রীধরাণী, খবরদার, শ্রীমতী জ্যোৎস্না শুক্লা প্রভৃতি কবি ; কান্হাইয়ালাল মুন্শী, পান্নালাল পটেল, ঈশ্বর পেটলিকর প্রভৃতি কথাকার ; চন্দ্রবদন মেহতা, জয়ন্তী দালাল প্রভৃতি নাট্যকার। সবাইকে আন্তরিকতার সহিত আহ্বান করে বিভূতিভূষণ নবযুগের বাণী নূতন করে শোনালেন। সভায় নিশ্চয় তাঁদের কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। বিভূতিভূষণের অভিভাষণ গুজরাতী সাহিত্যিকদের আপনার করেছে।

বিভূতিবাবুর অভিভাষণে এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে যে, সাহিত্য খামখেয়াল নয়—ইহা স্বাধিকার অর্জনের তপস্যা। সাহিত্যিকের সাধনা জাতির পথনির্দেশ ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করবে—রাজনীতিকের চেয়েও বেশি করে, শাসকের চেয়েও। বাংলা সাহিত্য জাতির সমস্যার দিনে তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে বিজয়ের পথে এগিয়ে দিয়ে এসেছে। আজ আবার সমগ্র জাতি নূতন সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে। এ সমস্যা বিপন্নের নয়, বিজয়ীরও একটি সমস্যা আছে—তা গঠনের।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতির সৃষ্টি-চেতনা নূতন করে জাগ্রত, তাকে নব নব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব সাহিত্যিকের। কেননা, তার চেয়ে মুক্ত আর কে? দৃষ্টির স্বচ্ছতা, চিত্তের স্বাধীনতা আর কার বেশি থাকবার কথা?

গুজরাটের বক্ষে দাঁড়িয়ে বিভূতিভূষণ এই বাণী ঘোষণা করে পরোক্ষভাবে গুজরাতী সাহিত্যিকদের কাছে প্রাণের আকুতি জানিয়ে এলেন। এ অভি-ভাষণে বাংলার সহিত নিকট সম্বন্ধ প্রকটীকৃত হবে সন্দেহ নাই।

একটি প্রার্থনা

॥ শ্রী 'শ্রাবসী মুখোপাধ্যায় ॥

[শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ থেকে]

ঈশ্বর তুমি পরম মহেশ্বর
সব দেবতার পরম দেবতা, প্রিয়।
তোমাকে জেনেছি ওগো ভুবনেশ্বর
মহাপ্রভু তুমি বিশ্ব-বন্দনীয়।
একথা জানতে পেল যে মহাহৃদয়
অমৃত হল সে,—সকলি অমৃতময় ॥

কার্য-কারণ কিছু নেই, নেই তাঁর।
সমান বা তাঁর চেয়ে বেশি নেই কেউ।
মহাশক্তির হাজারো রূপের ঢেউ
বোধি-বুদ্ধির কর্মের সমাহার।
যে মহা হৃদয় জানতে পেল এ কথা
অমৃতে তাঁহার আত্মার পূর্ণতা ॥

এ জগতে তাঁর প্রভু কোথা নেই কোনো,
রূপাতীত হয়ে সকল রূপের রাজা।
সকল কাজের করণ-উৎসে তাজা
তাঁরই শক্তির নাম-রূপে বোনো বোনো
জীবনে যে তাঁরই শিল্পের সম্মতি।
সৃষ্টি-বিহীন সৃষ্টির অধিপতি।
যে পেয়েছে এই সত্যের দর্শন
অমৃতে তাঁহার আত্মার জাগরণ ॥

বিশ্বকর্মা গড়েছে নিখিল বিশ্ব— ;
এই দেবতাই জন-চিত্তের কূলে

দেদীপ্যমান ; পৃথিবীর প্রতি ধূলে
এঁকেছে অবাক রূপের রঙের দৃশ্য।
হৃদয়-বুদ্ধি মানসে যে পরিব্যাপ্ত
তাঁরই নাম শোনো স্বপ্নের অভিসারে।
এই সত্যের যে নিয়েছে আনুগত্য
অমৃত তাঁহার আত্মার অধিকারে ।।

'বাধা বাধা দিবার জন্য নয়, বাধার প্রয়োজন প্রকাশকে সংযত, ক্রমানুসারী ও বিবর্ত্তিত করিবার জন্য। বন্ধনও তেমনি বাঁধিবার জন্য নয়, বন্ধনের প্রয়োজন মুক্তিকে সংযত করিবার জন্য, রসানুকূল্যে আস্বাদন করিবার জন্য, ক্রমানুসারী করিবার জন্য। তাই বন্ধন ও বাধা যদি 'মায়া', বন্ধনাপেক্ষা মুক্তি এবং বাধাপেক্ষা অবাধও মায়া। দুই-ই জীবনের মহাসম্পদ। বাধাও ধ্রুব, মুক্তিও ধ্রুব। বন্ধনকে এমন ভাবে মুক্তির আনুকূল্যে ও ঘনায়িতরূপে আস্বাদন করিতে হয়, যাহাতে মুক্তি জীবনেরই পরা অবস্থা রূপে পরিণত হয়। বাধা ও বন্ধনকে মানুষ ভয় পায়, যখন ঐ বন্ধন ও বাধা জীবনের অগ্রগমনের পরিপন্থী হয়। কিন্তু বাধা ও বন্ধনের স্বরূপ তো তাহা নয়। রামচন্দ্রের বাধাই রামচন্দ্রের রামচন্দ্রত্বকে গড়িয়া তুলিয়াছিল। রামকে চিনিতে হইলে অনন্ত বাধাযুক্ত রামকেই চিনিতে হইবে। পুরুষোত্তমের পদে পদে বাধা। শ্রীকৃষ্ণ অবাধে ব্রজে থাকিতে পারেন নাই, অবাধে মথুরাবাস তাঁহার হয় নাই, অবাধে দ্বারকায়ও থাকা হয় নাই, অবাধে মরাও হয় নাই। কি বাধা ঠেলিতে ঠেলিতে বা সার্থক করিতে করিতে তাঁহাকে চলিতে হইয়াছে? তাই না তিনি পুরুষোত্তম? যাহা-কিছু বড় তাহার কিছুই বাধাহীন নয়—পাইতে বাধা, রাখিতে বাধা, ছাড়িতেও বাধা। বাধা বস্তুকে ঘিরিয়া আছে বলিয়াই বস্তুর জন্য মানুষ এত উন্মাদ। অথচ মূর্খ মানুষ তাহাকে পাইয়াই বাধামুক্ত করিয়া একান্ত আপনার করিতে চায়। বস্তু বাধা-সমাকীর্ণ বলিয়াই কোন বস্তুই কাহারও পুরাপুরি আয়ত্তে আসিবে না। সকলেই সকলের পরকীয় থাকিবে।

পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী, ৫ই আগষ্ট, ১৯৫৭

রাজা ও কবি

(উড়িষ্যার গল্প)

॥ শ্রীজয়দেব রায় ॥

পুরী শ্রীজগন্নাথ দেবের লীলা-বিহার ক্ষেত্র। পুরীর রাজারা জগন্নাথ দেবের প্রতিভূ মাত্র। দিব্য সিংহ যখন পুরীর রাজা, সেই সময়ে কৃষ্ণদাস নামে এক কবি কাব্য সাধনা করতেন। শ্রীজয়দেবের ন্যায় তাঁরও কাব্যসাধনা ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা নিয়ে; ভগবানের লীলা গান ছাড়া তিনি আর কিছুই লিখতেন না।

সকাল সন্ধ্যায় গ্রামে তাঁর কুটীরের আঙ্গিনায় বসে কবি জগন্নাথ দেবের মহিমা গান করতেন, নানাস্থান থেকে ভক্ত শ্রোতারা এসে ভিড় ক'রে ব'সে সে গান শুনত। শ্রোতারা কিছু কিছু অর্থ ও খাদ্য তাঁকে দক্ষিণা দিয়ে যেত—তাতেই তাঁর পেট চলে যেত বেশ স্বচ্ছন্দে—উদ্বৃত্ত যা কিছু থাকত পাঁচজন গরীব দুঃখীকে তা বিলিয়ে দিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর খ্যাতি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল।

রাজা দিব্য সিংহের কানেও তাঁর খ্যাতি গিয়ে পৌছাল। তিনি ভাবলেন এই প্রকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিকে দিয়ে তিনি যদি তাঁর মহিমা কীর্তন করিয়ে নিতে পারেন, তবে জগতে তাঁর অক্ষয় খ্যাতি থেকে যাবে। তিনি কৃষ্ণদাসকে সভায় ডেকে পাঠালেন। রাজার ডাক কবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি রাজসভায় এসে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করলেন।

রাজা বললেন—"কবি, তোমার নাম আমি সর্বত্রই শুনতে পাই, আমাকে তুমি গান শোনাও।"

কবি বললেন—"মহারাজ, আমি সামান্য লোক। আপনার সভায় কত গুণী জ্ঞানীর ভিড়, তাঁদের কাছে আমি তো অতি নগন্য।"

মহারাজ বললেন—"পদ্মফুলের আদর আছে বলে কি শিউলি ফুলের গন্ধ থাকবে না। তুমি গাও, আমরা শুনব।"

কবি ভগবানের নাম গান শুরু করলেন। গানের সুরে সারা ভুবন ভ'রে গেল। রাজা বিমুগ্ধ হয়ে বসে বসে ভাবতে লাগলেন—এই কবিকে দিয়ে যদি

আমার খ্যাতি প্রচার ক'রে এক কাব্য লেখানো যায়, তাহ'লে জগতে আমার স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হবে। "এই দরিদ্র কবিকে তো অর্থ দিয়ে সহজেই বশীভূত করা যাবে।"

তিনি বললেন—"কবি, তুমি আমার গুণগাথা রচনা করো।"

কবি হেসে বললেন—"কিন্তু রাজা, আমার যে কাব্য ও কণ্ঠ ভগবানের কাছে সমর্পণ ক'রে দেওয়া আছে। আমি তো মানুষের গুণ গাই না।"—

বোইলে শুন কৃপানাথ।
কেবল দেব জগন্নাথ॥
এ পিণ্ড বিকি আচ্ছি তারে।
গীত মুঁ ন বোলে অন্য রে॥

রাজা বল্‌লেন—"আমি তো সামান্য মানুষ নই, আমি দেশের রাজা। আমার প্রতাপ দেবতাদেরই সমান বল্‌তে পারো। তুমি লেখ, তোমাকে আমি প্রচুর অর্থ দেবো।"

কবি কিন্তু তাঁর সংকল্পে অটল রইলেন। রাজা তখন তাঁকে ভয় দেখাতে লাগলেন—"তুমি যদি আমার প্রস্তাবে রাজী না হও তোমাকে আমি তিল তিল ক'রে মেরে ফেলব।"

কবি একথা শুনে প্রবল উত্তেজিত হয়ে বল্‌লেন—"ভগবানের নাম ছাড়া আমি আর কোন গান গাই না। তুমি জোর করে তোমার নাম গাওয়াবে?—

তুম্ভঙ্কু নাহি মোর ডর।
মো প্রভু বনে বলি আর॥
জগৎ সৃষ্টি আন হেলে।
গীত মুঁ আন কুল বোলে।"

রাজা তাঁকে কারাগারে বন্দী করলেন। সেখানে ঘরের মাঝখানে একটা গর্ত্ত ক'রে তার মধ্যে সর্বাঙ্গে শিকল বেঁধে কৃষ্ণদাসকে বসিয়ে ওপরে একটা তক্তা চাপিয়ে দিলেন। তক্তার ওপরেও আবার একটা ভারী পাথর চাপিয়ে ঘরে তিনটে তালা দিয়ে দিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল কবি এভাবে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এবং অনাহারে প্রাণ দেবেন।

কৃষ্ণদাসের শ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌ল, তখন তিনি জগন্নাথ দেবের গুণগান শুরু করলেন—"প্রভু, তোমার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য তুমি আমাকে বাঁচাও,

রাজার অহঙ্কার খর্ব করো।" গাইতে গাইতে তিনি জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

সেই অবসরে প্রভু শ্রীজগন্নাথ তাঁকে প্রদত্ত সকল ভোগ পাত্র নিয়ে কবিকে দেখা গিলেন। তাঁর বন্ধন মুক্ত ক'রে দিয়ে স্নেহ ভরে তাঁর আঘাতে হাত বুলিয়ে সকল যন্ত্রণার অপনোদন করলেন। জ্ঞান হলে কবি দেখলেন—একি, তাঁর বাঁধন তো সত্যই খোলা। আর চারিপাশে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য। আর প্রভুর করপল্লব তাঁর মস্তকে !

ওদিকে রাজা হঠাৎ স্বপ্ন দেখলেন, বলরাম অস্ত্রহাতে তাঁকে বলছেন—এখনই আমার ভক্ত কবিকে সসম্মানে মুক্ত ক'রে দাও—না হ'লে তোমার চরম সর্বনাশ হবে। রাজার ঘুম তখনই টুটে গেল, তিনি শশব্যস্তে ছুটে গিয়ে কবিকে মুক্ত ক'রে দিতে গেলেন। গিয়ে দেখেন কবির অঙ্গে কোন বন্ধন নেই, তিনি বসে বসে ভজন গাইছেন।

এমন সময়ে জগন্নাথদেবের প্রধান পুরোহিত ছুটে এসে জানালেন—"মহারাজ, সর্বনাশ হয়েছে, প্রভুর মূর্তির করপল্লবটি রাতারাতি কি ভাবে ভগ্ন হয়েছে।"

রাজা বল্‌লেন—"না, না, ঐ দেখ ভক্তকবির মস্তকেই রয়েছে প্রভুর করপল্লব।"

এই বলে তিনি বন্দীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বল্‌লেন—"না, না, কবি আর তোমাকে এই অধমের নামে লিপি কলঙ্কিত করতে হবে না; তুমি জগৎপ্রভুর গুণগানেই দিন কাটাও। কেবল আমাকে তুমি ক্ষমা করো—না হ'লে আমার যে গতি নেই।"

কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস মৃগমদভর। সেই মৃগমদে বিচিত্রিত কলেবর ॥
প্রচ্ছন্ন-মান-বাম্য ধম্মিল্যবিন্যাস। ধীরাধীরাত্মক-গুণ অঙ্গে পটবাস ॥
রাগ-তাম্বুল-রাগে অধর উজ্জ্বল। প্রেম কৌটিল্য নেত্রযুগলে কজ্জল ॥
সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব হর্ষাদি সঞ্চারী। এই সব ভাব-ভূষণ সর্ব্ব অঙ্গে ভরি ॥
কিলকিঞ্চিতাদি-ভাব-বিংশতি ভূষিত। গুণশ্রেণী-পুষ্পমালা সর্ব্বাঙ্গে পূরিত ॥
সৌভাগ্যতিলক চারু ললাটে উজ্জ্বল। প্রেমবৈচিত্ত্য-রত্ন হৃদয়ে তরল ॥
মধ্যবয়স্থিতা সখী স্কন্ধে কর ন্যাস। কৃষ্ণলীলা-মনোবৃত্তি সখী আশপাশ ॥
নিজাঙ্গ সৌরভালয়ে গর্ব্ব পর্য্যঙ্ক। তাতে বসি আছে সদা চিন্তে কৃষ্ণ-সঙ্গ ॥
কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ অবতংস কাণে। কৃষ্ণ-নাম-গুণ-যশ প্রবাহ বচনে ॥
কৃষ্ণকে করায় শ্যামরসমধুপান। নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্ব্বকাম ॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর। **অনুপম গুণগণ পূর্ণ কলেবর** ॥

—চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্যলীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ

অঙ্গের এই যথাশ্রয়ভাবই তাহার চিন্ময়ত্ব। অঙ্গীর ভাব ও অঙ্গ দুয়ে এক চিদ্বিগ্রহ। দেহই ভাব, ভাবই দেহ; ইহাই পররস মহাভাব চিন্তামণি। দেহ ও গুণের এমন সমন্বয়ই জীব যুগ যুগ ধরিয়া আকাঙ্ক্ষা করেন।

শিষ্টেশ্চ ॥৩।৩।৬২

শিষ্টি (উপদেশ) হইতেও যথাশ্রয় ভাব উপলব্ধ হয়। ব্রহ্মা শিষ্ট মুনিগণকে বলিতেছেন, 'অথৈবং স্তুতিভিরারাধয়ামি। তথা যূয়ং পঞ্চপদং জপন্তং শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায়ন্তঃ সংসৃতিং তরিষ্যথেতি হোবাচ হৈরণ্যগর্ভঃ।'—গোপালতাপনীয় (পূর্ব)। পুরুষোত্তম-দেহের প্রতি অঙ্গে, পুরুষোত্তম-লীলার প্রতি স্পন্দনে যে যে দেবতা ও গুণের স্ফুরণ হয়, সেই সেই দেবতা ও গুণাবলীকে সেই সেই অঙ্গে ধ্যান করিয়া এবং সেই সেই অঙ্গ ও লীলার সঙ্গে নিজ নিজ প্রতিরূপ

অঙ্গ ও জীবনের ঘটনার পরশ লাগাইয়া অন্যোন্যভাবসিদ্ধিদ্বারা সংসারের সব কিছুর মীমাংসা আস্বাদন করিতে হইবে—ইহাই ব্রহ্মার উপদেশ।

প্রাণ মনের দাবী পূর্ণ করিয়া মনকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, 'অথ মনোঽত্যবহৎ তদ্‌যদা মৃত্যুমত্যমুচ্যত স চন্দ্রমা অভবৎ'—বৃহদারণ্যকঃ ১।৩।১৬। প্রাণের ভিতর মন বুদ্ধি স্ব স্ব বিশেষ বারতা লইয়াও ব্যাপিক-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। 'সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যাপেক্ষম্'—বৈশেষিক দর্শন। প্রাণের ভিতর বুদ্ধির সামান্য ভাব ও বিশেষভাব দুই-ই অমৃত, সার্থক। মনোবুদ্ধির যথাশ্রয়ভাবে বিশিষ্টত্ব রক্ষা প্রাণের সামান্যভাবের ভিতর ডুবিয়া থাকিয়াই সম্ভব হইতেছে। তাহাই পরবর্ত্তী দুইটী সূত্রে দেখানো হইবে।

সমাহারাৎ ॥৩।৩।৬৩॥

সমাহারহেতু সামান্যভাবেরও পূর্ণ স্পর্শ সেখানে রহিয়াছে বুঝিতে হইবে।

প্রাণের মাঝে সর্ব্বসমাহার বা সামান্যভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শ্রুতি যখন বলিতেছেন, 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ', তাঁহার পাণিপাদ যদি সর্ব্বত্র, তবে তো প্রতি অঙ্গেই প্রতি অঙ্গীর সমাহার রহিয়াছে। ব্রহ্ম-সংহিতাও বলিয়াছেন, 'অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি জগন্তি' ইত্যাদি। প্রতি অঙ্গে সর্ব্বাঙ্গের উপসংহার রহিয়াছে। প্রাণের সামান্যাংশে বাস্তবিকই প্রতি অঙ্গই সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমৎ। কিন্তু প্রাণ যখন মনোবুদ্ধির দাবী পূর্ণ করিয়া তাহাদের বিশেষের দিক ঘুচাইয়া তোলে, তখন বিশেষ বিশেষ অঙ্গেরই ভাবনা করিতে হয়, অন্যান্য অঙ্গ থাকে প্রাণের স্তরে, অনুপলব্ধবৎ। উহাদিগকে শুধু প্রাণ দিয়াই বরণ করিতে হয়, বুদ্ধিদ্বারা নহে। প্রাণের কাছে সব বিশেষের আহারই সমানভাবে আহার বলিয়া প্রাণই সম্-আহার, সমাহার। প্রাণের অনন্ন কিছুই নাই—'অপো হ বৈ নাম প্রত্যক্ষং ন হ বা এবম্বিদি কিঞ্চনানন্নং ভবতি।'

গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥৩।৩।৬৪

গুণসাধারণ্য শ্রুতি হইতেও (প্রাণের সামান্য ভাব নির্দ্ধারিত হইতেছে।)

বস্তুতন্ত্রসাধনায় সকল গুণেরই সাধারণ্য বা সমাস আমরা সর্ব্বদা শ্রুত

হইয়া থাকি। পুরুষোত্তম তো দূরের, ভক্তে পর্য্যন্ত সর্ব্বগুণের সমাস ভাগবত বর্ণনা করিতেছেন।

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণাঃ
মনোরথেনসতি ধাবতো বহিঃ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতি শুনাইতেছেন, 'স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়শ্চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়স্তে-জোময়হতেজোময়ঃ কামময়োঽকামময়ঃ ক্রোধময়োঽক্রোধময়ঃ সর্ব্বময়স্তদযদেতদি-দম্ময়োঽদোময় ইতি যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন। আত্মা খল্বাহঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি স যথাকামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে॥ তদেষ শ্লোকো ভবতি। তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তম্ অস্য প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চে হ করোত্যয়ম্। তস্মাল্লোকাৎ পুনরৈত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতি নু কাময়মানঃ, অথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আত্মকাম আপ্তকামঃ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি'।— বৃঃ—৪।৪।৫-৬॥

আত্মা ব্রহ্ম কামময় ও অকামময়; অকাম যখন কামের প্রতিদ্বন্দ্বী তখন তাহা কামই, তাহাতে আত্মত্ব বা ব্রহ্মত্ব প্রকাশিত হন না। কেবল কাম বা কেবল অকাম পথ যদিও বাস্তব নহে তথাপি যাহারা স্বপ্নে ঐরূপ দুইটী স্বতন্ত্র পথের অস্তিত্ব কল্পনা করেন তাহারা স্বপ্নের কামরাজ্য বা অকামরাজ্য প্রাপ্ত হয়। স্বপ্নময় কাম বা অকাম রাজ্য-ভোগের নেশা ছুটিয়া গেলে আবার বাস্তব মাটির জগতে পা দিতে হয়। যে জ্ঞান মাটির জগৎকে অস্বীকার করিয়া উপরে উড়িতে প্রয়াসী, তাহা নিশ্চয়ই speculation, luxury। আত্মায় মাটিতে বড় ভাব; 'আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ'। ব্রহ্ম কাম × অকাম; এবং ইহাই সত্য অকাম। কামও কর্ম্ম, অকামও কর্ম্ম; কাম অকামের, ক্রোধ অক্রোধের সমন্বয়ই আত্মা ব্রহ্ম বিদ্যা। এই বিদ্যাময় হইলেই জীবের উৎক্রান্তি হয় না, যে যাহা আছে তাহাই আছে, যখন যে ভাবে যে সময়ে যে স্থানে থাকে, সেই ভাবে সেই কালে সেই স্থানেই সে ব্রহ্মময় রূপে হয় স্বপ্রকাশ। নচিকেতা যে প্রেত-

লোকের সম্বন্ধে অস্তিনাস্তি মীমাংসা যমরাজের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই প্রেতলোকই ত 'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র ভূতাশ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ'—বালকের নিকট এই ধর্মাধর্মের, কৃতাকৃতের ও ভূত ভব্যের অতীত সাম্পরায় তত্ত্ব প্রতিভাত হয় না। জড় দৃষ্টি এই ব্রহ্মপুরের ধর্ম্মধারা ও অধর্ম্মধারা কল্পনা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। "অবিদ্যায়মন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরা পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।" প্রেম ও প্রেয় গতি উভয়ই বিকল্প অবিদ্যা গতি; মূঢ় এই বিকল্পের ঘূর্ণিপাকে পতিত হইয়া অপরকেও পতিত করে। নচিকেতা ধর্ম্ম অধর্ম্মের অধীত বিদ্যাতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক। যমরাজও বলিতেছেন "অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ"—"অনন্যেন অপৃথগদর্শিনা আচার্য্যেন প্রতিপাদ্য ব্রহ্মাত্মভূতেন প্রোক্তে ভক্ত আত্মনি গতিঃ অনেকধা অস্তি নাস্তি ইত্যাদি লক্ষণা চিন্তা গতিরস্মিন্নাত্মনি নাস্তি ন বিদ্যতে, **সর্ব্ববিকল্পগতিপ্রত্যস্তমিতরূপত্বাদাত্মনঃ**"—শাঙ্কর ভাষ্য। আত্মাতে শ্রেয়োগতি বা প্রেয়োগতি বিকল্প অস্তমিত। "দূরামেতে বিপরীতে বিষূচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা।"—শঙ্কর গুরু অথচ আত্মাতে এই বিপরীত বিদ্যা ও অবিদ্যা বিকল্প নিষেধ করিতেছেন। বাস্তবিক নচিকেতা সেই বিদ্যাই প্রার্থনা করিয়াছেন যাহা বিদ্যা ও অবিদ্যা সমন্বয়ে পরমা বিদ্যা। ইহা পরবর্ত্তী "অন্যত্রধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ" মন্ত্র দ্বারাও পরিস্ফুট হইয়াছে। যে বিদ্যা কাম অকাম, ধর্ম্ম অধর্ম্ম বা শ্রেয় ও প্রেয়ের অন্যত্র, তাহাই পরা ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদ প্রতিপাদ্য। ধর্ম্ম সাধনা বা অধর্ম্ম সাধনা পরস্পর বিপরীত বলিয়াই উহাদের বিপরীত গতি এবং তদ্ধেতুই আত্মার উৎক্রমন কিন্তু রস সাধনায়— "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।"

প্রাণের স্তরের উপলব্ধ এই সর্ব্বগুণোপসংহার বুদ্ধিস্তরে যথাশ্রয়ভাব অবলম্বনে স্ফুরিত হয়, যেখানে যৌগপদ্য নাই, সহভাব নাই। পরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়ে তাহাই বুঝাইতেছেন। পরবর্ত্তী সূত্রদ্বারা বিশেষের ক্ষেত্রে প্রাণ প্রকাশের কথা বলিতেছেন।

ন বা তৎসহভাবাশ্রুতেঃ ।। ৩।৩।৬৫ ।।

এক অঙ্গের গুণের সঙ্গে অন্যান্য অঙ্গের গুণসমূহের সহভাবের অশ্রুতিবশতঃ (গুণসমূহের যথাশ্রয়ভাবই বিধেয়) কিম্বা বিধেয়ও নয়।

যেখানে যেখানে শ্রুতি 'তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে চ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা সহভাব দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু প্রাণের সামান্য দিককেই ফুটাইয়া তুলিবার জন্য; কিন্তু যেখানে মনোবুদ্ধিস্তরে ভজনার কথা উঠিয়াছে, সেখানে সহভাবের কথা নাই, সেখানে আছে পরস্পরের মুখ্যত্ব এবং গৌণত্ব। কোনও একটীকেই শ্রুতি একান্ত মুখ্য এবং কোন একটীকেই একান্ত গৌণ করেন নাই। একান্ত দুই স্তরের সম্বন্ধেই শ্রুতি 'নেতি নেতি' বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। উপাসনার ক্ষেত্রে তাই শ্রুতি প্রথমে 'সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মনি' শুনাইয়া পরেই আবার 'সর্ব্বেষু ভূতেষু চাত্মানম্' শুনাইয়াছেন। প্রত্যেকেই স্ব ক্ষেত্রে মুখ্য, অপরের ক্ষেত্রে গৌণ; এইভাবে যথাকাম যথাশ্রয়ভাব সার্থক হইতেছে। উপাসনার ক্ষেত্রে কোথাও 'তৎসহভাব' অর্থাৎ সর্ব্বোপাসনার গুণসমূহের সহভাব শ্রুত হয় না। তৎসহভাবের অর্থ তাহাদের (গুণসমূহের) সহভাব। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ গুণের চিন্তাই করিতে হয়। কিন্তু সূত্রকার 'ন বা' বাক্যদ্বারা সেখানেই অনিশ্চয়তা প্রকাশ করিতেছেন। সামান্য দিকের সম্বন্ধে যেমন 'কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ' সূত্রে 'ন বা' বলিয়াছেন; এই সূত্রে সামান্য ও বিশেষের দুইয়ের সম্বন্ধেই 'ন বা' বলিতেছেন। প্রাণের স্তর যখন বুদ্ধির ক্ষেত্রে অবতরণ করে, তখন সামান্য-বিশেষের ভিতরকার সীমারেখা এমনই অনিশ্চিত যে, কাহাকেও চূড়ান্তরূপে সেইটী বলা চলে না। সেখানে সামান্য বুঝি বা সামান্য নয়, বিশেষ বুঝি বা বিশেষ নয়। সেখানে বিশেষ বিশেষ থাকিয়াও সামান্য, সামান্য সামান্য থাকিয়াও বিশেষ। প্রাণের স্তরে 'ন বা' বলা ছাড়া লজিকের দিক হইতে গত্যন্তর নাই। সূত্রকার 'ন বা' বাক্যদ্বারা পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত সামান্য ও এই সূত্রোক্ত বিশেষ দুইয়ের সম্বন্ধেই অনিশ্চয়তা প্রকাশ করিয়াছে। প্রাণের স্তর না হইলে 'ন বা' প্রয়োগ করিতেন না, শুধু 'ন' শব্দদ্বারাই একান্ত প্রতিষেধ করিতেন।

দর্শনাচ্চ ॥৩।৩।৬৬

(বেদবাক্যের) দর্শন হেতুতেও (প্রাণস্তরে সামান্য-বিশেষ কিছুরই একান্ত নিশ্চয়তা অবধারিত হয় না)।

নাসদীয় সূক্ত বলিতেছেন,

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত অবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ॥

বিসৃষ্টির সমস্ত স্তরে এই 'বেদ যদি বা ন বেদ' রহিয়া যাইতেছে। কোনও একটী চূড়ান্ত জানা বা চূড়ান্ত না-জানার তত্ত্বই দুইবার 'নেতি' বাক্যের প্রয়োগ দ্বারা শ্রুতি বারবার বুঝাইয়াছেন। 'যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্ন বিজানাতি ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ॥ যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদন্যোঽন্যজ্জিঘ্রেদন্যোঽন্যদ্রসয়েদন্যোঽন্যদ্বদেদন্যোঽন্যচ্ছৃণুয়াদন্যো-ঽন্যন্মন্বীতান্যোঽন্যৎ স্পৃশেদন্যোঽন্যদ্বিজানীয়াৎ॥ সলিল একো দ্রষ্টাদ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি॥'—বৃহদাঃ—৪।৩।৩০-৩২। 'যদ্বৈতন্ন বিজানাতি' অংশদ্বারা প্রাণের সামান্য দিকটাই দেখানো হইয়াছে, 'যত্র বা অন্যদিব' অংশদ্বারা প্রাণের বিশেষত্বের দিকটাই দেখানো হইয়াছে এবং সেখানে 'বা' ও 'ইব' পরপর প্রয়োগদ্বারা তাহার চূড়ান্ত নিশ্চয়তাও নিষেধ করিয়াছেন। বিশেষের স্তরে 'ইব' শব্দের প্রয়োগদ্বারা অদ্বৈতবাদীগণ বদ্ধাবস্থার ব্যাখ্যা করিতেছেন। 'বা' ও 'ইব' শব্দ প্রয়োগে বদ্ধাবস্থা ও মুক্তির পরের লীলা-স্তরের কথা, তুরীয়াতীতের অবস্থা দুইয়েরই ইঙ্গিত রহিয়াছে। লীলার ভিত্তি অদ্বৈতবাদ; তাই অদ্বৈতবাদের সামান্যের দিকটা 'যদ্বৈ তন্ন বিজানাতি' দ্বারা ফুটাইয়া তাহার জমাটবাঁধা লীলাস্তরকে বুঝাইবার জন্য পরে 'যত্র বা অন্যদিব' প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল অদ্বৈতের বিকল্প ও অনিশ্চয় দিকটা হইতেছে লীলাঘন দ্বৈত। যদি 'বা' শব্দ না থাকিত কেবল 'ইব' শব্দই থাকিত, তাহা হইলে অদ্বৈতবাদীগণ এই অবস্থাকে বদ্ধাবস্থার ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু 'বা' ও 'ইব' শব্দদ্বয় বিকল্প ও তাহারও অনিশ্চয়তা এই দুইয়েরই অর্থ বুঝাইতেছেন। উল্লিখিত মন্ত্রে শেষে 'সলিলে' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা আত্মবস্তুর রসস্বরূপ ও তার ব্যাখ্যায় সামান্য-বিশেষের সমন্বয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন।

'ব্রহ্মে'র দিক হইতে ব্রহ্মদর্শনই শ্রুতি, 'আমি'-র দিক হইতে ব্রহ্মদর্শনই স্মৃতি বা বিশেষ দর্শন। ব্রহ্মদর্শনের ভিতরই ব্রহ্ম-দর্শন ও আমির দর্শন বা শ্রুতিস্মৃতি সমন্বয়, নিত্যরসাবধূতলীলা। ব্রহ্ম-কাম পূরণের জন্যই জীবের

কাম-প্রকাশ অথচ তাহার বিশেষত্ব-প্রাপ্তি। 'পূরয়তু মধুরিপুকামম্'—ইহাই সর্ব্ব শ্রুতি জীবের কাণের ভিতর দিয়া মরম স্পর্শ করিয়া আকুল করিয়া তুলিতেছে।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদন-মনোহর বেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
গোপী-পীন পয়োধর মর্দ্দন চঞ্চলকরযুগশালী॥
নামসমেতং কৃতসঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহুমনুতেঽতনু তে তনুসঙ্গত পবনচলিতমপি রেণুম্॥

ইহাই জীবের অভয়বাণী ও আহার শুদ্ধি। আজ জীব নিশ্চিন্ত, বনমালী আজ কামপ্রেরণায় নাম ফুকারিয়া ব্যাকুলভাবে অজস্র ডাক ডাকিতেছেন। চল, ঝাঁপ দেই, ধন্য হই।

তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অবধূতভাষ্য সমাপ্ত।

চতুর্থ পাদ

ওঁ নমঃ প্রাজ্ঞ তুরীয়ায় ভগবৎ-পুরুষোত্তমায়

স ঐক্ষত—

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ জন মনোভব পেশল জানি ॥
এ সখি ! সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানু ঠামে কহবি, বিছুর ন জানি ॥
না খোঁজলুঁ দূতী ; না খোঁজলুঁ আন।
দুহুঁ কেলি মিলনে মধ্যত পঞ্চবান ॥
অব সোই বিরাগ, তুহুঁ ভেলি দূতী।
সুপুরুষ প্রেমক ঐছন রীতি ॥

রামানন্দ-কৃত এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। 'এত কহি আপন কৃত গীত শুনাইল। **প্রেমে প্রভু স্বহস্তে তার মুখ আচ্ছাদিল।**" এই গীতই বর্ত্তমান যুগের আস্বাদনের জিনিষ; মহাপ্রভুর সময়ে ইহা জগতের বাজারে বিকায় নাই।

নয়নের চাহনিতে প্রেরণা সকল দেহ প্রাণ মন ডুবাইয়া দিনের পর দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই চাহনিই ত জীবনে অনুবন্ধ। এই কামময়ী প্রেরণা সরল সহজ প্রয়োজনাভাব পরকীয় সম্বন্ধ, পুরুষ-প্রকৃতিভাবমূলক নহে। পরকীয় প্রেম উপাধিরহিত বলিয়া দূতীবিহীন, ইহা প্রত্যক্ষ অপরোক্ষ। বিরহেই উপাধির প্রকৃত তাৎপর্য্য আবিষ্কৃত হয় এবং তখনই উপাধির উপাধিত্ব।

ক্রমশঃ

সাময়িকী

প্রাণের ডাক ঃ নূতন যুগ এসে পড়ল, দিকে দিকে আজ তারই সাড়া। বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের সামনে এগিয়ে এল, আর দেরী করবার সময় নেই। এইবার সাজ সাজ রব চতুর্দ্দিকে। যুগসঞ্চিত ক্লৈব্য ঝেড়ে ফেলতে হ'বে। ডাক এল আকাশ পথে, ডাক এল মাটির তলে, ডাক এল বুকের স্পন্দনে। চরৈবেতি চরৈবেতি। সদ্য সুপ্তোত্থিত পথিক অনন্ত আকাশের মুক্ত অবকাশের নীচে এসে দাঁড়াল। সমস্ত দেহ মনে তার নূতন যুগের হাওয়া এসে লাগল। বুকভরে একবার দম নিয়ে নিলে। চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে ধ্বংস-স্তূপের অবধি নেই—পথের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে চলে গেছে—সুদূরের পানে। পথিকের সমগ্র সত্তা থেকে বেরিয়ে এল জিজ্ঞাসা—কোথায় যেতে হবে ?

দিকে দিকে এই যে আজ আত্মপ্রকাশের বেদনা—এর মধ্য দিয়ে আমাদের কোন্ সত্তা প্রকাশের ব্যাকুলতায় পিষ্ট হচ্ছে ? কি আমরা হোতে চাই ? নূতন কালের যুগধর্ম্ম কী ? নূতন যুগের প্রশ্ন জটিল। বিজ্ঞানের নূতন নূতন আবিষ্কারে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা দ্রুত বদলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু সেই বদলে যাওয়া ধারণাকে মানুষ রূপ দিতে পারছে কই ? মানুষের রক্তের সংস্কৃতি চিন্তার গতির চেয়ে যে অনেক কম তালে চলে। অস্তায়মান যে সভ্যতার রূপ আজও আমাদের চোখের সামনে, সে মানুষের পরিপূর্ণ স্বরূপের পক্ষে গৌরবের নয়। তাই তার চতুর্দ্দিকে এমন করে নানা বিরুদ্ধ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। মানুষের আজকের প্রশ্ন শুধু আধ্যাত্মিক নয়, আধিভৌতিক নয়, শুধু অন্নের নয়, শুধু জড়ের নয়। দীর্ঘ দিনের ইতিহাসের সূত্র বেয়ে মানুষ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে—সেখানে দাঁড়িয়ে সে নিজের স্বরূপকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত হ'য়ে যাচ্ছে। জীবজগতের সাধারণ প্রয়োজনকে স্বীকার করেই তাকেও সে ছাড়িয়ে যায়। তাইতো সমস্যা তার এমন জটিল হ'য়ে উঠল। এই কথাটা আজকের দিনের মানুষ রক্তের স্পন্দনে টের পাচ্ছে। একথা আজ ধরা পরতে চাইছে যে বশ্বের সঙ্কট বহুতঃ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক, আসলে মূলতঃ তা নৈতিক

ও আধ্যাত্মিক। আজ মানুষ বুঝতে পারছে যে সে যেমন ব্যক্তিক মানুষ তেমনি সে সমষ্টিও বটে। বিজ্ঞান আজ একথা প্রমাণ করেছে যে, "Seperate individual existents are illusions of common sense. Scientific investigation reveals (and these findings are confirmed by the direct intuition of the trained mystic and contemplative) that concrete reality consists of the interdependent parts of a totality and that independent existents are merely abstractions from that reality." মানুষ যদি সমগ্র থেকে রওনা না হয়ে ব্যক্তিক জীবন থেকে সাধনা সুরু করে, প্রতি ব্যক্তি যখন শুধু একান্ত ব্যক্তিই থেকে যায়, তার খণ্ড ব্যক্তিত্বের বাইরে যে তার বিশ্বরূপের সত্তা, তা থেকে সে যখন নিজেকে একান্ত বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তখন এই যে একটা সমগ্র বিশ্বজগৎ—একটা whole—একটা integrity, এর প্রাণ-সম্বন্ধ থেকে চ্যুত হয়ে পরার জন্য ঐ বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলি তখন মৃত পদার্থে পরিণত হয়। তখন বিচ্ছিন্ন মানুষ সেই মৃত পদার্থগুলি দিয়ে যে আদর্শ-লোক গড়ে তোলে, সে আদর্শলোক শুধু "unearthly ballet of bloodless categories."

তাই আজকের দিনের মানুষের প্রশ্ন সত্তার সামগ্রিকতার। প্রশ্ন যদি কোন একটা হোতো—শুধু যদি তা রাজনীতি, বা শুধু অর্থনীতি বা শুধু আত্মার মুক্তির হতো—তবে সমস্যা অনেক সহজ ছিল। কিন্তু মানুষ যে আজ দেখতে পেয়েছে যে তার যেমন আত্মার মুক্তির ক্ষুধা আছে, তেমনি আছে অন্নের মুক্তির ক্ষুধা। অন্নের ক্ষেত্রকে অবজ্ঞা করে, অন্নের ক্ষেত্রে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি, অপমান অত্যাচারের গ্লানি নিয়ে যেমন আত্মার মুক্তির প্রচেষ্টা মানুষকে শুধু অন্ধকারগর্ত্তে নিয়ে যায়, তেমনি শুধু অন্নের প্রশ্নও তার একমাত্র প্রশ্ন নয়। সমস্ত প্রশ্ন জড়িয়ে গেছে—কোনোটা থেকে কোনোটাকে আজ আর বিচ্ছিন্ন করে দেখা যাচ্ছেনা। জওহরলাল সেদিন বলেছিলেন—

"আমাদের আজকের বিপর্য্যয় অতীতের থেকে আরও ব্যাপক, আরও ভয়াবহ। এর সঙ্গে মনস্তত্ত্ব আধ্যাত্মিকতা অথবা আর কিছুর কোথায় যেন একটা যোগ রয়েছে—আমি এর কোন স্পষ্ট সংজ্ঞা দিতে পারছিনা। এক বিরাট আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের পৃথিবী আজ অগ্রসর হচ্ছে। তথাকথিত ধর্ম্মের সংকীর্ণতার সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক শব্দকে যোগ

করে দেবেন না যেন। আজকের সমস্যা বিশেষ কোনো সম্প্রদায় বা জাতির নয়—এ সমস্যা সমগ্র মানবিকতার।" এই সমগ্র মানবিক সত্তা কি? আজকের দিনের বাস্তব কি? "We must become sensuous, intellectual, intuitional to know reality in its flesh and blood and not in merely its skin and bone."—Radhakrishnan. মানুষের স্বরূপ ও বিশ্ব রূপের সমন্বিত রূপই তার সত্যকার রূপ, তার সামগ্রিক রূপ—ইনিই আগতপ্রায় মহাযুগের বাস্তব বস্তু। আজ আমাদের সেই বাস্তবকে জানতে হ'বে, চিনতে হ'বে, দেখতে হ'বে, বুঝতে হ'বে, আয়ত্ত করতে হ'বে।

কী তার পথ, কী তার উপায়? জীবনের চলার পথে যখন আমরা মনকে দিশারী করলাম, তার উপরেই যখন পথ নির্দেশের সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম, তখনই ভুল করলাম। সমগ্র জীবনের পথের খোঁজ দিতে সে পারলে না। বুদ্ধির ছুরিকাকে শানিত করে বিশ্লেষণের পথে সে আকাশ-পাতাল বিচরণ করলে—বস্তুকে কেটে খণ্ড খণ্ড করে ফেললে; সত্যবস্তুর অনেকখানি লাভ করেই মনে করলে সবটুকুই বুঝি পেলাম।—কিন্তু হায়, সত্য তার সামগ্রিক রূপকে প্রকাশ করতে পারলে না। বুদ্ধির হিরণ্ময়ী ঝলক যখন ফলকে কেটে বিশ্লেষণ করে আত্মগৌরবে পুলকিত হচ্ছিল, তখন সেই কাটার পথে রস যে ঝরে পড়ল, মুগ্ধ সে, তা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু একদিন জীবনের আস্বাদন ধর্ম্ম তার কাছে ফলের রসটুকুও দাবী করলে। সে বললে—কই, রস তো নেই এর। কিন্তু ফলের রসের আস্বাদন-ধর্ম্ম রয়েছে জীবনে ফলের আঁটির মতই সত্তার সত্যতা নিয়ে, আর তার রস নেই—এতো হতে পারে না। ভুল আমারই হয়েছে—বিশ্বের সত্তা-ধর্ম্মের নয়। রস না থাকলে রসের আস্বাদন-প্রবণতাও থাকত না। বিশ্বের স্রষ্টা এমন বাতুল নন। মানুষ বলতে চাইলে দরকার নেই—ও সত্য নয়—ওতে বড় হাঙ্গামা। কিন্তু জীবনের সামগ্রিক আস্বাদন কান্না জুড়ে দিলে—সে বললে আমি ফলকে সমগ্রভাবে আস্বাদন করতে চাই। খোসা আর আঁটি যেমন বস্তুর সবখানি নয়, নির্য্যাসও বস্তুর সবখানি সত্য নয়। উত্তর এল আমি যা দিয়েছি, তার বেশী দিতে জানি না। তুমি পথ-প্রদর্শক দেখো। আমি ছেড়ে দিলাম সিংহাসন।

তাই সেখানে ডাক এল প্রাণের। এই প্রাণের স্বরূপ কি? এই প্রাণ

আত্মম্ভরী সর্ব্বম্ভরী। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রাণের মহিমা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। "ন বৈ বাচো, ন চক্ষুংষি, ন শ্রোত্রাণি, ন মনাংসীত্য.চক্ষতে, প্রাণা ইত্যাচক্ষতে প্রাণো হ বৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি।" এই প্রাণ প্রাণময় কোষ নয়। এ quantityর যোগফল নয়, এ ideaর quality, এ সত্তার সমগ্রতা। সংখ্যাকে নিয়েও এ সংখ্যাকে ছাড়িয়ে-স্থায়। এই প্রাণ মনসো জবীয়ঃ। বিস্তীর্ণ গভীর এই প্রাণের সন্ধান জীবনের মধ্যে মেলে, বুদ্ধির কুস্তিগীরিতে তার দেখা পাওয়া যায়না। সমস্ত নিরপেক্ষ যে সত্তাকে মানুষ আলাদা করে রেখেছিল, সেই সত্তা আজ সমস্ত অপেক্ষমান হয়েও নিজের স্বরূপে অচ্যুত রইলেন—সেইখানে প্রাণধর্ম্মের প্রকাশ হ'লো। এই প্রাণের মধ্যে আছে সর্বাতীত ও সর্বানুগ এই দুই সত্তার উপাধি-বিধুর স্বাভাবিক সম্বন্ধময়ী ব্যাপ্তি। জয় হোক এই প্রাণধর্ম্মের, জয় হোক সেই আগত-প্রায় যুগের, যেখানে এই বিস্ময়ময় প্রাণধর্ম্মের প্রকাশ জগৎ দেখতে পাবে। বিশ্ব স্বস্থ হউক।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি—বিজ্ঞান পড়িলেই বা বিজ্ঞানের বিবিধ থিয়োরী সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলেই যে মানুষ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হয়—ইহা ঠিক নয়। তেমনই বিজ্ঞান না পড়িলেও যে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হওয়া যাইবে না, একথাও ঠিক নয়। দেশের বেশীর ভাগ জনসংখ্যাই বিজ্ঞান পড়ে নাই, অথচ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার প্রয়োজন আছে। শিক্ষা পাইলে কিছুটা হইতেও পারিবে।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি কাহাকে বলি? বিজ্ঞানের কোনও সিদ্ধান্তে পৌছাইতে হইলে তাহার পথ যাহাকে এক কথায় বলে 'ক্রশ-এগজামিনেশন'; অর্থাৎ যাহা 'পলেমিক' নয়। পলেমিক প্রণালীতে আমি একটা সত্য ধরিয়া লই এবং সেটাকে যতদিক দিয়া পারি সত্য বলিয়া প্রমাণ করি। বিজ্ঞানের 'ক্রশ এগজামিনেশনে'র পথ ইহা নয়। ধরিয়া সেখানেও একটা লওয়া হয় সন্দেহ নাই,—রওনা তো হইতে হইবে একটা কিছু লইয়া—কিন্তু সেখানে যাহাকে আমার পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি লইয়া প্রথমে ধরিয়া লই, চতুর্দ্দিক দিয়া তাহাকে সত্য প্রমাণ করিতেই শুধু লাগিয়া যাই না, তাহার বিপক্ষে, বিরুদ্ধে যে সকল কথা উঠিতে পারে তাহাদের মুখ গায়ের জোরে, গলার জোরে বা যে কোন জোরে বন্ধ করিয়া, চাপা দিয়া কেবল আমার সেই ধরিয়া লওয়াকেই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাই না। সেখানে যাহাকে ধরিয়া আমি রওনা হই, তাহার

পক্ষে যত রকমের কথা হইতে পারে তাহা যেমন বাহির করি, তেমনই তাহার বিপক্ষেও যত রকমের কথা হইতে পারে তাহাও বাহির করি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন 'আমি'-টাই বিশ্বের সমস্তটুকু নহে—আমার বাইরে একটা মস্ত বড় বিশ্ব পড়িয়া আছে। অর্থাৎ ভাষান্তরে যাহা কিছু আমার পক্ষের, তাহাই শুধু আমি নহি, যাহা আমার বিপক্ষের, তাহাও আমি।

বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে আমির পরিচয় এই রকম।

মানুষ যখন এই আমির অধিকারী হয়, তখনই তাহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ হয়। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে আমার পক্ষের সব কথা (সব কথা জানা অবশ্য কোনদিনই মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, যতটা বেশী সম্ভব কথা—বিজ্ঞান কোনদিনই কোনকিছুরই সব কথা জানার দাবী করে না—এমন কি একটী তৃণেরও নয়) যেমন আমি জানিব—তেমনি আমার বিপক্ষে কি কি কথা হইতে পারে, তাহাও জানিব—এবং এই দুই জানার মধ্য দিয়া আমাকে পথ কাটিয়া চলিতে হইবে।

আমরা কি এই দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হইয়াছি? আমাদের আমি কি পক্ষের বিপক্ষের কথা স্মরণ রাখিয়া চলে? আমরা চারিদিকে যে আমির সাক্ষাৎ সর্বদা পাই, তাহা কি ঐ রকম বৈজ্ঞানিক আমি? বিজ্ঞানের প্রসার তো খুব হইতেছে; বিদ্যালয়ে বোধহয় চতুর্থ না কি পঞ্চম শ্রেণী হইতে বিজ্ঞান পড়ানো হইতেছে—কিন্তু বালক-বালিকা যুবক-যুবতী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়াদের মধ্যে কি নিজের পক্ষের ও বিপক্ষের কথা স্মরণ রাখিয়া তাহারা চলিতেছে, এরূপ চিত্তবৃত্তির প্রকাশ পাইতেছে? বরং চোখ বুজিয়াই বলা যাইতে পারে যে, ইহার বিপরীতই দেখিতেছি। নিজের বিপক্ষের কথা যদি মানুষ মনে রাখিয়া চলিত, যদি সে সচেতন থাকিত যে সে-ই এই বিশ্বে একমাত্র নহে, তাহার বাহিরে একটী সম সত্য (কিংবা বলিব কি অধিকতর সত্য?) বিশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে তো মানুষ বিনয়ী হইত, নম্র হইত, শ্রদ্ধাশীল হইত, অপরকে—সে যাহাই হউক না কেন—শ্রদ্ধা করিতে, সম্মান করিতে শিখিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা তো হইতেছে না, ঘরে বাইরে পথে ঘাটে সমবয়স্ক বা বড় ছোট কোন অবস্থার মানুষের মধ্যেই তো নম্রতা দেখা যাইতেছে না—এ কথা তো বোধহয় খুবই স্পষ্ট।

অথচ এ নম্রতা, এ শ্রদ্ধাশীলতা ছাড়া জীবনের সৌন্দর্যই বা থাকে কোথায়?

তাহা হইলে কি হইতেছে—ছোট বয়স হইতেই ছেলেমেয়েরা বেশ কিছু

কাল হইলই বিজ্ঞান পড়িতেছে—কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হইতেছে না। কেবল কতকগুলি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা কার্য কারণ সম্বন্ধ না শিখাইয়া বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা যায় কিরূপে?

আজ সেইটা সমস্যা।

বিজ্ঞান আমাদের যাহা দিতে পারিত আমরা তাহার সবটুকু লইতে পারি নাই, খানিকটা অংশ লইয়াছি। আর অংশ লইয়াছি বলিয়াই তাহা বিকৃত হইয়াছে—তাহার সুফল হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়াছি। বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি একই সঙ্গে কোন ঘটনার 'pro and contra' বিচার করে, (যাহার অপর নাম cross-exrmination,)। যদি এই একই সঙ্গে pro and contra বিচার করিবার মনোবৃত্তি আমরা লাভ করিতাম এবং বিজ্ঞানের অপর দান ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যও লইতাম, তাহা হইলে আজ আমাদের এ দুর্দ্দশা হইত না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধে অহং-এর স্বীকৃতি থাকে; অপর দিকটার সঙ্গে সমন্বিত না হইলে এই স্বীকৃতি বিকৃত হয়, বিকৃত হইলে তাহা মানুষের অহংকার বাড়াইয়া দেয়, দাম্ভিক করিয়া তোলে—ক্রমে তাহারই বিকৃতিতে মানুষ অপরের স্বাতন্ত্র্যকে অপমান করিয়াও বসে। কিন্তু একই সঙ্গে নিজের, অপরের এবং প্রতি ঘটনার বা বস্তুর pro ও contra দেখিতে পারিলে তো মানুষকে অহং-এর স্বীকৃতির বিকৃতি হইতে রক্ষা করিতে পারিত।

তাই মনে হয় বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে বিজ্ঞানের চলার পথকে অনুসরণ করিতেই হইবে—আমাদের চিন্তার ধারা ও চলার পথকে দ্বিমুখী করিতে হইবে—অর্থাৎ একই সঙ্গে আমাদের পক্ষের ও আমাদের বিপক্ষের যুক্তিগুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে সচেতন থাকিতে হইবে এবং সেই সচেতনতার মধ্য দিয়া আমাদিগকে পথ কাটিয়া চলিতে হইবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য-বোধসম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে শ্রদ্ধাশীল করিতে হইলে এই-ই পথ।

এইখানে মানুষের সমগ্রতা। মানুষের সমগ্রতা যাহাতে তাহাই মানুষের সুস্থ আত্মবিকাশের ধারা। মানব সন্তানের পক্ষে ইহাই সুস্থ ও স্বাভাবিক যে, সে অপরের গোলামী যেমন করিবে না, তেমনি অপরকে গোলাম বানাইবে না, —পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে সর্ব্বত্র; সে আত্মস্বতন্ত্রতার প্রভায় সমুজ্জ্বল থাকিবে অথচ তাহার বিচ্ছিন্ন সত্তার বাহিরে বলিয়া যাহা প্রতিভাত হইতেছে তাহার সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল হইয়া মহীয়ান হইয়া উঠিবে। অনাগত ভবিষ্যতের এই রকম সমগ্র সুন্দর মানব-শিশুকে স্বাগত জানাই।

অহং-এর বিকৃতি অর্থাৎ একটা বিকৃত আত্ম-সচেতনতা যাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের সুস্থ ও স্বস্থ করার সমস্যা গুরুতর বটে, কিন্তু আজ যাহারা শিশু তাহাদের শিক্ষা ও পরিচালনা সময়ে আমরা যদি এই মনোবৃত্তি দ্বারা নিজেরা পরিচালিত হই এবং তাহাদের পরিচালিত করি তাহা হইলে সুফল ফলিবার আশা আছে।

শিশুকে বুঝাইতে জানাইতে ও চালাইতে হইবে এইভাবে যে, ভগবানের তথা মানুষেরও আনন্দ-জাত সে যেমন একটী বিশেষত্ব লইয়াই বিশ্বে আসিয়াছে, তেমনি অপর প্রতিটী মানুষও—সে অপরের জাতিধর্ম্মদেশ যাহাই হউক না কেন। তাই সে বিশ্বের নিকট হইতে যেমন শ্রদ্ধা সম্মান বা যাহা কিছু চায়, বিশ্বকে—অপরকে—তেমনই শ্রদ্ধা সম্মান বা যাহা কিছু দিবার জন্য যেন সে প্রস্তুত থাকে। —ইহাই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির শেষ কথা, ইহাই পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে শান্তির পথ। তাই বিজ্ঞান পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের পথরেখা—'to be two sided, to examine at once the *pro* and the *contra*—in fine, to be what the English call *cross examination*'—এই পথরেখা যাহাতে আমরা অনুসরণ করিতে পারি ও করাইতে পারি—তাহার জন্য সচেষ্ট হইতে হইবে। যেন তেন উপায়েন নিজের দৃষ্টিকোণকে সমর্থন করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক-চোখা মনোবৃত্তি পরিহার করিয়া চলিতে শিখিলেই আমরা ঘরে বাহিরে অনেকখানি শান্তি ও শক্তি লাভ করিতে পারিব। আমাদের সকলের চিত্ত ও বুদ্ধি সেইদিকে জাগ্রত হউক। বন্দেমাতরম্।

শ্রীরেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধু নগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

আশ্বিন, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ   ১১শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা

শক্তি

॥ শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল ॥

মহেশ্বরী মহাশক্তি, পরেশী পরমাশক্তি,
হয়েছিলে রাসেশ্বরী—শ্রীকৃষ্ণের রাসে। ১।
ধ্যানে তব অধিষ্ঠান, সমাধিতে বিদ্যমান,
তত্ত্বমসি মহাবাক্য—তোমার উদ্দেশে। ২।
তুমি তত্ত্বমসি তারা, চিন্ময়ী চিদাকারা,
সর্ব্ব তত্ত্বের প্রকাশ—তোমার প্রকাশে। ৩।
যজ্ঞে তুমি যজ্ঞেশ্বরী, যোগে তুমি যোগেশ্বরী
তপময়ী হয়ে আছ—পরম তাপসে। ৪।
তুমি তপন তাপেতে, চারুচন্দ্র কিরণেতে,
মহেশের ললাটেতে—আছ মা মহেশে। ৫।
শম্ভুতে তুমি শাম্ভবী, মাধবে তুমি মাধবী,
দুরত্যয়া মহাদেবী—মায়ার বিকাশে। ৬।
নিত্যে তুমি নিত্যাশক্তি, নিত্যময়ী আদ্যাশক্তি,
প্রাণে প্রাণময়ী তুমি—প্রাণের উচ্ছ্বাসে। ৭।
তুমি পরম জ্ঞানেতে, আছ মা পরাভক্তিতে,
পরমা শান্তিতে আছ—পরম সন্তোষে। ৮।
তুমি পুরাতনী শক্তি, (কত) হও নবীয়সী শক্তি,
তুমি বিশ্বেশ্বরী শক্তি—বিশ্বের (শ্বরের) সকাশে। ৯।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শক্তি, শিবের শিবানী শক্তি,
বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি—ব্যাপিতা বিশ্বে। ১০।

ব্যাপ্ত তুমি পৃথিবীতে, ব্যাপ্ত আছ সলিলেতে,
ব্যাপ্ত বিমল বায়ুতে—অনল আকাশে। ১১।
সর্ব্বভূতময়ী শক্তি, পার্থিবী বারুণী শক্তি,
অগ্নিতে আগ্নেয়ী শক্তি—হইয়াছ অংশে। ১২।
তুমি যে বায়বী শক্তি, আকাশেতে তুমি শক্তি,
তুমি মা মানসী শক্তি—সবার মানসে। ১৩।
সত্যে সত্যবতী শক্তি, দিব্য প্রেমময়ী শক্তি,
মহাভাবময়ী শক্তি—(কৃষ্ণানন্দ) প্রেমানন্দ রসে। ১৪।
পড়ি মায়ার বিপাকে, বিপন্ন জীব তোমাকে
রক্ষা কর বলি ডাকে—রক্ষাকালী ত্রাসে। ১৫।
স্নেহময়ী স্নেহ গুণে, বিপন্ন জীব সন্তানে,
সান্ত্বনা কর আদরে—মধুর আশ্বাসে। ১৬
তুমি রাঁজরাজেশ্বরী, তুমি মা ভুবনেশ্বরী,
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে—(পূত) শুদ্ধ কর বাসে। ১৭।

'যার মা আনন্দময়ী সে কি থাকে নিরানন্দে ?
সদানন্দময় সে যে ভাসে সদা সদানন্দে।'

—শ্রীনিত্যগোপাল

মহাপূজা

॥ শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ॥

[৮ই আশ্বিন ১৩৩২ উজ্জ্বলভারত হইতে উদ্ধৃত]

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ গীতা ৪।৬ ॥
ভগবানপি তা রাত্রিঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুম্ মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ ॥ ভাগবত ১০।২০।১

শ্রীভগবান নিত্য বলিয়া তাঁহার জন্ম সম্ভবে না, কিন্তু তিনি যোগমায়া-প্রভাবে জীব-হৃদয়ের যুগ-যুগান্তরের কলুষতা মুহূর্ত মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়া অচেনা নূতনের মত প্রাণ ভুলান বেশে উঁকি দেন। তাঁহার ব্যয় নাই, ক্ষয় নাই, তিনি আত্মা; কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য লীলা। তিনি সেই লীলা প্রভাবে কত আদর-অনাদর, কত হাসি-কান্না, কত বিরহ মিলন ও কত অভিমান সোহাগের মধ্য দিয়া জীবের প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া দিতেছেন! তিনি সকলের প্রাণ-মন অধিকার করিয়া বিহার করিতেছেন, অথচ সকলেই ভাবিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার কাছেই আছেন এবং তাঁহাকে লইয়া রসলীলায় মগ্ন। ধন্য মা যোগমায়া, তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া ঠাকুর আমার ঈশ্বর হইয়াও মধুর, তিনি ঐশ্বর্য্যের দ্বারা জীবকে শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ করেন, আবার মাধুর্য্যের দ্বারা তাঁহার প্রাণের মাঝে আপনার করিয়া লুকাইয়া রাখেন। মা, তুমি যে তাঁহার মায়া অর্থাৎ কৃপাশক্তি। প্রেমময় ঠাকুর তোমাকে স্বকীয় (আপনার) ভাবে না দেখিয়া, স্ব (আপনি) ভাবে দেখেন। তুমি ও তিনি অভেদ; তুমি তাঁহার স্ব-প্রকৃতি। এখন মা, জীবের চিত্ত বড় মলিন ও প্রেমহীন; তোমার দিকে চাহিয়া আছে, প্রার্থনা করিতেও জানেনা। তুমি আমাদের হৃদয়-মাঝে তোমার পরাণ স্বরূপকে নিয়া প্রকাশিত হও। মা, তোমাকে আশ্রয় করিয়াই না সেই ব্রজধামে গোপী-বিনোদন শ্রীনিত্যগোপাল জ্যোৎস্নাময়ী শারোদোৎফুল্ল-মল্লিকা রজনীতে গোপীকুল নিয়া রাসবিলাসে মগ্ন হইয়া ছিলেন? সেদিন জগতের কি আনন্দের দিন। মা, তুমিই না বৃদ্ধা তপস্বিনী পৌর্ণমাসী মূর্ত্তিতে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মোহন লীলা-মাধুরী নয়ন ভরিয়া পান

করিবার লাগি সেখানে প্রকট হইয়াছিলে? তুমিই না রাসবিলাসের রজনী-প্রভাতে তোমার প্রাণকৃষ্ণ ও প্রাণের দুলালী শ্রীশ্রীরাধারাণীর বিরহভাব-বৈচিত্র্য আস্বাদন করিতে নন্দ-ভবনে ও বৃষভানুপুরে আনাগোনা করিতে? তুমিই না সৎ-কৃষ্ণের সঙ্গে আনন্দ-রাধার মিলন করাইবার জন্য চিন্ময়ী মূর্ত্তিতে ব্রজে সদা বিরাজমান? মা, আমরাও ত আনন্দ হইতে জাত, আনন্দে সঞ্জীবিত এবং আনন্দই আমাদের একমাত্র গতি। তবে মা, এমন কৃপাময়ী তুমি থাকিতে আমরা সৎ-কৃষ্ণ পদলাভে বঞ্চিত কেন? দয়া কর, দয়া কর। আমরা তোমারই শরণাগত।

মধুকৈটভ-ভয়ে ভীত ব্রহ্মা জনার্দ্দনকে যোগনিদ্রাপন্ন দেখিয়া হরির চৈতন্য সম্পাদনার্থ অনুপমা যোগনিদ্রার স্তব করিতেছেন :—

সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥ চণ্ডী।

মা যোগনিদ্রা, তুমি নিত্য অক্ষররূপা, ওঙ্কাররূপিনী; তোমার প্রতি পদক্ষেপে সুধারস উছলিয়া উঠিতেছে। মা, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি ওঙ্কারের এই তিনটি মাত্রা তুমি; আবার অর্দ্ধমাত্রা রূপে অবস্থিত ঘন, শান্ত, শিব, অদ্বৈত, যাহা বিশেষের আশ্রয়ে আস্বাদন করিবার উপায় নাই তাহাও তোমার শ্রীঅঙ্গে বিলসিত।

"এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসোঽপাম্ ওষধয়ো রসঃ ওষধীনাং পুরুষো রস পুরুষস্য বাগ্‌রসঃ বাচ ঋগ্রসঃ ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্‌গীথো রসঃ ॥ ১।১।২
স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥ ৩ ॥ ছান্দোগ্যোপনিষদ।

সর্ব্বভূতের রস পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি, ওষধির রস পুরুষ, পুরুষের রস বাক্য, বাক্যের রস ঋগ্‌বেদ, ঋগ্‌বেদের রস সামবেদ, সামবেদের রস এই ওঙ্কার। এই রসময় নিত্য নামই পরমপুরুষ নিত্যগোপালের অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনী, আবার উহা অষ্টম অভিব্যক্তি বলিয়া সকল রসের লয় স্থান। সর্ব্ব রস উহা হইতে উঠিয়া, উহাতে জীবন লাভ করিয়া উহাতেই একাকার হইয়া মিশিয়া যাইতেছে। বিশ্বের সর্ব্বরসের সার ঘনীভূত হইয়াই এই নিত্য নাম জীবের পাশে উদয় হইয়াছেন। "নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণ দ্বয়ী," কত সুধারস ছানি গড়িল বিহি না জানি! ধন্য হরি, ধন্য কলিযুগ!!

সপ্তমী পূজা—এই নিত্যনাম যোগমায়া প্রকাশিত রসলীলার আদি বীজ। যোগমায়া নিজের ভিতর হইতে সর্ব্বদেবশক্তি প্রকাশ করতঃ তাঁহাদের দ্বারা অনন্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন, এই ব্রহ্মাণ্ডে তাঁহার অংশভূতা জীব-প্রকৃতি সমস্ত দেবশক্তির সাহচর্য্যে স্নেহের দান নাম রূপ গুণে ভূষিত হইয়া মহা-দাম্ভিকতার সহিত কর্ত্তা ও ভোক্তা সাজিয়া শ্রীভগবানের ও সমস্ত দেবতার-শক্তি পদদলিত করিবার আশায় বিচরণ করিতে লাগিল। জীব এই ভাবে ধর্ম্মের গ্লানি জন্মাইল, জগতের সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল, দেবতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। হায়! হতভাগ্য জীব, তুমি যে শ্রীভগবানের প্রতিবিম্ব; তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া সাজাইলে যে তোমাকেই সজ্জিত করা হয়, ইহা কি ভুলিয়া গেলে? সমস্ত দেবতারা যে তোমাদের নিত্যমিলন সংঘটিত করিবার জন্যই সস্নেহ নয়নে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা যে সেই পরম পুরুষের মহাভিষেকের জন্য সমস্ত ভুবন-তীর্থবারি সংগ্রহ করিয়া তোমাকে সকরুণ ভাবে আহ্বান করিতেছেন, কিম্বা তোমাকে সেই যমুনা-বিলাসী কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের মহা অভিসারে সর্ব্বালঙ্কারে ও সর্ব্বগুণরাজিতে উজ্জ্বলিনী করিয়া পাঠাইবার জন্য প্রকাশ্য ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুপ্ত প্রেম-মার্গে বিচরণ করিতেছেন; সে জন্য তুমি কি একবারও তৃণাদপি নীচ হইয়া তাঁহাদের পাদ-বন্দনা করিবেনা? ধিক্ তোমাকে, ধিক্ তোমার প্রেমলাভ চেষ্টায়। ঐ দেখ কঠোপনিষদে নচিকেতা ধর্ম্মরাজ যমের নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। ঐ শোনো ঈশাবাস্যোপনিষদের ঋষি প্রেম-পরিপ্লুতচিত্তে প্রার্থনা করিতেছেন:—"অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্",—"হে অগ্নিদেব, যে পথে গেলে প্রেমধনে ধনী হইয়া প্রেমময়ের প্রেমালিঙ্গন লাভ করা যায় সেই পথে আমাদিগকে টানিয়া লও। তাঁহার চরণে প্রাণ মন বিকাইবার জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়াছে, তুমি আমার সহায় হও।" এই ভাবে ব্যাকুল হইলে দেখিবে সকল দেবতারা তোমার মহাযাত্রার সময়ে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তোমাকে সেই প্রেমের পথে তুলিয়া দিবেন। তবে দেবতাদিগকে শ্রীভগবান হইতে বিচ্ছিন্ন বলিয়া দেখিলে তাঁহারা তোমার গতিবোধ করিয়া দাঁড়াইবেন বটে। 'দেবাস্তং পরাদুর্য্যোঽন্যত্রাত্মনো দেবান্ বেদ।' যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া জানেন, দেবতাগণ তাহাকেই পরাস্ত করেন। এখন বোঝ সকলের চরণ-ধূলি শিরোভূষণ না করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা কি কল্যাণকর হইবে? না কিছুতেই

না। আরও দেখ, সব দেবতারা যাঁহার চরণ-মকরন্দ পান করিবার জন্য সর্ব্বদা লালায়িত, কোথায় তুমি প্রেমময় সেই ঠাকুরের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করতঃ তন্ময় হইয়া যাইবে, আর কি-না তুমি সেই সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইয়া নিজেকে শ্রীভগবানের আসনে বসাইয়া নিজে স্বামী সাজিলে?

ছিঃ, স্বামী হওয়া কি এতই সুখ? তুমি কি জাননা তিনি 'সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তাঃ' তবে আর কেন সর্ব্বদেব-পরিবৃত শ্রীযজ্ঞেশ্বরকে সর্ব্বযজ্ঞভাগ না দিয়া নিজে গ্রহণ করিতে লোলুপ হও? পারত সর্ব্বযজ্ঞের ভিতর নিজেকেও আহুতি দেও। তিনি 'অত্তাচরাচরগ্রহণাৎ' তিনিই রমণ, তিনিই রাম। তিল তুলসী দিয়া তিল তিল করিয়া তোমার সকল 'ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ব্রহ্মাগ্নি ব্রহ্মণা হুতম্। ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্ ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥' এই মন্ত্রে তাঁহাতে আহুতি প্রদান কর; তুমি ধন্য হইবে, তোমার অস্তিত্ব সার্থক হইবে।

মহাষ্টমী পূজা—জীব এইভাবে শ্রীভগবানের ও দেবগণের নিকট দীন না হইয়া যখন দাম্ভিকতা ও ভোক্তৃত্বের মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইল, তখন বিশ্বের সকল শক্তি ব্যথিত হইল, সকলের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দেবতারা পৃথক পৃথক ভাবে সকলেই ধর্ম্ম-শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কেহই সক্ষম হইলেন না। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীজ্ঞানগুরুর শরণাপন্ন হইলেন। সর্ব্বদেব-শক্তি শ্রীশ্রীগুরু-শক্তির কৃপায় একত্র মিলিবার সুযোগ পায়। শিব-গুরুর কৃপায় প্রথমতঃ তাঁহাদের হৃদয়ে নাম শক্তির প্রকাশ হইল। ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে, হিরণ্ময়বপু হিরণ্যশ্মশ্রু শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সাধক হৃদয়ে বীর্য্য আধান করেন। এই বীর্য্য 'অন্তঃ কৃষ্ণ বহিঃ রাধা'—অন্তরে দেহী ভাবে শ্রীভগবান আর বাহিরে দেহরূপে চিন্ময়ী পরাপ্রকৃতি শ্রীনিত্যনাম। মন্ত্রই এই ব্রহ্মবীর্য্য, ইহা অমোঘ। স্বামীর বীর্য্য যেমন স্ত্রী সযত্নে আত্মদান করতঃ অতি সুন্দর ও মনোহর করিয়া তোলেন, দেবতারাও তদ্রূপ দীক্ষাশক্তিতে আপনার সর্ব্বস্ব বিকাইয়া দিয়া শূন্যের মত হইয়া মনোমোহন রূপের সাক্ষাৎ পাইলেন। মন্ত্র দেবতার নিকট শ্রীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তোমার ইচ্ছা থাক্ আর নাই থাক্, নিত্য-প্রকাশশীল শ্রীশ্রীগুরু-বীর্য্য তোমার সর্ব্বস্ব আপনাতে আকর্ষণ করিয়া ছুটিয়া বাহির হইবেই। দেবতারা যখন এই সর্ব্ব আকর্ষণকারিণী শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র শক্তির বিকাশ বলিয়া নিজেদের লজ্জা, ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভ্রান্তি ইত্যাদিকে বুঝিয়া তাহাতে নিমজ্জিত দেখিতে পাইলেন, তখনই তাঁহাদের সম্মিলিত দেহ

শ্রীভগবানের প্রকাশ-ক্ষেত্র হইল। শ্রীভগবানের অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে দেবতাদেরও জীব-লোকে আসিতে হয়।

নবমী পূজা—প্রথমতঃ শ্রীভগবানের একাধারে সর্ব্বপ্রকাশক ও সর্ব্বাতীত বা গৌরকৃষ্ণ রূপ দেবতারাই আস্বাদন করিতে পারেন, কিন্তু সাধক উহা ধরিতে ও বুঝিতে পারে না। সাধকের অহংতত্ত্বকে পদদলিত করিবার জন্য পরাশক্তিকে আবার জীবের পঞ্চকোষের অধিষ্ঠাত্রী শুধু প্রকাশকারিণী গৌরীমূর্ত্তিতে অবিভূত হইতে হয়। দেবতারা এই শ্রীকৌশিকীমূর্ত্তি নিয়া জীবের মধ্যে আসিলেন এবং তাঁহার নানা রূপগুণাদির শ্রবণ-কীর্তনে মাতিয়া সাধকদিগকে ঐ শ্রবণ কীর্ত্তনে আকর্ষণ করিলেন। সাধক তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রণব রূপিণী আনন্দময়ী শ্রীশ্রীকৌশিকী দেবীর আবির্ভাব অনুভব করিল। সে এই অপ্রাকৃত স্বপ্রকাশ নামধনকে 'সকলনিগমবল্লীচিৎফলম্ সৎ স্বরূপম্' ও তাঁহার প্রকাশ-জনিত আনন্দকে প্রকৃত বলিয়া মনে করিয়া তাহার স্বাভাবিক ভোগ-লালসা নিয়া উহাদেরও রমণ হইবার জন্য ছুটিল। "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মাম বুদ্ধয়ঃ। পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥" "অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য, সর্ব্বোত্তম, পরম স্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তি ভাবপ্রাপ্ত মনে করে।" এইবার মাতাপুত্রে খেলা চলিল।

"এবার কালী তোমায় খাব।
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা,
দুটোর একটা করে যাব।"

এই খেলায় দু'জনার স্থান নাই। জীব যখন পরাশক্তিকে সাধারণ চক্ষে দেখিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার কামনা করিলেন, তখন তিনি বলিয়া পাঠাইলেন "যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে-দর্পং ব্যাপহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥" অর্থাৎ যিনি আমার নিত্য অব্যয় অহংকে খর্ব্ব করিয়া তাঁহার অহং স্থাপন করিতে পারিবেন এবং আমার দর্প চূর্ণ করিয়া আমার ইচ্ছা ও কার্য্যের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারিবেন, তিনিই আমার ভর্ত্তা।" অহংকারে মত্ত সাধক পরাশক্তির এই ভাষা বুঝিতে পারিলনা। শিবদূতী শ্রীশ্রীগুরু-শক্তিকে দূত করিয়া, সাধককে আত্মসমর্পণ করিতে উপদেশ দিতে পাঠাইলেন। পূর্ব্বে দেবতারা অন্তরে শ্রীগুরু-শক্তির ভাষা বুঝিয়া তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। এইবার সাধকও শ্রীশ্রীগুরু-

শক্তিকে যথা সর্ব্বস্ব বলিয়া একটু একটু বুঝিতে চেষ্টা করিতেছে—'মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং'। শ্রীশ্রীগুরুদেব সাধককে পরাশক্তির কোলে নিজেকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু সে তাহা পারিল না। তা জীব পারিবে কেন? মা, আমরা যদি তোমার শ্রীচরণে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে পারিতাম, তবে আর ক্ষোভ ছিল কি? তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জোর করিয়া তোমার জ্ঞানানন্দময় তত্ত্ব আস্বাদন না করাইলে, আমাদের কি সাধ্য যে আমরা তাহা ধরিতে, বুঝিতে ও আস্বাদন করিতে পারিব? আমরা তোমাকে কিছুই দিব না, যদি আমাদিগকে তোমার আপন বলিয়া দরদ থাকে, তবে পারত আমাদিগকে যে প্রকারে হউক, তোমার মাঝে তোমার করিয়া রাখিও। যখন অযাচিত ভাবে নামরূপে আমাদের হৃদয়ে উদয় হইয়াছ, তখন যাহাতে অচিরাৎ তোমাতে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে পারি, তাহার উপায় কর, জীবনে মরণে তুমিই একমাত্র গতি।

সাধক গুরু-বাক্য নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিতে ধরিতে না পারায় শ্রীগুরুদেবের মন্ত্র-শক্তিই জীবের সর্ব্বনাশিনী মূর্ত্তিতে তাঁহার সর্ব্ববিভূতি নিয়া সাধকের সর্ব্বোপাধি তাঁহার মধ্যে সংহনন করিতে অবতীর্ণ হইলেন। সর্ব্বশক্তিমতী লাবণ্যময়ী মায়ের আবির্ভাবে সাধক নিজকে ক্ষণে ক্ষণে দুর্ব্বল ও কুৎসিত বলিয়া বুঝিতে লাগিল। সে দেখিল, সে অসহায়, শক্তিহীন। জগতে যা কিছু সুন্দর ও চেতন তাহা মা; সে অচেতন শব। মা, "সৌম্যা সৌম্যাতরাশেষা সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী"। "তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্। তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। তাঁহার আলোকে সব আলোকিত, তাঁহার শ্রীচরণ সেবা করিয়া সকলে আলোকদান করিতেছে! তাঁহার শ্রীচরণ সর্ব্বশোভার আস্পদ। সে অনুভব করিল, ঐ নারী-মূর্ত্তি তাহার সর্ব্বস্ব ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে।

> ভৈরবনাদিনী কে রে উন্মাদিনী
> কিরূপে আমার রামা চিত্ত হরে?
> কিরূপে আমার অহংকার-তত্ত্ব
> কিরূপে আমারে আকর্ষণ করে। শ্রীশ্রীনিত্য গীতি।

সে আরও দেখিল,

> নীরদবরণী কে রে ত্রিনয়নী
> চরণে দামিনী ভাতে শত ধারে।

কে রে উজ্জ্বলিনী সুধাংশুভালিনী
ভুবনমোহিনী, কে রে শিবোপরে ॥

ওকি সাধক, তুমি যে কেমন হইয়া যাইতেছ? তোমার এত বীর্য্য, এত তেজ, এত অহঙ্কার সব যে নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে, তুমি যেন ধীরে ধীরে সব হারা হইতেছ। ভয় করিও না, ঐ দেখ, তুমি যতই শূন্য হইয়া যাইতেছ, ততই মা সুন্দরী হইতেও সুন্দরী হইতেছেন। তোমার সকল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে মিশাইয়া ঈশ্বর হইয়াও তিনি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। আজ তোমার ভাগ্যের সীমা নাই, আজ তুমি নিজেকে হারাইয়া মাকে পাইলে। তোমার সর্ব্বাঙ্গের শোভা লইয়া তাহা নিজ অঙ্গে মাখিয়া দিলেন। ধন্য তুমি, ধন্য তুমি! সে আরও দেখিল,

ফুল্ল সরোজিনী চরণে নলিনী
চরণ দুখানি পশেছে অন্তরে।
এযে বরদারূপিণী কৈবল্যদায়িনী
শিব-স্বরূপিনী বরাভয় করে।

মা কৈবল্যদায়িনীর শ্রীচরণ ধীরে ধীরে সাধকের হৃদয় অধিকার করিল। সে সেই বিশ্বের সকল শোভার খনি, যে "চরণ তলে হৃদয় ঢেলে পাগল পেল পাগলীকে" সেই রাতুল চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া, পূর্ব্বের অসুর স্বভাব ভুলিয়া গিয়া, মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, মা, আজ একি দেখিলাম! এতদিন তোমায় যে রূপে দেখিয়াছিলাম, আজ আর ত তোমার সে রূপ নাই। তুমি যে আজ আমার হৃদয়ের সবটুকু তোমার করিয়া আনন্দ-সাগরে ডুবাইলে? মা আজ আমার ভুল ভাঙ্গিয়াছে। শিব-বাক্য শুনি নাই, তাই আজ লজ্জায় ঘৃণায় নিজের অস্তিত্বও রাখিতে সাধ হয় না। কোথায় আমি কামে অন্ধ, আর কোথায় তুমি দিব্য জ্ঞানানন্দময়ী প্রেমময়ী। মা, তুমি আমাকে বর দিতে আসিয়াছিলে, আমি কিন্তু তাহা না বুঝিয়া নিজেই বর সাজিতে চাহিয়াছিলাম? মা, আমার অভিমান অহঙ্কারের প্রায়শ্চিত্তরূপে এই কর, যেন আমার আর কিছুই আর আমার বলিতে থাকে না। আমার সর্ব্বভাব তোমাতে বিলীন হউক। তুমি আমাকে কৈবল্যদানে কৃতার্থ কর। এতদিন আমি প্রাণ পাইতে যাইয়া প্রাণ হারাইয়াছিলাম, আজ প্রাণ হারাইয়া প্রাণ পাইলাম। আজ মরিয়া বাঁচিলাম, আজ তোমার কৃপায় শিবত্বের আস্বাদন

পাইলাম। তাই মা শিবানী, আমার সমস্ত অপরাধের শাস্তি স্বরূপ তোমার শিবস্বরূপে অনন্তকালের জন্য ডুবাইয়া রাখ।

যাও ভাগ্যবান সাধক, মায়ের নিত্যানন্দময় কোলে তাঁহাকে জড়াইয়া থাক, তিনি তাঁহার স্নেহের অঞ্চলে তোমাকে ঢাকিয়া রাখিবেন; তাঁর কত আদরের তুমি, তোমার মুখ চুম্বন করিয়া মা কতই না আনন্দিত হইবেন। মা, তুমি শ্রীনিত্যগোপালময়ী; তুমি শ্রীনিত্যগোপাল-মুখে বলিয়াছিলে তোমার কোলে উঠিয়া বালকের মতন তোমার সঙ্গে ক্রীড়ায় নিজে বিভোর হইব। সে দিনের কত বাকী? দয়াকর, দয়াকর।

ভাই নামসাধক, নিত্যধামের নিত্যনাম যখন প্রেমশূন্য কর্ম্মজ্ঞানশুষ্ক তোমাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য কর্ম্মজ্ঞান-ভক্তি-প্রেমানন্দ মূর্ত্তিতে সুরধুনী ধারার মত অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে, তখন সকলে মিলিয়া যোড হস্তে উর্দ্ধনেত্রে তৃণাদপি সুনীচ, তরোরপি সহিষ্ণু অমানী ও সানন্দ হইয়া সেই কৃপাময়ী নাম সুরধুনীর নির্ম্মল সর্ব্বতাপ-হারিণী ধারায় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত কর। আবার বিমল জলপিপাসু ব্যক্তি যেমন বর্ষারম্ভে সকল পত্র পরিপূর্ণ করিয়া নির্ম্মল বর্ষাবারি নিজের ও তাপিত তৃষিত জীবের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, তোমরাও তদ্রূপ সেই 'মধুর মধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং' নিত্য নাম বারি তোমাদের পঞ্চ কোষে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ, তুমি নিজেও পান করিবে, আর সকলকে বিনামূল্যে বিলাইয়া দিবে। নাম স্বপ্রকাশ; তাঁহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা বাতুলতার নিদর্শন। যখন নাম তোমার জিহ্বায় বা কর্ণে স্ফুরিত্ হইবে, তখন আদর যত্ন করিয়া তোমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তাঁহাকে আসন স্বরূপে প্রদান করিও, নয়ন-জল তাঁহার পাদ্য হইবে। সকল শক্তি দিয়া তাঁহার নৃত্যে যোগদান্ করিও। কেমন করিয়া তোমাকে শ্যাম সুন্দরের প্রাণ-প্রিয়তমা করেন, তাহা বেশ করিয়া লক্ষ্য করিও, বুঝিবে কেমন দয়াময়ী শ্রীনাম শক্তি! মা, যোগমায়া, তোমার স্নেহ পরশে আমার সর্ব্বাঙ্গ শীতল, সুন্দর ও প্রেম-পূর্ণ হউক; আমার প্রাণপ্রিয় যে শান্তি, সৌন্দর্য্য ও প্রেম-ভিখারী! তুমি শ্রীভগবানের যে বারতা নিয়া আসিয়াছ, তাহা আমার প্রতি রক্তবিন্দু মাঝে প্রবাহিত কর, আমি যেন শ্রীরাম-জীবন হনুমানের মত বুক চিরিয়া তোমাকে প্রতি অণুপরমাণুর ভিতর প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আমার বড় লোভ হয়, আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় তোমার মাঝে ডুবাইয়া দিয়া শূন্য হইয়া যাই। আমার যে আর কিছুই আমার

বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয় না, বড় সাধ যে আমার সর্ব্বস্ব দিয়া প্রাণ-বঁধূকে মনের মত সাজাইয়া দেই। মা দশভূজা, সে দিন কবে হ'বে, যেদিন আমার সকল দেহ প্রাণ মন তোমার মাঝে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার হইয়া যাইব। আমি আর আমার বোঝা বইতে পারি না। ঠাকুর, কতদিন তোমায় বলিয়াছি যে এই সংসার আমার মত অলসের জন্য নয়, তবে কেন আমায় অনন্ত প্রয়োজনের মধ্যে রাখিয়াছ? যাহা আয়াস-সাধ্য ও সহজ-লভ্য, তাহা ব্যতীত আমি আর কি নিয়া থাকিতে পারি বলত? হে আমার সহজ-রতন, আমার সব প্রয়োজন মুছিয়া ফেলিয়া তুমিই আমার প্রয়োজন হইয়া ব'স; আমার দেহ মনেও যেন আমার প্রয়োজন না হয়। আমার দেহ, মন সব তোমার সেবায় লাগুক। আমার সকল দায়িত্ব ফুরাইয়া যাক্। তুমি ব্যতীত আর কিছুই যেন আমার প্রয়োজন বলিয়া বুঝিনা, ইহাই আমার শেষ সর্ব্বাঙ্গীণ প্রার্থনা। এই দীন প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করিবে কি?

বিজয়া

যাঁহা পঁহু অরুণ চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণী হইও মঝু গাত ॥
যো দরপণে পঁহু নিজ মুখ চাহ।
হাম অঙ্গ জ্যোতিঃ হইও তঝু মাহ ॥
যো সরোবরে পঁহু নিতি নিতি নাহ।
হাম অঙ্গ সলিল হইও তছু মাহ ॥
যোহি বীজনে পঁহু বীজইত গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইও মৃদু বাত ॥
যাঁহা পঁহু ভরসই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হইও তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চন গোরী।
সো মরকত তনু তোহে কি ছোড়ি ॥

নিত্যগোপাল, সকল অঙ্গ দিয়া আমার সেবা এই ভাবে গ্রহণ করিবে কি?

তবৈবাস্মি তবৈবাস্মি ন জীবামি ত্বয়া বিনা।
ইতি বিজ্ঞায় দেবত্বম্ নয় মাম্ চরনাস্তিকম্ ॥

জগজ্জননী

॥ শ্রীভারতী ॥

শরতের সোনালী দিন; দিকে দিকে মাতৃবন্দনার প্রস্তুতি চলেছে, আশায় মানুষ দিন গুনছে—আর কত দেরী? বাঙ্গালী জীবনের অপরাজেয় উৎসব, মায়ের উৎসব। কিন্তু কে এই মা? কাহিনীতে আজ আর আমরা বিশ্বাস করি না—তাই হিমালয় ও কৈলাসের উপাখ্যান, উপাখ্যান হিসেবেই যেমন সমাদৃত, তেমনি দেবাসুর ও চণ্ডীও রূপকের মূল্যেই পরিচিত। কিন্তু কল্পিত কাহিনী এতবড় মূল্য পেল কেমন করে—এ এক বিস্ময়।

এ বিস্ময় সমস্ত দেশ ও কালের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। মানুষ যাকে ভালবাসে ভক্তি করে, অনেক সময়েই দেখা যায় অনেক অতিরঞ্জন ও অবিশ্বাস্য মহিমার দ্বারা ভূষিত করে তাকে এমন বড় করে তুলতে চায় যাতে সমস্ত মানুষ তার ছত্রছায়ায় এসে দাঁড়াতে পারে। সাম্প্রদায়িক ধর্মের গণ্ডী এভাবে প্রসারিত করতে চাইলেও তা সর্বমানবের মনকে আকর্ষণ করতে পারে না; কারণ—'সম্প্রদায় আপন মতকেই বলে ধর্ম; আর ধর্মকেই করে আঘাত। তারপরে যে বিবাদ, যে নির্দয়তা, বুদ্ধিবিচারহীন অন্ধ-সংস্কারের প্রবর্ত্তন হয়, মানুষের জীবনের আর কোনো বিভাগে তার তুলনাই পাওয়া যায় না।' (রবীন্দ্রনাথ)

আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষ এদিক থেকে কিছুটা অন্ততঃ মুক্ত। কারণ একদিকে সে চারিদিকের গ্রহণযোগ্য অনেক কিছুকে যেমন আত্মসাৎ করে নিতে দ্বিধাবোধ করেনি, অপরদিকে আবার তার ধর্মবোধ প্রসারণের চেয়ে সঙ্কোচনের দিকেই দৃষ্টি দিয়াছিল বেশী। ব্যাপকতার চাইতে গভীরতার দিকেই ছিল তার গতি; এর ফলে একই সঙ্গে ভাবজগতে ঘটেছে তার অনন্যসাধারণ সমৃদ্ধি এবং বাইরের জোর দখলের কচকচি থেকেও সে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে অনেকখানি। অবশ্যই কোনো কোনো অবস্থায় সঙ্কোচনের একটা কুফলও আছে এবং তাতে ক্ষতির পরিমাণও কিছু কম হয় না, তবুও এর গভীরতার দিকটা থেকে আমরা এমন কিছু পেয়েছি যা যে কোনো দেশ বা জাতির পক্ষেই তুলনাহীন সম্পদ।

শুনেছি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' নিয়েও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উঠেছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ মাকে তাঁর মনোভূমিতে সৃষ্টি করেছিলেন অথবা কোন্ মা ছিলেন তাঁর আরাধ্যা? 'সুজলাং সুফলাং মলয়জা শীতলাং' এ কার মূর্ত্তি? ছোট করে বললে বাংলা, আরো একটু বড় করলে ভারতমাতা, যার ফলে 'বন্দেমাতরম্' উচ্চারণকারীরা একদিন ইংরেজের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সে হচ্ছে স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনা, বিদ্বেষের চোখে দেখার ফল; ভালোবাসা দিয়ে যখন দেখি তখন দেখি ইনিই অন্নপূর্ণা মা ধরিত্রী যিনি অন্নে জলে ফলে ফুলে সমৃদ্ধিতে নিজে পরিপূর্ণা এবং যার সন্তানেরা সেই অসামান্য বৈভবের নিত্যকালের উত্তরাধিকারী।

শ্যামলাং সরলাং সুখিতাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

মায়ের কাছে সব সন্তানই সমান, একই অন্নে জলে স্নেহে সবাই লালিত, তাই তিনি গণ বা গণেশজননী, তাই তিনি জগজ্জননী। সমগ্র মানব সমাজের পরম আকাঙ্ক্ষিত ধরণীর সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ।

খণ্ডের মধ্যে যিনি বৃহতের মধ্যেও তিনি। দৃষ্টির গোচরের খণ্ড আকাশ ও অগোচরের অসীম আকাশ দুইই এক; ছোট দেশ আর সর্বলোকমাতা পৃথিবী সেই খণ্ড ও বৃহতের মধ্যেই প্রকাশিত ও আভাষিত। জননী ও জন্মভূমি এই দুইকে নিয়েই শ্রীদুর্গা। মা প্রত্যেকেরই এক একটি বিশেষ মা, কিন্তু মাতৃত্ব বস্তুটি কোনো এককের ঐশ্বর্য নয়, আর জন্মভূমি তো সম্মিলিত জীবনের অখণ্ড সুধাপাত্র। সেই জন্মভূমিকেই বলি;—সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে, আশ্চর্য এর রূপ। আদর্শ ছাড়া মানুষের মধ্যে এ রূপ সম্ভব নয়। দশদিককে নিয়েই তিনি পরিপূর্ণা; তার মধ্যে বৈচিত্র্য অসংখ্য, জীবনের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও হৃদয়-ধর্মের অপূর্ব মিলনভূমি,—তাই তিনি দশভূজা। একাধারে প্রহরণ-ধারিণী ও অভয়া জননী; ন্যায়ের পোষক ও অন্যায়ের নিধনকারিণী। হিংসা তাঁর পায়ের তলায়, কারণ হিংসাকে সম্পূর্ণ বিলোপ করা বাস্তব জীবনের পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু তাকে সংযত রাখার এবং অন্যায় অসুর বধের জন্য তার প্রয়োজনীয় ব্যবহারের শিক্ষাটিও আমরা পাচ্ছি এখান থেকে। সর্বসিদ্ধিদাতা গণেশ আছেন কোলে; কে না জানে গণ-জীবনের সমর্থন না পেলে সিদ্ধিলাভের আশা কি সুদূরপরাহত! প্রখর রাজনীতি ও ভোটযুদ্ধের দিনে এ সত্য তো সূর্য্যালোকের মতই ভাস্বর।

আর এই উদ্দেশ্যেই প্রচাররূপী অর্ঘ্যও প্রদত্ত হয় সর্বাগ্রে তাদেরই স্মরণ করে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংগঠন কর্তা বা সেনাপতি কার্তিকও আছেন এখানে; এদেরই সহায়তায় গণজীবনে আসছে চেতনা, গড়ে উঠছে অসুর-নাশের ও দেবজীবন লাভের তীব্র ও দিব্য আকাঙ্ক্ষা। সর্বোপরী আছেন লক্ষ্মী ও সরস্বতী—মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণতির আধার। সৌন্দর্যে মাধুর্যে, নিয়মে শৃঙ্খলায় ও বস্তু-সম্পদে পূর্ণ শ্রীমণ্ডিত যে জীবন, জ্ঞানে, শিল্পে, বিদ্যায়, বিনয়ে, শুচিতা শুভ্রতা ও আনন্দে মহিমান্বিত যে জীবন, মা সেই পরিপূর্ণ জীবনবোধটিকেই তার সন্তানদের জন্য নিজের মধ্য থেকে বিচ্ছুরিত করে দেখাচ্ছেন। এই অপূর্ব কল্পনা দিয়ে গড়া আমাদের অন্নপূর্ণা জীবধাত্রী পৃথিবী মা আমাদের ধ্যানলব্ধা মহীয়সী জননী—

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণা শরীরে
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

প্রতিমা ও মন্দির এই দুটি কথাকে অনেকেই সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন না; কিন্তু বাইরে রূপ দিই আর নাই দিই মনোজগতে সবাই আমরা একটা না একটা আদর্শের সন্ধান করি এবং বাহ্য জগতেও তাকে অন্ততঃ কিছুটা পাবার আশা ও বিশ্বাস যদি আমরা না রাখি তবে আদর্শ তো শুধুই বাতুলতা। সেই অধরাকে ধরার বাসনা থেকেই আসে রূপসৃষ্টির প্রেরণা। আর মন্দিরই বা কোথায়? সে কি বিশেষ একটা স্থান বা বিশেষ একটা মনের কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ? এ মন্দির সমস্ত মানুষের মনোমন্দির। সবদিক দিয়ে পরিপূর্ণ *একটি* জীবনমহিমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের জগজ্জননী, আমরাও প্রত্যেকে সেই জীবনের অধিকারী হব, আমাদের মনের মন্দিরেও হবে সেই জ্ঞান ও সৌন্দর্যের, করুণা ও শক্তির যথার্থ অধিষ্ঠান —এইটেই মানুষের কামনা, মন্দির ও প্রতিমার স্বরূপও এখানেই।

ধর্মে ধর্মে, জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে ভেদ আছে কিন্তু সবাই একই ধরিত্রীর সন্তান। নদীতে নদীতে ভেদ আছে কিন্তু সমুদ্র সকলকে সানন্দে আপন কোলে ডেকে নেয়; জোর নেই, কাড়াকাড়ি নেই, দম্ভ

নেই, তবু আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণকে ছাড়াবার উপায় নেই। মা নামটি ভাষাভেদে সকলের, এক ভূমি সকলেরই আশ্রয়, সকলের জন্যই তার দ্বার অবারিত। সেই বিশ্ববোধের দিকেই আজকের মানুষের মনন-স্রোত প্রবাহিত; সমস্ত আদর্শ ই এই একটি জায়গায়ই ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে।

'—ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো
বন্ধ নাশিবে—তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে—'

একথা আজ বিশ্বাস করা খুব কঠিন নয়। কারণ 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' যেমন প্রত্যেকের, তেমনি পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনাও প্রতিটি মানুষেরই। তাই এ মায়ের পূজার অধিকারীও সকলেই। সার্বজনীন পূজাপ্রাঙ্গণ আজ অনেক বড় হয়ে উঠেছে কিন্তু কেবল মাত্র স্বদেশের অঙ্গনেই এ সীমাবদ্ধ থাকবে কি? মূর্ত্তিপূজা বিশেষ দেশ ও জাতির, কিন্তু এর বৃহৎ ভাবসমৃদ্ধ চিরকল্যাণময়ী স্বরূপটি দেশ কাল ও জাতি নির্বিশেষে সকলেরই। তাই বিশ্বকবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও বলি;—

'—দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কি বিশাল প্রাণ
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান,
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার,—
এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গল ঘট হয় নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে—
আজি ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।'

মা

॥ শ্রীরেণু মিত্র ॥

একান্তভাবে অসহায়, সর্বতোভাবে পর-নির্ভর শিশুর বিশ্বের সঙ্গে, বস্তু-পুঞ্জের সঙ্গে প্রথম সম্পর্ক তার মায়ের মধ্য দিয়ে। তার তখনকার দেহ-ধর্ম-প্রধান চিত্ত-সত্তার সকল খোরাকই জুগিয়ে থাকে তার মা। এ কথা জানা আছে যে, শিশুর সঙ্গে তার মায়ের এই সম্পর্কের অন্তর্নিহিত মনস্তত্ত্বটুকু কিছু না কিছু সারা-জীবন মানুষকে ঘিরে থাকে, রূপান্তর তার যতই হোক না কেন। থাকা এইজন্যই স্বাভাবিক যে পরিণত বয়স্ক মানুষ যত সবলই হোক না কেন, সে সবলতার পূর্ণতা বলে কিছু নেই। তাই একের সঙ্গে অপরের সবলতার স্তরভেদ রয়েছে; তাই বৈজ্ঞানিক উন্নতি যতই হোক না প্রকৃতির বিরাটত্বের কাছে তাকে কোথাও না কোথাও মাথা নীচু করে স্তব্ধ বিস্ময়ে দাঁড়াতেই হয়। তাই কোন মানুষ যত বড় জ্ঞানীই হোন, কিংবা যত বড় কর্মীই হোন, যত বড় সবলই হোন না—সে জ্ঞান কর্ম বা বলের চিরন্তন পূর্ণতা বলে কিছু নেই; দেহেরও নেই, মনেরও নেই, চিত্তেরও নেই। দেহের চিরন্তন পূর্ণতা বলে কিছু নেই বলে মানুষকে বাইরে থেকে আহার্য সংগ্রহ করতে হয়; মনের চিরন্তন পূর্ণতা বলে কিছু নেই বলে বাইরে থেকে জ্ঞান আহরণের অবকাশ থেকেই যায়; চিরন্তন পূর্ণতা হৃদয়ের নেই বলে মানুষের হৃদয় চিরদিন হৃদয়ের স্পর্শ চায়।

তাই পরিণত মানুষকেও 'মা' বলেও একবার দাঁড়াতে হয়। স্নেহ-কাতর আমরা আমাদের শূন্য তাপিত প্রাণকে বিশ্ব-মায়ের প্রাণ-স্পর্শ দিয়ে একবার সঞ্জীবিত করে নিতে আজ দাঁড়িয়েছি।

কেবল তাই নয়, যে মানবশিশু তার মায়ের কাছে বস্তুর প্রথম পরিচয় একদিন জানতে পেরেছিল, পরিণত-দেহ চিরন্তন মানব-শিশুও বিশ্ব-মায়ের কাছ থেকেই চিরদিন বস্তু-জগতের পরিচয় নিতে চায়। প্রথম দিনের মত পরবর্তী কালেও বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক করার মূলে যদি মাকেই রাখতে পারি, তাহালে বস্তুর সঙ্গে পরিচয় অধিকতর পরিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি-তত্ত্বও শিখতে চাই মায়ের কাছেই।

চিরন্তন শিশু মানুষের মাতৃত্বের ধারণা উত্তরোত্তর পুষ্ট হয়েছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবাসী মাতৃত্বের যে অভিনব ধারণা করেছে, তা যেমন ব্যাপক তেমনই গভীর।

বিশ্বপ্রকৃতিতে ওতপ্রোত যে শক্তি তা যেমন ধ্বংসাত্মক, তেমনই সেই সঙ্গে গঠনাত্মক। তার ধ্বংসের রূপটাকেই যদি একান্ত করে দেখি তাহলে ভয়-বিহ্বল নিজেকে আর কোথাও খুঁজেই পাই না। শক্তিকে মাতৃরূপে দেখে তাঁর শ্রীদুর্গামূর্ত্তি কল্পনা করার মধ্যে ভক্ত ধ্বংসকে গঠনের পটভূমিকায় দেখায় এক অপূর্ব বস্তুতান্ত্রিকতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীদুর্গা অসুর সংহার করতে উদ্যত—অথচ কী অপরূপ লাবণ্য তাঁর সর্বাঙ্গে। ধ্বংসের বীভৎস রূপ শ্রীদুর্গাতে কল্যাণী রূপে প্রকাশ পেয়েছে। নানা অস্ত্রেশস্ত্রে তিনি সজ্জিত, কিন্তু মুখে চোখে অমন স্নিগ্ধতা সম্ভব হল কি করে? কেননা ধ্বংস আর গঠনের দ্বন্দ্ব মিটে গেছে মায়ের মধ্যে—তাই তিনি এমন সুন্দর, এমন মধুর, এমন কল্যাণময়ী, এমন স্নিগ্ধ। এমনই মাতৃমূর্ত্তি শ্রীশ্রীদুর্গার ধারণা করতে পেয়ে ভারতবাসী ধন্য!

প্রতি মুহূর্তে ধ্বংস হচ্ছে বস্তু জগৎ, আবার প্রতি মুহূর্তে নূতনকে জন্ম দিয়ে ধারাকে সে অব্যাহত রেখেছে। নূতন সৃষ্টির আহ্বান কেবল বিচ্ছিন্ন ব্যষ্টিগত বস্তুর ক্ষেত্রে নয়, সভ্যতার নানা রূপে সে পরিবার সমাজ রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রেই মানুষকে আহ্বান করে। মায়ের কাছে শিখতে হবে নূতন সৃষ্টির মনস্তত্ত্ব। ক্ষণে ক্ষণে বস্তু পচে, ক্ষণে ক্ষণে—সে ক্ষণের পরিমাণ যাই-ই হোক না কেন—আদর্শও বদলায়। কিন্তু নূতনকে আনব কেমন করে?

মায়ের তিন রূপ তিন দিনে ধ্যান করেছেন ভক্ত।

প্রথমদিনে—সপ্তমী পূজায়—নূতন সৃষ্টিকে যা বাধা দেয় অতীতের সেই সু ও কু সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মায়ের পূজা।

দ্বিতীয় দিনে সৃষ্টিকে রক্ষা করতে সর্বের সঙ্গে মিলবার সাধনা, সঙ্ঘ গড়ে তুলবার সাধনা শিখবার জন্য মাকে আহ্বান।

তৃতীয় দিনে যা আমি সৃষ্টি করলাম তা যাতে আমার ব্যক্তিগত ভোগের বস্তু হয়ে না দাঁড়ায়, যাতে তা সঙ্ঘের মধ্যে বস্তুতন্ত্র রূপ লাভ করে, সেই শক্তি লাভ করার জন্য মায়ের পূজা।

সৃষ্টির এই ক্রম—নূতনকে আনতে প্রথমে অতীতের সংস্কার থেকে মুক্তি, পরে সর্বের মধ্যে নিজের আত্মবিস্তার দ্বারা সঙ্ঘ গঠন, পরে নিজের অহং-এর

বিকৃতি থেকে আত্মরক্ষা তথা সৃষ্টিরক্ষা। মা তিন দিনে আমার অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তিনকেই উপাধি-মুক্ত করবার সুযোগ আমাকে দিলেন।

দৈনন্দিন ক্লেদমুক্তির জন্য দৈনন্দিন প্রার্থনা, ধ্যান, অনুধ্যান, আত্মবিশ্লেষণ, স্বাধ্যায় যেমন প্রয়োজন, তেমনি তাকেই আরও ব্যাপক করে বর্ষে বর্ষে এই মাতৃপূজায় নিজকে ঝালিয়ে নেওয়া—তিনদিন ধরে মায়ের ধ্যানের মধ্য দিয়ে আত্মবিশ্লেষণ। কোনও একটী বড়র—ব্রহ্মবস্তুর—ধ্যান সামনে না থাকলে শুধু আত্মবিশ্লেষণ ঠিক পথে না যাওয়ার সম্ভাবনায় ভরে থাকে। বর্ত্তমান যুগের সাধ্য সামগ্রিক চেতন-সত্তার। মায়ের মধ্যে সেই সমগ্রতা আছে। মায়ের পূজার তাই এত সমারোহ। মায়ের পূজায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক তিন স্তরের জাগৃতি ও অভ্যুদয়।

নৃপতি সুরথ ও বৈশ্য সমাধি নিজেদের ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন আসক্তি বিদ্বেষের হাত থেকে মুক্তি পাচ্ছিল না। আসক্তি বিদ্বেষের বস্তু থেকে তারা দূরেই ছিল—তথাপি আসক্তি বিদ্বেষের হাত থেকে তারা রেহাই পায় নি। নিজের এই আসক্তি বিদ্বেষের কাছে মানুষ কত বড় অসহায়! এ জ্বালা বড় জ্বালা। কেবল ব্যক্তিগত আত্মবিশ্লেষণ দিয়ে এর থেকে মুক্তি নেই—চাই একটী বড় কিছুর মধ্যে অবগাহন। মেধস মুনি বললেন ওদের দুজনকে—মায়ের মধ্যে অবগাহন কর। মায়ের টানেই শুধু ব্যক্তিগত এই মোহাবর্ত্ত থেকে মুক্তি সম্ভব।

কে মা? কী তাঁর রূপ? কী তাঁর স্বরূপ? বিরাট এই বিশ্বের মধ্যে আমি সামান্য—আর মা?—তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগৎ এতৎ চরাচরম্। যিনি জগৎ-চরাচরের স্রষ্ট্রী, তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক কি? তাঁকে আমি ধরতে পারব কেন? আমি ধরতে পারব না—তাঁর পথে চললে আমার সামগ্রিক সত্তার কাছে তিনি ধরা পড়েন—কেননা আমি তাঁর থেকেই জাত বলে আমার মধ্যে তাঁর প্রকাশ সম্ভব হতে পারে, প্রতিফলিত হতে পারে।

মায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে মুনিবর প্রথমেই যা বললেন তা বুদ্ধি-গ্রাহ্য নয়—তাকে দেহমনপ্রাণবুদ্ধি অর্থাৎ সমস্ত সত্তা দিয়ে বুঝতে হবে। তিনি নিত্যা—অথচ এই জগৎ তাঁরই রূপ।—'উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে।' এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয় 'অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিম্ স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি আত্মমায়য়া'-য়। বুদ্ধিমান এ বুঝল না, যারা শুধু

মেনেই নিল তারাও বুঝল বলা চলে না। বিপরীতার্থক এ তত্ত্ব শুধু বুদ্ধির মধ্যেও ধরা পড়ে না, অন্ধ বিশ্বাসের মধ্যেও নয়। এ একটা ভিন্ন স্তরের উপলব্ধির কথা—রাধাকৃষ্ণনের ভাষায়—intuitional truth যে স্তরে স্ফুরিত হয় সেই স্তরের উপলব্ধির কথা। এই স্তর সম্বন্ধে তিনি আরও লিখছেন—'When we talk of intuitional truths, we are not getting into any void beyond experience. It is the highest kind of experience when the intellectual conscience of the philosopher and the soaring imagination of the poet are combined. Intuitional experience is within the reach of all provided they themselves strain to it. These intuitional truths are not to be put down for chimeras, simply because it is said that intellect is not adequate to grasp them. The whole, the Absolute, which is the highest concrete, is so rich that its wealth of content refuses to be forced into the fixed forms of intellect. The life of spirit is so over flowing that it bursts all barriers. It is vastly richer than human thought can compass. It breaks through every conceptual form and makes all intellectual determination impossible. While intellect has access to it, it can never exhaust its fullness.'—এই স্তরে মা কি করে নিত্যা হয়েও রূপ গ্রহণ করেন, বিরাট হয়েও আমার সামগ্রিক চেতন সত্তার মধ্যে ধরা দেন, তা উপলব্ধ হতে পারবে।

মা তাঁর এক রূপে মধু ও কৈটভ বধ করলেন। আমাদের অতীতের সংস্কাররূপে পাওয়া সু ও কু সংস্কার রূপ মধু-কৈটভকে বধ করার প্রয়োজন আজও আমাদের রয়েছে।

যে ভাষায় মায়ের স্তব করা হচ্ছে তা অপূর্ব। মায়ের রূপ ও স্বরূপ পাওয়া যায় যখন বলি—

'ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকারঃ স্বরাত্মিকা।

*　　　*　　　*

ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা ॥
ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা ॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে ।
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে ॥
মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাঽস্মৃতিঃ ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী ॥
প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী ।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা ॥
ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা ।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ ॥

*　　　*　　　*

সৌম্যাঽসৌনাতরাশেষসৌমেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী ।
পরা পরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎবস্তু সদসদ্ বা অখিলাত্মিকে ।
তস্য সর্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে ময়া ॥'

এই অপরূপ স্তব সপ্তমী পূজার দেবী মহাকালীর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। মায়ের সমগ্রতা অপূর্ব—আগেই বলেছি আমাদের বুদ্ধিপ্রধান ক্যাল্‌কুলেটিং ইনটেলিজেন্স দিয়ে এর ধারণা চলে না। যে বুদ্ধি ভাল মন্দ, আলো আঁধার অর্থাৎ যা কিছুকে মোটা বুদ্ধিতে বা স্থূল চোখে বিপরীত বলে জানে, তাদেরকে দুটো একান্ত পৃথক রাজ্যের বলেই জানে, সে বুদ্ধি এই মাকে ধারণা করতে পারবে না। যে মা বলেছিলেন 'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা' সেই মা যে একই সময়ে মহা বিদ্যা, মহা মায়া, মহা দেবী, মহা অসুরী, মহা মেধা, মহা অস্মৃতি! কী অপরূপ কল্পনা—কল্পনা নয় উপলব্ধি—কী মহান্, কী গম্ভীর, কী গভীর, কী ব্যাপক, কী সামগ্রিক সমন্বয়রূপিণী। সমস্ত বিরোধ বিবাদ বিতর্কের অবসান এইখানে! অন্তর্দ্বন্দ্ব এইখানে মিটে যায় বলেই মায়ের পূজায়, ধারণায়, ধ্যানে মহা শান্তি। প্রাত্যহিকতার গ্লানিকে এতখানি বিরাটত্বের ধ্যানেই আত্মভূত করা সম্ভব।

মায়ের কথা মনে করতে গেলে আরও একটী অপরূপ স্তব উচ্চারণ না

করলে হৃদয় তৃপ্ত হয় না। সেটী তৃতীয় দিনের দেবীর রূপ মহাসরস্বতীকে উদ্দেশ করে উচ্চারিত। সমস্ত বিপরীত মায়ের মধ্যে বিবৃত।

নমো দেবৈ্য মহাদেবৈ্য শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেবৈ্য কৃত্যৈ নমো নমঃ ॥
যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

—মাকে ভক্ত দেবী, মহাদেবীরূপে দেখতে পারছেন, তাঁকে ভদ্রারূপে দেখতে পারছেন, রুদ্রারূপে দেখতে পারছেন—অতি সৌম্যা অতি রৌদ্রারূপে উপলব্ধি করছেন—কী গভীর আর কী ব্যাপক! সব চাইতে বড় কথা যে মায়ের এই বহু, বিচিত্র, বিপরীত সার্বজনীন প্রকাশকে ভক্ত সর্বভূতের মধ্যে দেখতে পারছেন—সর্বভূত থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে মাকে তিনি শূন্যে পরিণত করেন নি। এমনিই সর্বভূতাশ্রিত বা সর্বভূতে প্রকাশিত মাকে ভক্ত বারবার শতবার শতভাবে নমস্কার জানিয়েছে। সংক্ষেপে ভক্তের আরও নমস্কারকে স্মরণ করি—সর্বভূতের চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষান্তি, জাতিত্ব, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, লক্ষ্মী, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, তুষ্টি, মাতৃত্ব, ভ্রান্তি—সবই আমার মায়েরই রূপ। মায়ের আমার রূপের অন্ত নেই—এমন সর্বগ্রাসী, সর্বরূপিণী মা প্রতি দিনের ধ্যানের বস্তু। এমন সর্বাত্মক মাতৃমূর্তির ধ্যানে মানুষের ক্ষুদ্রতা দূরীভূত হয়—যদি সত্যই এই মাকে ধারণা করা যায়।

আজ নিজের মধ্যে নিজে আত্মতৃপ্ত থেকেই বাইরের সর্বভূতের মধ্যে বিচরণ করবার দিন—এই দিনে অমন মায়ের ধারণা করা, পূজা করাতেই আমাদের শক্তি মিলবে। সর্বভূতে যে মায়ের প্রকাশ ছড়িয়ে আছে, সর্বভূতে

বিচরণ করবার মন্ত্র তিনিই শেখাতে পারেন। 'সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে' যিনি, তিনি আমাদের সেই বুদ্ধি দান করুন সকলের সঙ্গে আমাদেরকে যা একাত্ম করবে। যিনি 'বিশ্বস্য বীজং', আবার যিনি 'পরমা অসি মায়া' তাঁকে কতবার নমস্কার জানালে হৃদয় তৃপ্ত হয়? যাকে দিয়ে এই জগৎ অন্তরে বাইরে পূরিত, ব্যাপ্ত, তাঁকে ধারণা করতে না পারলে, তাঁকে জীবনে জাগ্রত করে না তুলতে পারলে আত্মসাধনা সর্বভূতসাধনা মিলবে কেমন করে? তাঁকে বারবার নমস্কার, আরও নমস্কার—তিনি সর্বভূতের কল্যাণকারিণী, মঙ্গলদায়িনী—

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

'তোমার আনন্দ ঐ এল দ্বারে এল গো
ওগো পুরবাসী

* * *

সকল ধন্য যে ধন্য হল হল গো
বিশ্বজনের কল্যাণে আজ ঘরের দুয়ার খোলো গো।'

—শাপ মোচন

রুদ্রাণী

॥ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ॥

মাগো, কতবার শুনিয়াছি
অশ্রুত অভূতপূর্ব্ব সেই কণ্ঠস্বর,
কতবার ডাকিয়াছ সন্তানে তোমার,
অন্তরের স্নেহধারা অভিষিক্ত মায়ের সে ডাক
শুনিয়াছি আকুল আগ্রহে ;
জগন্মাতা ডাকে যেন সন্তানে তাহার
ক্লান্ত দিবসের শেষে খেলাঘর হ'তে
সন্তাপহারিণী তার সন্ধ্যার কুলায়।

জলদ গম্ভীর কণ্ঠে করেছ শাসন
চৈতন্য এনেছ তুমি মোহাচ্ছন্ন মনে।
মূঢ়তারে রূঢ় তিরস্কারে
লজ্জিত করেছে তব তেজোদৃপ্ত বাণী
পাপেরে করেছে দগ্ধ আগ্নেয় ভর্ৎসনা ;
পাপীরে করনি তবু ঘৃণা
অজ্ঞানতা নির্বিচারে ক্ষমা লভিয়াছে।

আবার শুনেছি তব কণ্ঠ অনুপম
স্নেহে ক্ষেমে সুকোমল হৃদয়-হারিণী,
জননীর ব্যাকুলতা সন্তানের তরে
কত যে মধুর—
কত যে ভাবনা তার কল্যাণের তরে
পুঞ্জিভূত উদ্বিগ্ন অস্থির
প্রতি মুহূর্ত্তেরে করে কত মহনীয়
তুমি তাহা বুঝায়েছ তব কণ্ঠস্বরে।

সেই কণ্ঠস্বরে বাজে ভৈরবী রাগিণী—
শ্রুতিমূলে নিত্য শুনি ঝঙ্কার তাহার।

জাগো জাগো হে রুদ্রাণী
তেজোময়ী হও আবির্ভূতা,
অন্তর তামস লোকে চাহি তোমা প্রত্যক্ষ গোচরে।
হে ব্রহ্মবাদিনী, তব কণ্ঠস্বরে তেমনি আবার
শুনাও শুনাও সেই অমৃত পুত্রের জয়ধ্বনি।

'মুক্তি ? ওরে ! মুক্তি কোথায় পাবি
মুক্তি কোথায় আছে ?
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরি-
বাঁধা সবার কাছে।'

—বাউল

মা আসিতেছেন !

॥ শ্রীধীরেন্দ্র চৌধুরী ॥

মা আসিতেছেন ! স্নেহময়ী মা আমার ! মা আসিতেছেন ! আহাঃ ! কি মধুরই না ঐ মা নাম, যা জীবন প্রভাতে আমি উচ্চারণ করিয়াছিলাম প্রথম !

মা আমার জগৎ-জননী। তোমার মা, আমার মা, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ তরুলতা সবার মায়ের একীভূত ঐ মাতৃত্বের বিকাশই দুর্গা—দুর্গতি নাশিনি। এসো! কে আছ কোথায় মায়ের সন্তান, ঐ মাকে আমরা বন্দনা করি—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

বর্ত্তমান বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সত্যদ্রষ্টা ঋষি আইনষ্টাইন বলিয়াছেন —'আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি এক মহাশক্তির খেলা, ধূলিকণা হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী।' আইনষ্টাইনের অনুভূত ঐ মহাশক্তিই আমাদের মা ভগবতি। তাঁহারই বিকাশ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জড়, অজড়, অণু, পরমাণু। ঐ যে আণবিক শক্তি তাহাও ঐ মহাশক্তিরই একটি ক্ষুদ্র বিকাশ মাত্র।

এসো ঐ মহাশক্তিকে আমরা নমস্কার করি।

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

এই বিশ্বব্যাপিনী শক্তিরূপা দেবীই সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন চিৎশক্তি-রূপে। তিনিই অধিষ্ঠাত্রী দেবী সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের। মন, বুদ্ধি, প্রাণ এই সবই ঐ মহাশক্তিরই বিকাশ। তিনিই ব্যষ্টি আত্মা, তিনিই সমষ্টি আত্মা—বিশ্বভ্রাতৃত্বের গোড়ার কথা।

ব্রহ্মারূপে তিনিই করেন সৃষ্টি, পালন করেন বিষ্ণুরূপে, তিনিই সংহার করেন—শিব। ঐ মহাশক্তিই আবার সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী শক্তিরূপে যথাক্রমে মহাসরস্বতী, মহালক্ষ্মী ও মহাকালী। সিদ্ধিরূপে তিনিই গণেশ, বীর্য্যরূপে কার্ত্তিক। পশুশক্তিও তিনি, অসুর শক্তিও তিনি। জগৎ-হিতায় সিংহবাহিনী ও অসুরমর্দ্দিনী।

সকল দেবদেবীর শরীর-তেজভূতা ঐ নারীমূর্ত্তিই জগৎ-জননী উমা, গৌরী। উমা নিত্যা, উমা সর্ব্বব্যাপী। তিনি ত্রিগুণা আবার তিনি নির্গুণাও বটেন—ব্রহ্ম শক্তি। জগৎ প্রপঞ্চ ঐ মায়েরই বিরাট রূপ। আমরা যা কিছু দেখি, যা কিছু অনুভব করি তা সবই তিনি। মায়ের বিভিন্ন বিকাশ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-রূপিণী ঐ মাকে নমস্কার।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥

বিশ্বরূপা মা আসিতেছেন! তিনি আবার আসিবেন কি? তিনি তো আছেনই সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বদিকে আমার—দেহ, মন, প্রাণ—যা কিছু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা অতীন্দ্রিয় সর্ব্বত্র। ঠিক, কিন্তু উপলব্ধি কৈ? যারা নিজের গর্ভধারিণী মাকেই করে না শ্রদ্ধা, মাইক আর বাহ্য আড়ম্বর না থাকিলে যাদের হয় না পূজা তারা বিশ্বমাতার মাতৃত্বকে অনুভব করিবে কেমন করিয়া? অথচ এই মাতৃত্বের উপলব্ধিই হইতেছে আসল পূজা। সুতরাং চাই আদর্শ নিষ্ঠা, চাই সাধনা, চাই অনুভূতি বিশ্বমাতৃত্বের—তবেই সার্থক হইবে তোমার দুর্গা পূজা, ধন্য হইবে তোমার জীবন। নচেৎ সবই বৃথা, হইবে শুধু পুতুল পূজা। বন্দেমাতরম্।

'বাসন্তী, হে ভুবনমোহিণী,
দিকপ্রান্তে, বনবনান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্রছায়ে
সরোবরতীরে, নদীনীরে
নীল আকাশে, মলয় বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী।'

—নবীন

বিজ্ঞানশিক্ষা

॥ শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় ॥

বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করবার অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধের রচনা। আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষার বিধি ব্যবস্থার বিচার করবার আগে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি গোড়ার কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

শিক্ষা মাত্রেরই, বিশেষ করে বিজ্ঞানশিক্ষার, ছুইটি দিক। একটি হচ্ছে জ্ঞানের দিক, আর অপরটি হচ্ছে প্রয়োগের দিক। এ ছুদিক থেকেই শিক্ষা মানব সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করে তুলছে।

সদ্-অসদ্-প্রয়োগ বা ভালমন্দ ফলাফল নিরপেক্ষ বিজ্ঞানশিক্ষার যে একটি স্বকীয় মূল্য আছে, একথা অস্বীকার করা চলেনা। মানুষের বুদ্ধি বিচারকে সতর্ক এবং মোহমুক্ত করবার এ হচ্ছে একটি নির্দ্ধারিত ও প্রশস্ত উপায়। স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার শক্তি আহরণ করে সমাজকে কল্যাণ ও শান্তির পথে পরিচালনার জন্য সকলের আগে চাই বিজ্ঞতা যা বিশুদ্ধ জ্ঞান। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আয়ত্ত করবার আগে তার প্রয়োগের চেষ্টা করতে গেলেই হয় নানা অকল্যাণের সৃষ্টি; এতে ব্যর্থতা এবং বিপদ উভয়েরই আশঙ্কা আছে সমানভাবে। আগে জ্ঞান, তবেই তার প্রয়োগ সম্ভব। নতুবা, গাছ রোপন না করে ফলের প্রত্যাশা হবে শুধু নির্বুদ্ধিতার পরিচয়।

বর্ত্তমানযুগে বিজ্ঞানের জ্ঞানের যে সব অদ্ভুত প্রয়োগ হয়েছে—রেডিও, বেতার, বিমানপোত ও সবাকচিত্র প্রভৃতির আবিষ্কারে—তাতে শুধু বিজ্ঞানের প্রয়োগের দিকটাই সাধারণের নিকট প্রচার হচ্ছে অসংযতভাবে। বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থাও আজ বিকৃত হয়ে উঠেছে প্রয়োগবিজ্ঞানের এ অস্বাভাবিক সমর্থনে। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ তার সুখ-সুবিধা ও ভোগ বিলাসের উপকরণ এবং উপায় উদ্ভাবন করেছে অভাবনীয় রূপে। মানুষের জীবনযাত্রা এতে সুগম ও সমুন্নত হয়েছে, এ কথা মানতে হবে। ফলে, আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষায় প্রয়োগবিজ্ঞানের বা বিজ্ঞানের ব্যবহারের দিকের চর্চ্চাই হয়ে উঠেছে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। বিজ্ঞান শিক্ষার

উদ্দেশ্য এবং মাপকাঠি হয়েছে অর্থোপার্জ্জনের ক্ষমতা। বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানযুগের শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই এক প্রকার উদাসীন। এতে সভ্যতার বিকাশ এবং সমাজের কল্যাণের দিক থেকে বিজ্ঞানশিক্ষার যে একটি স্বকীয় মূল্য আছে, এ পরম সত্যটি আমরা যাচ্ছি ভুলে। বিজ্ঞানের দার্শনিক বা জ্ঞানের দিককে উপেক্ষা করে তার ব্যবহারের দিকের এরূপ একান্ত অনুসরণে তরুণ শিক্ষার্থীদের মনোবৃত্তি যে জড়বাদের বা নাস্তিকতার অনুকূল হয়ে উঠবে, এ কিছুই অস্বাভাবিক নহে। প্রয়োগ-বিজ্ঞানের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ বিজ্ঞানের বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় সর্ব্বত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। যে বিজ্ঞানশিক্ষায় অর্থোপার্জ্জনের পথ সুগম হবেনা, তা শিখে কি হবে, এরূপ প্রশ্ন শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকবৃন্দের মুখে অহরহ শোনা যায়। জ্ঞানান্বেষণের পরিবর্ত্তে অর্থান্বেষণই যদি শিক্ষাব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে উঠে, সে শিক্ষা যে মানুষ হিসাবে বা জাতি হিসাবে আমাদিগকে উন্নতির পথে পরিচালিত করতে অক্ষম হবে—এ কথা ধ্রুব সত্য। বিজ্ঞানের শিক্ষাকে শুধু অর্থ ও ক্ষমতা অর্জ্জনের উপায় হিসাবে পরিণত করতে গেলে তার যে অপব্যবহার ঘটে, এর দৃষ্টান্ত আজ দেদীপ্যমান। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নোটজাল, মেকী মুদ্রা বা ভেজাল সৃষ্টি প্রভৃতি বহুবিধ দুর্নীতিতে যে আজ সমাজদেহ কলুষিত এ কথা কারো অজানা নয়। কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানশিক্ষার্থীরা যে বিজ্ঞানের প্রয়োগমূলক শিক্ষাকে অবজ্ঞা করে জীবন-সংগ্রামে বা জীবিকা অর্জ্জনে নিজেদের উপযোগী করে তুলবেনা, এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। আমার বলবার উদ্দেশ্য—বিজ্ঞানের শিক্ষাকে ফলবতী করতে হলে, তাকে শুধু জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নয়, আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র গঠনের পন্থা হিসাবেও অবলম্বন করতে হবে। এ সম্ভব হবে, বিজ্ঞানের নীতি এবং প্রয়োগ, এ উভয় দিকের চর্চ্চার মধ্যে সামঞ্জস্য বা সমন্বয় করে।

বিজ্ঞানের জ্ঞানের সত্যতা নির্দ্ধারিত হয় তার প্রয়োগের ফলে। প্রয়োগ হতে বিচ্ছিন্ন করে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে শুধু ধ্যানধারণার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখলে বিজ্ঞান হবে অচল, এবং তার উর্দ্ধগতি যাবে রুদ্ধ হয়ে। মানুষের হাতে বিজ্ঞান যে অপরিসীম ও অপূর্ব্ব শক্তির ভাণ্ডার অর্পণ করেছে, সে শক্তির উদ্ভব ঘটেছে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রয়োগে। কিন্তু প্রয়োগবিজ্ঞানের অবাধ ও অবৈধ অনুরাগে মানুষের সমাজে এ শক্তির অপব্যবহার ঘটছে আজ

ব্যাপকভাবে। পৃথিবীব্যাপী দুটি মহাযুদ্ধে যে নির্ম্মম ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের অভিনয় হয়ে গেল, তার মূলে ছিল প্রয়োগবিজ্ঞানের শক্তি। যুদ্ধোত্তর কালে আজও পৃথিবীবাসী সুশঙ্কিত নরনারী প্রয়োগবিজ্ঞানের নিদারুণ আঘাত হতে পরিত্রাণের জন্য কাতর হয়ে উঠেছে। বিজ্ঞানের এ শক্তির মুখে লাগাম দিতে হলে, একে নিয়ন্ত্রিত করে সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হলে, চাই মানুষের সতর্ক ও মোহমুক্ত বিচারবুদ্ধির উৎকর্ষসাধন। এর জন্য দরকার হবে বিজ্ঞানের জ্ঞানের বা দার্শনিক দিকের নিয়মিত চর্চ্চা এবং প্রচার, বিশেষ করে বিজ্ঞানের শিক্ষাপদ্ধতির প্রথম স্তরে। বিজ্ঞানের স্বরূপ এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক ধারণা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ অভাব। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বা অজ্ঞ বললেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রয়োগবিজ্ঞানের অপূর্ব্ব কৃতিত্বের মোহে বিজ্ঞানের জ্ঞান আজ বিপর্য্যস্ত। তাই আজ বিজ্ঞানসেবীরা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, এবং বিজ্ঞান-কর্ম্মীরা হয়েছেন সাধারণতঃ জড়বাদী ও অবিশ্বাসী; আহার নিদ্রা আরাম উপভোগের ব্যবস্থাই হচ্ছে তাঁদের নিকট মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। ব্যবসাবুদ্ধিকে তাঁরা মনে করেন সকল বুদ্ধির সেরা, এবং অর্থনীতিই হচ্ছে তাঁদের কাছে সব চেয়ে বড় নীতি। এর ফলে, মানুষে মানুষ দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতা বেড়ে উঠছে প্রবল হয়ে।

বিজ্ঞানের শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের তাই আজ বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, তার জ্ঞানের দিক এবং প্রয়োগের দিকের সমন্বয় সাধন করে। কত খরচে কত মাল তৈয়ার হতে পারে, এবং কত দরে বিকালে তা হতে কত লাভ হবে, এর হিসাবনিকাশ যেখানে বিজ্ঞানের প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়, সেরূপ বিজ্ঞানশিক্ষায় মানুষের মনুষ্যত্ব গড়ে উঠে না। জ্ঞানকে শুধু ব্যবসা পরিচালনের উপায় হিসাবে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করলে সে জ্ঞান হয়ে উঠে এক প্রকার অজ্ঞানের সামিল, যাকে সাধারণতঃ বলা হয় হাতুড়ে জ্ঞান।

বিজ্ঞানশিক্ষার আর একটি সমস্যা আমাদের দেশে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানের যারা গবেষক বা অধ্যাপক হিসাবে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে তরুণ বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের সংযোগ বড় ঘটে না। বিজ্ঞানের প্রাথমিক শ্রেণীতে তাঁরা কেউ অধ্যাপনা করেন না, অথবা করবার সুযোগও তাঁদের নাই, এমন কি বিজ্ঞানের গবেষণাগারে শিশু গবেষকদের

সঙ্গে কাজ করবারও তাঁদের অবকাশ বড় দেখা যায় না। বিজ্ঞান-অবিজ্ঞানের বা শিক্ষায়তনের নানাবিধ সভা সমিতি, রাষ্ট্রনীতি বা অন্যবিধ বিচিত্র কাজে তাঁদের সময় যায় চলে। অধুনা বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বিধানসভার মত নির্ব্বাচন-প্রথা চলতি হয়েছে। এতেও বহু অধ্যাপক এবং শিক্ষকেরা যান মেতে। ফলে, যাঁদের অধ্যাপনা বা পরীক্ষানৈপুণ্য হতে ছাত্রেরা প্রেরণা পাবার আশা করতে পারে, বিজ্ঞানের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পরীক্ষা হতে তাঁদের সংশ্রব যায় কমে। তরুণ শিক্ষার্থীদের মনে প্রেরণা জাগাতে হলে চাই প্রবীণ অধ্যাপকের বিজ্ঞতা। ঘোর অন্ধকারেই আবশ্যক হয় উজ্জ্বল আলোকের। এ কারণে, বিজ্ঞানের যারা প্রথম শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষার ভার নিতে হবে প্রবীণ পণ্ডিতদের। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত। নূতন পাস করা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য ডিগ্রী প্রাপ্ত যুবকের হাতেই পড়ে তরুণ শিক্ষার্থীদের অধ্যাপনার ভার। ফলে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনো আমরা ইউরোপ ও আমেরিকার বহু পশ্চাতে। এ কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ এবং লক্ষ্য কি এ সব কথা তরুণ বিদ্যার্থীদের বোঝাতে পারে একমাত্র বিজ্ঞানের প্রবীণ পণ্ডিত যাঁরা। এর অভাবে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে বেশির ভাগ হাতুড়ে শিক্ষা বা পুঁথিগত বিদ্যা। তাই আমাদের দেশের বিজ্ঞানশিক্ষা মনুষ্যত্ব বিকাশ বা চরিত্র গঠনের দিক থেকে বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছে বলা যায় না।

সত্যের অন্বেষণ হচ্ছে বিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য। তাই বলা হয়, বিজ্ঞানে কোন গোঁড়ামি নাই। বিচারবিহীন বিশ্বাস, সংস্কার, শাস্ত্র বা শাস্ত্রকারের দোহাই, বিশিষ্ট মতবাদের অনুশাসন, নিছক কল্পনা বা অনুমানের কোন স্থান বিজ্ঞানে নাই। এ কারণে অনেকের ধারণা যে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের হচ্ছে চিরন্তন বিরোধ। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভিত্তিহীন। ধর্ম্ম বলতে শুধু আচার অনুষ্ঠানকে মনে করলে চলবে না। ধর্ম্ম অর্থে বুঝতে হবে কোন পরম বিধি বা নীতির অস্তিত্বে বিশ্বাস—যার প্রভাবে বিশ্বজগৎ গড়ে উঠে চলেছে তার নির্দ্ধারিত পথে। বিজ্ঞান বলতে প্রয়োগবিজ্ঞান বুঝলেও চলবে না; সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস হচ্ছে বিজ্ঞানের মূল। অতএব বিজ্ঞানে বিশ্বাসের স্থান নেই বললে বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ পড়ে ঢাকা।

যদিও বিজ্ঞানে জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পরীক্ষা এবং পর্য্যবেক্ষণ, তথাপি

বিজ্ঞানের গোড়ায় রয়েছে একটি গভীর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসের অভাব ঘটলে বিজ্ঞান হবে অচল। বিজ্ঞান মেনে নিয়েছে, যে রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দময় পরিদৃশ্যমান বহির্জগতে আমরা জীবন কাটাই, এ হচ্ছে একটি বাস্তব জগৎ; এর স্থিতি এবং গতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে অলঙ্ঘ্য নিয়মে; এবং এসব নিয়ম বা বিধি বিধানের জ্ঞান মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অধিগম্য! এরূপ বিশ্বাসের কোন প্রমাণ বিজ্ঞান দিতে পারে না। কারণ, বিজ্ঞানের জ্ঞান হচ্ছে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ইন্দ্রিয়ানুভূতির জ্ঞান। কিন্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যে সীমাবদ্ধ এ কথা অস্বীকার করা চলে না। কাজেই বিজ্ঞানের জ্ঞানও হচ্ছে আমাদের মনের বা ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। আমাদের ইন্দ্রিয়-মন-নিরপেক্ষ বিশ্বজগতের প্রকৃত বা বাস্তব স্বরূপ যে কি, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান লাভ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এখানে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সকল বিরোধ যায় ঘুচে। প্রয়োগবিজ্ঞানের অসংযত প্রচারের ফলে বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ পড়েছে চাপা।

বিজ্ঞানের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা এ সব নানা কারণে সমাজের উপযোগী হয়ে গড়ে উঠেনি। বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির ফলে বিজ্ঞানের জ্ঞান গেছে ছড়িয়ে বহুবিধ শাখা প্রশাখায়। কাজেই বিজ্ঞানের শিক্ষা হয়ে উঠেছে আংশিক বা বিশেষজ্ঞের শিক্ষা। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সামগ্রিকভাবে আয়ত্ত করবার অবকাশ, সুযোগ বা ক্ষমতা যাচ্ছে বিলোপ হয়ে। বিজ্ঞানের কোন একটি বিশিষ্ট শাখার জ্ঞানেই দৃষ্টিকে কেন্দ্রীভূত করে রাখলে শিক্ষার্থীর জ্ঞানের সীমা একান্ত সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে যাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত, বাইরের সব কিছুই হয় তাদের দৃষ্টির অগোচর। সত্যের আংশিক প্রকাশকে সমগ্র সত্য বলে ধারণা করে শিক্ষার্থীর মনে এক প্রকার গোঁড়ামির হয় সৃষ্টি, ব্যক্তির বা সমাজের পক্ষে এ কখনো কল্যাণকর নহে। তাই অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্য, দর্শন, সংগীত ও অন্যবিধ কলাবিদ্যাদি শিক্ষার নিকট সংযোগ রক্ষা আবশ্যক। পৃথিবীব্যাপী দুটি মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী সমাজের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করলে বিজ্ঞান শিক্ষায় এরূপ সংস্কারের যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। আসুরিক শক্তিসম্পন্ন বিবিধ মারণযন্ত্রের উদ্ভাবনের বিপুল প্রতিযোগিতা হচ্ছে এর নিদর্শন। আমাদের শাস্ত্রে সত্যকে অভিহিত করেছে শিব এবং সুন্দর বলে।

শিব এবং সুন্দর হতে বিচ্ছিন্ন করে সত্যের আরাধনা করলে, তার প্রলয়মূর্ত্তিই শুধু আমাদের নিকট উঠবে প্রকট হয়ে।

এ ছাড়া আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার আরো একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক সময়ে আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রধান অন্তরায় ছিল যন্ত্রপাতির অসদ্ভাব। পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ সংগ্রহ করে সত্যের অনুসরণই হচ্ছে বিজ্ঞানের ভিত্তি। যন্ত্রপাতি এবং মালমসলা ব্যতিরেকে পরীক্ষার কাজ চলে না। কাজেই বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষাতেই ছিল বড় রকমের গলদ। এ সব অভাব এখন অনেকটা দূরীভূত হয়েছে বলা যায়। বিপুল অর্থব্যয়ে অনেকগুলি বিরাট জাতীয় গবেষণাগার আজ ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তাতে যন্ত্রপাতি ও মালমসলার সঞ্চয় হয়েছে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে যে, বিজ্ঞানের প্রাথমিক শিক্ষা আজ সর্ব্বত্র সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞাত। স্কুল কলেজগুলি ছাত্রসংখ্যার অপরিমিত বাহুল্যে একপ্রকার বাজারে হয়ে উঠেছে; এ-সব কলেজের পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের মালমসলা ও যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক দৈন্য; শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই বিজ্ঞানের পরীক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কলেজগুলি পরিচালিত হয় বাণিজ্য নীতির অনুসরণে। এ ফাঁপা এবং হাল্কা ভিত্তির উপর আমরা গড়তে যাচ্ছি বিজ্ঞানের বিচিত্র এবং মনোরম প্রাসাদ। স্কুল কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষার উপরই হয় বিজ্ঞানের গোড়াপত্তন। তার উপরই গড়ে উঠে বিজ্ঞানের গবেষণা। কিন্তু আমাদের দেশের বিধান এমনি বেয়ারা যে, এ গোড়াপত্তনের দিকে কিছুমাত্র নজর না করে, আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছি বিজ্ঞানের ত্রিতল মহলের জন্য আসবাব ও সাজ সরঞ্জামের আয়োজন করতে। খুঁটি না দিয়ে চাচ্ছি আমরা বিরাট চালার পরিনির্ম্মাণ। গাছের গোড়ায় সার না দিয়ে তার অগ্রডালে জল সেচন করে চাই আমরা রাতারাতি ফুল ফুটাতে। পিড়ামিডকে উল্টো করে গড়া চলে না; ঘোড়ার সামনে গাড়ী জুড়ে দিলে গাড়ী থাকবে অচল হয়ে। আমাদের দেশের স্কুল কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত আমার সঙ্গে তাঁরা এবিষয়ে একমত হবেন, সন্দেহ নাই। অর্দ্ধশিক্ষিত অপরিণত বিদ্যার্থীদের নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণা চল্‌তে পারে না। স্কুল কলেজে বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা না হলে বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য উপযোগী কর্ম্মী আসবে কোথা হতে? আশা করি, দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষজ্ঞ ও কর্ত্তৃপক্ষগণ এ বিষয়ে সজাগ হয়ে

উঠবেন। শুধু সোরগোল করে অর্থব্যয় করলে, বা যন্ত্রপাতির জোগাড় করলে, কিংবা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞানের গবেষণা হয় না। এর জন্য চাই স্কুল কলেজ হ'তে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত বিজ্ঞানের তরুণ কর্ম্মীর দল।

পরিশেষে বিজ্ঞানশিক্ষার যে একটি বড় রকমের সমস্যা স্বাধীন ভারতে দেখা দিয়েছে, সে-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক মনে করি। এ হচ্ছে বিজ্ঞানশিক্ষার ভাষা পরিভাষা নিয়ে। এতদিন যাবৎ আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষা চলে এসেছে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে। স্বাধীনতা লাভের পর অনেকেই মনে করেন ইংরাজীর পরিবর্ত্তে রাষ্ট্রভাষা বা হিন্দী হওয়া উচিত বিজ্ঞানশিক্ষার বাহন। কোন ২ প্রদেশে এ ব্যবস্থার প্রচলন সুরু হয়ে গেছে। তা'ছাড়া বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় স্কুল-কলেজে বিজ্ঞানশিক্ষার প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টাও উঠেছে প্রবল হয়ে। তাই স্থিরভাবে হিতাহিত বিবেচনা করে এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করবার প্রয়োজন হয়েছে। নতুবা বিভিন্ন প্রচেষ্টার ঘাত প্রতিঘাতে বিজ্ঞানশিক্ষার অগ্রগতি যাবে রুদ্ধ হয়ে।

এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, বিদেশী ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অস্বাভাবিক। এতে অনেক সময় এবং শক্তির অযথা অপব্যয় অনিবার্য্য। তবে মুস্কিল যে ভারতবর্ষের ভাষা হচ্ছে বহু, প্রত্যেক প্রদেশেই এক বা বহু ভাষা প্রচলিত। কিন্তু কোন ভাষাতেই বিজ্ঞানের উপযোগী পরিভাষার সৃষ্টি বা প্রচলন হয়নি। নূতন করে এ পরিভাষা গড়তে হবে। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বিভিন্ন হলে, নানা অসুবিধা ও বিভ্রাটের হবে সৃষ্টি। এক রাষ্ট্রভাষায় বা হিন্দিতে সর্ব্বত্র বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থা হলে এ অসুবিধা দূরীভূত হবে সন্দেহ নাই। তাই হিন্দিতে পরিভাষা সৃষ্টির আছে প্রয়োজন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে এবং উত্তর ভারতেরও কোন কোন প্রদেশে হিন্দিভাষা শিক্ষার বাহন হিসাবে অবলম্বিত হবে কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহ দিয়েছে দেখা। এ ছাড়া, হিন্দি বা কোন প্রাদেশিক ভাষায় বিজ্ঞানের প্রামাণিক গ্রন্থাদি, মৌলিক গবেষণার পত্রিকা বা সাহিত্যাদি, এবং পাঠ্যপুস্তকাদির সম্পূর্ণ অভাব। পৃথিবীর অন্যত্র বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতে হলে, ইংরাজী ও জর্ম্মান ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞানের গ্রন্থ এবং সাহিত্যাদির রীতিমত আলোচনা ও চর্চ্চা হবে অপরিহার্য্য। কাজেই বিজ্ঞানশিক্ষার্থীকে বাধ্য হয়ে ইংরাজী বা জর্ম্মান ভাষা শিখতে হবে। সময় এবং শক্তির

সংরক্ষণের দিক থেকে বিচার করলে মনে হয় বিজ্ঞানের ইংরাজী পরিভাষা বর্জ্জন করা আমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাতে সকল ক্ষেত্রেই ভারতীয় বিজ্ঞানের গতি যাবে পিছিয়ে, এবং বাইরের সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের সংযোগ যাবে সঙ্কীর্ণ হয়ে। ইংরাজী পরিভাষা অবলম্বন করে রাষ্ট্র এবং প্রাদেশিক উভয় ভাষাতেই বিজ্ঞানের শিক্ষাব্যবস্থার বিধান করাই হবে সমীচীন, অর্থাৎ ইংরাজী ভাষাকে একটি আবশ্যকীয় দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে প্রচলিত রাখলে আমাদের জাতীয় উন্নতি এবং ভারতীয় বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ প্রসার সুগম হয়ে উঠবে, বিশ্বাস করি। এবং সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রচারের জন্য চাই প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষায় প্রাদেশিক ভাষার প্রচলন।

যাঁরা বিজ্ঞানশিক্ষায় ইংরাজী বর্জ্জনের জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন, তাঁরা কি মনে করেন তাতে সত্যিসত্যিই ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রসার সহজ এবং সুগম হয়ে উঠবে? দেশাভিমানের প্রবল আবেগ ভিন্ন এর মধ্যে অন্য কোন যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া কঠিন। এরূপ ক্ষেত্রে জাপানের দৃষ্টান্তই আমাদের পক্ষে অনুকরণের উপযোগী মনে করি। জাপানে ভাষা বাহুল্যের কোন সমস্যা ছিলনা; তথাপি জাপান ইংরাজী বর্জ্জন করেনি, অথচ জাপানে ভারতবর্ষের মত ইংরাজী ভাষার কখনো প্রচলন ছিল না।

আমাদের দেশে বিজ্ঞানশিক্ষা সম্বন্ধীয় মাত্র কয়েকটি বিশিষ্ট সমস্যার এখানে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে। আশা করি, এ দিকে কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়বে।

উপসংহারে, বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সম্বোধন করে একটি কথা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন আছে মনে করি। কথাটি অতি পুরাতন, পুরাতন বলেই হয়ত এর প্রতি আমাদের নজর গেছে কমে। কিন্তু ভারতবর্ষে যদি বিজ্ঞানচর্চ্চার উৎকর্ষ সাধনে আমরা একান্ত প্রয়াসী হই তবে প্রবীণ নবীন সকল বিজ্ঞানীদের একথাটি সকল সময়ে স্মরণে রেখে চলতে হবে। ভারতে বিজ্ঞান সাধনার একজন শ্রেষ্ঠ কর্ম্মী ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিশিষ্ট পথিকৃৎ আচার্য জগদীশ চন্দ্রের অনুপম ও অননুকরণীয় ভাষায় একথাটির উল্লেখ করে আমার প্রবন্ধ শেষ করি।

"সর্ব্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে যথোচিত উপকরণ-বিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অনুসন্ধান অসম্ভব। একথা যদিও অনেক

পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। * * * * পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরো কিছু আছে। আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অন্তরে। * * * * নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবল বাহিরের দিকে যাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য যাহারা লালায়িত হয়ে উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি যাহাদের পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নাই, ধৈর্য্যের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারিবে না; দ্রুতবেগে খ্যাতিলাভ করিবার লালসায় তাহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ চঞ্চলতা যাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জন্য নহে। কারণ, দেবী সরস্বতীর যে নির্ম্মল শ্বেতপদ্ম তাহা সোনার পদ্ম নহে, তাহা হৃদয়-পদ্ম।"

'প্রেম আদর্শবাদেরও উর্দ্ধে, বাস্তববাদেরও উর্দ্ধে। এই প্রেমের একটু স্পর্শ পাইয়াছিলাম বলিয়াই আদর্শের ঝাঁঝ আমার মধ্যে নাই বলিয়াই কোনও দুর্বল মানুষকেও আমি চরম ত্যাগ করিতে পারি না। কত ক্ষমা যে করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। যত আঘাত মানুষ করিয়াছে, ততখানি আঘাত যদি আমি পাইতাম, হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হইত।...... মানুষ যে ব্যবহার করিয়াছে, তাহা সত্ত্বেও আমি যে আজ পর্যন্তও তাহাকে সঙ্গে লইয়া চলি, ইহা শুধু প্রেমের একটু স্পর্শ দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। প্রেম একদিন জয়ী হইবেই।......মানুষ যে দুইয়েরই উর্দ্ধে। আমি সমগ্র মানুষকে চাই।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী

২২-৮-১৯৫৭

প্রার্থনা

॥ শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ॥

জীবনে তোমারে ডেকেছি ডেকেছি, ডেকেছি বারম্বার
হে প্রভু প্রভু আমার।
ভজন সাধন হীন
কিছু করি নাই, হয়ে নিষ্কাম সুখে দুখে উদাসীন।
ডাকিয়া ভিক্ষা মাগা,
বুকে বড় পাই দাগা,
মোরে কি চতুর কি হীন ভেবেছ আজ ভাবি নিশিদিন।

২

তোমারে ডেকেছি সকাল সন্ধ্যা—গভীর রজনী জাগি
কেবল আমার লাগি,
মহিমা তো বুঝি নাই—
যখন যা কিছু অভাব হয়েছে তোমারে চেয়েছি তাই
তুমিই গৃহস্বামী,
ভৃত্য তোমার আমি,
তোমারে না বলে কিছু করি নাই আছে এই ভরসাই।

৩

ঘনাইছে দিন এখন ডাকিতে হয় যে লজ্জা ভয়—
ক্ষমা কর দয়াময়,
চক্ষে যে আসে জল
ক্ষমা কর প্রভু অজ্ঞাতে ভুল করিয়াছে দুর্ব্বল।
তোমারে গোপন করি;
কিছুই করিনি হরি,
তব তৃপ্তির হাসিতে করহে এ বুক সমুজ্জ্বল।

———

ভীষ্ম-তর্পণ

॥ অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

আশ্বিন মাস, বাংলা দেশের দিকে দিকে মাতৃপূজার সাড়া পড়ে গেল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজননীকে মণ্ডপমধ্যে মঞ্চস্থ করে তাঁকে যেভাবে আমরা পূজা করি, পূজার ছলে যেসব কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি তা সুন্দর নয়, শোভন নয়, সমাজের পক্ষে কল্যাণকরও নয়। যাক্ সে সব অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচ্য বিষয় হ'ল, মাতৃপূজার এই যে বিরাট কল্পনা তার পূর্বে শাস্ত্রকার আর একটি পূজার বিধান দিয়েছেন। দেবী পক্ষের পূর্বে পিতৃপক্ষ, তর্পণ পক্ষ—সে সময় পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে হয়, তিল ও জল দিয়ে তাঁদের পূজা করতে হয়। একটা উদ্দেশ্য নিয়েই শাস্ত্রকার শ্রীশ্রীদুর্গাদেবীর আরাধনার পূর্বে পিতৃপক্ষের বিধান দিয়েছেন। সে ব্যবস্থার নিগূঢ় অভিপ্রায় কি তা প্রণিধানযোগ্য।

জৈব মনবুদ্ধির শক্তি সীমায়িত। মানুষের সীমাবদ্ধ মনবুদ্ধিতে ধারণার যোগ্য কোন স্থূলবস্তুকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে অভ্যাস না করলে জগন্মাতাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায় না, কারণ জগৎপিতা বা জগন্মাতা অতি সূক্ষ্ম বস্তু। খণ্ড পিতা বা খণ্ড মাতাকে ভক্তি করতে না শিখলে অখণ্ড পরমাত্মায় শ্রদ্ধাবনত হয়ে আত্মসমর্পণ করা খুবই কঠিন। তাই অখণ্ড পিতৃত্ব বা মাতৃত্বকে পূজা করার পূর্বে খণ্ড পিতৃত্ব বা মাতৃত্বকে পূজা করে দেবীপূজার যোগ্যতা লাভ করতে হয়। তাই শ্রুতি লিখলেন—মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব—মাতাপিতাআচার্যকে দেবতা জ্ঞানে পূজা কর।

ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন। পতিতপাবনী জাহ্নবীর পূতস্পর্শে তাঁর পিতৃ-পুরুষগণ কপিল শাপ হতে মুক্ত হয়েছিলেন। ভগীরথের পিতৃশ্রদ্ধা বিগলিত হয়ে গঙ্গারূপে আবির্ভূতা। গঙ্গা যেন মূর্তিমতী পিতৃশ্রদ্ধা। গঙ্গাস্নানে যদি পিতৃশ্রদ্ধা না জাগে এবং সেই সঙ্গে যদি বিশ্বপিতার প্রতি ভক্তির উদয় না হয়, তবে গঙ্গাস্নান নিষ্ফল।

পিতৃশ্রদ্ধার জলন্ত দৃষ্টান্ত পিতামহ ভীষ্ম গাঙ্গেয়। গঙ্গাদেবীর গর্ভে

ভীষ্মের জন্ম সার্থক। পিতার মনস্তুষ্টির জন্য জগতের সকল ভোগসুখ ভীষ্ম বিসর্জ্জন দিয়েছেন, রাজার ছেলে রাজ্য ত্যাগ করেছেন, সংসারে থেকে সন্ন্যাসী সেজেছেন। অথচ ক্ষত্রিয়ের সকল কর্তব্য কখনও তিনি অবহেলা করেন নি। ভীষ্মের এই যে ত্যাগ তার প্রেরণা কোথায়? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর—পিতৃশ্রদ্ধা। খণ্ড পিতার প্রতি যাঁর এত বড় শ্রদ্ধা, তিনি বিশ্বপিতাকে পাবেন না তো পাবে কে? ভীষ্ম গোবিন্দগতমানস। তাই দেখি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর একদিন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের কক্ষে গিয়ে দেখলেন পীতবাস জনার্দ্দন বৃহৎ পর্যঙ্কে ধ্যান-মৌন। ধর্মরাজ কখন প্রবেশ করেছেন তাঁর খেয়াল নেই। কৃতাঞ্জলি হয়ে ভীত মনে ধর্মরাজ সম্ভাষণ করলেন, শ্রীকৃষ্ণ নিরুত্তর। আবার বললেন ধর্মরাজ, অমিতবিক্রম মাধব, জগতের মঙ্গল তো? শ্রীকৃষ্ণ পাষাণের ন্যায় নিশ্চল। ধ্যানভঙ্গে মৃদু হেসে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—

শরতল্পগতো ভীষ্মঃ শাম্যন্নিব হুতাশনঃ।
মাং ধ্যাতি পুরুষব্যাঘ্রস্ততো মে তদ্‌গতং মনঃ॥
স হি ধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠস্তস্মিন্ শান্তে মহাত্মনি।
ভবিষ্যতি মহী পার্থ নষ্টচন্দ্রেব শর্বরী॥

শর-শয্যাশায়ী ভীষ্ম আমাকে ধ্যান করছেন, আমি আর আমাতে ছিলাম না, আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। তস্মিন্ অস্তমিতে ভীষ্মে কৌরবাণাং ধুরন্ধরে—সেই কুরুকুল-ধুরন্ধর পরমজ্ঞানী স্বর্গে গেলে ভারতবর্ষ চন্দ্রহীন রজনীর মত শোভাহীন হবে, ভীষ্মরূপ জ্ঞান-সূর্য অস্তমিত হ'লে জগৎ অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে যাবে। পিতামহ এখনও জীবিত আছেন। কিন্তু সূর্য উত্তরায়ণে আবর্তিত হয়েছে, তাঁর জীবন-প্রদীপও নিভে আসছে। আর বিলম্ব করবেন না মহারাজ, যা কিছু জানবার, যা কিছু বুঝবার, তাঁর কাছে গিয়ে বুঝে নিন।

শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহের কাছে গিয়ে শান্তিপর্বের সেই অপূর্ব রাজধর্ম, আপদ্ধর্ম ও মোক্ষধর্ম শুনে বিগত-শোক হয়েছিলেন, হৃদয়ে নির্মল শান্তি পেয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে অর্জ্জুনের বিষাদ যোগ, তার ফলে আমরা পেয়েছি ভীষ্মপর্বের ভগবদ্‌গীতা, যুদ্ধের শেষে যুধিষ্ঠিরের বিষাদযোগ তার ফলেই পেয়েছি মহাভারতের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার—শান্তিপর্ব।

কিন্তু কে এই ভীষ্ম, কেন মহাভারতে তাঁর এত মহিমা, পিতৃপুরুষের তর্পণের সময় কেন আমরা সেই কৌরব-ধুরন্ধরের তর্পণ করি? ভীষ্ম সম্বন্ধে মোটামুটি আমরা কিছু জানি কিন্তু অনেক কিছুই জানি না। আজ স্বাধীন ভারতে তাঁকে আমাদের জানতেই হবে। কয়েকটী কথা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করছি।—

দেবব্রতের (ভীষ্মের বাল্যনাম) জন্মের পর কোন কারণে তাঁর জননী গঙ্গা সেই সদ্যোজাত শিশু নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। কয়েক বৎসর পর তিনি পুত্রকে তার পিতা মহারাজ শান্তনুর হস্তে অর্পণ করে বললেন —আপনার পুত্র বশিষ্টের কাছে সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করেছে, সমস্ত অস্ত্রে পারদর্শী হয়েছে। মহাধনুর্দ্ধর পুত্র আপনার, যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য, দেবাসুরের প্রীতির পাত্র। শুক্রাচার্য এবং সুরাসুরের নমস্য বৃহস্পতি যত শাস্ত্র জানেন, সব শিখেছে আপনার ছেলে। হে বীর, বীর পুত্রকে গৃহে নিয়ে যান—ময়া দত্তং নিজং পুত্রং বীর বীরং গৃহং নয়।

কয়েক বৎসর চলে গেল। অকস্মাৎ একদিন দেবব্রত লক্ষ্য করলেন পিতা কেমন বিমনা, তাঁর অপূর্ব লাবণ্য বিবর্ণ। উপযুক্ত পুত্র প্রশ্ন করলেন, পিতা, রাজ্যের সর্বত্র কুশল, কোথাও যুদ্ধবিগ্রহের কোন সম্ভাবনা নেই, তবে কেন আপনি এত ম্রিয়মাণ। পিতা শান্তনু দাসরাজকন্যা সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ, পুত্রকে তিনি কি উত্তর দেবেন? তিনি বললেন, এই প্রখ্যাত বংশে তুমিই আমার একমাত্র পুত্র। তুমি বীর, সর্বদা অস্ত্রাভ্যাস কর। আমার ভয়, তোমার অভাবে আমাদের বংশের কি হবে? কিন্তু তুমি একাই শতপুত্রেরও অধিক, সেজন্য সন্তান বৃদ্ধির কামনায় অনর্থক দারপরিগ্রহ করতেও ইচ্ছা করে না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন, একপুত্র থাকা আর নিঃসন্তান হওয়া উভয়েই সমান—অনপত্যৈকপুত্রত্বমিত্যাহুব্রহ্মবাদিনঃ।

বুদ্ধিমান দেবব্রতের কাছে পিতার উত্তর কেমন হেঁয়ালি ঠেকল, হিতকামী এক বৃদ্ধ মন্ত্রীর কাছে ভেতরের সব কথা তিনি জেনে নিলেন। তারপর যমুনার তীরে দাসরাজের কাছে গিয়ে "পিতুঃ কৃতে" তাঁর কন্যা সত্যবতীকে প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ বললেন, এমন শ্লাঘ্য বৈবাহিক সম্বন্ধ কোন্ কন্যার পিতা না চায়। এ বিবাহ হতে পারে যদি তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্র রাজা হবে। দেবব্রত স্বীকৃত হলে দাসরাজ বললেন, হে সত্যধর্মপরায়ণ শান্তনুনন্দন, তোমার প্রতিজ্ঞা যে মিথ্যা হবে

না, তা আমি জানি, কিন্তু তোমার পুত্র সিংহাসনে পৈত্রিক দাবী ছাড়বে কেন? দেবব্রত তখন বললেন—অদ্য প্রভৃতি মে দাস ব্রহ্মচর্যং ভবিষ্যতি। হে দাসরাজ, পূর্বেই আমি রাজ্যত্যাগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আবার প্রতিজ্ঞা করছি আজীবন ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করব।

দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা শুনে জগৎ স্তম্ভিত, দাসরাজ রোমাঞ্চিত, আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি হ'ল—অভ্যবর্ষন্ত কুসুমৈঃ ভীষ্মোঽয়মিতি চাব্রুবন্। আকাশ-বাণী হ'ল—ইনিই ভীষ্ম (যিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেন)। পাশে সত্যবতী দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁকে সম্বোধন করে ভীষ্ম বললেন, মা, রথ প্রস্তুত, চল মা ও ছেলে আমাদের গৃহে যাই—অধিরোহ রথং মাতঃ গচ্ছাবঃ স্বগৃহানিতি।

মহাভারতে মানুষকে, নরনারী উভয়কেই, খুব উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। শান্তিপর্বের হংস গীতায় আছে—গুহ্যং ব্রহ্মতদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ—গুহ্য একটী মহৎ তত্ত্ব বলছি, মানুষ হতে শ্রেষ্ঠতর আর কিছু নেই। কেবল একস্থলে নারীর মর্য্যাদা এমন মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে যে তার কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না—সাধারণ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির মত পাশা খেলায় দ্রৌপদীকে পণ রাখা; এরূপ উদাহরণ এত বড় মহাভারতে আর একটীও নেই। দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী গ্রহণের বেলায় যেমন যথেষ্ট নিন্দা করা হয়েছে, দ্রৌপদীর লাঞ্ছণাঘটিত ব্যাপারটীরও তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। সবই দৈব, এছাড়া জবাব কোথায়? এ ঘটনা না ঘটলে মহাভারত রচিত হবে কেমন করে, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধই বা ঘটবে কেমন করে? আমাদের আলোচ্য ভীষ্ম-চরিত্রের সঙ্গে ঘটনাটি কিন্তু নিবিড়ভাবে জড়িত।

সভা পর্বে বর্ণিত কাপট্যপূর্ণ দ্যূতসভা। আর্ত হয়ে মানুষ যেখানে সুবিচারের প্রার্থনা করে সেই রাজসভায় পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য চলছে। একটী রাজবধূ প্রকাশ্যে নিগৃহীতা হচ্ছেন তা দেখেও ভীষ্ম কোন প্রতিবাদ করলেন না। দ্রৌপদী প্রশ্ন করলেন, আপনারা সুবিচার করে বলুন, আমি জিত না অজিত? যিনি পূর্বেই পণ রেখে নিজেকে হেরেছেন, পরে তিনি কি করে তাঁর স্ত্রীকে পণ রাখতে পারেন? আপনাদের ধর্ম কোথায় গেল? ভীষ্ম প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন, কোন সদুত্তর দিলেন না, শুধু বললেন—ন ধর্ম সৌক্ষ্মাৎ সুভগে বিবেক্তুং তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ—শোভনে, ধর্মের তত্ত্ব অতি সূক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারছি না। ভীষ্ম চরিত্রের

এই দুরপণেয় কলঙ্কের কথা মহাভারতকার অকপটেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ঋষি কবির এই সত্যনিষ্ঠা, এই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ভারতগ্রন্থের সর্বত্র দেখা যায়।

সকল দুয়ার হতে এভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে দ্রৌপদী সর্বশোক নিবারণ নারায়ণকে ডাকলেন—

আকৃষ্যমানে বসনে দ্রৌপদ্যা চিন্তিতো হরিঃ।
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥
কৌরবার্ণব মগ্নাং মাং উদ্ধরস্ব জনার্দন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্ ॥

হে গোবিন্দ, কৌরব সমুদ্রে আমি ডুবে গেলাম। আমি তোমার একান্ত শরণাগত, আমাকে উদ্ধার কর।

এর পর ভীষ্মের জীবনে কত ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে গেল কিন্তু কখনও তিনি ধর্মের পথ লঙ্ঘন করেন নি, মানুষ-সুলভ আর কোন দুর্বলতা কখনও তাঁর চরিত্রে ফুটে ওঠেনি। কুরুবংশের অভিভাবক ভীষ্ম অনেক চেষ্টা করেছিলেন কুরুপাণ্ডবের গৃহবিবাদ আপোষে মেটাতে। কিন্তু দুর্যোধনের দুর্বার বিষয়-বাসনা তাঁর সকল চেষ্টা নিষ্ফল করল। লোকপ্রক্ষয়কর কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, ভীম প্রভঞ্জনে আসমুদ্র হিমাচল কেঁপে উঠল। নানা কারণে পিতামহকে তাঁর প্রিয়তম পাণ্ডবদের বিপক্ষেই যুদ্ধ করতে হ'ল। যুদ্ধের প্রথম দশদিন ভীষ্মই ছিলেন কৌরবপক্ষের সেনাপতি। মত্ত মাতঙ্গ যেমন পদ্মবন বিদলিত করে, জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন তুলারাশি ছাই করে দেয়, তেমনি করে ভীষ্ম নয়দিন অগণিত শত্রু সৈন্য সংহার করলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিবস—শিখণ্ডিনং পুরস্কৃত্য নির্যাতাঃ পাণ্ডবা যুধি। 'যমরাষ্ট্র বিবর্দ্ধন' যুদ্ধ চলছে। দশম দিবসের অপরাহ্ন বেলা। এমন সময় ভীষ্ম দেখলেন, শিখণ্ডীর পিছন থেকে শ্রাবণের বারিধারার মত অশ্রান্ত শরধারা তাঁর দিকে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। দুঃশাসন সেদিন অমিত বিক্রমে ভীষ্মের পার্শ্ব রক্ষা করেছিলেন। শিখণ্ডীকে দেখে ভীষ্ম আর যুদ্ধে মন দিলেন না। দুঃশাসন বললেন, একটু চেষ্টা করুন পিতামহ, শিখণ্ডীর শর সন্ধান ব্যর্থ করুন। তখন ভীষ্ম একটু হেসে বললেন—

নিকৃন্তমানা মর্মাণি দৃঢ়াবরণভেদিনঃ।
মুষলা ইব মে ঘ্নন্তি নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥

বজ্রদণ্ডসমস্পর্শা বজ্রবেগ দুরাসদাঃ।
মম প্রাণানারুজন্তি নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥
ভুজগা ইব সংক্রুদ্ধা লেলিহানা বিষোল্বণাঃ।
সমাবিশন্তি মর্মাণি নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ ॥
অর্জুনস্য ইমে বাণাঃ নেমে বাণাঃ শিখণ্ডিনঃ। ইত্যাদি

কিছুই বুঝলে না দুঃশাসন। এই যে মুষলসম শরনিকর সুদৃঢ় বর্ম ছিন্ন করে আমার মর্ম বিদ্ধ করছে, এ বাণ শিখণ্ডীর নয়। এই যে বজ্রতুল্য শরজাল বিদ্যুৎবেগে নিরন্তর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে আমার প্রাণ ব্যাকুল করেছে, এ সকল বাণ শিখণ্ডীর নয়। এই যে ক্রোধোন্মত্ত লেলিহান তীব্র বিষে ভরা সর্পের ন্যায় শরজাল আমার মর্মস্থলে প্রবেশ করছে, এ সকল বাণ শিখণ্ডীর নয়, দুঃশাসন, এ অর্জুনের। গাণ্ডীবধন্বা সব্যসাচীর শরনিক্ষেপের কি অদ্ভুত কৌশল! অর্জুনের শরাঘাতে জীবন যায় এ-কথা বলতেও যেন ক্ষত্রিয়োত্তম ভীষ্মের বীর হৃদয় নেচে উঠেছে, গর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠেছে, এমনি এক অপূর্ব ছবি ব্যাসদেব এখানে এঁকেছেন।

কিঞ্চিচ্ছেষে দিনকরে—দিবাবসান হতে আর একটুখানি বাকী। যিনি সহস্র সহস্র শত্রুসৈন্য সংহার করেছেন সেই ভীষ্মদেহে আজ দুই অঙ্গুলি স্থানও অবিদ্ধ রইল না। তীক্ষ্ণ শরে ক্ষত বিক্ষত দেহে পূর্বদিকে মাথা করে পিতামহ ভীষ্ম রথ থেকে পড়ে গেলেন—প্রাক্‌শিরাঃ প্রাপতদ্রথাৎ। দেহ শরজালে আবৃত থাকায় তিনি ভূমি স্পর্শ করলেন না—ধরণীং ন স পস্পর্শ শরসংঘৈঃ সমাবৃতঃ।

ভীষ্মের পতন সংবাদ বিদ্যুৎবেগে চারিদিকে ব্যাপ্ত হ'ল। দ্রুতবেগে অশ্ব চালালেন সঞ্জয় হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রকে খবর দিতে। যুদ্ধ থেমে গেল। অবহার (যুদ্ধ বিরতি) ঘোষিত হ'ল। শোকের নিবিড় ছায়া পড়ল কৌরব শিবিরে। পাণ্ডব শিবিরে আনন্দকলরোল, বীণা বেজে উঠল, নৃত্যগীত আরম্ভ হ'ল। শস্ত্র কবচ খুলে ফেলে উভয়পক্ষের মহারথীগণ মিলিতভাবে পিতামহকে দেখতে এলেন। একটা দেখবার মত দৃশ্য। তাঁদের কেহ কেহ অস্ফুট স্বরে বলাবলি করলেন—

অয়ং পিতরমাজ্ঞায় কামার্তং শান্তনুং পুরা।
ঊর্দ্ধরেতসমাত্মানং চকার পুরুষর্ষভঃ ॥

এই সেই মহাপুরুষ যিনি কামার্ত পিতার সুখের জন্য জগতের সব কিছু কাম্য বস্তু বিসর্জন দিয়ে নিজেকে উর্দ্ধরেতা করেছিলেন।

এমন সময় চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে শল্য উদ্ধারে নিপুণ বৈদ্যগণ উপস্থিত হলেন। তখন দুর্যোধনের দিকে দৃষ্টিপাত করে পিতামহ বললেন, এ সব কি হবে দুর্যোধন? উপযুক্ত অর্থ ও সম্মান দিয়ে চিকিৎসকদের বিদায় দাও—দত্তদেয়া বিসৃজ্যন্তাং পূজায়িত্বা চিকিৎসকাঃ। আমি ক্ষত্রিয়ের পরম গতি লাভ করেছি। দেহদুঃখ হোমানল প্রজ্জলিত থাক। আমি ক্ষতমুক্ত হতে চাই না, ব্যথার গভীর বেদনা অনুভব করতে চাই। অন্ন দিয়ে দুর্যোধন এই দেহকে বেঁধে রেখেছিল। এই দেহ দিয়ে এতদিন অধর্মের সেবা করলাম, কত দুর্লভ মনুষ্য জীবন ধ্বংস করলাম। তুষানলের মত তিলে তিলে দগ্ধ হয়ে আজ শুদ্ধ হতে চাই, নির্মল হতে চাই। তোমরা কেউ বাধা দিও না। দুঃখ দিয়ে ভগবান আমাকে পরম অনুগ্রহ করেছেন।

> "এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ ;
> এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
> এমন উপেক্ষা মরণেরে,
> হেন জয়যাত্রা—
> বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
> দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
> এর কি তুলনা কোথা আছে?"

সকলে নীরব। পিতামহ আবার বললেন, দুর্যোধন, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, আমার দেহাবসানের সঙ্গে তোমাদের বিরোধের অবসান হোক, প্রজাদের শান্তি হোক, রাজারা প্রীতিসহকারে পরস্পর মিলিত হোক, পিতা পুত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুন। কিন্তু মুমূর্ষুর যেমন ঔষধে রুচি হয় না, পিতামহের হিতকথায় দুর্যোধনের রুচি হ'ল না।

উত্তরায়নের প্রতীক্ষায় পিতামহ ৫৮ দিন শরশয্যায় ছিলেন, এই তীব্র বেদনা নিগৃহীত করে ধর্মরাজকে শান্তিপর্বের অমৃতময়ী কথা শুনিয়েছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্ব সনাতন ধর্মের বিপুল বিশ্বকোষ। রাজধর্ম, সমাজধর্ম, মোক্ষধর্মের বিবিধ জটিল প্রশ্ন সেখানে আলোচিত, ব্যাখ্যাত, নানা উপাখ্যানের দ্বারা স্পষ্টীকৃত করা হয়েছে। কিন্তু একটী প্রশ্ন সেখানে বার বার উত্থাপিত হয়েছে—ধর্ম কাকে বলে? মহাভারত সর্বত্র এর একই উত্তর দিয়েছেন—

যা মানুষের হিতকর তাই-ই ধর্ম। সত্য পালন ও অহিংস আচরণ শ্রেষ্ঠ ধর্ম, কারণ উহা সর্বভূতের কল্যাণজনক। কিন্তু যদি কোন অবস্থায় সত্য ও অহিংসা সর্বভূতের অনিষ্টকর হয়, তবে তা অধর্ম। সত্য-মিথ্যা, হিংসা-অহিংসার কোন একান্ত রূপ নেই। যা সর্বভূতের কল্যাণজনক তা যদি হিংসা বা মিথ্যা হয় তবে সে হিংসা হিংসা নয়, অহিংসা; সে মিথ্যা মিথ্যা নয়, তাকে সত্য বলেই গণ্য করতে হবে। এই কষ্টি পাথরেই সত্যানৃতের পরীক্ষা হবে। দেহপুষ্টির জন্য দুগ্ধ জীবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য, কিন্তু দেহের এমন অবস্থা হতে পারে যখন দুধ হয় বিষ, আর বিষ আর্সেনিক হয় অমৃত।

প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্ররচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥
ধারণার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ ধারণসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

জীবগণের জাগতিক অভ্যুদয়, ক্লেশ নিবারণ এবং ধনপ্রাণ রক্ষার জন্যই ধর্মের সৃষ্টি। যা মানুষকে অভ্যুদয়, উৎকর্ষ ও ঊর্দ্ধগতির পথে নিয়ে যায় তাই-ই ধর্ম। কর্ণপর্বেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে অনুরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন।

ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥

ধারণ (রক্ষা) করে এজন্যই ধর্ম বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম।

শান্তি ও অনুশাসন পর্বে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে লৌকিক অলৌকিক সকল বিষয়েই উপদেশ দিয়েছেন। যুধিষ্ঠির নিখিল মানব সমাজের প্রতিনিধি, ভীষ্ম সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডার। সংসার সম্বন্ধে মানুষের মনে যত প্রকার প্রশ্ন উঠতে পারে, যুধিষ্ঠিরের মুখে মহাভারতকার সব প্রশ্নই তুলেছেন, আর ভীষ্ম তার যথাযথ উত্তর দিয়েছেন। অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি বললেন—সত্যেষু যতিতব্যং বঃ সত্যং হি পরমং বলম্—তোমরা সত্যকেই আশ্রয় কর, সত্যই পরম বল।

দেবীপক্ষের পূর্বে পিতৃপক্ষে আমরা পিতৃপুরুষের তর্পণ করি। শুধু পিতৃপুরুষগণ নয়, ব্রহ্মা হতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত, সকলের তৃপ্তির জন্য জলদান করি, তাঁদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি। শ্রদ্ধা মানুষের পরম সম্পদ। পিতামহ ভীষ্মকে শ্রদ্ধা নিবেদন, তাঁর উদ্দেশে জলদান তর্পণের বিশেষ অঙ্গ।

যে যুগ এসেছে তাতে ভীষ্ম-তর্পণের বড় প্রয়োজন। যৌনক্ষুধার তীব্র লালসা জেগেছে নরনারীর অন্তরে। যৌনপ্রবৃত্তির উত্তেজনাময় আবেদন যাতে নেই, এমন বই কেউ পড়ে না, এমন কথাও কেউ আর শোনে না, এমন বিজ্ঞাপনও বুঝি আর মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। তাই বলছিলাম ভীষ্ম-তর্পণের আজ বড় প্রয়োজন। পিতামহ আশীর্বাদ করুন যেন তাঁর মত সংযমী ত্যাগী বীর সন্তানে দেশ ভরে যায়।

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতি প্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

'শ্রদ্ধা-ভক্তিতে দেহ-প্রাণ-মন-বুদ্ধি নমনধর্ম্মশীল হয়, গুরুজনের চরণে নুইয়া পড়ে। তাই ভাগবতে হাজার হাজার বার 'নমঃ' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। নম্-ধাতু হইতে নমঃ শব্দ। 'হরিহরয়ে নমঃ'। এই নমস্কার যখন জীবনের সকল স্তরে নামিয়া আসে, তখনই সকল ভাগবতী যোগ্যতা সেই জীবনে প্রকাশ পায়।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী

২৩-৮-১৯৫৭

শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল

॥ অধ্যাপক রেজাউল করীম ॥

আমাদের দেশে শিক্ষাদান প্রণালী এখনও বৈজ্ঞানিকরূপ ধারণ করেনি। যে কোন ছাত্র দু একটা পরীক্ষায় পাশ করার পর, হঠাৎ একদিন স্কুলে গিয়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শিক্ষকতা করতে করতে অন্যত্র চাকরীর চেষ্টা করে। চাকরী পেলেই শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে দেয়। তারপর শিক্ষক হয়ে আসে ঐ ধরণের আর একজন ভাগ্যান্বেষী তরুণ যুবক। এতে শিক্ষার যে কত ক্ষতি হচ্ছে তা কেউ ভেবে দেখে না। শিক্ষাদানকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছে এমন লোকের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের রীতি নীতিই আলাদা। সেখানে শিক্ষাদান প্রণালী অন্যরূপ। গোটা শিক্ষাদান ব্যবস্থাটাই বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু তা একদিনেই সম্ভব হয় নি। দীর্ঘ যুগ ধরে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণ নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষালাভ করেছেন, বাস্তব ক্ষেত্রে সেটাকে প্রয়োগ করেছেন। এবং এইভাবে পশ্চিম দেশে শিক্ষাদান-বিদ্যা একটা নূতন রূপ ধারণ করেছে। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণ নানা পুস্তকে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে রেখেছেন। পরবর্ত্তী যুগ তাঁদের সে সব অভিজ্ঞতা থেকে বহু উপকার পেয়েছে। আমাদের দেশের প্রত্যেক শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌দের তাঁদের যে সব অভিজ্ঞতার বিষয় জানা দরকার। আজ একজন শিক্ষাবিদের কথা বলব যিনি সমগ্র জীবন শিক্ষাদান করে গেছেন, এবং শিক্ষাদান প্রণালীকে একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছেন। তাঁর নাম ফ্রেডারিক উইল হেলম ফ্রয়েবেল। তিনি শিক্ষক হিসাবে জীবন আরম্ভ করেন নি। প্রথম জীবনে বন-বিভাগে কাজ করতেন। বনরাজির তরুলতার জীবনের বিকাশ পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে তিনি দেখলেন যে অতি শিশুকাল থেকে তরুরাজি একটা নিয়ম মেনে চলে। তখন তাঁর মনে হ'ল মানব শিশুও ত একটা জীব। এদেরও ত একটা নিয়ম আছে। তারপর তিনি মানব শিশুর ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। এক সিদ্ধান্ত থেকে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হ'লেন। এইভাবে তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ-

শক্তির প্রভাবে তিনি শিশুদের শিক্ষাদান নীতি সম্বন্ধে বহু অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করলেন।

ফ্রয়েবেল জার্মাণ দেশের একজন বিখ্যাত শিক্ষা-সংস্কারক ও শিক্ষাবিদ্। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিল থুরিঙ্গিয়া (Thuringia) প্রদেশের ওবার উইমাহ্ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়েছিল। প্রথম জীবনে তাঁর পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা হয় নি। তাই দেখে তাঁর জনৈক মাতুল তাঁকে নিজগৃহে আশ্রয় দিলেন, এবং একটি গ্রাম্য স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। তখন তাঁর বুদ্ধির বিকাশ হয় নি। জগতের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি প্রথম জীবনে বিশেষ সুবিধা করতে পারেন নি। ফ্রয়েবেলের হ'ল সেই অবস্থা। পাঠশালার শিক্ষকগণ তাঁকে নির্বোধ বলে ঘোষণা করলেন। এমন নিরেট মূর্খ ছেলে পড়িয়ে কোন লাভ হ'বে না। সুতরাং তাঁর লেখাপড়া এইখানে শেষ হ'ল। তারপর তাঁকে একজন বন-রক্ষকের নিকট শিক্ষানবিশ নিযুক্ত করা হ'ল। দু বছর তিনি শিক্ষানবিশী করেছিলেন।

থুরিঙ্গিয়ার জঙ্গলে কাজকর্ম্ম শিখবার সময় ফ্রয়েবেল একটি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করলেন, আর সেটাতে তাঁর অন্তর-দৃষ্টি খুলে গেল। তিনি দেখলেন গাছপালা ও পৃথিবীর অপরাপর বস্তু একটা নিয়ম মেনে চলে, তাদের মধ্যে আছে একটা uniformity বা ঐক্য ও সমরূপতা। প্রকৃতি এলোমেলো ও বিশৃঙ্খলভাবে চলেনা,—বিনা নিয়মে কোন গাছ বাড়েনা, বাঁচেনা বা ফল দেয় না। ফ্রয়েবেলের মন ছিল মিষ্টিক ভাবাপন্ন। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেলে হয়ত তাঁর এই মিষ্টিক মন আরও বিকশিত হ'ত। কিন্তু তিনি সে সুযোগ পেলেন না। তার ক্ষতিপূরণ হ'ল অন্যভাবে। তরুলতার বিচিত্র জীবন তাঁর মিষ্টিক প্রবণতাকে সহায়তা করল—আর তরুলতার জীবন তাঁর প্রবৃত্তি ও প্রবণতার সঙ্গে অদ্ভুতভাবে খাপ খেয়ে গেল। সতের বছর বয়সে তিনি বন-বিভাগের চাকরী ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বনবিভাগকে বিদায় দিবার সময় তিনি এই ধারণা নিয়ে গেলেন যে, প্রকৃতির জীবনের মধ্যে আছে একটা নিবিড় ঐক্য ও সমরূপতা। তাই তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞান শিখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। প্রকৃতির সার্ব্বজনীন আইন ও বিধিকে মানব-সমাজের মধ্যে কি ভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়, সেই চিন্তায় তিনি বিভোর হয়ে নানা বিষয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। প্রকৃতির নিয়মকে মানুষের জীবনে পর্য্যবেক্ষণ করতে হ'বে, এই হ'ল তাঁর

ধ্যান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি জেনানগরে উপস্থিত হলেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু তাঁর আর্থিক অবস্থা কোনদিন স্বচ্ছল ছিলনা। তাঁকে অভাবের দায়ে ঋণ গ্রহণ করতে হ'ল। কিন্তু সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে পারলেন না। ফলে ন'সপ্তাহের জন্য কারাগারে প্রেরিত হ'লেন। এইভাবে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সাঙ্গ হ'ল। অগত্যা বাড়ী ফিরে এলেন। কিন্তু তিনি মোটেই নিরুৎসাহ হলেন না। তিনি সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন যেমন করেই হোক আত্ম-জ্ঞান লাভ করবেন। এইরূপ মনের অবস্থায় তিনি জ্ঞানলাভের জন্য নানা স্থানে নানা কাজ করতে লাগলেন। কখন জরীপ করবার জন্য আমিনের কাজ গ্রহণ করলেন, কখন হ'লেন হিসাব রক্ষক। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিসর্জ্জন দিলেন না। তিনি স্পষ্ট অনুভব করলেন যে মানব-সমাজের উপকারের জন্য একটা মহৎ দায়িত্ব তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি যখন Frankfort-on-mainএ স্থপতিবিদ্যা শিখছিলেন, সেই সময় একটি মডেল-স্কুলের ডিরেক্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। এই ডিরেক্টার ইতিপূর্ব্বে শিক্ষাবিদ্ পেষ্টালজির নিকট উৎসাহ পেয়ে তদনুসারে কিছুটা কাজ আরম্ভ করেছিলেন। ইনিই এখন ফ্রয়েবেলকে তাঁর মডেল স্কুলে কাজ করতে উৎসাহ দিলেন। ফ্রয়েবেল কিছুদিন এখানে কাজ করে কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। তারপর ১৮০৭ থেকে ১৮০৯ পর্য্যন্ত নিউশ্যাটলের নিকট ইভারডুতে অবস্থিত পেষ্টালজির বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁর একটি বিশেষ মত গড়ে উঠেছিল। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, মানুষ ও প্রকৃতি একই মূল থেকে উৎপন্ন। সুতরাং প্রকৃতির মত মানুষেরও একই আইনদ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। অবশ্য পেষ্টালজিও প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা দিতে উৎসাহ দিতেন। কিন্তু ফ্রয়েবেল আরও একটু অগ্রসর হলেন। তিনি বল্লেন যে প্রকৃতি-বিজ্ঞানের ভিত্তিতেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হ'বে।

ফ্রয়েবেল বুঝলেন যে তাঁর নিজের আরও শিক্ষার দরকার। তাই ১৮১১ সালে গটেনগেনে (Got-tengen) নূতন উদ্যমে শিক্ষালাভ করতে শুরু করলেন। সেখান থেকে বার্লিনে এলেন। এই সময় প্রাশিয়ার রাজা দেশ রক্ষার জন্য দেশবাসিকে আহ্বান জানালেন। ফলে ফ্রয়েবেলের শিক্ষার ব্যাঘাত হ'ল। জাতিতে তিনি প্রাশিয়ান ছিলেন। তিনি একটি

সৈন্যদলে যোগদান করলেন এবং ১৮১৩ সনের অভিযানে যোগদান করলেন। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শৃঙ্খলা ও সংযুক্ত কর্মের মূল্য বুঝতে পারলেন। তিনি আরও উপলব্ধি করলেন যে ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য নয়, বরং সমগ্র জাতির জন্য। কারণ সমগ্র দেশ প্রত্যেক ব্যক্তিকে নানাভাবে রক্ষা করে।

ফ্রয়েবেলের ছিল অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রীতি। সেইজন্য দুজন মহান ব্যক্তির বন্ধুত্ব লাভ করলেন—তাঁদের একজনের নাম চিরকাল তাঁর স্মৃতির সঙ্গে জড়িত থাকবে—তাঁর নাম ল্যাঙ্গেথাল (Langethal)। আর অপর বন্ধুর নাম মিডেনড্রফ (Middendroff)। এই দুজন বন্ধু পরে তাঁর অনুরক্ত অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তাঁরা নিজেদের ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে ফ্রয়েবেলের আদর্শকে বাস্তব রূপ দিবার জন্য এগিয়ে এলেন। যুদ্ধ থেমে গেল। শান্তি স্থাপিত হ'ল। ১৮১৪ সালে ফ্রয়েবেল বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের খনিজবিদ্যার যাদুঘরের কুরেটার নিযুক্ত হলেন। সেই সময় লিঙ্গাথাল এবং মিডেনড্রফ বার্লিনে ছিলেন এবং শিক্ষাদান কাজেই নিযুক্ত ছিলেন। ফ্রয়েবেল তাঁদেরকে তাঁর শিক্ষাসংক্রান্ত থিওরীগুলি ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তাঁরা যে তাঁকে বিশেষ উৎসাহ দেবেন তা বলাই বাহুল্য।

ক্রমশঃ

'অপরিচিতের এই চিরপরিচয় এতই সহজে নিত্য
ভরিয়াছে গভীর হৃদয় সে-কথা বলিতে পারি এমন
সরল বাণী আমি নাহি জানি।'

—বলাকা

সৃজনধর্মী শিক্ষা

॥ শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় ॥

সৃজনধর্মী শিক্ষা। শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ—মানুষের সহজাত শক্তির সম্যক্ বিকাশ-সাধন—নব নব ক্ষেত্রে নব নব সৃজনে মানুষের উদ্বোধন। সৃজনধর্মী শিক্ষা নিয়ে গত শতাব্দী হতেই শুরু হয়েছে আন্দোলন। শিক্ষককে স্রষ্টা হতে হবে, এবং শিক্ষণকে সৃজনমুখী করে তুলতে হবে, এই হল সংক্ষেপে এই আন্দোলনের প্রধান শ্লোগ্যান।

শিক্ষাক্ষেত্রে 'সৃজন' এই কথাটা নিয়েও খানিকটা মতদ্বৈধ দেখা দিয়েছে। আভিধানিক অর্থে 'সৃজনের' সংজ্ঞা দ্বিবিধ:

(১) কোন কিছু তৈরী করাই নামান্তরে সৃজন—তা ভালো মন্দ, উত্তম অধম, সৎ অসৎ যা-ই হোক না।

দ্বিতীয় অর্থ, (২) শুভঙ্করী সৃষ্টি।

প্রথমোক্ত সংজ্ঞাটি নেহাৎ অভিধানগত—শিক্ষাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অচল। দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিই গ্রহণ-যোগ্য এবং সর্বজনগ্রাহ্য।

সংখ্যা গরিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্‌গণের মতে শিল্প, সঙ্গীত, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, বিজ্ঞান এবং এ-জাতীয় বিষয়গুলিই সৃজনানুকূল ও শিক্ষণীয় বিষয়। চিত্রশিল্পী নূতন চিত্র এঁকে নূতন জিনিসের সৃষ্টি করছেন, ভাস্কর পাথর খোদাই করে নূতন মূর্তি গড়ছেন, সুরকার নব নব সুরঝঙ্কার সৃষ্টি করছেন, বৈজ্ঞানিকের নূতন আবিষ্কার মানুষকে নূতন সম্পদ-সমৃদ্ধির সন্ধান দিচ্ছে। সুতরাং এঁরাই হচ্ছেন সৃজনকারী। জাতীয় ঐতিহ্যের সঞ্চয়ে এঁদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত। আবার শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-সুরসৃষ্টি ইত্যাদির ভিতর দিয়েই মানুষের সহজাত ক্ষমতারও স্ফুরণ হচ্ছে। সে দিক দিয়েও এ-বিষয় গুলির শিক্ষণ-অনুশীলন সৃজনাত্মক। কিন্তু এই কি সব? নূতন সৃজনের সম্ভাবনা কি শুধু এই নির্দিষ্ট বিষয়গুলির গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ? মতান্তরে, এবং সেই মতের গুরুত্বও উপেক্ষণীয় নয়, যারা দার্শনিক, যারা কবি, এমন কি যারা ব্যবসায়ী, যারা শাসক তারাও কোনও না কোন প্রকারে নূতন সৃষ্টিদ্বারা মানুষের মানস-পুষ্টি অথবা সামাজিক প্রগতির সহায়তা করছে। সুতরাং তারাও সৃজক।

এতোদিন অবধি সৃজনধর্মী শিক্ষক ও শিক্ষণের কথাই শুনা যেত। সৃজনধর্মী শিক্ষার পুরোপুরি দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল শিক্ষকের উপর। শিক্ষণ-পদ্ধতিকে ধরে নেওয়া হত সৃজনকারী-শিক্ষার মাধ্যম বা বাহন। যে শিক্ষার্থী তারও যে কিছু করণীয় আছে—সে কথাটা যেন ছিল নেহাৎই গৌণ। আধুনিক শিক্ষা-বিচিন্তায় একটা পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। সৃজনাত্মক শিক্ষণের পরিবর্তে সৃজনাত্মক শিক্ষার কথাও ভাবা হচ্ছে। যিনি শিক্ষা দান করছেন তাঁর একার দায়িত্বই সবটা নয়, যে শিক্ষা গ্রহণ করছে তারও দায়িত্ব আছে—এবং যথেষ্ট পরিমাণেই। অর্থবিহীন, বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক-শূন্য কতকগুলি তথ্য বা সংবাদ সংগ্রহ প্রকৃত শিক্ষা নহে। এমন বহু তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষাভিমানী ব্যক্তি আছে যাদের তথ্যের ঝোলা অপরিমিত ভারী। বহু বইয়ের নাম, বহু লেখকের নাম ধাম, বহু ঘটনার পঞ্জী, বহুবিধ সংবাদ সমাচার এদের নখাগ্রে। কিন্তু এরাই কি প্রকৃত জ্ঞানী? আদৌ নয়। প্রকৃত জ্ঞান অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত এবং বাস্তবের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। এইরূপ নয় বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী স্নাতক আক্ষেপোক্তি করেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত বিষয়গুলি এবং তৎলব্ধ তথ্য বা জ্ঞান পরবর্তী জীবনে বড় একটা কাজে লাগে না। অভিযোগটি সর্বৈব সত্য, এবং তার কারণ এই যে এ-দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সৃজনাত্মক শিক্ষার বিশেষ কোন মর্যাদা নাই। গতানুগতিকের গণ্ডী অতিক্রম করে নূতন সৃজনধর্মী পথে শিক্ষার ধারাকে প্রবাহিত করার দুঃসাধ্য ব্রত কে গ্রহণ করবে? বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শিখলাম তারই উপর সবটা গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কি করে শিখলাম তার উপর বিশেষ কোন গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছে না। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সৃজনধর্মী শিক্ষার দিকে কোন নজর দেওয়া হয় নি, এবং অর্জিত বিদ্যা অনেকটাই হয়েছে কৃত্রিম ও যন্ত্রচালিতবৎ—জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সহিত যোগাযোগবিহীন।

কি শিক্ষা-দাতা, কি শিক্ষা-গ্রহীতা উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী-ই যেন নেতি বাচক। ধরে নেওয়া হচ্ছে কতকগুলি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করার নামান্তর-ই শিক্ষা। আগাগোড়াই শিক্ষার্থী এই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হবার প্রয়াস করছে, আর শিক্ষক তাকে সে প্রতিবন্ধক অতিক্রমণে সহায়তা করছেন। এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে শিক্ষার্থীর মনে, ফলে শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাপারটি তার পক্ষে একটা আতঙ্ক ও পরাজয় সুলভ অভিজ্ঞতায়

পর্যবসিত হচ্ছে। এই ভ্রমাত্মক মনোভাবের নিরসন আবশ্যক। অভিজ্ঞতাই জ্ঞান এবং সন্নিকৃষ্ট জ্ঞানই শিক্ষা। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বিতরণ ও আহরণের প্রয়াসকেই বলা হয় শিক্ষা। অজ্ঞাত অথবা আংশিক জ্ঞাত হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ পৃথিবীর বুকে বিচরণ করছে। তীব্র শীত, প্রচণ্ড উত্তাপ, দাবানল, দিগন্তপ্লাবী বন্যা, ভূকম্পন, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি কতো নৈসর্গিক উপপ্লব, খেয়ালী প্রকৃতির কতো বিচিত্র পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই না মানুষকে তার যাত্রাপথে অগ্রসর হতে হয়েছে। আজকের মানুষের সামুদায়িক জ্ঞান সেই যুগ-যুগান্তের অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বল্পস্থায়ী জৈব-জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে প্রকৃতির অনন্ত লীলার রহস্য-সন্ধানেরই আর এক নাম শিক্ষা। মানুষের সম্মুখে প্রকৃতির অনন্ত প্রশ্ন। পদে পদে মানুষের ভুল, আর ভুল-সংশোধনের নিরন্তর চেষ্টা। ভুল আর ভুল-সংশোধনই মানুষের অভিজ্ঞতার সম্পদ। শিক্ষা-সাধনায় সপ্রশ্ন কৌতূহলী মন একান্তই অপরিহার্য। শিক্ষা-সাধনার সুদীর্ঘ পথে চলমান পথিকের পঞ্চেন্দ্রিয়, অনুভূতি ও কল্পনা সদা জাগ্রত, সদা উন্মুখ থাকা চাই।

শিক্ষার্থীর আত্মজিজ্ঞাসাই শিক্ষার্থীর অন্তঃপ্রেরণা। কি ও কেন—এই প্রশ্নই সতত শিক্ষার্থীর মনকে জ্ঞানমুখী করে রাখে। তোতাপাখীর বুলির মত অর্থহীন, অ-হেতুক ও কার্যকারণসম্পর্ক-বিচ্যুত কতকগুলি তথ্যাহরণই কি শিক্ষা? অথচ, শিক্ষার নামে এই মেকী বস্তুই সারা দুনিয়ায় চড়া দামে বিকোচ্ছে।

"পিটার প্যানের" (Peter Pan) ছড়াগানটিতে কী সুন্দর ভাবেই না এই মেকী শিক্ষার অন্তঃসারহীনতা ধরা পড়েছে।

"I won't grow up
I don't wanna go to school
Just to learn to be a parrot
And recite a silly rule."
আমি চাই না বড় হতে,
আমি চাই না স্কুলে যেতে।
আমি তোতা পাখীর বোকা বুলি—
চাই না শিখিতে।

কথাটা কি সত্য নয় যে, যে ব্যক্তি শিক্ষাশেষে বিদ্যা জাহির করবার উপযোগী কতকগুলি চমৎকার বুলি কপচানোর কৌশল আয়ত্ত করে বেরিয়ে এল, সে হেন ব্যক্তি আর ঐ খাঁচায় আবদ্ধ হরবোলা পাখিটার মধ্যে একটা অতি নিকট সাদৃশ্য বিদ্যমান। কি বলে যাচ্ছে তার অর্থ ও তাৎপর্য এরা কেউ-ই জানে না—এদের জানবার অবকাশ নেই।

কারু কারু মতে কেউ কাউকে কিছু শেখাতে পারেনা। অপরকে কোন কিছু বিষয় শিখতে এবং জানতে সাহায্য করা যায় মাত্র। বেশ কথা, কিন্তু শেষ কথা নাও হতে পারে। ফল কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষণ ও শিক্ষাগ্রহণ, পাঠদান ও পাঠগ্রহণ হবে পরস্পরের পরিপূরক। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকবে স্বাভাবিক দেওয়া-নেওয়ার সম্বন্ধ। ভাব ভাবনা তত্ত্ব ও তথ্যগুলি হবে বাস্তব অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক। সৃজনধর্মী শিক্ষার এটাই প্রধান কথা।

'জয় দিয়াই জয় করা সম্ভব। পরাজিত করিয়া কেহ কাহাকে জয় করিতে পারে নাই। ইংরেজ যদি ভারতবর্ষকে জয়ী করিতে পারিত, সে আজ এমন বীভৎস পরাজয়ের বেদনা লইয়া এদেশ হইতে চলিয়া যাইত না।'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডাইরী

১১. ১০. ১৯৫৭

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে

॥ অধ্যাপক সুহৃৎচন্দ্র মিত্র ॥

বৌদ্ধধর্মে দুঃখ কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে জন্ম মানেই দুঃখ। সেই দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে হলে আগে জানতে হবে দুঃখের কারণ কি? সেই কারণ অপসারণ করলে তবেই দুঃখ দূর হবে। কি করে তা করা যায় তার নানা উপদেশই বৌদ্ধধর্মের সার। বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অবস্থায় সঙ্ঘের বাহিরে বৌদ্ধধর্ম থাকতে পারত না। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের প্রথম সোপান "কল্যাণমিত্র" বা গুরুর কাছে ত্রিরত্নের প্রতি বিশ্বাসের দীক্ষা নেওয়া। এ জাতীয় গুরুবাদ হিন্দুধর্মেও ছিল এবং আছে। ত্রিরত্ন অর্থাৎ বুদ্ধ, সঙ্ঘ ও ধর্মে একরকম অন্ধ বিশ্বাস নিয়েই শ্রমণ-জীবন সুরু করতে হত। 'ক্ষণিকত্ব', 'আত্মার অনস্তিত্ব', 'নিরীশ্বরত্ব' গৌতম বুদ্ধ প্রধানত এই সব তত্ত্বই প্রচার করে গেছেন।

এই তত্ত্ব সমূহের দার্শনিক ভিত্তি বা ন্যায্যতা সম্বন্ধে বিচার করা আমার উদ্দেশ্য নয়, করবার অধিকারীও আমি নই। সম্প্রতি একজন অধ্যাপিকার সঙ্গে—যিনি সর্ব্বাস্তিবাদ বৌদ্ধমত সম্পর্কে গবেষণায় রত আছেন—দিনকতক কিছু আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। সাধারণ মানুষ হিসেবে এই ধর্ম সম্বন্ধে দুই একটি কথা যা আমার মনে হয়েছে তাই লিখছি। নতুন কথা সম্ভবত কোনটাই নয়।

প্রথম মনে হল বৌদ্ধধর্ম সাধারণের ধর্ম নয়। অসাধারণ ধীসম্পন্ন, অতি সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণপটু, অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তি ছাড়া কেহই এই ধর্মের গূঢ় তাৎপর্য্য উপলব্ধি করতে পারে না, এতে আকৃষ্ট হতে পারে না। কারণ কেবলমাত্র বুদ্ধি, জ্ঞানই হল এই ধর্মের একমাত্র ভিত্তি। তাই বুদ্ধদেবের প্রথম কাজই হয়েছিল উপযুক্ত মেধাবী লোক বেছে নিয়ে সঙ্ঘের সৃষ্টি করা। বুদ্ধ নিজেও সমাজের উচ্চস্তরের লোক ছিলেন। তাঁর অনেক শিষ্যও তৎকালীন উচ্চবংশীয় হিন্দুদের পরিবার থেকেই আসতেন। সঙ্ঘের অনেক নিয়মাবলী ছিল, ethical hierarchy অনুযায়ী একটা স্তর-ভেদ ছিল। সংঘের মধ্যে 'অর্হৎ'দের স্থান সবচেয়ে উঁচুতে ছিল। বুদ্ধের কোন কোন

শিষ্যও (শারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়ন বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই গত হন) অর্হৎ ছিলেন। উচ্চস্তরের অর্হৎ না হলে বোধিলাভের অধিকারী কেউ হতে পারে না। বুদ্ধির দিক থেকে এবং অর্থের দিক থেকে যাঁরা আভিজাত্যের দাবি করতে পারতেন,—aristocracy of intellect and aristocracy of wealth—তাঁরাই প্রথমে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম শ্রমণ ব্যতীত কেউ গ্রহণ করতে পারতেন না। এই সব সহায়ক বিশ্বাসীদের 'উপাসক' বলা হত। সম্রাট অশোক ও হর্ষবর্দ্ধন 'উপাসক' ছিলেন—শ্রমণ নয়। এই প্রচারের মধ্যে তর্ক, যুক্তি, যুক্তিখণ্ডন, বাগবিতণ্ডা, কলহ প্রভৃতির যথেষ্ট সন্ধান পাওয়া যায়। বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে রাজগৃহে, বৈশালীতে, পাটলিপুত্রে, গান্ধারে কবার সভা (synod) বসল। ৩০০ বছরের মধ্যেই আমরা বৌদ্ধধর্মের অন্তত ১৮টি শাখার সন্ধান পাই। এগুলি সারা ভারতে ছড়ায় ত বটেই, কালক্রমে কোন কোন শাখার অস্তিত্ব ভারতে লুপ্ত হলেও ভারতের বাইরে আশ্রয় ও পুষ্টিলাভ করে। ভারতের বাইরে চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, শ্যাম প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধ মত ছড়িয়ে যায়। আজকের দিনে সে সব দেশের বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এক একটি দেশেই অনেকগুলি শাখার সৃষ্টি হয়েছে। তাই আদি বৌদ্ধধর্মের এখন শাখা প্রশাখা যে কত তা গুণে বলা যায় না। প্রত্যেক শাখাই দাবী করে যে তার দৃষ্টিভঙ্গিই বুদ্ধদেবের যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। গৌতমবুদ্ধের জীবিতকালে তখনকার প্রচলিত হিন্দু রীতিনীতির বিরুদ্ধে এবং প্রধানত ঈশ্বরকারণবাদ ও আত্মার অস্তিত্ববাদের বিরুদ্ধেই এই আক্রমণাত্মক অভিযান চালিত হত। পরে নানা কারণে এই অভিযান বাইরের দিকে চালাবার প্রয়োজন এবং প্রেরণা কমে আসাতে নিজেদের মধ্যেই পরস্পরকে আক্রমণ করে বিভিন্ন শাখার মধ্যেই Battle of wits—'বুদ্ধির যুদ্ধ' চলতে লাগল।

অধ্যাপিকার সঙ্গে আলোচনায় জানলুম এবং কয়েকখানা প্রামাণ্য বই-এতেও দেখলুম কোন জিজ্ঞাসু কোন গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বুদ্ধদেব নীরব থাকতেন, জবাব দিতেন না। আমার কাছে এ ব্যাপারটা যতই বিসদৃশ মনে হোক বুদ্ধদেবের ঐ রকম ব্যবহারের নিশ্চয়ই যথেষ্ট কারণ ছিল। হতে পারে জিজ্ঞাসু উত্তরের গভীর রহস্য উপলব্ধি করতে পারবে না, তাই তিনি জবাব দিতেন না, নিরুত্তর থাকতেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক

সময় ঐ রকম আচরণ করাই হয়ত যুক্তিযুক্ত। সকলেরই এ অভিজ্ঞতা আছে অনেক অর্বাচীন এবং নির্বোধ ব্যক্তি এমন অনেক প্রশ্ন করে বসে যে গুলো প্রশ্নই নয়, যার জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে জবাব না দিয়ে যা বলছি মেনে নাও বলাই কর্ত্তব্য, তাছাড়া অন্য কিছু করা যায় না। কিন্তু বুদ্ধদেবের কাছে যাঁরা জিজ্ঞাসু হয়ে যেতেন, তাঁরা অনেকেই বুদ্ধির দিক থেকে খুবই উচুঁদরের লোক—তাঁদের প্রশ্নও তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্রেরই প্রশ্ন। উপরোক্ত কারণে তাঁদের জবাব দিতেন না এটা মনে করা কি ঠিক হবে? কিন্তু তা যদি না হয় তা হলে ত একটা বড় প্রশ্ন থেকে যায়। বুদ্ধির প্রাধাণ্যই প্রাচীন মতের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সাধারণই হোক বা অসাধারণই হোক—মানুষমাত্রেরই বুদ্ধি ছাড়া অন্য হৃদয়বৃত্তিও থাকে এবং বুদ্ধির মত তারাও অনেক দৈনন্দিন কাজের, সামাজিক কাজের প্রেরণা যোগায়। পুরাকালের মানুষদের যে সে সব বৃত্তি ছিল না এমন মনে করবার কোন কারণ নেই। বরং অন্য সব হৃদয় বৃত্তির প্রাবল্য যে বেশীই ছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

দুঃখের কারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝলেই কি দুঃখকে জয় করা যায়? অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবার আগেই শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছিলেন। দেহী মাত্রই মৃত্যুর অধীন সুতরাং মৃত্যুতে শোক করবার কিছু নেই তা তিনি বুঝেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রিয় পুত্র অভিমন্যু যুদ্ধে হত হয়েছে যখন শুনলেন, তখন শোকে কি রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সব হৃদয় বৃত্তিকে মনের দুর্বলতা মনে করে চিরকাল দমন করে রাখবার চেষ্টা করলে কোন না কোন সময়ে তার ফল ভোগ করতেই হয়। রুদ্ধ হৃদয়াবেগ একদিন দুর্বার শক্তির সাহায্যে সব বাধা ভেঙ্গে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে। মনের মধ্যে নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে নিজেকে আবার প্রতিষ্ঠিত করে। নদীর দুরন্ত স্রোত যেমন পাড়ের বন্ধন লঙ্ঘন করে গ্রাম গ্রামান্তর ভাসিয়ে দিয়ে নিজের পথ নিজে করে নেয়। একের জীবনে যেমন, বহুর জীবনেও তাই। এই সব হৃদয়বৃত্তির তাড়নায় 'হীনযান' ক্রমে 'মহাযানে' পরিণত হল বলা যায়। মহাযানে ভক্তিশ্রদ্ধার স্থান আছে, মর্য্যাদা আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র ত নেই। ঈশ্বর নেই, দেবতা থাকলেও তাঁরা ভক্তির পাত্র নন। সেই জন্যে বুদ্ধদেবই ক্রমে সেই শূন্য স্থান অধিকার করলেন। বুদ্ধদেব দেবতা হলেন, ভগবানের অবতার

হলেন। দার্শনিক ভিত্তিগত প্রভেদ থাকলেও আচার ব্যবহারে, রীতিনীতিতে হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিশেষ কোন পার্থক্য তখন বৌদ্ধধর্মের আর রইল না। চীন, তিব্বত, জাপান, নেপাল, মঙ্গোলিয়ায় মহাযানী মতই বর্ত্তমানে প্রচলিত। তাঁরা বুদ্ধের তথা বহু দেব দেবতার পূজা করেন। প্রাচীন পন্থী হীনযানীরাও ভারতবর্ষ ছেড়ে দেশান্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। ব্রহ্মদেশ, চট্টগ্রাম, সিংহল, শ্যাম প্রভৃতি দেশে হীনযানী বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এখনও আছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখা দরকার যে, ঐ সব বিভিন্ন দেশবাসী বৌদ্ধেরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত, পরস্পরের মধ্যে মতভেদ যথেষ্টই বিদ্যমান।

মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখে গৌতমবুদ্ধ দুঃখ কষ্টের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অনেক সাধনার পর এক পূর্ণিমার রাত্রে গয়ার এক অশ্বত্থ বৃক্ষতলে বসে তিনি দুঃখের কারণ বুঝতে পারেন। পৃথিবীতে জন্মই দুঃখের আদি কারণ। জন্মাবার 'তৃষ্ণা' সকলেরই থাকে—সেই তৃষ্ণা দূর করতে পারলে দুঃখকে অতিক্রম করা যায়। এই তৃষ্ণা নিবারণের উপায় দেখিয়ে দেবার জন্যে প্রয়োজন হল সংঘের সৃষ্টি, ধর্মের ব্যাখ্যা, দার্শনিক তত্ত্ব, মনের বিশ্লেষণ, স্কন্ধ, আয়তন, ভূত প্রভৃতির অবতারণা, অনিত্য, অনাত্মা, নিরীশ্বর প্রভৃতি তত্ত্বের প্রচার। সংঘের মধ্যে থেকে কঠোর নিয়মাবলী পালন করে যাঁরা অর্হৎ হতে পারবেন তাঁরাই নির্বাণ লাভের অধিকারী। সাধারণ লোকেদের তিনি কেবলমাত্র মধ্যপথ অবলম্বনের উপদেশ দিয়ে গেছেন। বুদ্ধের জীবনী থেকে দেখা যায় কিন্তু যে বুদ্ধদেব দুঃখ ও তা থেকে মুক্তি সম্বন্ধে তাঁর যুক্তি এবং দৃঢ়মত প্রচার করলেও ব্যবহারিক জ্ঞান ও কর্ম-পন্থাকে অস্বীকার করেন নি বা করতে পারেন নি।

আজকাল আমাদের দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যে আকার ধারণ করেছে তাতে মনে করা হয়ত অসঙ্গত নয় যে, এ দেশে আজ জন্মানই দুঃখ। যিনি জন্মাবেন তাঁকে হয়ত চিরকাল দুঃখভোগ করেই যেতে হবে। সে কথাটা মেনে নিলেও জন্মমাত্রই দুঃখের কারণ এ কথাটা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে দ্বিধা আসে। পৃথিবীতে দুঃখ আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই কিন্তু দুঃখ দূর করবার অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্যও ত আবিষ্কৃত হচ্ছে; কষ্ট কমাবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টার ত বিরাম নেই। অনেক কষ্ট লাঘব হয়েছে আবার অনেক নতুন কষ্টের যে সৃষ্টি হয়েছে সে কথাও স্বীকার্য্য। এই কষ্ট লাঘব করবার চেষ্টার মধ্যেও ত প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। তাছাড়া এই সুন্দর

পৃথিবীতে জলে, স্থলে, নিসর্গে আনন্দের উপাদান ছড়িয়ে রয়েছে। কবিরা সে আনন্দ তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। সাধারণ মানুষও ক্ষণিকের জন্যও মুগ্ধ হয়। শিশুর হাস্যে, মাতার স্নেহে, কৈশরের ক্রীড়াকৌতুকে, সৃষ্টি-মূলক কাজে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, বিজ্ঞান চর্চ্চায়, কর্ত্তব্য পালনে আনন্দ কি নেই? দেশকে স্বাধীন করবার জন্য যে সব বরেণ্য দলবদ্ধভাবে অত্যন্ত বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে এগিয়ে গিছলেন, আদর্শলাভের আনন্দের আভাসই তাঁদের প্রেরণার উৎস ছিল। কারুর জীবন দুঃখময়, কারুর সুখময়, অধিকাংশেরই সুখ-দুঃখ মিশ্রিত. জীবন। দুঃখও যতটা বাস্তব এবং যতটা কাল্পনিক, সুখও ঠিক ততটাই বাস্তব এবং ততটাই কাল্পনিক। সুখের আস্বাদ না পেয়ে থাকলে, সুখের কল্পনা না থাকলে দুঃখকে দুঃখ বলেই ত চেনা যায়না। একথা সত্যি, আমরা অনেক সময় ভুল করি। সুখ মনে করে দুঃখই চেয়ে বসি। তেমনি অন্যদিকে আপাত দুঃখের মধ্য দিয়ে অনেক সময় সুখই আসে। সুখে, দুঃখে সমে কৃত্বা যে অবস্থা তা আনন্দের অবস্থা—দুঃখের নয়, পূর্ণতার অবস্থা, শূন্যতার নয়। মহাপুরুষদের জীবনী পাঠে এই ধারণাই ত হয়। বুদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁর মতামত দেখে মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে তাঁর নিজের মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব ছিল।

বুদ্ধদেবের ধর্মতত্ত্বে, সংঘ সৃষ্টিতে এবং প্রচার কার্য্যের ধরণধারণে, সবের মধ্যেই যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। তিনি নিজে রাজার বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাই তাঁর সহচর ছিলেন। আভিজাত্যের আবহাওয়ার মধ্যেই তিনি বর্দ্ধিত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেবকে মানুষ হিসেবে দেখলে একথা কি বলা যায় না যে, তাঁর কাজে, অর্থাৎ তাঁর এই নতুন ধর্ম-সৃষ্টিতে তাঁর সেই পূর্ব্বেকার অভিজাত পরিবেশের প্রভাবই বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

সকলকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে মনে যে কথার উদয় হয়েছে এবং যে ভাব জেগেছে এই প্রবন্ধে সেইগুলোই শুধু লিপিবদ্ধ করেছি। কোন গভীর তত্ত্ব গভীর ভাবে আলোচনা করবার বিন্দুমাত্র প্রয়াস করি নি।

লক্ষ্মীর উপকথা[১]

॥ অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত ॥

বৈষ্ণবদর্শনের আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্মীতত্ত্বে এসে পৌঁছেছি। আগে জানতুম না লক্ষ্মীর ভিতরকার এত গভীর তত্ত্ব—এত মহিমা।

ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর ঘট পাতা দেখেছি—প্রতি বৃহস্পতিবারে সন্ধ্যায় লক্ষ্মীর ব্রতকথা পড়তে শুনেছি। তার মধ্যে শুনেছি, ঘরের মেয়েদের মধ্যেই লক্ষ্মী আছেন, তাঁরাই ঘরের লক্ষ্মী। এই জন্যই তাঁদের সব সময় এমন ভাবে আচরণ করতে হয়, এমনভাবে কথা বলতে হয়—এমনভাবে চলতে ফিরতে উঠতে বসতে, হাসতে কাঁদতে হয় যাতে অলক্ষ্মী এসে প্রবেশ করবার সুযোগ না পায়। অলক্ষ্মীতে একবার ছুঁয়ে দিলেও নারীর মহিমায় দাগ পড়ল।

সত্য-মিথ্যা কিছু জানতুম না—কিন্তু কথাগুলো শুনতে ভাল লাগত। এখন শাস্ত্র পড়ে দেখছি, শুধু এটুকু কথা নয়, আরও বড় বড় অনেক কথা।

লক্ষ্মীর একরূপে তিনি ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যে কান্তিরূপিণী ও শান্তিরূপিণী হয়ে ছড়িয়ে আছেন, আর এক রূপে তিনি নিত্য বিষ্ণুবক্ষো-বিলাসিনী। সে কথার অর্থ কি? অর্থ হ'ল, লক্ষ্মী বিষ্ণুর সমবায়িনী শক্তি, বিষ্ণুর স্বরূপের সঙ্গে তাই চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মত অচ্ছেদ্যরূপে জড়িয়ে আছেন। নিষ্ক্রিয় পুরুষেও তিনি নৈমিত্যরূপা—আনন্দদায়িনী। করুণায় বিগলিতা সেই লক্ষ্মীরই ছায়া পড়ে আমাদের মাটির ঘরে ঘরে—ঘরে ঘরের লক্ষ্মী-রূপিণীদের দেহে মনে। তাঁরাও তাই একাধারে শক্তিরূপিণী, কান্তিরূপিণী, শান্তিরূপিণী।

সত্য-মিথ্যা জানি আর না-ই জানি, মানি আর না-ই মানি—শুনতে ভাল লাগে, মনটা বেশ ভ'রে ওঠে। তা-ই ত চাই, ঘরে ঘরে সব লক্ষ্মীরূপিণী।

পড়েই চলছি, ভেবেই চলছি—লিখেই চলছি। বেশ জ'মে উঠেছি। শাস্ত্র ত বেশ বলে, জানি না মানি না কেন সে-সব কথা?

ভাবের স্রোতে আচমকা ঘা দিলেন ঘরের লক্ষ্মী। সঙ্গে বার তের বছরের একটি মেয়ে। ঘরের লক্ষ্মী বলেন,—'এ মেয়েটাকে কয়েক দিন

রেখে দেখলে কেমন হয়? ওর মা এই পাড়াতেই কাজ করে, এ-ও সব কাজ জানে; যেটা না জানে শিখিয়ে বুঝিয়ে নেব।'

কয়েক দিন যাবৎ বাড়িতে ঝির 'সঙ্কট' চলছে। ভাল যেটি আসে দু'দিন কাজ ক'রে বেশি মাইনেতে পাশের বাড়ি চলে যায়, যেটি টেকে সেটি টেকে, ব'লেই হয়ত ঘরের লোকের তেমন পছন্দ নয়। অতএব একটা 'সঙ্কটাবস্থা'; আর পরিবারের অন্য কোনও সঙ্কট হয়ত টের না পেলেও না পেতে পারি, কিন্তু ঝির সঙ্কট হ'লে টের না পেয়ে থাকবার কোনও উপায়ই নেই।

মেয়েটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম। একটা ময়লা ইজার ও খানিকটা সেলাই করা একটা ফ্রক পরণে। চুলগুলো বহুদিন তেল না পেয়ে রুক্ষ কটা, মুখখানা একটু শুকনো শুকনো। কিন্তু চলনে কর্মতৎপরতার এবং চোখে মুখে বুদ্ধির পরিচয় আছে। বললুম,—'তোমার নাম কি?'

মুখখানি নিচু ক'রে মেয়েটি অস্ফুট কণ্ঠে বলল,—'লক্ষ্মী'।

'লক্ষ্মী? তা তো হ'তেই হবে। সেই যে ঘরে ঘরে লক্ষ্মী—তা গিন্নী রূপেই হোন আর ঝির রূপেই হোক। ঠিক মিলে যাচ্ছে—শাস্ত্রের কথা বাবা—বেঠিক হবার উপায় আছে?'

ঘরের লক্ষ্মী সহসা রুদ্রাণীতে পরিণত হ'ন; সোজা সোজা সঙ্কল্প জানান শাস্ত্র দিয়ে কয়লার উনুন ধরাবার। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুভাব ত্যাগ করে ভোলা মহেশের ভাবান্তর গ্রহণ করি,—বলি, 'বেশত, কয়েকদিন রেখেই দেখ না; দেখে ত ভালই লাগছে।'

লক্ষ্মী ঝি রূপে গৃহে প্রবেশ করল।

আশ্চর্য কিন্তু মেয়েটা। ক'দিনেই ঘরের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইজার-জামা কেচে পরিষ্কার ক'রে নিয়েছে। পরিত্যক্ত ভাঙা চিরুণী দিয়েই কটা চুল গুলোর জটা ছাড়িয়ে নিয়েছে। দেখতে কিছু সুন্দরী নয়, ময়লা রঙ, একটু ছিপ্‌ ছিপে ধরণের চেহারা। একটু ছোট চোখ, কিন্তু টানা দৃষ্টি। কাজে মেয়েটা যেমন চতুর তেমন পরিষ্কার। যে-কাজটা একবার বুঝিয়ে দেওয়া হয় সেটা আর কোনোদিন ব'লে করাতে হয় না। ডাক দিলে অমনি একপায়ে খাড়া, অথচ চলতে ফিরতে পায়ের শব্দটি নেই। কাজে কর্মে বিরক্তি নেই, মুখে হাসিটি লেগেই আছে।

একদিন গৃহিণী বললেন,—'বস্তির ছোট ঘরের মেয়ে হ'লে কি হবে,

মেয়েটা কিন্তু সত্যি ভাল; ওর নামেও লক্ষ্মী—কাজ-কর্ম, চলন-ফেরন, কথা-বার্তা—সবটাতেই লক্ষ্মী।' আমিও সে-জিনিসটা দেখেছি; যা দেখছি আর শুনছি তাতে মনটা খুশি হ'য়ে উঠল। শাস্ত্রের সঙ্গেও যে মোটামুটি মিলে যাচ্ছে—নারীই লক্ষ্মী—ঘরে ঘরে লক্ষ্মী।

উৎসাহী হ'য়ে আমার স্ত্রী তাকে কিছু লেখা-পড়ার বই দিলেন, খাতা কালি কলম দিলেন, তারও মহা উৎসাহ; মুক্তার মত হ'য়ে উঠতে লাগল তার হাতের লেখা, অধিকার দেখাল সে তার বিদ্যাচর্চায়। আমার স্ত্রী তাকে কিছু কিছু সেলাইয়ের কাজ শিখিয়ে দিলেন, সে দু'দিনে সূক্ষ্ম ফোঁড় দিয়ে নক্সা তুলতে শিখে গেল। সত্যি আশ্চর্য মেয়েটা!

কথা-প্রসঙ্গে একদিন গৃহিণী বললেন,—'দেখ, মেয়েটার অদ্ভুত গুণ; ওকে ঘরের মেয়ের মত লেখা-পড়া শিখিয়ে দিলে বেশ কিন্তু মানুষ ক'রে দেওয়া যায়।'

কথাটা শুনে ভাল লাগে, মনে একটা নোতুন পরীক্ষার রঙীন স্বপ্ন জাগে। বস্তির এই মেয়েটাকে ঘরের মেয়ের মত লালন-পালন করে লেখা-পড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে দিলে কেমন হয়? আমার স্ত্রীকে আমি গম্ভীরভাবে বলি,—'সত্যি তুমি তাই কর না।'

সমান গম্ভীর ভাবেই তিনি একটু ভেবে জিজ্ঞাস করেন,—'বিয়ে-থা'র কি ব্যবস্থা হবে? তখন ত আর বস্তির ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া যাবে না।'

আমি বলি,—'তুমি ওকে মানুষ ক'রে দাও, আমি ওকে টাকা খরচ করে ভাল বরে বিয়ে দিয়ে দেব।'

নিজের স্বভাবের গুণে আর আমাদের স্নেহে লক্ষ্মী দেখতে দেখতে আমাদের ঘরের মেয়েই হ'য়ে ওঠে। আমরাও সকলে তাকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে ডাকি, কথা বলি; সেও আমাদের কাছে আবদার ক'রে—অভিমান করে। আমার স্ত্রী আবার কিছু দিন হ'ল তার ফ্রক ছাড়িয়ে নীল শাড়ি ধরিয়েছেন।

...   .

একদিন দেখলুম সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী একটি বয়স্কা ঝির সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা কইছেন। ভাবলুম ব্যাপার কি?

ঝিটি চ'লে গেলে ভুরু কুঁচকে স্ত্রীকে জিজ্ঞাস করলুম, 'তুমি কি লক্ষ্মীকে

একেবারেই ঘরের মানুষ ক'রে নিচ্ছ নাকি ? ঘরের কাজের জন্য অন্য ঝি দেখছ বুঝি ?'

'কেন ?'

'দেখলুম যে সিঁড়ির গোড়ে দাঁড়িয়ে একটি ঝির সঙ্গে অনেক কথা বলছ। সব জিনিসই একটু র'য়ে স'য়ে করতে হয়, অত ঝট্‌পট্‌ ক'রে কিছু ক'রো না।'

স্ত্রী বললেন,—'আরে ওত লক্ষ্মীর মা।'

'ওঃ—তাই নাকি ? কি ব'লে সে ?'

'বলে, লক্ষ্মী নাকি রাত্রে বাড়িতে শুতে যায় না।'

'এ্যাঁ—বাড়িতে যায় না ? কোথায় যায় ?'

'যায় এই পাশের বস্তিতে দুলালের মার কাছে—সে ওর মাসি মা।'

'তাই বল, তোমার কথা শুনে আমি যে প্রথমে একেবারে আঁতকেই উঠেছিলুম। তা মাসির বাড়ি যদি কাছে হয় ত মাসির কাছে থাকতে দোষ কি ?'

'মাসি ত পাতান মাসি ; সেখানে থাকে মার তা ইচ্ছে নয়।'

আবার ভুরু কুঁচকে বললুম,—'ও সব পাতানো মাসিতে কাজ নেই ; মা ত তা হ'লে ঠিকই বলছে, বড় মেয়ে ওর ত রাত্রে বাড়িতে বাপ-মার কাছেই চলে যাওয়া উচিত। তুমি ওকে বুঝিয়ে ব'লে দাও। বাড়ি যদি একটু দূরে হয়, রাত্রে একা যেতে ভয় করে ত ওকে সন্ধ্যার আগেই ছেড়ে দিও।'

আবার কিছু দিন যায়। আবার একদিন সিঁড়ির গোড়ে কথা শুনি ঝিদের—এবারে একজন নয়, দু'তিন জন। তারা লক্ষ্মীকে ডেকে বোঝাচ্ছে আর ধমকাচ্ছে—কেন সে রাত্রে যায় না বাড়ি।

কথাটা কানে যেতে ভয়ানক বিশ্রী লাগতে লাগল। স্ত্রীকে ডেকে বললাম,—'দেখ, এ-সব ব্যাপার কি ? আমি কিন্তু এ-সব মোটেই ভালোবাসি নে। লক্ষ্মী এখনও বাড়ি যায় না কেন ?'

'ও বলে, দুলালের মা-বাবা ওকে ভালোবাসে।'

শুনে আমি আরও ক্ষেপে যাই ; বলি,—'এই সব মায়ের থেকে মাসিমার বেশি আদর আমার মোটেই পছন্দ হয় না।'

'আসল কথা শুনলুম পাশের বাড়ির ঝি পাঁচীর মার কাছে ; লক্ষ্মীকে

দুলালের মা-বাবার খুব পছন্দ, ওদের ইচ্ছে ওরা লক্ষ্মীকে দুলালের বউ ক'রে ঘরে নেয়।'

'সে ত খুব ভাল কথা। দুলাল কি ক'রে?'

'শোণ-পাপড়ী ফিরি করে—তাতেই মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা কামাই করে।'

'বেশ ত, তবে সেইখানে বিয়ে দেবার ব্যবস্থা ক'রে দাও না। কাজ নেই আর পরের বড় মেয়ে ঘরে রেখে লেখা-পড়া শিখিয়ে।'

'সেখানে লক্ষ্মীর মা কিছুতেই মেয়ে দেবে না।'

'কেন?'

'কেন আমি কি জানি?' ব'লেই অত্যন্ত বিরক্তভাবে আমার স্ত্রী অন্য ঘরে চ'লে যাচ্ছিলেন। আমি তাকে বাধা দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে বললাম,—'তোমাদের এইসব হেঁয়ালি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না; বুঝতে চাইছিও না; আমার সোদ্দা কথা হ'ল, লক্ষ্মী ঐ বস্তিতে যেতে পারবে না, তাকে তার মা-বাপের কাছেই যেতে হবে।'

দিন দুই পরে দেখলুম, লক্ষ্মী বাড়িতেও যায় না, বস্তিতেও যায় না,—আমাদের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরের এক কোণেই তার থাকবার ব্যবস্থা হয়ে গেছে।

দেখে ভাবলুম, যাক্ তা মন্দ কি? থাকে এখানেই থাকুক।

আবার ক'দিন যায়।

এবারে সিঁড়ির গোড়ায় নয়—বাইরের দরজার পাশে দেখলুম—লক্ষ্মীর মাকে নয়, বাবাকে, চেঁচিয়ে ডাকল,—'লক্ষ্মী আছে?'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বললুম,—'এই একটু আগে আমার স্ত্রীর সঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেছে।'

লক্ষ্মীর বাবা বলল,—'তাকে বলবেন, তার মায়ের খুব অসুখ, আজই বিকেলে একবার যেন দেখতে যায়।'

লক্ষ্মী ফিরে আসতেই কথাটা তাকে বললাম।

তিন দিন পরে আবার বাইরের দুয়ারের পাশে সেই লোকটা, অত্যন্ত রুক্ষ গলায় বিশ্রীভাবে চেঁচামেচি করছে—'লক্ষ্মী—বলি লক্ষ্মী শুনতে পাচ্ছিস্'—

লোকটাকে কেমন যেন কিছুতেই বরদাস্ত করতে ইচ্ছা করে না। বারান্দায় গিয়ে তাকিয়ে দেখি—কেমন পেছন-ফেরান ঝাকড়া-মাকড়া চুল, কপালে

কালো কালো রেখা, গলার গ্রন্থিগুলো স্ফীত—চোখ দু'টো লালচে ঘোলাটে। উপর থেকেই গলা বাড়িয়ে বললাম, 'বাড়ির সামনে অমন ক'রে চ্যাঁচাতে নেই—ডেকে দিচ্ছি'—

প্রায় ভেঙচি কেটেই বলল লোকটা,—'খুব ত বাহাদুরী ক'রে বললেন, চ্যাঁচাতে নেই বাড়ির সামনে; এদিকে যে মাটা মরে যাচ্ছে—মেয়েটাকে এই তিন দিনে পাঠাতে পারলেন না একবার দেখতে'—

তার মানে? লক্ষ্মী তা হ'লে যায় নি তার মাকে দেখতে। চেঁচিয়ে ডাকলুম লক্ষ্মীকে—ছল্ ছল্ চোখে মাথা নিচু ক'রে লক্ষ্মী দাঁড়াল এসে সামনে। জিজ্ঞাস করলুম,—'কিরে, তুই যাস্ নি মাকে দেখতে?'

অপরাধিনীর ন্যায় মাথা নাড়াল সে—জানাল, যায় নি।

'কি রকমধারা মেয়ে তুই, আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি নে; এক্খুনি যাবি তুই তোর বাবার সঙ্গে—মা ভাল হ'লে তবে আবার আসবি।'

কোনো কথা বলে না লক্ষ্মী, যেমন ছিল ঠিক তেমনই মাথা নিচু করে নিচে নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে, রাস্তায় তাকিয়ে দেখলুম—হ্যাঁ চলে যাচ্ছে বাপের সঙ্গে।

মেয়েটার আর সবই ভাল—পরিবার শুদ্ধ সবাই আমরা ওকে ঘরের মেয়েই করে নিয়েছি, কিন্তু বাপ-মায়ের প্রতি এই অবহেলা এবং বিতৃষ্ণা—এ আমার কিছুতেই ভাল লাগছে না। কেনই বা সে এমন করে?

পরের দিন সকাল বেলাই দেখি লক্ষ্মী এসে উপস্থিত। সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই আমার স্ত্রী জিজ্ঞাস করলেন,—কিরে লক্ষ্মী—আজই সকালেই যে আবার ফিরে এলি, মা ভালো হয়ে গেছে?

লক্ষ্মী কোনও কথা বলে না।

সব জিনিসটাই কেমন হেঁয়ালির মত লাগছে।

তিন দিন পরে আবার সেই লোকটা তেমনই এসে উপস্থিত—তেমনি ভাবে চিৎকার ক'রে ডাকাডাকি।

আর ত কিছুতেই ভাল লাগছে না।

আমি কিছু বলবার আগেই জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে আমার স্ত্রী ব'লে দিলেন, 'লক্ষ্মী কাজে আছে—এখন যেতে পারবে না'—

নিচের থেকে জবাব এল,—'ও, মেয়ে আটকাবার ফন্দি? আচ্ছা আমি দেখে নেব।'

আমি আমার স্ত্রীকে বললাম—'বাপ নিতে আসে'—

বাধা দিয়ে স্ত্রী বললেন,—'ওঃ—কি-না আমার বাপ!'—

সে আবার কি!

সন্ধ্যায় আমার এক গাদা প্রুফ এসে গেছে—সেই যে লক্ষ্মীতত্ত্ব লিখছিলুম—বিষ্ণুর নিত্যা সমবায়িনী শক্তি—কান্তি-রূপিণী হ্লাদরূপিণী—তাঁরই ছায়া আবার কায়া ধরে নেমে এসেছে মর্ত্যের ঘরে ঘরে গৃহলক্ষ্মী রূপে—সেই লক্ষ্মীতত্ত্বেরই বই—এত দিনে প্রুফ এসে গেছে।

সেই প্রুফ দেখার ফাঁকে ফাঁকে শুনতে লাগলুম আমার স্ত্রীর কাছে মর্ত্যলক্ষ্মীর কাহিনী—সেটা তত্ত্ব নয়—ইতিহাস। তত্ত্বে আর ইতিহাসে সে কি মর্মান্তিক অমিল!

আমার স্ত্রী শুনেছেন সব কথা লক্ষ্মীর কাছে—লক্ষ্মী শুনেছে সব অজানা কাহিনী তার মায়ের কাছে—বাদবাকি তার নিজেরই জানা।

উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার এক গ্রামে লক্ষ্মীর বাবার বনমালী সাহুর ছিল এক মুদি দোকান। বেশ ভালই চলছিল দোকান আর তার ছোট সংসার। তারপরে এল বিরাট রাক্ষসীর মত হাঁ ক'রে পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ—একদিন বনমালী সাহুর দোকানপাট গেল লুট পাট হয়ে। মাস কয়েক চলল কোনও রকমে; তারপরে উপোসে উপোসে হন্যে হ'য়ে বনমালী সাহু চার বছরের লক্ষ্মী—দু' বছরের এক ছেলে—আর স্ত্রীর হাত ধ'রে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। প্রায় দু'শো মাইল ছেলে-মেয়েকে দুই কাঁধে রেখে হেঁটে এসেছিল এক শহরে—সেখান থেকে বিনে টিকিটে একদিন উঠে পড়ল রেল গাড়িতে কলকাতায় আসবার ভরসায়। খড়গপুরে এসে টিকেট বাবুর কাছে ধরা পড়ে গেল। গেঁয়ো মানুষ—কোনো দিন আসে নি শহরে—ওঠে নি গাড়িতে; হঠাৎ পান্তলুন-পরা কালো কোট-গায় বাবুকে দেখে বেচারা কেমন ভড়কে গেল—ছেলেটাকে কাঁধে ক'রে রেল-লাইনের উপর দিয়েই দিল চোঁচা দৌড়! পেছন থেকে এসে পড়ল হুড়্মুড়্ ক'রে একটা মালগাড়ী—সামলাবার আগেই কাটা পড়ল দু'জনেই—বনমালী আর ছেলেটা।

তারপর? তারপর নটে গাছ মুড়োয়—কিন্তু কথা আর ফুরোয় না—কথা স্রোতের টানে বেড়েই চলে। হাতে টিনের কৌটো আর মালাই নিয়ে দলে ভিড়ে পড়ে মা আর মেয়ে—ঘুরতে ঘুরতে শেষ অবধি 'পরং নিধানং' কলকাতার ফুটপাথ—সে বৈতরণী পার হ'য়ে বস্তি। বস্তিতেই জুটেছে এই

লোকটা। মা-মেয়ে ঝি-গিরিই ক'রে এসেছে—কিন্তু রাত্রে মাথা গুঁজেছে এর আশ্রয়ে। মায়ের এখন বয়েস গিয়েছে—দেহও হাড্ডিচর্মসার; চোখের সামনে ফুটিফুটি করছে এই মেয়েটা; কিছু দিন ধ'রে সেই লোকটার লোভদৃষ্টি পড়েছে এই মেয়েটার উপর—ভয় কখন হাত ছাড়া হয়ে যায়।

আর বেশি শুনতে ইচ্ছে করে না এই মর্ত্যের লক্ষ্মীতত্ত্ব। কথার মাঝখানে ছাতের উপর একটু খোলা হাওয়ায় চলে যাই। দেখি ছাতের উপরে পশ্চিমের যে দিকটায় রাস্তার আলো পড়ে না সেখানটার রেলিং ভর ক'রে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে লক্ষ্মী—ঐটুকু অন্ধকারকে অবলম্বন ক'রে লক্ষ্মী কি ভাবছে?

রাত্রে সেদিন ভাল ঘুম হ'ল না,—স্বপ্নে দেখি, একটা গভীর বন—সুন্দরবন না উত্তরের সেই তরাই অঞ্চল? কি থম্‌থমে আর কি ভূসো অন্ধকার! আশপাশে এগুলো ছোট বড় গাছ না খোলায় ছাওয়া ভাঙা দেওয়ালের মাটির ঘর—আর তারই পাশ দিয়ে জুলিপথে নড়ছে চড়ছে ওটা কি? ওটা নাম-না-জানা কোন্ পশু?

আরও দু' তিন দিন এসে লোকটা হামলা ক'রে গেছে। রাগে পিত্তি জ্বলে যায়, ইচ্ছা ক'রে বাঘের মত থাবা মেরে ওর গলার মোটা শিরাগুলো ছিঁড়ে ফেলি। কিন্তু পাড়ার বয়স্কা মহিলারা ইতিমধ্যেই দু' এক দিন এসে আমার স্ত্রীর কাছে ফিস্‌ফিস্ কি কথা ব'লে গেছে; বয়স্ক হিতৈষী দু'এক জনে আমাকে ডেকেও বলেছেন,—'বস্তির মেয়ে মশাই, ঘরে না রাখাই ভাল; ছেড়ে দিন মশাই, ওসব নারায়ণের জীব, তিনিই রক্ষা করবেন।'

মনটা দমে যায়। কোথায় ছেড়ে দেব? সেই স্বপ্নে দেখা নাম-না-জানা পশুটার মুখে?

আমাকে ক'দিন ধ'রে ভাবিত দেখে আমার স্ত্রী একদিন লক্ষ্মীকে আদর ক'রে কাছে ডেকে বলল,—'তোর মা ত তোর সত্যি মা, তার যখন সত্যি অসুখ—তখন তুই তার কাছে ক'দিন গিয়ে থেকে আয় লক্ষ্মী।'

সে প্রায় মুখ ঝামটা দিয়েই ব'লে উঠল,—'না-না-না,—আমি এক পাও নড়ব না ব'লে দিচ্ছি।'

আমরা তার মুখের উপরে আর কথা বলতে পারছি না কেন?

আটদশ দিন পরে লক্ষ্মীর মা-ই এসেছে একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে—সিঁড়ির গোড়ায় ব'সে পড়ে চেয়ে নিয়ে চক্‌চক্ ক'রে খানিকটা জল খেয়ে নিল; তারপরে চিঁ-চিঁ ক'রে বলল,—'আমার মেয়ে আর কাজ করবে না তোমাদের বাড়ি, তাকে দেবে কি দেবে না বল।'

মা এসেছে মেয়েকে নিতে, কে তাকে আটকে রাখবে ?

আমার স্ত্রী লক্ষ্মীকে আবার বলে,—'লক্ষ্মী—একটিবার আজ মায়ের সঙ্গে যা না'—

লক্ষ্মী সিঁড়ির হাতলটা শক্ত ক'রে ধ'রে বলে—'না'—

পাশের বাড়ির বয়স্কা মহিলা এসে ধমক দেন লক্ষ্মীকে—'এ কেমন ধারার মেয়ে গো ? মা এসেছে নিয়ে যেতে—তুই যাবি নে মানে ? যেতে তোকে হবেই।'

সিঁড়ির উপর ব'সে প'ড়েই ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে লক্ষ্মী।

পাশের বাড়ির মহিলারও মন গলে, গলা নরম ক'রে বলেন,—'কাঁদিস্ নে মা, আমি তোর ভালর জন্যই বলছি। তোদের জীবন—আমরা ত সব জানি মা, কিন্তু কি করবি মা, কাকে তুই দূষবি ? বিধাতাই যে বাদি, মানুষ কি করতে পারে ? যা তুই, নাম তোর লক্ষ্মী—নারায়ণে মতি রাখিস্,—বিপদভঞ্জন মধুসূদনই তোকে রক্ষা করবেন।'

লক্ষ্মী আস্তে আস্তে মুখ তুলল, আঁচলে চোখের জল মুছল, তারপরে এক-পা দু'পা করে সিঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

পিছন থেকে সেই বয়স্কা মহিলা বললেন,—'নারায়ণ—মধুসূদন—রক্ষা ক'রো—নিরাশ্রয়ের তুমিই আশ্রয় !'

ছ'মাস চ'লে গেছে। একদিন শুনলুম,—লক্ষ্মীর বিয়ে হয়ে গেছে—রেললাইনের ওপারের গোবিন্দপুরের একটা ছেলের সঙ্গে ; ছেলেটা একটা বিড়ির দোকানে বিড়ি বাঁধে—দিন বারো আনা কামাই করে। ঢাকুরিয়া লেকে লক্ষ্মীও যেত স্নান করতে, সেই ছেলেটাও আসত স্নান করতে—সেখানেই পরিচয়। শুনে ভাল লাগল ; মনে মনে বললাম,—'নারায়ণ—মধুসূদন—রক্ষা ক'রো।'

ছ'মাস পরে একদিন। প্রায় দুপুর। দেখি রাস্তার ফুটপাথে গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে কঙ্কালসার একটা মেয়ে—হাতের কাছে দেখলুম একটা মুড়ির ঠোঙা। এগিয়ে ভাবলুম—লক্ষ্মী নাকি ? লক্ষ্য ক'রে দেখলুম—ঠিক তাই ! মনে মনে বললুম,—'হে নারায়ণ—হে মধুসূদন—অনেক দিন ত টিকে আছ—আমাদের কপালে আর কিছু দিন টিকে থেকো প্রভু—নইলে কার দোহাই পেড়ে আমরা নিশ্চিন্তে ঘরে ব'সে থাকব—?'

আকাশ ঃ আমি

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

আকাশ অনেক বড় : আমি ভয় করিনাক তাকে ;
আমি তো অনেক ছোট তার চেয়ে অনেক অনেক—
তবু আমি তার পানে চেয়ে থাকি অবসর পেলে ;
চেয়ে থাকি, বেশ লাগে, একা একা শুধু চেয়ে থাকি ।

ভয় তো করে না মোটে, একটুও ভয় তো করে না ;
মনে হয় বিরাটের বুকে আমি নিয়েছি আশ্রয় ।
বিরাট সে, কী অসীম ! তবু তার বুক-জোড়া স্নেহ—
ডুবে যাই একেবারে সে করুণ-কোমল অতলে ।

ভুলে যাই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দিবসের অশান্ত চীৎকার ;
আঘাতের শত ব্যথা, নিমেষে নিঃশেষ হয়ে যায় ।
সীমাহীন পরিতৃপ্তি মেখে নিই সারা দেহ-মনে,
জুড়ায় সকল জ্বালা স্নিগ্ধ সিত চঞ্চল প্রলেপে ।

আকাশ অনেক বড়, আমি ছোট অনেক অনেক ;
তবু যাই বারবার নিঃসংকোচ দ্বিধাহীন গতি ;
সে আমায় ডাক দেয়, আমি তার ডাক শুনি কানে,
ছুটে যাই, একেবারে ডুবে যাই সে স্নিগ্ধ গভীরে ।

পশ্চিম বঙ্গে শিক্ষা-সঙ্কট

॥ শ্রীমোহিত কুমার সেনগুপ্ত ॥

সমস্যা-সঙ্কুল পশ্চিম বাংলায় শিক্ষা-সমস্যা দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতেছে। বৃটিশ আমলে অর্থের অভাবে শিক্ষার যথেষ্ট প্রসার হয় নাই। বৃটিশ আমলের তুলনায় এখন অর্থ ব্যয় হইতেছে অনেক বেশী, তথাপি শিক্ষার কাজ খুব বেশী অগ্রসর হইয়াছে একথা বলা যায় না। পূর্ব্বে সরকার-বিরোধী দল কথায় কথায় বলিতেন শিক্ষার চেয়ে পুলিশ দপ্তরের খরচ বেশী তাই শিক্ষার জন্য টাকার অভাব হয়। কিন্তু আজ আর সে কথা বলা চলিবে না। আজ পশ্চিম বাংলার সকল দপ্তর অপেক্ষা শিক্ষা দপ্তরেরই খরচ বেশী। তথাপি এ কথা অনস্বীকার্য্য যে পশ্চিম বাংলায় শিক্ষার প্রসার আশানুরূপ হয় নাই।

আজ ১১ বৎসর হইল দেশ স্বাধীন হইয়াছে। কিন্তু এখনও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সকল ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হয় নাই। শতকরা মাত্র ৬৫% জন ছেলে মেয়ে বিদ্যালয়ে আসে। এখনও শতকরা ৩৫% জন ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে আনাই সম্ভব হয় নাই। ইহার একটি কারণ ছেলে মেয়েকে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে বাধ্য করিবার মত কোন আইন নাই বলিলেই চলে। ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইনের এই ধারাটি এরূপ ত্রুটিপূর্ণ যে, ইহা কোন কাজেই আসে না।

ভারত সরকার তথা পশ্চিম বাংলা সরকার প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষা আবশ্যিকভাবে গ্রহণ করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কাজ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে? সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ১৬,০০০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৫৫০টি বিদ্যালয় বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমই সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুসরণ করা হয়, কিন্তু শিক্ষক সেই মামুলী ধরণের—কেহ পুরাতন পদ্ধতিতে শিক্ষা পাইয়াছে এবং কেহ কোন রকম শিক্ষাই পায় নাই।

আমাদের দেশে একটি প্রচলিত প্রবাদ বাক্য আছে "লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি।" অর্থাৎ পাঁচ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলে মেয়েদের কোন রকম লেখা পড়া

করিবার দরকার নাই। ৫ বৎসর বয়সে ছেলে মেয়েদের হাতে খড়ি দিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে লেখা পড়া শিখান আরম্ভ হইত। কিন্তু আজ কাল পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে কলিকাতা ও অন্যান্য সহরে nursery ও infant school নামে এক প্রকার শিশু-বিদ্যালয় গজাইয়া উঠিতেছে। যে Nursery School-এ যত বেশী মাহিনা নির্ধারিত হয় এবং যেখানে ২।১টি শ্বেতাঙ্গ মহিলা কাজ করেন সেই স্কুলই হয় তত আভিজাত্য-পরায়ণ। এই সকল স্কুলে কোন Managing Committee-র বালাই নাই, কোন syllabus-এর বালাই নাই এবং কোন রকম নির্দিষ্ট নিয়ম কানুনেরও বালাই নাই: এইগুলি হইয়াছে কতকগুলি অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

২ বা ৪ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা সব চেয়ে শোচনীয়। বর্ত্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন উপকারিতা আছে বলিয়া মনে করি না। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া ছেলে মেয়েরা বিশেষ কোন বিভাগে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা অর্জ্জন করে না। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ শেষ করিয়া কোন না কোন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। School Final স্তর পর্যন্ত না পড়িলে যখন মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হইতেছে না, তখন ২ বা ৪ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সার্থকতা কি? সেই জন্যই দেখা যায় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের ভর্ত্তি করিবার সুযোগ পাইলে কোন অভিভাবকই নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছেলে মেয়েদের পাঠাইতে চাহেন না। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলির অবস্থা শোচনীয়। এই সব বিদ্যালয়ে না আছে ভাল আসবাব পত্র, না আছে শিক্ষোপকরণ এবং না আছে ভাল শিক্ষক।

পশ্চিম বঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মত মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়িয়া উঠিয়াছে। আয়তনের দিক দিয়া এক পূর্ব্ব পাঞ্জাব ছাড়া আর সকল রাজ্য অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গ ছোট কিন্তু বিদ্যালয়ের সংখ্যা আয়তনের তুলনায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের সংখ্যা বেশী হওয়ার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া শতকরা ৮০ জন ছেলে মেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এখন প্রশ্ন হইতে পারে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া শতকরা ৮০ জন ছেলে মেয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলে ক্ষতি কি? কোন দেশেরই সকল ছেলে মেয়েই মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের উপযুক্ত নয়। তাহা ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা প্রধানতঃ সাহিত্য-ধর্ম্মী বলিয়া ইহা ছেলে মেয়েদের মধ্যে

ব্যবসায় বা শিল্প-প্রবণতা জাগাইয়া তুলিতে পারে না। ইহার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করিয়া দলে দলে ছেলেমেয়ে ছুটে চাকরীর সন্ধানে। ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পের দিকে বেশী ঝোঁকে না। এই জন্যই একদিকে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং অন্যদিকে বাংলা দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প অবাঙ্গালীদের হাতে পড়িতেছে।

All India Council of Secondary Education-এর নির্দেশ অনুযায়ী অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় বাংলা দেশেও ১১ শ্রেণীযুক্ত সর্ব্বার্থ-সাধক বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যতগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে সবগুলিকে একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তন করিবার সামর্থ্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের ক্ষমতার বাহিরে। অতএব প্রত্যেক রাজ্যেই কতকগুলি বিদ্যালয়কে বাছিয়া লইয়া ১১-দশ শ্রেণীযুক্ত সর্ব্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইবে। এক পশ্চিম বঙ্গে ১৬০০ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৩০০টি বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত করা হইল না, তাহাদের অবস্থা কি হইবে? সরকার হইতে বলা হইয়াছে ক্রমে ক্রমে সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ই সর্ব্বার্থ-সাধক বিদ্যালয়ে পরিবর্ত্তিত হইবে। সরকার যাহাই বলুন না কেন, আমার মনে হয় বর্ত্তমান দশমশ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির কতকগুলি হয় উঠিয়া যাইবে কিম্বা নিম্নগামী হইবে।

এখন পরিচালন ব্যবস্থার দিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেখা যাক বর্ত্তমান শিক্ষাধারার অবস্থা কি? গ্রাম অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনার ভার আছে জেলা স্কুল বোর্ডের (District School Board) হাতে। ১৯৩০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা আইন অনুসারে District School Board গঠিত হয়। এই আইন অনুসারে নির্ব্বাচিত স্কুল বোর্ডের সভ্যগণের মধ্যে এক জিলা স্কুল পরিদর্শক ছাড়া আর কোন শিক্ষাবিদের স্থান পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। কাজেই District School Board দ্বারা প্রকৃত শিক্ষার কাজ বিশেষ আগায় না। সভ্যদের মধ্যে স্ব স্ব দলের লোকেদের চাকরী দিয়া দলভারী করার দিকেই আগ্রহ দেখা যায়। সহর অঞ্চলে দুইরকম প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখা যায়। কতকগুলি প্রাথমিক

বিদ্যালয় থাকে মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত, আর কতকগুলি থাকে বেসরকারী সভ্যদের দ্বারা পরিচালিত কিন্তু সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত। মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিচালনার জন্য একটি শিক্ষা পর্ষৎ (Education Committee) থাকে। কিন্তু এই কমিটির সভ্যেরা নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়ের বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য করিতে পারেন না। বেসরকারী সভ্যদ্বারা যে সকল বিদ্যালয় পরিচালিত হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রধান শিক্ষকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। পরিচালন-সমিতির তথাকথিত সভ্যগণ শুধু নামে মাত্র সভ্য থাকেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১০ হইতে ১২ জন সভ্য লইয়া গঠিত হয় পরিচালক-সমিতি। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাইতেছে পরিচালক-সমিতির সভ্যদের বিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানের দিকে মন দেওয়া অপেক্ষা দলাদলি সৃষ্টি করা এবং আধিপত্য বিস্তার করার দিকেই লক্ষ্য বেশী। আজকাল বহু বিদ্যালয়েই দেখা যাইতেছে পরিচালক সমিতির সভ্যদের মধ্যে মতভেদ ও মনোমালিন্যের ফলে মামলা মকর্দমা পর্য্যন্ত হইতেছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও রাজনীতির খেলা আরম্ভ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

'নির্মল কান্ত, নমো হে নমঃ
স্নিগ্ধ সুশান্ত নমো হে নমঃ
বন-অঙ্গনময় রবিকর-রেখা
লেপিল আলিম্পনলিপি লেখা,
আঁকিব তাহে প্রণতি মম।
নমো হে নমঃ।'

—নটরাজ

নর-নারায়ণ

।। শ্রীবিভা সরকার ।।

ওরে মোর মন খোলরে নয়ন
গারে মানুষের গান
এই অগণন নরনারায়ণ
এরাই তো ভগবান।
এদেরই সেবায় দেব সেবা পায়
স্বর্গ সে ধরণীতে—
মুচি ও মেথর চাষা মুটে জন
পরিশ্রমের ভিতে
রহিয়া অচেনা করিছে রচনা
মন্দির দেবতার;
দেউল দুয়ারে ওরাই পূজারী
শ্রম দিয়ে আপনার।
এদের ফেলিয়া পাগলের প্রায়
চলেছো খুঁজিতে কারে?
নর নারায়ণ জীব শিবে ফেলি
দেবতা জাগিতে পারে?
জাগাও চেতন খোলরে নয়ন
গাও জীবনের গান
নিপীড়িত জন আতুর মানব
তারাই তো ভগবান।
ধরণীরে ছাড়ি স্বর্গ কোথায়
কল্পিত দেবলোক?
মানবের লাগি জাগহে মানব
জনম সফল হক॥

ঘূর্ণি

॥ শ্রীকনক মজুমদার ॥

নদীর ঘূর্ণি ঘুরপাক খাচ্ছে—ঘুরছে ত ঘুরছেই; ঘোরার আর তার বিরাম নেই। কে যে তাকে ঘুরতে বলেছে, কেনই যে সে ঘুরছে—সে কি তা জানে? ঘুরছে দিবারাত্র, অবিরাম ঘুরে চলেছে; ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই, অন্য লক্ষ্য নেই। ঘোরাটাই তার লক্ষ্য, ঘোরাতেই তার মোক্ষ। সে তার অসীম শক্তি নিয়ে নিজের মধ্যেই ঘুরে মরছে। সে নিজেও জানে না কত শক্তি সে রাখে। দূর থেকে লোকে ভয় পায় তার কাছে যেতে—কি ভীষণ শক্তি! ওর ভেতরে পড়লে আর রক্ষা নেই। সভয়ে মাঝিরা পাশ কাটিয়ে যায়। তবুও দুর্ঘটনা ঘটে, অজানিত ভাবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে কেউ না কেউ ওর ভেতরে পড়েই যায়; প্রাণও হারায়।

ঘূর্ণি মাত্রেই বিপজ্জনক। ঘূর্ণি হাওয়া—কি প্রচণ্ড শক্তি, কি ভীষণ গতি, —তার তাণ্ডব নৃত্য বিশ্বসংসার তছনছ করে দেয়, ওলট-পালট করে দেয়, সম্ভব অসম্ভব পরিবর্ত্তন ঘটায়। সে ঘূর্ণিতে কত কি যে ঘটতে পারে কেউ কল্পনা করতেও পারে না। সেই মুহূর্ত্তে অন্য কোন শক্তিই তাকে সংযত করতে পারেনা। সে তার ধ্বংস লীলায় শ্রান্ত হয়ে আপনিই থেমে যায়। জলের কোন কোন ঘূর্ণি দেখা যায় কোনদিনই থামেনা। জলের ছোট ছোট ঘূর্ণি কখনও কখনও স্রোতের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে দেখা যায়—আবার কখন কখনও ঘুরতে ঘুরতেই তাকে স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলতে দেখা যায়।

জল ও বায়ুর মত মানুষের মনেও ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়। স্থলে জলে মনে—ঘূর্ণির সৃষ্টি অদ্ভুত হলেও অস্বাভাবিক নয়। প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে কিংবা মানসিক ক্ষেত্রে সমশক্তিসম্পন্ন দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংঘাতে হয় ঘূর্ণির সৃষ্টি। সমান প্রবল দুই বিপরীতগামী হাওয়ার সংঘাতে হয় ঘূর্ণি হাওয়া; বিপরীত-গামী সমশক্তিসম্পন্ন দুই স্রোতের সংমিশ্রণে হয় জলের ঘূর্ণি; তেমনি দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার সংঘাতে সৃষ্টি হয় মনের ঘূর্ণি।

কেবলমাত্র বিপরীতগামী উভয় শক্তির সংঘাত হলেই ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়না। বিপরীতগামী উভয় শক্তিই যখন সমান প্রবল তখনই সৃষ্টি হয় ঘূর্ণির। মানুষের মনে অনবরতই ইচ্ছার উদ্ভব হচ্ছে। কোনো ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে,

কোনো ইচ্ছা দমিত হচ্ছে। বিচিত্র মনে বিচিত্র ইচ্ছার উদয় হয়েই চলেছে। কখনও কখন মন দুই বিরুদ্ধ ইচ্ছার মুখোমুখি হয়ে পড়ে, যে দুইটি ইচ্ছাই সমান প্রবল, সমান শক্তিসম্পন্ন, এবং উভয়েই চরিতার্থতা পেতে চায়। কিন্তু যেহেতু তারা বিরুদ্ধ ইচ্ছা সেহেতু একের অপসরণ ব্যতীত অপরের চরিতার্থতা আসতে পারে না। এবং যেহেতু দুইটি ইচ্ছাই সমান বলবান তাই একটি অপরটিকে হারিয়ে দিতেও পারছে না। দুইটি পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছার চরিতার্থতা কার্য্যত অসম্ভব। মনে তখন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। যেমন ছেলের মনে বাবাকে মেনে চলবার ইচ্ছেও রয়েছে, আবার বাবাকে অমান্য করে সিনেমা দেখবার ইচ্ছেও হচ্ছে। বাবাকে মান্য করে ভাল ছেলে হব, আবার নিষিদ্ধ বইয়ের সিনেমা দেখে কৌতূহলের নিবৃত্তি করব। এই দুইটি ইচ্ছাকে পরস্পর-বিরোধী বলা যেতে পারে—কারণ শেষোক্ত ইচ্ছাটি পূরণ করতে গেলে বাবাকে অমান্য করতেই হয়। দ্বন্দ্ব হচ্ছে—বাবাকে মানব কি মানবনা। যখন সজ্ঞান মনের দুইটি ইচ্ছা বিরোধিতা করে, তখন তার সমাধান করাটা আয়ত্তের মধ্যে থাকে। কিন্তু যখন বিরুদ্ধ ইচ্ছা দুইটির একটি নির্জ্ঞান মনে থাকে, তখন মনে যে দ্বন্দ্বের বা ঘূর্ণির সৃষ্টি হয় তা থেকে মুক্ত হওয়া খুবই শক্ত।

দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হলে মন একটি কষ্টকর অবস্থায় পড়ে যায়। অনেকক্ষণ ধরে মন এই কষ্টকর অবস্থায় অবস্থান করতে পারে না। ঐ অবস্থা অতিক্রম করবার চেষ্টা মনের মধ্যে সর্বক্ষণই চলতে থাকে। সেই চেষ্টার ফলে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিকারী দুইটি ইচ্ছার মধ্যে একটিকে অবচেতন মনে চলে যেতেই হয়। সেখানে গিয়েও সে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকে না, চরিতার্থতা পাবার এবং সংজ্ঞান মনে উঠে আসবার চেষ্টা করতে থাকে। তাকে অবদমিত রাখবার জন্যে মনের খানিকটা শক্তিকে সেখানে নিয়োজিত রাখতে হয়। কতখানি শক্তি সেখানে নিযুক্ত থাকবে সেটা নির্ভর করছে সেই দমিত ইচ্ছার প্রবলতার ওপর। সেই ইচ্ছাটি যতই শক্তিশালী হবে তাকে অবদমিত রাখতে তত বেশী মনের শক্তির প্রয়োজন হবে। সেই অবদমনের কাজে যত বেশী শক্তি আটকে থাকবে, ততই সেই লোকের অন্য কাজ করবার ক্ষমতা কমে যাবে। অনেক সময় মানুষের মনের এমন অবস্থা হয় যখন সে কোন কাজই করতে পারে না; কোন কাজ করবার উৎসাহ পায়না অথবা নানারকম শারীরিক অসুস্থতা বোধ হয় যার জন্যে কাজ করতে পারে না। যতটা পরিমাণ কাজ

সে করতে পারে বলে মনে করে ততটা কিছুতেই সে করে উঠতে পারে না। দীর্ঘসূত্রতা তার একটি লক্ষণ। এই কাজ করার অক্ষমতার একটি আপাত কারণ হল মনের শক্তিহীনতা ; মনে শক্তির অভাব নেই কিন্তু মনের খানিকটা শক্তি যেন কোথাও আবদ্ধ হয়ে আছে, যেটা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন নয়। অন্য আরও কারণ থাকে যে জন্যে এই অক্ষমতা আসে। মনের বিরুদ্ধ ইচ্ছার ফলে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব—তার ফলে কখনও দেখা যায় কাজে নিরুৎসাহ অথবা কোন অর্থহীন কাজ ক্রমাগত করে যাওয়া ; দুরকম অবস্থাই প্রমাণ করে মনে ঘূর্ণির সৃষ্টি। যেখানে নিরুৎসাহ, কর্মহীনতা সেখানে মনের গভীরে মন ঘূর্ণিতে পড়ে আছে ; যেখানে অর্থহীন কাজ বার বার করে যেতে দেখা যায়—সেখানে সে বাইরের কাজেই ঘূর্ণির মত ঘুরে চলেছে। দুরকম অভিব্যক্তিতেই মন আর এগিয়ে যেতে পারছে না। একটা অবস্থায় সে ঘুরেই চলেছে। তার প্রায় সমস্ত শক্তি সেই ঘূর্ণিতেই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় চরম পরিণতি দেখা যায় মানসিক রোগে। কেউ সব ছেড়ে দিয়ে অন্ধকার ঘরে খাটের তলায় বসে আছে, কেউ অনবরত পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, কেউ অনর্গল কথা বলে চলেছে······।

মনের এই ঘূর্ণি সাধারণভাবে মনের নির্জ্জান স্তরে চলতে থাকে। সংজ্ঞান মনেও ঘূর্ণির সৃষ্টি হয়—তার সে সব কাটিয়ে ওঠা ততটা শক্ত নয়। ছোট ছোট ঘূর্ণি অনবরত সৃষ্টি হচ্ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। মানুষ জীবন ভোর ঘূর্ণিতে পড়ে, আবার তা কাটিয়ে ওঠে, এগিয়েও যায়। বড় রকমের ঘূর্ণিতে পড়লে হয়ত সামলাতে পারে না, নিজেকে তার মধ্যে হারিয়ে ফেলে, হয়ত তারই মধ্যে মৃত্যু ঘটে ; হয়ত বা কোন সাহায্য পেলে তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেও পারে।

প্রাকৃতিক ঘূর্ণির কোন উপকারিতা আছে কি নেই বলতে পারি না। কিন্তু মনের ঘূর্ণির যথেষ্ট উপকারিতাও আছে, প্রয়োজনও আছে। সবল মনের প্রবল ঘূর্ণির ফলে কত সাহিত্য, কত শিল্প সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। ঘূর্ণি জীবনে আসবেই। প্রবাহিত বায়ু, বহমান স্রোত আর জীবন্ত মনই পারে ঘূর্ণি সৃষ্টি করতে। স্থির বায়ু, বদ্ধ জল এবং স্পন্দনহীন প্রাণে ঘূর্ণির কল্পনা করা যায় না। অনুসন্ধান করলে দেখা যায় অনেক সুন্দর সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই মানসিক ঘূর্ণি—আবার অনেক মানসিক বিকারের মূলেও রয়েছে ঐ ঘূর্ণি।

বাংলা ভাষার ভূমিকা

॥ অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য ॥

বাংলা দেশে আর্য উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পর হইতেই এ'দেশে সংস্কৃত ভাষার চর্চা আরম্ভ হইলেও সংস্কৃত কদাচ আর্যভাষী জাতির কথ্য ভাষা ছিল না। সংস্কৃত কোন কালেই কোন জাতিরই কথ্য ভাষা নহে। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী কিংবা তৎপূর্ববর্তী সময় হইতেই যে সকল আর্য ভাষাভাষী ঔপনিবেশিক এ'দেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহাদের কথ্য ভাষা ভারতীয় আর্য-ভাষা হইতে জাত হইলেও তাহা সংস্কৃত ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বা বৈদিক আর্যভাষার পরবর্তী যুগকে ভারতীয় ভাষা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে ব্যাপক ভাবে মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা বলা হইয়া থাকে। এই মধ্য ভারতীয় আর্যভাষারই পূর্বতম শাখাটি মগধ বা উত্তর বিহার অঞ্চল হইতে সর্বপ্রথম বাংলার পশ্চিম সীমান্তলগ্ন বিভাগ সমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়ে; পরে তাহা কামরূপ ও পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মধ্য-ভারতীয় আর্যভাষার পূর্বতম যে শাখাটি সর্বপ্রথম বাংলায় প্রবেশ লাভ করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে কি এই সম্পর্কে সকলে একমত নহেন। মধ্য ভারতীয় যুগে পালি ও প্রাকৃত ভাষাই আর্য সন্তান দিগের কথ্য ভাষা ছিল, তবে কথ্য পালি কিংবা কথ্য প্রাকৃতের সঙ্গে লিখিত পালি কিংবা লিখিত প্রাকৃতের যে পার্থক্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। বর্তমান কালে সাধু বাংলা ও চলিত বাংলায় যে পার্থক্য, সে পার্থক্য যে ইহারই মত ছিল, তাহাও সত্য। পালি প্রাকৃতেরই একটি রূপ; কেহ কেহ ইহাকে প্রাচীন প্রাকৃত অথবা পূর্বদেশীয় প্রাকৃতও বলিয়া থাকেন। যে আর্যভাষা তখন পশ্চিমে গান্ধার হইতে পূর্বে মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা কেবল মাত্র এক প্রাকৃত সংজ্ঞা দ্বারা নির্দেশ করা হইলেও ইহার মধ্যে যে বৈচিত্র্য ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই বৈচিত্র্য কেবল স্থানগত নহে—কালগতও বটে। আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ সন হইতে খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সন পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার যুগ ধরিয়া লইতে পারা যায়, অতঃপর খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সন হইতে খৃষ্টীয় ১০০০ সন পর্যন্ত মধ্য ভারতীয় আর্য

ভাষার যুগ ও তাহার পরবর্তী কাল আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার যুগের অন্তর্গত। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মধ্য ভারতীয় আর্য-ভাষাভাষী পূর্বতম সীমান্তবর্তী যে দেশ হইতে সর্ব প্রথম আর্য ভাষা বাংলার সীমায় প্রবেশ করিয়াছিল, সেই দেশ মগধ। এই মগধ দেশে সমসাময়িক কালে মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষার যে রূপ প্রচলিত ছিল তাহাকে মাগধী প্রাকৃত বলিত। অতএব এ'কথা স্বভাবতঃই অনুমান করা যাইতে পারে যে, মাগধী প্রাকৃতই ভারতীয় আর্য্যভাষার সর্ব্বপ্রথম প্রতিনিধিরূপে বাংলার সীমায় সে দিন প্রবেশ করিয়াছিল এবং এই মাগধী প্রাকৃত হইতেই কালক্রমে বাংলা ভাষার জন্ম হইয়াছে। এই মতই সাধারণতঃ সমর্থিত হইয়া থাকে। মধ্য ভারতীয় আর্য্য ভাষার সর্ব্বশেষ রূপ যাহা হইতে প্রত্যক্ষভাবে আধুনিক ভারতীয় আর্য্য-ভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে তাহাকে অপভ্রংশ বলা হয়। মাগধী প্রাকৃতের সর্ব্বশেষ অবস্থা মাগধী অপভ্রংশ, অনেকেই মনে করেন এই মাগধী অপভ্রংশ হইতেই প্রত্যক্ষভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু এ'কথাও সত্য যে মাগধী প্রাকৃত কিংবা মাগধী অপভ্রংশের সমস্ত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যই বাংলা উচ্চারণে প্রচলিত নাই। সেইজন্য কেহ আবার মনে করেন, বাংলা দেশে আর্য্য সংস্কৃতি বিস্তারের পর মধ্য ভারতীয় ভাষার যুগেই এদেশে এক নিজস্ব প্রাকৃতের রূপ গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে গৌড়ীয় প্রাকৃত বলিত। আলঙ্কারিক দণ্ডির 'কাব্যাদর্শে' গৌড়ীয় প্রাকৃত কথাটির উল্লেখ আছে, কিন্তু তাহার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। সেইজন্যই গৌড়ীয় প্রাকৃতের উচ্চারণ-নিয়ম কতখানি বাংলা ভাষায় প্রচলিত আছে তাহা বিচার করিয়া দেখিবার কোন উপায় নাই। অতএব এই সম্পর্কেও নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারা যায় না।

মাগধী প্রাকৃতের পূর্ব্বতম একটি শাখা প্রধানতঃ বাংলা দেশে সর্ব্বপ্রথম বিস্তৃতি লাভ করিলেও এ'কথা সত্য যে, কেবল মাত্র পূর্ব্ব মগধ অঞ্চল হইতেই সেই যুগে বাংলাদেশে বসতি স্থাপিত হয় নাই। একদিকে যেমন বাংলার সীমান্তবর্তী বলিয়া পূর্ব্ব মগধ অঞ্চলের অধিবাসীরা এ'দেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিবার ফলে মাগধী প্রাকৃত এ'দেশে প্রবেশ লাভ করে, আবার অন্যদিকে তেমনই জৈন ধর্ম্ম প্রচার সূত্রে জৈনগণ কর্ত্তৃক আনীত দক্ষিণ মগধের অর্দ্ধ মাগধী প্রাকৃত, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাসূত্রে ও অন্যান্য উপায়ে কাশী কাণ্যকুব্জ প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক আনীত শৌরসেনী প্রাকৃতও সেই যুগে

বাংলা দেশে প্রচার লাভ করিয়াছিল। একই দেশে ঘন সন্নিহিত স্থানে বসবাস করিবার ফলে অনতিকাল মধ্যে প্রাকৃতের এই বিভিন্নরূপের মধ্য হইতে একটি বিশিষ্ট আদর্শ গড়িয়া ওঠে, তাহা বিভিন্ন প্রাকৃতেরই মিশ্র উপাদানে গঠিত হইলেও প্রধানতঃ প্রাচ্য বা পূর্ব্বদেশীয় প্রাকৃতের উপরই ভিত্তি স্থাপিত করিয়া লইয়াছিল। সেইজন্য বাংলা ভাষার মধ্যে বিশিষ্ট কোন মধ্যভারতীয় আর্য্য ভাষার একক প্রভাবের পরিবর্ত্তে তাহার বিভিন্ন রূপেরই প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তৎকালীন বাংলার এই বিশিষ্ট প্রাকৃতকেই হয় ত গৌড়ীয় প্রাকৃত বলা হইত, কিন্তু এ'দেশে প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাকৃতের যুগেও সংস্কৃতের চর্চ্চাই অধিক হইয়াছে বলিয়া এই গৌড়ীয় প্রাকৃতের সাহিত্যিক কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই গৌড়ীয় প্রাকৃতেরই সর্ব্বশেষ অবস্থাকে যদি গৌড়ীয় অপভ্রংশ বলা যায়, তাহা হইতেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অবশ্য তৎকালীন ভারতীয় পূর্ব্বতম ভাষা বলিয়া ইহার উপর মাগধী অপভ্রংশের প্রভাবও বিলক্ষণ অনুভব করা যায়, এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত কারণে পশ্চিম ভারতীয় শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রভাবও ইহার উপর নগণ্য নহে। এই শৌরসেনী অপ্রভ্রংশ তৎকালীন বাংলাদেশে প্রচলিত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার উপর যে কেবল বাহির হইতেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাই নহে, তাহার অন্তঃপ্রকৃতি গঠনেও ইহা সেদিন এক প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

অপভ্রংশের গর্ভ হইতে বাংলাভাষা প্রথম কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? এই প্রশ্ন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নির্দ্দিষ্ট কোন সন তারিখে ভাষার জন্ম বা উৎপত্তি হইতে পারে না, একটা অনতিবিস্তৃত কালের মধ্যে ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া থাকে; এই পরিবর্ত্তন প্রথমতঃ অলক্ষ্যগোচর হইতে ক্রমে প্রত্যক্ষগোচর হয়। ভারতীয় আর্য্যভাষাসমূহের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে কোন্ সময়ে অপভ্রংশের মধ্যে এই অলক্ষ্যগোচর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা অনুমান করিয়া বলিতে পারা যায়। এই পরিবর্ত্তনের যুগে সর্ব্বপ্রথম দুই একটি করিয়া বাংলা শব্দের জন্ম হইয়াছিল, সেই নবজাত শব্দগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পরিবর্ত্তে সেই যুগে অপভ্রংশেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই জন্য তৎকালীন বাংলার অপভ্রংশ ভাষার শব্দ সমষ্টির মধ্যেই বাংলাভাষার কয়েকটি আদিম নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। যে সময়ের মধ্যে এই শব্দগুলি

জন্মলাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় উহা কিছুতেই খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। অতএব এই সময়ই মধ্য ভারতীয় আর্য্যভাষার সর্ব্বশেষ রূপ এই অপভ্রংশের গর্ভ হইতে আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষার পূর্ব্বতম একটি শাখা বাংলাভাষার জন্ম সূচিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে গুপ্ত সম্রাটগণ ও পরে অষ্টম শতাব্দী হইতে বৌদ্ধ পালরাজগণ বাংলাদেশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের উভয়েরই রাষ্ট্রভাষা ছিল সংস্কৃত। তাঁহাদের প্রদত্ত অসংখ্য সংস্কৃত তাম্রশাসন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনগুলি অধিকাংশই ভূমিদানলিপি। যে সমস্ত ভূমি রাজাগণ দান করিতেন এই তাম্রশাসনগুলিতে তাহাদের চতুঃসীমা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা থাকিত। এই তাম্রশাসনগুলিতে উল্লিখিত তৎকালীন বাংলার কতকগুলি গ্রামের নাম পাওয়া যায়, নামগুলি অধিকাংশই তৎকালীন বাংলাভাষার শব্দ; ভূমির সীমানির্দ্দেশ সুস্পষ্ট রাখিবার জন্য এই নামগুলিকে অধিকাংশই অবিকৃত রাখা হইয়াছে, অবশ্য কালক্রমে সংস্কৃত প্রভাবের সম্মুখীন হইয়া এ দেশের বহু গ্রামের নামই শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত রূপ লাভ করিয়াছে, কেবল সন তারিখযুক্ত এই প্রাচীন তাম্রশাসনগুলিতে যে কয়েকটি গ্রামের নাম একদিন উল্লিখিত হইয়াছিল তাহাই কালজয়ী হইয়া অমর হইয়া আছে। এই ধরণের কয়েকটি শব্দকে বাংলা ভাষার প্রাচীন নিদর্শনের অন্যতম বলিয়া ধরিয়া লইতে পারা যায়। যে সকল তাম্রশাসনে গ্রামের এই নামগুলি উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের রচনার সন তারিখও ইহাতে উল্লেখ আছে বলিয়া এই শব্দগুলি এ দেশে কবে প্রচলিত ছিল তাহা নিশ্চিতভাবে জানিতে পারা যায়।

এই ধরণের কতকগুলি শব্দের এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে। যেমন, 'খাটিকা' 'খাড়ী' আধুনিক বাংলায় 'খাঁড়ী'; 'পাটক' আধুনিক বাংলায় 'পাড়া'; 'কুণ্ড' আধুনিক বাংলায় 'কুঁড়'; 'কাণা' আধুনিক বাংলায়ও এই শব্দটি প্রচলিত আছে; 'বুড়ি পোখরি' অর্থ প্রাচীন পুকুর, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেও শব্দ দুইটি অনুরূপ বানানেই প্রচলিত ছিল; 'ঝাট' আধুনিক বাংলায় 'ঝাড়'; 'চম্পা' আধুনিক বাংলায় 'চাঁপা'; 'হট্টিকা' আধুনিক বাংলায় 'হাটি'; 'বুট্টিকা' আধুনিক বাংলায় 'বুটি'; 'থোড়া' আধুনিক বাংলাতেও অনুরূপ বানানেই শব্দটি প্রচলিত আছে; 'চাটি' আধুনিক বাংলায় 'চটি'; 'নেহ-কাষ্ঠী' সংস্কৃত 'স্নেহ' হইতে 'নেহ', অর্ব্বাচীন সংস্কৃত 'কাষ্ঠী' হইতে আধুনিক

বাংলায় কাঠি, এই গ্রামের নামটিকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করিলে হয় 'স্নেহকাঠি'; বর্ত্তমান 'ঝালকাঠি' 'স্বরূপকাঠি' প্রভৃতি গ্রামের নাম ইহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে; 'নেহ' শব্দটিও মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত ছিল। আধুনিক বাংলাভাষার শব্দের উপর সংস্কৃতের প্রভাব বশতঃ এই শব্দটিও লুপ্ত হইয়াছে; 'দেউলি' ('নেক্কা-দেউলি') আধুনিক বাংলায় 'দেউল'; 'ডহার' ('নীচ-ডহার') সম্ভবতঃ 'ডহর'। মধ্যযুগের বাংলা ভাষায় 'ডহর ডাঙ্গা' কথাটি প্রচলিত ছিল, আধুনিক বাংলায়ও 'নারায়ণ-ডহর' প্রমুখ গ্রামের নামের মধ্যে শব্দটির অস্তিত্ব আছে, শব্দটি সংস্কৃত 'হ্রদ' হইতে সম্ভবতঃ প্রাকৃত * 'হদ', * 'হদর' ইত্যাদির ভিতর দিয়ে বাংলায় বর্ণবিপর্য্যয় দ্বারা 'দহ' (তুলনীয় 'কালীদহ' 'শিলাইদহ') ও মূর্দ্ধন্যীকরণনীতি দ্বারা 'ডহর'-এ পরিণত হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীনকাল হইতে ইহার অর্থের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহার অর্থ জলাভূমি বা নিম্নভূমি; 'ডোব্বি' আধুনিক বাংলায় 'ডোবা', 'বাটি' আধুনিক বাংলায় 'বাড়ী'; 'বারয়ী পড়া' আধুনিক বাংলায় 'বারই (বারুজীবিকা) পাড়া'; 'পাশা' ('সাঙ্কর-পাশা') সংস্কৃত 'পার্শ্ব'; গ্রামের পার্শ্ব বা একাংশ, এই অর্থে শব্দটি বাংলা ভাষায় এখনও প্রচলিত আছে, 'অরণ্যপাশা' 'চণ্ডীপাশা' প্রভৃতি গ্রামের নাম এই সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে।

উদ্ধৃত শব্দগুলি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত লিখিত তাম্র শাসনগুলির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে, ইহাদের কোন কোনটি সামান্য সংস্কৃত রূপ গ্রহণ করিলেও মূলতঃ সকলগুলিই বাংলা, প্রাকৃত কিংবা অপভ্রংশ নহে; এই শব্দগুলির ভিতর দিয়াই বাংলা ভাষা সর্ব্বপ্রথম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছে। এই তাম্রশাসন ব্যতীতও তৎকালীন বাংলার আরও কতকগুলি নিজস্ব শব্দ একখানি প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানের টীকার মধ্যে এক অতি অভিনব উপায়ে রক্ষা পাইয়াছে, তাহাও বাঙ্গলা ভাষার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন রূপে ধরা হইয়া থাকে। বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দ নামক একজন পণ্ডিত ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত আভধান 'অমরকোষে'র একখানি টীকা রচনা করিয়াছিলেন, ইহার নাম 'টীকা-সর্ব্বস্ব'। সর্ব্বানন্দ বাঙ্গালী ছিলেন এবং বাঙ্গালী ছাত্রদিগের জন্যই তিনি তাঁহার এই টীকা বিশেষ ভাবে রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ সংস্কৃতের প্রতিশব্দরূপে 'দেশী ইতি ভাষা' এইরূপ উল্লেখ করিয়া তিনি কতকগুলি শব্দের বাংলা প্রতিশব্দেরও উল্লেখ

করিয়াছেন, এই শব্দগুলি হইতেই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত বাংলা শব্দের একটি নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় তিন শত এই প্রকার বাংলা শব্দ তিনি তাঁহার 'টীকাসর্ব্বস্বে'র বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক বাংলায় ইহাদের অনেকগুলি শব্দই অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে, কোন কোন শব্দ পরবর্ত্তীকালে সংস্কৃতের প্রভাববশতঃ সংস্কৃত রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, কিন্তু তৎকালে এই শব্দগুলি যে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হইত সমসাময়িক ও তাহার কিছু পরবর্ত্তী বাংলা সাহিত্যেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

'পৃথিবীর সর্বত্রই মানুষ কোথাও বা আপনার বহু প্রাচীন অভ্যাসের আবরণের দ্বারা আপনার মঙ্গলকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে, কোথাও বা সে আপনার নানা রচনার দ্বারা সঞ্চয়ের দ্বারা কেবলই আপনাকে বড়ো করিতে গিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে হারাইয়া ফেলিতেছে। কোথাও বা সে নিষ্ক্রিয়ভাবে জড়তার দ্বারা কোথাও বা সে সক্রিয়ভাবে প্রয়াসের দ্বারাই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতাকে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছে।'

—রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়

কলমের লড়াই

॥ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু ॥

সান ফ্রাসিস্কো থেকে কলম্বিয়া যাত্রা।

মিজৌরী ষ্টেটের ছোট্ট একটি শহর কলম্বিয়া। সুন্দর লোক-বিরল শহর। এখানেই মিজৌরী বিশ্ববিদ্যালয়। আর একটি বিখ্যাত বিদ্যায়তন মেয়েদের মহাবিদ্যালয় ষ্টিফেন্স কলেজ।

ভোর সাড়ে ছ'টায় প্লেন। হোটেল-ম্যানেজারকে তাই বলে রাখলাম। সাড়ে পাঁচটার ভেতর জাগিয়ে দেওয়া চাই।

অনুরোধ মতোই কাজ। টেলিফোনের শব্দে সময়-সংকেত। নির্দিষ্ট সময়েই ঘুম ভাঙে। তাড়াতাড়ি স্নানাদি সেরে এসে এলিভেটারের সামনে দাঁড়াই। স্যুটকেস আর ব্যাগে দু'হাত জোড়া।

নেমে যায় 'যন্ত্র-দাস'। সাত তলা থেকে কয়েক মুমূর্তে একতলায়।

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরোতে যাবো, এলিভেটরম্যান ডাকলে বাবুজী!

কি ব্যাপার, কেন ডাকছো?—জিজ্ঞেস করলাম।

তুমি নিজেই নিয়ে যাবে এসব মাল-পত্তর?

তা' ছাড়া আর কে নেবে? এখানে আর লোক কোথায়?

যদি বলো, আমিই নি। আমিই ক্যাবে তুলে দিয়ে আসি।—একটা আকুতির সুর লোকটির কথার মধ্যে।

কি যেন একবার ভাবলাম। একবার চাইলাম লোকটির দিকে। সে হয়তো কিছু একটা ধরে নিলে। বললে: আমরা কিন্তু এসব কাজও করি। কিছু কিছু বকৃশিষ পাই। তুমিও দিয়ো।

এর পরে আর কথা চলে না।

লোকটির হাতে মাল-পত্তর সঁপে দিয়ে আমি ম্যানেজারের কাউণ্টারে। সেখানে দেনা-পাওনার হিসেব-নিকেশ। প্রত্যেক জায়গায় সে এক ঝামেলার কাজ।

রাস্তার আলো তখনো নেবেনি। অন্তহীন কুয়াসার রাজ্য বাইরে।

এখনো ঘুম সান্ ফ্রান্সিস্কোর চোখে। ভারি সুন্দর এ শহর। কিন্তু এ শহর পুরো ঘুরে বেড়িয়ে উপভোগ করা সম্ভব হলো না, এই দুঃখ। এখানে এসে আমি যুদ্ধ-ক্লান্ত। ভীষণ কলমের লড়াই!

হোটেল রিসেপশনিষ্ট কিন্তু তার চেয়ারে বসে। এ যে হোটেল, এ যে পান্থশালা! কেউ যায়, কেউ আসে। জীবন-মৃত্যুর খেলার মতো। কাউকে তো হিসেব রাখতেই হবে তার। এই যে আসুন, আসুন। সুপ্রভাত!

সুপ্রভাত! রিসেপশনিষ্টের সাদর আহ্বানে আমার প্রত্যভিবাদন।

তা এতো সাত তাড়াতাড়ি নেমে এলেন যে! প্লেন তো সেই সাড়ে ছ'টায়।

কিন্তু প্লেন তো আর এখান থেকে ছাড়ছে না। তার জন্যে এয়ারপোর্টে যেতে হবে।

আমার কথায় হেসে উঠলেন রিসেপশনিষ্ট। হাসির তোপে তার ফুলো ফুলো গাল দুটিও নেচে উঠলো। হাসতে হাসতে বল্লেন: প্লেন এখান থেকে না ছাড়লেও প্লেনের বাস ছাড়বে প্রায় এখান থেকেই—এয়ার টারমিনাল তো দু'টো ব্লক পরেই। হোটেল থেকে ক্যাবে দু'মিনিট। আরো অন্ততঃ পনেরো মিনিট আপনি বিশ্রাম করতে পারেন। বসুন, বসুন—একটু গল্প করা যাক্।

টাকা-পয়সা মিটিয়ে দিয়েও যেন হোটেল ছেড়ে আসতে চাইছিলো না মন। মাত্র চারটি দিনের পরিচয়ের এতো আকর্ষণ!

রিসেপশনিষ্ট ভদ্রলোক সত্যি সত্যি ভারি রসিক।

ঠিক সাড়ে ছ'টা। প্লেন উড়লো ঠিক কাটায় কাটায়।

আমার পাশের সীটের ভদ্রলোক খুব গুরু-গম্ভীর। খবরের কাগজে তাঁর নিবিষ্ট মন। আমিও তাই নির্বাক। একখানা বই খুলে নিয়ে তাই পড়ি। একটু বাদেই বিমান-বান্ধবীর আবির্ভাব। ইংরেজীতে যাকে বলে এয়ার হোষ্টেস্। যাত্রীদের নাম মিলিয়ে নেওয়া তাঁর প্রথম কাজ। তারপরে সবার সুযোগ সুবিধে দেখা শোনা।

আপনার নাম?

উত্তরে আমার নাম শুনেও সঙ্গে সঙ্গে তা টুকে নিলেন না এয়ার হোস্টেস। আমার মুখের দিকে তাঁর অবাক দৃষ্টি।

কেন? কী ব্যাপার? ব্যাপারটা কেমন যেন অদ্ভুতই মনে হলো আমার। জিগ্যেস করলাম: কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, আপনার পদবীর বানানটা কি?—উত্তরে প্রশ্ন এলো বিমান-বান্ধবীর দিক থেকে।

পদবীর বানান্ বললাম।

এবারেও কিছু লিখলেন না ভদ্রমহিলা। এবার তিনি তাঁর মিষ্টি দৃষ্টি তুলে তাকালেন। একবার আমার পাশের যাত্রীর হাতের পত্রিকার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে ফেরআমার দিকে চাইলেন। মনে মনে কি যেন মিলিয়ে নিলেন। তারপর বল্লেন:

আজকের 'সানফ্রান্সিস্কো একজামিনারে' এক ভদ্রলোকের মস্ত বড়ো বিবৃতি বেরিয়েছে। ফটোও বেরিয়েছে তার সঙ্গে। ঠিক আপনার মতোই তাঁর নাম। দেখুন তো এ আপনিই কিনা!—বলেই পাশের সহযাত্রীর হাতের কাগজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আমার।

হ্যাঁ, ঠিকইতো ধরেছেন বিমান-বান্ধবী। 'স্যানফ্রান্সিস্কো একজামিনার' আমার জবাবটাও পুরোপুরি বার করেছে তা'হলে! আমার ফটোটাও দিয়েছে। ওদের ফটোগ্রাফারেরই তোলা সে ছবি। আমাদের কন্সাল জেনারেল শ্রীনন্দ গভীর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন এ বিবৃতির প্রকাশ সম্বন্ধে। আমিও একটু হতাশ হয়েছিলাম পরদিনই বিবৃতিটি প্রকাশ না হওয়ায়। ওদের সাংবাদিক সততায় সম্পূর্ণই আস্থা হারাতে হতো এ যদি সত্যি সত্যি ছাপা না হতো। এ রীতিমতো একটা কলমের লড়াই। বিদেশে আমার জাতীয় সম্মানকে আমি ক্ষুণ্ণ হতে দিতে পারি না আমারই সমধর্মী পাক্ সাংবাদিকের হাতে। আমার এ জবাব মাত্র দু'দিন আগের 'সানফ্রান্সিস্কো একজামিনারে' প্রকাশিত 'লাহোর স্টার' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ আজিজ বেগের সুদীর্ঘ এক ভারত-বিরোধী প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত প্রতিবাদ। কালও বেগের ভারত-বিরোধী প্রচারের আর এক দফা বেরিয়েছে সান্-ফ্রান্সিস্কোর আর একখানি দৈনিকে, 'সানফ্রান্সিস্কো ক্রনিকলে'। এক দফা ভারত-বিরোধী বিষোদ্গার নয়, দু'দফা। একই দিনে দু'কিস্তি। পাকিস্তান প্রসংগ আলোচনার পাশে 'স্পিরিট অব আমেরিকা' ব্যাখ্যায় নির্লজ্জ স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতকে শায়েস্তা করার সুপারিশ! এরও প্রতিবাদ তৈরি করে পাঠাতে হয়েছে 'ক্রনিকেলে'। কালকের সারাটি দিনই কেটেছে তীব্র উত্তেজনায়। থাক সে সব।

হ্যাঁ, এটি আমারই লেখা। আমারই ফটো।—বলতেই হেসে ফেল্লেন এয়ার হোস্টেস। প্রসন্নতার হাসি। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন।

পাশের সহযাত্রী এতোক্ষণ ধরে আমার বিবৃতিই পড়ছিলেন একমনে। এবার হঠাৎ যেন তাঁর ধ্যান ভাঙ্‌লো। কাগজ থেকে চোখ তুলে নিয়ে দৃষ্টিছায়া ফেললেন আমার মুখের ওপর। তিনিও একবার আমায় মিলিয়ে নিলেন আমার ফটোর সঙ্গে। তারপর প্রশ্ন করলেন ঃ

আপনি বুঝি লেকচার ট্যুরে এসেছেন ?

না, ঠিক তা নয়। তবে বলতে হচ্ছে কোথাও কোথাও। তোমাদের দেশে আমন্ত্রিত হয়ে এসে তোমাদের কাগজে আমরা দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র সাংবাদিক বিতর্কে নেমেছি, এ ভারি লজ্জার কথা। আমেরিকা তো আমাদের দু'দেশেরই বন্ধু। তাই তোমাদের দিক থেকেও এ খুব অসুবিধার ব্যাপার।

তা'হলেও আপনার দিক থেকে আপনি ঠিকই করেছেন। মিঃ বেগের প্রবন্ধের উত্তর না দিলেই বরং আপনার কর্তব্যচ্যুতি ঘটতো। বেগের লেখা পড়েই ভারতের বক্তব্য জানবার ইচ্ছে হয়েছিলো। আপনার জবাব অত্যন্ত সংযত বলেই হয়তো খুব ভালো লেগেছে।—ভদ্রলোক হেসে হেসে এ উত্তর দিলেন। জানিনা এ তাঁর মনের কথা কিনা।

এবারে কোথায় চলেছেন ?—আমার ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গেই নতুন প্রশ্ন।

উত্তর দিলাম, কলাম্বিয়ায়।

বেশ, বেশ। মিজৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম স্কুলের খুব সুনাম। সেখানে আপনাকে বলতে হবে কিছু নিশ্চয়ই। তাই না ?

কলাম্বিয়ার প্রোগ্রাম আমার কিছুই জানা নেই। তবে ওখানকার স্কুল অব জার্নালিজম্‌-এর ডীন ডক্টর ইংলিশই আমার কলাম্বিয়ার 'স্পন্সর'। তাঁর ওপরই আমার প্রোগ্রাম তৈরী করার ভার।

তা'হলে তো নিশ্চয়ই তাঁর ছাত্রদের সভায় অন্ততঃ ভারত সম্পর্কে কিছু বলতেই হবে আপনাকে। খুবই চমৎকার লোক ডীন ইংলিশ।—আগে থেকেই আমার 'স্পন্সরে'র প্রশংসা শুনে ভালো লাগলো। কিন্তু যিনি তাঁর প্রশংসা করলেন তিনিও যতোটা ভেবেছিলাম ততোটা গুরু-গম্ভীর নন। বেশ মিষ্টি আলাপী ভদ্রলোক।

কখনো পড়ায়, কখনো নিদ্রায়, আর মাঝে মাঝে কথায় কথায় পথ ফুরোয়। তার ওপর যথা নিয়মে খানাপিনা তো আছেই।

আমাদের বিমান আর এক বিমান ঘাঁটিতে। আমরা ক্যানসাস্ সিটিতে বেলা আড়াইটায়।

টি-ডবলিউ-এর এ বিমানখানি আরো দূরযাত্রী। আমার পার্শ্ববর্তীও তাই। আমার অবতরণ স্থান ক্যানসাস্ সিটি। সহযাত্রীকে বিদায় নমস্কার জানিয়ে তাই বিদায়। 'সান্‌ফ্রাসিস্কো এক্‌জামিনার' কাগজখানা ফেরৎ দিতে গিয়ে বাধা।

না, না ও কাগজখানা আপনার কাছেই থাক। আপনার দরকার হবে। আমার তো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রয়োজন শেষ।—বিদায় নেবার মুহূর্তে ছোট্ট একটি ঘটনা। কয়েক মুহূর্তের অন্তরংগতার একটি অপূর্ব নিদর্শন। অপরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার এ দৃষ্টান্ত মনে রাখার মতো।

খুবই সত্যি কথা বলেছিলেন ভদ্রলোক, কাগজখানা আমারই রাখা দরকার। সুদূর আমেরিকায় গিয়েও যে কলমের লড়াইতে পড়তে হয়েছিলো আমাকে তার কোনো প্রমাণ থাকবে না আমার সঙ্গে! ঐ কাগজখানা না আনলে তার আর একখানা কপি সংগ্রহ করা হয় তো হয়েই উঠতো না পরে। মনেই কি আর থাকতো বেশি দিন ঐ লড়াইয়ের স্মৃতি!

"অনাদি প্রাণের মন্ত্র
তোমার নব কিসলয়ের মর্মে এসে মেলে—
বিশ্বহৃদয়ের সেই আনন্দমন্ত্র—
'ভালোবাসি'।

* * *

ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে সৃষ্টির শাশ্বত বাণী—
'ভালোবাসি'।

* * *

জীবনের শেষ বাণীতে হ'ক উদ্ভাসিত—
'ভালোবাসি'।"

—শেষসপ্তক

ঈশ্বর কোথায় ?

[একাঙ্কিকা]

॥ শ্রীমন্মথ রায় ॥

"How am I to talk of God to the millions who have to go without two meals a day? To them God can only appear as bread and butter."—Mahatma Gandhi.

[ধনী শিষ্য-গৃহে শিষ্য ও শিষ্য-পত্নীর সহিত আলাপরত গুরুদেব।]

শিষ্য—প্রচুর দেনা রেখে বাবা মারা গেলেন। মারা যাবার সময় শুধু একটা কথা বলে যেতে পেরেছিলেন।

গুরুদেব—কি ?

শিষ্য বললেন,—'দেখ বাবা' ঐশ্বর্যের মোহে আমি ভগবানকে ভুলে গিয়েছিলাম। দুঃখ দুর্দশা দিয়ে ভগবান আমাকে শেষ বয়সে সেই কথাটাই বড় বেশি করে মনে করিয়ে দিয়েছেন। এ কথাটা তুমি মনে রেখো। ঈশ্বরকে ডেকো। তাঁর কৃপায় আবার তুমি উঠবে—বড় হতে পারবে।'

গুরুদেব—মৃত্যুকালে তোমার পিতা পরম সত্যটিই লাভ করেছিলেন।

শিষ্য—দেনার দায়ে, সংসারের চাপে আমার কাছে কিন্তু এ সত্যটি চাপা পড়ে গিয়েছিল। ভগবানের কথা দিনান্তে মনে করতে পারিনি আমি—জীবনযুদ্ধ এমনি তীব্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার। কিন্তু আশ্চর্য, ভগবানকে স্মরণ-মনন না করেও আমি ক্রমাগত জিতেই যেতে লাগলাম আমার সেই জীবন-যুদ্ধে। পরে বুঝতে পারলাম, এটা আমার ভুল। আমার এ ভুলটা ভাঙলেন ইনি—আমার স্ত্রী।

গুরুদেব—কি মা। তুমি ?

শিষ্য-পত্নী—লক্ষ্মী-নারায়ণের পট-মূর্তি ছিল বাড়িতে। উনি যখন জীবন-যুদ্ধে হাবু-ডুবু খাচ্ছেন, তখন আমি সেই পটের সামনেই পড়ে থাকতাম অনুক্ষণ। দেখলাম, ব্যর্থ হলোনা আমার কান্না। বিপদের পর বিপদ যেতে

লাগলো কেটে। দেনা হলো শোধ, তখন মানত করলাম, লক্ষ্মীনারায়ণ, যা দেনা ছিলো,—তোমারই কৃপায় শোধ হ'লো। এবার, দাও—আমার ঘর সংসার ভরে দাও তোমার ঐশ্বর্যে। আমি তোমার সোনার মূর্তি গড়াবো—রূপোর সিংহাসনে বসাবো। তোমার জন্যে শ্বেত পাথরের মন্দির গড়ে দেব।

শিষ্য—এই মানতটির কথা ইনি আমায় যে-দিন বললেন, সেইদিন থেকেই সুরু হলো আমার ভাগ্যোদয়। সেদিন থেকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, আমি যা'তে হাত দি' তাই হতে লাগলো সোনা। বছর যেতে না যেতেই ব্যবসা'তে যে টাকাটা লাভ হলো, তার পরিমাণ অন্তত দশ লাখ।

গুরুদেব—শুনে আমার রোমাঞ্চ হ'চ্ছে বাবা। (হাসিয়া) আর তবে কোনো সন্দেহ নেই যে ঈশ্বর আছেন—আর সে ঈশ্বর পরম দয়ালু।

শিষ্য-পত্নী—আর তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে আমাদের জীবনে। এবার আমাদেব মানত রক্ষার পালা।

শিষ্য—তাই আপনাকে স্মরণ করেছি আমরা। দয়া কবে এসেছেন আপনি। লাখ টাকা ব্যয় করে লক্ষ্মী-নারায়ণের সোনার মূর্ত্তি, রূপার সিংহাসন আর শ্বেত পাথরেব মন্দির গড়া ঠিক করেছি আমরা। আপনি আমাদের গুরুদেব। আপনাব পরামর্শ মত এ কাজটা করতে চাই আমরা।

গুরুদেব—অনেক কিছু ভাববার আছে বাবা।

শিষ্য—সে আপনি ভাবুন। তাড়া নেই কিছু। লাখ টাকা আমি এই বিগ্রহ আর মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য আলাদা করে রেখেছি। কত বড় মূর্তি হবে, মন্দিরই বা কত বড় হবে—আর সে মন্দির কোথায় করা হবে, প্রতিষ্ঠার দিনই বা কবে ধার্য করতে চান, এসব ভেবে-চিন্তে আপনি আমায় বলুন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হবে কাজ।

গুরুদেব—বড় গুরু দায়িত্ব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ বাবা!

শিষ্যপত্নী—আপনার জল খাবার এসেছে বাবা।

গুরুদেব—এর নাম জলখাবার! এ যে এক রাজসূয় যজ্ঞ। একি, এ যে কেবলি আসছে! খাবারে খাবারে ঘর ভরে গেল যে মা!

শিষ্যপত্নী—কত কাল পরে আপনি এসেছেন বাবা।

গুরুদেব—তোমার কথায় মনে হচ্ছে মা, এত কাল আমি যেন কিছু খাইনি। এত কালের খাবার তুমি মা যেন একদিনে আমার সামনে ধরছো······ওকি! বাইরে যেন কে চীৎকার করছে!

শিষ্য—কে !

শিষ্যপত্নী—কি যেন একটা গোলমাল শুনছি।

শিষ্য—রামধন ! কে চীৎকার করছে, দেখ দেখি !

রামধন—আজ্ঞে হুজুর, একটা পাগলা। এত বার তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু বারবার আসছে। চীৎকার করে শুধু বলছে, 'ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর নাই।'

শিষ্য—ঈশ্বর নেই ! এই কথা বলছে লোকটা ? কী পাপ !

শিষ্যপত্নী—এত বড় অধর্মের কথা লোকটা এসে বলছে এই বাড়িতেই !

শিষ্য—ওকে মেরে তাড়িয়ে দাও রামধন।

শিষ্যপত্নী—তোমাদের আক্কেলটা কি রামধন ? যখন গুরু সেবার আয়োজন এখানে, তখন কিনা এই অনাচার !

রামধন—যাচ্ছি মা। এ পাপ আমি এখনি বিদায় করছি।

গুরুদেব—না-না শোনো রামধন। লোকটাকে তুমি এখানে একবার আনো দেখি ! বলছে ঈশ্বর নেই ! লোকটাকে আমি দেখব।

শিষ্যপত্নী—আপনার সেবা শেষ হো'ক আগে গুরুদেব। তারপর বরং—

শিষ্য—হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকটা এখন এখানে এলে আপনার সেবায় অনাচার হবে গুরুদেব।

গুরুদেব—না-না। লোকটার স্পর্ধা দেখ। বলে, ঈশ্বর নেই। ওর সঙ্গে আগে আমার বোঝা-পড়া হবে, যা কিছু। রামধন, আমি বলছি তুমি লোকটাকে ধরে আনো এখনি আমার কাছে।

রামধন—যে আজ্ঞে।

গুরুদেব—লোকটার কথায় আমার মনে বড় একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেই প্রশ্নটির বিচার করতে চাই ওর সঙ্গে। ওকে তোমরা কেউ করো না অনাদর—করো না অবহেলা। বুঝলে ?

শিষ্য—তাই হবে গুরুদেব !

গুরুদেব—তুমি মা কোনো কথা কইছো না যে !

শিষ্যপত্নী—আপনার কথার ওপর কথা কইবার স্পর্ধা নেই আমার প্রভু।

গুরুদেব—উত্তম। আর একখানি আসন আনো মা।

শিষ্যপত্নী—আনছি বাবা !

গুরুদেব—ভারতবর্ষ দেবভূমি। ভারতের লোক নাস্তিক হ'তে পারে না কখনো। নাস্তিকতা প্রচার করতে চেয়ে ছিলেন 'চার্বাক'। কিন্তু ভারত

তাতে কর্ণপাত করেনি কখনো। ভারতের প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে সামবেদীয় শান্তি-বচনে—"আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, ব্রহ্ম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করেন; তাঁহার সহিত আমার এবং আমার সহিত তাঁহার নিত্য অবিচ্ছেদ হউক।"

শিষ্যপত্নী—আসন এনেছি বাবা।

গুরুদেব—আসনটি আমার পাশেই পেতে দাও মা।

রামধন—লোকটাকে ধ'রে এনেছি বাবা!

লোকটি—এই তো আমি এসেছি। সত্যি কথা বলবো তাতে ভয় কি? কে বলে ঈশ্বর আছে? আমি বলছি ঈশ্বর নেই—ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর যদি থাকবে, তবে আমি খেতে পাইনে কেন? খেটে খেতে চাই, কাজ পাইনে কেন? আমার স্ত্রী-পুত্র অনাহারে থাকে কেন? আমি আজ দু'দিন অনাহারে আছি কেন?

গুরুদেব—এস বাবা, বসো—আমার পাশে, এই আসনে। খেতে খেতে আমরা আলোচনা করবো, ঈশ্বর আছেন কি নেই।

লোকটি—ওরে বাবা, এত খাবার! আমাকে খেতে বলছো? আমি খাবো?

গুরুদেব—হ্যাঁ, খাবে বৈকি! নইলে এত খাবার কি আমি একা খেতে পারি বাবা! সুরু কর বাবা—সুরু কর। খেতে খেতে এসো আমরা বিচার করি, ঈশ্বর আছেন কি নেই।······তুমি বলছো ঈশ্বর নেই। একথা কেন বলছো বাবা?······কি চুপ করে রইলে যে?

শিষ্য—খেতে ব্যস্ত। আপনার কথার উত্তর দেবার সময় নেই ওর।

গুরুদেব—ওহে শুনছো? আমি যা তোমাকে জিজ্ঞেস ক'রেছি, শুনছো?

লোকটি—হুঁ।

গুরুদেব—যদি শুনেছ, তবে উত্তর দিচ্ছ না কেন বাবা?

লোকটি—হুঁ।

শিষ্য-পত্নী—উত্তর দিতে সময় পাচ্ছেন না বাবা!

গুরুদেব—কিন্তু উত্তর না দিলে তো আমি ছাড়বো না তোমায় বাবা! আমি জানতে চাই—ঈশ্বর নেই এত বড় কথা তুমি কেন বলো? আমার দিকে তাকাও—উত্তর দাও।

শিষ্য—উত্তর দিতে উনি সময় পাচ্ছেন না গুরুদেব।

শিষ্য-পত্নী—কিন্তু আপনি তো কিছুই মুখে দিলেন না গুরুদেব।

গুরুদেব—প্রশ্নটির উত্তর পাবো, তবে আমি খাবো মা।

শিষ্য—এ খাবার শেষ না হলে, এর উত্তর আপনি পাবেন বলে মনে হচ্ছে না গুরুদেব!

শিষ্য-পত্নী—আর, আপনার জন্যে যে কিছু থাকবে তাও মনে হচ্ছে না গুরুদেব!

গুরুদেব—ওহে শুনছো?

লোকটি—হুঁ।

গুরুদেব—কি শুনছো?

লোকটি—হুঁ।

গুরুদেব—ঈশ্বর আছেন?

লোকটি—হুঁ।

গুরুদেব—তুমি চেঁচিয়ে কেবলি বল্‌ছিলে, ঈশ্বর নেই।

লোকটি—হুঁ। বল্‌ছিলাম।

শিষ্য—যাক, একটা কথা বেড়েছে।

গুরুদেব—এখন কি মনে হচ্ছে?—ঈশ্বর আছেন?

লোকটি—আছেন। আমার স্ত্রী পুত্রও যদি এমনি দেখতে পায় তবে বলবো—ঈশ্বর শুধু আছেন নয়—সর্বত্র আছেন।

গুরুদেব—এখনো তো অনেক খাবার পড়ে রইলো বাবা। এগুলো তবে তুমি বাড়িতেই নিয়ে যাও।

লোকটি—ঈশ্বরের কি দয়া!

গুরুদেব—রামধন!

রামধন - আজ্ঞে—

গুরুদেব—সব খাবার বেঁধে এর সঙ্গে নিয়ে যাও এর বাড়িতে।

রামধন—যে আজ্ঞে।

লোকটি—ঈশ্বর! ভগবান! তোমার এত দয়া!

গুরুদেব—না-না, রামধন, আমার জন্যে এক পাত্র খাবার রাখো। নইলে আমি হয়ত আবার চেঁচিয়ে উঠবো—ঈশ্বর নেই। না-না, এ হাসির কথা নয়।

রামধন—যে আজ্ঞে।

লোকটি—ঈশ্বর! দয়াময়! আমি বলেছিলাম, তুমি নেই। আমার এ পাপ তুমি ক্ষমা কর—ক্ষমা কর।

গুরুদেব—এখন এ কথাটা বল্‌ছো বাবা, কিন্তু কাল যখন খাবার থাকবে না, —আবার যখন অনাহারে থাকবে তখন—

লোকটি—তখন বলবো, ঈশ্বর তুমি নেই। গরীবের কাছে দু'মুঠো ভাতই হলো গিয়ে ঈশ্বর। চলি ঠাকুর। আজ ঈশ্বরের অপার দয়া পেয়ে গেলাম। কাল কি হবে কে জানে! চলো—চলো ভাই রামধন—বাড়ির লোকগুলো সব অনাহারে শুকিয়ে কুঁক্‌ড়ে মরতে বসেছে। ঈশ্বরকে নিয়ে তুমি চলো ভাই।

গুরুদেব—লোকটি চলে গেল—যেন ঈশ্বরকে হাতের মুঠে ভ'রে নিয়ে গেল। শোন বাবা, শোন মা, তোমরা লক্ষ্মীনারায়ণের সোনার মূর্তি রূপোর সিংহাসনে বসিয়ে শ্বেত পাথরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে চাইছো—লক্ষ টাকা ব্যয়ে!

শিষ্য-পত্নী—ঐটেই আমার মানত বাবা!

শিষ্য—আচ্ছা বাবা, এই যে লোকটি এলো আর গেল, এতে আপনার কোনো ইঙ্গিত ছিল কি?—হাত ছিল কি?

গুরুদেব—না না, এ তুমি কি বলছো বাবা! লোকটিকে এর আগে আমি কখনো দেখিনি—চিনিও না।

শিষ্য—ঠিক এই সময়টিতে এ লোকটি তবে এলো কেন! এসে যেন একটা নতুন আলো জ্বেলে দিয়ে গেল আমার মনে!

গুরুদেব—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা বাবা!

শিষ্য—গুরুদেব, সোনার মূর্তি, রূপোর সিংহাসন আর শ্বেত পাথরের মন্দির না গড়ে যদি এই লক্ষ টাকায় গড়ে তুলি একটা ম্যাচ্‌ ফ্যাক্টরী—দেয়াশলাইয়ের কারখানা—

গুরুদেব--তা' দেশলাইয়ের আলোতে অনেক অন্ধকার দূর হয় বাবা।

শিষ্য-পত্নী—কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের কৃপাতেই আজ আমাদের এই বাড়-বাড়ন্ত। সেই লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে আমার মানত। দেশলাইয়ের কারখানা করলে সে মানত তো পূর্ণ হবে না বাবা। ঈশ্বরের কাছে সত্যভঙ্গ হবে। আমাদের মঙ্গল হবে না—মঙ্গল হবে না তা'তে।

শিষ্য—নাগো। স্পষ্ট দেখলাম ঈশ্বর আছেন—কিন্তু তিনি আছেন ক্ষুধার অন্নে—সেই অন্ন তুমি বিতরণ কর। লক্ষ্মী-নারায়ণ তাতে শুধু আমাদের

ঘরে প্রতিষ্ঠিত হবেন না—প্রতিষ্ঠিত হবেন কারখানার প্রতিটি কর্মীর ঘরে ঘরে।

শিষ্য-পত্নী—কিন্তু আপনি কি বলেন বাবা!

গুরুদেব—লক্ষ্মীনারায়ণ আজ দরিদ্র নারায়ণ। হ্যাঁ মা, তিনি সোনা নন, রূপো নন, শ্বেত পাথরও নন। পেট ভ'রে খেতে পেয়ে ঐ লোকটির চোখে-মুখে যে আনন্দ, যে তৃপ্তি ফুটে উঠেছিল, আর কোথাও কি তা দেখেছ মা!···উত্তর দাও মা!···কি ভাবছ?

শিষ্য-পত্নী—দেখেছি বাবা।

গুরুদেব—কোথায়?—কোথায় দেখেছ মা!

শিষ্য-পত্নী—আমার লক্ষ্মী-নারায়ণের মুখে—ঐ পটের মূর্তিতে।

শিষ্য—আর আমার কোন সংশয় নেই। ঐ লক্ষটাকায় আমি ম্যাচ-ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠা করবো—গুরুদেব।

শিষ্য-পত্নী—তার নাম দিয়ো লক্ষ্মীনারায়ণ ম্যাচ ফ্যাক্টরী।

গুরুদেব—হ্যাঁ মা, তাতেই তোমার মানত সার্থক হবে মা। তোমাদের জয় হোক্—জয় হোক্।

—॥ যবনিকা ॥—

'মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্মম, দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।

—শেষ সপ্তক।

সাময়িকী

বিজয়া দশমী ঃ [বিগত ১৩৬৪ সনের বিজয়া দশমী দিনে সন্ধ্যারতির পর শ্রীমৎ স্বামীজী যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার যেটুকু আমি টুকিয়া রাখিয়াছিলাম, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। তাঁহার ভাষণের নোট রাখা সহজ নয়—তাই খুব সামান্যই নোট করিতে পারিয়াছি। সকল বাক্য শেষও হয় নাই। স—উঃ ভাঃ]

শ্রীনিত্যগোপাল ১৩১২ সনের ১৩ই অগ্রহায়ণ যে দুর্গামন্ত্র আমার জীবনে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন, সেইদিন থেকে দুঃখের তূর্য বাজবার অর্থ খুঁজে পেয়েছি।...... আগে ছিলাম কুনো...বহির্জগতের সঙ্গে সম্পর্ককে অবিদ্যার খেলা বলে জানতাম—শ্রীনিত্যগোপালের কাছে এসে জানতে পেলাম বহির্জগৎ মায়েরই রূপ।...কতখানি পূজা করতে পেরেছি জানি না...সকল জীবন দিয়ে আস্বাদন করবার চেষ্টা করেছি...শিবাণী...শিব দুর্গা...অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তোমার মহাকালী রূপ দেখেছি...সপ্তমী পূজায় ধ্বংসের পটভূমিকায়...নূতন সৃষ্টির পত্তন হল অষ্টমী পূজার দিন।......একটা ধ্বংসোন্মুখ বিশ্বের মধ্যে একটা উজ্জ্বলভারতের চিত্র ফুটে উঠল...সেই দিন থেকে...বিশ্ব আমায় ডাকে।......১৯১৯-এর ৯-ই ফেব্রুয়ারী আবার বেড়িয়েছি পথে...নরনারায়ণ আশ্রম চোখের জল দিয়ে বিশ্বের অন্তরালে নিভৃতে মায়ের পূজা করছে...ব্যক্তিগত সংসার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বনাথের সংসার করি...জানি না কে আসবে...আমি শ্মশানে একলা পূজা করব... আমি বেশ নেই...আমার বড় জ্বালা...সর্বদেবশরীরজ সর্বভূতস্থিত সেই জগন্মাতা মহালক্ষ্মীর স্পর্শ পেয়ে.. সাধের ঘর ভেঙ্গে গেছে · ছোট সংসার ছেড়ে দিয়ে বিশ্বকে ভাল বাসে এমন কয়েকটি প্রাণ চেয়েছিলাম।... বিশ্বেশ্বরী...মানুষের দুঃখ বইবার চেষ্টা করেছি...যা কিছু আমি পেয়েছি আমি তো ভোগ করিনি—শিব যে আমার পিতা...। চোখের জল নিয়ে চলেছি...আমি বিশ্ব ছাড়া কিছু ভালবাসি না...নূতন সৃষ্টির সামনে শ্মশানে পুরুষোত্তম-সাধক...ভোগ্য বস্তুকে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেটাই মহাসরস্বতীর পূজার দিনের কথা.. (ভোগ্যবস্তু বলতে যা কিছু একজন নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগাতে চায়............)। জমিদার জমি ভোগ করতে চেয়েছিল, ধনিক ধন ভোগ করতে চেয়েছিল। মূল্য দেয় নি বলে জমিদারের জমিদারী গেল, কুলীনের কৌলীন্য

গেল।···আজ দেশ অন্নহীন, অন্ন আজ বল দেয় না···পুরুষ স্ত্রৈন, বৈশ্য অলস···বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বে ভুজ্ ধাতু চলবে না, চলবে ভজ্ ধাতু।··· বস্তুকে ব্রহ্মমূল্য প্রদান কর···বিজয়ার ইহাই কথা—তখনই বস্তুকে জয় করা হয়।...তোমার মত অন্নও ব্রহ্ম···স্বাধীনে স্বাধীনে কোলাকুলি করতে হবে। কেন সর্বত্র সজ্ঘর্ষ এসেছে?···সব কিছুকে ভোগ করতে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া··· ইংরেজ ভারতবর্ষকে ভোগ্য করে রেখেছিল...ভোগ করতে গেলে বস্তু, অন্ন শুকিয়ে যায়···পুরুষোত্তমানন্দের দুর্গাপূজা দেখতে কেউ আসে না···আমার যা কিছু সম্পদ তা বিশ্বের···একলা গায়ের জোরে ব্যক্তিগত সংসারও চলবে না, বিশ্বের রাজনীতিও চলবে না।···মা কুলীনের চেয়ে ছোটলোককে ভালবাসেন···রাম গুহকচণ্ডালকে ভালবেসে বিজয় লাভ করেছিলেন।···সকলের ক্ষুধা মা···সকলের পুষ্টি আমার পুষ্টি...সংসারের একটু অতীত না হলে সংসার করা যায় না···স্ত্রীপুত্রকন্যা পাছে আমায় পেয়ে বলে তাই পরিবারের বাইরে বরিশালের কাজ করেছি, বরিশাল পাছে আমায় পেয়ে বসে সেইজন্য বাংলার কাজ করেছি···শিবেরই তো সংসার...সন্ন্যাসী শিবেরই গৌরী...নিজের সংসার গুছাতে তো তিনি ডাকেননি...বিশ্বের সংসার গুছাতে ডেকেছেন ...বিধবার দুঃখ কে দূর করবে? দুঃখের পথেই তো তাঁকেই পাওয়া যায় ...বিজয় অর্থ ব্রহ্মমর্যাদা দান করা... গৌরীর মর্যাদায় শিব গৌরীপতি, শিবের মর্যাদায় গৌরী শিবাণী...রাধারাণী ডাক দিয়েছেন মেয়েদের ওঠ, জাগ।... নারীর শক্তি পুরুষ, পুরুষের শক্তি নারী...শিব না থাকলে শক্তি উচ্ছৃঙ্খল। বিজয় করতে হলে কিছুকে ঘৃণা করা চলবে না...একটা মানুষ মা মা বলে কাঁদে, ভগবান ভগবান বলে এমনি কান্না কাঁদে...কয়জন লোক এমনি কাঁদে? ...মায়ের তত্ত্ব পেয়েছি আজ আবার নূতন করে যাত্রা করলাম...কাউকে, কিছুকে ছোট মনে করলে বিজয় আসবে না...যাত্রার মন্ত্র পড়ে দেখ...ধেনুর বৎস,...গণিকা পর্যন্ত শুভ লক্ষণ। যেদিন ভারতবর্ষ নিজেদের মধ্যে ঘৃণা করেছে, সেইদিন মুসলমান, সেইদিন ইংরেজ...মহাপ্রেমের মন্ত্র জড় অজড়ের, চৈতন্য অচৈতন্যের মিলন, কোলাকুলি···এই তো বিজয়—সংসারের প্রতি বস্তুকে ব্রহ্মমূল্যে দেখো...সব কিছু ভজনীয় দৃষ্টিতে দেখো...যাত্রা কর বিশ্বের সঙ্গে বিশ্বের মধ্যে...যতখানি পার নিজেকে বিলিয়ে দাও···সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে......।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩/১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

কার্ত্তিক, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে

'আদিবৃক্ষ এই সংসারের সুখ-দুঃখ দুইটী ফল; আনন্দ-ঘন পুরুষোত্তমে যাহার যাত্রা তাহার আনন্দের মাঝে সুখ-দুঃখ সমান হইয়া যায়। 'সুখ-দুঃখ সমান হল আনন্দ সাগর উথলে'—কমলাকান্ত। আদি বৃক্ষের তিনটী মূল—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। সত্ত্ব রজঃ তমঃ যখন পরস্পরকে অভিভব করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল, তখনই সংসার মিথ্যা। যখন উহারা বিনিয়ধর্ম্মী হইয়া পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হইয়া 'এক' জীবন গড়ে, তখনই উহারা নির্গুণ। সংসার-বৃক্ষ তখনই কর্ত্তিত হইয়া যায়, পুরুযোত্তম-সংসার প্রতিষ্ঠিত হয়। আদিবৃক্ষ চতুঃরস। বিষয়ী ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চারিটী রসের জন্য ঘুরিয়া মরে। প্রেম-স্বরূপ পুরুষোত্তম জীবনে অবতরণ করিলে চারিটী রসই 'ফিকা' হইয়া যায়, কিম্বা চারিটী রসের পরম অর্থ আস্বাদিত রস। বিষয়ীরা সব রসকে বিকৃত না করিয়া ছাড়ে না। রস-ঘন পুরুষোত্তম-স্পর্শে সেই বিকৃত রস আবার নির্ব্বিকারত্ব লাভ করে।

শ্রীকৃষ্ণ-জীবন দুঃখ-মন্থন।......নিজে শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর দুগ্ধ পান করিবার মত ভাগ্য লাভ করেন নাই। অনন্ত দুঃখের জীবন লইয়াই তিনি ভিখারী ভগবান, দীনময়, কাঙ্গালশরণ।'

—পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী
১৯শে আগষ্ট, ১৯৫৭

মহাকবি বল্লত্তোল ও মহামানব পুরুষোত্তমানন্দ

॥ শ্রীসতীশচন্দ্র গুহঠাকুর ॥

মহাকবি বল্লত্তোল (Vallathol) নারায়ণ মেনোন * খৃঃ ১৯৫৮ ১৩ মার্চ ৮০ বৎসর বয়সে কোচিন প্রদেশের এরনাকুলম্ নগরে পরলোক গমন করিয়াছেন। ঠিক ১৮ দিন পরে ১লা এপ্রিল বাংলাদেশের মহামানব স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত † ৭৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় দেহরক্ষা করিয়াছেন। উভয়ে পরিণত বয়সেই চলিয়া গিয়াছেন। ভারতবাসীর আয়ুষ্কাল এর বেশী আর কি হয়? কিন্তু দেশের ও জগতের দিক দিয়া উভয় মহাত্মাই আরো কিছুকাল দেহে থাকিলে উত্তম হইত।

মহাকবি বল্লত্তোল

বল্লত্তোল রাষ্ট্রকবি। শ্রীবোম্মানা বিশ্বনাথম্ 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যায় (১০।৫।১৯৫৮) তাঁহার জীবনবৃত্ত বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপ. নারায়ণ 'যুগ-প্রভাত' হিন্দী পাক্ষিক পত্রে তাঁহার "কলা-সাধনা" বিবৃত করিয়াছেন। বিশ্বভারতী পত্রিকায় ইঁহার বিস্তৃত জীবনী বাহির হইয়াছে। Indian P.E.N. জুলাই সংখ্যায় ম. কুন্হাপ্পা অর্ঘ্য দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতোই এই কবিও শৈশবে কৈশোরে স্কুল-কলেজের ভিতর দিয়া শিক্ষালাভ করেন নাই, নিজেই নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছেন।

শিশুকালেই তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে মাতৃভাষা মলয়ালম্ ও দেব-ভাষা সংস্কৃত পাঠ দেন। কৈশোরেই তিনি অনেক সংস্কৃত কাব্য ও নাটকের আস্বাদন পাইয়াছিলেন। কাকা তাঁহাকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দিবার প্রচেষ্টা

* বল্লত্তোল নারায়ণ মেনোন মালাবার (কেরল) প্রদেশের পেনাই তালুকে, বল্লত্তোল গ্রামে ডেক্তেনাড়ু পরিবারে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বল্লত্তোল নামেই ইনি সর্বজন-পরিচিত। তাঁহার গর্ভধারিণী পার্বতী অম্মা, পিতা মল্লেসরি দামোদরন্ এল্লায়াত্। কোচিন ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার লইয়া কেরল প্রদেশ গঠিত। দেশভাষাও কৈরলী, সাম্পয়ালী বা মালয়ালম্।

† স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত গার্হস্থ্যজীবনে বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ নামে পরিচিত ছিলেন।

করেন; কিন্তু তিনি বিষয়টির কার্যকরী দিকে অগ্রসর না হইয়া, বরং আয়ুর্বেদের উপর কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা ব্যবসায় গ্রহণ না করিয়া তিনি লেখনীর উপর নির্ভর করিলেন।

আকৈশোর তিনি গঠনমূলক কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। নিতান্ত কম বয়সেই একটি পাঠচক্র গড়িয়া, সংঘ সৃষ্টি কৌশলের পরিচয় দেন। কি করিয়া বক্তৃতা দিতে হয়, বিতর্কের ন্যায়ানুমোদিত পন্থা কি, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা এবং পরস্পরের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির আদান-প্রদান দ্বারা সদস্যগণ সমৃদ্ধ হইতেন। এতদ্ব্যতীত গদ্য ও পদ্যে লেখন-শৈলী আলোচনা দ্বারা লেখক-সৃষ্টিকর্ম চলিল বল্লত্তোলের নেতৃত্বে।

পিতা মল্লেসরি দামোদরন এল্লায়ার্ত কথকলী নৃত্য-কৃষ্টিতে আকৃষ্ট ছিলেন। উত্তরাধিকার-সূত্রে অর্জিত এই বিদ্যায় তাঁহার দুইটি ভগিনী পারদর্শিতা লাভ করিলেন তাঁহারি নেতৃত্বে। যে 'কলামণ্ডলমে' এই নৃত্যনাট্য শিক্ষা দেওয়া হয়, সমগ্র ভারতে আজ শান্তিনিকেতনের পরই উহার উল্লেখ হয়।

গ্রাসাচ্ছাদন আহরণের জন্য বল্লত্তোল প্রথমে ২৬ বৎসর বয়সে এক প্রেসের ম্যানেজারি করিতে আরম্ভ করেন; সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পত্র পত্রিকার সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেন। গদ্য-পদ্য উভয়-ই লিখিতেন; এবং লেখকদের সহায়তার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। ইনি 'রামানুজন্' 'কেরলোদয়ম্' এবং 'আত্মপোষিণী' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা বহুকাল সম্পাদন করিয়াছেন। কবি একটু বেশি রকমের কাণে-কালা ছিলেন। কিন্তু তাহাতে সাহিত্যসাধনায় বা অন্য কর্মে বাধা জন্মে নাই।

বল্লত্তোলের বিরাট সাহিত্যকর্মের মধ্যে প্রথমেই পাওয়া যায় বাল্মীকি রামায়ণের মলয়ালম্ ভাষান্তর।

মহাকবির অন্তিম কৃতি ঋগ্বেদের ছন্দোবদ্ধ ভাষান্তর। তরুণ বয়সে বাল্মীকি রামায়ণের ভাষান্তর নিয়া তিনি দ্বারে দ্বারে বিক্রয় করিয়াছেন। ঋগ্বেদের মলয়ালম্ ভাষান্তরের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইঁহাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা (২০০০০৲) পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করিয়াছেন। কর্মযজ্ঞের এই মহাপুরুষ নিয়ত অগণিত কর্মদ্বারা উত্তরোত্তর সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তদুপরি বিধিদত্ত কাব্যপ্রতিভা তাঁহাকে লোকচক্ষে আদর্শ-স্থাপন করিয়া গিয়াছে।

কালিদাসের শকুন্তলা-ও তিনি মাতৃভাষায় তর্জমা করেন। তা ছাড়া

ভাস-কৃত বহু সংস্কৃত নাটকের মলয়ালম্ রূপ প্রদান করেন। মৎস্য, বামন প্রভৃতি পুরাণের অনুবাদ-ও বাদ যায় নাই। শেষ বয়সে (বয়ঃ ৭২) ঋগ্বেদের বৈদিক সংস্কৃত হইতে আহরণ করিয়া মাতৃভাষা-সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন এবং সাধারণ ভাবে সংস্কৃতে সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার মলয়ালমে রূপান্তরিত করিয়া জনগণের বোধগম্য করিয়া তোলেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার মূল রচনাও গদ্যে পদ্যে অপরিমিত। কৈরলী সাহিত্য এই একটি মাত্র ব্যক্তির দ্বারা আধুনিক কালে যতটা সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক। কেরলবাসী জনগণ নিরবধি সে সুধা পান করিয়া ধন্য হইতেছে। কেরলের এই রাষ্ট্র কবি মহাকবিরূপে সমগ্র ভারতে সম্মানিত। বর্ত্তমানে কৈরলী সাহিত্যে যে যুগ চলিতেছে তাহা 'বল্লত্তোল' যুগ নামে অভিহিত হয়।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ কৃত শ্রীঅরবিন্দ-প্রশস্তি রচনায় রহিয়াছে 'ভিক্ষা লাগি বাড়াও নি আতুর অঞ্জলি'—মহাকবি বল্লত্তোলেও এ বাক্য প্রযোজ্য। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার বল্লত্তোলকে কদাপি আয়ত্তে আনিতে পারে নাই। প্রিন্স্ অব্ ওয়েল্স্ ভারতে আসিয়া সাদর আমন্ত্রণ জানাইলে এবং উপাধি ও পুরস্কারের লোভ দেখাইলে তিনি কেবল যে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহাই নয়, শোষক সরকারের প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতেই তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন: যে সরকার তাঁহার দেশবাসীর রক্ত-শোষণ করিয়া পুষ্ট হইতেছে, তাহার হাতে পুরস্কার গ্রহণে তিনি ঘৃণা বোধ করেন। এ তো পুরস্কার নয়, ঘুষ! মহাকবির জীবন ব্যাপী সংগ্রামের আভাস ও তেজস্বিতার পরিচয় এই ঘটনার মধ্যে পরিস্ফুট। উত্তর ভারতে থাকিলে এমনতর কবির পক্ষে শ্রীঘর বাস অনিবার্য হইত।

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই সাম্রাজ্যবিরোধী অভ্যুত্থানে বল্লত্তোল-সাহিত্য কেরল দেশে কি আলোড়ন তুলিয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। কবিবর গান্ধীর পরম অনুরাগী ছিলেন। 'মোর গুরুদেব' কবিতায় তিনি মহাত্মার প্রতি অপার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন। মহাত্মার মহাপ্রয়াণে আর একটী কবিতায় অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতিক আন্দোলনে সাহায্য করিতে বল্লত্তোলের গানগুলি অনেক সহায়তা করিয়াছে। জাতীয় পতাকার উদ্দেশে রচিত তাঁহার গান সাম্রাজ্য-

বাদী পুলিসের চণ্ডনীতির বিরোধ করিয়াছে। বিদেশজাত দ্রব্য ও বস্ত্র বহিষ্কারের উপর তাঁহার গান রহিয়াছে।

মানষকে মানুষ করিবার ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সামাজিক কু-প্রথাগুলির অপনয়নের জন্য সারাটি জীবন খাটিয়াছেন। জাতিভেদ ও মহিলা পরাধীনতার উপর শ্লেষ করিয়া তিনি কত কবিতা ও খণ্ড কাব্য রচনা করিয়াছেন। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের অশোভন আচরণগুলির তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার কম্বুকণ্ঠে নিনাদিত হইত। নারীর প্রতি নরের অত্যাচারে তাঁহার মন বিক্ষুব্ধ থাকিত। তাঁহার কাব্যের বিষয়-বস্তু প্রায়শঃ হিন্দু-খৃশ্চিয়ান-মুস্লিম ধর্ম্মের অসঙ্গত আচরণ গুলির প্রতি তীব্র কষাঘাত।

বল্লত্তোলের মৌলিক কাব্য গ্রন্থের মধ্যে প্রথমেই পাওয়া যায় 'তপতী সম্ভবম্'; দ্বিতীয় মহাকাব্য 'চিত্তযোগম্'—উভয়ই সংস্কৃত কাব্য পদ্ধতিতে রচিত। পরে 'বন্ধনস্থনায় অনিরুদ্ধম' খণ্ড কাব্য; ইহাতে পুরাণোক্ত উষা-অনিরুদ্ধ কাহিনী বর্ণিত। অপর এক খণ্ডকাব্য 'শিষ্যনুম মাকানডম্' (গুরু-শিষ্য)। মহেশ্বরের শিষ্য ভার্গবাম এবং পুত্র গণেশের মধ্যে এক মল্লযুদ্ধ বর্ণনায় রহিয়াছে শিষ্য পরশুদ্বারা গুরুপুত্রের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দেন; এই বিষয় লইয়া খণ্ড কাব্যটি রচিত! 'গণপতি' এবং 'পিতা পুত্রী' প্রভৃতি রচনায়ও পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত!

দেশপ্রেম মূলক শাশ্বত কাব্য সঞ্চয় 'সাহিত্য-মঞ্জরী' গ্রন্থটি বল্লত্তোল সাতটি বিশিষ্ট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'স্ত্রী' 'বিপুকনি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। 'ভারত স্ত্রী কলতন ভাবশুদ্ধি' প্রভৃতি রচনা অপূর্ব। ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে 'কাট্টে-লিয়ূডেকত্তু' (পাহাড়ী ইঁদুরের পত্র) কবিতায় জয়সিংহকে লিখিত ছত্রপতি শিবাজীর চিঠির হিন্দী অনুবাদ করিয়াছেন রাষ্ট্রকবি মৈথিলীশরণ গুপ্ত। তাহা দেখি নাই। বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন শান্তি-নিকেতনের উদীয়মান লেখক শ্রীমান্ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। উহা 'দেশ' (১০।৫।৫৮, পৃ. ১৩৬) হইতে তুলিয়া দেওয়া হইল। মহাকবির রচনার কিছুটা পরিচয় ইহার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

[হে জয়সিংহ!]

"অন্য প্রভুর হুকুমে আজ ভাইকে মারবে তুমি?
ঔরংজেব (হ'ল) তোমার আলমগীর!

উপরে ঐ আরো একজন আলমগীরের অনন্ত মন্দির—
ঐ দ্যাখো তাঁর ময়ূর-আসন পৃথিবী আর সূর্যের সঙ্গমে!
[—তুমি ভুললে নকল রাজার ময়ূর পেখমে !!]

ঘরে ঘরে ঘোমটা-ঘেরা চক্ষে আনল জল
ঔরঙ্‌জেব—কত মানুষ করল সে কঙ্কাল !—
আমরা কি সেই দুঃশাসনের উত্তরাধিকারে
ঘরের ভিটা আপন বুকের রক্তে করব লাল ?
[—তুমি ভুললে নকল রাজার ময়ূর-পেখমে !!]

পূর্ব-পুরুষ মানল বুঝি হার !
জয়সিংহ, তোমার দু-হাত্ মানুষ হানবে শুধ্ ?
ঔরংজেব তোমার হাতে মরবে না কখনো
জয়সিংহ, কখন তুমি করবে বাঘ শিকার ?
[—তুমি ভুললে নকল রাজার ময়ূর-পেখমে !!]

বরং দেব মাটির শরীর, অন্তিম নিঃশ্বাস,
দক্ষিণাপথ দেবে না তার একটি বালুর কণা,
দক্ষিণাপথ দেবে না তার মাটির একটি ঘাস
মরবে মুঘল রাজদরবার, আমরাই মরব না !
[—তুমি ভুললে নকল রাজার ময়ূর-পেখমে !!]

ভবানি ! এই আমার খড়্‌গ—খড়্‌গ তো নয় সে যে
কত যুগের কত হোমের শিখা ;
এই যে আমার জন্মভূমি, এই যে আমার বুকে
ভারতবর্ষ—রাজর্ষিদের প্রেষিত-ভর্তৃকা ।।
[—তুমি ভুললে নকল রাজার ময়ূর-পেখমে !!]

—পাহাড়ী ইঁদুর (শিবাজী)

বল্লত্তোল কেবলমাত্র কেরল দেশের মহাকবি নহেন; তিনি ভারতের এবং সমগ্র জগতের। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং জাতীয়তা বোধের উদগাতারূপেও তিনি ভারতবর্ষের মহাকবি। আচার্য শঙ্কর কেরল ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া যেমন ভারতের জগদ্‌গুরু, তেমনি কেরলের বল্লত্তোল ভারতের বিশ্বকবি।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কদাপি তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হন নাই। ১৯৪২

খ্রীষ্টাব্দে ভারত ছাড় আন্দোলন হয়; তাহার দশ বৎসর পূর্বেই তিনি ঘোষণা করেন: 'কালো ধোঁয়া ওড়ানো বিদেশী জাহাজের ভারতবর্ষে আসার কোনো দরকার নেই; প্রয়োজন বোধ করলে আমরা নিজেরাই না হয় ডাকবো। কাজেই এই মুহূর্তে ভারতবর্ষ হইতে বিদায় লও।'

দরিদ্র কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত দীনজনের জন্য বল্লত্তোলের হৃদয় বিগলিত হইত। দরিদ্রের অসম্মানে তাঁহার মনে পীড়া দিত। দেশের অনেক নেতা মুখে দরিদ্রনারায়ণ বলিয়া সম্মান দেখাইলেও, কার্যে তাহাদের বিশেষ উপকারে আসেন না; কিন্তু বল্লত্তোল সে ধরণের নেতা ছিলেন না; তাদের প্রতি কর্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রাণ পণ করিতেন। নিজে মানুষ ছিলেন, মানুষ গড়িবার জন্য আজীবন প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই আদর্শ নিয়া সমস্ত জীবন চলিয়াছেন। ধনিককে ধিক্কার দিতেন—যে দরিদ্র মজুর রাজমিস্ত্রী ধনিকের প্রাসাদ গড়িত, যে দীন জোলা-তাঁতি তার জন্য রেশমী বস্ত্র উৎপাদন করিত, তাদেরকে অর্দ্ধভুক্ত বা অভুক্ত রাখিয়া কোন্ লজ্জায় ধনিক পট্টবস্ত্র পরিহিত হইয়া প্রাসাদে প্রমোদে আত্মহারা হয়!

সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্তবাদী সমাজের পঙ্কোদ্ধারে তিনি অহর্নিশ লাগিয়া থাকিতেন। নারী নির্যাতন সামন্তবাদী ফিউডাল্ সমাজের এক অপরিহার্য অনুষ্ঠান। নারীর প্রতি সমাজের আচরণের ভিতর দিয়া প্রগতিপথের তাপমানযন্ত্রের রেখা নির্ণয় করা যায়।

কাব্যে তিনি কেবল কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি মহিলাদের জীবনকে তুলিয়া ধরিয়াছেন।[৭] আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় মহিলাদের জীবন কারাগার বলিয়া অভিহিত করিলেন। পুরুষেরা মহিলাদের জন্য যে বেড়াজাল সৃষ্টি করিয়া কাপুরুষতা দেখাইতেছে, তাহা যদি মহিলারা ভাঙিয়া দেয় তবে কাপুরুষেরা সেটা সহ্য করিতে পারে না।

বল্লত্তোলের স্ত্রী-চরিত্র অবলা নহে। কালিদাসের শকুন্তলার মতো দুষ্মন্তের সকল অত্যাচার মুখ বুজিয়া সে সহ্য করে না। প্রতিবাদের প্রচণ্ড ভাষা তাহার মুখে যোগাইয়া দেন। অঙ্গদ কুন্তল কঙ্কন হার বলয় অলঙ্কারাদি দূরে ঠেলিয়া আত্মপ্রত্যয় নিয়া সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়; তূণ হইতে এক-এক করিয়া তীরগুলি স্বামীর হাতে তুলিয়া দিতে থাকে। মহাকবির বর্ণিত এক রাজপুত

মহিলা নিজ স্বামীকে রণক্ষেত্রের দিকে আগাইয়া দিয়া বলে, যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার তরবারী যেন সগর্বে সমুন্নত হইয়া বিদ্যুদ্‌বেগে চমকায়।

কবির দৃষ্টিতে ধর্ম্ম ও মহামানবতা কেবল তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, 'বাজারের মা'-দের মধ্যে, দেবদাসীদের ভিতরও মহৎগুণের আবিষ্কার তিনি করিয়াছেন। তাঁহার একটি বিখ্যাত কবিতা 'কোচ্ছ সীতা' (ক্ষুদ্রাকৃতি সীতা) একটি বেশ্যাকন্যার ঘৃণিত জীবন-যাপনের পরিবর্তে মৃত্যু বরণ ঘটনাটির ভিত্তিতে রচিত এক খণ্ড কাব্য।

পৌরাণিক চরিত্রগুলিও বল্লত্তোলের হাত অদ্ভুত রকমের সময়োপযোগী হইয়া দেখা দিত।

এই মহাকবির অসংখ্য গানে কবিতায় প্রণোদিত হইয়া হাজার হাজার মানুষ স্বাধীনভাবে রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িত। কবির ভাষায় এই বীর কেশরীদের কাছে হাতকড়া যেন সোনার কঙ্কন, বন্দীশালা বিলাস-নিকেতন।

'আমাদের জবাব' কবিতায় তিনি ঘোষণা করেন—হয় শেষ গন্তব্যের পথে পৌঁছিব, মৃত্যু বরণ করিতে হয় করিব, তবু বাধা-বিঘ্নকে দু-পায়ে দলিয়া চলিব। এই শপথের বাণী মহাকবির তপস্যায় প্রতিভাত হয়। 'কৃষকের গান' কবিতায় সরকারী নৃশংসতাকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলেন, "যখনি কেহ মাথা খাড়া করিয়া দাঁড়ায়, তখনি তোমাদের তরবারীর ঝংকার চলে—বর্শা ছুটে যায় সেই দিকে, বন্দুকের গুলি পর্যন্ত!"

ভারতবর্ষকে কবি বিশাল হাতীর সঙ্গে তুলনা করেন। হস্তী নিজ জীবনের শৃঙ্খল ভাঙিয়াছে; কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সেই শৃঙ্খল অন্য দেশকে পরানো নয়; বরং অবনমিত দেশের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়াইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরা এবং তার অগ্রগতির পথ সুগম করা তাহার ধ্যেয়। ভারতবর্ষের দরদী মনে কোনো দ্বিধা নাই, সে অহিংস সংগ্রামের যোদ্ধা, তাই শঙ্কাপূর্ণ পরিস্থিতিতেও যুদ্ধোন্মোত্ত কোনো রাজ্যের প্রতি বিন্দু মাত্র ঝোঁক নাই। সে নিউট্রাল্—ন্যায়ানুমোদিত তটস্থতা নির্ভয়ে অবলম্বন করে।

মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ বিষয়ে বল্লত্তোলের রচনার একটি উদ্ধৃতি শ্রীবোম্মারু বিশ্বনাথম্ এইরূপ দিয়াছেন:

"সংস্কৃত ভাষাতন স্বাভাবিক আউজস্ম্‌খ সাক্ষাল তামিলিণ্টে সৌন্দরীয় বুমুত্তত্ত্‌ চেরন্নুল্লেরু ভাযায়ানেন ভাষা" (অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার স্বাভাবিক

ওজস্বিতা ও শুদ্ধ তামিলের সৌন্দর্য নিয়ে গড়ে উঠেছে আমার মলয়ালী ভাষা)।*

বিদেশী ভাষার কাব্য উপন্যাস হইতেও বল্লত্তোল কম আহরণ করেন নাই। বাইবেলের মেরী মাগ্‌ডালার উপাখ্যানটি উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছেন। তেমনি ইসলামীয় সাহিত্যে আন্তরিকতার সহিত প্রবেশ করিয়াছেন। বৌদ্ধ জৈন উপাখ্যানাদিও উপেক্ষা করেন নাই।

কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদে বল্লত্তোলের মন ভিজিল না। আন্তর্জাতিকতার সমুজ্জ্বল দিক্‌টিও তাঁহার জীবনে উদ্ভাসিত হইল। সোবিয়েৎ ইউনিয়নে টলষ্টয়ের স্মৃতি সৌধে নাৎসীদের বোমা-বর্ষণের সংবাদে কবিকণ্ঠে ধিক্‌কার-বাণী স্ফুরিত হইল: "যুদ্ধোন্মাদ পশুরা কি ভেবেছিস্ টলষ্টয় শুধু রাশিয়ার? তিনি কবি, তিনি শিক্ষক, তিনি মহামানব; সাম্রাজ্যবাদের দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। মানুষ আর ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌বে না।" এদিকে আবার চীন দেশে জাপানী নৃশংস বর্বরতার বিরুদ্ধে কবিকণ্ঠের প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হইল। অধঃপতন নামক তাঁহার একটি কাহিনী-কবিতায়, কিভাবে মায়ের কোল হইতে দুধের শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া জাপানী সৈনিক তাহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল—এই ঘটনাই একটি কথকলী নৃত্যে নানা স্থানে অভিনীত হইল।

কথকলী কেরলের একটি বিশেষ ধরণের ক্লাসিকল নাচ। নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীতের সংমিশ্রণে এই অপূর্ব সৃষ্টি। ১৯২৭ সনে মহাকবির প্রচেষ্টায় সংঘবদ্ধভাবে 'কলামণ্ডলম্' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংপ্রতি কেবল সরকার এই প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতের এবং বিদেশাগত শিক্ষার্থীদিগকে এখানে এই কথকলী নৃত্যকলা শিক্ষা দেওয়া হয়। গোপীনাথ, রাগিনীদেবী, তারা চৌধুরী, লীলা দেশাই, আনন্দ শিবরাম, মাধবল্ প্রভৃতি বিখ্যাত নৃত্যশিল্পিগণ এই কলামণ্ডলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা বিদেশে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ও চীনগণ রাজ্যে কথকলী নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করিয়া ভারতের মান বৃদ্ধি করিয়াছেন।

স্বাধীনতা লাভের পর এই ভারতীয় কবি য়ুরোপ পর্যটনে গিয়াছিলেন। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংলণ্ড এবং ইটালী পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এশিয়ার চীনগণরাজ্যও ঘুরিয়া আসিলেন। দেশে-দেশে মৈত্রী স্থাপনের তিনি অগ্রদূত। কএক বৎসর পূর্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'সারা ভারত শান্তি ও সংস্কৃতি সম্মেলনে' তিনি সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল

পর্যন্ত তিনি পী. ই. এন্. ভারতীয় কেন্দ্রের একজন উপসভাপতি ছিলেন, যার প্রথম সভাপতি ছিলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। বর্তমানে সভাপতি রাধাকৃষ্ণন্ এবং উপসভাপতিদের মধ্যে একজন আমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরু।

বল্লত্তোলের অভাব আজ সকল শান্তিকামী যুদ্ধবিরোধী জনগণ অনুভব করিতেছে।

প্রাণশক্তি ও সত্যনিষ্ঠ আদর্শ পূর্ণরূপে বর্তমান থাকায় এই মহাকবি অর্দ্ধশতাব্দীকাল কেরলের সাংস্কৃতিক প্রগতির পুরোধা ছিলেন। কৈরলী-সাহিত্যে বল্লত্তোল যুগ অভূতপূর্ব। বল্লত্তোল, ভারতের লহ নমস্কার, বল্লত্তোল জগতের লহ নমস্কার। বন্দে মাতরম্॥

মহামানব পুরুষোত্তমানন্দ

পূর্ববঙ্গে বরিশাল-শহরে এটর্ণী শ্রীদুর্গাচরণ গুহঠাকুরতা মহাশয় তাঁহার শহরস্থ বিস্তীর্ণ বাড়ীর একপ্রান্তে ৩।৪ খানি চালাঘর তুলিয়া একটি নিঃশুল্ক ছাত্রাবাস করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে ১০।১২টি ছাত্রের বাসস্থান কুলাইয়া যাইত। ঠিকা-বাসায় আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইত। পাঠ্যবস্থায় (১৯০২-৬ খৃঃ) আমি ঐ ছাত্রাবাসে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলাম।

গোড়ার দিকে দেখিতাম বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র ছিলেন শ্রীশরৎকুমার ঘোষ, তিনি তখন ব্রজমোহন কলেজে বী. এ. ক্লাসের ছাত্র। ইনিই পরবর্ত্তী জীবনে পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত।

ঐ ছাত্রাবাসে তখন আমি সকলের বয়ঃকনিষ্ঠ, এবং শরৎদা জ্যেষ্ঠ। প্রথম হইতেই জ্যেষ্ঠরা আমাকে অনুজের স্নেহ দান করিতেন। আমিও টোলের ছাত্রের মতো সবাইকে অগ্রজের সম্মান দিতাম। শরৎদা কথা কম বলিতেন, পড়িতেন আরো কম। প্রায়ই নিজের ঘরে বসিয়া মাতৃ-বিষয়ক গান গাহিতেন এবং কাঁদিতেন। আচরণে বুঝিতাম আমাকে গভীর স্নেহ করিতেন।

প্রতি রবিবার প্রাতে আচার্য শ্রীজগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আশ্রমে (বা Sir-এর বাসায়) আচার্যদেব গীতা-ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। শরৎদাদা সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, এবং কখনো-বা গান গাহিতেন; বিশেষতঃ প্রৌঢ় ভক্ত-গায়ক অন্নদাচরণ রায়চৌধুরী অনুপস্থিত থাকিলে, ছাত্রেরাই গান ধরিতেন। রবিবার সন্ধ্যায় শহরে ধর্মরক্ষিণী সভাগৃহে প্রায়ই

দেশপূজ্য শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি বক্তৃতা করিতেন। সেখানেও শরৎ দাদা উপস্থিত এবং প্রায়ই গান গাহিতেন। স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তীর ভক্তিপ্লুত সঙ্গীত শুনিতেও শরৎদাদা যাইতেন।

বী. এ. পাঠ কালেই শরৎদাদার বিবাহ হয় ঢাকা শ্রীনগরের ধনী জমিদার বংশে। বরযাত্রীদের সঙ্গে এমন উদাসীন ভাবে যাত্রা করিতে কোনো বরকে কখনো দেখি নাই। বিবাহে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ইচ্ছা ছিলনা; কিন্তু গুরুজনদিগের আগ্রহের বিরুদ্ধে না দাঁড়াইয়া মন-মরা ভাবে তাঁহাদের ব্যবস্থা মানিয়া লইলেন।

পরবর্তীকালে অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত শৈশবে ৮।৯ বৎসর বয়সে শরৎদাদাকে প্রথম দেখেন মহিলারা গ্রামে স্বদেশী বক্তারূপে। আমি প্রথম দেখি এবং সান্নিধ্যলাভ করি কৈশোরে ১৪ বৎসর বয়সে। কতজনে শরৎদাদাকে দেখিয়া পরোক্ষে ঠাট্টাবিদ্রূপ-ও করিত; কিন্তু অধ্যাপক মহাশয়ের মতো আমার মনেও প্রথম হইতেই তিনি গভীর আলোকপাত করিয়াছিলেন, যাহার ফলে চিরজীবন আমি শ্রদ্ধার সহিত মহৎ ব্যক্তিগণের গুণমুগ্ধ রহিয়াছি। পরবর্তী জীবনে সাক্ষাৎ কদাচিৎ হইত, চিঠি-পত্র আদান-প্রদান আরো কম। কিন্তু উভয়ের পারস্পরিক টান ছিল চিরদিন অক্ষুণ্ণ।

বক্তৃতা বা কথকতা করিতে গিয়া প্রায়ই শরৎদাদা এই মন্ত্রটি সুমধুর কণ্ঠে গাহিয়া ভগবৎ প্রণতি জানাইতেন।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎ কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥

মন্ত্রের ব্যাখ্যা যদি করিতেন, তবে মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে নিজের জীবনের কথা তুলিতেন, ছয় বৎসর পর্যন্ত তিনি বোবা ছিলেন; কথাবার্তা বলিতে পারিতেন না। পিতা-মাতার আকুল প্রার্থনায় দেবতার কৃপা হইল, কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমার নিজ জীবনেও খানিকটা এরূপই ঘটিয়াছিল, আমি প্রায় দুই বছরের পর ৩য় বৎসরে কথা কহিলাম। কেবল তাহাই নয়, অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়ই আয়ত্ত হইতে আমার অত্যধিক সময় লাগিত, সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, নৌকা বাওয়া, দাঁড় টানা, খেলা-ধুলা সকল বিষয়েই আমি পশ্চাৎপদ ছিলাম। শরৎদাদার সেরূপ হয় নাই। শারীরিক-মানসিক কোনো বিষয়ে কোনো কালে আমি শরৎদাদার অবস্থায় পৌঁছিতে পারি নাই। তবে শরীরগত একটি বিষয়ে উভয়ের আশ্চর্য

সৌসাদৃশ্য : শরৎদাদা ঈষৎ ট্যাড়া ছিলেন, আমিও তাই। মেয়েরা আমাদের উভয়কে লক্ষ্মী-ট্যাড়া বলিতেন। অন্য সকল বিষয়েই আমি তাঁহার অনেক নীচে। শরৎদাদার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেহে শেষকালে যখন ঈষৎ গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিতেন, তখন সে কাপড়ের রঙ্ যেন শরীরের সঙ্গে মিলিয়া যাইত। আমি একেবারে পাংশু ব্রাউন্ রঙের। তিনি বলিষ্ঠ বিশাল শালপাংশু মহাকায়, আমি দুর্বল খর্বাকৃতি। তিনি সুগায়ক আমি উদ্বাহুরিব বামন; তিনি মহাপণ্ডিত, আমি নিতান্তই অপণ্ডিত। তিনি বাগ্মী, আমার বাক্-পটুত্বে অভাব, আমি তর্কে অনগ্রসর। তথাপি মনের ক্ষেত্রে বা প্রাণের দিক্ দিয়া উভয়ের টান ছিল প্রগাঢ়। এইখানে আমি বোধ হয় অকপটে বলিতে পারি, তাঁর প্রতি আমারো আকর্ষণ ও প্রাণের টান অপরিসীম। চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ করে, আবার লৌহও বেগে ছুটিয়া চলে চুম্বকের দিকে। দেহে ও মনে সর্বত্র আমি শরৎদাদার নাগালের বাহিরে, তবুও পারস্পরিক প্রবল আকর্ষণের অর্থ খুঁজিয়া পাই আমাকে তাঁহার 'ভাইটি' বলিয়া গ্রহণ করার উদারতায়। আমিও তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালো বাসিয়াছি, ভক্তি করিয়াছি, তাঁহার বিবৃত দর্শনকে জীবনে সারমর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

১৯২২ খৃষ্টাব্দে গয়া কংগ্রেসে শরৎদাদা প্রতিনিধি হইয়া আসেন বরিশাল হইতে, আমি উত্তর বিহার অর্থাৎ মিথিলার দ্বারবঙ্গ হইতে। আমি তো শহরে বন্ধু শ্রীসূর্যপ্রসাদ মহাজনের আতিথ্যে রাজার হালে দোতলায় থাকিতাম। একদিন শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষের সহিত তাঁহার এক পিতৃব্যের বাসায় নিমন্ত্রিত হইয়া পরম সুখে শীতকালীন আহার নিদ্রার সুবিধা পাইয়াছি; শরৎদাদাকে দেখিলাম দ্বিপ্রহরে কংগ্রেস শিবিরে মাত্র খিচরী বেগুন ভাজা দিয়া কোনক্রমে উদর পূর্তি করিয়া একমাত্র শুভ্র খদ্দরের রামধুতি ও বহির্বাসে শীত কাটাইলেন। কচুর শাক তিনি ভালোবাসিতেন; শাকান্নেই তাঁহার যে তৃপ্তি হইত তাহা অনেকবার দেখা গিয়াছে! দেখিলাম শরৎদাদা একটুও বদলান নাই। বরং বুঝিলাম, দেশের ও দশের সেবায় পূর্ণতরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া দুর্গম পথযাত্রায় বলিষ্ঠ যাত্রী তিনি। সারাটি জীবন আমি তাঁহার সংবাদ লইতাম, প্রায়ই পরোক্ষে এবং সুবিধা পাইলেই দেখা করিতাম বা দেখিতাম।

শরৎদাদার প্রিয় গানগুলি আমি খাতায় টুকিয়া লইতাম। বক্তৃতায়

উদ্ধৃত ভাগবতের শ্লোকগুলি আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঠ ব্যাখ্যায়ও' প্রায়ই শুনিলাম। বরিশাল শহরের সাধু চরিত্র ব্যক্তিগণ, যথা—অশ্বিনী কুমার, আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক ক্ষেত্রনাথ বসু, কেরাণী অন্নদাচরণ রায় চৌধুরী, বাগ্মী মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি সকলেই শরৎদাদাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। বরিশালের বাহিরেও সকল নেতৃবর্গ তাঁহাকে নিজের করিয়া লইয়াছিলেন। মহাত্মাজী বা যে কোনো জ্যেষ্ঠ কর্মী নেতা তাঁহাকে অনায়াসে আপনার করিয়া লইতেন। কলিকাতায় দেখিয়াছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ, ব্রহ্মবান্ধব, মতিলাল ঘোষ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডন্ সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'সার্ভেণ্ট' দৈনিক সম্পাদক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী-('বন্দেমাতরম্' দৈনিকে শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী), মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন, এটর্ণী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সকলেই শরৎ দাদাকে গভীর স্নেহ করিতেন এবং দেশের কাজে তাঁহার প্রাণের আকুতি ও আত্মাহুতির প্রশংসায় মুখর হইতেন। শ্যামসুন্দরকে এক বক্তৃতায় বলিতে শুনিয়াছি 'শরৎ আমার অনুজ, কিন্তু আমি তার পদতলে বসিয়া বেদান্ত শিক্ষা করিতে পারি।' ইত্যাদি উদাহরণ অনেক আছে, উল্লেখ বাহুল্য। কনিষ্ঠ কর্মিদের মধ্যে নেতাজী সুভাষ এবং বর্তমান লেখক সর্বদা শরৎদাদার গুণগান-মুখর।

পরবর্তী কালে শরৎদাদা হইলেন স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত। স্বামিজীর কণ্ঠ সুমধুর, তাঁহার প্রাণ-ঢালা কথা ও গান শ্রোতৃবর্গের মন স্পর্শ করিত, উহাতে সবাকার প্রাণ বিগলিত হইত। দেহরক্ষার ৩।৪ বৎসর পূর্বে নরনারায়ণ আশ্রম যখন ৮এ রাসবিহারী এভেন্যুএ ছিল, তখন একদিন রবিবাসরীয় তাঁহার ব্যাখ্যা কথকতার শেষের দিকে এরূপ কথা বলিয়াছিলেন; 'ভগবান্, আমি তোমাকে দরকার মনে করি আর না-ই করি, তোমার পক্ষেই যে আমাকে দরকার। তাই যাবে কোথায়? আমার কাছে ছুটিয়া আসিতেই হইবে তোমায়' ইত্যাদি। আমি উপস্থিত ছিলাম, ঐ ভাবের একটি গানের পদ মনে পড়িল, আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে ইত্যাদি। কান্ত কবির এই পদগুলি আমি আওরাইলাম মাত্র। উপস্থিত গায়কগণের মধ্যে কেহই ঐ গানটির সঙ্গে পরিচিত না থাকায় স্বামিজী নিজেই সুকণ্ঠে

ভাবের সহিত গানটি গাহিয়া সেই সান্ধ্য কথার সুমধুর সমাপনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন!

মৌলবী রেজাউল করিম ঠিকই লিখিয়াছেন : 'বর্তমান যুগের তিনি (পুরুষোত্তমানন্দ) একজন বিশিষ্ট চিন্তানায়ক ছিলেন। তিনি জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন নূতন চিন্তার আলো। পুরাতন কথাকে পরিবর্তিত পরিবেশনে নূতন করিয়া দেখাইবার ও বুঝাইবার তাঁহার ছিল অসাধারণ ক্ষমতা। জাতির জন্য প্রয়োজনীয় কোন দিক্‌টাই তিনি বাদ দেন নাই। আধ্যাত্মিকতা ও ঐহিকতা এই দুই দিকের বিবিধ সমস্যার উপর স্বামিজী নূতন আলোকপাত করিয়াছেন। এই মহান্ সন্ন্যাসীর অন্তরে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত ছিল একটি অকৃত্রিম স্বদেশপ্রীতি।······কেবল বিদেশীকে বিতাড়ণই তাঁর স্বরাজের মূল কথা ছিল না। দেশবাসীর মনের উন্নয়ন, চিত্রের উৎকর্ষ, চরিত্রের উন্নতি ও ধর্মের বিকাশ—এই সব ছিল তাঁর স্বরাজের উদ্দেশ্য।'

মৌলবী সাহেব আরো বলিয়াছেন তিনি (স্বামিজী) 'স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি উচ্চ আসন অধিকার করিতে পারিতেন। কিন্তু রাজনীতি তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না।······তিনি দেশের গণমানবের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। কেমন করিয়া দেশের মানুষকে সত্যকার ভাবে মানুষ করা যায়, সেই চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল—তিনি দেশবাসীকে মানুষ করার ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের কৌপীনের অন্তরালে বিরাজিত ছিল একটা বিরাট আদর্শ—মানুষের কল্যাণ।'

পুনরায় এই মোশ্লেম অধ্যাপক লিখিলেন 'তিনি সন্ন্যাসের ব্রত গ্রহণ করিলেন সত্য, কিন্তু এ সন্ন্যাসী কেবল কৌপীনধারী সন্ন্যাসী নন—এ সন্ন্যাসী আত্ম-মুক্তি-সন্ধানী নন, তিনি দেশের সর্ব শ্রেণীর মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য উৎসাহিত-প্রাণ মহান্ সন্ন্যাসী। তিনি নিত্যগোপালের আদর্শ গ্রহণ করিয়া তাহাকেই বাস্তব রূপ দিবার জন্য 'নর নারায়ণ আশ্রম' গঠন করেন। এই আশ্রম বিশ্বমানবতার নব-মন্দির। এখানে সর্বমানব এক মোহনায় দাঁড়াইয়া পরস্পরে মিলিত হইতে পারে।'

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার স্বামিজীর কথা বলিতে গিয়া বাল্মীকির বাক্যোদ্ধার করিয়াছেন—বিশ্বামিত্রের পরিচয় প্রসঙ্গে বশিষ্ঠ রাজা দশরথকে বলিলেন :

"এষ বিগ্রহবান্ ধর্মঃ এষ বেদবিদাং বরঃ।
এষ বীর্যবতাং শ্রেষ্ঠো বিদ্যাজ্ঞানতপোনিধিঃ॥

মজুমদার মহাশয়ের মতে এই সব কটি কথাই স্বামিজীর সম্বন্ধে খাটে। এবং অল্প কথায়, ইহাই বোধ হয় তাঁর সঠিক পরিচয়।"

আমি যে মন্ত্রে স্বামিজীকে প্রণাম নিবেদন করিতে চাই সেটি এই :—

"আজানুলম্বিতভুজ কনকাবদাতম
সংকীর্তনৈকবিভবস্মিত বঙ্কিমাক্ষম্।
বিশ্বপ্রেম ঘন নর-নারায়ণসেবীম্
বন্দে সমন্বয়গুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্।।"

স্বামিজীর ধর্মশীলতা, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুগভীর পাণ্ডিত্যের কথা অনেকেই জানেন। ব্রহ্মসূত্র ঈশ কেন কঠ প্রভৃতি উপনিষদ্ এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে তাঁহার রচিত অবধূত ভাষ্য এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থাবলিতে তাঁহার অসাধারণ মনীষা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল তাহাই নয়, তাঁহার সকল রচনায় ও বক্তৃতায় তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য সুপরিস্ফুট এবং মৌলিকতা ও অভিনবত্বে অপূর্ব। ব্রহ্মসূত্র ও গীতার অবধূত ভাষ্যদ্বয় বর্তমান যুগোপযোগী এবং উহা অভূতপূর্ব সমন্বয়ের আশ্বাসবাণী প্রদান করিতেছে। সমন্বয়ের এত বড় আশ্বাস বর্তমান জগতে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না—সর্বত্র সকল বিষয়ে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া জগৎ যেন ধ্বংসের মুখে চলিতেছে—কোথাও আশার বাণী এতটুকু পাইলে মানুষ সেখানে ঝুঁকিয়া পড়ে। এমন দুর্দিনে নিত্যগোপালের অপূর্ব আশ্বাসবাণী নিত্য নব নব পথে হাটে মাঠে গোঠে সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়া এই আশ্চর্য অবধূত পুরুষোত্তমানন্দ সারা জীবন পাত করিলেন। জড়াজড় সমন্বয়, স্ত্রীপুরুষ সমন্বয়, ধনিক শ্রমিক সমন্বয়, বুদ্ধ-শঙ্কর সমন্বয়, যোগ শক্তি বৈষ্ণব জৈন সমন্বয়! কোথায় নয়? এ যে কল্পনার অতীত। নিগমাগম সমন্বয় শ্রীঅরবিন্দ দর্শনের সহিত তন্ত্রের সমন্বয়। বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রে সমন্বয়। সর্বত্র মিলন সেতু দেখাইয়া বর্তমান জগতে নিত্যগোপাল যে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া গেলেন তাহা ফলপ্রসূ হইলে জগৎ ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পাইবে।

আধুনিক যুগে জগতের সর্বত্র সর্বক্ষেত্রে দেখিতে পাই কেবল দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, অনেকের নির্যাতনে একের প্রাধান্য স্থাপন চেষ্টা। ধর্মার্থকাম ত্রিবর্গের কুত্রাপি ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এমন যে চতুর্থ মোক্ষবর্গ যাহার ভিতর সমস্ত দর্শন

ও ধর্মমতগুলির স্থান ধার্য রহিয়াছে, তাহাতেও সংঘর্ষের অবধি নাই। এক ধর্মমতের সঙ্গে অপরের অবলুপ্তপ্রায় মিলন-সেতু যখন অদৃশ্য হইতেছিল তখন দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেব দেখাইলেন, কেবল ব্রহ্ম-আত্মা-ভগবান্-ই একার্থ জ্ঞাপক নহে পরন্তু 'গড্ আল্লা খোদা' সবই একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। যেমন-টি 'ওয়াটার পানি জল' একই দ্রব্যকে বুঝায়। তিনি আরো বলিলেন, 'যত মত, তত পথ'। সকল পথেই গন্তব্যে পৌছা যায়, সুতরাং কোনো পথই হেয় নয়। অন্যান্য সাধু-সন্তেরাও যথা, রমণ মহর্ষি, তুকোজী মহারাজ প্রভৃতি—ঐ একই কথা নানাভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, দোহরাইলেন বা পুনরাবৃত্তি করিলেন। শ্রীঅরবিন্দ আধ্যাত্মিক দিক দিয়া অতিমানসে পৌছিবার দিগ্‌দর্শন করিলেন। ধর্মের দিক দিয়া সাধুসন্তেরা কাজ করিয়া গেলেন। মহাত্মাজী মনুষ্য সমাজে সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে উহাকে দৃঢ় করিলেন। বিনোবাজী সেটিকে কার্যকরী করিবার জন্য ত্যাগের দ্বারা সমাজ-বিপ্লব আনিলেন। শ্রীনিত্যগোপালদেব পরস্পর বিপরীত ধর্মের, বিপরীত তত্ত্বের সমন্বয়ের এই সারতত্ত্ব যাহাতে মনুষ্যসমাজ-শরীরে বদ্ধমুল হয়, সেইজন্য দার্শনিক ভিত্তিতে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়োজন মনে করিলেন ; তাই তো নিত্যগোপাল নিজেকে বিশ্বনাগরিক ঘোষণা করিয়া অপূর্ব সর্ব সমন্বয় তত্ত্ব প্রদান করিলেন। পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত সেই সর্ব-সমন্বয় তত্ত্বের প্রচারক ও ব্যাখ্যাতা এবং নিজ জীবনে আচরণ দ্বারা তিনি বুঝাইয়া দিলেন যে, বেদান্তের আদর্শ অনুসারে সরল জীবন যাপন দুঃসাধ্য নহে ; ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে মূলগত বিরোধ নাই ; একে অন্যের পরিপূরক মাত্র।

পূর্ব পূর্ব যুগে মানুষ যতটা অগ্রসর হইয়াছিল, তাহার উপর 'আগে কহ আর' বাক্য উচ্চারণ করিয়া যেন নিত্যগোপালের জড়অজড় সমন্বয়, নিত্য অনিত্য সমন্বয়, আত্মা অনাত্মা সমন্বয়, চৈতন্য অচৈতন্য সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল।

প্রায় ৫।৬ বৎসর পূর্বে স্বামিজীর সপ্ততি বর্ষে পদার্পণের সময় আমি লিখিয়াছিলাম, মহাত্মাজীর সকল শিষ্যই (যথা বিনোবা, মহাদেব দেশাই প্রভৃতি তাঁহার সান্নিধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু শরৎকুমার ঘোষ তাঁহার একলব্য-শিষ্যরূপে দূর দেশে পরোক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছেন। বাপু যাহাদিগকে পতিতা ভগিনী fallen sisters বলিলেন, স্বামিজী (শরৎকুমার) তাহাদিগকে 'বাজারের মা' বলিয়া গ্রহণ করিলেন। সুদূর বরিশালে যখন বাজারের মায়েদের-ও তিনি প্রভাত-ফেরী এবং বৈতালিক গান গাহিয়া চলিতে অনুমতি

দিলেন, তখন সাবরমতী হইতে বাপু 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদকীয় অগ্র-লেখ লিখিলেন, 'আগুন লইয়া খেলা' Playing With Fire!

দার্শনিক ভিত্তিতে সমন্বয়-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রচার দ্বারা স্বামিজী যে মহদনুষ্ঠানের সূচনা করিলেন, তাহা পরবর্তী যুগে মানুষ উপলব্ধি করিয়া দেখিবে যে, এটি না হইলে কোনো অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিপ্লবই দাঁড়াইতে পারে না। বাস্তবিক পক্ষে ভবিষ্য মানব অবশ্যই দেখিবে বিনোবাজীর ত্যাগধর্মের মাহাত্ম্য অপেক্ষা স্বামিজীর বিপ্লব কোনো অংশে ন্যূন নহে।

মনে পড়ে, আমার শেষ কথা এই ছিল :

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ পুরুষোত্তমঃ কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি ॥

সেদিন স্বামিজী একথা ক'টি প্রকাশ করিতে দেন নাই। এখন তাঁহার দেহাবসানে কথাটি বলিয়া রাখা আমি কর্তব্য মনে করিতেছি। আমারো ৭০ হইল। যতদিন আছি আমি উহা বলিয়াই যাইব।

কাশীধামে পূজ্য পদ্মবিভূষণ ডক্টর শ্রীভগবান্ দাসের মুখে সমন্বয়ের বাণী শুনিয়াছি, তাঁহার লেখায়ও তাহা ব্যক্ত আছে। সেখানেই অপর এক মহা-পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় আচার্য ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের কাছে তো সমন্বয়ের বাণী ও ব্যাখ্যা অহরহ শুনিয়াছি। আজিও তিনি বিস্তৃতরূপে জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দেন বৌদ্ধ-বেদান্ত, নিগম-আগম, বেদ-বাইবেল, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব, ন্যায় বৈশেষিক সাংখ্যযোগ, কর্ম-জ্ঞান-ভক্তি, শ্রীঅরবিন্দ দর্শন ও হিন্দু তন্ত্র, হিন্দু-বৌদ্ধ তন্ত্র প্রভৃতির সমন্বয় রহিয়াছে; কেবল চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, প্রাণ দিয়া, হৃদয় দিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। স্বামিজী দার্শনিক ভিত্তিতে উহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং নরনারায়ণাশ্রম দ্বারা অনুশীলন (experiment) করিয়া দেখাইলেন।

বাগ্মী-রূপেও পুরুষোত্তমানন্দ অপরূপ! অধ্যাপক শশিভূষণ ৮।৯ বছরের বাল্যকালে একলাগা তিন ঘণ্টাকাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ বক্তৃতা শুনিয়াছিলেন! বর্তমান যুগে কুত্রাপি দেখি না যে, দীর্ঘকাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোনো বাগ্মী আসর জমাইয়া রাখিতে পারেন। স্বামিজীর প্রাণ ছিল একেবারে খোলা, হৃদয় আকাশের মত অসীম। আমি জীবনে অনেক বাগ্মীর বক্তৃতা শুনিয়াছি, যথা, মাতাজী (মিসেস ডক্টর) এনি বেসাণ্ট, মাতাজী লিলিয়ন এডগর, শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু, শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াডিয়া, ডক্টর এরুণ্ডেল,

জিনরাজদাস, শ্রীরাম, রোহিত মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, শ্রীঅরবিন্দ, লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল রসুল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, তিলক, গোখলে, লাজপত রায়, নটেশন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ দেবধর, মহাত্মা গান্ধী, শশধর তর্কচূড়ামণি, শিবনাথ শাস্ত্রী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, আশু মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, রাধাকৃষ্ণণ, শিবস্বামী, কৃষ্ণস্বামী, রামস্বামী, প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আনন্দমোহন বসু, কুমার স্বামী, ভগিনী নিবেদিতা, কৃষ্ণমূর্তি, দাদাভাই নাওরোজী, খপার্ডে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আচার্য রায়, কাব্য-বিশারদ, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নেতাজী সুভাষ, যতীন্দ্রমোহন সেন, সখারাম গণেশ দেউকর, নেহরু, কৃপালনী, বিনোবা, মহাদেব দেশাই প্রভৃতির বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনিয়াছি। অনেকের বক্তৃতা পাঠ করিয়াছি, যথা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন আচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ প্রভৃতির বক্তৃতা সংগ্রহগুলি পড়িয়া দেখিয়াছি, বিশেষ ভাবে বিবেকানন্দ ও কেশব চন্দ্রের মুদ্রিত বক্তৃতাগুলি সযত্নে পড়িয়াছি। স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ অবধূতের বক্তৃতা আমি অল্পই শুনিয়াছি; তবু আমি বলিতে পারি, তাঁহার মতন বাগ্মী আমি দেখি নাই। এমন মর্মস্পর্শী প্রাণখোলা কথা অন্যত্র কদাচিৎ শুনিতে পাওয়া যায়। স্বামিজীর প্রতিটি বক্তৃতা প্রাণ-মন-হৃদয় আন্দোলিত করে। আবার এত বেশিক্ষণ দাঁড়াইয়া বলিতেও কাহাকে দেখি নাই। একমাত্র কেশবচন্দ্রের কথা প্রয়াগের 'গ্রাণ্ড্ ওল্ড্ ম্যান্' জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়ের মুখে শুনিয়াছি, কেশবচন্দ্র তিনঘণ্টা পর্যন্ত দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিতে পারিতেন—মুদ্রিত বক্তৃতার বহর দেখিয়া এটি বিশ্বাস করিতে হয়। স্বামিজীও তিন চারি ঘণ্টা দাঁড়াইয়া এক সঙ্গে অনায়াসে বক্তৃতা দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা সকল বিষয়ে কেশবের সমকক্ষ বলিয়া মনে হয়। অপর কাহারো সঙ্গে তাঁহার তুলনা হয় না।

আবার এত বেশি বক্তৃতা একটি জীবনে দেওয়া অন্য কাহারো পক্ষে সম্ভব হইয়াছে কিনা জানি না। প্রত্যক্ষদর্শীর প্রদত্ত হিসাবে জানা যায়, স্বরাজ পর্যন্ত স্বামিজী কমপক্ষে ১৩।১৪ হাজার বক্তৃতা করিয়াছেন। কৃষ্ণমূর্তি বা মহাত্মাজীও এতগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। সংখ্যায় কেহ-বা সমকক্ষ হইলেও পরিমাণে স্বামিজীর পাল্লাই ভারী দাঁড়াইবে।

কারণ তাঁহার কোন-কোন বক্তৃতা তিন-চারি ঘণ্টা পর্যন্ত চলিয়াছে ; ৪৫ মিনিটের কম তিনি হয়তো কদাচিৎ বলিয়াছেন।

আমার বন্ধু সুগায়ক ভক্ত প্রয়াগবাসী শ্রীমোহিনী মোহন রায় ১৯২২ গয়া কংগ্রেসে নেতাজীর অধীনে, এবং অসহযোগের বিখ্যাত বরিশাল কন্‌ফারেন্সে স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। তিনি বহু বাগ্মীর বক্তৃতা শুনিয়াছেন। তিনিও বলেন শরৎ ঘোষের মতন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা তিনি জীবনে অন্যত্র কুত্রাপি শুনেন নাই। শরৎদাদা পরম ভক্ত, practical vedantist। নিজ জীবনে আচরণ দ্বারা যে লোকশিক্ষা তিনি দিয়া গেলেন, বর্তমান যুগে তাহার তুলনা হয় না। শরৎদাদার শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেন তাঁহার সঙ্গে একাত্মীভূত হইয়া এক পরম শান্তির এবং আশ্বাসের আব-হাওয়া সৃষ্টি করেন। তাঁহার অপলক স্থির বঙ্কিম দৃষ্টিপ্লুত প্রাণ-ঢালা কথা যেন কানের ভিতর দিয়া মরমে পৌঁছিয়া যায়। আবার ক্লান্তিও তাঁহার নাই। দুই তিন ঘণ্টা অনর্গল কথাবার্তার পর কখনো-বা নিজেই গান ধরিয়া মধুরেণ সমাপন করেন। শ্রোতার মনে বক্তার বিষয়বস্তু এত গভীর ভাবে প্রবেশ করে যে, পরবর্তী কএকটি দিন ধরিয়া তাহার রেশ চলিতে থাকে। বাস্তবিক পুরুষোত্তম কথা অমৃত সমান, যিনি স্বকর্ণে শুনিয়াছেন তিনি ভাগ্যবান্।

সেই কম্বুকণ্ঠ আজ নীরব। লেখা যতটা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তো 'উজ্জ্বলভারতে' আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব ; কিন্তু প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির রিপোর্ট আধুনিক কোনো সঞ্জয় দিতে পারিবেন কিনা জানিনা। আমি পুনঃ পুনঃ স্বামিজীকে প্রণাম জানাই :

আজানুলম্বিতভুজ কনকাবদাতং সংকীর্তনৈকবিভবস্মিত বঙ্কিমাক্ষম্।
বিশ্বপ্রেমঘন নর-নারায়ণসেবীং বন্দে সমন্বয়-গুরুং পুরুষোত্তমানন্দম্॥

মহাকবি বল্লত্তোল এবং মহামানব পুরুষোত্তমানন্দ উভয়ে ভারতের এক মহাসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হইয়া ভারতবর্ষ ও সমগ্র জগৎকে ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মানুষ গড়ার কৌশল রাখিয়া গেলেন ; মানব চিরদিন তাহা সম্বল করিয়া অগ্রগতির পথে চলিবে--চরৈবেতি, চরৈবেতি।

আমি বলিব— যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ মহীতলে।
তাবৎ মহাজনকথা লোকেষু প্রচরিস্যতি॥

—বন্দেমাতরম

ছিয়াত্তরতম জন্ম-স্মরণে

[গত ১৬ই কার্ত্তিক ১৩৬৫ কার্ত্তিকী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত মহারাজের ৭৬-তম জন্মবাসরে পঠিত]

শ্রীরেণু মিত্র

ওঁ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি-তুরীয়-তুরীয়াতীতায় ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবৎ-পুরুষোত্তমায় নমো নমঃ ॥

ওঁ নমো পুরুষোত্তমানন্দায় নমো নমঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় ও বন্ধুগণ,

আজ যাঁর জন্মকে স্মরণ করে আমরা সমবেত হয়েছি তাঁকে আমাদের সমবেত প্রণাম নিবেদন করি। পুরুষোত্তমানন্দ, তুমি গ্রহণ কর। তোমার জন্ম আমাদের মধ্যে অর্থবান হয়ে উঠুক। তুমি জন্মেছিলে, জন্মে আছ জন্মাবে। তুমি সভ্যতার এই সংকটের দিনে যে কথা দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর একভাবে বলে গেছ, তোমার সে কথা ছড়িয়ে আছে আকাশে বাতাসে, মানুষের হৃদয় কন্দরে। আজও ঠিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি তা তবু বেরিয়ে সে আসবেই একদিন স্পষ্টতর হয়ে মানুষের চেতনসত্তার স্তরে। জীবন ও জগতের যুগোপযোগী এক নূতন মূল্যবোধকে দার্শনিক কাঠামোর মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে তুলে ধরবার জন্যে সারাজীবন তুমি প্রয়াস করে গেলে! আজ তোমার পুরুষোত্তমানন্দ-দেহে তুমি নেই, তবু জানি

'নব জীবনের সংকট পথে হে তুমি অগ্রগামী
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না কোথাও যাবে না থামি।
শিখরে শিখরে কেতন তোমার রেখে যাবে নব নব,
দুর্গমের মাঝে পথ করি দিবে জীবনের ব্রত তব।
যত আগে যাবে দ্বিধা সন্দেহ ঘুচে যাবে পাছে পাছে
পায়ে পায়ে তব ধ্বনিয়া উঠিবে মহাবাণী আছে আছে।'

যে কথা তুমি তোমার সকল সত্তা দিয়ে বলেছ, সে কথা আজও মানুষের কাছে কেবল ভাল লাগার মধ্যেই মুখ্যতঃ জড়িয়ে আছে—তার সামাজিক রূপ ভবিষ্যৎ বিশ্ব প্রত্যক্ষ করবে।

পুরুষোত্তমানন্দ-জন্মকে স্মরণ করে আপনারা এসেছেন, গেল বছরও আপনারা এসেছিলেন। সেদিন তিনি তাঁর পুণ্য দেহ নিয়ে আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, আজ দেহে তিনি অনুপস্থিত। আকস্মিকভাবেই তিনি অন্তর্হিত হয়েছেন। বলার কিছুই নেই—তবু ব্যথা বাজে। শুধু প্রার্থনা আমাদের মধ্যে তাঁর আসা কল্যাণকর হোক, সার্থক হোক।

একটা প্রচণ্ড আদর্শবাদের সঙ্গে একটা প্রচণ্ড প্রেম নিয়ে আমাদের সামনে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন একটী অভিনব রূপে। ও দুটোই তিনি আমাদের দেবার জন্য এনেছিলেন—কিন্তু আমাদের জীবত্বের শক্ত আবরণ ভেদ করে তাঁর সে প্রেম আর আদর্শ আমাদের মধ্যে এক আধ কণার বেশী ঢুকতে পায় নি, তাঁর সে অভিনব রূপ আমাদের কাছে ধরা পড়ে নি!

পুরুষোত্তমানন্দকে আমরা অল্পই জানি, অল্পই বুঝি; পুরুষোত্তমানন্দ যাঁর কথা ও জীবন নিজ জীবন দিয়ে প্রকাশিত করবার জন্যে এসেছিলেন, সেই শ্রীনিত্যগোপালকে—যোগাচার্য শ্রীশ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূতকে—আমরা আরও অল্প জানি, আরও অল্প বুঝি। পুরুষোত্তমানন্দের কথা আমরা বুঝি না বটে, কিন্তু তাঁর কথা শুনতে সবাই ভালবাসত। বাংলাদেশের সর্বত্র এবং বাংলার বাইরেও যখনই যেখানে তিনি কথা বলেছেন—বৃন্দাবন, বরোদা, আমেদাবাদ প্রভৃতি—মানুষ মুগ্ধ হয়েই শুনেছে। পুরুষোত্তমানন্দ উপনিষদ্ বেদান্ত গীতার কথাই বলেন, পুরুষোত্তমান্দ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা শ্রীগৌরের কথাই বলেন। কিন্তু এই সমস্ত কথা এতদিন আমরা যেরকম করে শুনেছি, পুরুষোত্তমানন্দের কৃষ্ণরাধাগৌর গীতাউপনিষদবেদান্তভাগবত সে সমস্ত থেকেই আলাদা। তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-জীবনের ব্যাখ্যার মধ্যে এমন একটী ব্যাপকতা ও গভীরতা আছে যে, যে-কোন দেশের লোক, যে-কোন মতাবলম্বী লোক নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে শুনলে প্রীতি লাভ করবেন—দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ সংসারে চলার পথের খোঁজ পাবেন। দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ সর্বোপাধিমুক্ত বিপ্লবঘন একটি জীবনধারার সংবাদ আছে সেখানে। এই জীবনই ভবিষ্যৎ বিশ্ব আকাঙ্ক্ষা করছে। সর্বোপাধি-মুক্ত এই জীবনের একমাত্র ভিত্তি প্রেম। এই জীবন ও এই প্রেমকে ধারণা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ও সহজ নয়। তাই পুরুষোত্তমানন্দ যখন এই জীবনের কথা আর এই সর্বগ্রাসী প্রেমের কথা বলেন তখন আমরা থই পাই না। আমরা সাধারণতঃ আবেষ্টনগত অভ্যাসের অধীন—যে আবেষ্টনে বড় হয়ে উঠি বা যে ভাবে

ভাবতে অভ্যস্ত হই, তার বাইরে সাধারণতঃ আমরা যেতে পারি না। কিন্তু এ যুগের হাওয়া হচ্ছে দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ একটী মুক্ত জীবনকে লাভ করার আকাঙ্ক্ষা—এ আকাঙ্ক্ষা ক্রমে সর্বত্র ফুটে উঠছে। পুরুষোত্তমানন্দ এই জীবনের অধিকারী ছিলেন এবং সেই জীবনের কথাই বলতে এসেছিলেন—তাই তাঁকেও যেমন আমরা বুঝতে পারি না, তাঁর কথাকেও বুঝতে পারি না। কিন্তু একটা জিনিষ তাঁর বুঝি সেটা তাঁর স্নেহ প্রীতি ভালবাসা—মানুষের জন্য তাঁর আকুলতা। সারা জীবনে এমন কোন লোক নেই তাঁর কাছে যে এসেছে যাকে তিনি অন্তরের গভীরতা দিয়ে একাত্ম করে ভালবাসেন নি।

কেন তিনি এই পৃথিবীর এই মানুষকে এমন করে ভালবাসতেন, এমন করে একাত্ম করে নিতেন? তার কারণ প্রেমস্বরূপ পুরুষোত্তম থেকে জাত মানুষের সৃষ্টি স্থিতি লয় প্রেমে আর ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশ স্থূল মানুষের এই পৃথিবী। অথচ যে-মানুষের যে-পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিনের পরিচয় তার চেহারা ঠিক প্রেমের নয় বা ব্রহ্মজ্ঞানের নয়—এ কথা অনায়াসেই দেখতে পাই। তাহালে কথাটা কি এই যে মানুষ আসলে সুন্দর নয় অথচ সে সুন্দরের পূজারী? তাই-ই যদি ধরে নেই তাহালেও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত একটী সৌন্দর্য আছে বলেই সে সুন্দরের পূজারী হতে পারে। পুরুষোত্তমানন্দের চোখে এই সুন্দর মানুষের ও সুন্দর পৃথিবীর এমন একটী উজ্জ্বল চিত্র ফুটে উঠেছিল যারই জন্য পাগলের মত সারাজীবন তিনি মানুষকে সেই উজ্জ্বল জীবনের কথা শুনিয়ে গেলেন। মানুষকে তিনি সত্য বলেন, বিশ্বকেও—কিন্তু কাড়াকাড়ির বিশ্বও তাঁর কাছে সত্য নয়, আসক্তি বিদ্বেষে জর্জরিত অহং-কৈন্দ্রিক পশুত্ব-প্রধান মানুষও তাঁর কাছে সত্য নয়। মানুষ আর পৃথিবী সত্য হয় প্রেমে—অবতার-জীবনে সেই কথা ঘোষিত হয় যুগে যুগে বারে বারে বিস্মৃত-ধর্মী মানুষের কাছে। পুরুষোত্তমানন্দ সেই প্রেমের কথা বলেছেন নূতন আবেষ্টনের নূতন ভাষায়।

আজ এই স্বল্প পরিসরে স্বল্প কালে পুরুষোত্তমানন্দের ব্যাপক-গভীর জীবনের সবটুকু কথা তুলে ধরতে আমি পারব কেন? একটী দিব্য মানুষের দিব্য সমাজের উজ্জ্বল চিত্র যে পাগলকে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ক্ষেপিয়ে রেখেছে, তাঁর কথা ক্ষুদ্র আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করব কেমন করে? এই মানুষই ব্রহ্ম-মানুষ ভাগবত-মানুষ হয়ে ব্রহ্ম সমাজ, দিব্য সমাজ, ভাগবত সমাজ গড়ে তুলতে পারে যে-পথে, পুরুষোত্তমানন্দের জীবন সারা জীবন ধরে সেই

পথের কথাই বলে এসেছে। অত্যন্ত সংক্ষেপে সে পথটা হচ্ছে প্রত্যেকের মূল্যের স্বীকৃতি—যেটা ভগবানের দেওয়া। মানুষ নিজের মন-গড়া যে মূল্য দিয়ে অসাম্যের সৃষ্টি করে অকল্যাণকে ডেকে এনেছে, সে মন-গড়া মূল্য-বোধ যে 'মাত্রা' হারিয়ে ফেলেছিল, সেই মাত্রাটি আবার গেঁথে দিতে হবে মানুষেরই দিকে তাকিয়ে। ধনের যে মূল্য ছিল, মানুষের দুর্বুদ্ধি একদিন তার থেকে তাকে বেশী—অনেক বেশী—মূল্য দিয়ে ফেলল—শ্রমের নিজস্ব মূল্য রইল না কিছুই—মাত্রা গেল হারিয়ে, ছন্দ গেল ভেঙ্গে। ঘটল অঘটন। কুলের যে মাত্রায় যতটুকু মূল্য হওয়া উচিত ছিল, কুল পেয়ে গেল একদিন তার থেকে অনেক বেশী মূল্য—তাই কুল বজায় রাখতে গিয়ে শ্মশানযাত্রীর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়েছে একদিন এই মানুষই। এলো সেই পথে অকল্যাণ। পাণ্ডিত্যের মাত্রাতিরিক্ত মূল্য দিয়ে অপণ্ডিতকে করা হল অপমান। ঘটল এবারেও অঘটন। বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হল—কিন্তু তার মাত্রা রক্ষা করা গেল না—বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে হৃদয়বান তথাকথিত ছোটর দল—নারী প্রজা শ্রমিক দরিদ্র—নিপীড়িত হল—কেননা বুদ্ধি এদের নেই। সমাজের সমস্ত অকল্যাণ এই মাত্রাহীনতার জন্য।

ব্যক্তির জীবনের সকল ক্ষেত্রেও এই-ই ঘটেছে। দেহবান মানুষ কোথাও দেহকে দিল বেশী মূল্য, আত্মাকে করল খাটো, আবার কোথাও দেহকে ঘৃণ্য বলে আত্মাকে করল শুচি। মিল গেল ভেঙ্গে।

পুরুষোত্তমানন্দ জীবনের সকল ক্ষেত্রের এই অমিলকে মাত্রার ছন্দে গেঁথে তুলে দার্শনিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করলেন—বিকৃত মানুষ ও বিকৃত সমাজকে রক্ষা করতে চেয়ে এক প্রাণ-মাতানো কথা শুনিয়ে গেলেন।

সর্ব্ব সমন্বয়ের এই মিলকে, মাত্রাবোধকে পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন শ্রীনিত্যগোপাল—যোগাচার্য শ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। সিদ্ধান্ত দর্শন, ভক্তিযোগদর্শন, জাতি-দর্পণ বা নিত্য-দর্শন, সর্বধর্মনির্ণয়সার প্রভৃতি বহু বইয়ে যুগান্তকারী ক্রান্তি-পথকে শ্রীনিত্যগোপাল প্রকাশ করে গেলেও তাকে ঐ বইএর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, মুখে তা প্রচার করে যান নি, পুরুষোত্তমানন্দকেও তিনি এ তত্ত্ব মুখে বুঝিয়ে যান নি। তাঁকে তিনি শুধু এই আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন, 'শরৎ, তুমি কি জান না তোমার যখন যা দরকার ভগবান অন্তর্যামীরূপে তখন তা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন?'

আর পুরুষোত্তমানন্দকে যখন ১৩১২ সনে শ্রীদুর্গামন্ত্রে শ্রীনিত্যগোপাল দীক্ষা দান করেছিলেন তখন বলে দিয়েছিলেন এক বৎসর পরে বদলে দেব শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে। এই এক বৎসরের শেষাশেষি বাইরের দিক থেকে মন্ত্র বদলে দেন নি, কিন্তু যে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাতত্ত্বের কথা পুরুষোত্তমানন্দ বলে থাকেন, সেই তত্ত্ব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে প্রবেশ করেন। সে প্রবেশের কাহিনী যখন তিনি শ্রীনিত্যগোপালকে নিবেদন করেছিলেন, তখন শ্রীনিত্যগোপাল তাতে তাঁর সম্মতি জানিয়েছিলেন। ক্রমে শ্রীরাধা-কৃষ্ণের এক বৈপ্লবিক তত্ত্ব পুরুষোত্তমানন্দের মধ্যে গজিয়ে উঠতে থাকল—যে তত্ত্বকে তিনি বর্তমান বিজ্ঞানের চিন্তাধারার ভাষা দিয়েও ইদানীংকালে আমাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। অমনি করে ১৯১৯-এর প্রথম পর্যন্ত কাটল। এ পর্যন্ত শিক্ষকতা তাঁর বৃত্তি ছিল—কিন্তু এ বৃত্তি রক্ষা করা আর সম্ভব হল না—তাঁর ভিতরে চুইয়ে আসা তত্ত্বকেই জীবন দিয়ে প্রচার ও প্রকাশ করবার জন্য তাঁকে ঠেলে পথে বের করে দিল—১৯১৯-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী তিনি শিক্ষকতা-বৃত্তি ছেড়ে চলে এলেন কলকাতায়। সেই থেকে দেহ রক্ষা করার পূর্ব পর্যন্ত কাটল তাঁর সেই পথের কথা বলে যে-পথে এই মানুষই ব্রহ্ম-মানুষ, এই সমাজই দিব্য মানুষের সমাজ, এই ধরার ধূলিই ব্রহ্ম-ধূলি। রাজনীতির মধ্য দিয়েও তিনি মানুষের সামগ্রিক জীবনকথা বলেছেন। তিনি বলতেন আমি রাজনীতি করি না, রাধানীতি করি। রাধানীতি করা অর্থ নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত কি ভাবে শক্তিমানের কাছে নিজের মর্যাদায় দাঁড়াতে পারে, সেই পথের কথা শোনান। প্রত্যক্ষ রাজনীতি যেদিন ছেড়ে এলেন সেদিনও এই কথাই শুনিয়েছেন—বলতে চেয়েছেন দৃষ্টিভঙ্গির এই পরিবর্ত্তনকে দার্শনিক চিন্তা ও কাঠামোর মধ্যেও আনতে হবে—নয়তো এ বিপ্লবকে ধরে রাখা যাবে না। ভাষান্তরে নূতন দৃষ্টিভঙ্গির তিনি একটী দার্শনিক কাঠামো দিয়েছেন।

পুরুষোত্তমানন্দের সমস্ত চলাফেরা আচার অচরণ তাঁর জীবনের ঐ ব্রতকেই ফুটিয়ে তুলেছে। নিজেকে তিনি বিশ্বনাগরিক বলে মনে করতেন, যে মন্ত্র তাঁর মুখে তুলে দিয়েছিলেন শ্রীনিত্যগোপাল। নিজেকে সর্বের সঙ্গে এক করে দেখতে চেয়েছেন বলেই সারাজীবন না খেয়ে না পরে কৃচ্ছ্রতার জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু আশ্চর্য এই যে এই কৃচ্ছ্রতা তাঁকে দেহে মনে চিত্তে, কর্মে জ্ঞানে প্রেমে ভক্তিতে এতটুকু অসুবিধায় ফেলতে

পারে নি—সবগুলিই তাঁতে একসঙ্গে কার্যকরী থেকেছে এবং এই কৃচ্ছ্র তার মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনব্রত তাঁর দেহকে পর্যন্ত বেশ খানিকটা অসাধারণ লাবণ্য ও স্নিগ্ধতা দান করেছিল। তাই পঁয়তাল্লিশ দিন উপোস করেও যেদিন তিনি উপোস ভাঙ্গেন সেদিনও জনসভায় বক্তৃতা দেবার দৈহিক ক্ষমতা তাঁর ছিল—দেহের সেই যোগ্যতা তাঁর লাভ হয়েছিল। অত্যন্ত সাধারণ আহার যে মানুষের দেহমনের কোন শক্তিকেই হরণ করতে পারে না—এটা পুরুষোত্তমানন্দের জীবনে প্রমাণিত হয়েছে।

অত্যন্ত সাধারণ খাওয়া পরার মত অত্যন্ত সাধারণ মানুষের সঙ্গে স্বামিজী বিচরণ করেছেন—ইচ্ছে করেই অত্যন্ত সাধারণ মানুষকে তিনি বুকে তুলে নিয়েছেন, একাত্ম করে দেখেছেন। সকলের দৈহিক সুখদুঃখকে প্রাণপণ করে দূর করতে যেমন চেয়েছেন, তেমনি এই সাধারণ স্তর থেকেই আত্মনিবেদনের পথে মানুষ যে কেমন করে নির্গুণের স্তরে উঠতে পারে, সেই কথাটি তাকে শেখাতে প্রাণপণ করেছেন। আসক্তি-বিদ্বেষ বহির্ভূত প্রেম-মাত্রকে সম্বল করে নিজের পরিচ্ছিন্ন অহংকে গলিয়ে দিয়ে কি করে মানুষ নিরুপাধিক বা সর্বোপাধিক মুক্তি আস্বাদন করতে পারে সকল ঘটনার মধ্যে—যাকেই তিনি কাছে পেয়েছেন তাকেই সেই কথাটা জানাতে চেয়েছেন।

পুরুষোত্তমানন্দের কথা আর আমরা তাঁর কম্বু কণ্ঠে শুনব না। যিনিই সে কণ্ঠ শুনেছেন, তিনিই উপলব্ধি করছেন সে কণ্ঠ না শোনা কি বস্তু! সে কণ্ঠ আর আমরা শুনব না। তাঁর কথা ছড়িয়ে পড়েছে, ছড়িয়ে পড়বে। যে লেখাগুলি তাঁর রয়েছে, সন্ধানী দৃষ্টি সেগুলিকে ক্রমে আরও ছড়িয়ে দেবে। আজ তিনি দেহেতে নেই—সর্বভূতের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার যে সাধনার স্পর্শ চিত্তে তিনি দিয়ে গেছেন, সে সাধনা ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনে, ব্যক্তি জীবনে ব্যক্ত হয়ে উঠবে—তাঁর সেই সার্বভৌতিক প্রকাশই আজ দেখতে পাওয়ার অপেক্ষায় আছি। আজ তাঁর এই শুভ জন্মদিনে তিনি নেই—তবু তিনি আছেন। তাঁর সেই থাকাকে প্রতি মুহূর্তে যেন উপলব্ধি করি। উপলব্ধি করি অন্তরে নিজের মধ্যে, উপলব্ধি করি বাইরে আপনাদের সকলের মধ্যে। সর্বভূত থেকে নিজেকে তিনি কখনও বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি—তাই আপনাদের সকলের মধ্যে তাঁর প্রকাশকে দেখতেই হবে। তাঁর একদিকে তাঁর শ্রীনিত্যগোপাল, আর এক দিকে তাঁর অন্তরে মানুষের দিব্য রূপের চিত্র

—এই দুইয়ের মধ্যে নিজেকে তিনি নিঃশেষ করে দিয়েছিলেন। বলেছেন —'আমার জন্মের মধ্য দিয়ে শ্রীনিত্যগোপাল বিশ্ব-জীবনে জন্মলাভ করুন'— নিজের পৃথক সত্তা তাঁর ধুয়ে মুছে গিয়েছিল। তাই তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে শ্রীনিত্যগোপালকে পেতে হবে, শ্রীগৌরকে পেতে হবে, শ্রীকৃষ্ণকে পেতে হবে—আর পেতে হবে আপনাদের সকলকে, সমস্ত মানুষকে। তবেই তাঁর জন্ম সার্থক, তাঁকে স্মরণ করা সার্থক, তাঁকে পূজা করা সার্থক। আমরা যেন তাই পারি—আপনারা আশীর্বাদ করুন। শ্রীনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন, পুরুষোত্তমানন্দ জয়যুক্ত হউন, বিশ্বের মানুষ জয়যুক্ত হউন।

দুটি শালিক

॥ শ্রীগোপাল ভৌমিক ॥

বহুদিনের চেনা শালিক জোড়া :
মেয়েটি বেশ নধরদেহ
পুরুষটির পা-টা একটু খোঁড়া।
পরিচয়, তা বছর পাঁচ হবে,
সদ্য যখন বিয়ে করে
ঘর বেঁধেছি এই বাড়িতে সবে।
শহরতলীর ছোট বাসা এটি,
অল্প আয়ে অথই জলে
হোক সাময়িক, তবু তো সে জেটি।
পেয়ারা গাছ ছিল উঠান জুড়ে,
রোজই দেখি শালিকজোড়া
সেই গাছেতে বসছে ঘুরে ঘুরে।

মাঝে মাঝেই খাবার খেয়ে খুঁটে
বসত গিয়ে গাছের ডালে
মনের সুখ ওঠে পাখায় ফুটে।
উঠোনের সে পেয়ারা গাছ বাড়ে,
শিশুর হাসি-মুখর বাড়ি
জীবন থেকে ঝিমুনি সব কাড়ে।
কেমন যেন একটা তবু ফাঁক
হৃদয় ভরে শূন্যতায়
না শুনে সে শালিকজোড়ার ডাক।
হারিয়ে গেছে কোথায় তা কে জানে ?
তাদের সাথে হারায় নি কি,
এ জীবনের অনেকখানি মানে ?
খোঁড়া শালিক, মোটা বউটি, ভাবি
এমন করে কোথায় গেল
ছেড়ে দিয়ে পেয়ারা গাছের দাবি ?

শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেল

॥ অধ্যাপক রেজাউল করীম ॥

(২)

১৮১৬ সালে New-Education বা নব-তর শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে ফ্রয়েবল নিজের আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হ'লেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম তিনি গ্রীমেম গ্রামে চলে এলেন। সেখানে দু'বছর থাকার পর থুরিঙ্গিয়ানের অন্তঃপাতী কেল্‌হাম গ্রামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। পরে এই গ্রামটা শিক্ষা সম্পর্কিত নূতন থিওরীর তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। ফ্রয়েবেল, লিঙ্গাথাল এবং মিডেনড্রফ, এই তিন বন্ধুতে নব-প্রণালী অনুসারে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন বিবাহিত। তাঁরা এখানে একটি শিক্ষক-সমাজ গড়ে তুললেন। ক্রমেই তাঁদের আদর্শ চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হ'তে লাগল এবং বিদ্যালয়টির খ্যাতি সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। তাঁদের একটিমাত্র বিষয়ের অভাব ছিল—তাঁরা বহু বৎসর ধরে অর্থসঙ্কটের মধ্যেই কাজ করতে লাগলেন। এখানে ফ্রয়েবল প্রায় চৌদ্দ বছর ছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি অনেক কিছু শিক্ষালাভ করলেন। তারপর তিনি এখান থেকে চলে গেলেন এবং অন্যত্র আরও কতকগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। অবশেষে ওয়াটানমের পরিত্যক্ত প্রাসাদের ভিতর তিনি একটি আদর্শ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। কিন্তু উক্ত প্রাসাদের ধর্ম্মযাজকগণ তাঁকে নানাভাবে বাধা দিতে লাগলেন। তাঁদের বাধা দিবার প্রধান কারণ এই যে, তাঁরা মনে করলেন যে, ফ্রয়েবেল এইভাবে শিক্ষা প্রচার ক'রে ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রোটেস্টান্ট অভিযান চালাচ্ছেন। কাজেই এত বাধাবিপত্তির পর তাঁর প্রতিষ্ঠান সাফল্যলাভ করল না।

এইটাই শেষ বাধা নয়—নানাভাবে আরও বাধা উপস্থিত হ'ল। কিন্তু তবু তিনি হতাশ হলেন না। ঠিক এই সময় সুইস্-সরকার তাদের দেশের তরুণ শিক্ষকদেরকে শিক্ষণবিদ্যা শিক্ষা করবার জন্য তাঁর নিকট প্রেরণ করতে লাগলেন। অবশেষে ফ্রয়েবেল বার্গড্রফে (Burgdrof) চলে এলেন।

তিরিশ বছর পূর্ব্বে এখানে পেষ্টালজি শিক্ষাদান ব্যাপারে বহু কাজ করে-ছিলেন। এখানেই ফ্রয়েবেল একটি অনাথ-আশ্রম স্থাপন করলেন এবং স্কুলের শিক্ষকদের জন্য শিক্ষণবিদ্যা সম্পর্কে পাঠ দিতে আরম্ভ করলেন। বিভিন্ন শিবিরের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণকে এক বছর অন্তর বার্গড্রিফে তাঁর তত্ত্বাবধানে তিনমাস শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলেন। এইসব শিক্ষক-গণ বিভিন্ন শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার তুলনামূলক আলোচনা করতেন। তাঁরা ফ্রয়েবেল, বিটজিয়াস (Bitzius) প্রমুখ শিক্ষাবিদের নিকট উপদেশ গ্রহণ করতেন। ফ্রয়েবেল প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে সম্মেলনে মিলিত হ'তেন, আলাপ আলোচনা করতেন। তাতে ফ্রয়েবেল দেখলেন যে স্কুলে পড়বার মত বয়স হবার পূর্ব্বে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সর্ব্বত্র অবহেলিত হয়। সেইজন্য যখন তারা স্কুলে প্রবেশ করে তখন ভাল ফল করতে পারেনা। কিন্তু ফ্রয়েবেল harmonious development-এর পক্ষপাতী, তাঁর শিক্ষা-নীতিতে শিশুর শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে বলেন। ১৮২৬ সালে তিনি The Education of Man লেখেন। তাতে তিনি লিখেছেন যে, সাত বছর বয়স পর্য্যন্ত শিশুর শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে হ'বে। অল্প বয়সের শিশুদেরকে কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে, সেই বিষয়ের উপর তাঁর চিন্তা ও ধ্যান ধারণা নিবদ্ধ ছিল। তিনি বলেন এইসব শিশুদের প্রতি উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হ'বে।

গাছের ছোট চারাকে যেমন বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা দরকার, শিশুর প্রতিও তদনুরূপ ব্যবহার করতে হ'বে। তাই তিনি শিশুদের শিক্ষার জন্য graduated course of exercise-এর পরিকল্পনা রচনা করলেন। যে সব খেলাধূলা শিশুকে আকৃষ্ট ক'রে তাহারই উপর মডেল ক'রে তাঁর এই শিক্ষাপদ্ধতি রচিত। তিনি যদি স্বাধীন ভাবে কাজ করবার সুযোগ পেতেন তবে বহু শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে যুগান্তর আনতে পারতেন। কিন্তু সবদেশেই দেখা যায় যে বৈপ্লবিক প্রত্যেক কাজেই প্রতিক্রিয়াশীল সরকার বাধা সৃষ্টি করেন। এ ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'ল না। সরকার তাঁকে নানা ছলছুতা তুলে পদে পদে বাধা দিতে লাগলেন। সুতরাং অগত্যা বাধ্য হয়ে তিনি কিল্হানে চলে এলেন। অতঃপর তিনি প্রথম কিণ্ডার-গার্টেন স্কুল স্থাপন করলেন। কথাটার অর্থ garden of the children—শিশুদের উদ্যান। কিলহানের নিকট একটি গ্রাম ছিল তার নাম ব্লাঙ্কেনবার্গ

(Blankenburg)। এই গ্রামেই সর্ব্বপ্রথম কিণ্ডারগার্ডেন প্রথা অনুসারে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হল। এই পদ্ধতির প্রথম প্রবর্ত্তক হচ্ছেন ফ্রয়েবেল। আজ এ নামটি সর্ব্বত্র সুপরিচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় শিশুশিক্ষার অমন একটি সুন্দর ব্যবস্থা টাকার অভাবে চলল না। তিনি অর্থাভাবে পরিকল্পনাটি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু ফ্রয়েবেল আশা ও উদ্যম ত্যাগ করলেন না। তিনি সুযোগ ও সুবিধামত কাজ করে যেতে লাগলেন। ১৮৭৯ সালে একজন বুদ্ধিমতী মহিলা ফ্রয়েবেলের প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হলেন—তাঁর নাম Baroness Von Marennoltz। এই মহিলা তাঁর দীক্ষাগুরুর একটি স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। অদ্যাবধি ফ্রয়েবেলের জীবনী সম্বন্ধে এই বইটিই সবচেয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ।

১৮৪৮ সালে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠলো। ফ্রয়েবেল আশা করেছিলেন যে এই বিপ্লবের ফলে সাধারণ মানুষের উন্নতি হবে। আর মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করবার সুযোগ পাবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তার কিছুই হ'ল না। স্বাধীন চিন্তার যে কোন সুযোগ পাওয়া গেল না তার প্রমাণ তিনি অল্পদিনের মধ্যে পেলেন। তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র অধ্যাপক কার্লফ্র য়েবেলের শিক্ষা সংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তক প্রকাশ করলেন। আর অমনি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠ্‌ল যে তিনি সোস্যালিজম প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। সুতরাং সরকারের পক্ষ থেকে তাঁদের দুজনকেই আদেশ দেওয়া হ'ল যে তাঁরা যেন কোন নূতন বিষয় শিক্ষা না দেন। ফ্রয়েবেলের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ উঠলো যে তিনি শিক্ষাসংস্কারের নামে ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রচার করছেন। এই সব কারণে ১৮৫১ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ভন রাউমার (Von Raumer) একটি আদেশ জারি করলেন, তার ফলে প্রাসিয়ার কোথাও ফ্রয়েবেল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের আদর্শ অনুসারে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা চলবে না। এতদিন ধ'রে তিনি যে মহৎ কাজে ব্রতী ছিলেন মন্ত্রীপ্রবরের এক আদেশেই তাঁকে সে ব্রত ছেড়ে দিতে হ'ল। এই আদেশের পর তিনি অধিক দিন বাঁচেন নি। ১৮৫২ সালের ২১শে জুন ফ্রয়েবেল ভগ্ন হৃদয়ে দেহ ত্যাগ করলেন।

তাঁর যুগের লোক ফ্রয়েবেলকে ভাল ক'রে চিনতে পারে নি। কিন্তু আজকের যুগের শিক্ষাবিদ্‌গণ বুঝেছেন যে ফ্রয়েবেল শিক্ষাদান প্রণালীর মধ্যে যুগান্তর এনে দিয়েছেন। তিনি ধর্ম্মবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বলতেন যে

ধর্ম্মের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত না হ'লে কোন শিক্ষা-ব্যবস্থাই ফলপ্রসূ হয় না। তিনি আর একটা বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সমস্ত বিষয়ের মধ্যে একটা Unity বা ঐক্য আছে। সৃষ্টির আদিতে ছিল এই ঐক্য। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুই সেই আদিম ঐক্যের মধ্যে বাস করত, চলাফেরা করত, তারি মধ্যে তাদের অস্তিত্ব বিরাজমান ছিল। মানুষ ও প্রকৃতির সব জীবজন্তু একই মূল সূত্র থেকে উদ্ভূত। তারা সকলেই একই বিধি বা আইনের অধীন। দুশো বছর পূর্ব্বে কমেনিয়াসও এই কথাটাই ইউরোপের শিক্ষাবিদ্‌গণকে বলেছিলেন। ফ্রয়েবেল সেই কথাকেই নূতন পরিবেশে নূতন ক'রে বল্লেন। তিনি বল্লেন মানব-সন্তানের শিক্ষানীতির মূল কথা জানতে হ'লে প্রকৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করতে হ'বে। গাছপালা তরু লতা এসব কৃষক সৃষ্টি করে না। কিন্তু তারাই ত এগুলির যত্ন করে' সেবা করে' তাদেরকে নানা উপায়ে বাঁচিয়ে রাখে। সেইরূপ শিশুকেও মানুষ সৃষ্টি ক'রে না, এবং শিক্ষকও শিশুর মধ্যে কিছুই সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁর প্রধান কাজ হ'বে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে (Inborn faculties) বিকশিত করে তোলা। শিক্ষক শিশুর উপর তদারক করবেন, তাকে পর্য্যবেক্ষণ করবেন, একটু একটু করে পথ দেখাবেন। পেষ্টালজি বলেন যে শিশুর এই সব প্রবৃত্তিকে অভ্যাস ও ব্যায়াম দ্বারা বিকাশ করতে হ'বে। কিন্তু ফ্রয়েবেল এতে সন্তুষ্ট নন। তিনি আর একটু এগিয়ে বল্লেন যে, শিক্ষাদানের প্রধান কাজ হচ্ছে শিশুর স্বেচ্ছাপ্রসূত কর্ম্মধারাকে জাগ্রত করতে হবে এবং তারপর সেগুলিকে বিকশিত করতে হ'বে। ফ্রয়েবেল শিশুর স্বৈচ্ছিক কর্ম্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। তাঁর শিক্ষানীতির প্রধান কথা হচ্ছে যে মানুষ প্রধানত: Doer বা কারক এবং Organiser বা পরিকল্পক। শিশু স্বকৃত কর্ম্মমালার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ করে। তার শিক্ষা-জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত তার কাছে মূল্যবান। তবে ফ্রয়েবেল শিশুর প্রথম স্তরের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। রুশোর মত তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শিশুর বিকাশের প্রত্যেক স্তর স্বয়ংপূর্ণ এবং পরবর্ত্তী স্তরের পরিপূর্ণতা পূর্ব্ব স্তরের পূর্ণতার উপর অনেকটা নির্ভরশীল। শিশু-জীবনের প্রথম স্তর অত্যন্ত মূল্যবান। সেই স্তরের গুরুত্ব উপলব্ধি করে' তিনি পেষ্টালজির মতই শিশুর মাতার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও স্বীকার করেছেন। পেষ্টালজি বলতেন যে শিশু হচ্ছে পরিবারের বস্তু। আর ফিটচে বলতেন যে শিশু হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্পত্তি। কিন্তু ফ্রয়েবেলের মত একটু বিভিন্ন।

তিনি বলেন সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যে শিশুর ক্রমোন্নতি মিলন ও সামঞ্জস্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাই তিনি বিশ্বাস করেন যে শিশু যেমন পরিবারের তেমনি রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পত্তি। সুতরাং শিশুদের জীবনের কিছুটা অংশ সাধারণ জীবন ও সাধারণ কাজ কর্ম্মের মধ্যে কাটবে।

পূর্ব্বেই বলেছি যে কিণ্ডারগার্ডেন কথাটা ফ্রয়েবেলই আবিষ্কার করেছেন। তিনি এই কথাই বলতেন যে শিশুদের প্রধান বৃত্তি হবে খেলাধূলা। খেলাধূলার সংজ্ঞা তিনি দিয়েছেন—যে কোন কাজে শিশুরা আনন্দ পায় তাকেই তিনি বলেন "খেলাধূলা"। তিনি শিশুদের খেলাধূলার জন্য কতকগুলি নূতন নূতন খেলা আবিষ্কার করেন। সেগুলি নিছক খেলা হ'তে পারে কিন্তু তাদের মধ্যে শিক্ষারও একটা ইঙ্গিত আছে—যেমন, এই সব খেলার মাধ্যমে শিশুদের দেহ বেশ শক্ত হ'বে, তাদের ইন্দ্রিয় সমূহ সুসমঞ্জসভাবে পরিচালিত হ'বে, তাদের মনটা জাগ্রত হ'বে, তারা তাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে জানবে ও বুঝবে—আর জানবে তাদের সঙ্গীকে। এইভাবে তারা ঠিকভাবে গঠিত হ'বে, তাদের মধ্যে স্নেহপ্রীতির ভাবও জেগে উঠবে। এই পথে তাদেরকে জীবন যাত্রার পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আমাদের দেশের শিক্ষকদেরকে বিশেষ ক'রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন শিক্ষাবিদ্ ফ্রয়েবেলের শিক্ষানীতিটা ভাল ক'রে বুঝবার চেষ্টা করেন। দেশের শিশুদের গড়ে তোলার ভার তাঁদের উপর ন্যস্ত। মান্ধাতার আমলের শিক্ষা দান পদ্ধতির আমূল সংস্কারের ও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আছে। আমাদের শিক্ষকগণ যেন একথা ভুলে না যান।

———

বৌদ্ধ দর্শনে ক্ষণিক বাদ

॥ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সরকার ॥

বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা দুঃখবাদে। বুদ্ধদেবের মতে সংসার দুঃখময়। তাঁর সুখ-শান্তিময় কৈশোরে রোগ শোক জরা মৃত্যুর দুঃখময় অভিজ্ঞতা তাঁর করুণাঘন অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই তিনি প্রথমে খুঁজেছিলেন এইসব দুঃখের কবল থেকে মানুষের মুক্তির উপায়। তাঁর জন্য তিনি দ্বাদশ বৎসর কঠোর একাগ্র সাধনা করেন। এই সাধনায় তিনি যে সমাধি বা দিব্যজ্ঞান লাভ করেন তাই তিনি রূপায়িত করেছেন বৌদ্ধ দর্শনে এবং তার উপরেই বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠিত।

দুঃখবাদের মূল সূত্রকে বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় 'আর্য্যসত্য'। 'চত্তারি অরিয় সত্তানি',—আর্য্যসত্য চারটি,—দুঃখ, দুঃখ সমুদয় বা উৎপত্তি, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় উদ্ভাবন। দুঃখ আট প্রকার,—জন্ম, ব্যাধি, জরা মরণ, প্রিয়জনের বিয়োগ, অপ্রিয় সম্প্রয়োগ অর্থাৎ অনভিপ্রেতের সহিত সংযোগ, ঈপ্সিত বস্তুর অলাভ বা অপ্রাপ্তি এবং পঞ্চেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু। সকলেই এই আট রকমের দুঃখ ভোগ করে। প্রত্যেকেরই জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি আছে, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ আছে, অপ্রিয় বা অবাঞ্ছিতের সংস্পর্শ পরিহার করা যায় না, ঈপ্সিত বস্তু ইচ্ছামত পাওয়া যায় না; পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে যা ভোগ করা যায় তা আপাতঃ মধুর হলেও পরিণামে দুঃখ জনক।

দুঃখের সমুদয় বা উৎপত্তি বিষয়ে সমীক্ষা করতে গিয়ে তিনি একটী কারণ পারম্পর্য্য নির্ণয় করেছেন। তাঁর আবিষ্কৃত মনোবিজ্ঞানের এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ মূলক অংশটীর নাম দেওয়া হয়েছে 'পতিচ্চ সমুদ্‌পাদ' বা 'প্রতীত্য সমুদ্‌পাদ'। Rys Davis প্রভৃতি পাশ্চাত্য মনীষীরা এই অংশকে বলেছেন "chain of dependent causation"—Psychology of Buddha. বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানে তার সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয়েছে এইরূপে :—

"অস্মিন্ যদীদং ভবতি,
অস্যোৎ পাদাৎ ইদমুৎপদ্যতে।"

ইহা ঘটিলে উহা হয়, একের উৎপত্তিতে হয় অন্যটীর উৎপত্তি। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না ; জগতে যা কিছু ঘটে তার মূলে আছে কোন এক বা একাধিক কারণ। এইরূপ কারণ-পরম্পরার মধ্য দিয়াই আমাদের অনুভূতির জগত আমাদের কাছে প্রকাশমান। বুদ্ধের মতে দুঃখের কারণ বারটি,— অবিজ্জা বা অবিদ্যা, সঙ্খার বা সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি ও জরা মরণ। অন্তরের ও বাইরের অজ্ঞানতাই অবিদ্যা। জগত যে দুঃখময়, সে দুঃখের স্বভাব কি, তার কারণ কি, তার উৎপত্তির কারণ নিরোধ করার আবশ্যকতা এবং এই নিরোধের উপায় কি,—এই সব বিষয় না জানাই অবিদ্যা। অবিদ্যা নিয়েই মানুষ জন্ম গ্রহণ করে। আমাদের পাঁচ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের প্রতি নিয়ত সংযোগ হয়। এই সংযোগের ফলেই বাইরের জগৎ আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। এই সংস্পর্শ নিত্য নয়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এর পরিবর্ত্তন হয়। এই সংযোগও যেমন পরিবর্ত্তনশীল, তা থেকে ইন্দ্রিয় যা গ্রহণ করে তাও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন-শীল।

প্রতি মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়ের এই যে গ্রহণ করার ব্যাপার বৌদ্ধ দর্শনে তাকে বলা হয় 'ধর্ম'। "মনোপুব্বাং গমা ধম্মা মনো-সেট্‌ঠা মনো ময়া"—মনকে পূর্বঙ্গম করেই ধর্মের উৎপত্তি, মনের সঙ্গে যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং একই বিষয়বস্তু অবলম্বন করে। মনের সহযোগিতা ছাড়া ধর্মের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং মন এদের প্রধান অগ্রণী, কিন্তু দেশ ও কাল হিসাবে পূর্বগামী নয়। এরূপে উৎপন্ন হয় তাই ধর্মসকল মনোময় বা মন গঠিত। 'ধর্ম হেতু প্রভবা'—কারণ বা অকারণ সমূহ হ'তে ধর্মের উৎপত্তি,—তাদের মধ্যে মনের আধিপত্য থাকে তাই কারণ পরম্পরার মধ্যে মনই শ্রেষ্ঠ। ধর্মের প্রকৃতি ও তার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাও অবিদ্যা। অবিদ্যা থেকে সংস্কার জন্মে। "অবিজ্জা —পচ্চয়ে সঙ্খারা" প্রতীত্যসমুদপাদ ; সংস্কার প্রত্যয়-জাত ও সমবায়ে উৎপন্ন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এর নাম দিয়েছেন mental aggregate বা mental co-efficient, অর্থাৎ সমীকৃত ধর্ম।

"সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চা"—ধম্মপদ মগ্‌গো বগ্‌গো। ধর্ম্ম যেমন অনিত্য, ধর্ম্মজাত সংস্কার সকলও অনিত্য বা ক্ষণ স্থায়ী।

সংস্কারের উৎপত্তি হলে তার সঙ্গে মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের যোগে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। বেদনার অর্থ অনুভূতি। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের

সমষ্টিকে বলা হয় "নাম" এবং চারি মহাভূত ও ভূতাত্মক বস্তুকে বলা হয় "রূপ"। যখনই বাইরের জগৎ বা প্রকৃতির সঙ্গে পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের যোগ স্থাপিত হয় তখনই নাম-রূপের উৎপত্তি হয়। জড়ের সঙ্গে চেতনার সংস্পর্শে নাম-রূপের উৎপত্তি এবং এই প্রকার সংযোগেই ষড়ায়তন অর্থাৎ চক্ষু-কর্ণ শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয়ের ভিতরের শক্তির বিকাশ ঘটে। অপিচ চেতনা ও জড়ের সংযোগেই হয় পুদ্গল বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ। আবার যখন ছয় ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শক্তির বিকাশ হয় তখনই সাধিত হয় প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সংযোগ বা সংস্পর্শ। এর ফলেই দুঃখ অদুঃখ অর্থাৎ সুখদুঃখময় বেদনা বা অনুভূতি আসে। এই সব অনুভূতিই তন্হা বা তৃষ্ণার কারণ। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ছয় ইন্দ্রিয় এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পৃষ্টব্য ও ধর্ম এই ছয় বিষয়—এই দ্বাদশ আয়তনের সংযোগ জনিত বেদনা থেকে তৃষ্ণার উৎপত্তি। তৃষ্ণাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, কাম তৃষ্ণা (craving for sensual pleasure), ভব তৃষ্ণা বা রূপ তৃষ্ণা (craving connected with eternalism) ও বিভব বা অরূপ তৃষ্ণা (craving connected with the nihilism)।

"ছত্তিংস সতি সোতা" (ধম্মপদ, তন্হা বগগো) তিন শ্রেণীতে উপরোক্ত দ্বাদশ আয়তন যুক্ত হয়ে তৃষ্ণা-স্রোত ছত্রিশ ধারায় প্রবাহিত হয়। এই সব তৃষ্ণা থেকেই উপাদান বা গ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা জন্মে। বাসনাই দুঃখের কারণ। (দ্বিতীয় আর্য্য সত্য।) বাসনার নিরোধেই দুঃখের নিরোধ বা নির্বাণ।

যে পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধ দর্শন ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হয়েছিল তার অবস্থা ভাল করে না জানা থাকলে বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাব ও অভিযান যে কত দুঃসাহসিক ও কত বড় সুশান্তকারী তা প্রণিধান করা যায় না। প্রাক্ বুদ্ধ শতাব্দীতে বৈদিক ধর্মে নানা গ্লানি প্রবেশ করে। বৈদিক ধর্মাচার অথবা উপনিষদের শান্ত সমাহিত ব্রহ্মানুভূতি কিংবা আনন্দময় অমৃত স্বরূপের উপলব্ধি করার সাধনা অতি অল্প সংখ্যক লোকের ভিতর সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বৈদান্তিক জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের স্থলে যজ্ঞমূলক ক্রিয়া কাণ্ড প্রাধান্য পেয়ে বসে। সনাতন বেদের শাসক ও রক্ষক ঈশ্বরবাদের উপর আবার চাপ্তে থাকে আদিম যুগের বহু দেবতাবাদ এবং নিত্য নূতন দেবতা নব নব মূর্ত্তিতে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে। এদের সকলেরই শক্তি অমিত,—তারা পূজা পার্বণ পেলে মহাসুখী,—তখন নিজ নিজ অমোঘ শক্তির বলে শরণাগত ভক্তের

সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন এই আদিম বিশ্বাস সাধারণের মনে দৃঢ়-বদ্ধ হয়; এবং দেবতাগণকে তুষ্ট করে অভীষ্ট ফল লাভের আশায় পূজা পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞের দেশব্যাপী মাতামাতি-সুরু হয়। কেন না এই জাতীয় অনুষ্ঠান এক দিকে সহজসাধ্য,—অন্যদিকে এর ফলাফল অতি-লোভনীয় ও সুদূর প্রসারী। এ জন্মে সকল বাসনার পূরণ ও মৃত্যুর পর পুষ্পক রথে স্বর্গ যাত্রা ও লক্ষ কোটি বর্ষ স্বর্গ-সুখ ভোগ। তার ফলে ধর্ম্মের নামে চলতে থাকে নানা কদাচার ও জীব হত্যার বীভৎস তাণ্ডব। ধর্মাচরণে বণিক বৃত্তি প্রবেশ করে এবং লক্ষ লক্ষ দেবতা ও ঈশ্বরের উপর শ্রেণী বিশেষের একাধিকার (monopoly) প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সময় কয়েক শতাব্দী ধরে বৈদিক কর্ম-কাণ্ড এতই ব্যাপক ভাবে অনুষ্ঠিত হতো যে ভগবান ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভগবত গীতায় তা উল্লেখ না করে পারেন নাই।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ
বেদবাদ রতাং পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদান্
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥

গীতা ২য় অধ্যায় ৪ ২-৪৩ শ্লোক।

"হে পার্থ, অল্প বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বেদের কর্ম কাণ্ডের স্বর্গফলাদি প্রকাশক প্রীতিকর বাক্যে অনুরক্ত, তাহারা বলে বেদোক্ত কাম্য কর্ম্মাত্মক ধর্ম ভিন্ন আর কিছু ধর্ম নাই, তাহাদের চিত্ত কামনা-কলুষিত, স্বর্গ ই তাহাদের পরম পুরুষার্থ, তাহারা ভোগৈশ্চর্য লাভের উপায় স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়া কলাপের প্রশংসা সূচক আপাত মনোরম বেদ বাক্য বলিয়া থাকে।"

—শ্রীজগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত গীতা ৬ষ্ঠ সং, ৫৭ পৃঃ।

সনাতন হিন্দুধর্মের এই রকম অবনতি কালে সমস্ত কর্ম শক্তি ও সৃজনী শক্তিকে তুলে দেওয়া হয় একমাত্র স্থিতিশীল স্থির চৈতন্য ঈশ্বরের হাতে। মানুষের স্বাধীন কর্ম-তৎপরতা এবং সে পথে অগ্রগতি যায় রুদ্ধ হয়ে, মানুষ হয় ঈশ্বরের হাতের যন্ত্র-চালিত পুতুল মাত্র। মানুষের এবং সত্তার একমাত্র আবশ্যকতা জীবনের 'প্রবাহ রক্ষাকরা,'—জীবনের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঈশ্বরের। তাঁর পরিচালনা না পেলে নিজের কর্ম বলে বা তৎপরতায় মানুষের কোনো কিছু আয়ত্ত বা অর্জ্জন করার অধিকার থাকে না।

কিন্তু পিতা ঈশ্বর বা প্রভু ঈশ্বর যাই হন তিনি, তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব ও শাসন পালনের অধীনে মানুষের আত্ম প্রতিষ্ঠার পথে, নিজের স্বরূপ উপলব্ধির পথে সতত থাকে এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, এবং কেবল মাত্র ঈশ্বরের করুণা ভিক্ষা করাই থাকে মানুষের সম্বল ও সে-বাধা দূর করবার উপায়।

এইরূপে ভারতের মুক্ত আত্মা বৈদিক ক্রিয়া কাণ্ডের নাগ পাশে জড়িত হয়ে যখন 'অচলায়তনের অন্ধকারে বন্দী, সেই মোহাচ্ছন্নযুগে ভগবান তথাগত গতি, চঞ্চলতা ও সজীবতার বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচার করলেন, মানুষকে শোনালেন মুক্তির বাণী, অমৃতের পুত্র কন্যাকে আবার নবীন-তম অমৃত মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন, সকল রকম দুঃখ থেকে মুক্তির ও চির নির্বাণ লাভের পথ দেখালেন।

প্রতীত্য সমুদপাদের গোড়ার দিকে তিনি বলেছেন 'সব্বম্ অনিচ্চম্ সব্বম্ সুন্নম্।' সকলই অনিত্য, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। Things are impermanent,—Rys Davis, Psychology of Buddha.

ধর্ম অনিত্য, যে কারণ বা কারণ সমূহ হতে এবং যে সংযোগের ফলে ধর্মের উৎপত্তি তারাও অনিত্য। সুতরাং ধর্মজাত সংস্কার, নাম, রূপ, চার মহাভূত, ষড়ায়তন বিজ্ঞান বেদনা বা তৃষ্ণা সবই ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সব কিছুরই রূপান্তর ঘটে। এ মুহূর্ত্তে যে ধর্মের উৎপত্তি হয় পর মুহূর্ত্তে তার লয় হয়ে অন্য ধর্মের উৎপত্তি হয়। এইরূপে কারণ পরম্পরার শৃঙ্খলে একের পর অন্যটীর রূপান্তর ঘটে। এই পরিবর্ত্তনশীলতা থেকেই চঞ্চলতা ও গতিশীলতার উৎপাত্ত। সুতরাং জগতে চিরস্থির কোনো কিছুর অস্তিত্ব নাই। এইরূপে তিনি স্থিতি-শীলতার স্থলে গতি-শীলতা, স্থির চৈতন্যের স্থলে চঞ্চলতা এবং একের স্থলে বহুর প্রতিষ্ঠা করেন। এই মতবাদকে পাশ্চাত্য মনীষিগণ Philosophy of Dynamism বা momentariness Philosophy নাম দিয়েছেন।

যে সূক্ষ্ম যুক্তির উপর প্রতীত্য সমুদপাদন ও গতি দর্শন প্রতিষ্ঠিত তাতে কোনো কল্পনা বিলাসের স্থান নাই। ইহা বৈজ্ঞানিক বাস্তব দৃষ্টি ও বিশ্লেষণ-মূলক। বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী, তাঁর নিকট বাস্তব জগতের সত্তা মায়া বা অবাস্তব নয়—অনুভূতিগম্য। পঞ্চেন্দ্রিয়ের উপর যার সংস্পর্শ ঘটলে ধর্ম উৎপন্ন হয় তা ক্ষণিক হলেও মায়া বা unreal নয়। "To Buddha naught exists save actualities,—eternally fermenting,

seething simmering actualities, that melt and dissolve and drosses of definition in their fiery glow, or ever they are able to come to birth."—Buddhism and Science by Paul Dahlke.

—'বুদ্ধের নিকট বাস্তব ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই,—কিন্বায়মান, স্ফুটন্ত, উত্তাপে উচ্ছসিত বাস্তবতা—যা তার অগ্নিগর্ভ জ্যোতিতে সব রকম সংজ্ঞার খাদ ও মলিনতাকে দ্রবীভূত করে অথবা সব সময় আপনা থেকে প্রতিভাত হয়।'

তাঁর মতবাদে এক অপেক্ষা বহুকে, ঈশ্বর অপেক্ষা মহা মানবকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেইজন্যই তাঁর প্রবর্ত্তিত ধর্মাচরণে করুণা মৈত্র মুদিতা ও উপেক্ষা সাধনার শ্রেষ্ঠ আঙ্গিক। ইহা বৌদ্ধ ধর্মে 'চারি মহাসত্য' নামে অভিহিত।

এই চার মহা সত্যের মূলে আছে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কথা—মানুষের মূল্য, মানবতার জয়গান, সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার অভয় বাণী।

বুদ্ধের সার্দ্ধ সহস্রাধিক বৎসর পরে বৈষ্ণব রস-রসিক বাংলার মরমী কবি এই সত্যকে আবার প্রকাশ করেছেন তাঁর সুললিত কীর্ত্তন রসে সরস করে—"শুনহ মানুষ ভাই

সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই।"

বুদ্ধদেবের মতে প্রত্যেক মানুষই সম্বোধি লাভের অধিকারী, তার জন্য পরমুখাপেক্ষী হবার—উচ্চতর শক্তির নিকট আত্ম সমর্পণ বা কৃপা ভিক্ষা করার আবশ্যক নাই। তিনি আত্মশক্তি ভিন্ন অন্য কোনো শক্তির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই।

এ বিষয়ে কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানুষকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগ-যজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছেন। দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছেন। তিনি মানুষের আত্ম-শক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ—তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই; মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছেন।

এমন করিয়া শ্রদ্ধা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল 'সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে হীন নহে কারণ মানুষ যে শক্তি'। মন্দির, ভারতবর্ষ।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা-সঙ্কট

(২)

। শ্রীমোহিত কুমার সেনগুপ্ত ॥

এইবার শিক্ষকদের দিক দিয়া একবার বিচার করিয়া দেখা যাক অবস্থাটা কি। প্রায় পনর বৎসর পূর্ব্বে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন গড়ে মাসে ১০।১২ টাকার বেশী ছিল না। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন যথেষ্ট দেওয়া হয় একথা আমি বলি না কিন্তু পনের বৎসর পূর্ব্বে যেখানে গড় পড়তা বেতন ছিল ১০।১২ টাকা, সেখানে এখন ইহা দাঁড়াইয়াছে মাসে ৫০ টাকা। কিন্তু শিক্ষক মহাশয়েরা তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তীদের অপেক্ষা কি কাজে বেশী মনোযোগ দিতেছেন? সহর ও পল্লী অঞ্চলের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখিবার সুযোগ আমার হইয়াছে, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রাথমিক শিক্ষার মান পূর্ব্বাপেক্ষা নীচে নামিয়া গিয়াছে। মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রেও ইহা অপেক্ষা কোন উজ্জ্বলতর ছবি দেখা যায় না। বিদ্যালয়ে পড়ার মান আজ এত নীচে নামিয়া গিয়াছে যে কোন ছেলের গৃহ-শিক্ষক ছাড়া চলে না। বাপ মা সংসার-খরচের সঙ্কোচ করিয়া ছেলে-মেয়েদের জন্য গৃহ-শিক্ষক নিয়োগ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন করিয়া আর একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্য্যন্ত ৩০০টি বিদ্যালয় ১১দশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হইয়াছে। সরকার হইতে স্থির করা হইয়াছে একাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ঐচ্ছিক বিষয়গুলি পড়াইবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করা এম. এ. বা এম. এস. সি. বা অনার্স লইয়া পাশ করিয়াছেন এইরকম শিক্ষকের প্রয়োজন। কিন্তু বেশীর ভাগ বিদ্যালয় হইতেই অভিযোগ আসিতেছে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. এ., এম. এস. সি. বা অনার্স সহ পাশ-করা শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। মফঃস্বল অঞ্চলের কথা বাদ দিলেও খাস কলিকাতায় একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়েও উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাইতেছে না। আমার মনে হয় একাদশ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করিবার

পরিকল্পনাটি ঘোড়ার আগে গাড়ী স্থাপন করার মতই হইয়াছে। উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা না করিয়া কোন বিদ্যালয়কে একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করা উচিত হয় নাই। আমার মনে হয় ইহার পর হইতে কোন বিদ্যালয় একাদশ শ্রেণীযুক্ত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হইবার জন্য আবেদন করিলেই সরকারের দেখা উচিত যে, সেই বিদ্যালয়ে এম. এ., এম. এস. সি. পাশ শিক্ষক আছে কিনা? যদি উপযুক্ত শিক্ষক না থাকে তাহা হইলে সে বিদ্যালয়কে কোন মতেই একাদশ শ্রেণীযুক্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত হইবার অনুমতি দেওয়া উচিত হইবে না।

শিক্ষা বিভাগের আর একটি দিকের সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমাদের দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ২০% জনের বেশী নহে। আমাদের বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। কাজেই বয়স্ক অশিক্ষিতদের শিক্ষা ব্যবস্থা করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে সরকার হইতে কতকগুলি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি আছে literacy centre এবং কতকগুলি আছে complete centre। Literacy centre-এ একজন শিক্ষক থাকেন, তাহার বেতন দেওয়া হয় মাসিক ১০৲ টাকা এবং complete centre-এ থাকেন একজন social teacher ও একজন literacy teacher। Social teacher-এর মাসিক বেতন ৩০৲ টাকা এবং literacy teacher-এর বেতন ১০৲ টাকা। সরকার কি আশা করিতে পারেন যে ১০৲ টাকা বেতনে কোন লোক পাওয়া যায়? যেখানে আজ কাল একজন গৃহের ভৃত্যকেও খাওয়া-পড়া ছাড়া ১৫৲ টাকার কম বেতন দিলে লোক পাওয়া যায় না, সেখানে ১০৲ টাকা বেতনে কেমন করিয়া শিক্ষক পাওয়া যাইবে? কাজেই বেশীর ভাগ বয়স্ক কেন্দ্রেই ভাল-ভাবে কাজ চলে না। এই পরিকল্পনাটির পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

স্বাধীনতা লাভের পর হইতে শিক্ষাক্ষেত্রে আর একটি সমস্যা দেখা দিয়াছে। আমাদের ছাত্রেরা এখন রাজনীতির দিকে বেশী অবহিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ ও পরিবর্ত্তনে ছাত্রেরা কর্ত্তৃপক্ষের কাজের সমালোচনা করে। বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতির নির্ব্বাচনেও কোন কোন স্থানে ছাত্রদের canvasing করিতে শুনা যায়। বিদেশী রাষ্ট্রে কি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার প্রতিবাদে স্কুল কলেজে ধর্ম্মঘট করে। পরীক্ষায় ফেল করার জন্য কোন ছাত্রকে উচ্চতর

শ্রেণীতে উত্তীর্ণ না করিলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ধর্ম্মঘট করিবার কথাও মাঝে মাঁঝে শুনা যায়। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা যাইত না। বর্ত্তমানে এই শৃঙ্খলাহীনতার জন্য দায়ী কে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে।

উপরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে কয়টি সমস্যার কথা বলা হইল তাহার জন্য কাহাকেও দায়ী করা আমার উদ্দেশ্য নহে। একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সকল সমস্যা চোখে পড়ে, সেইগুলির দিকে দেশের চিন্তা-নায়ক ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই প্রধান লক্ষ্য।

‘তোমার পাই নে কূল—
আপনা-মাঝারে আপনার প্রেম
তাহারো পাই নে তুল।’
—মানসী

ইতিহাস

॥ শ্রীসুকুমার মিত্র ॥

মানুষ কি, অর্থাৎ সে কি হয়েছে, এবং সে কি হতে চায় এই সমস্যাই হল ইতিহাসের মূল উপাদান, মূল প্রেরণা। ভেঙেচুরে তৈরী পাথরের একখণ্ড অমসৃণ হাতিয়ার যখন হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় ঘসামাজা একটা মসৃণ হাতিয়ার হয়ে দেখা দিল, তখন বুঝলাম মানুষ কি হতে চায়। আবার যখন শুনলাম, "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্", তখনও বুঝলাম যে মানুষ যা হয়েছে তাতে সে তৃপ্ত নয়, সে অন্য কিছু হতে চায়। যুগে যুগে যাঁরা মনীষী, দ্রষ্টা বলে সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছেন তাঁরা এই সমস্যার সমাধান যুগিয়েছেন। কেউ বলেছেন—"হও, কিন্তু জীবনকে পরিহার কর।" আবার কেউ বলেছেন—"না, জীবনকে আঁকড়ে ধর।" যাঁরা বলেছেন জীবনকে পরিহার করতে তাঁরা কিন্তু হেরে গেছেন। কেননা মানুষ জীবনকে বর্জন করে নি, চিরকাল আঁকড়ে ধরেছে। এইটাই মানুষের ধর্ম। ইতিহাসই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। ইতিহাস তাই আজ এত বৈচিত্র্যময়, এত ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত। আজ সেই প্রেরণার রহস্য মানুষের বুদ্ধিতে ধরা পড়েছে। তাই আজ সে কি হয়েছে এবং কি হতে চায় সেই গবেষণায় গভীরভাবে মগ্ন। শুধু তাই নয়। সে কী হতে পারে, তারও একটা অস্পষ্ট আভাষ আজ তার মনকে চঞ্চল করে তুলেছে।

'মানুষের অহঙ্কারপটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।'

কিন্তু কিসের সে অহঙ্কার? কবি তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেই মুক্ত। কিন্তু সে অনুভূতির রহস্য উন্মোচন করবে কে? কে করবে তার ব্যাখ্যা। যে অকবি, কবির অনুভূতির উৎসকে স্পর্শ করার, উপলব্ধি করার অধিকার হয়ত তার নেই। কিন্তু তবুও সে করবে। হয়ত ভুল করবে কিন্তু করবে। কেননা সেও যে মানুষ, আর সেটা তারও অহঙ্কার।

পৃথিবীতে মানুষের চাওয়ারও অন্ত নাই, পাওয়ারও অন্ত নাই। এই চাওয়া ও পাওয়ার মাঝখানের প্রক্রিয়াটি হল সৃষ্টি। এই সৃষ্টি যুগে যুগে

কত বিচিত্র রূপেই না প্রকাশিত। সৃষ্টির বৈচিত্র্যই হল মানুষের অস্মিতার উৎস, তার দুরন্ত, অনন্ত কামনার অভিজ্ঞান।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য এই যে মানুষ চিরকালই নিজেকে ঘিরে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, কিন্তু পশু তা পারে নি। এই পরিবেশকে বলা হয় সংস্কৃতি, ইংরাজীতে culture। এই পরিবেশ সৃষ্টির কাজে মানুষকে সাহায্য করেছে তার অবয়বের গঠন ও নিপুণতা। কিন্তু প্রাণী-জগতে মানুষের প্রাধান্যের প্রকৃত কারণ তার অবয়বের গঠন বা নিপুণতা নয়, প্রকৃত কারণ তার মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের উদ্ভব এক ধরণের প্রাণীকে মনুষ্যত্ব লাভের পথে প্রতিষ্ঠিত করে। মনের আধার মস্তিষ্ক। মন নিষ্ক্রিয় বস্তু নয়, তা সক্রিয় ব্যাপার; উপলব্ধি ও বুদ্ধি হচ্ছে তার ক্রিয়া এবং তা প্রকাশিত হচ্ছে মানুষের ব্যবহারের বিবিধ অভিব্যক্তিতে।

আমাদের এই পৃথিবীর বয়সের একটা আনুমানিক সীমা সংখ্যার প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু কল্পনায় স্পর্শ করা যায় না। পৃথিবীর বুকে প্রাণের আবির্ভাব ঘটল কবে তাও সংখ্যায় প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা তা করেছেন নানা কলাকৌশলের সাহায্যে। তাঁদের কাছে ব্যাপারটি খুবই সরল, খুবই স্পষ্ট। প্রাণ বস্তুর একটি গুণ। বস্তুকে অবলম্বন করেই তার সৃষ্টি, তার স্থিতি; বস্তুর লয়েই তার লয়, বস্তু নিরপেক্ষ প্রাণ অসম্ভব। কিন্তু সে প্রাণের আবির্ভাব কবে হল তা আমাদের কাছে সংখ্যা মাত্র, শব্দ মাত্র। আমাদের অন্তরে তার কোনো আবেদন নেই। কিন্তু কি বিরাট ঘটনা সেটি! কি বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি তা করে! সেই প্রাণ তারপর কত বিচিত্র প্রবাহে, কত বিচিত্র প্রক্রিয়ায়, কত বিচিত্র রূপে যুগের পর যুগ অতিক্রম করে, এগিয়ে চলে। এই এগিয়ে চলার একটি স্তরে এসে তার মধ্যে দেখা দেয় মনের অঙ্কুরোদ্গম—সৃষ্টি হয় মানুষ। বস্তুতে হয় প্রথমে প্রাণের স্ফুরণ, তারপর প্রাণে প্রস্ফুটিত হয় মন—ইতিহাসের বৃহত্তম ঘটনা। এর গুরুত্ব হয়ত আজ আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনা।

মানুষের আবির্ভাবের আগে পৃথিবীর একটা অতীত ছিল, কিন্তু ইতিহাস ছিল না। ইতিহাস শুরু হল মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে। ইতি-হাসের আগেও পৃথিবীতে সূর্য্য উঠত, দিবারাত্রি হত, আকাশে মাটিতে রঙের বিচিত্র লীলা চলত। কিন্তু তবুও তা ছিল নিতান্তই মূঢ়, জড়, অর্থহীন, অন্ধ প্রক্রিয়া। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজগৎ তাৎপর্য্য-

মণ্ডিত হয়ে উঠল, তার দ্বিতীয় জন্ম লাভ হল। মানুষের মন তাকে নতুন করে গড়ে তোলবার কাজে নিরবচ্ছিন্ন, অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। সৃষ্টি রূপায়িত হয়ে উঠল মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের উপকরণগুলির মধ্যে; রূপায়িত হয়ে উঠল চিত্রে, ভাস্কর্য্যে, সঙ্গীতে, ভাষায়, কাব্যে, দর্শনে। সৃষ্টি হল দেবতা, সৃষ্টি হল ধর্ম, সৃষ্টি হল সংস্কার। শুরু হল মুক্তির সাধনা। সব মিলিয়ে যা গড়ে উঠল তা হচ্ছে তার পরিবেশ, তার culture। মানুষই বিশ্বকর্মা, বিশ্বশিল্প তারই সৃষ্টি। তাই তার এত অহঙ্কার।

কিন্তু মানুষের সমস্যার ত অবসান হল না—তাত ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পেল। আজ মানুষ এক নতুন সঙ্কটের সম্মুখীন। যে মন ইতিহাসকে সৃষ্টি করেছে এবং নিত্যই করছে, যে মন মানুষের নিপুণতম অস্ত্র, শ্রেষ্ঠ সম্পদ, প্রিয়তম বস্তু, তাই আজ অশান্ত। আজ প্রশ্ন উঠেছে সৃষ্টি কি স্রষ্টার চেয়ে শক্তিশালী? সংস্কৃতির সাধনা কি ব্যর্থ? বিশ্বকর্মার অহঙ্কার কি চূর্ণ হয়ে যাবে?—না। একথা সত্য যে নিয়ম ও অনিয়মে উৎপিষ্ট মানুষ আজ খানিকটা যন্ত্রের মত পরিচালিত হয়। দেখা যায় যে, যে মানুষ উপাসনা মন্দিরে নিন্দা করে মানুষের বর্বরতার, নৃশংসতার, স্বার্থান্ধতার, সেই মানুষই তৈরী করে বোমা, বারুদ, বীজাণু বা বিষবাষ্প। উপাসনা মন্দিরে যে মানুষ মহৎ, উদার, ভাবপ্রবণ, আদর্শবাদী—কর্মক্ষেত্রে সে অন্ধ, নির্মম, অচেতন। কিন্তু তবুও না।

'Mau is the measure of all things,' 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।' মানুষের অন্তরের কোন্ অন্তস্থলে ধ্বনিত হয়েছিল নীতি-চেতনার এই বাণী! যুগে যুগে কত বাধা, কত বন্ধন, কত নিগ্রহ সহ্য করে আজ সেই চেতনা এসে দাঁড়িয়েছে সগর্বে, উন্নত শিরে বিশ্বমানবের আলোকোজ্জ্বল হৃদয়-প্রাঙ্গনে। আজও চলছে মানুষের মুক্তি সাধনা—আরও দ্রুত গতিতে, আরও সূক্ষ্মভাবে। বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি সকলেরই মন ঘুরে বেড়াচ্ছে নতুন তথ্য, নতুন সত্য, নতুন উপলব্ধির সন্ধানে। আজ জেগে উঠেছে সমাজ বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী। নিত্যই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন সমাজ চেতনা, নতুন সমাজতত্ত্ব। আজ মানুষের মনকে আবিষ্ট করেছে মুক্তির চিন্তা, বন্ধনের নয়। পুরাণো বন্ধনের অবসান হ'ক; মুক্তির মাঝেই মানুষ লাভ করুক নতুন নতুন বন্ধন। আজ তাই দেখি শিশু চাইছে স্বাধীন শিক্ষার অধিকার, মানুষ চাইছে স্বাধীন চিন্তার, স্বাধীন প্রকাশের, স্বাধীন ভালবাসার, স্বাধীন জীবনযাত্রার অধিকার। মানুষের ধর্ম জীবনকে উপভোগ করা।

করুক জীবনের উত্তাপ মানুষকে আনন্দিত। আজ যারা ভবিষ্যতের ভয়ে সঙ্কুচিত, যারা জীবনকে পরিহার করতে চায়, যারা অন্তর্মুখ, অতীন্দ্রিয় বিলাসী তারা ভ্রান্ত। সঙ্কটের মাঝেই আছে নতুন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত, মানুষের অহঙ্কারের চরিতার্থতার সম্ভাবনা, মনের উৎকর্ষের পরিচয়। ইতিহাসের সূত্র আজ মানুষের হাতে।

'আমার মাঝারে করিছ রচনা
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ব বেদনা
　　　　মোর বেদনায় বাজে ?'

—চিত্রা

সাময়িকী

[বিগত ১৬ই কার্তিক, ১৩৬৪ (২রা নভেম্বর ১৯৫৮) শ্রীমৎ স্বামীজীর জন্মতিথি দিনে নরনারায়ণ আশ্রমের যে বার্ষিক বিবরণ আশ্রম-সম্পাদিকা কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল তাহা এইখানে মুদ্রিত হইল। সঃ উঃ ভাঃ]

নরনারায়ণ আশ্রমের এক বছর কালের সামান্য একটু বিবরণ আপনাদের কাছে আশ্রমের পক্ষ থেকে আমাদের দেবার আছে। এ বৎসরের প্রথম কথা শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ গত বৎসর এই সময়টায় ছিলেন, এ বছর তিনি নেই—তাঁর স্থূল দেহ থেকে নিজেকে তিনি সরিয়ে নিয়েছেন সাত মাস হয়ে গেল। পরের কথা হচ্ছে তবু কাজ বন্ধ হয়ে যায় নি। শ্রীমৎ স্বামিজী মাত্র দুই বৎসর এই গ্রামে ছিলেন, আমাদের এই সব কাজকর্মও বৎসরখানেক হয় আরম্ভ হয়েছিল, তিনি আজ দেহে না থাকলেও তাঁর শক্তি, তাঁর ইচ্ছা তিনি ক্রমে ক্রমে ফুটিয়ে তুলবেন। গত এক বৎসর ধরে সমাজ সেবার দিকে তিনটী প্রতিষ্ঠান আমরা চালিয়ে নিয়েছি—নরনারায়ণ গ্রন্থাগার ও ফ্রী রীডিং রুম, বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র এবং মহিলা শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র। গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পূর্বে থাকলেও আনুষ্ঠানিকভাবে গত ১২ই মে ১৯৫৭-তে এটা সর্বসাধারণের জন্য আরম্ভ হয়, আর বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র ও মহিলা শিল্প-শিক্ষাকেন্দ্র গত অক্টোবর. ১৯৫৭-তে খোলা হয়েছে। এক বৎসর ধরে নিয়মিতই এ তিনটী চলেছে। খুব দ্রুত আমরা অগ্রসর হতে পারছি না—তবে নানা বিপর্যয়ের মধ্যে নিজেদের সমস্ত শক্তি দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এখানে ছেলে মেয়ে যারা আসে, তাদের সঙ্গে প্রাণের মধ্য দিয়ে আমরা মিলতে চাই, আপন করে পেতে চাই। সেই পথে আমরা পরস্পর লাভবান হয়ে সমৃদ্ধতর চিত্তের অধিকারী হব নিশ্চয়।

আমাদের গ্রন্থাগারে বই আছে	৮৮৯
Leading section-এ সভ্য সংখ্যা	৩৮
ফ্রী রীডিং রুমে এ পর্যন্ত বই issued হয়েছে	৪১২

বয়স্কা মহিলা শিক্ষা কেন্দ্রে ৫৫ জন নিরক্ষর মেয়ে শিখে গেছে। ভর্তি হয়েছিল অবশ্য অনেক বেশী, কিন্তু সবাইকে ধরে রাখতে পারি নি। এটা

সত্যি কথা যে, সুদীর্ঘকাল যারা শিক্ষা পায় নি তাদের মধ্যে শিখবার মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হলে যেমন করে ঘরে ঘরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিলতে হবে, মিশতে হবে, বার বার শতবার চেষ্টা করতে হবে, তেমন করে আমরা আমাদের বর্তমান সামর্থ্য নিয়ে পুরোপুরি করে উঠতে পারছি না। চারদিকের ক্যাম্পগুলিতেই আমরা কিছুটা যাতায়াত করতে পেরেছি আর জগৎপুর গ্রাম থেকেও আমরা কিছু সারা পাব বলে ভরসা করছি। এদিক দিয়ে কর্মীসংখ্যা বাড়িয়ে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে সন্দেহ নেই।

শিল্পশিক্ষাকেন্দ্রে ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রী রয়েছেন, সপ্তাহে তিনদিন শেখান হয়,—ছাটকাট সেলাই, উল, এমব্রয়ডারী। এ পর্যন্ত এই এক বছরে ৩০৭ দিন স্কুল হয়েছে। ৯৫ জন মেয়ে ভর্তি হয়েছে। মেয়েদের তৈরী জামা ইত্যাদি কিছু বিক্রী হয়েছে, কিছু বিক্রীর জন্য আছে।

এই কটী কাজ ছাড়া শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ তাঁর জীবনের শেষ তিন চারটী মাসের ঐকান্তিক আগ্রহের অনুপ্রেরণায় যে কাজটী সংঘটিত করে গেছেন, সেটী আপনাদের সামনে নিবেদন করতে পেয়ে খুসী হচ্ছি। আশ্রমে আসবার পথটী আপনারা দেখেছেন—এর খানিকটা এখনও কাঁচা অবস্থায় পড়ে আছে। এ রাস্তাটী সরকার থেকে পাকা করবার বন্দোবস্ত করা হলেও ঘটনাচক্রে সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শ্রীমৎ স্বামিজীর অনুপ্রেরণায় স্থানীয় লোকদের সহযোগিতায় সে বাধা অপসারিত হয়েছে, বর্ষার আগে নূতন মাটী ফেলা হয়েছিল, এ বৎসর এটা পাকা হয়ে যাবে স্থির হয়েছে। যে বাধা উপস্থিত হয়েছিল তা অপসারিত হওয়ার পথে স্বামিজীর প্রচেষ্টার কথা এ গ্রামবাসী প্রতিটী লোক জানেন। এই গ্রামে স্বামিজীর বেশীদিন থাকবার সৌভাগ্য হয় নি। গ্রামের সেবা করবার জন্য তাঁর আকুল আগ্রহ ছিল—নানা কারণে তা তিনি পেরে উঠছিলেন না—তবে যাওয়ার আগে তিনি যে এ গ্রামের জনসাধারণের এতটুকু সেবাও করতে পেরেছেন—এতে তাঁর প্রাণ তৃপ্ত হয়েছিল—কেননা মানুষের সেবা করতে না পেলে তাঁর আনন্দ ছিল না।

এদিকে স্বামিজীর উজ্জ্বলভারত মাসিক পত্রিকা এক বছর ধরে ঠিকমতই চলেছে—তাঁর দেহরক্ষার পরও প্রতি মাসে নিয়মিতই সেটা বের হচ্ছে। তাঁর বইগুলির মধ্যে কঠোপনিষদখানা ছাপা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর দিন কয়েকের মধ্যেই সেটা প্রকাশিত হবে। ব্রহ্মসূত্র উজ্জ্বলভারতে ছাপা

হচ্ছে। এখনও প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য তৈত্তিরীয় বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্য শ্বেতাশ্বেতর ছাপা হতে বাকি আছে। গীতা উজ্জ্বলভারতে বেরিয়েছিল—তারই ১০।১২ কপি রিপ্রিণ্ট আমরা রেখেছিলাম—সেগুলিও ফুরিয়েছে। তাই গীতাখানা আবার ছাপান দরকার। স্বামিজীর এই বইগুলি যাতে শীঘ্র প্রকাশ করতে পারি এজন্য আপনাদের সাহায্য আমরা প্রার্থনা করি।

শ্রীমৎ স্বামিজীর চলে যাওয়ার পর তাঁর গীতা-আলোচনাতে আমরা তাঁর কণ্ঠ পাচ্ছি না বটে, কিন্তু তাঁর কথা, তাঁর লেখা আমরা পাঠ করে যাচ্ছি। তাঁর কথার মধ্যে তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করা ছাড়া তাঁর কথাকে রক্ষা করবার আর দ্বিতীয় পথ কি আছে? তাঁর বলার মত তাঁর লেখা সহজবোধ্য নয় ঠিকই, এবং আমরাও ব্যাখ্যা করে বোঝাতে পারছি না তা-ও ঠিক, তবু তাঁকে যদি ভালবাসি, তবে আজ না বুঝলেও শুনে যেতে যেতে, পড়ে যেতে যেতে, ভাবনা অনুভাবনা আলোচনা করে যেতে যেতে নিশ্চয়ই তা আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রতিফলিত হবে,—এ ছাড়া আর কি করবার আছে? আমরা সেই চেষ্টা করে যেতে কৃতসঙ্কল্প।

শ্রীমৎ স্বামিজীর সমাধিস্থানে মন্দির তোলবার শত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আমরা এখন পর্যন্ত তা পেরে উঠিনি। ভিৎ পর্যন্ত গেঁথে তুলবার অর্থ সংগ্রহ করা গিয়েছিল, কিন্তু তার বেশী এর মধ্যে সম্ভব হল না বলে আমরা বেড়া দিয়ে তা ঘিরে নিয়েছি। মন্দির নির্মাণ ব্যাপারেও আপনাদের সকলের সাহায্য প্রার্থনা করছি।

স্বামিজীর দেহরক্ষার পর নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে—সে সকল বিবৃত করবার এ স্থান নয়। তবু শ্রীনিত্যগোপালের কথা নিয়ে, তাঁর সেবা পূজা নিয়ে এবং শ্রীমৎ স্বামিজীর পুণ্য দেহ নিয়ে যে স্থান তাঁদের সেবা করতে চাইছে, ভিতর বাইরের কোন বাধাই তাদের গতি আটকাতে পারবে না—এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং সেই বিশ্বাসের সঙ্গে আপনাদের সকলের আশীর্বাদ আমরা ভিক্ষা করি। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আপনারা সহযোগিতা করুন, আপনারা শক্তি দিন শ্রীমৎ স্বামিজীর কাজে ও পথে আমরা এগিয়ে যাই। গত দেড় বৎসর হয় আমার হার্টের অসুখ খুব বেড়ে যাওয়ায়ও আমাদের কাজ ব্যাহত হয়েছে। তবু আমরা চলব, তাঁর আশীর্বাদ প্রতি মুহূর্তে আমাদের শক্তি দিচ্ছে—তাঁর কাজে তাঁর পথে আমরা চলব।

অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—

বিগত ১৮ই কার্তিক ১৩৬৫ (১৮৮০) শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজের ৭৬-তম জন্মতিথি অনুষ্ঠান নরনারায়ণ আশ্রম পবিত্র গাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্পন্ন করে। সকালে পূজা-অঞ্জলি দেওয়া হয়। নরনারায়ণ আশ্রমের লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকাও উত্তোলিত হয়। সকাল এবং দ্বিপ্রহরের ভোগের পর প্রায় পাঁচশত লোককে প্রসাদ দেওয়া হয়। স্থানীয় ছাত্রসঙ্ঘের ছেলেরা সমস্ত অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সহযোগিতা করে। অতঃপর বিকাল ৪টায় জেলা-অধিকর্তা শ্রীকালীপদ সেন মহাশয়ের পৌরোহিত্যে এক জনসভা হয়। জনসভায় বহু লোকসমাগম হইয়াছিল। কলিকাতা হইতেও স্বামিজীর গুণমুগ্ধ ভক্ত ও বন্ধুগণ অনেকে আসিয়াছিলেন। যাঁহারা আসিতে পারেন নাই তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পত্রদ্বারা স্বামিজীর প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ, এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ানার সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ, আনন্দবাজারের শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মোদক আই সি এস, কণ্টিনেণ্টাল কমার্শিয়াল কোম্পানীর শ্রীতারকদাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজিতেন্দ্রনাথ কুশারী, অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়, শ্রীদুর্গামোহন সেন প্রভৃতি রহিয়াছেন।

শ্রীপার্বতীনাথ বিশ্বাসের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর আশ্রম-সম্পাদিকা শ্রীমৎ স্বামিজীর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে স্বল্পের মধ্যে একটী ভাষণ পাঠ করেন (উহা স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল), এবং তাহার পর নরনারায়ণ আশ্রমের এক বৎসরের চলার পথের ইতিবৃত্ত নিবেদন করিয়া সকলের আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। অতঃপর এ্যাডভোকেট শ্রীনিশীথনাথ কুণ্ডু, এ্যাডভোকেট শ্রীমন্মথ নাথ দাস, কলিকাতা মহানির্বাণ মঠের শ্রীতারিণীচরণ নন্দী, বাগুইআটী নিবাসী শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় স্বামিজীর জীবন ও আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রীশান্তশীল দাশ একটী কবিতায় স্বামিজীর প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শ্রীনিশীথ কুণ্ডু মহাশয় বলেন যে, স্বামিজীর জীবন প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একই ধারায় বহিয়া আসিয়াছে। জীবনের প্রথমে শিক্ষকতা তাঁহার বৃত্তি ছিল—প্রথমে ইস্কুলের ছোট আবেষ্টনে পরে বৃহত্তর সমাজের পরিধির মধ্যে সারাজীবন তিনি শিক্ষকতাই করিয়াছেন। স্বামিজীর জীবনে কিছুই আকস্মিক নহে। তিনি যে গান্ধীজীর চাপে রাজনীতিতে

প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাও নহে, রাজনীতি ছাড়িয়া যখন সামগ্রিক জীবনের এক বিপ্লবঘন আদর্শের কথা বলিলেন তখনও সেটা আকস্মিক নহে। রাজনীতির জীবনে স্বামিজীর কথা মানুষের মর্মে প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু দেখা গিয়াছে যাহা এত ভাল লাগিল তাহাকেও পুনরায় প্রকাশ করা সহজসাধ্য ছিল না। তিনি একটা কথা বলিতেন সাধারণ মানুষকে বুঝিতে হইলে in terms of সাধারণ মানুষ বুঝিতে হইবে—এই তত্ত্বানুযায়ীই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে বুঝিতে চাহিয়া শ্রীগৌর হইলেন। স্বামিজী প্রধান এগারখানা উপনিষদের এবং ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার ভাষ্য আর দশটী ভাষ্য হইতে পৃথক—সেখানে দেশের কথা পাইবেন, সমাজের কথা পাইবেন, রাষ্ট্রের কথা পাইবেন আবার বৈকুণ্ঠের কথাও।

শ্রীকালীপদ সেন মহাশয় দেশ সমাজ ও সভ্যতার প্রতি স্বামিজীর অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া দেশের বর্তমান অবস্থা কিছু আলোচনা করেন। সভাশেষে সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ইহার পর রাত প্রায় দশটা পর্যন্ত রামায়ণ গান হয়।

[স্থানাভাবে নিম্নলিখিত বিবরণ পূর্বে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। দেরীতে হইলেও ইহা এই মাসে মুদ্রিত করা হইল।]

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী ঃ বিগত ১৯শে ভাদ্র ১৩৬৫ (৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮) নরনারায়ণ আশ্রমে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী উৎসব পালিত হয়। এই উপলক্ষে বিকাল ৪ ঘটিকায় এক জনসভা হইয়াছিল। তাহাতে কলিকাতা হইতেও আশ্রমের গুণগ্রাহী কয়েকজন আসিয়াছিলেন এবং স্থানীয় জনসাধারণ অনেকেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সমবেত সঙ্গীতের পর শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ মহারাজ গত দুই বৎসর জন্মাষ্টমীর সময়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার যেটুকু আশ্রম-সম্পাদিকা টুকিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করা হয়। ইহার পরে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত লিখিত 'মদন-মোহন' প্রবন্ধটি পাঠ করা হয়। ইহার পরে শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীকানাইলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীভূপতি মোহন সেন কিছু বলেন। সমবেত সঙ্গীত দ্বারা সভা ভঙ্গ হইলে কিছু প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরাধাষ্টমী ঃ বিগত ৩রা আশ্বিন শনিবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর জন্মতিথি ছিল। নরনারায়ণ আশ্রম এই উপলক্ষে ৪ঠা আশ্বিন রবিবার এক জনসভার আয়োজন করে। অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিগ্রহমেই আশ্রমে

উপস্থিত হইয়াছিলেন, তবে অসুস্থতার জন্য তিনি সভা পর্যন্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার একটি প্রবন্ধ সভায় পাঠ করা হয়।

স্বামিজীর গত দুই বৎসরে এই তিথির ভাষণানুযায়ী উজ্জ্বলভাবত্তের শ্রীরাধা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। অতঃপর আশ্রমের চারিজন ছেলে শ্রীমৎ স্বামিজীর নিকট হইতে তাঁহার কথা যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল তাহা তাহাদের সাধ্যমত পাঠ করে ও কেহ বলেন। ইহার পর শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কিছু বলেন। সভান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শ্রীরাধা সম্বন্ধে শ্রীমৎ স্বামিজীর চিন্তাধারা এক নূতন খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। তাঁহার মতে শ্রীরাধা ঐতিহাসিক সত্য এবং সমস্ত নিপীড়িত মানবাত্মার মুক্তির তিনি ঘন বিগ্রহ। কৌলীন্যের কাছে দাসত্ব না করিয়া নিজের অন্তর-বাহিরের জ্যোতিঃ দ্বারা যে তাহার সহিত সমকক্ষতার আস্বাদন সম্ভব—অথচ তাহার মধ্যে কোন উচ্ছৃঙ্খলতা, কোন অসৌন্দর্য, কোন চরিত্রহীনতা থাকিবে না—শ্রীরাধা-জীবন এইটি প্রমাণ করিয়াছে। ব্রহ্ম-কৌলীন্য, পুরুষ-কৌলীন্য, ধন-কৌলীন্য, জাতি-কুল-শীলের কৌলীন্য, পাণ্ডিত্যের কৌলীন্য– কোন কৌলীন্য দ্বারাই আজ অকুলীনকে নিপীড়ন করা, অপমান করা যাইবে না—শ্রীরাধা এই সংবাদ পৌঁছিয়াছেন। অথচ তিনিই আত্মনিবেদনের চরম দৃষ্টান্ত। তত্ত্ব বিহীন শ্রীরাধা-লীলা জাতির স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়, বিগত কয়েক শত বৎসরের বাংলা দেশ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণও বলিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানেন—যো বেত্তি তত্ত্বতঃ—তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারিবেন। তত্ত্ব বাদ দিয়া লীলা আজ আর মানুষের পক্ষে উপযোগী হয় না। শ্রীরাধা-জীবনের আত্মনিবেদনের তত্ত্বও শ্রীরাধা-জীবনের সমগ্র তত্ত্বের সঙ্গে বিধৃত। জীবনটা উভয় পদার্থপ্রধান দ্বন্দ্বসমাস। যে-কোন দুইটি বস্তু ঘটনা বা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক এই রকম যে তাহারা উভয়েই প্রধান—একজন প্রভু আর একজন দাস নহে—অথচ উভয়েরমধ্যে একটি সম্পর্ক আছে এবং এই সম্পর্কের ভিতর দিয়া একটা কিছু সৃষ্ট হইয়া উঠে—ইহাই শ্রীরাধাজীবন। বর্তমান কাল শ্রীরাধাতত্ত্বকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

শ্রীরেণু মিত্র কর্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা
হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩া১, মোহনবাগান লেন,
কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মৎস্যজীবী সাধারণকে ও মৎস্যভোজী জনসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবিদের অভাব অভিযোগ দূরীকরণার্থে ও তাঁহাদিগকে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকার অধিকার অর্জ্জন করিতে সর্ব্বান্তঃকরণে সমবায়ী হইতে হইবে এবং মৎস্যভোজীদের প্রয়োজনীয় মৎস্য সস্তায় ও সুবিধায় সংগ্রহার্থে সমবায় প্রথায় চেষ্টা করা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে অবিলম্বে "মৎস্য-আড়ৎদার, মৎস্য-চালানী, মৎস্য পাইকার, মৎস্য ব্যবসায়ী ও মৎস্যজীবী সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতি লিমিটেড্" নামে একটী শক্তিশালী সমবায় প্রতিষ্ঠান ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২১ আইন মতে রেজেষ্ট্রীকৃত হওয়া প্রয়োজন। উদ্বাস্তু মৎস্যজীবিগণ সমবায়ী না হইলে তাহাদের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইবে।

নিবেদক

শ্রীরমণীমোহন বিশ্বাস,

সাধারণ-সম্পাদক, বঙ্গীয় মৎস্যজীবী সঙ্ঘ (রেজিষ্ট্রী নং ৬৫৪)

ও সংগঠন-সম্পাদক, ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিডিউল কাষ্টস্ কংগ্রেস

এবং সম্পাদক ব্যবসা বিভাগ

মল্ল ক্ষত্রিয় সমাজ উন্নয়ন সভা

(১৮৬০ সালের ২১ আইন মতে রেজিষ্ট্রীকৃত)

ও সেক্রেটারী

গাড়ুলিয়া ফিসারমেন কো-অপারেটিভ সোসাইটী লিমিটেড্

(১২।২৪ পরগণা অব্ ১৯৫২ রেজি তাং ইং ৩১।৩।৫২)

ঝল্ল-মল্ল-ক্ষত্রিয়-মৎস্যজীবী উপনিবেশ (গভর্ণমেণ্ট কলোনী)

পোঃ গাড়ুলিয়া, জিং ২৪ পরগণা

উজ্জ্বলভারত

অগ্রহায়ণ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ   ১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে

(১৯৪৯)

'... -র নিকট পত্র দেওয়া হইল। আমার কাছে বসিয়া গীতা পড়িতে না পারার দুঃখ যেন না হয়। যাহার যাহা ক্ষেত্র, সেখান হইতেই যাত্রারম্ভ করিতে হইবে। সেবকের কাছে থাকা বা দূরে থাকা দুই-ই সমান। যে কোনও কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হইলেই তাহা হয় সেবা। তিনি দূরে, তিনি নিকটে। নিকটে থাকিয়াও তাঁহার সেবা না হইতে পারে, দূরে থাকিয়াও করা যাইতে পারে। আমার বইগুলি যেন জীবন দিয়া পড়ে। বুকের রক্ত দিয়া লেখা যেন বুক দিয়াই ধারণ করে।'

—১৭ই জানুয়ারী

'... -এর মৃত্যু হওয়ার খবর পাইয়া দেখা করিতে যাই।... -এর সঙ্গে আলোচনা হয়। মৃত্যুরও যে একটী positive দিক আছে, ভগবান যে একটী মোহর না রাখিয়া কাহারও একটী পয়সাও কাড়িয়া নেন না, শূন্য আসন পূর্ণ করিয়াই যে পূর্ণ সর্ব্বদা সার্থক বস্তু—ইহাই সেখানে জোর দিয়া বলা হয়। পুত্র শত্রু, সব সম্পর্কই মায়া—এইভাবে শোককে চাপা দিয়া মানুষ হয় পাযাণ। শোকের সার্থকতা জীবনের শুচিতা আনয়ন করাতে। মানুষ অমর; তাহার পরিবারবর্গই তাহার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। মানুষের ব্যষ্টি জীবনের লোপ হয়, কিন্তু তাহার সমষ্টি জীবনের দিকটাকে জাগাইয়া রাখিয়াই তো মানুষ চলিতে পারে। মানুষ বাঁচিয়া থাকিবার জন্য কত কিছু রাখিয়া যায়, তাহা নিয়াই তো মানুষকে বাঁচাইয়া রাখা চলে। কিন্তু বিষয়ী মানুষ সব সম্বন্ধ ধুইয়া পাখালিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়, আবার সংসার

গুছাইতে চায়। কাহাকেও জীবনের বাহিরে একেবারে সরাইয়া দিতে নাই। উহা জীবনের উপর জুলুম। তাই তো হিন্দু বছরের পর বছর শ্রাদ্ধাদি করে।...আমি মরিব না। আমি নিত্যকাল থাকিব। আমার দেহ থাকিবে না সত্য, কিন্তু আমার সাজান কর্ম্ম থাকিবে, আমার বেদান্ত থাকিবে, আমার র্জন থাকিবে, আমার বিশ্ব থাকিবে। তবুও আমি মরিব? আমি কি ইহার মধ্যেই চির অমর নই? মানুষ কি শুধুই ব্যষ্টি?'

—২২শে জানুয়ারী

'গীতা ক্লাশে......'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি'—শ্লোক ব্যাখ্যা করি। নদী যেমন সাগরের সঙ্গে যোগস্থ হইয়া একবার জনপদের দিকে আবার সাগরের দিকে এই দ্বিবিধ গতিতে 'কর্ম্ম' করে, ঠিক তেমনি তুমি পুরুষোত্তম-আমির সঙ্গে যুক্ত যোগস্থ হইয়া কাজ কর। দ্বিবিধা গতির যে-কোনও একটীর সঙ্গে আটকাইয়া পড়িলেই আসিবে কর্ম্মবন্ধন। কর্ম্মের বহির্মুখী হওয়াও বন্ধন, অন্তর্মুখী হওয়াও বন্ধন। জনপদের কথা সাগরের কানে কানে এবং সাগরের কথা জনপদের কানে কানে বলাই নদীর 'কর্ম্ম'। 'শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে।' 'যোগস্থ' বলিতে পুরুষোত্তমে সম-যোগ, কর্ম্মে সম-যোগ অর্থাৎ সম কর্ম্মিত্ব, ত্যাগও সম ত্যাগ। ভক্ত-ভগবান যুগল হইয়া ব্যক্তির কর্ম্ম ও বিশ্বের কর্ম্মের যুগল মিলন ঘটাইয়া, দুই জনেই সমান ভাবে ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। ফলও এইভাবে সমান ভাগে ভোগ বা ত্যাগ হইবে।

—২৩শে জানুয়ারী

—কে 'পুরুষোত্তমোঽহমস্মি'—গীতার এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দেওয়া হয়। নদীর আমি যদি সাগরের আমিকে 'অহম্ অস্মি' না বলিয়া নিজের 'অহম্ অস্মি' লইয়াই মজগুল থাকে, তবে তাহার যেমন পরিণতি, ঠিক তেমনি জীবও তাহার 'অহম্ অস্মি' লইয়া বিপদে পড়িতেছে। সকল 'আমি'র মধ্যে যিনি 'আমি', তিনিই 'পুরুষোত্তমোঽহম্', তাঁহার আমিতেই আমার অস্তিত্ব।'

—২৪শে জানুয়ারী

"...তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়। 'বিশ্বের পশ্চাতে যে একটী প্রাণশক্তি কার্য্য করিতেছে, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে মানুষের সব দুরাচারত্বকে, সব মরণকে অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যাহার ফলে পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভে অশ্বত্থমার আগ্নেয় অস্ত্রে বিপ্লুষ্ট-দেহ হইয়াও বাঁচিয়াছিলেন'—তাহারই আলোচনা চলে। 'দ্রোণাস্ত্রবিপ্লুষ্টং ইদং মমাঙ্গং সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাং। জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রে মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ'॥—এই ভাগবতী দৃষ্টি মানুষের পাপ অপেক্ষা মানুষের দিকেই তাকাইয়া আছে।

—২৫শে জানুয়ারী

আজ সারাদিনই মনে হইতেছিল—প্রাণের প্রয়োজন প্রাণ দিয়া না মিটাইয়া বুদ্ধির সাহায্যে তাহা পূরণ করার নামই ধূর্ত্তামি; 'পক্ষান্তরে বুদ্ধির প্রয়োজন বুদ্ধিদ্বারা না মিটাইয়া প্রাণকে অস্বাভাবিকরূপে বাড়াইয়া তাহাদ্বারা পূরণ করাই মোহিনী মায়া। প্রাণ তখন হয় বিকৃত। পুরুষ সাধারণতঃ তাই ধূর্ত্ত, নারী মোহিনী। কিন্তু সহজ জীবন সেখানেই, যেখানে বুদ্ধি প্রাণের প্রয়োজনের বেলায় সরলভাবে প্রাণেরই শরণ লয়, প্রাণও বুদ্ধির প্রয়োজন মিটাইতে বুদ্ধিরই আশ্রয় নেয়। ক্ষেত্র উভয়েরই পৃথক, কৌশলও পৃথক। ইংলণ্ড তাহার নিজের প্রয়োজনেই ভারতবর্ষকে দখলে রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে, কিন্তু প্রাণ খুলিয়া তাহা বলিতে পারে নাই। সে বলিয়াছে যে, ভারতবর্ষের পরম কল্যাণের জন্যই সে ভারতবর্ষে আছে। ইহাই বুদ্ধির ধূর্ত্তামি। বুদ্ধি যদি প্রাণসাধনা বরণ করিয়া আত্ম-প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে চাহিত, তবে তাহাকে সেবাব্রতে দীক্ষিত হইতে হইত। কিন্তু বুদ্ধির সে নিজস্ব শক্তি কোথায়? তাই সে প্রতারণার আশ্রয় নেয়। আমি জীবনে একান্ত প্রজ্ঞাবাদী বা প্রাণবাদী কাহারও দলে মিশিতে পারিলাম না, তাহারাও আমাকে আপন মনে করিতে পারিল না। আমি ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিয়া একরূপ 'একা-ই' তো চলিতেছি, যাহারা ২।৫ জন আছেন তাহারা আমার সঙ্গে চলিতে প্রাণপণ করিতেছেন। কবে মানুষ প্রস্তুত হইবে, সেই ভরসায়ই বাঁচিয়া আছি। প্রাণ-প্রজ্ঞা সমন্বয়ের উপর বিশ্ব ও বিশ্বের মানুষ গড়িয়া উঠিলেই তো বিশ্বশান্তির ভিত্তি পত্তন হইবে, তখনই স্ফুরিত হইবে বিশ্বে সহজ সরল অনাবিল সম্বন্ধ। শ্রীনিত্য-গোপাল ইহঁারই ঘন বিগ্রহ।'

—২৯শে জানুয়ারী

'টালিগঞ্জ বস্তিতে ৬টার সময় মহাত্মাজীবিজয় উপলক্ষে সভার অনুষ্ঠান। ......মহাত্মাজীর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বলি। তিনি বরিশালে আমার বাসায় দুইবার পদার্পণ করেন, একবার আমার জেলে থাকা কালীন ১৯২০-তে, আর একবার পরে, তখন আমি বরিশালেই ছিলাম। মহাত্মাজী বরিশালের বিরোধের কথা জিজ্ঞাসা করেন। আমি বলিলাম—উহারা বলেন End justifies the means, আমি বলি Means justifies the end. সব কিছুর মধ্যেই এই পার্থক্যই চলিতেছে। আমি বলিয়াছিলাম, 'I will fight with Gandhiji in order to maintain his Gandhism'. গান্ধীজী শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন। 'যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ'—আমরা মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা করিতে করিতে মহাত্মাজীই হইব, তবেই সার্থকতা। তাঁহার কর্ম্মপদ্ধতিকে চালু করিতে হইলে ভারতের সনাতন কাঠামোকে বদলাইতে হইবে, নচেৎ বুদ্ধ যেমন দাঁড়াইতে পারেন নাই, মহাত্মাজীর আন্দোলনও ব্যর্থ হইবে। অস্পৃশ্যতা বর্জন আজও সমাজ সকল প্রাণ দিয়া মানিয়া লয় নাই, যদিও আড়াই হাজার বছর পূর্ব্বে ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। মহাত্মাজীর কর্ম্মপদ্ধতিকে সার্থক করিতে হইলে সহরের সভ্যতাকে ঠেলিয়া নিতে হইবে গ্রামে। সহর-উন্নয়ন ও গ্রাম-উন্নয়ন আপাতঃ পরস্পর বিরোধী। তাই মহাত্মাজী ছিলেন 'Naked Fakir'। তিনি একাধারে জন ও জননেতা। অতীত ও ভবিষ্যৎ ভারতের কর্ম্মগত যোগসূত্র স্থাপন করিতেই তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। আমরা তাঁহার সেবার ভিতর তিনিময় হইয়া যাইব।'

—৩০শে জানুয়ারী

"...তিনি কয়েকদিন পূর্বে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের 'প্রেমের সহজ দৃষ্টি' বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ যখন সিলাইদহ ছিলেন, সেখানে গগন নামে এক পিওন ছিল। সে সর্ব্বদা গান গাহিত, 'আমি বিলাই সবার চিঠি, আমার চিঠি আসবে কবে?' এই মানুষটীর সদা প্রফুল্ল মুখ ও হৃদয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। 'কোন্ সাধনে তাহার এই ফল লাভ হইল' জানিতে চাহিলে সে বলিত, উহা এমনিই হয়। পীড়াপীড়িতে একদিন বলিল, 'আমার নয় বছরের এক মেয়ে এই সাধনায় সিদ্ধি আনিয়া দিয়াছে'। সে মেয়ে কোথায়? বলিল, 'সে সব জায়গায়

ছড়াইয়া রহিয়াছে।' রবীন্দ্রনাথ নাকি এই পিওনের জীবন দর্শনেই 'ডাকঘর' লিখিবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সহজ জীবন লাভ করিতে হইলে এই জগতের একটী মানুষকে ভালবাসিয়াই তাহার ভিতর দিয়াই লাভ করা সম্ভবপর, গগনের জীবনে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে। কর্ত্তাভজাদের একটি প্রচলিত বাক্য আছে 'এই মানুষই সেই মানুষ'। শ্রীনিত্যগোপালও 'বর্ত্তমান ভজনে'র খবর পৌঁছাইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের 'যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রও ইহাই প্রচার করিয়াছে।

৩১শে জানুয়ারী

'দুপুরে -এর সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়।...আমার জীবনের উদ্দেশ্য এবং দর্শনের ভবিষ্যৎ উপযোগিতা সম্বন্ধে কথাবার্তা হয়। কংগ্রেসকে মহাত্মাজীর পরে আগাইয়া যাইতে হইলে যে পুরুষোত্তম দর্শনের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হইবে না, তাহাও বলা হয়। কংগ্রেস আটকাইয়া যাইতেছে, তাহার পথের বাধা দূর করা যাইতে পারে শুধু এই দর্শনের দ্বারাই। পুরুষোত্তম-দর্শনের বুকেই মহাত্মাজীর প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে। মহাত্মাজীর কার্যক্রমের চতুর্দ্দিকে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি সংহত হইতেছে। সেইগুলিকে হজম করিতে হইলে মহাত্মাজীর কর্ম্ম-তালিকাকে আরও এক স্তর উর্দ্ধ হইতে চালাইবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে। গান্ধী-মতবাদের সহিত কমিউনিজম, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘ প্রভৃতির বিরোধ আছে। উহাদিগকে টিপিয়াও মারিয়া ফেলা সম্ভব হইবে না। সেইজন্যই তো প্রয়োজন ব্যাপকতর একটি দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ গান্ধীবাদ-কমিউনিজম্-এর সমন্বয়। এই পথে রওয়ানা হইবার দিন আসিয়াছে। মহাত্মাজী তিরোধান করিয়া এই পথের সামনেই জাতিকে দাঁড় করাইয়া গিয়াছেন। ইহাই হইবে মহাত্মাজীর বিজয় যাত্রা।...'

২রা ফেব্রুয়ারী

রাসবিহারী ঘোষ

॥ শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ॥

ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে, আইন-শাস্ত্রে, পাণ্ডিত্যে, তীক্ষ্ণ-মেধা ও তীব্র স্মৃতি শক্তিতে যে সকল বাঙ্গালী চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন—স্যার রাসবিহারী ঘোষ তাঁহাদের অন্যতম। বদান্যতা ছিল তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, পাঠ-স্পৃহা ছিল জন্ম-গত প্রকৃতি; নির্ভীকতা ও তেজো দীপ্তি তাঁহার চরিত্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল।

ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে সুগভীর জ্ঞান, আইন শাস্ত্রের জটিল সমস্যার মীমাংসা, ব্যবহার শাস্ত্রের নীতি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় অপ্রতিম দক্ষতা তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বর্দ্ধমান জেলার খণ্ড ঘোষ নামের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে রাসবিহারী ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগদ্বন্ধু ঘোষ তখন বর্দ্ধমান রাজ-ষ্টেটে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। জগদ্বন্ধুর পিতামহ, শুনা যায়, জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিতেন। তাঁহার নাম ছিল স্বর্গীয় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ। কথিত আছে, রাসবিহারী যখন সূতিকাগৃহে, তখন তিনি প্রপৌত্রের প্রফুল্ল মুখ দর্শন করিয়া প্রীত হন এবং পদতল নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্যবদনে বলিলেন "এই সন্তান বড় হইয়া মহাপণ্ডিত ও যশস্বী হইবে"। প্রপিতামহের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

জগদ্বন্ধুবাবুর প্রথমা স্ত্রীর সন্তান রাসবিহারী, দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে বিপিনবিহারী ঘোষ হাইকোর্টের জজের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বাল্য-জীবন

রাসবিহারী বাল্যাবস্থায় অত্যন্ত দুরন্ত, মেধাবী ও ক্রোধ-পরায়ণ ছিলেন। তিনি জননী অপেক্ষা পিতামহীকে অধিক ভালবাসিতেন এবং পিতামহীর অতিরিক্ত স্নেহের ফলে আদুরে ছেলে হইয়া উঠিলেন। পড়াশুনা অপেক্ষা

খেলা-ধূলা, আম-বাগানে আম কুড়ান এবং দুরন্তপনা অধিকতর ভাল লাগিত। কিন্তু অভিমানী ও বদমেজাজী নাতিটির উৎপীড়নে পিতামহী কাতর হইতেন না বরং স্নেহ-সিক্ত হৃদয়ে সকল আবদার হাসিমুখে শুনিতেন।

গ্রাম্য পাঠশালায় রাসবিহারীর বিদ্যারম্ভ হয়। অস্থির চিত্ত বালক সকল সময়ে খেলায় উন্মত্ত, কিন্তু ক্লাসে প্রথম স্থান অধিকার তিনি, সর্ব্বদাই করিয়া থাকিতেন। সামান্য অল্পক্ষণ পড়িলেই মেধাবী ছাত্রের পাঠ আয়ত্ত হইয়া যাইত।

অল্পকাল পরে পিতামহী স্নেহের নিধি রাসবিহারীকে লইয়া তাঁহার পিত্রালয় তোড়কণায় চলিয়া আসেন। সেখানে পাঠশালা নাই, দুরন্ত বালকের খেলাধূলা রীতিমত এবং আরামের সহিত চলিতে লাগিল। পড়া-শুনার ক্ষতি হইতেছে দেখিয়া পিতা কয়েকমাস পরে তাঁহাকে বর্দ্ধমানে লইয়া গিয়া রাজার বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন, পিতা সাদাসিধা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ সন্তান। যথাযথ সংসার পরিচালনা করিয়া থাকেন। বালকের পাঠে মনোযোগ দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং নিয়ম করিয়া দিলেন প্রাতঃ-কালে দুই ঘণ্টা এবং রাত্রে নয় ঘটিকার তোপ পড়া পর্য্যন্ত পড়িতে হইবে।

বর্দ্ধমানের রাজস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই রাসবিহারী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। অত্যন্ত প্রখর মেধা ও স্মৃতিশক্তি দেখিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। পুরস্কার লাভ করিয়া যখন ফিরিতেছিলেন তখন সভাপতি বর্দ্ধমানধিপতি মহতাপচাঁদ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। চারি বৎসর তাঁহার বুদ্ধিমত্তা বিদ্যানুরাগ ও তীক্ষ্ণ-ধী দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইলেন। পরে পিতা জগদ্বন্ধুবাবু পুলিস ইন্সপেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া বাঁকুড়ায় চলিয়া যান। পুত্র রাস-বিহারী সেখানকার উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। এখানে আসিয়া তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির পরিচয় দেন। পাঠ্য পুস্তকের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহু ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার নিকট অন্যান্য ছাত্র পারিয়া উঠিত না। একটি অসামান্য শক্তি সকলে লক্ষ্য করিলেন, একবার যাহা পাঠ করেন, তাহার সকল অংশ তাঁহার মনের মধ্যে গাঁথা হইয়া থাকে। কত ছাত্র এই গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহার সাহচর্য্য কামনা করিত। তাঁহার ক্লাসের এমন কি নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণ তাঁহার সহিত আলাপ করিতে চাহিত এবং পড়া বুঝাইয়া লইত। বাহিরের বই পড়িবার

নেশা এত বাড়িয়া গেল যে ক্লাশের পড়া শেষ হইবামাত্র তিনি অতিরিক্ত পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। বলা বাহুল্য সকল বিষয়ে তিনি স্মৃতির প্রাখর্য্যে প্রথম স্থান অধিকার করিতেন, কেবলমাত্র অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁহার মন যাইত না এবং ব্যাকরণ ভাল লাগিত না। পণ্ডিত মহাশয় একবার তাঁহার ঘণ্টায় লুকাইয়া ইংরাজি পুস্তক পড়িতেছেন দেখিয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট নালিশ করেন। ফলে তাঁহার শাস্তির ব্যবস্থা হইল।

এই স্কুলে কিছুকাল পরে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, যাহাতে তাঁহার বিদ্যানুশীলনের পরিচয় পাইয়া সকলে বিস্মিত হন।

ইংরাজিভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার পারদর্শিতার জন্য বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রাসবিহারী তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়েন। বাঁকুড়া জেলা হাইস্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের লইয়া এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় হুগলী যাইতেছেন। রাসবিহারী ধরিয়া বসিলেন তিনিও যাইবেন। উদ্দেশ্য হুগলী দেখিয়া কলিকাতায় একবার ভ্রমণ করিয়া আসিবেন। শিক্ষক মহাশয় বলিলেন, আগামী বৎসর পরীক্ষা দিবার কালে হুগলী যাইতে হইবে, পরীক্ষান্তে কলিকাতা দেখিলেই চলিবে। অনর্থক বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই। মেধাবী ও জেদী ছাত্র বলিয়া উঠিলেন, এ বৎসরই পরীক্ষা দিলে আমি উত্তীর্ণ হইতে পারিব। আপনি প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে বলিয়া আমার পরীক্ষা দিবার অনুমতি পত্র আদায় করিয়া দিন। এই সংবাদে সন্তুষ্ট হইয়া প্রধান শিক্ষক মহাশয় দ্বিরুক্তি না করিয়া সম্মতি দিলেন। তিনি রাসবিহারীর পারদর্শিতা ও কৃতিত্ব সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। এতটুকু সন্দেহ তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কলিকাতা কেন্দ্রে তাঁহার পরীক্ষার ব্যবস্থা হইল। নির্ভীক ও আত্ম-প্রত্যয়শীল বালক কলিকাতায় আসিয়া কোনও প্রকার প্রশ্নের সদুত্তর দান করিয়া নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এইভাবে পরীক্ষা দিয়া সাধ মিটাইয়া কলিকাতা দেখিয়া বাঁকুড়ায় না ফিরিয়া তোড়কণায় চলিয়া গেলেন। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। সেই বৎসর বাঁকুড়ার কোন ছাত্র পাশ করিতে না পারায়, তিনি এগার টাকার বৃত্তি লাভ করিলেন।

এইভাবে অসামান্য বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয় দিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রাসবিহারী কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি

হইলেন। তৎকালীন অধ্যাপকগণের সংস্পর্শে আসিয়া এবং সর্বোপরি বিরাট গ্রন্থাগারের জ্ঞান-ভাণ্ডার ব্যবহার করিতে করিতে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। আজন্ম জ্ঞানলিপ্সা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিরাট পুস্তকাগার মিটাইতে পারিল না, উত্তরোত্তর লোল জিহ্বা বিস্তার করিল। তিনি আকণ্ঠ পান করিতে লাগিলেন সেই জ্ঞান সুধারস—তৃপ্তি আর মিটে না, শান্তি আর পান না।

দুই বৎসর পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে অক্লান্ত পরিশ্রমী ও অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী রাসবিহারী এফ এ পরীক্ষা দিলেন। অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য দেখাইয়া তিনি পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন।

বি, এ পরীক্ষা দিবার সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যাগত অবস্থায় কয়েকদিন কাটাইলেন। মাস কয়েক পূৰ্ব্ব হইতে তিনি ব্যাধি-রাক্ষসীর কবলে পড়েন। বহু চিকিৎসা সত্বেও আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। পরীক্ষার মাত্র সতের দিন অবশিষ্ট, তখন তিনি জ্বরমুক্ত হইলেন। দেহ দুৰ্ব্বল, কণ্ঠ ক্ষীণ, চলৎ-শক্তি পূর্ব্বের ন্যায় ফিরিয়া পান নাই,—কিন্তু মনে তাঁহার অদম্য বল, অজেয় আকাঙ্ক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হইলেন কম্পিত চরণে। পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।

তখনকার যুগে খ্রীষ্টান অধ্যাপকদের নিকট পাঠ করিবার ফলে ও পাদরী সাহেবদের প্রচার শক্তির প্রভাবে রাসবিহারী অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ন্যায় খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়েন। তখন তিনি হোষ্টেলে থাকিতেন। গীর্জায় গিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে যাইবেন সঙ্কল্প করিলেন। কলিকাতা হইতে তারযোগে সংবাদ পাইয়া পিতা জগদ্বন্ধুবাবু ইত্যবসরে কলিকাতায় আসিয়া পড়িলেন। তিনি বাধা প্রদান করায় পিতৃভক্ত রাসবিহারী এই সঙ্কল্প চিরদিনের মত পরিত্যাগ করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারী এম, এ, পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎকালে বি, এ, পাশের এক বৎসর পরে এম, এ, পরীক্ষা দিবার রীতি ছিল। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে ইংরাজীতে সৰ্ব্ব প্রথম এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন বলিয়া শুনা যায়।

পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ব প্রথামত বি, এল, পরীক্ষা দেন।

এবারও প্রথম স্থান অলঙ্কৃত করিয়া ১০০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং হাইকোর্টে ওকালতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

প্রথম প্রথম হাইকোর্টে তিনি সুবিধা করিতে পারেন নাই। মামলার জন্য তাঁহাকে কিছু কাল অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি এক প্রকার নিরাশ হইয়া পড়িলেন। হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্বনামধন্য, বিজ্ঞপ্রবর দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় রাসবিহারীর সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতি ও বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। তিনি কথাবার্ত্তায় তাঁহার ঔজ্জ্বল্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধি দেখিয়া বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আইন ব্যবসা ছাড়িতে নিষেধ করেন। তাঁহার উৎসাহ-বাণী ও সস্নেহ অনুরোধে রাসবিহারী পুনরায় ব্যবসা চালাইতে বদ্ধপরিকর হন। এইবার তাঁহার মূলধন হইল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং আইন সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ।

আইন পাশ করিবার চার বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে রাসবিহারীর জ্ঞান-তৃষ্ণা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি Honours-in-law পরীক্ষা দেন, এবং বলা বাহুল্য তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বুঝাইবার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন খ্যাতনামা কর্ত্তৃপক্ষ ও অধ্যাপকগণ প্রশংসা বর্ষণ করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে ঠাকুর-ল-লেকচারারের পদে নিযুক্ত করেন। এই লেকচার বা বক্তৃতা যাঁহারা প্রদান করেন, তাঁহারা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অর্থ-ভাণ্ডার হইতে সবিশেষ অর্থ পুরস্কার পাইয়া থাকেন। এই বক্তৃতা মালার বিষয় ছিল "ভারতবর্ষীয় বন্ধকী আইন"। বহু গবেষণাপ্রসূত, তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক জ্ঞান-গর্ভ-বক্তৃতাগুলি একটি জ্ঞান-ভাণ্ডার বিশেষ বলিতে পারা যায়। "ল অফ মর্টগেজেস ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া" (Law of Mortgages in British India) তাঁহার শেষ বক্তৃতা অপূর্ব্ব জ্ঞান ও বিদ্যার খনি। ইহা পুস্তকাকারে বাহির হইবার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশ-বিদেশে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়া আসিতেছে। এই বক্তৃতা-মালা প্রণয়নে তাঁহাকে গভীর গবেষণা ও প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার অসীম জ্ঞান ও প্রোজ্জ্বল বুদ্ধি বৃত্তি প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছিলেন। ইহা সম্পন্ন করিতে তাঁহার প্রায় এক বৎসর সময় লাগিয়াছিল।

এই পুস্তক খানি তাঁহার শিরে যশের কিরীট পরাইয়াছিল; এবং তাঁহার প্রতিভার সৌরভও চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার জগৎ-জোড়া নাম বিদ্বৎ-মণ্ডলীর মধ্যে বিঘোষিত হয়। কেবল এ দেশের নয়, বিদেশীয় বিজ্ঞ বিচারকগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

কর্ম্ম-জীবন

তাঁহার কর্ম্ম-জীবন রাসবিহারীর অত্যুজ্জল প্রতিভা ও অনুপম হৃদয়-বলের পরিচায়ক। দেশ-প্রেম ও স্বজাতি-স্নেহ তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ। ভারতীয় কৃষ্টি, হিন্দুশাস্ত্র ও সাধনার মূল-নীতি তাঁহাকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। দেশের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও দেশীয় আচার-ব্যবহার, ভারতীয় ভাবধারা, ধর্ম্ম, রীতি-নীতি পালন, সমাজসেবা, জ্ঞান-বিস্তার তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল। জ্ঞান ও বিদ্যাদেবীর সেবা অর্চ্চনা-আরাধনা তাঁহার চরিত্রকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। শুনা যায়, ঠাকুর আইন বক্তৃতামালা ও গবেষণা কার্য্যের পারিশ্রমিক রূপে যে কয়েক সহস্র অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন, তাহা নিজের জন্য ব্যয় করেন নাই; কয়েক বৎসর সরস্বতী পূজায় তাহা ব্যয়িত হয়। স্পষ্টভাবে একবার বলিয়াছিলেন, "বাক্‌দেবীর প্রসাদে যে অর্থ লাভ করিয়াছি, তাঁহার পূজায় তাহা সদ্ব্যবহার করিলাম,—ইহা অপেক্ষা আনন্দের কি আছে ?"

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবার দুই বৎসর পর (১৮৭৭ খৃঃ) রাসবিহারী বি-এল পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। আরও দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃঃ পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো-র পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার মনীষার স্ফুরণ ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করিয়া এবং সর্ব্বোপরি আইনের সূক্ষ্ম বিচার ও অত্যাশ্চর্য্য কূট-তর্ক প্রণোদিত বিচার প্রণালীর ঔজ্জ্বল্যে শিক্ষিত সমাজে সুনাম প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশবাসীকে বিস্মিত করিলেন। ভাগ্যদেবী তাঁহার মস্তকে যশের মুকুট পরাইয়া দিলেন যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টর-ইন-ল—ডি-এল উপাধিতে বিভূষিত করেন (১৮৮৪)। তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৮৭ খৃঃ-এ তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে নানাবিধ লোক-হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং

আইন প্রণয়নে উচ্চতম কৃতিত্ব দেখাইয়া তিনি বিদ্বন্মণ্ডলীকে ও দেশবাসীকে চমৎকৃত করেন। তখনও তাঁহার যশের ও প্রজ্ঞা-প্রাখর্য্যের গৌরব উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহন করে নাই। ১৮৯১ খৃঃ তাঁহার লোক-বিশ্রুত কীর্ত্তি কলাপে বিমুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন তাঁহাকে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, নিযুক্ত করেন। তাঁহার অলোকসামান্য মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতি, বিচার-বুদ্ধি ও আইনের মূল তত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব্ব শক্তি দেখিয়া পরবর্ত্তী লর্ড এলগিন রাসবিহারীকে পুনরায় তিন বৎসরের জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত করেন। অসামান্য বুদ্ধি-কৌশল, সার্ব্বজনীন মনোবৃত্তি ও অগাধ পাণ্ডিত্য দেখিয়া ভারত সরকার বঙ্গ-মাতার প্রিয় সন্তান ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষকে "সি-আই-ই" নামক গৌরবজনক উপাধি উপহার দেন।

রাসবিহারীর জ্ঞান পুস্তকপাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল। অতঃপর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের জন্য তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দেশ-ভ্রমণে তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা মিটিত। পুস্তকের পাতায় যাহার বর্ণনা আবদ্ধ তাহা নীরস। সেইজন্য তিনি প্রকৃতির মাঝে, বিভিন্ন সমাজের সংস্পর্শে সেগুলি প্রাণবন্ত ও সরস করিতে চাহিতেন, পরোক্ষ জ্ঞানে তিনি তৃপ্তি পাইতেন না। তাই প্রতি বৎসর কলিকাতার মহামান্য উচ্চ আদালতের অবসর আরম্ভ হইলেই তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। ১৮৯৪ খৃঃ-এ বিলাতে গিয়া তত্রস্থ সুদৃশ্য ও দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দর্শন করিয়া ফ্রান্সের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। সুবিখ্যাত স্থানগুলি তাঁহার মনে প্রেরণা আনিয়া দিল। দুই বৎসর পরে ১৮৯৬ খৃঃ তিনি ইতালীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভুবনবিদিত রমণীয় দৃশ্য ও হর্ম্ম্যাদি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ পুলকিত হন। অধিক ক্ষেত্রে পূজার ছুটি ছিল তাঁহার ভ্রমণের কাল, চিত্ত-বিনোদনের সময়। ১৯০৩ খৃঃ-এ তিনি পূজাবকাশে একবার সিমলায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তথায় পিতার নিদারুণ রোগের সংবাদ পাইয়াই পিতৃভক্ত সন্তান সিমলা হইতে তৎক্ষণাৎ বর্দ্ধমানে রওনা হন এবং তারযোগে জানান, অবশ্যম্ভাবী কোন বিপদ ঘটিলে তাঁহার জন্য যেন অপেক্ষা করা হয়, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া এবং সৎকার তিনিই করিবেন। বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন পিতা জগদ্বন্ধু বাবু পূর্ব্ব রাত্রি দেড়টার সময় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জন্য আত্মীয় স্বজন শবদেহ লইয়া শ্মশানে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান ষ্টেশন হইতে এই দুর্ঘটনার বার্ত্তা শুনিয়াই শোকাশ্রুপূর্ণ নয়নে

শ্মশানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পিতার চরণপ্রান্তে পড়িয়া বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে বর্দ্ধমানে শ্মশানের অবস্থা ভাল ছিল না এবং সেই দিন ঝড় বৃষ্টির প্রাবল্যে দাহকারীদের কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। বর্দ্ধমান-গৌরব রাসবিহারী ১৯১২ খৃঃ-এ বহু অর্থব্যয়ে পিতার নামে "জগদ্বন্ধু শবদাহ ঘাট" নামক একটি পাকা ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

ক্রমশঃ

'তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন।
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার পরম-আগমন।
লভিলাম চিরস্পর্শমণি ;
তোমার শূন্যতা তুমি পরিপূর্ণ করেছ আপনি।

জীবন আঁধার হল, সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ, অন্তরে রাখিয়া গেছ দান।
বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।'

—মহুয়া

আজকের জীবন-সমস্যা

॥ শ্রীবিভা সরকার ॥

আজকের দিনের মানুষের জীবন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়েছে—নানা সমস্যা সংকটে পথ তার কণ্টকাকীর্ণ একথা একান্ত সত্য এবং এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। মানুষ তার স্থান কাল ও যুগ-সমস্যাকে মেনে নিয়েই বাঁচতে পারে, এড়িয়ে গিয়ে নয়। আমরা কি ছিলাম এবং কি হয়েছি এ আলোচনা বং যা গত তা ভাল হ'ক মন্দ হ'ক, তা নিয়ে হা হুতাস—একান্তই সময়ের অপব্যয়। বর্ত্তমানই মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় কথা এবং সেই বর্ত্তমানকে কেমন করে সহজ সুন্দর ও কল্যাণময় করা যায়, সেই কথাটাই আমাদের প্রধান অর্থাৎ মুখ্য বিষয় হওয়া চাই—আমাদের জীবনে বর্ত্তমানের তুলনায় ভূত এবং ভবিষ্যৎ দুটিই গৌণ এ কথা মানতেই হবে।

মানুষ চিরদিনই তার ভালমন্দ, পাপপুণ্য, ধর্ম্ম অধর্ম্মের সংমিশ্রণ। গত যুগেও মহৎ ব্যক্তি, ন্যায়নিষ্ঠ বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ ছিলেন, এ যুগেও আছেন। গত যুগেরও অনেক গ্লানি, অনেক ক্লেদ ছিল; এ যুগেরও আছে—মানুষের জগতে শুধু ভাল শুধু মন্দ এ কিছুতেই হতে পারে না।

আমাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা সেকালের সুখ্যাতিতে মুখর এবং আজকের দিনের সব কিছুই মন্দ দেখেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের একান্ত মতবিরোধ। কোন কালই ভালমন্দ মুক্ত হতে পারে না—কারণ যে মানুষকে নিয়ে কাল, সেই মানুষই চিরদিন ভালয় মন্দয় মেলামেশা।

একদল আছেন যাঁদের দৃষ্টিতে সেকালের নারী মহীয়সী ছিলেন এবং আজকের মেয়েরা পথভ্রান্ত, আদর্শভ্রষ্ট। তাঁদের সঙ্গেও আমাদের নিদারুণ মতবিরোধ। সেকালেও স্নেহময়ী মা ছিলেন, সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন, কল্যাণময়ী কন্যা ছিলেন—একালেও আছেন। সেকালেও ধ্বংসরূপিণী চামুণ্ডা ছিলেন—একালেও আছেন। সেকালেও লোকচক্ষুর অন্তরালে সমাজের স্তরে স্তরে বহু অন্যায় বহু পাপ ফল্গুধারার মত প্রবাহিত ছিল—একালেও আছে। হয়ত যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপ বদলেছে, কিছুটা জটিলতা বেড়েছে—কিন্তু পাপ আদিকালেও ছিল, আজও আছে, চিরদিনই কিছুটা থাকবে।

এ নিয়ে দোষ যদি কাউকে দিতে হয়—তা হলে সেই বিধাতাকেই দিতে হয় যিনি মানুষের মনে পাপপুণ্যের এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন—যিনি তাঁর এই সুন্দর জগতে এনেছেন অসুন্দর শয়তানকেও।

আমাদের দৃষ্টিতে আমরা দেখি সেকালে পুরুষের জীবনে অনাচার উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের কাছে প্রশ্রয় পেয়েছে, কেননা প্রায়ই তাঁরা ছিলেন সমাজের মাথা বা প্রণেতা—মেয়েদের বেলায় কিন্তু সেই সমাজই ছিল খড়্গহস্ত—নারীর কোনও দুর্ব্বলতাই সেই পুরুষ-কৌলীন্য শাসিত সমাজে সহ্য করা হত না। পথভ্রষ্ট মেয়ে চিরদিনের মতই পঙ্কে নিক্ষিপ্ত হয়েছে—যতই অনুতপ্ত সে হক না কেন তার কৃত কর্ম্মের জন্য। কিন্তু পুরুষ মার্জ্জনা পেয়েছে সহজেই একই অপরাধের সমভাগী হয়ে। এমন কি ছলে বলে ঘরের বার করা হয়েছে যে মেয়েকে, তার বেলাতেও শাস্তির বোঝা সেই মেয়েকেই বহন করতে হয়েছে আমরণ, কিন্তু দুষ্কৃতকারী সহজেই ছাড়া পেয়েছে অর্থ-কৌলীন্যে বা গাঁয়ের অথবা সহরের সমাজে তাদের মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তির বলে। আজকের দিনে এ চলতে পারে না তাই এর বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলেছে এবং এ আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। পাপকে বর্জ্জন করে অনুতপ্ত বিভ্রান্ত পাপীকে রক্ষা করাই মানবতার ধর্ম্ম। দুষ্ট ব্রণ যদি হয় তার সুচিকিৎসা করাতে হবে—অঙ্গটিকেই বাদ দিলে চলবে কেন! দোষীর কাঠগড়ায় যে দাঁড়াবে, তাকে কি ঘরে কি বাইরে নারী-পুরুষ নির্ব্বিচারে ন্যায়ের দণ্ড মেনে নিতেই হবে—সেখানে পক্ষপাত চলবে না, চলা উচিতও নয়। অনেকে হয়ত বলবেন নারী যে গৃহলক্ষ্মী—গৃহ-কল্যাণ যে তাঁরই ওপর নির্ভর করে। এ কথা একান্ত সত্য এবং সেদিক দিয়ে তাঁর দায় যে অধিক এও মানি—কিন্তু রাম বিনা শুধু সীতা কল্পনা করতে পারি না, ভাবতে পারি না লক্ষ্মণ বিনা উর্ম্মিলাকে। তাই শুধু সীতা চাইলেই হবে না, ফিরিয়ে আনতে হবে রামকে।

আজকের সমাজ জীবন আগের চেয়ে জটিলতর হয়ে উঠেছে সে কথা আগেই বলেছি। সেখানে নারী-পুরুষের রাজত্ব একান্তই স্বতন্ত্র ছিল—কিন্তু আজকের দিনে সে স্বতন্ত্রতা আর নেই। পথে ঘাটে ঘরে বাইরে—কর্ম্ম-জীবনে, ধর্ম্ম-জীবনে সর্ব্বত্রই অবাধ মেলামেশা চলছে—এ স্বাধীনতা কেউ বন্ধ করতে পারবে না—এবং এরও প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। বন্ধ ঘরের মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা হয়ে জীবন কাটিয়ে দিলে যে মেয়ে, সত্যের

কষ্টি পাথরে পরীক্ষা হল কই তার? মুক্তির মধ্যে প্রতিদিনের ভালমন্দর ঘাতপ্রতিঘাতে নিজেকে রক্ষা করে চলার যে শিক্ষা, সেই ত প্রকৃত শিক্ষা। জীবনে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে—ভালমন্দের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেই নিজের জীবন পথ গড়ে নিতে হবে—ঝড়ঝঞ্ঝা যে জীবনে এলো না, তার পরীক্ষা হবে কোন্ মাপ কাঠিতে? ভালমন্দ পাপপুণ্য সব দেখতে হবে—জীবনের সমস্ত গরল নাশ করে যে অমৃতের আস্বাদন আনতে পারবে, সেই ত স্থিতধী, সেই ত অমৃতের সন্তান। শিব সুন্দরের সাধনা তার জন্যই সফল হয়ে উঠবে।

আজকের মেয়ে ঘর ছেড়েছে কিছুটা কালের তাগিদে জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনে, কিছুটার মানব সভ্যতার অগ্রগতির গুণে। এর ফলে কিছুটা সমস্যা মানুষের জীবনে বেড়েছে। এখন এ সমস্যা এবং প্রতিকূলতাকে মেনে নিয়েই কি ভাবে আমরা কল্যাণময় স্নেহনীড় রচনা করতে পারি, কি করে জীবনে আদর্শ ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা করতে পারি—সেই বিষয়েই চিন্তা করতে হবে। আজকের জীবনে এইটাই সবার বড় সমস্যা এবং সবার বড় প্রয়োজন।

একটা কথা আমাদের বার বারই মনে হয়—আমরা আজকের দিনে পরস্পরের প্রতি কল্যাণবোধ হারাতে বসেছি এবং কিছুটা স্বার্থপরতা দোষে দুষ্ট হয়ে পড়েছি। আমরা আজ বহু বিষয়ে স্বাধীনতালাভ করেছি—কিন্তু স্বাধীনতা রক্ষারও একটা দায় আছে—তা থেকে আমরা যেন ভ্রষ্ট না হই। মানুষের মন আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ, মোহ ভালবাসা চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্বদোলায় চির দোলায়মান। কিন্তু আমাদের কল্যাণবোধ, ন্যায়ধর্ম্ম যদি মোহের আবরণে, ইচ্ছার উদ্দামতায় চাপা পড়ে যায়, তা হলে আমরা বাঁচব কি নিয়ে? সমাজের কল্যাণ আসবে কোন পথে? চলার পথে অনেক বাধা অনেক কণ্টক—সে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই ত পথ চলা সফল হবে। মানুষকে মনীষীরা যুগে যুগে চিত্ত জয়ের সাধনাই করতে বলে গেছেন—বারে বারে তাঁদের কল্যাণ বাণী উচ্চারিত হয়েছে এই চঞ্চল মনকে বশে আনার জন্য। এই মনকে সংযত করাই সংসারে সবার বড় শিক্ষা। আত্মসুখ-ত্যাগই সব চেয়ে বড় ত্যাগ। আমার নিজের সুখের চেয়েও যেদিন অন্যের আনন্দকে বড় করে দেখতে শিখব, সে দিনই ত মুক্তি—তখনই আমরা আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হব—আমরা মানুষ নামের যোগ্য

হব। সত্যকার ভালবাসা জীবনে কখনও অকল্যাণ আনতে পারে না—যা অকল্যাণ আনে, সে ভালবাসা ভালবাসাই নয়। সে হল মোহ এবং মানুষ মাত্রকেই এই প্রলয়ঙ্করীকে জয় করতে চেষ্টা করা উচিত। মন যদি অকল্যাণের পথে ছোটে, তাকে আপ্রাণ চেষ্টায় ফিরিয়ে আনতে হবে—যেখানে একের জন্য বহুর জীবন বিড়ম্বিত হতে চলেছে, সেখানে বহুর অপমৃত্যুর চেয়ে একজনের মৃত্যুই কাম্য।

মানুষের মন জীবন্ত ও সচল—এই গতিশীলতাই জীবনের ধর্ম্ম। মানুষের মনে একের অধিক মনের ছায়াপাত খুবই সম্ভব। জীবনে একের অধিককে পছন্দও করতে পারি, আর এই ভাললাগা থেকে ক্ষেত্র বিশেষে ভালবাসাও সম্ভব—কিন্তু মাত্রা জ্ঞান কোন্ ক্রমেই হারান উচিত নয়। প্রতিটি বিষয়ের সীমা যে কোথায়—কোথায় গিয়ে আমাদের থামতে হবে, এ জ্ঞান থাকা চাই। এইটুকু চেতনা যাঁর আছে তিনি সকল সমস্যা সকল জটিলতা থেকেই সহজে উত্তীর্ণ হতে পারবেন।

আজকের এই অবাধ মেলামেশার দিনে এটা খুবই সম্ভব—একত্রে স্বামী-স্ত্রী রূপে বহুদিন সুখে শান্তিতে বাস করার পরও স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে তৃতীয়ের আগমন এবং সেই আগমন উপলক্ষে শান্তির নীড়ে ধ্বংস। বহু নষ্ট নীড় আসে-পাশে দেখে এবং লোকপরম্পরায় শুনেই মনে এ প্রশ্নটা জেগেছে। এসব ক্ষেত্রে দেখি পিতা মাতার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে অবোধ নিরপরাধ শিশুগুলি। মাতা পিতার স্নেহাশ্রয় বঞ্চিত যে সন্তান তার মত অভাগা আর কে? সৎ পিতামাতার শান্তির সংসার ছাড়া সুসন্তান কল্পনা করা কঠিন। গৃহের আবহাওয়া, বংশের ঐতিহ্য ও পিতামাতার মনের ছায়াতেই শিশুমন পুষ্ট হয়—নষ্ট নীড়ে সুসন্তান সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমই বলব।

প্রতিটি স্ত্রী-পুরুষের যাতে নীড় নষ্ট না হয়, গৃহে অশান্তি না ঘটে, সে বিষয় বিশেষ সচেতন হওয়া দরকার। যেখানেই গৃহ বিচ্ছেদ বা স্বামী-স্ত্রীর বিবাদ, সেখানে প্রায়ই তৃতীয়ের আবির্ভাব দরুণই এটা ঘটে। এই সব ক্ষেত্রে তাঁরা যদি আত্ম-সুখ বা স্বার্থপরতার উর্দ্ধে উঠতে পারেন—তাঁরা যদি একটি গৃহের প্রতি, আপন স্বদেশ ও জাতির প্রতি কল্যাণবোধ উদ্বুদ্ধ করেন, মনে হয় আমরা বহু অপমৃত্যুর হাত থেকেই উদ্ধার পেতে পারি। যে গৃহে সদাই অসন্তোষ কলহ বিবাদ, সে গৃহ সন্তানদের জন্য নরক সমান—এ

প্রভাব তারা পরবর্ত্তী সারা জীবন অজ্ঞাতেই বহন করতে বাধ্য। মানব শিশুর বাল্য এবং কৈশোরই জীবনের যুগ সন্ধিক্ষণ—এ সময় তার মনে যে ছায়া পড়ে, সারা জীবন সেই ছায়া মনে তার অলক্ষে কাজ করে যায়।

প্রায়ই শুনি যাঁদের আমরা দস্তুরমত আজ কালের মাপকাঠিতে শিক্ষিত বলি—এমন মেয়েরা একটি বিবাহিত, এমন কি সন্তানের পিতার প্রেমে এমনই আকণ্ঠ নিমজ্জিত হন যে, সেই প্রৌঢ়কে বিবাহ ছাড়া পথ খুঁজে পান না—আর হিন্দু সমাজের পুরুষের বহু বিবাহ কোনও দিন দোষ ছিল না, আজই দুষনীয় এবং আইন করে সে পথ বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আইন করে মানুষের কল্যাণ সব সময় আনা যায় না—সংসারে ছলছুতোর অভাব ঘটে না। কাজেই প্রকৃত অন্যায়ের পথরোধ মানুষের চরিত্রে নির্ভর করবে—করবে তার শিক্ষায়, মার্জ্জিত রুচির পরিচয়ে। তাই যখন দেখি এই সব মেয়েরা মোহের বসে নিজেদের এবং অপরের জীবনে দুঃখ বিড়ম্বনা টেনে আনেন—দুঃখ বোধ না করে পারি না। এ কথা কি তাঁরা ভাবেন না যে, যে-মানুষ একজনকে ঠকাতে পারে সে অপরকেও ঠকাতে পারবে—যেখানে নিষ্ঠার দৈন্য, সততার দৈন্য সেখানে পৌরুষ কোথায়? বলিষ্ঠ চরিত্র কখনও আদর্শ-ভ্রষ্ট হয় না—সত্য প্রেম চিরদিনই কল্যাণকামী। সে প্রেম অকল্যাণের জন্ম দেয় না।

সময় থাকতে তাই ঘরে ঘরে মেয়েদেরই কল্যাণের জন্য অনুরোধ করি আপন সন্তানদের সামনে ন্যায়ের আদর্শ নিষ্ঠার গৌরব তুলে ধরতে। সন্তানের চরিত্র গঠনে যেন ফাঁকির স্থান, ঝুটো মেকির ঝলক রেখা পাত না করে। মানুষ কি শুধু মাত্র ভাবালুতার ভাপে ভরা ফানুস? এ কথা মেনে নেবো কোন্ যুক্তিতে!

আজ আমরা যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি—যুগ-সন্ধিক্ষণের মানুষকে চিরদিনই ঝড়ঝঞ্ঝার সম্মুখীন হতে হয়েছে—আজকের মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইনি। জানি বিধাতার সুন্দর-তম সৃষ্টি এই মানুষ কখনও অসুন্দরের পথে পরাজয় মানবে না—এমন দুর্দ্দিন যদি সত্যই আসে জানবো এ সৃষ্টি মিথ্যা—মিথ্যা সেই লোকত্তম সৃষ্টি-কর্ত্তা।

এই সঙ্কটে যুগোত্তীর্ণ সুষ্টু, সুন্দর বলিষ্ঠচেতা ভবিষ্যৎ বংশধরদের পথ চেয়েই বসে থাকবো—সেই অনাগত শুভদিনের অদূর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি, অনুভব করছি সমস্ত সত্তা দিয়ে। জয় হোক মানুষের!

শান্তি

।। শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী ।।

তোমায় দেখেছি আমি ছায়াপথে দিগন্ত রেখায়
নীরবে সুদূরলব্ধ শুচি-স্মিত আলোর লেখায়
অনন্তেতে জ্যোতিষ্মান। ক্ষমানীল আকাশে উধাও
শুভ্র মেঘে দিকে দিকে বার বার বুঝি লিখে যাও
যে আলো মাধুর্য্যে মুগ্ধ, প্রেমেতে নিবিড় বেদনায়
ব্যাকুল, উদার, স্নিগ্ধ। স্পর্শে যার পৃথিবী হারায়
বহ্নি দাহ জ্বালা। তোমায় দেখেছি মুগ্ধ দূর হ'তে
অসীম আগ্রহে নীল অতৃপ্তির বৈতরিণী স্রোতে।

তারপর ফিরে দেখি অন্ধকারে এই পৃথিবীকে,
যুগে যুগে চেয়ে থাকা নির্নিমিখ আকাশের দিকে
এই মোর জন্মের ফসল। তৃষ্ণায় আকুল পাখী
মরুশূন্যে অন্তহীন বেদনায় কেঁদে যায় ডাকি
একবিন্দু বারি ; তবু কোনদিন নামেনা ত সাড়া,
কক্ষ্যবন্ধ জীবনের আমি এক ঘূর্ণ্যমান ধারা ॥

পুস্তক সমালোচনা

॥ শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর ॥

গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান—শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, M.A., L.L.B., Dip. Lib.—D.M. লাইব্রেরী, কলিকাতা ; ১৩৬৪, বড় ক্রাউন ৮°(৮"×৬॥") পৃ. ॥৶০+৩৯৪, পূর্ণ কাপড় ; ১০৲।

গ্রন্থকার নিজে বহুশ্রুত গ্রন্থাগারিক ; সুদীর্ঘ বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞতা এবং নানা গবেষণা ও আলোচনায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ। স্বদেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য সার্বজনিক গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার-পরিষদ শিক্ষণ-শিবির প্রভৃতির পুরোধা কর্মিরূপেও খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এবং দেশের রাজধানীতে রাষ্ট্রীয় আর্কাইভ্‌সে এবং ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনে সর্বপ্রথম ও প্রধান কেন্দ্র বরোদা রাজ্যেও উচ্চপদস্থ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। তদুপরি য়ুরোপীয় অভিজ্ঞতাও যৎসামান্য নয়। গ্রন্থকারের নিজের কথায় (অবতরণিকা পৃ. ৩) "Librarianship বলিতে কি বোঝায়, তাহাই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য।"

গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য যে কতদূর বিস্তৃত, তাহা এই গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্যকরণীয়ের মধ্যে রহিয়াছে : গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন, গ্রন্থপঞ্জী ও নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পাঠকের সহায়তা ও মানুষের জ্ঞানার্জন-স্পৃহা বর্দ্ধন এবং বিষয়ানুক্রমে গ্রন্থাদির পরিস্থাপন ও সহজে আবশ্যক পুস্তকাদির সন্ধান প্রাপ্তির সুযোগ প্রদান—এক কথায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের অ আ ক খ (A B C—Administration, Bibliography and Classification)। এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা এবং অতিরিক্ত অনেক কিছু এই গ্রন্থটিতে সাধারণ ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা দ্বারা গ্রন্থাগার-বিদ্যার্থী ও কর্মী এবং সাধারণ পাঠক সবাই উপকৃত হইবেন। এমন সর্বতোমুখী দৃষ্টি নিয়া আজ পর্যন্ত এদেশে কোনো ভাষায় এ বিষয়ে পুস্তক বাহির হইয়াছে বলিয়া জানা নেই। দেশে অদ্যাবধি যা-কিছু ইংরাজীতে ও দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটিও এবংবিধ সর্বতোমুখী নহে। এই একটি গ্রন্থ থাকিলেই গ্রন্থাগার বিষয়ক অবশ্য-জ্ঞাতব্য তথ্যের জন্য অন্যান্য এক বা অনেক বিষয়ের পুস্তকাদি অনুসন্ধানের বিশেষ আবশ্যকতা হইবে না।

বর্তমান গ্রন্থখানি ১৯টি পরিচ্ছেদ ও ৪টি পরিশিষ্টে বিভক্ত। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে আবশ্যক গ্রন্থপঞ্জী প্রদান ইহার একটি এমন বিশেষত্ব, যাহা অতঃপর অন্যান্য গ্রন্থকারগণ অনুসরণ করিতে পারিবেন। পরিভাষা ও নির্ঘণ্ট

প্রকরণগুলিও অনুকরণীয়। গ্রন্থপঞ্জীর মধ্যে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত পুস্তকের উল্লেখ কদাচিৎ থাকিলেও দেশীয় অন্যান্য ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকাদির সন্ধান নাই। বাংলা বই-ও মাত্র তিন-চারিখানি পঞ্জীতে উল্লিখিত আছে; যথা, বসু ও পাকড়াশীকৃত 'লাইব্রেরী সংরক্ষণ' (পৃ. ২৪৩), ঘোষ কৃত 'গ্রন্থাগার আন্দোলন ও জনশিক্ষা' এবং রায়-মহাশয় কৃত (১) 'গ্রন্থাগার আন্দোলন' ও (২) "দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার' (পৃ. ২৮৫)। তদ্ভিন্ন প্রমীল বসু লিখিত 'গ্রন্থকার-নামা'-ও উল্লিখিত হইয়াছে চতুর্থ পরিচ্ছেদে (পৃ. ৪৩)। ৩৮ পৃষ্ঠে পঞ্জী মধ্যে বঙ্গাক্ষরে যে গ্রন্থটির নামোল্লেখ হইয়াছে তাহা বর্তমান সমালোচকের একটি ইংরাজী বই 'Prachya-Vargikarana-Paddhati (1932).

শুদ্ধিপত্র (পৃ ৩৯৩) অসম্পূর্ণ। মুদ্রাকর-প্রমাদ ও সম্পাদনে সামান্য ত্রুটি থাকিলেও গ্রন্থখানি উৎকৃষ্ট। সকল গ্রন্থাগারে ও পাঠাগারে রক্ষিতব্য।

অতি-আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কোন কোন প্রকাশনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থের জন্য catalogue-card ছাপাইয়া বিলি করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে, যাহাতে ডিউই বা অপরবিধ বর্গীকরণ প্রতীক সংখ্যার নির্দেশ থাকে। বর্তমান গ্রন্থকার ততদূর অগ্রসর না হইলেও, গ্রন্থে বর্ণিত পুস্তক-জেব (book-pocket) জুড়িয়া দিয়া তন্মধ্যে মুদ্রিত পুস্তক পত্রক (book-card) রাখিয়া, তদুপরি ডিউই পরিচয়াঙ্ক নির্দেশ করিয়াছেন। ইহাও অনুকরণ-যোগ্য। ভারতে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকাশনে গ্রন্থাগারিককে এবংবিধ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা দেখা যায় না।

বর্তমান সমালোচকের আরব্ধ 'গ্রন্থাগার-বিদ্যা-প্রবেশিকা' প্রকাশে যতই বিলম্ব হইতেছে, ততই তাহার উৎকর্ষ বর্দ্ধনের সুযোগও উপস্থিত। 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' এ কার্যে যথেষ্ট সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করিবে। যদি কেহ মনে করেন, 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বিদ্যার্থী ও কর্মিগণের জন্য আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া দুই খণ্ডে লিখিত হইলে অধিকতর উপযোগী হইত, তবে তাহা ভুল হইবে। সর্বতোমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া বিষয়ের আলোচনা ও সমন্বয় দর্শন বাঞ্ছনীয়, এবং তাহাতে কৃতকার্য হওয়া কষ্টসাধ্য। কিন্তু এ বিষয়েও গ্রন্থকারের প্রচেষ্টা সার্থক বলিতে হইবে। তিনি ধন্যবাদার্হ এবং এবংবিধ পুস্তকের প্রকাশন ও পরিবেশনের ভার নিয়া যে প্রকাশন সংস্থা, দ [ত্ত-] ম [জুমদার] লাইব্রেরী, সৎসাহসের সহিত অগ্রণী হইয়াছেন তাঁহারাও প্রশংসনীয়।

ব্রহ্মসূত্রম্

।। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ।।

(২৩)

পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ।। ৩।৪।১

(পুরুষোত্তমের নয়ন চাহনির) প্রেরণার বুকেই পুরুষার্থ সিদ্ধি; বাদরায়ণ ইহাই সিদ্ধান্ত করিতেছেন। শব্দ হইতেও (ইহা অবগত হওয়া যায়)।

পুরুষের ক্রিয়ার্থ ও অতদর্থের (বিদ্যার্থের) সিদ্ধি এই নয়ন চাহনির প্রেরণার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে। ক্রিয়ার প্রয়োজন পুরুষের আছে, অতদর্থ অর্থাৎ বিদ্যার প্রয়োজনও পুরুষের সমভাবেই আছে। এই দুই অর্থ সিদ্ধ হয় শুধু পুরুষোত্তম-চাহনির মধ্যে। এই দুই সিদ্ধির সমন্বয়েই হয় পঞ্চ পুরুষার্থ—ধর্ম্মসিদ্ধি, অর্থসিদ্ধি, কামসিদ্ধি, মোক্ষসিদ্ধি ও প্রেমসিদ্ধি। 'অতঃ' পদের অর্থ পুরুষোত্তম-নয়ন চাহনির প্রেরণার বুকে; সপ্তম্যর্থে 'তস্' প্রত্যয়। শ্রুতি-শব্দ এই প্রেরণার তত্ত্বই ঘোষণা করিয়াছেন।

বিদ্যাঞ্চ অবিদ্যাঞ্চৈব যস্তদ্বেদোঽভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে ॥

প্রেরণার বুকেই বিদ্যা-অবিদ্যার সহ ভাব সম্ভবপর; একান্ত বিদ্যায়ও নয়, অবিদ্যায়ও নয়। প্রেরণারই এক শাখা বিদ্যা, যাহার ফল অদ্বৈতামৃতাস্বাদন, অপর শাখা তাহার অবিদ্যা বা ক্রিয়া, যাহার ফল দ্বৈতের ক্ষেত্রে ধর্ম্ম-অর্থ-কামাস্বাদন; প্রেম এই মরণ-অমরণের সমন্বয়। প্রেরণার মূর্ত্ত প্রকাশ প্রেম। 'ওঁ অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপম্'—শাণ্ডিল্যসূত্র।

এই প্রেরণার দুই ধারা—বিদ্যা ও অবিদ্যা। প্রাণের ক্ষেত্রে ইহারা যুগপৎ; কিন্তু বুদ্ধিক্ষেত্রে, প্রজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহা পুরুষের বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। বুদ্ধির ক্ষেত্রে কখনও বা বিদ্যা হয় অবিদ্যা, ক্রিয়ার শেষ বা অঙ্গ; কখনও বা বিদ্যার শেষই অবিদ্যা বা ক্রিয়া। জৈমিনির পূর্ব্ব মীমাংসা ক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া সব-কিছুকে এমন কি ব্রহ্মকে পর্যন্ত ক্রিয়ার শেষ বা অঙ্গ ধরিয়া লইয়া ক্রিয়ার নিজস্ব মূল্য আস্বাদন করিয়াছেন। ইহা পরিপূর্ণ প্রেরণার এক দিক; অপর দিকও ইহার আছে যাহার সঙ্গে সমন্বয় না হইলে এই দিকও

একান্তভাবে নিজের ফল আনয়ন করিতে পারিবে না। বাদরায়ণ পরে এই পাদেই 'তুল্যন্তু দর্শনম্' ইত্যাদি সূত্রে ইহাই ব্যাখ্যা করিবেন। ক্রিয়াকে কেন্দ্র করিয়া সবকিছুকে ক্রিয়ার উপকারক ধরার দিকটাই এইবার সূত্রকার বিশ্বের সামনে ধরিতেছেন।

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথাঽন্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ৩।৪।২

বিদ্যার শেষত্বহেতু (বিদ্যাফল) পুরুষ সম্বন্ধে অর্থবাদ মাত্র—ইহাই জৈমিনি বলেন; যেমন অন্য সকল অর্থাৎ দ্রব্যসংস্কার-কর্ম্মে (ফলশ্রুতি দেখা যায়)।

বিদ্যার শেষত্ব রহিয়াছে। 'শেষঃ পরার্থত্বাৎ'—জৈমিনিদর্শন ৩।১।২। বিদ্যা কর্ম্মার্থ; কর্ম্মের অন্তর্নিহিত সত্যরূপ বিদ্যাই ফুটাইয়া তোলে ও ফল প্রদানে সমর্থ করে। পরার্থের দিক দিয়া দেখিলে কর্ম্মও পরার্থ, কেননা কর্ম্ম 'ফলের' উদ্দেশ্যেই স্ফুরিত হয়। 'কর্ম্মাণি অঙ্গে জৈমিনিঃ ফলার্থত্বাৎ'—২।১।৪। ফলও আবার পুরুষার্থ, কেননা ফল পুরুষোত্তমেরই জন্য, 'ফলং পুরুষার্থত্বাৎ'—২।১।৫। আবার পুরুষও কর্ম্মার্থ বলিয়া কর্ম্মের শেষ বা অঙ্গ, 'পুরুষশ্চ কর্ম্মার্থত্বাৎ'—২।১।৬। সকলেরই অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধ। 'তেষামর্থেন সম্বন্ধঃ'—২।১।৭। পুরুষের এই অর্থই হইতেছে পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তমরূপ অর্থের তুলনায় পুরুষ, তাহার কর্ম্ম, কর্ম্মের ফল ও বিদ্যা সবই শেষ। কাজেই পুরুষ-কর্ম্ম-ফল-বিদ্যা সম্বন্ধে যত কিছু উৎকৃষ্ট ফলের শ্রুতি বেদে দৃষ্ট হয়, সবই সত্য বাস্তব পুরুষ সম্বন্ধে অর্থবাদ বা প্রশংসা। অর্থ যতক্ষণ নিজের মূল্যে, গৌরবে প্রতিষ্ঠিত, ততক্ষণই সে 'অর্থ' পদবাচ্য। যখন অর্থ পরের প্রয়োজন সিদ্ধ করে, তখনই তাহা অর্থবাদ। পুরুষ যতক্ষণ কৃষিকর্ম্মকে কৃষিকর্ম্ম হিসাবেই গৌরব দান করিয়া সম্পন্ন করে, তখনই কৃষিকর্ম্ম 'অর্থ'-পদবাচ্য, পুরুষের যাহা-কিছু ফলশ্রুতি সবই কৃষির অর্থবাদ মাত্র। কৃষি-প্রয়োজনে পুরুষ—এখানে কৃষি অর্থ, পুরুষের সুখফলশ্রুতি হইতেছে অর্থবাদ। বিদ্যা কর্ম্মের শেষ—বলার ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছে কর্ম্মের নিজস্ব গৌরব, কেন্দ্রত্ব। ক্রিয়ার স্বয়ং-মূল্য দানের জন্য দেবতা, কর্ম্মকর্ত্তা ও বিদ্যা সব-কিছু ক্রিয়ার উপকারক। কর্ম্মাঙ্গ বিদ্যার ফলশ্রুতি পুরুষের অর্থবাদ, পুরুষেরই প্রশংসা—বিদ্যার এই দিকটাই জৈমিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবত শাস্ত্র এই জৈমিনিসিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়াই রাসোৎসবের স্বয়ংকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন—"রাসোৎসবঃ সংপ্রবর্ত্তিতঃ"—স্বয়ংপ্রবৃত্ত এই রাসোৎসবের শেষ হইতেছে কৃষ্ণ ও ব্রজগোপী।

রাসোৎসবকে গৌরব দিতেই রাধা-কৃষ্ণ, উৎসবের উপযোগী সব দ্রব্য, সংস্কার, কর্ম্ম ও বিদ্যা সবকিছু রাসক্রিয়ার অঙ্গ মাত্র, প্রশংসা মাত্র। এই দৃষ্টি কোণে পুরুষ পর্য্যন্ত অর্থের মানদণ্ডে অর্থবাদ মাত্র। পুরুষ কর্ম্মেরই প্রকাশ বলা যাইতে পারে। "পুরুষের অর্থবাদ, এমন কি বিদ্যা হইতে পুরুষ পর্য্যন্ত সবই অর্থের অর্থবাদ" "পুরুষার্থবাদ"—এই পাদের নিগূঢ়ার্থ ইহাই। কৃষি-ফলের 'শেষ' হইতেছে কৃষিকর্ম্ম, কৃষিকর্ত্তা দেবশক্তি, কর্ম্মোপযোগী দ্রব্যসমূহ ইত্যাদি; কৃষিকর্ম্মজনিত কর্ত্তার সুখ, দ্রব্যাদির প্রশংসা সবই কৃষিবাচক অর্থবাদ মাত্র। ফল কর্ম্মের পর, অতীত; কর্ম্ম করিলেই ফল হইবে এমন কোনও স্থিরতা নাই, সুযোগসুবিধা চাই। ফল ও কর্ম্মের পররূপ পুরুষের দৃষ্টিতে ধরাইয়া দেওয়াই জৈমিনি-দর্শনের প্রয়োজন। ইহারই নিদর্শন দিবার জন্য সূত্রকার বলিলেন—"যথা অন্যেষাম্"—অন্য অর্থাৎ দ্রব্য, সংস্কার ও কর্ম্মে যেমন "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি। যদাঙ্‌ক্তে চক্ষুরেব ভ্রাতৃব্যস্য বৃঙ্‌ক্তে। যৎ প্রযাজানুযাজা ইজ্যন্তে কর্ম্ম বা এতৎ যজ্ঞস্য ক্রিয়তে কর্ম্ম যজমানস্য ভ্রাতৃব্যাভিভূত্যৈ"—এই জাতীয় শ্রুতি অর্থবাদ মাত্র, তদ্রূপ বিদ্যা সম্বন্ধে যে ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়, যথা "তরতি শোকমাত্মাবৎ" ইত্যাদি। তাহাও পুরুষের অর্থবাদ মাত্র। "দ্রব্যসংস্কারকর্ম্মসু পরার্থত্বাৎ ফলশ্রুতিরর্থবাদঃ॥" জৈমিনি সূত্র ৪।৩।১। কর্ম্মের পররূপ বা লীলাত্ব ফুটাইয়া তুলিতে চাই ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা তাই কর্ম্মেরও শেষ। ব্রহ্মবিদ্যা কর্ম্মের পরার্থ। "কুর্য্যাবিদ্বানংস্তথাসক্তঃ চিকীর্ষুঃ লোকসংগ্রহম্"—বিদ্বান্ ও অসক্ত পুরুষ লোক-সংগ্রহের ইচ্ছুক হইয়া কর্ম্ম করিবেন। বিদ্যা ও অনাসক্তিপূর্ব্ব কর্ম্ম লোকসংগ্রহরূপ অর্থকে ফুটাইয়া তুলিয়া উহারা লোকসংগ্রহেরই শেষ বা অঙ্গ। লোক-সংগ্রহই সন্ধ্য রচনা।

আচারদর্শনাৎ॥ ৩।৪।৩

আচরণ দর্শনহেতু (বিদ্যার শেষত্বই অবধারিত হইতেছে)।

জনকাদির আচরণ ইহার নিদর্শন। 'জনকো হ বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞেনেজে', (বৃঃ ৩।১।১), 'যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোঽহমস্মি', (ছাঃ ৫।১১।৫) —ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণের এই সব বাক্যসমূহদ্বারা বিদ্যার কর্ম্ম-সম্বন্ধত্ব দৃষ্ট হইতেছে। উদ্দালক প্রভৃতির পুত্রানুশাসনাদি দর্শন হইতে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের গার্হস্থ্যসম্বন্ধও অবগত হওয়া যায়। একান্ত জ্ঞানেই যদি পুরুষের সিদ্ধি

হইত, তাহা হইলে অনেকায়াস-সাধ্য কর্ম্ম তাঁহারা করিবেন কেন? ‘অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ”।

তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৩।৪।৪

বিদ্যার কর্ম্ম-শেষত্ব শ্রবণ-হেতু (কেবলা বিদ্যার পুরুষার্থ হেতুত্ব নাই)

ছান্দোগ্য বলিতেছেন—‘যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতি’ (ছা ১।১।১০)। ‘বিদ্যয়া’—এখানে করণ কারকে প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘সাধকতমং করণম্’। ‘করোতি’ সাধ্য, ‘বিদ্যয়া’ তাহার সাধকতম করণ।

সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৩।৪।৫

সমানভাবে অনুগমন পূর্ব্বক আরম্ভণ হেতু (বিদ্যার কেবলাত্ব প্রতিপন্ন হয় না)

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—“তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে। (বৃ ৪।৪।২) এই মন্ত্রে বিদ্যা-কর্ম্মের ফলারম্ভে সহ কারিত্ব, সহ অন্বয়ত্ব দর্শনহেতু বিদ্যার একান্ত স্বাতন্ত্র্য সমর্থিত হইতেছে না।

তদ্বতো বিধানাৎ ॥ ৩।৪।৬

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের (তদ্বতঃ) (ব্রহ্মারূপে যজ্ঞে) বিধান দর্শনে (প্রতিপন্ন হয় যে বিদ্যা কর্ম্মের অঙ্গ)

ব্রহ্মিষ্ঠৌ ব্রহ্মাদর্শপৌর্ণমাসায়াস্তং বৃনীত—তৈত্তিরীয়তে ব্রহ্ম-জ্ঞানবান্ ব্রহ্মাকেই দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞে বরণ করিয়া বিধান রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মবিদ্যা নিশ্চয়ই কর্ম্মের উপকারক, তাই যজ্ঞে তাহার বরণ বিধান রহিয়াছে।

নিয়মাচ্চ ॥ ৩।৪।৭

শ্রুতিনিয়ম হইতেও (একান্ত বিদ্যা উপপন্ন হয় না)

ঈশোপনিষদ বলিতেছেন—“ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা”। ‘ভুঞ্জীথা’ তখনই সম্ভব যখন সাধকতম করণ থাকে “ত্যক্তেন”; ত্যক্তেন হইবে অঙ্গ, ভুঞ্জীথা তাহার

অঙ্গী। 'ত্যক্তেন' পদদ্বারা বিদ্যাই সূচিত হইতেছে, ভুঞ্জীথা পদদ্বারা সূচিত হইতেছে ভোগ ক্রিয়া। তাহার পরই আবার শুনাইতেছেন—

কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথে তোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥

কর্ম্মের পরে লিপ্ত না হওয়া সম্ভব হয় তখনই, যখন বিদ্যা হয় কর্ম্মের সাধকতম করণ। বিদ্যা-কর্ম্ম সমন্বয় হইলেই প্রতিষ্ঠিত হয় লীলা।

কিন্তু এইভাবে ক্রিয়াকে একান্ত শেষী ও বিদ্যার একান্ত শেষত্ব দর্শনই যে চূড়ান্ত দর্শন নয়, উহা যে একদেশ-দর্শনই, ইহারও অধিক দর্শন যে আছে, তাহাই বাদরায়ণ পরবর্ত্তী সূত্রে প্রকাশ করিবেন।

অধিকোপদেশাৎ তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩।৪।৮

অধিকের উপদেশ থাকা হেতু নিঃসন্দেহে বাদরায়ণের এইরূপ সমন্বয় সিদ্ধান্ত (যুক্তিযুক্ত হইতেছে) কেননা অধিকের দর্শন শ্রুতিতে মিলিতেছে।

কঠ শুনাইতেছেন "অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ"—কৃত ও অকৃতের অধিক হইতেছে পুরুষোত্তম। কৃত দ্বারা অকৃত-লোক লাভ হয় না—'নাস্তি অকৃতঃ কৃতেন"। কৃত হইতেছে ক্রিয়া, অকৃত হইতেছে বিদ্যা। পুরুষোত্তম প্রেরণা কৃতেরও একান্ত অধিক, একান্ত অকৃতেরও অধিক। লীলাস্বাদনই হইতেছে অধিকোপদেশ; লীলা বিদ্যারও অধিক, কর্ম্মেরও অধিক। যেখানে কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন, অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন, সেখানেই কর্ম্মের অধিক দর্শন, অকর্ম্মের অধিক দর্শন, এই দুই অধিক দর্শনের সমন্বয়ই লীলা দর্শন। শ্রুতির সর্ব্বত্র এই লীলাদর্শনের তত্ত্ব স্ফুরিত হইতেছে।

ইহার পর বাদরায়ণ অধিক দর্শনের ভিত্তিতে বিদ্যার কর্ম্মশেষ হওয়ার অপর দিক্ অর্থাৎ কর্ম্মের বিদ্যা-শেষত্বের দিকটা পরবর্ত্তী ছয়টী সূত্রে ফুটাইয়া তুলিবেন। 'আচার দর্শনাৎ' সূত্র হইতে 'নিয়মাচ্চ' পর্য্যন্ত পাঁচটী সূত্র ও 'তুল্যন্তু দর্শনম্' হইতে 'স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা' এই পাঁচটী সূত্র পরস্পর পরস্পরের পরার্থ হইয়া দুইয়েরই অধিক পুরুষোত্তম-লীলাকেই প্রকাশ করিতেছে।

তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ৩।৪।৯

(বিদ্যা-কর্ম্মের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিত্বের) দর্শন নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে তুল্য।

যেখানে দর্শনকে তুল্য বলা হইতেছে, সেখানে জৈমিনির মতবাদকে

নিশ্চয়ই নিরাশ করা হইতেছে না। বিদ্যা-কর্ম্মের পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবের দর্শন যদি তুল্য, তবে তাহাদের উপযোগিতাও তুল্য। শ্রুতিতে রহিয়াছে—'এতদ্ধ স্ম বৈ তদ্বিদ্বাংসঃ আহুর্ঋষয়ঃ কবেষেয়াঃ কিমর্থা বয়ম্ অধ্যেষ্যামাহ কিমর্থা বয়ং··যাহ। এতদ্ধ স্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংসোঽগ্নিহোত্রং ন জুহুকঞ্চক্রিরে।' 'এতং বৈ তমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি'॥ বৃ ৩।৫।১

শ্রুতি পুরুষোত্তম-দর্শনই প্রচার করিতেছেন বলিয়াই তাহাতে ত্যাগ-দর্শন ও ভোগ-দর্শন তুল্য ভাবেই স্থান পাইয়াছে। কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গত্ব হওয়ার ফলে ব্রহ্মলোক দর্শনের কথাও আছে, বিদ্যার কর্ম্মাঙ্গত্ব হওয়ার ফলে পিতৃলোক প্রভৃতি প্রাপ্তির দর্শনের কথাও আছে। ব্রহ্মলোকের দর্শনে পিতৃলোক দর্শন অর্থবাদ, পিতৃলোকের দর্শনে ব্রহ্মলোক দর্শন অর্থবাদ। এই দুইয়ের মাঝে অনুস্যূত হইয়াই পরিপূর্ণ পুরুষোত্তম-দর্শন। এই সূত্রটীও পূর্ব্বোক্ত 'আচার দর্শনাৎ' সূত্রটীর অপর দিক।

অসার্ব্বত্রিকী ॥

(পুরুষোত্তম বিদ্যার বাহিরে একান্ত ক্রিয়া বা একান্ত বিদ্যা কেহই) সার্ব্বত্রিকী নয়।

বুদ্ধির স্তরে বিদ্যা ও ক্রিয়ার ক্ষেত্র পৃথক পৃথক। স্ব স্ব ক্ষেত্রে উহারা স্বয়ং হইলেও পর ক্ষেত্রে পরার্থ মাত্র, অর্থবাদ মাত্র। কেহই সর্ব্বক্ষেত্রে সমানভাবে স্বয়ং নহে। এই সূত্রটী ও পূর্ব্বোক্ত "তচ্ছ্রুতেশ্চ" সূত্রটী পরিপূরক। ক্রিয়ার অনুগমন করিয়া বিদ্যা ক্রিয়াকে দেয় ভাব, পক্ষান্তরে বিদ্যার অঙ্গ হইয়া কর্ম্ম যোগায় বিদ্যার রস। বিদ্যাহীন কর্ম্ম যেমন বন্ধন আনয়ন করে, কর্ম্মহীন বিদ্যা আনে ভাবুকতা। বিদ্যা কর্ম্মের ভাব, কর্ম্ম-বিদ্যার রস।

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ৩।৪।১১

এক শত সংখ্যার মত পুরুষ-জ্ঞান-কর্ম্মের বিভাগ রহিয়াছে।

পুরুষ, বিদ্যা ও কর্ম্মের বিভাগ শতের (১০০) মতন : একের পর দুইটী শূন্যই সার্থক; কিন্তু একহীন একটীরও কোন মূল্য নাই। তেমনি সতী আত্মময়ী প্রেরণার ভিতর দিয়াই দ্বৈত জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রেরণার অর্থ প্রকাশ করিতেছে;

প্রেরণাহীন জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়া শূন্যই, ফাঁকিই। প্রেরণার ভিতর দিয়াই শূন্যবাদের অনন্ত মূল্য, নচেৎ একবাদ ও শূন্যবাদ দুই-ই নীরস, বিকট। প্রেরণাহীন সংসার শূন্যই, প্রেরণাহীন জ্ঞান ও কর্ম্মও শূন্য, প্রেরণাকে বুকে রাখিয়া শূন্য জ্ঞান ও শূন্য কর্ম্ম পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ কর্ম্মে ভরপূর হইয়া উঠে। সৎ প্রেরণা এক (১); বিদ্যা দ্বিতীয়, শূন্য (০); কর্ম্ম তৃতীয়, শূন্য (০) —একাধারে সচ্চিদানন্দ ১০০। কখনও বা প্রেরণা ১, কর্ম হইতেছে দ্বিতীয়, ০, বিদ্যা হইতেছে তৃতীয়, শূন্য ০। একের বুকেই দুই শূন্যের অদ্বৈত রস-লীলা। শূন্য মিথ্যা নহে, ইহার অনন্ত মূল্য আছে। 0 = +1 − 1 or +2 − 2 or +3 − 3 to infinity। বিভাগই ভক্তিবাদ; একে শূন্য দশ, দশে শূন্য শত। এক × বিদ্যা = দশমহাবিদ্যা, দশমহাবিদ্যা × কর্ম্ম = পূর্ণরস। শূন্যের সহিত একের ভাবই রসলীলা; "আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ"। বিভাগ বাদ বা ভক্তিবাদ এক ও শূন্যের পরকীয় আস্বাদন প্রচার করিয়া জ্ঞান ভক্তি কর্ম সর্ব্ব শ্রেয়ঃ সমন্বয়। বিভাগই ব্রহ্মের রসময়ত্ব; জ্ঞান ও আনন্দকে যত ভাগ করিবে, ততই বাড়িতে থাকিবে কেন না জ্ঞান ও আনন্দ ব্রহ্ম (যাহা বাড়িতে থাকে)। ব্রহ্মই বিভাগময় কিম্বা ব্রহ্মই বিভাগ বা ভক্তি। যে কৌশলে প্রকৃতিকে ভাগ করিলে প্রকৃতির বুকে ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্ম-ভজন আত্ম-প্রকাশ করে, সেই ভজন প্রক্রিয়াই (Rules of division) পুরুষোত্তম-বাদের শিক্ষা, ভক্তি কৌশল। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। যোগ ও বিয়োগ দুইটী নিত্য রস-ধারা; যোগ-সংক্ষেপ পূরণ, বিয়োগ বা ত্যাগ-সংক্ষেপ ভাগ বা ভজন; উভয়ের সমাহার যোগ-ভজন যোগমায়া; অবতার মূর্ত্তিমান ভক্তি (Subtraction or Division) অথচ যোগ (Additiou or Multiplication) কোন্ কৌশলে ব্রহ্ম যোগ বজায় রাখিয়া প্রকৃতিকে ভাগ ভাগ করিয়া ভাগ করিতেছেন, সেই কৌশল শিক্ষা করা ছাড়া ভজন আর কিছুই নহে। এই সূত্রের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত "সমন্বারম্ভণাৎ" সূত্রটী পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

অধ্যয়নমাত্রবতঃ॥ ৩।৪।১২

অধ্যয়নমাত্রবান্ ব্রহ্মিষ্ঠ পুরুষের (বরণের বিধান থাকা হেতুতেই কর্ম্মের বিদ্যা-শেষত্ব উপপন্ন হইতেছে)

'তদ্বতো বিধানাৎ' সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মিষ্ঠ ব্রহ্মাকেই বরণ করিতে হইবে। ব্রহ্মিষ্ঠ শব্দে বেদনিষ্ঠও হয়, ব্রহ্ম অর্থে বেদ। বেদাধ্যয়নমাত্রবিজ্ঞান-

বান পুরুষকেই বরণ করিতে হইবে—ইহাই স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে। অধ্যয়নকে 'অর্থে'র কাছে বলি না দিয়া, অর্থ প্রাপ্তির আশায় অধ্যয়নকে মাত্র প্রয়োগ না করিয়া অধ্যয়নের স্বমূল্যে অধ্যয়ন করাই অধ্যয়ন মাত্রত্ব; এই অধ্যয়ন মাত্রত্বের বিজ্ঞান যাহার আছে, সেই অধ্যয়ন-মাত্রবান্। অধ্যয়নের যখন অর্থ থাকে না, অধ্যয়ন যখন নিজেই নিজের অর্থ, তখনই তাহা অকর্ম্ম— 'অর্থলোপাদকর্ম্ম স্যাৎ'—জৈমিনি সূত্র ৩।১।৯। কর্ম্মের যখন অর্থ লোপ অর্থাৎ কর্ম্ম যখন নিরর্থক, নির্হেতু তখনই তাহা অকর্ম্ম। অকর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম্য, নৈষ্কর্ম্মই জ্ঞান। এখানে অধ্যয়ন কর্ম্ম এমন কৌশলে পরিচালিত যে, কর্ম্ম বিদ্যার অঙ্গরূপে বিদ্যাকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছে, কর্ম্ম বিজ্ঞানরূপে জমিয়া উঠিতেছে। অধ্যয়নের নেশায় অধ্যয়ন তখনই হয়, যখন অধ্যয়ন-কর্ত্তা অধ্যয়নকে কোনও বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার না করে, যখন কর্ত্তা কর্ত্তৃতন্ত্রত্ব পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন। যাহার কর্ত্তৃতন্ত্র অহঙ্কার বিলুপ্ত তাহার কাছেই বেদাধ্যয়ন স্বয়ংমূল্যে প্রতিষ্ঠিত; তখন অধ্যয়ন ও ব্রহ্মবিজ্ঞান এক। এই সূত্র 'তদ্বতো বিধানাৎ' সূত্রের অপর দিক্ প্রকাশ করিয়াছে। বর্ত্তমান সূত্রের অর্থই পরবর্ত্তী সূত্রে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

নাবিশেষাৎ ॥ ৩।৪।১৩

(অঙ্গ অঙ্গিগত) অবিশেষ থাকা হেতু কোনও এক দিককেই স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়।

এই সূত্র পূর্ব্ববর্ত্তী 'নিয়মাচ্চ'—সূত্রের অপর দিক্ প্রকাশ করিতেছে। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি'—এই মন্ত্রে কর্ম্ম করিতে করিতে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবার কথাই বলা হইয়াছে। এই কর্ম্ম অর্থযুক্ত বা অর্থহীন অকর্ম্ম হইবে, তাহার বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই। কর্ম্মের অর্থ জ্ঞান হইতে পারে, জ্ঞানের অর্থও কর্ম্ম হইতে পারে। অবিশেষভাবে বলার হেতুতে কোনও এক পক্ষকেই স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত নয়। তবে এই মন্ত্রটির পূর্ব্বে 'ঈশাবাস্যম্ ইদম্ সর্ব্বম্' ইত্যাদি থাকায় বিদ্যাপ্রকরণই এই মন্ত্রটিতে উক্ত হইয়াছে ধরিয়া লইলে কর্ম্মের বিদ্যাঙ্গত্বই স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। পরবর্ত্তী সূত্রে তাহাই বলিতেছেন।

ক্রমশঃ

চীনদেশ ও চীনদেশবাসী

লেখক—লিন-ইউ-তান্‌ঃ অনুবাদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

খৃষ্টীয় জগতের সংস্কৃতির মত যে সব সংস্কৃতি ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত এবং চৈনিক সংস্কৃতির মত যে সব অজ্ঞেয়বাদী সংস্কৃতি—এই দুই প্রকারের সংস্কৃতির ভিতরে যে পার্থক্য কি, তা আমি অনেক সময় বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি এবং দেখেছি এই পার্থক্য বিভিন্ন স্থানে কি রকম বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে মানুষের অন্তরের প্রয়োজনে, যদিও প্রয়োজনটা সব মানুষেরই মূলতঃ প্রায় একই। মানুষ ধর্ম্ম বলতে সাধারণতঃ যে তিন প্রকারের আচার অনুষ্ঠান বোঝে, তার প্রতি লক্ষ্য করলেই এই পার্থক্যের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। প্রথমতঃ ধর্ম্মের মূর্ত্ত প্রকাশ হিসেবে যাজক-তন্ত্র এবং তাদের মত-বাদের গোড়ামী শিষ্য পরম্পরা-ক্রমে উত্তরাধিকার, অলৌকিকে বিশ্বাস, পাপের অব্যর্থ মহৌষধের বিলি-ব্যবস্থা ও ক্ষমা-পত্র বিক্রয়, পাদ্রীর ইচ্ছায় মোক্ষের সুলভ সংস্করণের ব্যবস্থা, এবং স্বর্গ-নরকের বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস। সহজেই কেনা-বেচা করা যায় এমন যে ধর্ম্ম, তা পৃথিবীর সর্ব্বত্র এবং সব জাতের মধ্যেই প্রচলিত আছে—এমন কি চৈনিকদের ভিতরেও আছে। মানব সংস্কৃতির স্তর বিশেষে এরূপ ধর্ম্মের দ্বারা হয়ত মানুষের কোনো গভীর প্রয়োজন সিদ্ধ হয় বলেই তা এত সাধারণ হয়েছে। চৈনিকদের মধ্যেও বোধহয় সেই জন্যেই প্রচলিত হয়েছে এবং কনফিউসীয় মত-বাদ তার ব্যবস্থা করতে অস্বীকার করায় তারা তাও-মতবাদ এবং বৌদ্ধধর্ম্মের কাছ থেকে তা সাগ্রহে গ্রহণ করেছে।

দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদ যে ধর্ম্মের অনুমোদনেই নৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রামাণিকতা—ধর্ম্ম না থাকলে নীতির কোনো সত্যিকার ভিত্তি থাকে না, এই বিষয়ে চৈনিক ও খৃষ্টীয় দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিপুল পার্থক্য। মানবতার নীতি-শাস্ত্র মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—ঈশ্বরকে কেন্দ্র করে নয়। মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক—যাকে বলে ব্যক্তিগত বা সামাজিক নীতি—তা যে কোনো পরম-পুরুষের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়া সম্ভব, তা পাশ্চাত্ত্যের লোকেরা

ভাবতেই পারে না। অপর দিকে চীনবাসীরা এই কথা ভেবে বিস্ময় অনুভব করে যে, কোন তৃতীয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তিতা ছাড়া মানুষ কেন একে অন্যের সঙ্গে ভদ্রভাবে সুরুচিসঙ্গত ভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। বস্তুতঃ এটা খুবই আশা করা যায় যে, মানুষ মানুষের মঙ্গল চিন্তা করবে এবং মঙ্গল সাধন করবে এই জন্যই শুধু যে, এইরূপ করাই মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক এবং ভদ্ররীতি-সঙ্গত। আমি অনেক সময়ে অবাক হয়ে ভাবি যে, ইউরোপীয় নীতি শাস্ত্রের পরিণতি কি হয়ে দাঁড়াত যদি তা সেণ্ট্ পল প্রচারিত ঈশ্বর-তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত না হত। আমার মনে হয়, সে অবস্থায় তা আপন প্রয়োজনেই মার্কাস্ ও রেলিয়াসের চিন্তাধারা অনুসরণ করেই পরিণতি লাভ করত। পলের ঈশ্বর-তত্ত্বই মানুষের মৌলিক পাপ সম্বন্ধে ধারণা হিব্রুদের কাছ থেকে এনে খৃষ্টীয় মত-বাদের অঙ্গীভূত করেছে এবং এই মৌলিক পাপের ধারণা দ্বারা সমস্ত খৃষ্টীয় ধর্ম্মনীতি সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে। তার ফলে খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রধান কথাই হচ্ছে এই যে, উদ্ধার কর্ত্তার সাহায্য ছাড়া কারো পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি নেই। তাই ইউরোপের অবস্থা দাঁড়িয়েছে এই যে, ধর্ম্ম বাদ দিয়ে কোন নীতিশাস্ত্র সম্ভব এরূপ চিন্তা সে দেশে কারো মনেই কখনও উদিত হয় না।

তৃতীয়তঃ যেখানে ধর্ম্ম হচ্ছে একটা প্রাণের প্রেরণা ও হৃদয়ের জীবন্ত আবেগস্বরূপ অথবা বিশ্বের বিপুল রহস্য ও বাস্তবের ভয়ঙ্কর অথচ মহিমময় রূপ সম্বন্ধে একটা ভয়-বিহ্বল বিস্ময়-ভাব এবং একটা নিরাপদ আশ্রয় সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা, যে সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন মানুষের আপন স্বভাবের মধ্যেই নিহিত। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই এমন সময় আসে, যখন এই পরি-দৃশ্যমান জগতের কিছুই আমাদের মনটাকে বেঁধে রাখতে পারে না। যখন আমাদের পরমাত্মীয় কেউ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, অথবা যখন আমরা ভীষণ একটা রোগে ভুগে মরতে মরতে বেঁচে উঠি, অথবা যখন শরতের শীতার্ত্ত সকালের একটি একটি করে ঝরে পড়া পাতার দিকে চেয়ে চেয়ে আমাদের মনে মৃত্যুর আবছায়া মূর্ত্তি জেগে ওঠে এবং মনে হয় এ দুনিয়ায় কিছুই কিছু নয়, তখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন বস্তুই আমাদের মনটাকে খুসি করতে পারে না—তখন আমরা এই দৃশ্যমান জগতের পরপারে আকুল আগ্রহে সুদূরের পানে চাই।

চৈনিকদের জীবনে যেমন মাঝে মাঝে এরূপ মুহূর্ত্ত আসে, তেমনি

ইউরোপীয়দের জীবনেও আসে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া সমান হয় না। আমি নিজে এক সময়ে খৃষ্টান ছিলাম—এখন অবশ্য খৃষ্টানরা যাকে বলে প্যাগান্ অর্থাৎ বহু দেবতাবাদী পৌত্তলিক, আমি তা-ই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, জীবনের এরূপ যাবতীয় সমস্যার তৈয়ারী জবাব ধর্ম্মের কাছ থেকে হাতে হাতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তার ফলে জীবনের অতল-স্পর্শ রহস্য ও অপরিসীম বিষাদ বেদনার যে একটা স্বাভাবিক অনুভূতি মানুষের মনে সদা প্রবহমান—যাকে আমরা বলি "কবিত্ব"—তা অনেকটা ফিকে হয়ে যায়, তার রস-মাধুর্য্য বহুলাংশে লোপ পায়। 'সংসারে যা ঘটে, সবই মঙ্গলের জন্যে'—খৃষ্টানদের এই অবাস্তব আশাবাদ কবিত্ব-ভাবের বিলোপ সাধন করে। একজন প্যাগানের পক্ষে তার নিজের জীবন সমস্যার এরূপ তৈয়েরী জবাব হাতে হাতে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে তার মনে একটা অপরিসীম রহস্যের বোধ সর্ব্বদা জাগরূক থাকে এবং তার ফলে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন বোধও অপরিপূরিত ও অপরিপূরণীয়ই থেকে যায়। তাই তার পক্ষে 'সর্ব্বত্র এক আত্মার অধিস্থান'-রূপ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটা কবিত্বের ভাবের উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় থাকে না। বস্তুতঃ চীনবাসীদের জীবন-যাপন ব্যবস্থার জীবন্ত প্রেরণার উৎস হিসেবে কবিত্বই ধর্ম্মের স্থান গ্রহণ করেছে। চৈনিক কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে একথার সত্যতা আমরা বিশেষ ভাবে দেখতে পাব। পাশ্চাত্ত্যরা প্রকৃতির প্রত্যেক সৃষ্টিতে জীবাত্মার সন্ধান পেতে অভ্যস্ত নয় বলে ধর্ম্মই তাদের একমাত্র আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে। কিন্তু একজন প্যাগানের মনে হয় যে, নিতান্তই ভয় থেকে এরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উদ্ভব। ভয়টা এই যে আমাদের পার্থিব জীবনে বুঝি যথেষ্ট কবিত্ব নেই—এমন কিছু নেই যার দ্বারা আমাদের বিচিত্র ভাব ও কল্পনা-প্রবণ মন পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। এরূপ ধর্ম্ম-বিশ্বাসীরা হয় ত মনে করে যে, ডেনমার্কের বীচ ফলের বনে কিংবা ভূমধ্য সাগরের শীতল বালু-সৈকতে যথেষ্ট শক্তি ও সৌন্দর্য্যের উৎস নেই, যাতে মানুষের ব্যথাহত চিত্ত শান্তি ও তৃপ্তি লাভ করতে পারে। তাই তাদের পক্ষে অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাস একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কিন্তু কনফিউসীয় সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বিশ্বাসের ধার ধারে না—অতীন্দ্রিয় ব্যাপারকে অজ্ঞেয় রাজ্যের রহস্য মনে করে, তা নিয়ে অযথা সময় নষ্ট করতে যায় না এবং করে না। কনফিউসীয় মতবাদীরা

প্রকৃতি-জয়ী মানব মনের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী—স্বাভাবিক জীবনের পথ, নিছক প্রকৃতির অনুসর বা স্বাভাবিকতা মানুষের পক্ষে হিতকারী বলে তারা মনে করে না—তার চেয়ে বিচারশীল মনের বুদ্ধি প্রদীপ্ত পথে বিচরণকেই তারা মানুষের আদর্শ বলে মনে করে। এই মনোভাব কনফিউসিয়াসের শিষ্য মেনসিয়াসের মতবাদে সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছে দেখা যায়। কনফিউসীয় মতে সারা বিশ্ব জুড়ে "আকাশ" "পৃথিবী" ও "মানুষ" এই ত্রি শক্তির খেলা চলছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের স্থান সম্বন্ধে কনফিউসীয় মতাবলম্বীদের ধারণা কি? ব্যাবিট (Babbit) কর্তৃক বিশ্লেষিত অতীন্দ্রিয়বাদ-প্রকৃতি-বাদ ও মানবতাবাদের মধ্যে যে পার্থক্য এই ত্রিশক্তির পার্থক্যও অনেকটা সেই রকমের। আকাশ হচ্ছে গ্রহ তারা খচিত মেঘ রাজী সম্বলিত ও অসংখ্য অজ্ঞাত শক্তি অধ্যুষিত আকাশ, যে শক্তির খেলাকে পাশ্চাত্ত্য ব্যবহার শাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় ঐশ্বরীক ঘটনা। আর পৃথিবী হচ্ছে পাহাড় পর্ব্বত ও নদনদী ভরা পৃথিবী এবং সেই সব শক্তির লীলা নিকেতন, যা গ্রীক পুরাণে ডিমেটারের (Demeter)-এর শক্তি বলে কথিত। এই দুইয়ের মাঝে মানুষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান। মানুষ জানে এই বিশ্ব-সংস্থানে তার স্থান কোথায় এবং সে সম্মানজনক স্থানের জন্যে সে স্বভাবতঃই গৌরব অনুভব করে। চীনবাসীদের ঘরের ছাদ যেমন গথিক রীতিতে নির্ম্মিত মন্দিরের সমুচ্চ চূড়ার মত আকাশ ভেদ করে ঊর্দ্ধে ওঠেনা, তেমনি তাদের ভাবপ্রবণতা মাটি ছেড়ে আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়ায় না; পরন্তু পৃথিবীর বুকে পার্থিব বিষয় নিয়েই ব্যাপৃত—তার সঙ্গেই ওত-প্রোত ভাবে জড়িত। এই ভাবপ্রবণতায় উদ্বুদ্ধ যাবতীয় কর্ম্ম-প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ সাফল্য হচ্ছে এই পার্থিব জীবনে মোটামুটি রকমের একটা সুখ ও শান্তির অধিকারী হওয়া।

চীনবাসীদের ঘরের ছাদের নাতিদীর্ঘ উচ্চতাই তাদের মনের এই ভাব নির্দ্দেশ করে যে, আপন গৃহই হচ্ছে সুখ লাভের প্রাথমিক স্থান। বস্তুতঃ আমি গৃহকেই চৈনিক মানবতার মূর্ত্ত প্রকাশ হিসেবে দেখি। পবিত্র ও অপবিত্র প্রেম নামক বিখ্যাত চিত্রের একটি উন্নততর সংস্করণ কেউ যদি নিপুণ হস্তে উচ্চ কলাসম্মত ভাবে এঁকে তুলতে পারে তবে খুব চমৎকার হয়। তাতে তিনটি স্ত্রীলোকের ছবি আঁকা হবে। একটি ফ্যাকাসে-মুখ সন্ন্যাসিনীর ছবি (অথবা ছাতা হাতে মেয়ে পাদ্রীর ছবি), একটি ইন্দ্রিয়-

সেবী বার বিলাসিনীর ছবি এবং তৃতীয়টি তিনমাসের সন্তান-সম্ভবা সমুজ্জ্বল মাতৃমূর্ত্তি। এই তিন জনের মধ্যে স্বামী-গৃহের গৃহিণী যিনি, তাঁর মূর্ত্তি হবে নিতান্ত সাধারণ, সাদাসিদে, অথচ পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও তুষ্টির প্রতিমূর্ত্তি। এই ভাবে আঁকলে তারা তিনজনে জীবনের ত্রিবিধ পথের প্রতীক বলে গৃহীত হোতেং পারে—একজন ধর্ম্মপথের, একজন স্বাভাবিকতার পথের এবং আর একজন মানবতার পথের প্রতীক।

সহজ সরল সাদাসিদে ভাবের অধিকারী হওয়া খুবই শক্ত। কেননা সত্যিকার মহাপুরুষেই এরূপ ভাবের স্বাভাবিক স্ফুরণ সম্ভবপর। চীন-বাসীরা এই সহজ সরল আদর্শকেই তাদের জীবনের আদর্শ করে নিয়েছে। হেলাফেলা করে কেবল মাত্র একটা অলস চেষ্টায় তা করতে পারেনি—পেরেছে সরলতার মন্দিরে প্রাণের সত্যিকার পূজা প্রদান করে, পেরেছে সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ধর্ম্ম অনুসরণ করে। কেমন করে এই আদর্শ তাদের অধিগত হয়েছে, তা আমরা এখনই দেখতে পাবো।

(৩) মধ্যপথ সম্বন্ধীয় মতবাদ।

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানের ধর্ম্ম বা বিবেচনাশীল মনোভাব হচ্ছে কনফিউসীয় মানবতার অচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। এই বিবেচনাশীল মনোভাব থেকেই মধ্য-পথ সম্বন্ধীয় মতবাদের উদ্ভব হয়েছে, যা হচ্ছে কনফিউসীয় মতবাদের মুখ্য বস্তু। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছদেই বিবেচনাশীল মনোভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে যুক্তিবাদ বা ন্যায়ের তর্ক থেকে এরূপ মনো-ভাবের পার্থক্য কি! সেখানে বলা হয়েছে যে, এই বিবেচনাশীল মনোভাব সহজাত জ্ঞানসঞ্জাত এবং ইংরেজী ভাষার "কমন্‌সেন্‌স্‌" (কাণ্ডজ্ঞান) এর সমার্থবাচক। আরো দেখানো হয়েছে যে, কোনো একটা প্রস্তাব ন্যায়-শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে নির্ভুল হওয়াই চৈনিকদের মতে যথেষ্ট নয়—সে প্রস্তাব মনুষ্য স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ কি না, এইটেই তাদের বিবেচনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

চিরদিনই চীনের প্রাচীন শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বিবেচনা-শীল হতে শিক্ষা দেওয়া। এই বিবেচনাশীল মানুষই হচ্ছে চৈনিক সংস্কৃতির আদর্শ। তাদের মতে শিক্ষিত ব্যক্তির লক্ষণ হচ্ছে সে প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ হবে বিবেচনাশীল, তার কাণ্ডজ্ঞান থাকবে সর্ব্বদা প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল—

ধৈর্য্য ও সংযমের প্রতি থাকবে তার অনিবার্য্য ও অস্খলিত আকর্ষণ—বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন অতি প্রাকৃত মতবাদ এবং ন্যায়ের কূটযুক্তির আতিশয্যের প্রতি থাকবে তার একান্ত বিমুখতা। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান সব সাধারণ লোকেরই আছে। কিন্তু শিক্ষাব্রতী বিদ্বান ব্যক্তির পক্ষে এই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসবার আশঙ্কা থাকে। তার পক্ষে বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্কহীন মতবাদের আলোচনায় অত্যধিক মাত্রায় অভিনিবিষ্ট হওয়া ও তার ভিতরেই ডুবে থাকার সম্ভাবনা খুব বেশী। কিন্তু কোন বিবেচনাশীল ব্যক্তির পক্ষে তথা চৈনিক সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্ত কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে মতবাদ এবং আচার আচরণের আতিশয্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা একান্ত আবশ্যক। ইতিহাসজ্ঞ ফ্রুড (Froude) বলেছেন যে, অষ্টম হেন্‌রি তার পত্নী আরাগণের ক্যাথারিনের সঙ্গে যে বিবাহ বন্ধন ছেদন করেছিলেন, তার একমাত্র কারণ রাজনৈতিক প্রয়োজন। কিন্তু বিশপ ক্রেইটন (Bishop Creighton) -এর মতে তার কারণ অষ্টম হেনরির ইন্দ্রিয় সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বলে—সম্ভবতঃ উভয় কারণই বর্ত্তমান ছিল। আমার মনে হয় এই শেষের মতই সত্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী। পাশ্চাত্ত্য দেশে কোন বৈজ্ঞানিক হয় তো পিতৃ-পুরুষানুক্রমে দোষ-গুণাদির সমাগম এই মতবাদে অতিশয় অনুরক্ত; অপর কেউ হয় তো আবেষ্টনীর অনিবার্য্য প্রভাবের উপরেই অতিমাত্রায় বিশ্বাসী এবং উভয়েই আপন আপন মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করতে অগাধ বিদ্যা ও অত্যাশ্চর্য্য নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকেন। কিন্তু কোন প্রাচ্য দেশবাসী হয়তো মস্তিষ্কের অতিরিক্ত কসরতে প্রবৃত্ত না হয়েই সহজভাবে বলে দিবে যে, উভয় মতবাদেই কিছু না কিছু সত্য নিহিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনো চীনবাসী সাধারণতঃ যে রায় দিবে তার নমুনা এই:—"অমুক ব্যক্তির মতই ঠিক, তবে অপর ব্যক্তির মতও ভুল বলা যায় না।"

এরূপ স্বয়ংপূর্ণ ভাব কখনো কখনো যুক্তিবাদী মনের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। কেননা বিবেচনাশীল মন সর্ব্বাবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে, কিন্তু যুক্তিবাদী মন সময় সময় তা হারিয়ে বসে। সমস্ত বস্তু জগৎকে কেবল মাত্র কতগুলি মোচাগ্রবৎ মূর্ত্তি, সমতল ক্ষেত্র ও কোন বিশিষ্ট সরল রেখার সমষ্টি হিসেবে দেখা যেতে পারে। এরূপ মন্তব্য যে যুক্তিসঙ্গত, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পিকাসোর মত (Pecasso) এই মন্তব্যকে চিত্রকলায়

প্রতিফলিত করার চেষ্টায় নিযুক্ত হওয়া কোনো চীনবাসীর পক্ষে একেবারেই অচিন্তনীয় ব্যাপার। সম্পূর্ণ নির্ভুল অটুট যুক্তি এবং ন্যায়ের কূট তর্ক সমন্বিত মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের একটা স্বাভাবিক অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা আছে। সাধারণ কাণ্ড-জ্ঞানই হচ্ছে মতবাদের এরূপ নৈয়ায়িক স্বেচ্ছা-চারিতার শ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ প্রতিকার। বারট্রাণ্ড রাসেল খুব সুন্দর করে কথাটা বলেছেন যে, শিল্পকলায় চৈনিক প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে অতিরম্যতা বা লাবণ্য সৃষ্টি এবং ব্যবহারিক জীবনে সর্ব্বত্র বিবেচনাশীলতার প্রতিফলন।

সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানকে এরূপ বহু মান দেওয়ার ফল হচ্ছে চিন্তা ও কার্য্য—মতবাদ ও আচার-আচরণে সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যের প্রতি বিতৃষ্ণা। এরই স্বাভাবিক পরিণতিতে উদ্ভূত হয়েছে এই মতবাদ যে মধ্যপথই শ্রেষ্ঠ পথ। প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা বলতেন—'অত্যধিক কিছুই ভাল নয়'। চৈনিকদের এই মধ্যপথের অর্থও তা-ই। মিতাচার শব্দের চৈনিক তর্জ্জমা হচ্ছে চুংহো (Chungho)। এ কথার মানে হচ্ছে "অনাতিশয্য এবং সুসঙ্গতি"। 'সংযম' কথার চৈনিক তর্জ্জমা 'চিয়ে' (Chieh)। তার অর্থ "পরিমিত পরিমাণে দমন"। স্বকিং (Sheiking) নামক কনফিউসিয়াসের লেখা সংগ্রহের ঐতিহাসিক অংশ বিভাগে প্রাচীন চীনের রাজনৈতিক ইতিহাস সংগৃহীত হয়েছে বলে ধরা হয়। তার মধ্যে আছে সম্রাট ইয়াও (Emperor Yao) সম্রাট শুন (Emperor Shun)-এর হাতে রাজ্য ভার ছেড়ে দেওয়ার সময়ে বলেছিলেন "মধ্যপথের পথিক হও"। মেন্‌সিয়াস্‌ (Mencius) বলেছেন আর একজন আদর্শ সম্রাট তাং (Tang)-এর কথা যে তিনি সর্ব্বদা মধ্যপথ অনুসরণ করে চলতেন। কথিত আছে এই সম্রাট কোন একটা ব্যাপারে কি কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে সব রকমের পরামর্শ মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। তার পরে যে সব পরামর্শ একে অন্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, তা যত্নের সঙ্গে তোলাপাড়া করে মাঝামাঝি একটা সূত্র অবলম্বন করে জন সাধারণের অনুসরণীয় পথ দেখিয়ে দিতেন; তার মানেই হচ্ছে তিনি দুই বিপরীত মতের প্রত্যেকের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ গ্রহণ করতেন এবং পঞ্চাশ ভাগ বাদ দিতেন। এই মধ্য পথের গুরুত্ব চৈনিকদের কাছে এত বেশী যে তারা তাদের দেশকেও মধ্যরাজ্য আখ্যা দিয়েছে। এই কথাটা শুধু যে একটা ভৌগলিক সংস্থান নির্দ্দেশ করে, তা নয়। এটা মূলতঃ জীবনেরই পথ-নির্দ্দেশক, যে পথকে বলা হয়েছে জীবন যাত্রার মধ্যপথ। এই পথই হচ্ছে সত্যিকার মানবতার পথ,

সহজ স্বাভাবিকতার পথ। চৈনিকদের দাবী, যেমন দাবী করেছেন এ দেশের প্রাচীন মনীষীরা যে, এই পথ আবিষ্কার করে তারা সর্ব্বপ্রকার দার্শনিক মতবাদের মূল সত্য আবিষ্কার করেছে।

মধ্যপথের এই মতবাদ সর্ব্বব্যাপক এবং সর্ব্বপ্রকার সমস্যা ও সন্দেহ নির্ব্বাপক। এই মতবাদ অন্যান্য সব মতবাদের আঁট সাঁট বাঁধন আলগা করে দেয় এবং সব ধর্ম্মের ধ্বংস সাধন করে। কোন বৌদ্ধ পুরোহিত বা শ্রমণ হয়তো বস্তুর অনস্তিত্ব এবং জীবনের অসারত্ব সম্বন্ধে অটুট যুক্তি প্রমাণের অবতারণা করতে পারেন। কিন্তু তার সঙ্গে তর্ক বিচারে কোন কনফিউসীয় মতাবলম্বী খাঁটি বস্তুতান্ত্রিকের মত শুধু বলবে—অযৌক্তিক হলেও বলবে—"আপনার মতো যদি সবাই সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়, তবে এই জগৎ, মনুষ্য সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার কি হবে?" কথাটা অযৌক্তিক হলেও মানুষের জীবন যাত্রার দিক থেকে কথাটা যে যথেষ্ট মূল্যবান এবং মানুষের মনও যে এই কথাটায়ই বেশী সায় দিবে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। শুধু বৌদ্ধ ধর্ম্ম নয়—যে কোনো ধর্ম্ম, যে কোনো মতবাদের সত্যাসত্য জীবনের এই অব্যর্থ কষ্টি-পাথরের নিকষে যাচাই হয়ে যায়। সব সময়ে যুক্তিসঙ্গত মতবাদ নিয়েই আমাদের জীবন যাত্রা চলে না। বস্তুতঃ মনের কতগুলি ধারণা নিয়ে তোলাপাড়া করতে করতে যখন তা এক রকমের মানসিক ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়, তখনই মতবাদে পরিণত হয়। সব মতবাদেরই সৃষ্টি এই ভাবেই হয়েছে। তাই ফ্রয়েডীয় মতবাদ ফ্রয়েডের মনের ব্যাধি এবং বৌদ্ধ মতবাদ বুদ্ধের মনের ব্যাধি বিশেষ। ফ্রয়েডেরই হোক, বুদ্ধেরই হোক, সব রকম মতবাদেরই উদ্ভব হয়েছে অতিরিক্ত ভাব-প্রবণতার মিথ্যা বিভ্রম থেকে। মানুষের দুঃখ কষ্ট, বিবাহিত জীবনের ঝঞ্ঝাট, সর্ব্বাঙ্গ ছেয়ে ব্রণ সমন্বিত ভিক্ষুকের বীভৎস দৃশ্য, রোগীর রোগ যন্ত্রণা ও গোঙানি এইসব দেখে আমাদের মত সাধারণ লোক দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সব ভুলে যায় এবং মনের স্বাস্থ্যের পক্ষে সেইটেই হিতকর। কিন্তু এইসব দৃশ্যে বুদ্ধের অত্যধিক উত্তেজনা-প্রবণ স্নায়ুমণ্ডলী এমন দ্রুত তালে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে যে, তার ফলেই তিনি নির্ব্বাণের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন। অপর দিকে কনফিউসীয় মতবাদ হচ্ছে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাদের পক্ষে বুদ্ধের মতো অতটা ভাব-প্রবণ হওয়া সম্ভবপর নয়। সম্ভবপরই

যদি হোতো তবে মানুষের সমাজ সংসারই টিকতো না—খান খান হয়ে ভেঙে পড়তো।

মধ্যপথের প্রয়োগ-প্রণালীর দৃষ্টান্ত জীবনের ও জ্ঞানের সব ক্ষেত্রেই মিলবে। যুক্তিসঙ্গত কারণে কোনো মানুষেরই বিয়ে করা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবের দিক থেকে দেখলে সকলেরই বিয়ে করা উচিত। কন্‌ফিউসীয় মতবাদও তাই বিয়ে করতেই সকলকে বলে। যুক্তি বলে—সব মানুষই সমান, কিন্তু বাস্তব জীবনে দেখা যায়, তা নয়। তাই কন্‌ফিউসীয় মতবাদ প্রভুত্ব ও আনুগত্যের সম্পর্ক স্বীকার করে নিতে বলে। যুক্তিবলে পুরুষ মেয়ের কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়, কিন্তু কার্য্যতঃ তা আছে দেখা যায়। তাই কন্‌ফিউসীয় মতবাদ স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য স্বীকার করে নিতে বলে। মোৎসে (Motse)-এর মতো দার্শনিক বলেন "সব মানুষকেই ভাল বাসা উচিত", আবার ইয়াং চু (Yang chu)-এর মতো আর একজন বলেন "মানুষ কেবল মাত্র নিজেকেই নিজে ভালবাসতে পারে"। কিন্তু কনফিউসীয় মতাবলম্বী মেন্‌সিয়াস (Mencius) মনে করেন উভয় মতই বর্জ্জনীয়। তিনি শুধু বলেন—"মাতা পিতার প্রতি ভক্তি করো"। কথাটা অতি সাধারণ অথচ অতিশয় সঙ্গত। কোন দার্শনিক ইন্দ্রিয় নিগ্রহেই বিশ্বাস করেন, কেউ হয় তো যথেষ্ট ইন্দ্রিয় সুখ ভোগই ভাল মনে করেন, কিন্তু জুস্থু (Jzussu) বলেন সব বিষয়েই ইন্দ্রিয়-সংযম অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রী পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধের বিষয়ই ধরা যাক। এ সম্বন্ধে দ্বিবিধ মতবাদ দেখা যায়—একটা অপরটার ঠিক উলটো। একটার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ক্যালভিনের মত ও বৌদ্ধ মত। এই মত অনুসারে স্ত্রী পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ পাপের নিদান, যার স্বাভাবিক পরিণতি সন্ন্যাস অবলম্বন। অপর মত হচ্ছে যাকে বলে স্বাভাবিকতার উপাসনা। এই মতে পুরুষের পুরুষত্বের—তার প্রজনন-প্রবৃত্তিরই মহিমা কীর্ত্তন করা হয় এবং বর্ত্তমান যুগের মানুষ সাধারণতঃ মনে মনে যে এই মতেরই পক্ষপাতী তাতেও সন্দেহ নেই। আধুনিক কালের মানুষের মনে যে একটা অস্থিরতার ভাব দেখা যায় তাও এই দুই বিপরীত মতের সংঘর্ষেরই ফল। হ্যাভেলক ইলিসের মতো (Havelock Ellis) যারা সুস্থ ও সদ্‌বুদ্ধি সঞ্জাত মত পোষণ করেন এবং বলেন যে স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলন আকাঙ্ক্ষা নিতান্তই সঙ্গত ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, তারা মূলতঃ প্রাচীন গ্রীক মনীষীদের মতই সমর্থন করেন, যে মত

প্রকৃত-পক্ষে, সম্পূর্ণ রূপে মানবের স্বভাব-সঙ্গত মত—মানবতার ধর্ম্ম-সঙ্গত মত।

কনফিউসীয় মতে স্ত্রী পুরুষের দৈহিক মিলন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কর্ত্তব্য কার্য্য। শুধু তা-ই নয়, এর উপরে মানুষের বংশ রক্ষা ও জাতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে বলে এই মিলন প্রত্যেক লোকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, কর্ম্ম। ইয়েসাও পাওইয়েন (Yehsao Paoyen) নামক চৈনিক উপন্যাসে এ সম্বন্ধে যেরূপ অভিমত পাওয়া যায়, আমার বিশ্বাস সেরূপ সুস্থ এবং যুক্তিসঙ্গত অভিমত আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সে অভিমতে কন্‌ফিউসীয় মত-বাদকেই সমর্থন করা হয়েছে। এই বইতে যতি সন্ন্যাসীদের লাম্পট্য ও ব্যভিচারের গোপন ঘটনা উদ্‌ঘাটনে লেখক সবিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করছেন। উপন্যাসের নায়ককে দাঁড় করানো হয়েছে একজন কন্‌ফিউসীয় অতিমানবরূপে, যার প্রধান কাজই হচ্ছে সর্ব্বত্র ঘুরে ঘুরে যে কোনো ডাকাতের দলের যুবক যুবতীগণকে তাদের পিতৃ পুরুষগণের গৌরব বর্দ্ধনার্থ বিবাহে ও সন্তান উৎপাদনে রাজি করানো। চিন পিন্‌মেই (Chin Painmei) নামক চৈনিক উপন্যাসখানাতেও এরূপ ব্যভিচারের সবিস্তার বর্ণনা আছে। কিন্তু যে সব মেয়ে পুরুষের চরিত্র তাতে অঙ্কিত হয়েছে, তা বিশেষ উঁচুদরের নয়। কিন্তু ইয়েসাও পাওইয়েনে বর্ণিত মেয়ে পুরুষের আচার ব্যবহার সবই যথেষ্ট সুরুচি-সঙ্গত এবং তাদের প্রত্যেকেই আদর্শ স্ত্রী বা আদর্শ স্বামী বলে গণ্য হওয়ার উপযুক্ত। তবু যে এ উপন্যাসখানাকেও অশ্লীল বলা হয়ে থাকে, তার কারণ হচ্ছে এই যে, বইতে মেয়ে পুরুষ সম্পর্কের গোপনীয় ঘটনাবলির এমন সব বে-অব্রু বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তা আধুনিক মানুষের পক্ষে বিশেষ রুচি-সঙ্গত হয়নি। মোটের উপর বইটা পড়ে যে ধারণা হয়, তা হচ্ছে এই যে, বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিবাহ ও ঘর সংসার করার পক্ষে অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন ও মাতৃত্বের মহিমা কীর্ত্তন। স্ত্রী পুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ বিষয়ে এই মত হচ্ছে ইন্দ্রিয়াসক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ কনফিউসীয় মতবাদের একটা দিক মাত্র। কনফিউসিয়াসের পৌত্র (Jzussu) তার চুং ইয়ুং (Chung yung-মধ্যপথ) নামক বইতে এই ইন্দ্রিয়াসক্তি সম্বন্ধে কনফিউসীয় মতবাদের যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। তিনি সাত প্রকারের ইন্দ্রিয়াসক্তির বর্ণনা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক বিষয়ে যথোচিত সংযম অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন।

এরূপ সংযম অবলম্বন করে চলা যে খুবই শক্ত কথা তা প্রমাণিত হয়

প্রাচ্য দেশীয়েরা যাকে বলে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের আতিশয্য তা দ্বারাই। মানুষ কেমন যেন অতি সহজেই জাতিয়তাবাদ ফ্যাসীবাদ সমাজতন্ত্রবাদ অথবা সাম্যবাদের ক্রীতদাস হয়ে পড়ে এবং ভুলে যায় যে মানুষের জন্যই রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়। অথচ এই সব মতবাদ আধুনিক কেন্দ্রীভূত শিল্প-ব্যবস্থার আতিশয্যের ফল ছাড়া আর কিছু নয়। সাম্যবাদী রাষ্ট্রে মানুষকে দেখা হয় কোন বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বা রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসেবে। মানব জীবনের সত্য আদর্শ সম্বন্ধে কনফিউসীয় মতবাদ যে গ্রহণ করেছে, সে কখনই এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষপাতী হতে পারে না। এরূপ নাম করা বিভিন্ন মতবাদের প্রচলন সত্ত্বেও মানুষ তার বেঁচে থাকবার ও সুখ অন্বেষণের নিরঙ্কুশ অধিকার দাবী ও তার প্রতিষ্ঠা করবেই। কেন না যে কোন রকমের রাজনৈতিক অধিকারের চেয়ে মানুষের জীবনে সুখ ও আনন্দ লাভের অধিকার অনেক বড়। চীন দেশে যদি ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপরও হয়, তবে চীনের যে কোনো শিক্ষিত লোককে এ কথা বুঝানো খুবই শক্ত হবে যে, ব্যক্তির কল্যাণের থেকে সমগ্র জাতির দ্বিধাহীন প্রতিবাদহীন সংঘবদ্ধতা কাম্য। যখন ফিয়াংশিতে (Fiangse) সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, তখন সে প্রদেশের প্রকৃত অবস্থা যে নিগূঢ়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে, তার মনে আর লেশমাত্র সন্দেহও থাকতে পারে না যে, চীনবাসীদের পক্ষে সাম্যবাদ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। প্রমাণ স্বরূপ সে ফিয়াংসির তখনকার অবস্থা দেখিয়ে বলবে যে, অন্যান্য প্রদেশের সামন্ততন্ত্রের অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলা থেকে কিংয়াসির অবস্থা অনেকটা ভালো হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার সাধারণ সমাজ-ব্যবস্থা মানবীয় ভাবুকতার সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং জীবন-যাত্রা কলের মত অটুট নিয়মের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত।

ক্রমশঃ

সেমিয়ন মালেন্‌কি ঃ
আরেকজন প্রাচীন রুশ ভারত-পথিক
॥ শ্রীজি, কুরিলেন্‌কো ॥
(তাস নিউজ এজেন্সী কর্তৃক প্রেরিত)

দুঃসাহসী বণিক ও প্রতিভাবান লেখক আফানাসি নিকিতিনই প্রথম রাশিয়ান যিনি পাঁচ শত বৎসর পূর্বে "বিস্ময়ের দেশে" পৌছান। তিনিই ভারতবর্ষে তাঁহার তিন বৎসর অবস্থান কালে রুশ-ভারত মৈত্রীর প্রথম অঙ্কুর রোপণ করিয়া আসেন।

নিকিতিনের প্রত্যাবর্তনের পরে মাস্কোভির গভর্ণর ও কতিপয় উৎসাহী রুশ বণিক ভারতবর্ষের সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও ভারতের সহিত ব্যক্তিগত ব্যবসাবাণিজ্য সংগঠনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করেন। মসলিন, কাশ্মিরী শাল, নীল, চিনি ও মশলার জন্য ভারত তখন জগৎ-বিখ্যাত ছিল। কিন্তু হিন্দুস্থানে গমনাগমনের পথ তখন দুর্গম। কত সাগর, পর্বত ও মরুভূম ভারতবর্ষকে রুশিয়ার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ইহা ছাড়াও ছিল পরস্পরের সহিত বিবদমান প্রাচ্য রাষ্ট্রগুলির বাধা। এক কথায়, প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া ভারতবর্ষের পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

মাত্র জন কয়েক রুশ বণিকের ঐ সুদূর দেশে পৌছিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহাদের প্রায় কেহই তাঁহাদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। সুতরাং তাঁহারা বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছেন। উঁহাদের দুই-চারি জনের সম্পর্কে টুক্‌রা টুক্‌রা তথ্য এখনও পাওয়া যায়। যেমন, আমরা আজ জানি, যোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বণিক লিওন্‌তিয়ুদিন "বুখারেথ-এ (অর্থাৎ বুখারা ও মধ্য এশিয়ায়) ছিলেন এবং ভারতে ছিলেন সাত বছর।"

"সাতসমুদ্র তের নদী আর পাহাড় পর্বতের ওপারে" সুদূর ভারতবর্ষে যাওয়া বণিকদের পক্ষে ছিল সুকঠিন কাজ। মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে

নিয়মিত সংযোগ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে রুশ গভর্ণমেণ্ট হিন্দুস্থানে কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। সঙ্গে বন্দুকধারী পাহারা থাকা সত্ত্বেও বহুকাল সেই চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। মধ্য ও নিকট প্রাচ্যের নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধবিগ্রহ প্রত্যেক পর্যটকেরই পথ বিঘ্ন-বহুল করিয়া তুলিয়াছিল। ১৬৭৬ সালে ইউসুফ কাসিমফের নেতৃত্বে এক কূটনৈতিক ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদল মধ্য এশিয়া ও হিন্দুকুশের গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া কাবুলে পৌছিতে সক্ষম হন। আফগানিস্থান ও মোগল সম্রাটের মধ্যে তখন যুদ্ধ চলিতেছিল বলিয়া কাসিমফ আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ১৬৭৮ সালে তিনি মস্কোয় ফিরিয়া আসেন।

এই সব ব্যর্থতায়ও রুশ গভর্ণমেণ্ট দমিলেন না। ১৬৯৫ সালে যুবক প্রথম পিটার ভারতবর্ষে আর একটি প্রতিনিধিদল পাঠান। এই দলের নেতা ছিলেন নির্ভীক বণিক কূটনীতিবিদ্ সেমিয়ন মাতিনোভিচ মালেন্‌কি।

প্রধানত "ফার" (সলোম পশুচর্ম) ও অন্যান্য বিবিধ পণ্য লইয়া মালেন্‌কি ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রথম পিটারের একখানি চিঠি তিনি সঙ্গে লইয়া যান। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পিটার সেই চিঠিতে ভারত-সম্রাটের নিকটে উভয় দেশের পক্ষে লাভজনক বাণিজ্য-সম্পর্কের প্রস্তাব করিয়া জানান, রুশ বণিকরা ভারতে বিশেষ সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে এবং ভারতীয় বণিকরাও অনুরূপ সুযোগসুবিধা ভোগ করিবে রুশিয়ায়।

মালেন্‌কি তাঁহার দলবল ও সশস্ত্র পাহারা সঙ্গে লইয়া মস্কো ত্যাগ করেন। মোট বিশ জন লোকের এই দলটি ভারতের সহিত সংযোগের মুখ্য স্থলবিন্দু আস্ত্রাখানে গিয়া পৌছায়। সেই সময় প্রায় একশত ভারতীয় বণিক ও কারিগর আস্ত্রাখানে স্থায়ী বসবাস স্থাপন করিয়াছিল। মালেন্‌কি ইহাদের মধ্য হইতে একজন দোভাষী সংগ্রহ করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য। যে পথ দিয়া একদিন নিকিতিন গিয়াছিলেন সেই সুদীর্ঘ বিচিত্র পথে যাত্রা সুরু হইল আস্ত্রাখান হইতে। রুশ যাত্রীদল সমুদ্র পথে বাবুর উপকূলে পৌছিলেন। সেখানে অর্থগৃধ্নু শেমাখ খাঁ তাঁহাদের ছয় মাস আটকাইয়া রাখেন। মূল্যবান সলোম পশুচর্ম খণ্ডের বিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করিয়া ঐ দলবল স্থলপথে ৪৫ দিনে তৎকালীন পারস্যের রাজধানী ইস্‌পাহানে পৌছান: পারস্যের খাঁন তাঁহাদের সহৃদয় স্বাগত জানান। পারস্যে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া ও সেখানে তাঁহার কূটনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করিয়া অতঃপর

মালেন্‌কি দলবল সহ দক্ষিণদিকে লীলায়ুবু পারস্য উপসাগরের উপকূলে পৌছান। তাঁহারা এবার উপনীত হইলেন বন্দর-নগরী আব্বাসে। আব্বাস বন্দরের ওপরে "গুরমিজ দ্বীপে" অবস্থিত বিখ্যাত নগরী গুর্মুজ। এই নগরীই কাব্যমণ্ডিত হইয়া আছে "সাদ্‌কো" গীতিনাট্যে। এই নগরী হইতেই একদা নিকিতিন জলপথে "বিস্ময়ের দেশ" অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

আব্বাস বন্দরে কিছু দিন থাকার পরে সোনার হিন্দুস্থানে যাইবার জন্য উদ্‌গ্রীব রুশরা জলপথে পূর্বদিকে যাত্রা করে। অনুকূল বাতাসের কল্যাণে বিশ দিনের মধ্যেই জাহাজ বহুকাল-বাঞ্ছিত ভারতবর্ষের উপকূলে পৌছিল। ১৬৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে জাহাজখানি আসিয়া ভিড়িল সুরাট বন্দরে।

দিন কয়েক অচেনা সুরাটের সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া রুশ দলটি ভারত সম্রাটের তৎকালীন প্রশাসনিক কেন্দ্র বুর্হানপুরের দিকে অগ্রসর হয়। তিন মাস পথ চলার পর ঐ ছোট সহরটির মীনারগুলি চোখে পড়িল। সেমিয়ন মালেন্‌কি ও তাঁহার দলবলকে বৃদ্ধ সম্রাট ঔরঙ্গজেব ভালোভাবেই গ্রহণ করেন। তিনি ঐ বিদেশীদের আদরযত্নের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি রুশ বণিকদের বিনা শুল্কে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দেন। "সমস্ত রুশদের জারকে—তাঁহার রুশ ভাইকে" সম্রাট ঔরঙ্গজেব একটি হাতী উপঢৌকন পাঠান।

ভারত সম্রাটের দরবারে এক বৎসর কাটাইয়া মালেন্‌কি ও তাঁহার দলবল ব্যবসাবাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ভারত সফর করেন। তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের বহু সহর ও গ্রাম পরিদর্শন করেন। তাঁহারা দিল্লীর পরে আগ্রায় গিয়া মধ্যযুগীয় ভারত-স্থাপত্যের মধ্যমণি বিখ্যাত তাজমহল দেখেন।

রুশ পর্যটকদের ভারতবর্ষ খুব ভাল লাগে। পরে মস্কোতে এই প্রতিনিধি দলের একজন অভিমত জানান: "ভারতবাসীরা শান্ত প্রকৃতির লোক, হৃদয়বান, সামাজিক ও ব্যবসাবাণিজ্যের ব্যাপারে সৎ।"

এই অতিথিপরায়ণ দেশে চার বৎসর কাটাইবার পর, ১৭০১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এই পর্যটকগণ চিনি, আদা, গুড়, কোকো, রঞ্জন দ্রব্য ইত্যাদি নানা জিনিসে বোঝাই দুইটি জাহাজে চাপিয়া স্বদেশের দিকে রওনা হন।

এবারে আর আমাদের এই যাত্রীদলের প্রতি ভারত-মহাসমুদ্র ততোটা সদয় হয় নাই। ছয় সপ্তাহ ধরিয়া জাহাজ দুইটি উত্তাল সমুদ্রে ভাসিয়া চলিবার পরে তাঁহারা পারস্য উপসাগরের দুই তীর দক্ষিণে বামে অস্পষ্টভাবে

দেখিতে পাইলেন। কিন্তু এখানে আবার তাঁহারা ভয়ঙ্কর মস্কট-জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং জিনিস-বোঝাই একটি রুশ জাহাজ এই জলদস্যুরা দখল করিয়া লয়। কিন্তু সেমিয়ন মালেন্‌কি ও তাঁহার সঙ্গীদলের অধিকাংশই ছিলেন দ্বিতীয় জাহাজটিতে। তাঁহারা আব্বাস বন্দরে আসিয়া পৌঁছাইতে সমর্থ হন—এই আব্বাস বন্দর হইতেই তাঁহারা চার বৎসর পূর্বে ভারত-যাত্রায় রওনা হইয়াছিলেন।

আহত সঙ্গীগণ সুস্থ হইয়া উঠিবার পরে, এখান হইতে তাঁহারা দক্ষিণ-ইরাণের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্য দিয়া ক্লান্ত পথ ধরিয়া উত্তর মুখে চলিলেন। আরেকবার তাঁহাদের চোখে পড়িল গাছ-গাছালির শ্যামল-শোভাময় বন্ধুত্বে ঘেরা ইস্‌পাহান শহর।···শেষ পর্য্যন্ত দিগন্তের ওপারে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন ককেশাসের তুষারশুভ্র চূড়াগুলি।

১৭০১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকাল শেষ হইয়া আসিতেছে; যাত্রীদল আজের-বাইজানের এই সামন্ত-প্রভুদের অশান্তিময় দেশ অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু আবার এখানে তাঁহাদের এক দুর্দৈবের সম্মুখীন হইতে হইল। নিদারুণ ক্লান্তিতে আর শারীরিক কষ্টের ফলে দলের নেতা মালেন্‌কি ও তাঁহার সহকারী আনিকিফ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং শেমাখ্‌ শহরে তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিল।—এই অভিযানের প্রারম্ভে তাঁহারা শেমাখ্‌ শহরের মধ্য দিয়াই গিয়াছিলেন।

দুই প্রিয় সাথীকে সমাধিস্থ করিবার পর দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে এই প্রতিনিধিদল ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে হেমন্তকালের শেষের দিকে স্বদেশের সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। শেষে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, পাঁচ বছরেরও বেশি অনুপস্থিত থাকিবার পরে, যাত্রীদল মস্কোর মাটি স্পর্শ করিলেন।

এইভাবে, আড়াই শতাব্দী পূর্বে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে প্রথম নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ও বানিজ্যিক লেনদেন স্থাপিত হয়। রুশ ও ভারতীয় জনগণের মধ্যে এই বন্ধুত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বাড়িয়াই চলিয়াছে।

মন্দিরের মূল্য

॥ শ্রীজগন্নাথ সাহা ॥

ব্যারিষ্টার শ্রীঅমরনাথের দ্বিতীয় পুত্র অমিয়নাথ। দুইবার ম্যাট্রিক ফেল করিয়া তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই বয়স কুড়ির কোঠায় পা দিয়াছে—সঙ্গীর সংখ্যাও অনাহুত ভাবে বাড়িয়াছে।

অমিয়নাথের লেখাপড়ায় প্রধান বিঘ্ন সময়ের অভাব। মাষ্টার মহাশয় পড়িতে বলেন ছয় ঘণ্টা। পিতাও পুত্রকে উপদেশ দেন। অমিয়নাথ কান দিয়া শোনে। মন দিয়া করেনা কিছুই।

"—কোথায় গিয়েছিলে ?"

অমিয়নাথ নিরুত্তর।

"—রাত কটা বাজে ?"

"—সাড়ে দশটা—"

"—এত দেরী হোল কেন ?"

"—মিণ্টুদের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল।"

"—নেমন্তন্নটা কিন্তু ব্যারিষ্টার অমরনাথের ছেলেকেই করে—অমিয়নাথকে করে না, কথাটা ভুলোনা যেন—" সাবধান করিলেন পিতা।

বাস্তব পটভূমিকায় কথাটা সত্য। মনোহারী দোকান হইতে সিনেমা হল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অমিয়নাথের অবাধ গতি। সকলেই জানে ব্যারিষ্টার সাহেবের ছেলেকে ধারে মাল দিলেও দামের ভাবনা নাই। অমিয়নাথের ধারণা ঠিক বিপরীত। সে ভাবে মানুষ তাহাকেই সম্ভ্রম করিয়া চলে।

পয়লা জানুয়ারী। শিবপুর বোটানিক্যাল উদ্যানে ভোজের আয়োজন। অমিয়নাথের পাতে আস্ত মুড়া আর জোড়া সন্দেশ—দৈ দেবার বেলাও অমিয়নাথকে নূতন পাতিল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্যারিষ্টার সাহেবের ছেলে অমিয়নাথ বসুপরিবারের উত্তরাধিকারী কিনা !

"—মা, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রী আমায় যেতে বলেছেন তাঁর মেয়ে দীপালীর গান শুনতে—"

"—কবে ?"

"—আজ বিকেলে—"

"—বেশ্ তো, যা না—"

দিবানিদ্রার শেষ বেলা ব্যারিষ্টার সাহেবের কানে গেল মা ও ছেলের এই কথাবার্ত্তা। বাহিরে আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন—

"—গিন্নি! তোমার আদুরে দুলালকে বলো মন্দিরের ভেতরেই বিগ্রহের দেবত্ব—বাইরে পুতুল।"

পরদিন। অমিয়নাথ হাইকোর্টে গিয়াছে। ছুটির পথে পিতাকে লইয়া হ্যামিল্টনের বাড়ী হইতে হীরার আংটী কিনিবে।

"—নমস্কার—" সম্ভাষণ জানাইলেন স্যুট্‌কোট পরিহিত এক ভদ্রলোক ব্যারিষ্টার অমরনাথকে।

"—নমস্কার! কেমন আছেন।"

"—ভাল—"

"—কি কোরবেন ঠিক কোরেছেন ?"

"—রেজিষ্ট্রারের পদ পেয়েছিলাম। কিন্তু সিটি কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে নেমে রেজিষ্ট্রার হ'তে চাইনি—দেখা যাক্ কি হয়। আচ্ছা, নমস্কার—"

ব্যারিষ্টার সাহেবের মুহুরী পাশে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। প্রশ্ন করিল "—স্যার, এই ভদ্রলোকটী কে ?"

"—ইনিই সিটী কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীবি. সি. ঘোষ—"

"—ওঃ, তাইতো চেনা চেনা মনে হচ্ছে।"

"—তাতো হবেই ; মন্দিরের বাইরে এসেছে কিনা—চেনবার জো নেই, মূল্যও নেই—"

পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন "—বুঝলে অমিয়নাথ, আমার মন্দিরে আছ বলেই তোমার প্রতিষ্ঠা। মন্দির ভেঙ্গে পড়বার আগেই জাগ্রত দেবতা হও—নইলে হবে তুচ্ছ পুতুল। প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে মানুষ হও। বাইরে এসেছেন বলেই বারান্দার মানুষও প্রধান বিচারপতিকে চিনতে পারলে না —মন্দিরের মূল্য অনেক—"।

বিপ্লবী ঈশ্বরচন্দ্র

॥ শ্রীঅনিল কুমার সমাজদ্দার ॥

বিদ্যাসাগরকে উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আখ্যা দিলে ভুল হবে না। সমাজের যে পরিবেশ ছিল তখনকার যুগে, সেই পরিবেশে তিনি ছিলেন সত্যই বিপ্লবী, বিশেষ করে বর্ণ বৈষম্যপূর্ণ সমাজের মধ্যে। রামমোহন আর বিদ্যাসাগরের সামাজিক পরিবেশ এক ছিল না।

ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশব হইতেই কঠোর জীবন-সংগ্রাম সুরু। গ্রাম্য জীবন হতে মহানগরীর ছাত্র-জীবন এক টানা দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণের মধ্য দিয়েই কেটেছে। পিতার কঠোর অনুশাসন, অভাব-অনটন সবই ঐতিহাসিক কাহিনী। ছোট বেলা হতেই সমাজের ঘোর অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। অধ্যাত্মবাদের আবিলতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে তিনি বাস্তব জীবনের সমস্যার প্রতি আকৃষ্ট হ'ন।

এই হতভাগ্য দেশকে তার পংকিলতার বদ্ধ জলাভূমি হ'তে শুকনো বাস্তব ভূমিতে নিয়ে আসবার জন্য অশেষ চেষ্টা করেন। ছাত্র জীবনের সাফল্য লাভের পর তিনি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন এবং শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, ক'লকাতার বাইরেও পড়ে রয়েছে বিরাট এক অনুন্নত জগৎ, বৃহৎ বাংলা—সেখানে নেই শিক্ষা-আলোক কিন্তু আছে অফুরন্ত কু-সংস্কারের গভীর আঁধার আর মিথ্যা গোঁড়ামী—বর্ণ বিদ্বেষ। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েই তিনি প্রস্তাব করলেন যে, সংস্কৃত কলেজে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই অধ্যয়ন করতে পারবে। পূর্বে শূদ্রের (অ-ব্রাহ্মণের) সংস্কৃত পাঠ এবং সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন নিষিদ্ধ ছিল।

তাঁর প্রস্তাব প্রকাশিত হবার সাথে সাথে কলিকাতার ব্রাহ্মণ সমাজের মাথায় যেন বজ্রপাত হ'ল। হৈ-চৈ পড়ে গেল চারদিকে, অটল বিদ্যাসাগর; কোন প্রতিবাদেই তিনি কান দিলেন না, নিজের প্রস্তাব কার্য্যকরী করলেন। প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ সমাজ পরাজিত হয়ে বিবরে প্রবেশ যদিও করলেন তথাপি সেখান থেকেও তাঁরা বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে গরল উদ্গীরণ করতে পরাঙ্মুখ হ'লেন না। নানা চক্রান্তে লিপ্ত হ'লেন তাঁরা।

কেবল মাত্র পুরুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকলেন না। স্ত্রীলোকদের সু-শিক্ষিতা করে গড়ে তুলতে না পারলে বাঙ্গালীজাতির উন্নতি নেই, সমাজের উন্নতির মূলে মায়েদের শিক্ষা একান্ত আবশ্যক —এ কথা সেইদিনই বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন।

পুরুষ-শাসিত সমাজ প্রতিক্রিয়াশীলতার স্তন্য রসে পরিপুষ্ট হয়ে এমনই আয়েসী হয়ে উঠেছিল যে, তাঁরা তাদের ঘরের মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে জ্ঞানালোক দানে বিরোধিতা করলো তীব্র ভাবে; অথচ তারাই নারীর প্রশস্তি গানে পঞ্চমুখ ছিল। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীর কথা বলে মেয়েদের উপদেশ দিতে দ্বিধা করতো না।

সংস্কৃত কলেজে অব্রাহ্মণ প্রবেশাধিকার পাবার পর যে সব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বিবরে প্রবেশ করেছিলেন—তাঁরা এবার আবার বের হলেন। নারী জাতির বহুদিন শৃঙ্খলিত জীবন-গতির মুক্তির আন্দোলনকে সংগত বলে সে কালের অনেক মহাপুরুষও স্বীকার করেন নি। তাঁরাও বিদ্যাসাগরের এ প্রচেষ্টাকে দুর্বল ও বিনষ্ট করবার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও তাঁদের সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি।

স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধিতার অনেকগুলি কারণও ছিল—তার মধ্যে প্রধান হল—স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের নামে মিশনারী পাদ্রীরা খৃষ্টান ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। ফলে অনেকেই ভীত হয়ে পড়েছিলেন। ফলে স্বর্গীয় রাধাকান্ত দেবের দলও বিদ্যাসাগরের বিরোধিতা করেছিলেন স্ত্রী শিক্ষায় পূর্ণ মত থাকা সত্ত্বেও। তবে তাঁর বিরোধ ছিল অন্য প্রকার। স্ত্রী-শিক্ষা আন্দোলন নিয়ে হিন্দু সমাজে মহা-আন্দোলন আরম্ভ হ'ল। পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালংকার স্ত্রী শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করবার জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করে ছিলেন; শুধু তাই নয়, প্রথমেই তিনি তাঁর কন্যাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলেন। "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ: মহানির্বাণতন্ত্রের এই বচনালঙ্কৃত বাণী নিয়ে নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের গাড়ী যখন রাজপথে বের হ'তো—তখন পথচারী হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো, আর নানা কুৎসা রটাতো। তা ছাড়া আমাদের সমাজের এতই নিম্নস্তরের সমাজপতিরা ছিলেন যে, তাঁরা কিশোরীদিগের উদ্দেশ্যে কতই না অশ্লীল এবং ইতরোচিত ভাষা প্রয়োগ করতেন ভাবলেও রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়।" [শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ" হইতে—পৃঃ ১৭২]

নাটুকে রাম নারায়ণ ও বাংলার রসিক কবি ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত হাল্কা রসিকতায় কলিকাতার বাজার সর গরম করে তুলে ছিলেন। তিনি স্ত্রী-শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লিখলেন—

"যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
এ, বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে॥
আর কিছু দিন থাক্‌রে ভাই। পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥"

স্বদেশীয়দের তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে সরকারী আনুকূল্যে নারী-মুক্তি (শিক্ষার)-আন্দোলনকে বিদ্যাসাগর আরও এক ধাপ এগিয়ে দিলেন—১৮৫৭ নভেম্বর থেকে মে ১৮৫৮ সালের মধ্যে মাত্র সাত মাসে তিনি কলিকাতার বাইরে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করে ফেললেন। সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মে সেদিন গোটা বাংলার আপাদমস্তক কুসংস্কারে আচ্ছাদিত হিন্দু সমাজের বিরাট প্রভাবযুক্ত ও শক্তিমান মানুষদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করা সহজ কথা নয়। বাধার পর বাধা এমন কি তাঁকে হত্যা করবার হীন ষড়যন্ত্র সব কিছুই অগ্রাহ্য করে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। বিধবার বিয়ে হিন্দু-শাস্ত্রসম্মত একথা তিনি সমাজের চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। শত বাধার পাহাড় তিনি ধুলিসাৎ করে দিলেন। এই সংগ্রাম জয়ে তাঁর বিজয়বার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হ'ল।

ধর্মকে ক্ষুদ্র সীমারেখায় টেনে এনে তিনি চলেন নি কোনদিন। সাম্প্রদায়িক ধর্মের ক্ষুদ্র গণ্ডীর চেয়ে মানুষের প্রাণ অনেক উর্দ্ধে তা তিনিই সর্বপ্রথম দেখান। ভাষার উন্নতি সাধনেও তিনি পিছিয়ে ছিলেন না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "চরিত্র পূজা"র পৃঃ ১৩-তে লিখেছেন—"বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম এবং যথার্থ শিল্পী ছিলেন, তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।···যতটুকু বক্তব্য ততটুকু সরল এবং সুন্দর করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে"। মোটামুটি বিপ্লবী বিদ্যাসাগরকে "বাঙ্গালী জাতির জনক" বললে ভুল হবে না নিশ্চয়ই।

সাময়িকী

নরনারায়ণ আশ্রমের ২৬-তম জন্মতিথি ঃ—বিগত ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ নরনারায়ণ আশ্রমের ২৬-তম জন্মতিথি আশ্রম অনাড়ম্বর গাম্ভীর্যের সঙ্গে উদযাপন করে। সন্ধ্যারতির পর শ্রীমৎ স্বামিজী গত দুই বৎসর এই দিনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার যেটুকু লিপিবদ্ধ করা ছিল, তাহা পাঠ করা হয়। ইহার পর নাম-কীর্ত্তন হয় এবং কীর্ত্তনান্তে হরির লুট দেওয়া হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এবং নিকটবর্ত্তী উদ্বাস্তু ক্যাম্পগুলি হইতে প্রায় ৬০।৭০ জন কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জীবন-সাধনা ঃ—আচার্য জগদীশ-চন্দ্র বসুর এই শুভ শততম জন্মদিনে আমরা তাঁহাকে আমাদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করি। বিজ্ঞান-তাপস জগদীশচন্দ্র আমাদের বাঙ্গালাদেশকে, ভারতবর্ষকে বিশ্বকে যাহা দিয়াছেন, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে, সমাদৃত হইয়াছে। তাঁহার সে বিজ্ঞানের আবিষ্কার বোঝা আমাদের শক্তির বাহিরে, আমরা দূর হইতে এজন্য তাঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রণতি জানাই। কিন্তু আজ তাঁহার এই শততম জন্মদিনে বসিয়া জীবন-তাপস দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের জীবনের কথা বার বার ধ্যান করিতেছি। মহা জীবনের জীবনধারা হইতে যে একটি দীপশিখা জ্বালাইয়া দিয়া বিধাতা তাঁহাকে এ সংসারে পাঠাইয়া ছিলেন, সে দীপশিখা চিরদিন অনির্বাণ জ্বলিয়াছে। কোন বাধা, কোন বিপত্তি, কোন ব্যর্থতায় সে দীপশিখা ম্লান হয় নাই। বিজ্ঞানের পরীক্ষাক্ষেত্রে কত ব্যর্থতা আসিয়াছে, কত অন্ধকার রাত্রির ঘনঘোর ঘটায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছে—তবু সে দীপশিখা অনির্বাণ জ্বলিয়াছে। আজ সেই অনির্বাণ জ্বলার কথা মনে করি। এমন করিয়া কয়জন জ্বলিতে পারেন? যাহারা পারেন তাঁহারাই কালোত্তীর্ণ জীবন লাভ করেন। মনে হইতেছে বর্ত্তমান সময়ে জনসাধারণের শিক্ষার সংখ্যা ও মানদণ্ড অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া অনির্বাণ জ্বলার মানুষ কমিয়া গিয়াছে। আমরা কেমন নির্জীব, শুধুমাত্র কেবল দিন যাপন করি। জোরালো প্রাণের তেজ আজ জাতির সর্বসাধারণের মধ্যে একেবারেই দেখা যায় না। বাধা, বিপত্তি, অকৃতজ্ঞ শীতল আবেষ্টন—সমস্তই

জগদীশচন্দ্রের ছিল এবং বেশ তীব্রভাবেই ছিল। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মধ্যে একটি জীবন-দার্শনিক ছিলেন যিনি এই সমস্ত বিপর্যয়কে যে মনোবৃত্তির অনির্বাণ দীপ্তির মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেই জীবন-দার্শনিক জগদীশচন্দ্রকে আজ স্মরণ করি। বৈজ্ঞানিক অনেকই আছেন—কিন্তু জীববিজ্ঞান বা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন-বিজ্ঞানের দর্শনকে যিনি প্রাণের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কয়জন আছেন? জগদীশচন্দ্র তেমনই একজন, সেই জগদীশচন্দ্রকে আমরা স্মরণ করি। তাঁহার শততম জন্মদিনে তাঁহার বিজ্ঞান সাধনার কথা যেমন আমরা তুলিয়া ধরিতেছি, তেমনই তাঁহার জীবন-সাধনার কথাও যেন আমরা স্মরণ করি, জাতির ভবিষ্যৎ যে শিশু-সমাজ সেই শিশু-সমাজের কাছে যেন তুলিয়া ধরি'।

নরনারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘে নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস ঃ বিগত ১লা ডিসেম্বর নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস' উপলক্ষে নর-নারায়ণ আশ্রম সঙ্ঘ বয়স্ক মহিলা শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে সকাল বেলায় চারটী বিভিন্ন দল জগৎপুর ও কেষ্টপুর গ্রাম, বাগজোলা ক্যাম্পগুলির কিছু, বাগুইআটী গ্রামের বাগুইপাড়া ঘোষপাড়ায় বয়স্ক মেয়েদের লেখাপড়া এবং সকল মেয়েদেরই সেলাই শিক্ষার জন্য আহ্বান ও আবেদন জানান হয়। জগৎপুরে ২৫ বাড়ীতে, কেষ্টপুর গ্রামে প্রায় ৩০ জন লোকের একত্র সমাবেশে, বাগজোলা ক্যাম্পগুলির অন্ততঃ ৫০টী ক্যাম্পে এবং বাগুইপাড়া, ঘোষপাড়া মিলাইয়া অন্ততঃ ৩০ বাড়ীতে কর্মীরা আলোচনা চালান। আশ্রম কর্মীরা ৭।৮ জন এবং স্থানীয় ছাত্রসঙ্ঘের ৩।৪টী ছেলে মিলিয়া চারটী দলে বিভক্ত হইয়া আলোচনা করেন। এক এক দল প্রায় ২৫।৩০টী বাড়ীতে যান। তন্মধ্যে কেষ্টপুর গ্রামে ৪।৫টী বাড়ীতে যাওয়ার পর ২৫।৩০ জনকে একত্র আহ্বান করিয়া আলোচনা চালান হয় এবং ক্যাম্পগুলিতে যে দল গিয়াছিলেন তাঁহারা ৪৫।৫০টী ক্যাম্পে যাইয়া লেখাপড়া শেখার উপযোগিতা আলোচনা করেন। ইহার ফল বেশ সন্তোষ-জনক হইয়াছে। ২রা ডিসেম্বর হইতে ৫ দিনের মধ্যে ২২ জন নূতন মেয়ে ভর্তি হইয়াছে এবং পুরাণো যাহারা আসিত না, তাহারাও আবার আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা আশা করিতেছি এই সন্তোষজনক অবস্থাটাকে আমরা বজায় রাখিতে পারিব এবং বাড়াইয়াই লইতে পারিব।

১লা ডিসেম্বর সকালে প্রচারকার্য চালান হয় এবং সন্ধ্যার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ফিল্ম লাইব্রেরী কর্তৃক পাঁচটী শিক্ষা মূলক ফিল্ম

দেখান হয়। উহাতে কাশ্মীর, শান্তিনিকেতন, মেবারগৌরব, খেলাধূলার উপযোগিতা, নার্সিং-এর উপযোগিতা প্রভৃতি বিষয় দেখান হইয়াছিল। বয়স্কা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রীগণ ছাড়াও গ্রামের সকল প্রকার মানুষেরাই ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। প্রায় ২।৩ শত লোক হইয়াছিল।

'ব্যক্তিগত কেন্দ্র ছাড়িয়া পুরুষোত্তম কেন্দ্রে স্থিত হওয়াই সন্ন্যাস। · ····· সংসারির কর্ম্ম কয়েকজনের সুখের জন্য, সন্ন্যাসীর কর্ম্ম বিশ্বনাথের সুখের জন্য, বিশ্বের সুখের জন্য।······'

—শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ

শ্রীরেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

উজ্জ্বলভারত

পৌষ, ১৮৮০ শকাব্দ, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ ১১শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দের ডায়েরী হইতে

(১৯৪৯)

(২)

…আমি বিশ্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলাম, মাটির বুকে গোলোক-বৈকুণ্ঠের প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়াছিলাম—ইহাই আমার সারা জীবনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখিবার জন্য পথে বাহির হইয়াছিলাম, সব খোয়াইয়াছিলাম। আজও পথে। কোনও অভিসন্ধি ছিল না বলিয়া কোনও দলে মিশিতে পারি নাই, দলও গড়ি নাই। সেবাব্রত ছিল জীবনের ব্রত। কংগ্রেসেও থাকিতে পারি নাই, স্বরাজসেবকসঙ্ঘ ভাঙ্গিয়া গেল, গৌরাঙ্গগোষ্ঠী চলিল না। আজ নরনারায়ণ আশ্রম আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি। কিন্তু আমার স্বপ্ন তো আজও আমাকে ছাড়িল না, অথচ পূর্ণও হইল না। তোমরা যদি আমার স্বপ্নকে সার্থকতায় গড়িয়া তুলিতে পার, আমি বাঁচিয়া যাইব, তোমরাও বাঁচিবে। আমি দেবতা চাই নাই, চাই মাটির মানুষে পুরুষোত্তম-প্রতিষ্ঠা। তোমরা পুরুষোত্তম হও, পুরুষোত্তম বনিয়া যাও—ইহা আমি দেখিবার জন্য আজিও বাঁচিয়া আছি। আমি একটি মাত্র শ্লোক শিখিয়াছি—

> ন কাময়েঽহম্ গতিমীশ্বরাৎ পরাং
> অষ্টর্দ্ধিযুক্তমপুনর্ভবং বা।
> আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজাং
> অন্তঃস্থিতঃ যেন ভবত্যদুঃখাঃ॥

তোমরা বিশ্বের সঙ্গে সমদুঃখী হও, বিশ্ব শান্ত হউক, তোমরা শান্ত হও

এই পথে চলিতে পারিলে কংগ্রেসও ঠিক পথে চলিবে। কংগ্রেস আজ অচল হইতে বসিয়াছে। তোমরা অচল কংগ্রেসকে সচল কর।

৫ই ফেব্রুয়ারী

…এর আগ্রহাতিশয্যে আজও গীতাভবনে গীতাপাঠ হয়।…'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' শ্লোকটি মাত্র ব্যাখ্যাত হয়।…

…সভাপতিরূপে বলি, আজ সমগ্রের ধারণা লইয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সমগ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষাত্রয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্বের রহিয়াছে সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। নরনারায়ণ আশ্রম এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যই স্থাপিত হইয়াছে।…এতদিনের দর্শন না বদলাইলে কিছুতেই কোন গঠনকর্ম্ম স্থায়ী রূপ নিতে পারিবে না। অস্পৃশ্যতাবর্জ্জন-আন্দোলন বুদ্ধ এদেশে প্রথমে আনয়ন করেন, তাহা সনাতন ভারত আজও গ্রহণ করে নাই। ঋষির বর্ণাশ্রম static দর্শনের উপর গড়া, শ্রীকৃষ্ণ dynamic বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ঋষি-দর্শন তাহাকে ফুটিতে দেয় নাই। আজ তাহার দিন আসিয়াছে। ইহার সাধনা হিসাবে কর্ম্মীদের ২টী শ্লোকের কথা বলিব। 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' ও 'ন কাময়েঽহম্' ইত্যাদি শ্লোক। যে স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিবার জন্য কোনও অভিসন্ধি না রাখিয়া এই দীর্ঘ বৎসর ছুটিয়াছি, …তাহা রূপ দিতে প্রাণপণ করিলেও সকলের সহানুভূতি পাইবেন, আমি তাহাদের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া যুক্ত হইব। এই যাত্রারম্ভে পুরুষোত্তম সহায় আছেন। তিনিই

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥

তিনিই বলিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

৬ই ফেব্রুয়ারী

…'সহজ প্রেমের গতি' বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে আলোচনা হয়। 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেৎ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ'—যেখানে করা ও হওয়া এক হইয়া যায়, তাহাই সহজ। পুত্রের নাম জপ করেন, না

আপনাআপনি জপ হয়? দুই-ই সত্য। যেখানে প্রীতি সহজ, সেখানের কর্ম্মও সহজ। সহজ কর্ম্মে টানাটানি নাই। জপ যেন আপনাআপনি হইয়া যাইতেছে, আমি যেন তাহা শুনিয়া যাইতেছি। এইখানে প্রকৃতি কেবলা, আমিও কেবল। 'প্রকৃতিস্ত প্রবর্ত্ততে' মনের পিছু পিছু ছুটিয়া মনকে বশে আনিবার জন্য কোনও হাঙ্গামা এখানে নাই। মন আপনাআপনি বশ হইয়া যায়। ইহাই সহজ প্রীতি, এখানেই কর্ম্ম সহজ। এইখানেই নামাদি হয় সেবা, জিহ্বাদি থাকে সর্ব্বদা সেবোন্মুখ। তখনই সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে নামাদি স্বয়ং স্ফুরিত হয় 'সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ'।

...স্থিতি-গতি সম্বন্ধে কথা মনে আসিতেছিল। যখন মানুষ 'at ease' দাঁড়ায় এক পায়ের সমান্তরালভাবে অপর পা রাখিয়া, তখন তাহা 'স্থিতি'। কিন্তু যখন সে চলিতে থাকে, তখন এক পা স্থির রাখিয়া অপর পা উঠাইয়া তাহাকে সামনে স্থাপন করে, পরে সেই স্থিত পায়ের উপর ভর করিয়া পিছনের পা উঠাইয়া তাহাকে আবার সামনে স্থাপন করে। গতি অবস্থায় একান্ত স্থিতি বা একান্ত গতি কখনও হয় না। যখন 'stand at ease,' তখনকার অবস্থাই একান্ত স্থিতি। গতি অবস্থার মধ্যে এক পায়ের স্থিতি ও অপর পায়ের গতি, এক পা পিছনে, অপর পা সামনে। দুই পা যখন পৃথিবীর গতিতে গতিমান, নিজেদের গতি ত্যাগ করিয়াছে, তখনই তাহাদের স্থিতি। কর্ম্ম ও জ্ঞান এইভাবেই স্থিতিমান ও গতিমান। পুরুষোত্তম-গতিতে যখন তাহাদের গতি, তখনই তাহারা স্থিতকর্ম্মা ও স্থিতপ্রজ্ঞ। যখন গতি সুরু হয়, তখন কখনও স্থিতকর্ম্মা, তৎপরে গতিপ্রজ্ঞ, আবার স্থিতপ্রজ্ঞ, তৎপরে গতিকর্ম্মা। এইভাবে অনন্তকাল আগাইয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে 'stand at ease'—স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতকর্ম্মা দুই-ই যুগপৎ। ইহাই শরণাগতির অবস্থা। কর্ম্ম-শরণাগত, জ্ঞান-শরণাগত। ইহাই পরা বিদ্যা বা ভক্তি।

৭ই ফেব্রুয়ারী

আজ 'অতিগ' ও 'অনুগ' শব্দদ্বয়ের একটা ব্যাখ্যা মনে আসিতেছিল। কয়েকখণ্ড আলগা কাগজকে একটী সেফটি পিন দ্বারা একত্র করিলে উহা হয় 'অতিগ' ভাবে একত্রিত করে, আর সূত্রদ্বারা বিদ্ধ করিয়া একত্র করিলে উহা হয় 'অনুগ'। অনুগ-র সঙ্গে অতিগ থাকিবেই। অতিগ কিন্তু অনুগ ছাড়া সম্ভব হয়। এই অতিগ অবস্থার একত্রিত হওয়াটা mechanical।

উহার মধ্য হইতে কোনও sheet অনায়াসেই টানিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু যেখানে বন্ধন অন্তগ ও অনুগ, অন্তরে বাহিরে, সেই বন্ধনই সত্য বাস্তব টেকসই। ব্রহ্ম 'অন্তঃ বহিঃ'—ইহার অর্থও ইহাই। তিনি সকলকে পারস্পরিকভাবে ভিতরে অনুস্যূত থাকিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আবার বাহিরের দিক হইতেও সকলকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। অনুগ-র বাঁধ প্রাণের বাঁধ, অন্তিগ-র বাঁধ প্রজ্ঞার বাঁধ। 'অন্তিগ' সত্তা আনিয়া দেয় প্রজ্ঞাগত ঐক্য, অনুগ স্থাপন করে রসগত ঐক্য। একটী অপরটীর পরিপূরক। ইহাই পুরুষোত্তম-দর্শনের মূল কথা।

আরও এক রকমের বন্ধন আছে, যেখানে কাগজের সীটগুলিকে আঠা দিয়া আটকাইয়া রাখা যায়। ইহা একান্তই অনুগ, কোনও অন্তিগ এখানে নাই। অন্তিগ না থাকার জন্য ইহা সাংসারিক লোকদের বৈষয়িক বন্ধনে পরিণত হয়। এই বন্ধনে কোনও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য থাকে না। একত্রীভূত সীটগুলির মধ্য হইতে কোনও একটীকে না ছিঁড়িয়া টানিয়া বাহির করা যায় না। কিন্তু যেখানে সূতা দিয়া অন্তরে বাহিরে সেলাই করিয়া একত্রিত করা হয়, সেখানে প্রয়োজন হইলে একত্রিতও রাখা যায়, সূতা খুলিয়া আস্তভাবেই বাহির করা যায়। এই বন্ধনের ভিতর সংসার ও সন্ন্যাস সমন্বিত রহিয়াছে। আলগা আলগা থাকিয়াও একত্র থাকিবার এই কৌশলই পুরুষোত্তম-যোগ।

১ই ফেব্রুয়ারী

'দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম'—৫১ পর্যন্ত ৩টী শ্লোক ব্যাখ্যাত হয় গীতা ভবনে। 'কর্ম্মজং ফলং'—ভোগ ও মোক্ষ দুই-ই কর্ম্মের ফল। মনীষীগণ দুই-ই ত্যাগ করেন। ভোগ ও মুক্তি দুই-ই যখন ত্যক্ত হয়, তখন অনন্ত জন্ম, অনন্ত বন্ধনেও সে ঘাবড়ায় না, তখনই সে জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্ত। 'কিয়ে মানুষ পশু পাখী কিয়ে জনমিয়ে অথবা কীট পতঙ্গ, করমবিপাকে গতাগতি পুনঃ-পুনঃ মতি রহ তুয়া পরসঙ্গ'। তখন কর্ম্ম ও আনন্দ এক হইয়া যায়, আনন্দেরই জমাটবাঁধারূপে কর্ম্ম স্ফুরিত হয়। কর্ম্ম হয় সহজ। ইহাই কর্ম্মের 'অনাময় পদ'। মায়ের পেটে সন্তান—এখানে মাতাপুত্রে এক হওয়ায় মাতার লাভ হয় জ্ঞানানন্দ। সন্তান প্রসব হওয়ার পর মাতা-পুত্রের মধ্যে স্ফুরিত হয় দুইয়ের মধ্যে একত্ব, তখন আস্বাদিত হয় কর্ম্মানন্দ।

যাহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানের সমন্বয় চান অথচ 'এষা তেঽভিহিতা সংখ্যে'

ইত্যাদি শ্লোকের প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুসরণ করেন, তাঁহারা শঙ্কর-পন্থারই অনুসরণ করিতেছেন। কর্ম্ম-জ্ঞানের সমন্বয় বিধান করিতে হইলে আত্মার ক্ষেত্র, স্বধর্ম্মের ক্ষেত্র ও কীর্ত্তির ক্ষেত্রকেও সমন্বয় করিতে হইবে, একাধারে অদ্বৈত ও দ্বিত্বে অদ্বৈত আস্বাদন করিতে হইবে। কিন্তু প্রচলিত সব টীকা ভাষ্য আত্মজ্ঞানকে পারমার্থিক ধরিয়া স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তিকে রাখিয়াছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে। পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের এইভাবে ভেদ স্বীকার করিলে অনাত্মার ক্ষেত্র গৌণ হইয়া পড়ে, আত্মার ক্ষেত্রই মুখ্য হইয়া পড়ে। তখন কি আর কর্ম্ম-জ্ঞানের সমন্বয় সম্ভব? স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তির ক্ষেত্রই অনাত্মার ক্ষেত্র।

১৩ই ফেব্রুয়ারী

জ্ঞান যখন নিউটনের আলোকরেখার মত সরলপথে চলে, তখনই তাহার নাম জ্ঞান। তখন জীবনের সকল জটিলতাকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া 'সরল' করিবার দিকেই থাকে দৃষ্টি। কিন্তু এই জ্ঞান যখন পথে বাধা পাইয়া বক্রপথে চলে, বাধাপ্রাপ্ত আলোর interference and diffraction-এর মত চলে, তখন তাহারই নাম বিজ্ঞান বা কর্ম্ম। ভারতবর্ষ এতদিন 'অবাধ' জ্ঞানগতির কথাই জানিত, শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার জীবনে বাধার সামনে জ্ঞানের কিরূপ গতি হইবে, তাহারই নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন। এই গতি সরল হইয়াও জটিল, একাধারে corpuscle এবং wave।

১৪ই ফেব্রুয়ারী

বৈকালে গীতাপাঠ হয়। 'বাহ্যস্পর্শেষু' ইত্যাদি দুই শ্লোক (৫ অধ্যায়)। 'পরসত্য' কি? 'সত্যং পরং ধীমহি'। যেখানে মুখের সত্য ও হৃদয়ের সত্য, ব্যবহারিক সত্য ও পারমার্থিক সত্য গলিয়া এক হইয়া গিয়াছে—তাহাই পরসত্য, ভাগবত ইহাই প্রচার করিয়াছে। 'মুখের সত্য' পালন করিতে গিয়া রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে হারাইলেন, নিজের মরণ আনিলেন। হৃদয়ের সত্য কিন্তু কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মুখের সত্য পালন করিতে গিয়া রাজা যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনের সঙ্গে পাশাখেলায় যোগ দিলেন, সেদিনও হৃদয়ের সত্য অনাদৃত হইয়াছিল। ধূর্ত্তের দল হৃদয়ের সত্যকে পদ-দলিত করিয়া 'মুখের সত্য' রক্ষার প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারে মত্ত তথাকথিত ধার্ম্মিকদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

মুখের সত্যকে আঁকড়াইয়া থাকিলে হৃদয়ের সত্য অনাদৃত হইবেই, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেই সত্য-মিথ্যার ভেদ ভাঙ্গিয়া যাইবে, মিথ্যার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে, মুখের সত্যও টিকিবে না। বর্ত্তমানে ইহার দৃষ্টান্ত চতুর্দ্দিকে। আজ মিথ্যার রাজত্ব চলিতেছে। সংসারে, ব্যবসায়ে সত্যের লেশও নাই। উপায় কি? প্রচলিত সত্য-মিথ্যার ধারণার উপর দাঁড়াইয়া কিছুতেই আর সত্য-প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না। সত্য-মিথ্যার ওপারে 'পরসত্যে'-র সুরেই শুধু সম্ভব হইতে পারে আবার ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সত্য-প্রতিষ্ঠা। সমগ্র জীবনের মধ্যে নির্দ্ধারণ করিতে হইবে সত্য ও অমৃতের স্থান। একমাত্র জীবনের মধ্যেই মুখ ও হৃদয় যে যাহার স্থানে সার্থক হইতে পারে। হৃদয়ের সত্য বাদ দিলে মুখের সত্য মিথ্যায় পরিণত হইবেই; পক্ষান্তরে মুখের সত্য বলিয়া কিছু না থাকিলে হৃদয়ের সত্যও আকাশে থাকিয়া যাইবে, তাহাতেও মুখের সত্য অচল হইবে। বাহিরের সত্য ও ভিতরের সত্য চলিবে একই জীবনের ছন্দে।

'মুখের সত্য সত্য নয়, হৃদয়ের সত্যই সত্য'—শরৎচন্দ্রের দত্তা। ইহা সত্যের এক দিক। দুই সত্য সমন্বয় করিয়াই পূর্ণ পরসত্য।

সমগ্র জীবনের আদর্শও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অথচ মুখের সত্য ও হৃদয়ের সত্য দুইয়েরই কঠিন গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই সমাজের সর্ব্বত্র চলিতেছে এক দুর্নীতি। আজ সমগ্র জীবনের দুইকেই গুছাইয়া লইতে হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানকে অতীতের সত্য মিথ্যা নির্দ্ধারণের খাতে নিয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে।

১৫ই ফেব্রুয়ারী

মনে হইতেছিল, মা বুকের রক্তের মধ্যেই সন্তানকে ধারণ করে, বুকের রক্ত দিয়াই তাহাকে পালন পোষণ করে। পরে অবশ্য অর্থের দরকার হয়, যাহা পালনপোষণের সহায়ক হয়। সব কর্ম্ম সম্বন্ধেই ঐ এক কথা যে কর্ম্মের সৃষ্টি বুকের মধ্যে হয় নাই, বুকের রক্ত দিয়া যাহা সিঞ্চিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত না হয়, তাহাকে শুধু অর্থ দিয়া কি বাঁচানো যাইবে? অর্থ বরং বিপদই ডাকিয়া আনিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিবে, বাহিরের বিরোধ ঘরে ডাকিয়া আনিবে। ভাগবত তাই বলিয়াছেন, 'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি কবয়ে'।

১৬ই ফেব্রুয়ারী

মুখের সত্য ও হৃদয়ের সত্যের মধ্যে টানাটানির ফলে, অসামঞ্জস্যের ফলে সুবিধাবাদেরই সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ সুবিধামত কখনও মুখের সত্যের, কখনও বা হৃদয়ের সত্যের অভিনয় করে। আসলে সে সুবিধাবাদী। এই সুবিধাবাদ সামনের আর একটা উচ্চস্তরের ইঙ্গিত করিতেছে, যেখানে পরসত্য জীবনের মাঝে উপনিষদুক্ত 'সত্যং চ অনৃতং চ' এই মন্ত্রের সার্থকতা মিলাইবে। অতীতের সত্যও চলিবে না, মিথ্যাও চলিবে না। জীবনের আলোকে আজ স্থির করিতে হইবে সত্য কি, অনৃত কি। বিশ্ব আজ এই দো-টানায় পড়িয়াছে। চাই নূতন দর্শন, নূতন পথ। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ-জীবনে এই পথ ও দর্শনের খোঁজ মিলিবে। সব নীতি, সব ধর্ম্ম আজ ভাঙ্গিয়া চৌচির হইয়াছে। কে ইহাকে রক্ষা করিবে পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া? এই অধর্ম্ম, এই দুর্নীতির মধ্য দিয়া কে পথ দেখাইয়া আগাইয়া লইয়া চলিবে?

১৭ই ফেব্রুয়ারী

...কে বলা হয়, সারাজীবন তোমার কাছ হইতে মানুষ সুযোগ আদায় করিয়াছে। মানুষের সঙ্গে কিরূপে চলিতে হয়, বাধার মধ্যে কিরূপে আগাইয়া যাইতে হয়, তাহা না শিখিলে জীবন ব্যর্থ হয়। নিউটন আলোর সরল রৈখিক গতির খবর দিয়াছেন, ভারতবর্ষও সরল রৈখিক জীবন যাপনের কথাই শিখাইয়াছেন। তাই তাহার অহিংসা, সত্য ও ব্রহ্মচর্য্য সব ঝঞ্ঝাটবিহীন। ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্যই বলা হইয়াছে সংসার মিথ্যা, নারী নরকের দ্বার ইত্যাদি। কিন্তু তাহাতে কি আলোর transference ও diffraction-এর ঘটনাপুঞ্জ ব্যাঘাত হয়? তাই তো ভারতবর্ষ সব বৈদেশিক আক্রমণে বিপন্ন হইয়াছিল। আজ জটিল-কুটিল আবেষ্টনের মাঝে পথ চলিবার কৌশল শিখিতে হইবে। গীতা-বক্তার জীবনে ও দর্শনে তাহাই আছে। অনন্ত বাধাযুক্ত জীবনে ব্রহ্মজ্ঞানের রূপ কি হইবে, কৃষ্ণ জীবন তাহাই শিখাইয়া গিয়াছে। বাধা সম্বন্ধে রাগদ্বেষ-বর্জ্জিত না হইলে কিছুতেই বাধাকে পরিপাক করা যাইবে না। বাধাকে এড়াইতে গেলেই বাধা হয় বাধা। বাধাকে জীবনের রসে পরিপাক করিলেই বাধা যোগায় জীবনের রসময়ী অগ্রগতি। বাধাহীন জীবন জীবনপদবাচাই নয়। যে বাধাকে এড়াইবার জন্য মানুষ পাগল, সেই বাঁধাই আজ অনন্তরূপে অনতিক্রম্যরূপে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে।

কিছুকালের জন্য গীতা পড়া হয়। পঞ্চম অধ্যায় শেষ হয়। পুরুষোত্তম-

যোগের মধ্যে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি যে যাহার যথোপযুক্ত স্থান লাভ করিয়াছে। সমগ্র জীবনে কর্ম্মেরও যেমন প্রয়োজন, জ্ঞান ও ধ্যানেরও তুল্য প্রয়োজন রহিয়াছে। পূর্ণ যোগে সর্ব্ব যোগসমন্বয় থাকিবেই। কিন্তু পুরুষোত্তম-জীবনের বাহিরে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগের মধ্যে গৌণ মুখ্য ভাব রহিয়াছে। পুরুষোত্তম-যোগে সব যোগ সম প্রয়োজন, সম মূল; পুরুষোত্তম-সাধনার বাহিরে প্রত্যেকটি অপরের সঙ্গে বৈষম্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষের অংশে এই তত্ত্বই পরিস্ফুট রহিয়াছে।

কর্ম্মযোগের মধ্যেও জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। 'মৎকর্ম্মপরমঃ' হওয়াই কর্ম্মের জ্ঞানাংশ, মদর্থ কর্ম্মই কর্ম্মের ধ্যানাংশ। মদযোগমাশ্রিতা কর্ম্ম মদর্থ কর্ম্মের অন্তর্গত। গীতার 'শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাৎ জ্ঞানদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ ত্যাগাৎ শান্তিরনন্তরম্'— এই শ্লোকের মধ্যে নির্গুণা ভক্তির অবতরণ ও তাহার মধ্যে ভক্তি, যোগ, ধ্যান ও কর্ম্মের ক্রমান্বয়ে জমিয়া উঠার তত্ত্ব রহিয়াছে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী

গীতার 'যদা তে মোহকলিলম্' ইত্যাদি পাঠ হয়। কর্ম্ম-জ্ঞান দ্বন্দ্বমোহ-রূপ কলিল অর্থাৎ গহন। 'শ্রোতব্য চ শ্রুতস্য চ'—কর্ম্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বসম্বন্ধে অনেক যা কিছু শুনিয়াছ, আরও শুনিবে, সে সব হইতে উত্তীর্ণ হইলেই বুদ্ধি নিশ্চল অচল হইবে। কর্ম্ম-জ্ঞানের ঝগড়ার উপরেই বর্ত্তমান ভারত-বর্ষের সমাজ-কাঠামো গড়া। শাস্ত্রব্যাখ্যা, গান, কথকতা, প্রবাদ বাক্যের ভিতর দিয়া এই ঝগড়ার কথা শোনা হইয়াছে, আরও অনেকদিন শুনিতে হইবে। অতীতের এই সব শোনা ও ভবিষ্যতের শোনার হাত হইতে মুক্ত না হইলে বুদ্ধির স্থিতি মিলিবে না।

প্রজ্ঞার স্থিতি নাই বলিয়াই অর্জ্জুনকে ভগবান 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে' বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন এইবার তাই প্রশ্ন করিতেছেন— স্থিতপ্রজ্ঞের ভাষা কিরূপ? স্থিতপ্রজ্ঞের সম্বন্ধে কিরূপ ভাষা লোকে প্রয়োগ করে কিম্বা স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ ভাষায় কথা বলে—ইহাই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসা।

গীতাভবনে গীতাপাঠ হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী।

রাসবিহারী ঘোষ

(২)

॥ শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ ॥

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাসবিহারী

লর্ড কার্জ্জনের শাসনকালে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় চান্স্‌লার রূপে তিনি যে একটি বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি এশিয়াবাসীদের "মিথ্যাবাদী" ও অন্যান্য কথা বলিয়া গালি দিয়াছিলেন।

"The highest idea of truth is, to a large extent, a western conception...In the East craftiness & diplomatic skill have always been held in much repute....... Oriental diplomacy is something rather tortuous and hyper-subte.... In the habit of exaggeration very often a whole fabric of hypothesis is built out of nothing at all."

ইহার ফলে দেশের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সকলে মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া এই কটূক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেন। সকল প্রকার প্রতিষ্ঠান হইতে সমালোচনা, ভ্রান্ত ধারণা, ঈর্ষা-প্রণোদিত, দম্ভমূলক উক্তি, প্রভৃতি নানা প্রকার আখ্যা দিয়া লর্ড কার্জ্জনের অযাচিত কটু বাণীর নিন্দাবাদ করা হয়। কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নির্ভীক মনের অভিব্যক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে পরিপূর্ণ। এইরূপ হৃদয়গ্রাহী ও সত্য-সন্ধানী বক্তৃতা শ্রবণ ও পাঠ করিয়া সকলে পুলকিত হইয়াছিলেন এবং অনেক ইংরাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া পত্রদান করেন।

লর্ড কার্জ্জন আর একটি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃঃ তিনি বাঙ্গলা দেশকে দ্বিখণ্ডিত করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হইলে শাসন,

সংস্কৃতি, একতা, রীতিনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বাঙ্গলাদেশ বিষম আঘাত পাইয়া শক্তিহীন হইয়া পড়িবে—বঙ্গবাসী এই কূট রাজনীতির ফন্দী বুঝিয়া ফেলিলেন। এবং এইজন্য দেশমধ্যে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি, বক্তৃতা, প্রতিবাদ, সমালোচনা প্রভৃতির ফলে দেশময় নব চেতনা জাগ্রত হইল। সেই বৎসর ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে এক মহতী সভা আহূত হইল। জনসাধারণ কাতারে কাতারে আসিয়া তাহাতে যোগদান করিল। আবালবৃদ্ধবনিতা সাগ্রহে, আন্তরিকতার সহিত সেই সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণের মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাসবিহারী ছিলেন দেশপ্রেমিক। তিনি সেই সভায় সুললিত ভাষায়, তেজোগর্ব্বিত কণ্ঠে বুঝাইয়া দিলেন কার্জ্জন সাহেব দেশের কি অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সে নির্ভীক বক্তৃতা যিনি শুনিয়াছেন তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, হৃদয়ে স্পন্দন অনুভব করিয়াছেন এবং স্বদেশী ব্রতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন।

ডাঃ রাসবিহারী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিলাতী দ্রব্য পরিত্যাগ ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য সকলকে আদেশ দিলেন। তাঁহার সেদিনের পূত প্রফুল্ল আনন যিনি দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন রাসবিহারীর হৃদয়-কন্দরে দেশপ্রেম ও স্বজাতি-বাৎসল্যের কি সুগভীর কূপ প্রোথিত ছিল। তাঁহার সরস ও সুস্নিগ্ধ বাণী সকলকে জাগ্রত করিয়াছিল, তিনি স্বদেশী ব্রত গ্রহণের মর্ম্মকথা এইভাবে ব্যাখ্যা করিতেন:—"বাঙ্গলাদেশ বিভক্ত হইয়াছে বলিয়া যে আমরা স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিলাতী বর্জন করিব, তাহা নহে। দেশে প্রস্তুত দ্রব্যাদি আমাদের সকলেরই ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। দেশীয় পণ্যসম্ভারে সমগ্র দেশ যদি ভরিয়া উঠে, তাহা হইলে আমরা অচিরে ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিব। জাতির দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার পক্ষে ইহার ন্যায় উত্তম পন্থা আর দেখি না।"

রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা যে আমাদের কাম্য তাহা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসভা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য যে প্রয়াস করিয়া আসিতেছিল, তাহাতে তাঁহার সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় হইতে তিনি একজন উদ্যোগী ধীর, নীরব কর্ম্মী ছিলেন এবং কংগ্রেসের সেবায় মুক্ত-কণ্ঠে অর্থদান করিয়াছেন। স্বদেশী প্রচার কার্য্যে উৎসাহ দান, শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠন, জাতীয়তামূলক অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে

তাঁহার অমূল্য অবদানের জন্য তাঁহাকে সকলে জননায়ক ও দেশের অকৃত্রিম বন্ধুরূপে গণ্য করিয়াছিল। "বন্দে মাতরম্" দেশলাইয়ের কারখানা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি ইতিপূর্ব্বে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। এই সকল কারণে ১৯০৭ খৃঃ রাসবিহারী ঘোষ ভারতেব জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ভারতের অন্যতম নেতা মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের সবিশেষ অনুরোধে তিনি এই পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন। সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশন আহূত হইয়াছিল। বিধির নির্ব্বন্ধে সে বৎসর কংগ্রেসের কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে নাই। বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন মহারাষ্ট্র নেতা। তাঁহার জলন্ত উদ্দীপনা ও নিঃস্বার্থ দেশসেবার জন্য তিনি লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন চরম পন্থী, পণ্ডিতবর গোখলে ছিলেন নরম পন্থী। দুই দলের দ্বন্দ্বে সেই সময় দেশ মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। তিলক মহারাজের দল চাহিয়াছিলেন তিনিই সেইবার সভাপতি হইবেন। সেইজন্য রাসবিহারীর সভাপতিত্ব তাঁহাদের মনোমত হয় নাই। তাঁহারা সভাপতি মহাশয়ের সম্মুখে বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করেন। নরমপন্থী গোখলে এবং তাঁহার অনুচরবৃন্দ ও প্রিয় শিষ্যগণ থামাইবার চেষ্টা করিলে অপর পক্ষ আরও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল। মহতী সভার মধ্যে দেখা গেল পন্থা লইয়া বিরোধ শেষে ইহা এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, ইট পাটকেল, চেয়ার প্রভৃতি বর্ষণ শুরু হইল। বাধ্য হইয়া সভাপতি মহাশয় ধীর-মতি রাসবিহারী সভা মুলতুবি রাখিলেন।

পর বৎসর ১৯০৮ খৃঃ মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়।

লোকমান্য তিলকের দল সে বার কোন গোলমাল সৃষ্টি করেন নাই। বঙ্গগৌরব রাসবিহারী সে বৎসর বিপুল সংবর্দ্ধনার সহিত কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

দানবীর রাসবিহারী

তাঁহার হৃদয় ছিল পরদুঃখকাতর, তাঁহার আদর্শ ছিল জন-সেবা। রাসবিহারীর আজন্ম বাসনা ছিল দেশের মধ্যে শিক্ষা প্রচার। দেশকে উন্নত করিতে, জন্মভূমির দুঃখকষ্ট দূর করিতে উচ্চ শিক্ষা ব্যতীত আর কোন উপায় কার্য্যকরী হইবে না, এই ছিল তাঁহার বদ্ধমূল ধারণা। তিনি বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে একুশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার টাকা দান করেন।

আপার সার্কুলার রোডের বিজ্ঞান কলেজ তাঁহার মহতী কীর্ত্তিরূপে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় "ডক্টর অফ ফিলজফি" নামক গৌরবের উপাধি দান করিয়া তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করেন। ইহা ভিন্ন তিনি কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে (অধুনা আর, জি, কর কলেজ) পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া সমাজ-সেবার আদর্শ রাখিয়া যান।

স্বনামখ্যাত রাসবিহারী ঘোষের দেহত্যাগের পর জানা যায় তিনি পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কয়েকটি সম্পত্তি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য দান করেন। পিতার স্মৃতি রক্ষার্থ স্বগ্রামে তোড়কণায় যে "জগদ্বন্ধু স্কুল" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা পরিচালনার জন্য একলক্ষ টাকা দান করিয়া যান। এবং তাঁহার বিরাট লাইব্রেরীর আইন পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থগুলি ঐ বিদ্যালয়ে দান করেন। উইলে দেখা যায় আত্মীয়-স্বজন, ভৃত্য, পরিচারক, অনুচরবর্গ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিদের প্রভূত অর্থ দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তোড়কণা গ্রামের গরীব দুঃখীদের মাসিক ও এককালীন অর্থ সাহায্যের জন্য বহু টাকা ধার্য্য ছিল।

এই সকল দানের পরও যে সকল সম্পত্তি তাঁহার ছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন যাদবপুর টেকনিক্যাল স্কুলের জন্য—তাহার মূল্য ছিল সতের লক্ষ টাকার উপর।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী—রাত্রি একটার সময় তাঁহার প্রিয় মাতৃভূমি, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি অমর ধামে চলিয়া যান। তাঁহার নশ্বর দেহ কালিঘাটের কেওড়াতলার শ্মশানে ভস্মীভূত হয়। পরে জানা যায়, তাঁহার বাসনা ছিল তাঁহার শবদেহ যেন তোড়কণার শ্মশানে দাহ করা হয় এবং তাহার উপর একটি মন্দির রচনা করিয়া তথায় যেন লিখিত থাকে—After life's fitful fever,

he slept well.

কিন্তু, হায়, সে বাসনা পূর্ণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায় নাই।

রাজনৈতিক নেতা রাসবিহারী

রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে মনীষী রাসবিহারী অমূল্য অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস-রাজনীতি কতিপয় জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল।

রাষ্ট্রীয় গগনে তখন ভীতিপ্রদ কৃষ্ণ-মেঘের সঞ্চার হয়। বাংলাদেশে অপরাজেয় শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা চলিয়াছিল। তখন চরিত্র গঠনের প্রচেষ্টা, যুবকদের মধ্যে সংগঠন-স্পৃহা, দার্শনিকতত্ত্ব আলোচনা, গীতাপাঠ, কর্ম্মযোগে উৎসাহ প্রভৃতি আদর্শমূলক ব্যবস্থা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। স্বদেশী আন্দোলন, বক্তৃতা, ব্রত-পালন, রাখী-বন্ধন প্রভৃতি মাতৃ-পূজার আয়োজন তৎকালে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের আশায় উদ্বুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির স্বদেশী সঙ্গীত রচনা দ্বারা যে প্রেরণা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গদেশে আনিয়াছিল দেশ প্রেমের পবিত্র প্লাবন।

এই প্রকার আবহাওয়ায় বাঙ্গালী কংগ্রেস সভাপতি রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে মাদ্রাজের সর্ব্ব-ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়া উঠিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমুজ্জ্বল প্রতিষ্ঠান সগৌরবে বিঘোষিত করিল রাসবিহারী ঘোষের কম্বু কণ্ঠ নিঃসৃত আদর্শ। ইহা অনুষ্ঠিত হয় মাদ্রাজ সহরে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর, ২৯ ও ৩০শে তারিখেও ঐ অধিবেশনের কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল। সেই বৎসর দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণস্বামী রাও ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রতিনিধি সংখ্যা হইয়াছিল ৬২৬ জন। সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেস' (দ্বিতীয় ভাগ) পাঠে জানা যায়, ১৯০৮ সালেই মুরারী পুকুর উদ্যান খানা-তল্লাস করিয়া বারীন্দ্র প্রভৃতিকে বিচারার্থ পাঠানো হয়। মজঃফরপুরে মিসেস কেনেডি, মিস কেনেডি নিহত হন। জেলখানায় নরেন গোঁসাইকে খুন করা হয়। বাবরা ডাকাতি এবং চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জিলায়ও বহু ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিও নিহত হন। এই শ্রেণীস্থ ব্যাপার সম্বন্ধে কংগ্রেস নিম্নলিখিত প্রস্তাব করে "Resolved that this Congress places on record its emphatic and unqualified condemnation of the detestable outrages and deeds of violence which have been committed recently in some parts of the country and which are abhorant to the loyal, human and peace-loving nature of His Majesty's Indian subjects of every denomination."

এই সময়ে গভর্ণমেণ্টের রুদ্রনীতি প্রচণ্ডভাবে ইহাকে ক্ষতবিক্ষত করে। অনেক লোক গ্রেপ্তার হন, মনীষী শ্রীঅশ্বিনী কুমার দত্ত, রাজা সুবোধচন্দ্র

মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী সম্পাদক) শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, পুলীন বিহারী দাস, ভূপেশচন্দ্র নাগ, ১৮১৮ সালের তিন রেগুলেসনে গ্রেপ্তার হইয়া দেশান্তরিত হন, এবং ১৯০৮ সালের ৭ ও ১৪ আইন অনুসারে অনুশীলন সমিতি, সাধনা সমিতি, সুহৃদ সমিতি, ব্রতী সমিতি প্রভৃতি সমিতি বিপ্লবী সন্দেহে বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। এই কংগ্রেসে এই নীতির প্রতিবাদ করিয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ হয়—

X. That having regard to the recent deportations and the grave risk of injustice involved in Government action based upon exparte and untested information and having regard to the penal laws of the country, this Congress strongly urges upon the Government the repeal of the Bengal Regulation III of 1818 and similar regulations in other provinces of India, and it respectfully prays that the persons recently deported in Bengal be given an opportunity of exculpating themselves or for meeting any charges that may be against them, or be set at liberty.

Acts of 1908

XI. That this Congress deplores the circumstances which have led to the passing of Act VII of 1908 and Act XIV of 1908, but having regard to their drastic character and to the fact that a sudden emergency alone can afford any justification for such exceptional legislation, this Congress expresses its earnest hope that the enactments will only have temporary existence in the "Indian Statute Book".

এই Regulation III সম্বন্ধে প্রখ্যাতনামা আইনবিশারদ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ মহোদয় বলেন it is a barbarous relic from the past এবং এই বিষয়ে মিঃ সৈয়দ হাসান ইমাম অশ্বিনীবাবুদের গ্রেপ্তারে

ব্যথিত হইয়া খুব স্পষ্টভাবে বলেন যে, এইরূপ আদেশেই রাজভক্তগণের মনও তিক্ততায় ভরিয়া যায়।

"Unexplained deportations shook the faith of the most loyal in the justice of a law that hides its proceedings from public gaze." মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ও প্রস্তাবটি সমর্থন করেন।" এই অধিবেশন নরম পন্থীদের দ্বারা পরিচালিত বলিয়া জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট সম্বন্ধে কোন প্রস্তাবই হয় নাই। বঙ্গ-ভঙ্গ বন্ধ হইলেই লোকের সন্তোষ ফিরিয়া আসিবে এবং ত্যাগ স্বীকার ও বিলাতী অপেক্ষা স্বদেশী দ্রব্যেই অনুরাগ প্রদর্শন কর্ত্তব্য—এবংবিধ দুইটি প্রস্তাব মৃদু ভাষায় গৃহীত হয়।

বঙ্গ-প্রতিভা

রাষ্ট্র-নীতি, রাষ্ট্রীয় দর্শন, রাজনৈতিক আদর্শ প্রভৃতি তত্ত্বমূলক অভিভাষণ বহু বঙ্গীয় নেতার মধ্যে দৃষ্ট হইবে। বঙ্গ-প্রতিভা প্রতিভাত নানা রাজনৈতিক নেতার আলোচনা, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার মধ্যে। কংগ্রেসের অধিবেশনে প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ যে উজ্জ্বল আলোকপাত জনসাধারণের মনের উপর করিয়া গিয়াছেন তাহার গভীরতা ও ঔজ্জ্বল্য অধিকদিন স্থায়ী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বঙ্গীয় প্রতিভা, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপায়ানুসন্ধান, মনো-বিশ্লেষণ, চরিত্রগঠনের দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি সমস্যামূলক আলোচনা ঐ অভিভাষণ ভিতরে বিশেষ আকারে পরিস্ফুট। স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে লোকমত নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া পুরুষসিংহ বঙ্গবীরগণ প্রতিভা বিকাশে যে সমুজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল অম্লান থাকিবে। রাসবিহারী ঘোষ ছিলেন সমসাময়িক যুগে অদ্বিতীয় ব্যবহারজীবী; তাঁহার বিচার বিশ্লেষণ, যুক্তির অকাট্য বাচন-ক্ষমতা, অপ্রমেয় আবেদন-শক্তি ও তর্কশাস্ত্রের নিবিড়তা তাঁহাকে ভাষা-সাহিত্য, প্রকাশ-ভঙ্গী, বাগ্মিতার চরম শিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। কংগ্রেস-ক্ষেত্রে কয়েকজন প্রতিভাশালী বঙ্গ-বীরের নামোল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম:

সভাপতি	সন	স্থান	অধিবেশন
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৮৫	বোম্বাই	১ম
ঐ	১৮৯২	এলাহাবাদ	৮ম
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৯৫	পুণা	১১শ
আনন্দমোহন বসু	১৮৯৮	মাদ্রাজ	১৪শ
রমেশচন্দ্র দত্ত	১৮৯৯	লক্ষ্ণৌ	১৫শ
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯০২	আমেদাবাদ	১৮শ
লালমোহন ঘোষ	১৯০৩	মাদ্রাজ	১৯শ
রাসবিহারী ঘোষ	১৯০৭	সুরাট	২৩শ
রাসবিহারী ঘোষ	১৯০৮	মাদ্রাজ	২৪শ
ভূপেন্দ্রনাথ বসু	১৯১৪	মাদ্রাজ	৩০শ
সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ	১৯১৫	বোম্বাই	৩১শ
অম্বিকাচরণ মজুমদার	১৯১৬	লক্ষ্ণৌ	৩২শ
চিত্তরঞ্জন দাস	১৯২২	গয়া	৩৮শ
আবুলকালাম আজাদ	১৯২৩	দিল্লী	(বিশেষ)
সুভাষচন্দ্র বসু	১৯৩৮	হরিপুরা	৫১শ
সুভাষচন্দ্র বসু	১৯৩৯	ত্রিপুরী	৫২শ
আবুলকালাম আজাদ	১৯৪০	রামগড়	৫৩শ

পরিসমাপ্তি

রাষ্ট্রীয় সংস্কৃতি উন্নতি লাভ করার ফলে বহুবার বঙ্গদেশ কংগ্রেস অধিবেশন আহ্বান করিবার যোগ্যতা ও সাহস অর্জন করিয়াছিল। রাষ্ট্রীয়-চেতনা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ না হইলে সে সাহসে নির্ভর করা যাইতে পারিত না। গণজাগরণ অবশ্য সে পরিমাণে প্রকাশ পায় নাই। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সমগ্র ভারতবর্ষ সে সুবিধা লাভ করিয়াছিল। কলিকাতা মহানগরী বহুবার ভারতীয় জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে দেশপূজ্য বরেণ্য নেতৃবৃন্দের পদধূলি আহরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কলিকাতার বাহিরে চ'ব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহরের সন্নিকটে কল্যাণী গ্রামে একবার মাত্র অনুষ্ঠিত হয় :—

কলিকাতায়

সভাপতি	অধিবেশন	সাল
দাদাভাই নৌরজী	২য়	১৮৮৬
ফিরোজশা মেটা	৬ষ্ঠ	১৮৯০
রহিমতুল্লা সায়াণী	১২শ	১৮৯৬
দিনশা ওয়াচা	১৭শ	১৯০১
দাদাভাই নৌরজী	২২শ	১৯০৬
বিষেণ নারায়ণ ধর	২৭শ	১৯১১
এনি বেশান্ত	৩৩শ	১৯১৭
লালা লাজপত রায়	(বিশেষ)	১৯২০
মতিলাল নেহরু	৪৪	১৯২৮
নেলী সেনগুপ্তা	৪৭	১৯৩৩
জওহরলাল নেহরু	৫৯ (কল্যাণী)	১৯৫৪

"আলোকের সাথে মেলে আঁধারের ভাষা,
মেলে না কুয়াশা।"

—লেখন

পুস্তক সমালোচনা

॥ শ্রীশান্তশীল দাশ ॥

(সমালোচনার জন্য দুইখানি করিয়া পুস্তক পাঠাইতে হইবে)

গান্ধীজী স্মরণে : শ্রীজিতেন্দ্র নাথ কুশ'রী।
প্রকাশক : অধ্যয়ন, ১৪ কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২ ; মূল্য ১।•

লেখক গান্ধীপন্থী। যাঁরা গান্ধীজীর নামাবলী গ্রহণ করে গান্ধীজীর প্রদর্শিত পথকে পরিহার করে চলেন, সে পথ দুর্গম ও সাধনাসাপেক্ষ বলে, লেখক সে দলের নন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি একাধিকবার গান্ধীজীর সংস্পর্শে এসেছেন, আলোচ্য পুস্তকে তারই কিছু সংবাদ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন, সহজ সরল ভাষায়। গান্ধীজীর জীবন বিচিত্র। সেই বিচিত্র জীবনের সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন, তিনিই লাভবান হয়েছেন সেই জীবন্ত উদাহরণের সংস্পর্শে এসে। সে সংস্পর্শ ক্ষণকালের হলেও তার মাঝে চিরকালের ঐশ্বর্যের আভাস মেলে। সে আভাস লেখকের বর্ণনায় প্রকাশ পেয়েছে।

পুস্তকের শেষ প্রবন্ধটি বোম্বাইয়ের রাষ্ট্রপাল শ্রীপ্রকাশের রচিত গান্ধীজী সম্পর্কীয় একটি ইংরাজী প্রবন্ধের অনুবাদ। অনুবাদটি সাবলীল হয়েছে। পড়তে গেলে হোঁচট খেতে হয় না।

স্থানে স্থানে মুদ্রাকর প্রমাদ নজরে পড়ে।

আপন দেশ : শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়।
প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশর্স ; কলিকাতা—১২
দাম ২॥•

আলোচ্য গ্রন্থখানি একটি ক্ষুদ্র ভ্রমণের ডাইরী। দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখক লিপিবদ্ধ করেছেন। ভ্রমণ করা যত সহজ ভ্রমণ কাহিনী লেখা তত সহজ নয় ; একথা সকল ভ্রমণবিলাসীরাই স্বীকার করেন।

বইখানি পড়তে সুরু করলে মনে হয় আমিও যেন লেখকের সহযাত্রী, তাঁর সংগেই ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করছি। রচনা তথ্যের তালিকায় একটুও ভারাক্রান্ত হয়নি। বরং বর্ণনার কুশলতায় স্থানে স্থানে রম্য রচনার প্রসাদগুণে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। সে লেখার মধ্যে wit আছে, humour আছে, কবি-সুলভ নৈপুণ্যের দ্যুতি আছে, আর আছে লেখকের স্বকীয়তার ছাপ। মাঝে মাঝে বর্ণনা এত চিত্তাকর্ষক হয়েছে যে একাধিকবার পড়ার লোভ সামলান যায় না। পর্বতের বিবরণ, নদীর বিবরণ, অরণ্যের বিবরণ, অধিবাসীদের বিবরণ, এমন কি থার্ড ক্লাশ যাত্রীদের-বিবরণ লেখকের রচনা গুণে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

মোট কথা যে সজাগ দৃষ্টি থাকলে ভ্রমণ সার্থক হয় এবং লেখনীর যে নৈপুণ্য থাকলে ভ্রমণকাহিনী লেখা সার্থক হয়, সে দৃষ্টি ও সে লেখনী লেখকের আছে। 'আপন দেশ' একখানি ক্ষুদ্র অথচ সার্থক লিপিবদ্ধ ভ্রমণকাহিনী।

'শিশির রবিরে শুধু জানে
বিন্দুরূপে আপন বুকের মাঝখানে।'

—লেখন

বিস্মৃতি

॥ শ্রীহরেকৃষ্ণ প্রামাণিক এম, এসসি, ; বি, এল ॥

(১)

যেদিন তরুণ অরুণ উদিল দৃশদ্বতীর তীরে,
মহা ঋষিগণ বসিলা যজ্ঞে কানন সভাটি ঘিরে,
জ্ঞান বিজ্ঞান ব্রহ্মতত্ত্ব,
প্রাকৃতিক আর অনাদি সত্য
উদ্ভাসিল বিশ্বনিখিল ভাস্বর মহাজ্ঞান
সেদিনের সেই পুরাতন ছবি স্মৃতিপটে হল ম্লান ?

(২)

যেদিন নৈমিষারণ্য মাঝারে মিলিলা অযুত ঋষি
সাধিলেন যাগ পুণ্যক্ষেত্রে সবে একত্রে বসি
সূতেরে বসায়ে শ্রেষ্ঠ আসনে
যাপিলেন কাল ধর্ম শ্রবণে
নিরূপিত হ'ল মানব ধর্ম্ম পরাধর্মের সনে
সেদিনের সেই পুরাতন স্মৃতি ম্লান কি হইল মনে ?

(৩)

যেদিন প্রভাতে উদিল তপন অরুণোজ্জ্বল রাগে
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে নিষ্কাম মহাযাগে
মহা স্যন্দনে নরে নারায়ণে,
কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি বাখানে
"সকল ধর্ম্ম ত্যজিয়া লও হে আমার শরণাগতি"
মুছিয়া কি গেল মরম হইতে পুরাতন সেই স্মৃতি ?

(৪)

যেদিন একদা মেধস মুনির পবিত্র তপোবনে
সুরথ নৃপতি হ'ল সমাগত সমাধি বৈশ্য সনে

অজ্ঞান তমঃ হল অপগত
মুক্ত হইল বন্ধন শত
জগৎ জননী করুণা আলোকে উজ্জ্বল হ'ল দিন
সেদিনের সেই পুরাতন কথা স্মৃতিপটে হল ক্ষীণ ?

(৫)

সেদিন যখন গঙ্গার তটে পরীক্ষিত মহারাজ
বসিলেন এসে অতি দীনবেশে, অন্তরে পেয়ে লাজ
সেদিনের সেই মনীষিসভায়
ব্যাস-সুত শুক বালকের প্রায়
ভাগবত কথা শুনাল জগতে অমৃত রসের ধারা
সেদিনের সেই পুরাতন কথা স্মৃতিপটে হ'ল হারা ?

(৬)

যেদিন একদা রাজার দুলাল ত্যজি' রাজভোগ সুখ
বাহিরিলা পথে, জীবের ঘুচাতে জরা রোগ শোক দুখ
লভি মহাজ্ঞান কঠোর ধেয়ানে
"উপসম্পদা" দিলা জনে জনে
আধেক ধরণী হইল উজল যাঁহার করুণা রাগে
সেদিনের সেই মহিমা কাহিনী স্মৃতিপটে নাহি জাগে ?

(৭)

যেদিন একদা কাবেরীর তীরে শিশু এক সুকুমার।
অষ্ট বর্ষে নিল সন্ন্যাস ডোর-কৌপীন-সার
উচ্ছেদ করি তান্ত্রিকগণে,
শারীর সূত্র কবিল স্থাপনে,
নাস্তিকবাদ করিয়া নিরাশ স্থাপিল বেদের ধর্ম্মে
সেদিনের সেই পুরাতন স্মৃতি ম্লান কি হইল মর্ম্মে ?

(৮)

একদা যেদিন গোদাবরী তীরে অপরূপ সন্ন্যাসী
সাধন তত্ত্ব পুছে রাম রায়ে বালুকা সিকতে বসি,
সাধ্যের সীমা করি নির্ণয়
সাধনের ক্রম তবে রায় কয়

উন্নতোজ্জ্বল মাধুর্য্যরস সাধ্যতত্ত্ব শেষ
সেদিনের সেই অভিনব কথা স্মৃতিপটে নাহি লেশ ?

(৯)

একদা যেদিন তরুণ যুবক ত্যাগী সন্ন্যাসী বেশে,
লঙ্ঘি সাগর হ'ল উপনীত আমেরিকা মহাদেশে
সে বীর একেলা নাহিক সহায়,
শিকাগো নগরে ধর্ম্ম সভায়,
আর্য্য ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ করিয়া স্থাপিল জগত মাঝারে
সেদিনের সেই বিজয় কাহিনী স্মৃতিপটে আজ নাহিরে ?

(১০)

তোদের লাগিয়া নিজে ভগবান যুগে যুগে অবতরি
তোদের অধরে সুধার পাত্র বারবার দেন ভরি
সে সুধাভাণ্ড রহে ভরপুর,
অফুরাণ রহে সে বাঁশীর সুর,
তবুও তোদের হৃদয় মাঝারে অজ্ঞান-কুহেলিকা
বিস্মৃতি আসে মরম ছাইয়া কিবা এই প্রহেলিকা ?

(১১)

স্মৃতিতে তোদের নাহি রহে কেন ভগবৎ অবদান ?
নিখিলের সেরা জ্ঞান বিজ্ঞান কেন হয়ে যায় ম্লান ?
ধর্ম্ম কর্ম্ম জ্ঞানের তত্ত্ব
করুণা প্রেম ও রসের তথ্য
কেন ভুলে যাস তোরা যে সত্য অমৃতেরি সন্তান
তোদেরি প্রেমেতে উজলিবে ধরা দূর হবে অজ্ঞান।

(১২)

আধ্যাত্মিক ও ত্যাগের ধর্ম্ম তোদেরি যে নিজ দান
জগৎ মাঝারে এই ধর্ম্মের কোথা মিলে সন্ধান ?
যুগে যুগে সেই ধর্ম্ম আচরি'
যুগে যুগে তাহা মানবে প্রচারি'
শমিত হইল ভারত মাঝারে হিংসা দ্বেষ ও রোষ
স্থাপিত হইল ভারত বক্ষে শান্তি ও সন্তোষ।

(১৩)

তোদেরি ত্যাগেতে জগৎ হইতে হিংসা হইবে ক্ষয়
তোদেরি প্রেমেতে আবার জগতে মৈত্রীর হবে জয়,
প্রসার হউক তোদের কৃষ্টি
প্রেমের ধরণী হউক সৃষ্টি
শান্তির ধারা হউক বৃষ্টি সকল ভুবনময়
দেবের প্রকাশ হউক নরেতে হ'ক সবে নির্ভয়।

'দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরি পায়।
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায়।

কর্ম আপন দিনের মজুরি রাখিতে চাহে না বাকি।
যে প্রেমে আমার চরম মূল্য তারি তরে চেয়ে থাকি।

দুঃখের আগুন কোন্ জ্যোতির্ময় পথরে টানে
বেদনার পরপার পানে।'

—লেখন

"ছোট-মা"

॥ শ্রীআদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

প্রদীপালোকে প্রমীলার অশ্রুসিক্ত দু-গণ্ডের দিকে চেয়ে অন্নদা কঠিন কণ্ঠে বললেন "বৌমা, এ ভক্তি সন্ধ্যেবেলায় অমন করে কেঁদেকেটে আমার গুরুদাসের অমঙ্গল করো না। রামদাস গেছে তার পরমায়ু ফুরিয়েছে; কিন্তু তাই বলে আমি বেঁচে থাকতে গুরুদাসের কোন অমঙ্গল চোখে দেখতে পারব না।"

তুলসীতলায় প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে প্রমীলা সিক্ত স্বরে বলল "মা, আমি কি ঠাকুরপোর অমঙ্গল চাই, সে কি আমার কেউ নয়? শ্বশুর-কুলের একমাত্র বংশধর, ভগবানের কাছে সর্ব্বদাই যে তার মঙ্গল কামনা করি! তা ছাড়া যে বৈমাত্র ভাইয়ের স্ত্রীকে আপন বৌদির চেয়েও বেশী শ্রদ্ধা করে, তার অমঙ্গল আমার প্রাণ থাকতে করতে পারব না—সে বেঁচে থাক্, সুখে থাক্, এই আমি চাই!"

"হুঁ, সে কদর ত স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি—" বলে অন্নদা অস্ফুটস্বরে কি যেন বলতে লাগলেন।

হেঁট হয়ে শ্বাশুড়ীর পদধূলি গ্রহণ করে প্রমীলা তার পাশে বসে পড়লো। কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ দুটো মুছে প্রমীলা বলল "কেন জানিনা, আপনা হতে চোখের জল সময়-অসময় ঝরে পড়ে। আপনি বিশ্বাস করুন মা, এ আমার অন্তরের বেদনা, সত্যি বলছি—আমার দুর্ভাগ্যের সঙ্গে কাউকে জড়াতে চাই না।"

মীরা এইমাত্র বৈকালিক খেলাধূলা শেষ করে বাড়ী ঢুকলো। অন্নদা তার দিকে চেয়ে বললেন, "কাপড় কাচিস্ নি বুঝি? বামুনের ঘরে আচার আচরণ আর রইলো না লো তোর জ্বালাতে! বলি বৌমা,—" বলে প্রমীলার দিকে চেয়ে অন্নদা পুনরায় বললেন "মেয়েকে কি এগুলোও শেখাতে পার না? চিরদিন কি ঐ কচি খুকীই থাকবে?"

মেয়ের দিকে চেয়ে প্রমীলা বলল "কতদিন তোকে বলিচি মা, সন্ধ্যের আগে কাপড় কেচে বাড়ী ঢুকবি, তা না সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খেলা! আমার

ভাগ্য—” বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রমীলা শ্বাশুড়ীর হাতে জপের মালাটা তুলে দিল।

গুরুদাস আদালতে কেরাণীগিরি করে। বেলা ন'টার সময় খেয়ে যায়, ফেরে সন্ধ্যার সময়।

মালাটা হাতে নিয়ে অন্নদা বসলেন “গুরুদাস এখনও বাড়ী ফেরেনি বুঝি?”

‘না—”

“হুঁ, আমায় কি সুস্থির হয়ে দু-দণ্ড ভগবানকে ডাকবার অবসর আছে? দেখি—” বলে মালাটা হাতে নিয়ে অন্নদা বাড়ীর বাইরে এলেন।

গুরুদাস তখন পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে মীরাকে কোলে নিয়ে বলতে বলতে আসছে “আর কি চাই বল ত মা?”

গুরুদাসের গলা জড়িয়ে ধরে মীরা বলছে “এক বাক্স সাবান, একটা স্নো আর একটা খু-ব ভাল সেণ্ট—যেন অনেক দূর পর্যান্ত গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে।”

সহসা কথার মোড় ফিরিয়ে পুনরায় মীরা বলল “ও পাড়ার গীতা, জানলে কাকা, ওর দাদা ওকে একটা ভা-ল মত সুটকেশ এনে দিয়েছে, গীতা তাতে ওর সাবান, কাপড় এসব রাখে, তা আমাকেও একটা গীতার মত সুটকেশ এনে দিওনা?”

স্নেহার্দ্র কণ্ঠে গুরুদাস বলল “দেবো বৈ কি মা—নিশ্চয় দেবো! এ মাসের মাইনে পেলে আগে তোমার সব জিনিষ কিনে আনবো।”

দোর গোড়ায় মাকে দেখে গুরুদাস বলল “কোথায় যাচ্ছ মা?”

“তোর বাড়ী আসতে দেরী দেখে পথের দিকে চেয়ে আছি বাবা।”

মৃদু হেসে গুরুদাস বলল “ছেলে কি তোমার আজও ছোট আছে মা যে পথের দিকে চেয়ে আছ?”

“মায়ের কাছে ছেলে চিরদিনই ছোট বাবা, আসতে দেরী হলে প্রাণ চঞ্চল হয়ে পড়ে—স্থির হয়ে বসে থাকতে পারি কৈ?”

মীরার খিল খিল হাসি শুনে অন্নদা বললেন “ও, ও বুঝি তোর কোলে উঠেছে?”

“হ্যাঁ, পুকুর ঘাটে দেখতে পেয়ে আর ছাড়ে না, আমার ছোট-মা কি না, তাই ওর কথা অগ্রাহ্য করতে পারলাম না।” বলে সকলে মিলে বাড়ী ঢুকলো।

গুরুদাসের আগমন টের পেয়ে প্রমীলা তার জল খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিলো। ডাক শুনে বলল "যাচ্ছি ভাই—"

"যাচ্ছি নয়, শীগ্রি আনো—খুব ক্ষিদে পেয়েছে।"

খাবারের থালাটা সম্মুখে নামিয়ে দিয়ে প্রমীলা বলল "কেন, তোমার ছোট-মার ত্বাড়া আছে বুঝি ?"

প্রমীলার কথার কোন উত্তর না দিয়ে গুরুদাস আহারে প্রবৃত্ত হলো।

গুরুদাস সারাদিনে যত বার আহার করে, ততবার খাবারের কিয়দংশ মীরার জন্মে রেখে দেয়। খেতে বসবার আগে মীরা বাড়ীতে আছে কিনা লক্ষ্য করে, যদি না থাকে প্রমীলাকে বলে "বৌদি, ছোঠ-মার জন্মে থাকলো।"

প্রমীলা বাধা দিয়ে বলে "প্রত্যেকবারই যে ওর জন্মে রাখতে হবে তার মানে কি আছে ? না—না, ওরকম করে নিজে না খেয়ে—"

"আমার খুশী আমি রাখব—" বলে গুরুদাস উঠে পড়ে।

মীরা এতক্ষণ কাপড় পড়ছিলো। গুরুদাসের ডাকে সাড়া দিয়ে বলল "যাচ্ছি কাকা, তুমি ওঠো—"

অন্নদা জপের মালাটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন "তোর আদর পেয়ে পেয়ে মেয়েটা যেন দিন দিন কি হচ্চে।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে গুরুদাস বলল "বাপ্-মরা মেয়ে, এক ফোঁটা আদরও যদি আমাদের কাছে না পায়, ও কার কাছে আব্দার করবে বল দেখি মা ? মাত্র সাত বছর বয়েস—কি-ই-বা এত বোঝে।"

পানের ডিবেটা গুরুদাসের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রমীলা বলল "মেয়েরা ছোট বেলায় বেশী আদর পেলে শেষে শ্বশুর বাড়ী গিয়ে কাঁদতে হয় ঠাকুরপো।

"কোন্ শাস্ত্রে আছে শুনি ?"

"শাস্ত্রের কথা আমি জানি না তবে আমার ভাগ্যের সঙ্গে মিলিয়ে বল্‌চি। ছোট বেলায় মা-বাবা আমাকে বড্ড আদর করতেন—আকাশের চাঁদ চাইলেও বোধহয় পেড়ে দিতেন, তাই ভাবি, বোধহয় অতি আদরের শেষ পরিণতি অনাদর।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে গুরুদাস বলল, "বৌদি, এখানে কি তোমার কিছু অসুবিধা হচ্চে ? সত্যি বল—লুকিয়ো না।"

"আমার অসুবিধার কথা ত কিছু বলি নি ভাই, দুরদৃষ্টের কথা বলচি !"

ঝাঁঝালো কণ্ঠে অন্নদা বললেন, "নবাবের বিটি, এত করে মন পাওয়া যায় না! বলি, এত গুমোর কিসের?"

ভগ্ন কণ্ঠে প্রমীলা বলল, "মা, আমাকে মাপ করুন, কি কথায় কি এসে পড়লো।"

"আসল কথাই বলেচো, মিথ্যে গোপন করে বেশী দিন রাখা যায় না, বুঝলে? রামদাস আজ তিন বছর মারা গেছে কিন্তু আমার গুরুদাস কি কোনদিন তোর গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগতে দিয়েচে? তোমাদের মা-বিটিকে ত মাথায় করে রেখেচে!"

"আমি অস্বীকার করচি না মা, আমি শুধু বলতে চেয়েছি আমার দুর্ভাগ্যের কথা। ঠাকুরপো যে আমাদের দয়া করে ঠাঁই দিয়েছে, তাঁর করুণাদৃষ্টি যে আমাদের উপর অযাচিতভাবে এসে পড়েচে, এ সৌভাগ্য কজন বিধবার অদৃষ্টে জোটে?"

গুরুদাস মায়ের দিকে চেয়ে বলল, "মা, চুপ কর, ওর কথাটা আমরা বুঝতে পারি নি, মিথ্যে তিরস্কার করে দুঃখ দিতে নেই।"

"থাম্, আমি সব জানি। মনে করচে, দু'টো করে রান্না করে দিয়ে আমাদের মাথা কিনে রেখেচে। আমি কারো কথার ধার ধারি না—যা বলবে পষ্ট বলুক। তেজ—বলি এত তেজ কিসের?"

শান্তকণ্ঠে প্রমীলা বলল, "আমাকে ভুল বুঝবেন না মা, আপন কর্ত্তব্য করে যদি মাথা কেনার প্রশ্ন ওঠে তা হলে আমি নিরুপায়।"

"মা, তুমি কি পাগল হলে?" বলে গুরুদাস ধমক দিয়ে ওঠে।

অন্নদা কপট অশ্রুপাত করে নীরব হন।

তখনকার মত ঝগড়া থেমে গেল বটে কিন্তু প্রমীলার অন্তর বার বার অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠতে লাগল। রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার দুচোখ বেয়ে অবিরত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। মীরার দিকে চেয়ে তার মন বলে—আমার জীবনের আর কোন মূল্য নেই, শুধু তোর জন্যে আমার এ দুর্ভোগ, তা' না হলে কোন্‌দিন নিজেকে বলি দিতাম—সব জ্বালা-যন্ত্রণা চুকে যেতো।

ঘড়িতে একটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রমীলা শশব্যস্ত হয়ে উঠলো। সকালে তার অনেক কাজ—গুরুদাসের অফিসের ভাত, ঘর দোর পরিষ্কার করা, অন্নদার স্নানাহ্নিকের ব্যবস্থা করে দেওয়া। সুতরাং আর অনর্থক চিন্তা না করে সে শুয়ে পড়লো।

তিন বছর আগে স্বামী মারা গেছেন স্ত্রী এবং একমাত্র মেয়েকে রেখে। এ সংসারে প্রমীলা বেশীদিন আসে নি, মাত্র দশ বছর। প্রথম স্বামী-সংসারে এসে প্রমীলা সৎ-শাশুড়ীর বিষ নজরে পড়ে, কেন তা' অন্নদা ছাড়া কেউ জানে না। শত চেষ্টাতেও প্রমীলা আজ পর্য্যন্ত তাঁর মনোরঞ্জন করতে পারে নি। সব কাজে কথাতে অন্নদার কেমন যেন খুঁত খুঁত করা স্বভাব।

রামদাস সান্ত্বনা স্বরে বলেছিলো "সেজন্যে দুঃখ করো না প্রমীলা, সব ঠিক হয়ে যাবে। মায়ের মৃত্যুর পর উনি আমাকে বহু কষ্টে মানুষ করেচেন, হোক্ বিমাতা, আপন মায়ের চেয়েও আমি তাঁর কাছে বেশী স্নেহ পাই।"

ঠিক আর কোনদিন হলো না। বিশেষতঃ রামদাসের মৃত্যুর পর তার ওপর বাক্যবাণ যেন দিনের দিন বেড়ে চলেছে। এখান হতে চলেও সে যেতে পারত, কিন্তু যেতে পারে নি। কোথায় যাবে? দরিদ্র পিতৃগৃহে! সেখানে গেলে মেয়ের বিয়ে হওয়া যে শক্ত।

রামদাসের মৃত্যুর পর গুরুদাস কোনদিন এদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে নি। তাকে, তার মেয়েকে সে যেমনভাবে দুঃখ কষ্টের হাত হতে রক্ষা করে আসছে, সে কথা আর কেউ না জানুক, প্রমীলা জানে। তাই তার এ দুর্দ্দিনে সর্ব্বদা সে গুরুদাসের মঙ্গল কামনা করে। নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার তালে নয়, এমন মানুষ যে এ সংসারে কমই আছে তাও সে জানে।

সামান্য কথা নিয়ে তাকে বাড়িয়ে তোলা অন্নদার স্বভাব। এ কথা গুরুদাসেরও না জানা নয়। সকল কথাতেই সে নীরব শ্রোতা, অসহ্য হলে থামিয়ে দেয়, তাতে তার মনের কোন ভাবান্তর হয় না। হোক্ মা, তাঁকেও মাঝে মাঝে ধমক দিয়ে বা অনুনয় করে গুরুদাসকে থামাতে হয়। কোন সময় প্রমীলাকে বলে "বৌদি, একটুক্ষণ চুপ করে থেকো না, মা যখন বকাঝকা করবেন। শুনলে ত আর গায়ে ফোস্কা পড়বে না? সৎ-শাশুড়ী মনে না করে না হয় আপন মা-ই মনে করো।"

গুরুদাসের অন্তর যে কতখানি নির্ম্মল—কত মহৎ তা' ক্রমশঃ প্রমীলা জানতে পেরেছে। হোক্ সে তার চেয়ে ছোট কিন্তু অন্তর তার বড় উচ্চ। তাই এ দেবরটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করে, তার মনুষ্যত্বের তুঙ্গ শৃঙ্গের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

সকালের সমস্ত কাজ কর্ম্ম চুকিয়ে সকলকে খাইয়ে প্রমীলা মটকা কাপড়খানা পরে মৃত স্বামীর পটে পূজা করে। সে পূজার মন্ত্র নেই, শুধু হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের

আবেগে অশ্রু বিসর্জ্জন করা। তাঁর ছবিখানি যেন তাকে সৎ-পবিত্র আলোকের সন্ধান দেয়, বিপদে সাহস জোগায়, ক্ষণিকের দুঃখকে ধুয়ে মুছে দাঁড়াতে সাহায্য করে।

দরিদ্রের ঘরে জন্ম হলেও ছোট হতে প্রমীলা গান গাইতে শিখেছিলো। তার এ সঙ্গীত-প্রীতি আজও যায় নি। সময়ে সে দু-একটা গান গেয়ে দুঃখের ভার লাঘব করবার চেষ্টা করে।

সেদিন আপন কর্ত্তব্য সমাপন করে প্রমীলা শাশুড়ীর ঘরে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই অন্নদা পার্শ্ববর্ত্তী মহিলাদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, "বৌমা, এরা তকিপুর হতে এসেছেন, গুরুদাসের বিয়ের সম্বন্ধ করতে।"

তাঁদের দিকে চেয়ে হাত তুলে নমস্কার করে প্রমীলা বলল, "বেশতো—"

একজন বর্ষীয়সী বললেন, "বেশ নয় মা, এ দায় হতে আমাকে উদ্ধার করতেই হবে, তাই আমি নিজে এসেছি। তোমার সে ছোট বোনটিকে এ ঘরে ঠাঁই করে দিতেই হবে!"

"আমারও একটি ছোট বোনের দরকার, খুব ভাল হবে।"

বৈকালে গুরুদাস চীৎকার করতে করতে বাড়ী ঢুকল। কৈ আমার ছোট মা কোথায় গেল, ছোট-মা—"

অন্নদা আগন্তুক মহিলাদের দিকে চেয়ে বললেন, গুরুদাস এসে পড়েচে, বৌমা—ও বৌমা—"

"যাচ্ছি মা—" বলে প্রমীলা ভাঁড়ার ঘর হতে সাড়া দিল।

উঠানের এক পাশে মীরা এতক্ষণ তার পুতুলদের ঘুম পাড়াচ্ছিলো। গুরুদাসের ডাক কানে যেতেই সে কোলের পুতুলটা নামিয়ে রেখে সহাস্যে আগিয়ে এসে বলল, "কি বলচো কাকা?"

সুটকেশটা মীরার হাতে দিয়ে গুরুদাস বলল, "তোমার সুটকেশ—"

"সেণ্ট, সাবান—আনো নি?"

"আগে সুটকেশটাই খোল মা?"

সুটকেশটা খুলে দু-চক্ষু স্থির করে মীরা ডাকল, "ঠাকুমা মা সব্বাই এসো, দেখো কাকা আমার জন্যে কত কি এনেচে।"

অন্নদা মহিলাদল সহ বাইরে আসতেই গুরুদাস তাদের পাশ কাটিয়ে সরে গেল।

অন্নদা বললেন, "বড্ড ভালবাসে গুরুদাস, কেউ কিছু বলতেও সাহস করে না ওকে—বলে ও আমার ছোট মা।"

গুরুদাসের জলযোগান্তে অন্নদা কাছে এসে বসলেন, "ওঁরা তকিপুর হতে এসেচেন, তোর বিয়ের সম্বন্ধ করতে।"

মায়ের দিকে চেয়ে গুরুদাস বলল, "মেয়েরাই এসেচেন? কৈ কোন পুরুষ দেখচি না ত?"

"তাঁরা কেউ আসেন নি।"

"কাজের সুবিধা হবে বলে।"

"তা হতে পারে, এখন তুই কি বলচিস বল?"

"এখন বিয়ে করবনা—দেরী আছে।"

"সে কি বাবা? আমি যে ওঁদের একরকম কথা দিয়েচি—আমাদের ও-পাড়ার চাটুজ্যেদের আত্মীয় কিনা ওঁরা—আর মেয়েটিও ভাল—গতবার দুর্গা পূজার সময় দেখিচিও আমি—তাই অমত করতে পারলুম না।"

"তবে আর আমার মতের দরকার কি?"

প্রমীলা এতক্ষণ নীরবে বসে ছিলো। এবার গুরুদাসের দিকে চেয়ে বলল, যোগ্য ছেলে, তা একটা মতামত চাই বৈ কি ভাই। তা ছাড়া মা যখন এ বিয়েতে মত দিয়েচেন, তখন তোমার খুশী মনেই রাজী হওয়া উচিত।"

অন্নদা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, "ঠিক বলেচো বৌমা, কোন্‌দিন চোখ বুজি তার ঠিক নেই, এখন ভালয় ভালয় ওর ঘর-সংসার দেখে গেলেই আমার শান্তি।"

সে দিন সন্ধ্যায় গুরুদাসের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল।

* * *

গুরুদাসের সংসারে মমতা এলো, কিন্তু হৃদয়ে একবিন্দু মমতা নিয়ে এলো না। নিষ্ঠুর মনকে অকারণ চোখ রাঙিয়ে,—তার গতিপথকে প্রতিহত না করে লাগামবিহীন অশ্বের মত নিজেকে ছেড়ে দিল। ক্ষণে ক্ষণে একটা না একটা কিছু খুঁত ধরে কিংবা ছলাকলায় প্রমীলার সাথে সে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ করতো।

অন্নদা আপন পুত্রবধূর কথা সমর্থন করে প্রমীলাকে নিষ্ঠুরভাবে গালি-গালাজ করতেন, এমনকি তার শেষ পরিণামের কথা জানিয়ে শাসিয়ে, স্বীয় স্বেচ্ছাচারিতার অনুশাসন মেনে নেবার কঠোর আদেশ দিতেন।

প্রমীলা যতক্ষণ পারত মুখবুজে সহ্য করত, অসহ্য হলে দু-একটা কথার জবাব না দিয়ে থাকতে পারত না।

গুরুদাস সারাদিন একরকম বাইরে থাকে সুতরাং সে এসব ঝগড়াঝাঁটির কথা ভাল রকম জানত না, যদিও কিছু কানে আসত, গ্রাহ্য করত না।

মমতা স্বামীর কাছে কোন কথার সন্তোষজনক উত্তর না পেয়ে শেষে যখন তোষামোদ খোসামোদ করেও আপন উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারল না, তখন আরম্ভ করলে অভিমান, আর তার সঙ্গে যোগ করলে কপট অশ্রু, কিন্তু তাতেও গুরুদাস রইল অটল।

এবার মনের মধ্যে যুক্তি এঁটে স্বামীর উপস্থিতির সময় মমতা আরম্ভ করলে প্রমীলার সঙ্গে ঝগড়া। কিন্তু গুরুদাসের সতর্কবাণী এবং পৌরুষের কাছে মমতাকে হার মানতে হলো।

অন্নদা মমতার পক্ষ নিয়ে উত্তেজিত হয়ে ছেলেকে এ বিষয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবার দাবী জানাতেন।

গুরুদাস ম্লান হেসে বলতো, "মা, চিরদিন কারো সমান যায় না। দুর্ভাগ্য যখন আসে তখন এমনি করেই আসে। তাই বলে নিয়তির নির্ম্মম পরিহাসকে তার ভাগ্যদোষের সঙ্গে যদি আমরাও একভাবে দেখি—সে মানুষ কোথায় দাঁড়াবে?"

গুরুদাসের কথা মমতার মনঃপূত হলো না। এবার অন্তরের স্বরূপ খুলে সে প্রমীলাকে আক্রমণ করল। এতদিন ধরে যে ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে সে নিজেকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো, তার বিষক্রিয়া আরম্ভ হলো।

অনেক রকম মন্তব্যের পর মমতা বলে বসল, "ছোট মায়ের আবদার মেটানো ত নয়, এ এক লীলা। মনে করে সব, আমি কিছু বুঝিনা। ভগবান আছেন—তিনিই এর বিচার করবেন।"

প্রমীলার ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছিলো। মমতার কাছে এসে বলল, "ছোট-বৌ, আর যাই বল্‌বি বল্‌, মিথ্যে কলঙ্ক দিস্‌নে।"

শেষ পর্যন্ত মমতা বলে, "দিদি, মনে করোনা তুমি বিধবা হয়েচো বলে গাঁয়ের সব্বাই তোমার অপরাধ মার্জ্জনা করে হিত তাকায়, এ সধবার যাতে সর্ব্বনাশ না হয় সে কথাও তারা ভাবে। আর এ-ও বলে রাখচি, এমনভাবে আমার সর্ব্বনাশ করলে, আমি কিছুতেই মুখ বুজে সইব না।"

"তোর দোষ নেই ছোট-বৌ, নির্দ্দোষ ব্যক্তিও পূর্ব্ব জন্মের পাপের ফলভোগ করে।"

অন্নদা এতক্ষণ নীরবে জপের মালা ঘোরাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই এত চেঁচামেচির মধ্যে মন বসাতে পারছিলেন না। এবার মালাটা তুলে রেখে ক্রুদ্ধভাবে প্রমীলাকে বললেন "বৌমা, ছোট বৌ সে যুগের কলা বৌটি নয়—সোমত্ত মেয়ে, তা' ছাড়া ও যে মিথ্যে কথা বলবেন না, তা' আমি জানি। হ্যাঁ, ওদের জাত বংশ তেমন নয়। কিন্তু ওকে ছোটটি পেয়ে যে, যাদের খাবে-পড়বে, তাদেরই সর্ব্বনাশ করবে—এই বা তোমার কি আক্কেল শুনি?"

অশ্রু সজল নেত্রে শাশুড়ীর দু-পা ছুঁয়ে প্রমীলা বলল "মা, আপনি বিশ্বাস করুন, এ কথা মিথ্যে—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি।"

"থাক্—থাক্, খুব হয়েছে।" বলে অন্নদা তাঁর পা দুটো সরিয়ে নিলেন।

প্রস্তর মূর্ত্তিবৎ প্রমীলা নির্ণিমেষ নয়নে চেয়ে রইল অন্নদার হিংস্র মূর্ত্তির দিকে।

রাত্রির অন্ধকারে বিশ্বজগৎ যখন নিমজ্জমান তখন প্রমীলা তার অসহায় অবস্থার কথা ভাবতে বসে। সারাদিনের ক্লান্তিতেও ঘুম আসে না, নিঃশব্দে বারান্দায় বসে রাত্রির ছায়ামূর্ত্তির দিকে চেয়ে ভাবে, এ বিরাট পৃথিবী যাদের নিয়ে গঠিত তাদের মধ্যে কত লোক যে অসহায়ভাবে বিধাতার অনুকম্পার উপর নির্ভর করছে তার ইয়ত্তা নাই। কেন এমন হয়? কেন পবিত্র মানুষের গায়ে কলঙ্কের আঁচড় লাগে, কেন মিথ্যেকে সত্যরূপে প্রতিপন্ন করতে মানুষের জিহ্বা এতটুকু কাঁপে না?

এ সব কথার উত্তর সারা রাত অন্তরকে মন্থন করেও সে পায় না। বারবার চোখের জল আর মানসিক উদ্বেগ আচ্ছন্ন করে তোলে তার শোকাতুর মন।

মরণে তার ভয় নেই, এ কলঙ্কের কথা শুনবামাত্র আত্মহত্যাও সে করতে পারত কিন্তু তাকে যে বাঁচতেই হবে। নাবালিকা মেয়ে তার। নিষ্পাপ শিশু-মূর্ত্তির দিকে যখন সে চায়, তখন যে মরতে প্রাণ চায় না, নাড়ীর সহস্র বন্ধন মুস্‌ড়িয়ে উঠে। তা ছাড়া তার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আকুল হৃদয় পরিতৃপ্ত হয় না।

দিন কেটে যাচ্ছে। এ-দিকে প্রমীলার মনপ্রাণ যেন দিনের দিন অবসন্ন হয়ে পড়ছে। আহারে, নিদ্রায়, বিশ্রামে কিছুতেই রুচি নেই, সরল হৃদয় চাইছে

ধরাপৃষ্ঠ হতে চির-শান্তি ; কিন্তু সে শান্তির পথে আছে এক বাধা—সে বাধার মায়া কাটাতে মাতৃ-হৃদয় কঠিন হতে পারছে না।

ক্রমশঃ মমতার অহেতুক তিরস্কার ও বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হয়ে মনপ্রাণ শক্ত করে প্রমীলা একদিন বলল "ছোট-বৌ, আমার মনের আশা ছিল তোর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদে দিন কাটাব, তোর ছেলেমেয়ে হলে তাদের নিয়ে শেষের দিনগুলো বেশ কেটে যাবে ; কিন্তু সে আশা আমার পূর্ণ হলো না।"

ঝঙ্কার দিয়ে মমতা বলল "সে আশা পূর্ণ করবার আগে গলায় দড়ি নাও, না হয় ডুবে মর কিংবা বিষ খাও।"

উদ্বেগ-কণ্ঠে প্রমীলা বলল "পারব না ছোট-বৌ, আত্মঘাতী হতে পারব না। আমার মেয়ে মীরা আছে, তাকে কার কাছে দিয়ে যাব, কে তার ভার নেবে ?"

"যমে নেবে।"

"এত বড় কথাটা তুই বলতে পারলি ছোট-বৌ ? তুইও একদিন সন্তানের মর্ম্ম বুঝবি, সেদিন বুঝতে পারবি, সন্তানের প্রতি মায়ের টান অহেতুক নয়—হৃদয় পিঞ্জরের সঙ্গে সম্বন্ধ।

কিছুক্ষণ পর পুনরায় প্রমীলা বলল "আচ্ছা, ছোট-বৌ, আমরা চলে গেলে কি তুই সুখী হোস্ ?"

"অন্ততঃ একবিন্দুও দুঃখিত হই না ; আর কেন হবো, আপন সুখ-শান্তি কে না চায় ?"

অন্নদা স্নান করতে গিয়েছিলেন। মমতার কাছে সব কথা শুনে উচ্চকণ্ঠে বললেন, "তা যাক্ না, কোন চুলোয় যাবে ! এসে থেকে শুধু তেজ-ই দেখালে, আ-মর্—লজ্জাও করে না ?"

মমতার দিকে চেয়ে পুনরায় বললেন "খবরদার, বাধা দিও না বৌমা, মা-বিটিতে যেখানে শান্তি পায় সেখানে যাক্ !"

প্রতিবেশীদের সপ্রশ্ন দৃষ্টি এড়াবার জন্যে প্রমীলা মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে আস্তে আস্তে নদীপথের দিকে চলে গেল।

মীরা তখন জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য। যাবার কালে অন্নদা কি মমতা কেউ বাধা দিল না তাদের। প্রমীলার হৃৎপিণ্ডখানা মীরার জন্যে অজানা

আশঙ্কায় কেঁপে উঠতে লাগল আর অজস্রধারে দু-গাল বেয়ে ঝরতে লাগল দুর্দ্দমনীয় অশ্রু।

রাত্রিতে গুরুদাস বাড়ী ফিরে এসে অন্নদাকে দেখতে না পেয়ে ডাকল "ছোট-মা কেমন আছে বৌদি—বৌদি—"

মমতা রান্নাঘর হতে বেড়িয়ে এসে বলল "তোমার বৌদি, ছোট-মা দু জনেই চলে গেছে।"

বিস্মিত ভাবে গুরুদাস বলল "কোথায়?"

"বলে গেছে, বাপের বাড়ী!"

"বাপের বাড়ী? কখন গেল?"

"সন্ধ্যের সময়—"

"কেন?"

"তা জানি না—"

"জান না?" বলে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে গুরুদাস বলল "তোমার জন্যেই যে গেছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারচি।"

"তার হবে কি?"

"কি হবে? হবে কি জান? হয় তো পনের বিশ কোশ রাস্তা নৌকোয় যেতে যেতে মেয়েটাকে নদীর জলেই ফেলে দিতে হবে।"

"কেন?"

"কেন? তার আগে বল দেখি, যদি তুমিই তার মত অবস্থায় পড়তে, কি করতে? তোমার সন্দেহ ভুল—মনে করো না, গুরুদাস একটা পশু!" বলে গুরুদাস সেই অবস্থাতেই ঘর হতে ছুটে বেড়িয়ে গেল।

মমতা পিছু ডেকে বলল "কোথায় যাচ্চ?"

গুরুদাস তখন বিপুল বেগে ছুটে চলেছে নদী-পথের দিকে।

নদীবুকে একখানা ছোট নৌকা জ্যোৎস্নালোকে ধীরে ধীরে আগিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দের সঙ্গে নৌকার মাঝি গাইছে প্রাণ-খোলা গান। ভিতরে প্রমীলা মেয়ের মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ আগে মীরার চৈতন্য ফিরে এসেছে। হ্যারিকেনের আলোয় মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে প্রমীলা বলল "মীরা, কেমন লাগছে মা?"

বেদনা-বিধুর মনের কোণে এ ছোট্ট মেয়েটির অসুস্থ অবস্থাতেও এক আলোড়ন জেগে উঠেছে। সে অপূর্ব্ব আলোড়ন তার শিশু মনের অন্তস্তলে

বারবার দিচ্ছে খোঁচা। এত দিনের স্নেহ, ছোট-মা বলে ডাক—একি সহজে ভোলা যায়? মায়ের মুখের দিকে চাইতেই মীরার চোখে পড়ল প্রমীলার দু-চোখ অশ্রু-সিক্ত। মৃদু হেসে বলল, "তুমি কাঁদচো কেন মা, আমি ত ভালই আছি?"

মাথার উস্কোখুস্কো চুলের গোছায় আঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে প্রমীলা বলল "মাথাটা ছেড়েচে মা? সত্যি বল্—"

সাতদিন ধরে জ্বরে ভুগছে মীরা। আজও সকালে ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। এ অবস্থায় তাকে নদীপথে কি সহজে এনেছে প্রমীলা! কত বেদনা দুঃখে সন্ধ্যার পর মেয়েকে কাঁধে ফেলে কত সন্তর্পণে এসে উঠেছে নৌকায়।

নৌকার মাঝি বাধা দিয়ে বলেছিলো "কাল দুপুর ছাড়া পৌঁচাতে পারব না মা, তা ছাড়া শেষে কোন বিপদে পড়ব না ত?"

প্রমীলা বলেছে "তোমাদের কোন ভয় নেই মাঝি, আমার ভাগ্য কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।"

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে মীরা বলল "সন্ধ্যে বেলায় চলে এলে, বাড়ী এসে কাকা আমাদের কত খুঁজবে বল দেখি? হয় তো তার ছোট-মাকে দেখতে না পেয়ে সারারাত্ত কাঁদবে, তার চেয়ে ফিরে চল না মা?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রমীলা বলল, "ফিরে যাবার মুখ আর নেই মা, মনকে পাষাণ করে যখন একবার বেড়িয়ে এসেচি, তখন কেমন করে আর সেখানে গিয়ে দাঁড়াব?"

"কেন, আমি সব কথা কাকাকে বলব, সব শুনলে কি কাকা আমাদের তাড়িয়ে দেবেন? তুমি জান না মা, কাকা সে রকম নয় বরং ফিরে গেলে খুশীই হবেন—যাবে মা?"

চোখ দুটো মুছে প্রমীলা বলল, "না মা, আর গিয়ে কাজ নেই।"

"কেন মা?"

মেয়ের মুখে "কেন" প্রশ্নের উত্তর এখনও পর্য্যন্ত ভেবে স্থির করতে পারে নি প্রমীলা। এসেছে শুধু একটা সংসারে ঘুণ ধরিয়ে না দিয়ে সহজভাবে গুরুদাসের সংসারের যাত্রাপথকে প্রশস্ত করতে। দীর্ঘ দিন ধরে যার করুণায় তারা এতদিন কাটালে, তার জীবনকে সুস্থ করতে, শান্ত করতে।

গুরুদাসের বিয়ের পর ছ'মাস কেটে গেল। ছ'মাসের মধ্যে একটা মাসও

প্রমীলা মনে শান্তি পায় নি। তাকে বারবার আচম্বিতে আক্রমণ করেছে মমতা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন, শাশুড়ীর কানে কুৎসা রটানো—শেষ পর্য্যন্ত গাঁয়ের মেয়েদের কাছে নানারকম ইতর কথাও বলতে ছাড়েনি তার নামে। প্রমীলা অসহায়ভাবে তার কাছে জানিয়েছে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা, দরিদ্র বাপের অবস্থার কথা, একমাত্র মেয়ের বিয়ের কথা কিন্তু মমতা তার কোন কথা শুনতে চায় নি।

শেষ পর্য্যন্ত মেয়ের মাথায় হাত রেখে প্রমীলা বলেছে, "ছোট-বৌ বিশ্বাস কর, এখনও চন্দ্র-সূয্যি উঠছে—আমি মেয়ের মাথায় হাত রেখে বলচি—যদি মিথ্যে বলে থাকি, জন্ম জন্মান্তর ধরে যেন ঠিক এরকম শাস্তি পাই।"

ক্রূর হাসি হেসে মমতা তাকে অপমানিত করেছে, বিশ্বাস করতে চায় নি তার একটি কথা।

তখন বোধ হয় রাত বারটা। গুরুদাস নদীর পাশে পাশে ছুটে চলেছে পশ্চিম দিকে। জ্যোৎস্না রাত, তাই রাস্তা চলতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছেনা তার। তবু কত কাঁটা যে পায়ের তলায় ফুট্‌ছে তার হিসেব নেই—পাগলের মত সে ছুটছে, বিরাম নেই।

তখন মাঝিদের চোখে ঘুম আসছে। একজন বলল "আর পারচি না, ঘুম আসচে।"

অন্যজন বলল, "গঞ্জের ঘাটে বাঁধবো, আর পোয়াটেক্ রাস্তা।"

হঠাৎ পিছন থেকে কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা। "মাঝি নৌকা থামা—মাঝি—"

প্রথম কয়েকটা ডাক ওদের কানে যায় নি। এবার ভীত কণ্ঠে একজন বলল, "কে ডাকচে না?"

অন্যজন বলল, "ভয়ের জায়গা—জোরে চালা।"

হ্যারিকেনের আলো লক্ষ্য করে গুরুদাস ডাকছে। তা' ছাড়া এতটা পথ অবধি একখানা নৌকাও সে এ পথে যেতে বা আসতে দেখে নি, সুতরাং আন্দাজে ঠিক করল, হয়ত এই নৌকাখানাই হবে।"

পুনরায় অনেকটা কাছে চিৎকার শুনতে পাওয়া গেল। মাঝি নৌকা থামা, আমি চোর-ডাকাত নই—প্রতাপপুরের গুরুদাস। ওরে থামা, আর ছুটতে পারচি না—আমার বৌ-দি—ছোট-মা—ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেচি।"

প্রমীলা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল। হঠাৎ জেগে উঠে বলল, "মাঝি, নৌকা থামাও—ঠাকুরপো ডাকচে।"

"তাঁকে কোথায় পাবেন মা? ও অন্য কেউ হতে পারে।"

"আমার ছোট-মাকে একবার দেখতে দে—ওরে নৌকো থামা—মাঝি—"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রমীলা বলল, "মাঝি—থামাও"।

কূলের কাছে নৌকা ভিড়তেই গুরুদাস লাফিয়ে নৌকায় উঠে হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "বৌদি, আমার ছোট-মা কৈ?"

মীরা এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলো। গুরুদাসের কণ্ঠস্বর শুনে বলল, "কে, মা?"

ভগ্নকণ্ঠে প্রমীলা বলল, "তোর কাকা।"

উত্তেজনা বশে ধড়মড়্ করে উঠে বসে মীরা গুরুদাসের গলাটা জড়িয়ে ধরে বলল, "কাকা, তুমি এসেচো? আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চল না, মা কিছুতেই আমার কথা শুনচে না।"

মীরাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে গুরুদাস বলল, "সেই জন্যেই এসেচি মা, আমার ছোট-মাকে ছেড়ে কি থাকতে পারি?"

কয়েক মিনিট পর গুরুদাস বলল, "কেন এমন করে এলে বৌদি? আমাকে কি এ সম্বন্ধে একটা কথাও বলার প্রয়োজন মনে করো নি? আমার ছোট-মাকে মেরে ফেলবে তুমি?"

প্রমীলা এতক্ষণ নীরবে মাথা নীচু করে বসেছিলো। এবার চোখ দুটো মুছে বলল, "ঠাকুর-পো, কেন আমার জন্যে তোমার পাতানো সংসার নষ্ট হয়ে যাবে? আর সংসার ত আর শুধু তোমার একার নয় ভাই—ছোট-বৌও তার মালিক।"

"দুনিয়ার মালিক ভগবান, রেখে দাও তোমার ছোট-বৌ! ফিরে চল বৌদি, তুমি জাননা দাদার মৃত্যুশয্যায় আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলুম—তাঁর পা ছুঁয়ে শপথ করেছিলুম—সেদিন হতে যে আমি তোমাদের ভার নিয়েছি।"

প্রমীলা বলল, "এত কেলেঙ্কারীর পরও কি সেখানে আমার যাওয়া উচিত মনে কর?"

ধরাগলায় গুরুদাস বলল, "আসল সোনার জ্যোতি কোনদিন ম্লান হয় না বৌদি। তুমি বিশ্বাস কর—আমি থাকতে তোমার আর কোন অসম্মান হতে দেবো না।"

মীরা বলল, "তাই চল মা—আমরা না গেলে কাকা কত কষ্ট পাবে বল দেখি?"

মীরার মাথায় হাত রেখে গুরুদাস বলল, "ছোট-মা, তুই আমার মনের কথা বুঝতে পেরেচিস?"

প্রমীলার আদেশে নৌকা বিপরীতগামী হলো।

'তিমির-হৃদ্‌বিদারণ
জ্বলদগ্নি-নিদারুণ,
মরুশ্মশান-সঞ্চর,
শংকর শংকর।
বজ্রঘোষ-বাণী
রুদ্র, শূলপাণি,
মৃত্যু-সিন্ধু-সন্তর
শংকর শংকর।'

—মুক্তধারা

ব্রহ্মসূত্রম্

।। শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ অবধূত ।।

(২৪)

স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ।। ৩।৪।১৪

অথবা বিদ্যা-স্তুতির জন্যই কর্ম্মের অনুমতি বলা যাইতে পারে। 'কুর্ব্বন্নেবেহ' মন্ত্রে কর্ম্ম-জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গিগত উক্তির অবিশেষ রহিয়াছে। অথবা বিদ্যা প্রকরণ ধরিলে বিদ্যারই অঙ্গরূপে কর্ম্মের অনুমতি হইতেছে—এইরূপও বলা যাইতে পারে। মন্ত্রের শেষে বলা হইয়াছে—'ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে'—কর্ম্ম যখন কর্ত্তার অর্থহীন অকর্ম্ম, তখনই তাহার লেপ কর্ত্তার উপর পড়ে না, তখন তাহা জ্ঞানেরই অঙ্গ কিম্বা মূর্ত্তিমৎ জ্ঞানই। 'ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে' অংশ বিদ্যার স্তুতিই করিতেছে এবং এই স্তুতি দ্বারা কর্ম্মেরই অনুমতি হইয়াছে বুঝিতে হয়। পুরুষোত্তমের নয়নে নয়ন মিলাইয়া ভজনের পথ বাহিয়া প্রাণের স্তরে যাহারা চলিয়াছেন, তাঁহারা বুদ্ধি-স্তরে কোন্ ধারা অবলম্বন করিবেন, তাহাই বলিবার জন্য পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

কামকারেণ চৈকে ।। ৩।৪।১৫

এক সম্প্রদায় কামকার দ্বারা (চলিবার পরামর্শ দিয়াছেন)

যাহার সম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন—'নৈব তস্য কৃতেনার্থ নাকৃতেন ইহ কশ্চন,' 'কৃতাকৃতাৎ অন্যত্র', সেই পুরুষের চলিবার ধারা নিশ্চয়ই তাহার অন্তর্নিহিত মূর্ত্তিমান কাম পুরুষোত্তম-প্রেরণার উপরই নির্ভর করিবে; কেননা ইহার নাহঙ্কৃতভাব সিদ্ধি হইয়াছে, পুরুষোত্তম-কামই ইহার অহঙ্কারের প্রেরণা যোগায়। পুরুষোত্তম-কামেই তাহার যাহা-কিছু 'কার' বা কার্য্য; তাই সে কামকারের পথে চলে। এই সম্প্রদায় হইতেছে অবধূতাবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষদের। ইহাদের সম্বন্ধে অবধূতোপনিষদ লিখিতেছেন—'স্বৈরং স্বৈরবিহরণং তৎ সংসরণম্। সাম্বরা বা দিগম্বরা বা। ন তেষাং ধর্মাধর্মৌ ন মেধ্যামেধ্যৌ। সদা সাংগ্রহণ্যেষ্ট্যাশ্বমেধমন্তর্যাগং যজতে। স মহামখো মহাযোগঃ। কৃৎস্নমেতচ্চিত্রং কর্ম্ম। স্বৈরং ন বিগায়েত্তন্মহাব্রতম্। ন স মূঢ়বল্লিপ্যতে। যথা রবিঃ সর্বরসান্ প্রভুঙ্‌ক্তে

হুতাশনশ্চাপি হি সর্বভক্ষঃ। তথৈব যোগী বিষয়ান্ প্রভুঙ্‌ক্তে ন লিপ্যতে পুণ্যপাপৈশ্চ শুদ্ধঃ॥' ৬। অবধূত লোকসংগ্রহার্থ কখনও বা সংসারী, কখনও সন্ন্যাসী হইতে পারেন, সংসার-সন্ন্যাসেরও নানা স্তরে বিহার করিতে পারেন। কখনও বা তিনি কর্ম্মী, কখনও বা জ্ঞানী। অবধূতের কোনও বিশেষ সম্প্রদায় নাই, সাধনার বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট ধারাও না থাকিতে পারে। অবধূত শুধু স্বরূপানুষ্ঠানরত থাকেন। কলির সন্ন্যাস অবধূতাশ্রমে—'অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাসঃ উচ্যতে'। কলিযুগে প্রাকৃতিক বিধানানুসারেই কোনও পুরুষেরই কোনও নির্দ্দিষ্ট ধারা ধরিয়া চলিবার যো নাই, প্রকৃতি মানুষকে অনেকখানি অবধূত বানাইয়া দিয়াছে। বর্ত্তমান আবেষ্টনে মেধ্যামেধ্য বিচার চলে না, কি যে কাহার ধর্ম্ম, কি যে কাহার অধর্ম্ম নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার হইতেছে; এই অবস্থাকে পুরুষোত্তম-স্তরে গড়িয়া তুলিবার জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে অবধূত সম্প্রদায়। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—'অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীদিগের বেদান্তই প্রধান গ্রন্থ। তাহা গৃহস্থ বেদব্যাস-রচিত। প্রকৃত উদাসীন-অদ্বৈতজ্ঞানী গৃহস্থ-অদ্বৈতজ্ঞানীকে অবজ্ঞা করেন না।······মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমতে ব্রাহ্মণ অবধূত হইলেও যাহা হন, শূদ্র অবধূত হইলেও তাহা হন। সেই জন্য শূদ্র অবধূত হইয়া সামবেদীয় মহাকাব্য উচ্চারণে অন্যকে সন্ন্যাস দিলেও দোষ হয় না। অবধূত হইলে শূদ্রও সামবেদে অধিকারী হন্ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুসারে স্পষ্টই বোঝা যায়।

···মহানির্ব্বাণ তন্ত্রানুসারে কোনও অবধূত গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিলেও তাহার প্রত্যবায় নাই। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল না করিলেও কোনও প্রত্যবায় নাই। কারণ ঐ তন্ত্রানুসারে অবধূত গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিলে কোন ফল লাভ করেন না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে অবধূত নিজ ইচ্ছা অনুসারে সন্ন্যাসের চিহ্ন সকল না রাখিয়া গৃহস্থের চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কার্য্য সকলও করিতে পারেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র অনুসারে শূদ্র অবধূত হইলে তিনি আর শূদ্র থাকেন না। সেইজন্য তাঁহার চতুর্ব্বেদ এবং প্রণবেও অনধিকার থাকে না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রমতে পঞ্চবর্ণ অবধূত হইলেই নারায়ণ হন। তাঁহাদের পরস্পর কোনও প্রভেদই থাকে না।

অবধূত সন্ন্যাসী, অবধূত অদ্বৈতজ্ঞানী, আত্মজ্ঞানী, অবধূত আত্মা, অবধূত নিত্য। সেইজন্য তাহার জন্মই হয় নাই। তাহার জন্ম হয় নাই বলিয়া তাহার জাতিও নাই।

স্বাধীনবৃত্তি-অবলম্বী অবধূতের ন্যায় ধূলিধূসরিত গাত্র হইলেই প্রকৃত অবধূত হওয়া যায় না। কত জন্তুরও তো ধূলি ধূসরিত গাত্র—তাহারা, কি অবধূত হইয়াছে ?

অবধূত বৃত্তি অপেক্ষা স্বাধীন বৃত্তি আর নাই। সে বৃত্তি অবলম্বন ইচ্ছা করিলেই করা যায় না। আত্মজ্ঞান যাহার হইয়াছে তিনিই সে বৃত্তি অবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। নিত্যধর্ম্ম পত্রিকা ১৩২২, আষাঢ় ষষ্ঠ সংখ্যা।

উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ৩।৪।১৬

উপমর্দ্দও (তাঁহারা আমনন করেন)

কর্ত্তৃতন্ত্র পুরুষ বুদ্ধির স্তরে দাঁড়াইয়া শব্দের অর্থগত, সাধনাগত, আচারগত যত কিছু সংস্কার আঁকড়াইয়া ধরিয়া এক একটী একান্ত মতবাদের বা পথের স্থাপনা করিয়াছেন। প্রাণ-সাধক অবধূত কোনও বিধির একান্ত অনুগত বা বিদ্বেষ্টা না হইয়া অথচ প্রত্যেকটীরই একান্ততার উপমর্দ্দন করিয়া, প্রত্যেক শব্দ-অর্থের, প্রতি সাধনার, প্রতি আচারের স্বরূপ অনুসন্ধানপর থাকেন। কোনও বিধি-বিধানে আটকাইয়া যাওয়া প্রাণ সাধনায় নাই। প্রাণ-সাধকের জীবনে সবই 'রস', অনাদি অনন্ত প্রবহমান। দৃষ্টিগত, দৃশ্যগত, দর্শনগত সব সংস্কারের উপমর্দ্দনই প্রাণ-সাধনার প্রথম কথা, কেননা এখানে আরম্ভ হইতেছে পুরুষোত্তম-দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া, চারি চোখের মিলন ঘটাইয়া পুরুষোত্তম-জীবনে জীবন চালাইবার সঙ্কল্প লইয়া। প্রাণের স্তরে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের এই উপমর্দ্দন সম্ভব বলিয়াই বিদ্যা-কর্ম্মের যৌগপদ্য সম্ভব হয়। তাই হারীত স্মৃতিতে এইরূপ শ্লোক আছে—

যথাশ্বা রথহীনাশ্চ রথাশ্চাশ্বৈর্বিনা যথা।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ উভাবপি তপস্বিনঃ॥
যথান্নং মধুসংযুক্তং মধু চান্নেন সংযুতম্।
এবং তপশ্চ বিদ্যা চ সংযুক্তং ভেষজং মহৎ॥
দ্বাভ্যামেব হি পক্ষাভ্যাং যথা বৈ পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞান কর্ম্মাভ্যাং প্রাপ্যতে ব্রহ্ম শাশ্বতম্॥

ভজনে যে শুধু কর্ম্মেরই উপমর্দ্দ হয় তাহা নয়, বিদ্যারও হয়। প্রারব্ধ নষ্ট করিবার ক্ষমতা বিদ্যার নাই; ভোগদ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় হইলেই তবে বিদেহ কৈবল্য লাভ হয়, ইহাই বিদ্যাবাদীদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পুরুষোত্তম-ভজনে প্রারব্ধও জারিত হয়। ভজন বিদ্যাকে জারিত করিয়া ভজনারূপে প্রকাশ করিলেই তবে সেই বিদ্যার প্রারব্ধ নাশ করিবার সামর্থ্য প্রকাশ পায়।

ঊর্দ্ধরেতঃস্সু চ শব্দে হি ॥ ৩।৪।১৭

ঊর্দ্ধরেতঃ পুরুষদের জীবনে ও আশ্রমে (এইরূপ স্বৈরভাব ও উপমর্দ্দন দৃষ্ট হইয়া থাকে); শ্রুতি-বাক্যে ইহা সুস্পষ্ট।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিতেছেন—"তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিরমৌনং চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব"—৩।৫।১। ব্রাহ্মণই ঊর্দ্ধঃ-রেতা পুরুষ। ব্রাহ্মণের আচার সম্বন্ধে "ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ" এই রূপ প্রশ্ন করা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন "যেন স্যাৎ তেন ঈদৃশ এব"—যে কোনও আচরণেই তিনি থাকুন না কেন, সেই আচরণ সত্ত্বেও তিনি উক্ত লক্ষণ ব্রাহ্মণই বটেন। কিন্তু এই স্থানের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর লিখিতেছেন—"যেন কেনচিচ্চরণে নেতি স্তুত্যর্থ যেয়ং ব্রাহ্মণাবস্থা, সেয়ং স্তূয়তে ন তু চরণেঽনাদরঃ"। ব্রাহ্মণ বলিতে তিনি বিশেষ আচরণযুক্ত পুরুষ এবং আচরণ বলিতেও তিনি নিশ্চয়ই সাত্ত্বিক-রাজসিক-তামসাচার ভেদ করিয়া ব্রাহ্মণের জন্য বিশেষ বিশেষ আচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেই বলিয়াছেন 'ন তু চরণে-ঽনাদর'। তাঁহার মতে 'যেন স্যাৎ' ইহা শুধু ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতিমাত্র, ব্রাহ্মণ বিশেষ কোন আচার অবলম্বন করিয়াই চলিতে বাধ্য। পুরুষোত্তম-স্তরে কোনও আচারেরই কোনও চূড়ান্ত অর্থ নাই, কোনও বাধ্যবাধকতা নাই, অর্থগত কোনও সংস্কারই চূড়ান্তভাবে তাহার থাকিতে পারে না। জীবনবল্লভ পুরুষোত্তম-স্তরে প্রতি শব্দই সর্ব্বার্থ, প্রতি আচারই সর্ব্বাচার সমন্বিত। সত্ত্বঃ-রজঃ-তমঃ-এর কোনও চূড়ান্ত রূপ জীবনে চলে না। ঊর্দ্ধ-রেতাঃ পুরুষ সর্ব্ব সংস্কারাতীত, তাই যে কোনও সংস্কারকে জীবনের অগ্র-গতিতে কাজে লাগাইয়া চলিয়া যাইতে পারেন। ঊর্দ্ধরেতাদের আদর্শ চতুর্ব্বর্ণ চতুরাশ্রম-সমন্বিত শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণাদির জীবন ইহার দৃষ্টান্ত। সেই জন্যই তো শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র, ব্রহ্মচারী-গৃহী-বানপ্রস্থী-

সন্ন্যাসীদ্বারা সমভাবেই ভজনীয় হইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবরুদ্ধসৌরত, আত্মারাম হইয়াই অরীরমৎ। বৃন্দাবনের রাসলীলা উর্দ্ধরেতাঃ পুরুষোত্তমেরই ক্রীড়ামাত্র। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ববর্ণ সমন্বিত, সর্ব্বাশ্রম সমন্বিত। কোনও বর্ণের বা আশ্রমের সংস্কার তাঁহার জীবনের অগ্রগমনকে আটকাইতে পারে নাই। তাই তিনি 'ভিন্নসেতুঃ'। সেতু শব্দের অর্থ আলি, সংস্কারে সংস্কারে যে সীমারেখা বা আলি রহিয়াছে, জীবনের প্রবাহে যিনি সেই আলি ভাঙ্গিয়া অথচ সকলের সব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া বহিয়া যাইতে পারেন, তিনিই অবধূত, জীবনবল্লভ পুরুষোত্তম। বিধি-প্রতিষেধ স্থির হইবে আবেষ্টনের সঙ্গে জীবন-ধারার সামঞ্জস্যের দিকে চাহিয়া। চূড়ান্ত বিধি বা চূড়ান্ত প্রতিষেধ বলিয়া জীবনে কিছুই নাই। যুগে যুগে অবস্থায় অবস্থায় বিধি প্রতিষেধের রূপ ভিন্ন ভিন্ন হইতেই হইবে যদি পুরুষকে একটী জীবন্ত মানুষ হইতে হয়। উর্দ্ধরেতাঃ একটী জীবন্ত মানুষ; সকল দেশে, সকল কালে, সকল অবস্থায়, সকল বর্ণে, সকল আশ্রমে তাহার গতি অবারিত ও স্বাধীন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এই উর্দ্ধরেতাদের আশ্রম কি স্বতন্ত্র না ব্রহ্মচর্য্য গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাশ্রমেরই কৌশলমাত্র, স্তুতিমাত্র? ইহারই মীমাংসার জন্য পরবর্ত্তী সূত্র সমূহের অবতারণা।

পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ৩।৪।১৮

জৈমিনি আশ্রমত্রয়ের মধ্যেই উর্দ্ধরেতাদের আশ্রমের পরামর্শ দেন; কেননা উহার কোনও চোদনা নাই। প্রত্যক্ষ শ্রুতি এই আশ্রম স্বাতন্ত্র্যের অপবাদই দেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি শুনাইতেছেন—'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি॥" ২।২৩।১ ধর্ম্মস্কন্ধ তিনটি; একটি স্কন্ধ হইতেছে যজ্ঞ-অধ্যয়ন-দান, ইহা নিশ্চয়ই গৃহস্থাশ্রম। দ্বিতীয় স্কন্ধ হইতেছে তপস্যা অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রম; তৃতীয় স্কন্ধ হইতেছে আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী। ইহারা সকলেই পুণ্যলোকগামী হন্; ব্রহ্মসংস্থ হইলেই ইহারা প্রত্যেকে অমৃতত্ব লাভ করেন। এই শ্রুতি-বাক্যের মধ্যে তিন আশ্রমেরই বিধান রহিয়াছে। 'ব্রহ্মসংস্থঃ অমৃতত্বমেতি'—এই যে উর্দ্ধরেতাদের অবস্থা, তাহা হইতেছে আশ্রমত্রয়ের স্তুতিমাত্র। স্তুতিমাত্র হিসাবেই সন্ন্যাসাবস্থার পরামর্শ আশ্রমত্রয়ের

মধ্যে মুনি জৈমিনি মনে করেন। এই সন্ন্যাস অবস্থামাত্র, আশ্রম বিধি নাই—ইহাই জৈমিনির মতবাদ। কেননা প্রত্যক্ষ শ্রুতি এই সন্ন্যাসাশ্রমের অপবাদ দিতেছে—তাই সূত্রকার বলিতেছেন 'অপবদতি হি', 'বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে', 'আচার্য্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ' তৈঃ ১।১১।১, 'নাপুত্রস্য লোকোঽস্তি ইতি তৎসর্ব্বে পশবো বিদুঃ' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা গার্হস্থ্যেরই মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রুতিতে 'যে চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপঃ ইত্যুপাসতে' ছা ৫।১০।১, 'তপঃ শ্রদ্ধে যে হ্যুপবসন্ত্যরণ্যে' মুণ্ডক ১।২।১১—এই যে সব দেবযানের উপদেশ রহিয়াছে, তাহাদ্বারাও সন্ন্যাসাশ্রমের উপদেশ পাওয়া যায় না। "তপঃ এব দ্বিতীয়"—এই শ্রুতি-বাক্যে সন্ন্যাসাশ্রম সন্দিগ্ধ। শ্রুতিতে যখন বলা হইয়াছে 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি, (বৃঃ ৪।৪।২২), ইহা লোকের স্তবমাত্র। এখানে সন্ন্যাসের বিধি নাই। এই ভাবে সন্ন্যাস জৈমিনির মতানুসারে আশ্রমত্রয়ের অমৃতত্ব লাভ করিবার একটী কৌশলমাত্র। সন্ন্যাসাশ্রম নামে বিশেষ কোনও আশ্রমান্তর থাকিলে ভাবুকতার সৃষ্টি হইতে পারে, সর্ব্ব লোক বর্ত্তমান যুগের মত কর্ম্মকে অনাদর করিয়া, কর্ম্মত্যাগ করিয়া ওপারে বৈকুণ্ঠের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ইহলোকে পরলোকে পাছে ভ্রষ্ট হয়, তাই পরম কারুণিক জৈমিনি কর্ম্মের ভিত্তিকে পাকা করিয়া, বর্ত্তমান ভজনেরই মহিমা স্থাপন করিয়া কর্ম্মের উপর নৈকর্ম্ম্যের ব্রহ্ম-সংস্থান গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ দিয়াছেন। তাঁহার পরামর্শমতে ব্রহ্মসংস্থ হওয়ার জন্য গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগের প্রয়োজন নাই। সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরও মাতৃসেবা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য যে বেদনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রেরণা কত গভীর। এই প্রেরণাকে অস্বীকার করা আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। শ্রুতিও 'বীরহা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ইহাই বলিয়াছেন।

নদীয়া চলহ, মাতাকে কহিয় নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার ॥
কহিয় তাঁহারে—তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ ॥
যে দিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেই দিনে আমি অবশ্য করিয়ে ভক্ষণ ॥

তোমা সেবা ছাড়িয়া আমি করিল সন্ন্যাস।
বাতুল হইয়া আমি কৈনু ধর্ম্ম নাশ ॥
এই অপরাধ তুমি না লইবা আমার।
তোমার অধীন আমি—পুত্র তোমার ॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব, তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে ॥

যদিও মহাপ্রভু নদীয়া গিয়া মায়ের কাছে দৈন্য প্রকাশের পরামর্শই দিতেছেন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসাশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই, সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠেয়ত্ব ইহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রুতি এই জন্যই বলিয়াছেন—'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। আশ্রমান্তরের অনুষ্ঠেয়ত্ব শ্রুতিও স্বীকার করিতেছেন। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহারই অবতরণা করা হইয়াছে।

অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ৩।৪।১৯

বাদরায়ণ (স্বতন্ত্র ভাবেই সন্ন্যাসাশ্রম) অনুষ্ঠেয় (মনে করেন) কেননা সাম্যবিষয়িণী শ্রুতি রহিয়াছে।

ভগবান বেদব্যাস সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠেয়ত্ব স্বীকার করেন। 'যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহোতি', 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি' ইত্যাদি মন্ত্রে যাবজ্জীবন কর্ম্মেরই উপদেশ আছে, সন্ন্যাসের নাই—এইরূপ বুদ্ধির নিরাকরণের জন্যই এই সূত্র। কেননা বেদে সাম্যশ্রুতি রহিয়াছে—'সাম্য শ্রুতেঃ'। গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাশ্রমের সমানভাবে অনুষ্ঠেয়ত্ব শ্রুতি পরামর্শ দিয়াছেন। 'ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ'—এই মন্ত্রের মধ্যে যে 'তপঃ' শব্দ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী দুইকেই সমভাবে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মস্কন্ধত্রয়ের মধ্যে প্রতি আশ্রমের তুল্যত্বই শ্রুত হইতেছে। ব্রহ্মসংস্থতাদ্বারাই প্রতি আশ্রম তুল্য। ব্রহ্মসংস্থতা মূলে না থাকিলে উহাদের মধ্যে উচ্চাবচভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, সন্ন্যাস হয় সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম সিঁড়ি। সন্ন্যাস-কৌলীন্য ভাঙ্গিবার জন্যই এই সূত্রের অবতারণা। শ্রীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন—'সন্ন্যাস শ্রেষ্ঠ, গার্হস্থ্য হেয়—এ বোধও সন্ন্যাসীর বন্ধন',—'মহাসিদ্ধাবস্থায় গার্হস্থ্য সন্ন্যাস এক বলিয়া মনে হয়'। যাহারা বিধি মার্গে ব্রহ্মচারী গৃহী বানপ্রস্থী সন্ন্যাসী, তাহারাই 'পুণ্য লোক', যাহারা রাগ মার্গে উর্দ্ধমূল হইয়া, দ্বন্দ্ব-বুদ্ধির ক্ষেত্রকে ডিঙ্গাইয়া প্রাণের সন্ধানী তাহারা সর্ব্বাশ্রম সমন্বয়-মূর্ত্তি। বিধির দেশে সব আশ্রমেরই

যাহার সাম্যশ্রুতি লাভ হইয়াছে, তাহার পক্ষেই সন্ন্যাস আশ্রম নিশ্চয়ই অনুষ্ঠেয়। এই সন্ন্যাসাশ্রম স্বীকারের মূলে রহিয়াছে পুরুষোত্তম-চোদনাকে বিশ্বের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দেওয়া। সন্ন্যাসী চোদনা-মূর্ত্তি। গৃহীও সন্ন্যাসাবস্থা লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত তিনি জীবনের উপলব্ধ সত্যকে কি করিয়া লোকসংগ্রহের প্রয়োজনে লাগাইবেন? পুরুষোত্তম-আচরণের জন্য সন্ন্যাসাশ্রমের অনুষ্ঠেয়ত্ব না থাকিলেও পুরুষোত্তম-প্রচারের জন্য তাহার অনুষ্ঠেয়ত্ব নিশ্চয়ই আছে। ঋষভ দেবের সন্ন্যাসী নব যোগেন্দ্রই প্রত্যেক ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভাগবত ধর্ম্মের মহিমা-কীর্ত্তন করিতে পারেন। পুরুষোত্তম-বিদ্বান গৃহী জনকও তাহা পারেন না। সন্ন্যাসাশ্রম যেন দেশ-সেবার সেচ্ছা-সেবকের প্রতীক চিহ্ন, চাপরাস, যাহা দ্বারা চেনা যায় যে ইনি বিশ্ব-সেবক। অর্দ্ধোদয় যোগে গৃহস্থ দল যে যাহার ভার বহিতেই ব্যস্ত, কে সকলের ভার বহিবে? সকলের ভার বহিবার দায়িত্ব স্বীকার করার মত একটী আশ্রম না থাকিলে সমাজ ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ হয় না। তাই শ্রুতি ও স্মৃতি সমভাবেই গার্হস্থ্য সন্ন্যাসের অনুষ্ঠেয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই বাদরায়ণের সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসও "অতএব"-এর সন্ন্যাস; সন্ন্যাসের প্রয়োজন লোক-সংগ্রহ।

মহাপ্রভু ভাবিতেছেন :—

যত অধ্যাপক, আর তার শিষ্যগণ।
ধর্ম্মী কর্ম্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জ্জন॥
এই সব মোর নিন্দা অপরাধ হইতে।
আমি না লওয়াইলে ভক্তি, না পারে লইতে॥
নিস্তারিতে আইলাঙ আমি, হৈল বিপরীত।
এ সব দুর্জ্জনের কৈছে হইবেক হিত?
আমারে প্রণতি করে, হবে পাপক্ষয়।
তবে সে ইহাদের ভক্তি লওয়াইলে লয়॥
মোর নিন্দা করে যে—না করে নমস্কার।
এ সব জীবের অবশ্য করিব উদ্ধার॥

সাময়িকী

যোগ্য হওয়া ঃ যোগ্য হইতে হইবে, এ সংসারে মানুষের মত বাঁচিয়া থাকিতে হইলে যোগ্য হইতে হইবে; আর বর্তমান কালে কেবল টিকিয়া থাকিতে হইলেই যোগ্য হওয়া দরকার। যোগ্য হওয়ার অর্থ কি? বর্তমান কালে জীবনের দিকে তাকাইয়া যোগ্যতার মানদণ্ড স্থির করিতে হইবে। 'To be fit is to be a Jogi'—যোগী হওয়াই যোগ্য হওয়া। যোগী হইতে হইবে কিন্তু কোন একরকমের যোগী নয়—কর্মযোগী বা জ্ঞানযোগী বা ধ্যানযোগী —ইহাদের যে কোন একটী হইলে আজিকার দিনের মানদণ্ডে যোগ্য হওয়া হইল না—হইতে হইবে জীবন-যোগী। একই মানুষকে কর্মযোগী হইতে হইবে, জ্ঞানযোগী হইতে হইবে, ধ্যানযোগী হইতে হইবে, প্রেম-যোগী হইতে হইবে, ভক্তিযোগী হইতে হইবে। অর্থাৎ একটা সামগ্রিক জীবন-যোগ তাহার সাধ্য। এই সামগ্রিকতা এমন বস্তু যাহা প্রথম হইতেই সমগ্র—তাই তাহার সাধনাও সামগ্রিক। জীবন-যোগের এক একটী দিককে লইয়া আরম্ভ করিয়া উহা শেষ করিয়া আবার আর একটী—এইভাবে দেখিলে চলিবে না। জীবনের বিভিন্ন দিকগুলিকে একবার বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে আর সেগুলিকে জোড়া দেওয়া যাইবে না। ইহা একটা যান্ত্রিক প্রণালী নয়। মানুষ যখন পুতুল গড়ে তখন সে একটী একটী করিয়া অংশ তৈরী করিতে করিতে অগ্রসর হয়— কিন্তু ভগবান যখন মানুষ সৃষ্টি করেন তখন প্রথম হইতেই উহাতে একটা সমগ্রতা থাকে। চারাগাছ কিংবা বৃহৎ বনস্পতি উভয়ের মধ্যেই প্রত্যেকের যথাস্থানে তাহাদের নিজস্ব একটী সম্পূর্ণতা আছে—বড়র বড়র মত তাহার একটী নিজস্ব সামগ্রিকতা আছে, ছোটর ছোটর মত তাহারও একটী সামগ্রিকতা আছে। ভগবানের সব সৃষ্টির পক্ষেই একথা সত্য—তাঁহার কাজে অন্তে সম্পূর্ণতা নয়, সোপানে সোপানেই সম্পূর্ণতা—কিন্তু মানুষের ভারাবাধা অসমাপ্ত ইমারত সমাপ্ত ইমারতের কাছে লজ্জা পায়। আলোর মধ্যে যে একটা সমগ্রতা আছে, তাহা অল্প আলো বা অধিক আলো সব আলোর মধ্যেই আছে। আগুনের মধ্যেও তাই, জলের মধ্যেও তাই। মানুষের মধ্যেও এমনই একটী সামগ্রিকতা তাঁর সত্তার মধ্যে অনুস্যূত হইয়া আছে। চারাগাছটী যে সমগ্রতা

লইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে, আজকের মানুষকে সেই সমগ্রতা লইয়া যোগ্য হইয়া উঠিতে হইবে। আজ রাজনীতিজ্ঞ হইব বা কলাবিৎ হইব বা গৃহস্থ হইব বা সন্ন্যাসী হইব—ইহা যোগ্য হওয়ার কথা নয়। আজকের মানুষ মানুষ হইবে, যাহার মধ্যে 'সামগ্রিক যোগ অনুস্যূত হইয়া আছে। সেটা পরিমাণ নয়, কোন বাহিরের প্রক্রিয়াও নয়, সেটা প্রাণের সম্পূর্ণতা।

আজকের শিশু বুদ্ধিতে পূর্বেকার বৃদ্ধের অপেক্ষা যোগ্য হইয়া জীবনের ক্ষেত্রে দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ প্রাণের এই সম্পূর্ণতার অধিকারী হইয়া যোগ্য হইবার সাধনা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেক শিশুকে শেখাও, প্রাণবান হও; ওরে কচি, ওরে সবুজ, প্রাণবান হও। বর্তমানের যে শিক্ষা-পদ্ধতি, যে আবেষ্টন—তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সহজেই ঘটাইতেছে, কিন্তু প্রাণ যে শুখাইয়া মরিয়া গেল! আজ প্রাণকে জাগ্রত করাই যোগ্য হওয়া। বুদ্ধির মধ্যে সম্পূর্ণতা নাই, বিশেষতঃ যে বুদ্ধি অহং-কৈন্দ্রিক তাহা তো নিতান্তই ঐকদেশিক, তাহা ভেদসৃষ্টিকারী। বুদ্ধিতে যোগ্য হইতে গিয়া ছোট হইতে বড়, ইস্কুল হইতে গৃহ বিশ্বব্যাপী সর্বত্র চলিতেছে একটা রেষারেষি, পারস্পরিক প্রীতির গন্ধও যেখানে নাই। অথচ বিশ্বের অন্তর-সত্তা কাঁদিয়া উঠিয়াছে একটু প্রীতির স্পর্শের জন্য। মানুষের অবচেতন সত্তা যাহা চাহিতেছে, চেতন অবস্থায় মানুষের বুদ্ধি তাহারই গলা টিপিয়া মারিতেছে। নিজের কাছে মানুষ বন্দী হইয়া কি অদ্ভুত অবস্থায় পড়িয়াছে! প্রাণের সমগ্রতা লইয়া আজ যোগ্য হইতে হইবে—নহিলে মানুষের সাথে মানুষের মিলন অসম্ভব। অথচ আজ মিলনের দিন—এক বিশ্ব-সমাজ রচনা করিয়া তুলিবার দিন। সভ্যতা আজও বুদ্ধি-প্রধান বলিয়া মানুষ কিছুতেই মিলনটাকে ঘটাইয়া তুলিতে পারিতেছে না—বিভেদমূলক ব্যক্তি-কৈন্দ্রিক যোগ্যতা লইয়া নিজের অহংকারের প্রাচীরে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে। তাই বলি, কেবলই বলি, নিজেকে বলি, সবাইকে বলি—প্রাণবান হও, প্রাণকে জাগ্রত কর—প্রাণের সমগ্রতা লইয়া ফুটিয়া ওঠ—মিলন বা প্রেমই যাহার শেষ কথা।

গীতা-জয়ন্তীঃ অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা কহিয়াছিলেন। সে কত বৎসর আগে তাহার হিসাব আমাদের ঠিক জানা নাই; কিন্তু তিথিটী গীতাকে যাহারা ভালবাসে তাহাদের কাছে স্মরণীয় হইয়া আছে। এ কথা ভাবিতে পুলক লাগে যে, সেই কত কত কাল আ[illegible] কথা উচ্চারিত বা গীত হইয়াছিল, তাহাই আজ আমরা পড়ি, ভাবি; তাহাই আজ

আমাদিগকে পথের নিশানা দেয়। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক কালেই সমস্যা আছে—যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ সমস্যা। কিন্তু ভারতবাসীর বিশেষতঃ আধুনিক ভারতবাসীর সমস্যাটা একটু বিশেষ ধরণের। আধুনিক বলিতে পঞ্চাশ বৎসর নয়—দেড়শত বৎসর মত সময়। বলা যাইতে পারে রামমোহন রায় মহাশয়ের সময় হইতে ভারতবাসীর পক্ষে আধুনিক যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এবং ভারতবাসীর বিশেষ সমস্যাটার সমাধানের ইঙ্গিত সেইদিন রামমোহনই ধরিয়া দিয়া গিয়াছিলেন।

ভারতবাসীর রক্তের মধ্যে সেই আকুতি—'অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে'। এই আকুতিই ভারতবর্ষকে ভোগের মধ্যেও মুক্তির পথ দেখাইয়াছিল। যেজন্য উপনিষদ্ বলিতে পারিলেন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা'। কিন্তু বস্তুকে ছাড়াইয়া তাহার অতীত থাকিবার এই মনোবৃত্তি বিকৃত হইয়া একদিন বস্তুকে, ইহলোককে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত করিয়া বস্তুর অতীত হইল, এই স্থান হইতে অন্য কোথা যাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। ইহার নাম অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ। আবার একদিন চক্র ঘুরিল—তথাকথিত অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষের সঙ্গে তথাকথিত জড়বাদী পাশ্চাত্ত্যের ধাক্কা লাগিল—দুইটী দুই ক্ষেত্রে আপন কক্ষে আবর্তিত হইতেছিল—কালের ধাক্কায় দুইজনে মেশামেশি হইয়া গেল। ফলে অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ আজ নোংরারকম জড়বাদী হইয়া পড়িল। তাই আজ আমাদের সামনে সমস্যা নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে বলা যায়। তাই আজ আবার সেই গোড়া হইতে আরম্ভ করিতে হইবে—সেই উপনিষদের যুগ হইতে—যেখানে 'এজতি' ও 'ন এজতি' একই সঙ্গে একই সময়ে সত্য। সেইখানে আজ আমাদের গীতাকে বড় প্রয়োজন—আমাদের সমস্যাটা কেমন স্পষ্ট করিয়াই সেখানে আছে, আর আছে তাহার সমাধানটা। ধনুর্দ্ধর পাশ্চাত্ত্যকে আজ যোগেশ্বর হইতে হইবে—অর্থাৎ তাহাকে শিখিতে হইবে যে ব্যক্তি-কৈন্দ্রিক বা শুধু নিজ জাতি-কৈন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিটাই সবটুকু সত্য নয়—এই দুই কেন্দ্রকে ডিঙ্গাইয়া, ইহাদের অতীত হইয়া তাহাকে সামগ্রিক চেতনা আনিতে হইবে। আজও পাশ্চাত্ত্যের বাস্তব-জীবনে ইহা সত্য নয়। আবার ভারতবর্ষ যেমন তাহার এই যা-কিছুকে মিথ্যা বলিয়া যোগেশ্বর হইতে পারিবে না, যোগেশ্বর হইতে হইবে এই যা-কিছুকে ব্রহ্মমূল্যে [illegible]দন করিয়া, ইহাদের অন্তর্নিহিত পুরুষোত্তম-মূল্য খুঁজিয়া বাহির করিয়া, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের মত জড়বাদীও সে হইতে পারিবে না।

এই সন্ধিক্ষণে গীতা তাহাকে পথ দেখাইবে—গীতার অবধূত-ভাষ্যে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ সেই পথকে স্পষ্টতর করিয়া ধরিয়াছেন। আমরা আজ এই গীতা-জয়ন্তী দিনে, এই অগ্রহায়ণের শুক্লা একাদশী তিথিতে গীতাকে আমাদের মনপ্রাণচিত্ত দিয়া বন্দনা করিতেছি, প্রার্থনা জানাইতেছি গীতার যুগোপযোগী বাণীকে যেন আমরা ধারণ করিতে পারি।

ঐদিন নরনারায়ণ আশ্রমে বিকালে শ্রীমৎ পুরুষোত্তমানন্দ লিখিত 'গীতা-জয়ন্তী' পুস্তিকা পাঠ হইয়া থাকে। রাত্রিতে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থললিত কণ্ঠে নাম-কীর্ত্তন করেন।

'প্রাণের মধ্যে আনন্দ এবং কর্ম এই দুটো জিনিস একত্র মিলিত হয়ে রয়েছে। প্রাণের সচেষ্টতাতেই প্রাণের আনন্দ—প্রাণের আনন্দেই তার সচেষ্টতা।'

—রচনাবলী (১৪), ২৯৪

শ্রীরেণু মিত্র কর্ত্তৃক নরনারায়ণ আশ্রম, পোঃ দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত ও দি প্রিন্ট ইণ্ডিয়া ৩।১, মোহনবাগান [illegible], কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।